CUL - H04257 - 13 - P30237

বঙ্গশ্রী

সচিত্র বাঙ্গলা মাসিক

ষোড়শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৫৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

13

ষাণ্মাষিক সূচীপত্র

সম্পাদক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড্,
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

P30237

বিষয় ও লেখক-সূচী

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বেকার সমস্যা	শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
আনাক্কাগোরাস	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৩৫৩
আর্থিক উৎপাদন ও কোয়াপারেটিভ্ ক্রেডিট-সোসাইটি	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন	২৬৬
ইউরেনিয়াম	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল	৪০৮
উত্তর আটলান্টিক চুক্তি	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪৫৭
একাডেমির চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র)	রূপরসিক	২২২
এলিয়েটের কাব্য	শ্রীওঙ্কারনাথ গুপ্ত	৬২
কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের দুইটি পত্র	শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তী	৭২
কারেণ বিদ্রোহের ইতিহাস (সচিত্র)	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৩২৭
কুয়োমিন্‌টাঙ, আর কমিউনিষ্ট, কারা ?	ওঙ্কারনাথ গুপ্ত	৪৩৮
গণতন্ত্র ও গণ-স্বাধীনতা	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	২৮২
গিরিশচন্দ্রের বলিদান	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৪২
গ্রীক-দর্শন	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৩
চাঁদের কথা	শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী	১১২
জনগণ-মন-অধিনায়ক কে ?	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	২৫১
জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশন	(সচিত্র)	১২৫
ঝুলি-ঝাড়া উপাখ্যান	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	৪২৯
নূতন অধ্যায়	ঐ	১০
পদাবলী সাহিত্য ও লীলাতত্ত্ব	শ্রীকালিদাস রায়	৩১৭
পরমাণুবাদঃ লিউকিপাস ও ডেমক্রিটাস	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	১৬৮
পুণ্যাত্মাপুরুষ সচ্চিদানন্দ		
পুরাতন দিল্লী (সচিত্র)	শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রাচীন চিত্র	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন		
'প্রেম'	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	
বাংলা গানে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান	শ্রীসুনীলচন্দ্র বসু	
বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নী	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	
ব্যাপক বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রস্তাব (সচিত্র)	শ্রীসন্তোষ কুমার দে	
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়	শ্রীননীমাধব চৌধুরী	২৩৯
ভারত-মহীয়সী সরোজিনী নাইডু (সচিত্র)		
ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গান্ধার পদ্ধতি (সচিত্র)	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	
মন জাতির উপকথা	শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দাস	
রাজগীরের জন্মকথা	শ্রীমতী অমিয়া বসু	
রূপক নাটক ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' (সচিত্র)	শ্রীললিত কুমার শেঠ	
শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৩২,১১৫,২৫
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র নাথ (সচিত্র)		
সাহিত্য ও সামাজিক দায়িত্ব	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	
সাহিত্য সাধক চিত্তরঞ্জন	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩৯৮
সুন্দরবন	শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল	
হাইদ্রাবাদ (সচিত্র)	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	
মিশরের স্বাধীনতাসংগ্রাম	শ্রীমতী অমিয়া বসু	
বৌদ্ধ স্থাপত্য	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	
জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	
এথেন্‌স্	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	
পর্দ্দার আড়ালে	শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার	
জাতীয় সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল	শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায়	

গল্প

	সুবোধ বসু	২১০
(জন ষ্টেন্‌বেক)	অনুবাদক—শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী	৩২৩
	শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ	৩০১
	শ্রীহরিপদ দে	২২৪
	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪০১
ফুল	মুসাফির	২৯
	বিজয় কুমার বসু	৬
	শ্রীরমাপতি দাস	৪৩২
	শ্রীচারুচন্দ্র সেন	৩৭
ন্টন চেকভ)	অনুবাদক—শ্রীমৃগাঙ্ক রায়	৩৫৫
	শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৪
	শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ	১৩৮
	বীরু সরকার	৪৬
রম	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৯৭
াই	শ্রীজনরঞ্জন রায়	৭৮
	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৮৮
(এণ্টন্ চেকভ)	অনুবাদক—শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়	৭৪
রসেট ম'ম)	অনুবাদক—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	১৯০
	দুলাল গুহ	৪৯
	শ্রীমতিলাল দাস	১১৪
ায়ণের তীরে	শ্রীচারুচন্দ্র সেন	৪৯৩
হচর	শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী	১০৯
দন (মুন্সী প্রেমচন্দ)	অনুবাদক—পারুল ঘোষ	৩২২
ধী	রঞ্জত সেন	৪৭৫
।	শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	৫০৮
শ	শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া	৫৩৪
শ অছেন	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	৫৪২
রায়	রমেশ মৈত্র	৫৫৩

উপন্যাস

াটের কসল	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	১৭, ১৪৬, ২৩৬, ৩৩৩
দিগ্বিজয়ীর ঘাট	শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	৫৬, ১৭৮, ৩৮৩
পরিব্রাজক কার্ন্দীত (কার্ল গিয়েলারপ)	অনুবাদক—শ্রীশুদ্ধোধন সেন	৮৩, ১৬১, ২৪৬, ৩৫৭
উর্দ্ধগামী (উপন্যাস)	শ্রীসুবোধ বসু	৪১১, ৫২৫

কবিতা

অস্মাকম্ শুভায় ভবতু	সত্য দাস	১৮৬
অনশেষে	অনিমা মুখোপাধ্যায়	৯৮৩
এই মাটি	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৭৫
একদা এমনি রাতে	লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস	২৮৭
কত দূর	নির্ম্মলেন্দু রায়চৌধুরী	৫১৮
ক্রোড়পত্র	পরিমল মুখোপাধ্যায়	২১১
ক্ষমা কর	রঘুনাথ ঘোষ	২৬৮
গান	শ্রীরমেন মৈত্র	৫২
গান্ধীজীর জীবন-মৃত্যু	সত্যপ্রিয় ঘোষ	৫৩১
চোখ	সুধা চক্রবর্ত্তী	২১৪
জিজ্ঞাসা	পরিমল মুখোপাধ্যায়	৩৩৭
জিজ্ঞাসা	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৩৬
জ্যোতিষ্ক-প্রাণ	সলিল গঙ্গোপাধ্যায়	২৫৪
ঠিকানা	সত্য দাস	৩০৪
তন্ময়	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১০৯
দ্রুতা	শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩১২
দেবতার ঠাঁই	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০৮
দীপ	চিত্তরঞ্জন সরকার	৪১০
নিঃসঙ্গ	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	২৩৫
নূতন স্বর্গ	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৩৫৬
নেতাজী	শ্রীসুবোধ রায়	২৩১
পদ্মা-বক্ষে	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১
প্রথম পরশ	শ্রীমন্মথনাথ সরকার	৩৫২
প্রত্যাশা	অরবিন্দ গুহ	৩০০
প্রেম আসে	বিভূতি মণ্ডল	৩৩২
বসন্ত-বরণ	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৩২৬
বিবেকানন্দ বীর	শ্রীপ্রণতি দাশগুপ্তা	২৪২
বিষকুম্ভ	দিলীপ দাশগুপ্ত	৪৩১
বুরুশওয়ালা	শ্রীজগদিন্দ্র চন্দ্র বসু	১৩০

রামিকৃষ্ণ	শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী	৪৬৪
'বেঁথাগুলো বয়ে নাই'	শ্রীবটকৃষ্ণ দে	১৭৬
'সত্য এল আনন্দেরি রূপে'	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	১২০
স্মৃতি	নির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তি	৮০
হয় তো	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	৬১
হাসে ইতিহাস	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	১৩৭
মেঘলা দিনে	অশ্বিনী পাল	৪৭৫
সম্ভাবনা	শ্রীবটকৃষ্ণ দে	৪৮৩
সাড়া	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনো—	৪৯২
আমাদের ডাক	হাসিরাশি দেবী	৪৯৮
গোপা	শ্রীহরিপদ গুহ	
অনাহুতের প্রতি	কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত	
ভারতবর্ষ	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী	

পুস্তক ও আলোচনা

৮৪,

রূপলোক

৮১, ২৫৯,

সম্পাদকীয়

৮৩,
৩৬৫,

বিস্তৃত ও সরল টিপ্পনীসহ বঙ্গীয় সংস্করণ

বাল্মীকি রামায়ণ

৬০ খণ্ডে সমাপ্ত
প্রতি খণ্ড—এক টা—

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সাচ্চদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গশ্রী

ড়শ বর্ষ | পৌষ—১৩৫৫ | ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

পদ্মা-বক্ষে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বালক বৃদ্ধ বধূ ও কন্যা ভীত সব নর নারী,
আসিছে পলায়ে ঢাকায় সুদূর পল্লীভবন ছাড়ি।
ইষ্টিমারের বুকে
বসে আছে নত মুখে,
বিদায়ের ব্যথা-ব্যাকুল নয়নে তখনো রয়েছে বারি।

দুই

আসেনি, নয়কো অর্দ্ধাশনেও ম্লান,
সম্ভ্রম আর ইজ্জত সম্মান।
মের বনের রেখা
খনো যেতেছে দেখা,
বিকৃত কিন্তু আছে প্রকৃতির টান।

তিন

সাত পুরুষের বাস্তুভিটার সে মায়া কি ভোলা যায়,
প্রতি ঘরখানি সজীব হইয়া কেঁদে যেন পথ চায়।
আঙিনার তরুরাজি
আঁখিজলে ভেজে আজি,
মাটির মায়ার শত বন্ধন এড়ানো দারুণ দায়।

চার

ভেঁপু বাজাইয়া ঠেলি জলরাশি চলিছে ইষ্টিমার,
বিদায়ের ব্যথা-রঞ্জিত যেন পরিচিত চারিধার।
নদীর জলোচ্ছ্বাস
বলে ওরে কোথা যাস?
তোরা পদ্মার পদ্ম যে, কোথা যাবি কোল ছেড়ে তার?

পাঁচ

'খানাতল্লাস' করিতে আসিল 'গার্ড'দল হয়ে জড়,
যত তৈজসপত্র হাতাড়ে তর্জ্জন করে বড়।
ত ম করি ০
খে নোট টাকা কড়ি,
স্বর্ণ গহনা এড়ায় না সেই দৃষ্টি রূঢ় ও খর।

ছয়

কি কাড়িয়া লবে ঠিকানা তো নাই তাই শঙ্কিত সবে,
পুণ্য ও প্রিয় তৈজস হায় অপরে কাড়িয়া লবে?
তাই তুমি নাও বলে
ফেলে পদ্মার জলে
যা হোক তাহারা শীতল অতলে তবু শান্তিতে রবে।

সাত

জলে ফেলে দেয় পুষ্পপাত্র, ঘট ঘটি সারি
আইবুড়ো ভাত খাওয়ার থালা ও ভোগ রাঁধিবা
ডিস্ বাটা ফুলদানী
যৌতুক সব টানি
সেরা খাগড়াই দানের বাসন তৈজস ভারী

আট

বধূ হাত হতে খুলি কঙ্কণ ভাবে অতি
শুভ কঙ্কণ কার করে গিয়া হইবে কলঙ্কি
পদ্মা তুমিই পরো,
শাঁখা অক্ষয় কর,
তোমার সলিলে স্বর্ণ-কাঁকন থাকুক নিম

নয়

শূন্য হস্ত শূন্য হৃদয় আকাশের পানে চায়,
তাদের ব্যথায় বয়ে পদ্মার জলো-হাওয়া গায় হায়।
বলে ওগো মনে রেখো,
যেথা যাবে সুখে থেকো,
যাও মঙ্গল মঙ্গলময়ী কাহার উপেক্ষায়?

গ্রীক দর্শন

এম্‌পিডক্লিজ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

এম্‌পিডক্লিজ সিসিলিদ্বীপে এগ্রিজেন্টাম নগরের অধিবাসী ছিলেন। (৪৯০—৪৩০ খৃঃ পূঃ)। রাজ-নীতিবিদ্, চিকিৎসক ও কবি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি অনেক অতিপ্রাকৃত কর্ম্ম করিতে পারি-তেন বলিয়াও লোকের বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের ক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ পটুতা ছিল। কথিত আছে, তিনি আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আপনার দেবত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ইত্‌না আগ্নেয়গিরির গহ্বরে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

পারমিনিদিসের মত এম্‌পিডক্লিজও তাঁহার গবেষণার কথা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পারমিনিদিস বলিয়াছিলেন, ব্যাবহারিক জগতের অন্তরালে যে সত্য পদার্থ আছে, তাহা গোলাকার, চিরস্থায়ী, অচঞ্চল ও নিরবকাশ। কিন্তু সেই নিশ্চল চিরস্থায়ী পদার্থ হইতে এই গতিশীল নশ্বর জগতের উদ্ভব হইল কিরূপে? এই জগতের বৈচিত্র্য ও গতি কোথা হইতে আসিল? ঐ গোলক যদি কেবল একজাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গতি অসম্ভব, অন্ততঃ গতি ও স্থিতি সমান হইয়া যায়। কিন্তু যদি কতিপয় মূলপদার্থ লইয়া গোলক গঠিত হইয়াছে—ইহা অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তাহ সবই মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাবহারিক জগতের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এম্‌পিডক্লিজ এই ভাবেই জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্য পদার্থ যদি একমাত্র হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে যে জগতের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার কখনই উৎপত্তি হইতে পারে না। সত্যপদার্থ যদি বহু হয়, তাহা হইলে নিত্যত্ব ও পরিবর্ত্তন উভয়ের ব্যাখ্যাই সম্ভব হয়। তাই এম্‌পিডক্লিজ সিদ্ধান্ত করিলেন, জগতের উপাদান (matter) স্বরূপে অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও তাহা একাধিক মৌলিক দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত। সেই মৌলিক দ্রব্য-সমূহের বিভিন্ন অনুপাতে সংযোগে জগতের উৎপত্তি। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, (অগ্নি) ও মরুত—এই চারিটি মৌলিক দ্রব্য। তাহারা অবিনশ্বর। এখনও তাহারা যাহা, চিরকালই তাহাই তাহারা। তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সমবায়ে (পিণ্ডীকরণ) বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু মৌলিক দ্রব্যে গতির উৎপত্তি হয় কিরূপে? সর্ব্বত্র যে সংযোগ ও বিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? জগতে যে শক্তির ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করা যায়, হেরাক্লিটাস অগ্নিকে তাহার কারণ বলিয়া-ছিলেন, কিন্তু এম্‌পিডক্লিজের মতে অগ্নি মৌলিকদ্রব্য সমূহের মধ্যে একটিমাত্র, সুতরাং তাহা দ্বারা উৎপত্তি ও ধ্বংসের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই ভৌতিক দ্রব্যে গতির ব্যাখ্যার জন্য এম্‌পিডক্লিজ ভৌতিকপদার্থের অতিরিক্ত তত্ত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ভৌতিক পদার্থের যেমন সংযোগ আছে, তেমনি তাহাদের বিশ্লেষণও আছে। জীবের উৎপত্তির সময় তাহারা সংযুক্ত হয়, মৃত্যুতে বিশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং এম্‌পিডক্লিজ গতির দুইটি কারণের কল্পনা করেন—রাগ (Love) ও দ্বেষ (Holi)। মৌলিকদ্রব্যগুলি সকলেই এই দুই শক্তির প্রভাবাধীন। রাগ কর্ত্তৃক তাহাদের সংযোগ ও দ্বেষ কর্ত্তৃক বিয়োগ সাধিত হয়। এই দুই শক্তি মৌলিক দ্রব্যের গুণ নহে—তাহারা স্বতন্ত্র শক্তি। প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে। কখনও রাগ প্রবল হয়, কখনও বা দ্বেষ। যখন দেহের সমস্ত অঙ্গ রাগের প্রভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করে, তখন জীবনের পরিপূর্ণ রাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বেষের প্রভাবে তাহাদের ঐক্যবাদন ছিন্ন হইয়া যখন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে,

তখন জীবন-তরঙ্গ ভগ্ন হইয়া যায়। ভৌতিক পদার্থ চতুষ্টয়ের মত রাগ ও দ্বেষও শাশ্বত। সুতরাং এম্পিডক্লিজের মতে শাশ্বত তত্ত্বের সংখ্যা ছয়টি।

জগতে পর্য্যায় ক্রমে রাগ ও দ্বেষের প্রভাবের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। জগতের পরিবর্ত্তনরাজির মূলে কাহারও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা নাই, তাহারা নিয়ন্ত্রিত হয় যদৃচ্ছা (chance) ও নিয়তি (necessity) দ্বারা। রাগ ও দ্বেষের প্রভাব চক্রের মত পরিবর্ত্তী। রাগ যাহাদিগকে সংযুক্ত করে, দ্বেষ তাহাদিগকে বিযুক্ত করে; দ্বেষ যাহাদিগকে বিযুক্ত করে, রাগ তাহাদিগের সংযোগ বিধান করে। আদিতে রাগেরই রাজত্ব ছিল। তখন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছিল বলিয়া সৃষ্টির সম্ভব হয় নাই। দ্বেষের আবির্ভাবের ফলে তাহাদের ঐক্যবন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে, এবং তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। রাগের শক্তি সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত না হওয়ায় বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তখন বিশ্বের সৃষ্টি হইল। সীমাবদ্ধ দ্বেষ কর্ত্তৃক অংশত বিচ্ছিন্ন হইলেও, বিভিন্ন অংশ তখন সমগ্রভাবে একীভূত ছিল। যখন রাগ সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন বিচ্ছেদও সম্পূর্ণ হয়, এবং বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রলয়ের পরে রাগ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া আবার প্রবল হইয়া উঠে, তখন নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এই রূপে চক্রবৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে।

এম্পিডক্লিজের মতে জগৎ গোলাকার। সত্যযুগে দ্বেষ ছিল এই গোলকের বাহিরে, রাগ ছিল ভিতরে। ক্রমে দ্বেষ ভিতরে প্রবেশ লাভ করে এবং রাগ বহিষ্কৃত হয়। আবার রাগ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বেষকে বহিষ্কৃত করে। বিশ্বের ইতিহাস অভিব্যক্তির ইতিহাস, সংঘর্ষ ও সঙ্গতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের ইতিহাস।

মানব বিশ্বগোলকের প্রতিরূপ। মৌলিক চারিটি পদার্থ তাহাতে সম্মিলিত হইয়া রাগ ও দ্বেষের অধীনে আসে; মানব নিজেও রাগ ও দ্বেষের প্রভাবের অধীন। বিশ্বের মূল উপাদানে গঠিত বলিয়া মানুষও বিশ্বের প্রত্যেক দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। স্বরূপে আমরা যাহা, তাহা আমরা জানিতে পারি। সদৃশ পদার্থ কর্ত্তৃক সদৃশ পদার্থ জ্ঞাত হয়। ক্ষিতিদ্বারা আমরা ক্ষিতিকে জানি, জলের দ্বারা জলকে, বায়ুদ্বারা বায়ুকে এবং অগ্নিদ্বারা অগ্নিকে। প্রেমদ্বারা আমরা প্রেমকে জানি, বিদ্বেষদ্বারা বিদ্বেষকে।

এম্পিডক্লিজ ঈশ্বর তত্ত্বেরও আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরকে তিনি পবিত্র, বাক্যের অতীত চিৎপদার্থ (mind) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রুতগামী চিন্তাদ্বারা তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু বিশ্বের অপরিহার্য্য অংশরূপে তিনি ঈশ্বরের কল্পনা করেন নাই। জীবনের অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যায় চিন্তাকে (thought) তিনি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন মনে করিতেন। আত্মাকে তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু বলিয়া মনে করেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পার্থক গোরাসের মতই তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন, এবং তাহার স্বকীয় বিভিন্ন জন্মের কথাও বলিয়াছেন। একজন্মে তিনি কুমীর, অন্য জন্মে মৎস্য, তাহার পূর্ব্বে পক্ষী ছিলেন। এক জন্মে যে তিনি গুল্ম ছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন।

এম্পিডক্লিজ কেবল দার্শনিক ছিলেন না, তিনি বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে বায়ুকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া আবিষ্কার করেন। ইহার প্রমাণ এইভাবে দিয়াছিলেন:

যখন কোনও একটি জলপাত্র উপুড় করিয়া জলের মধ্যে স্থাপন করা যায়, তখন দেখা যায় পাত্রের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। পাত্রের মধ্যস্থ বাতাসই জলের প্রবেশে বাধা দেয়। তিনি কেন্দ্রাতিগ শক্তির (centrifugal force) বিষয়ও অবগত ছিলেন। দড়ি বাঁধা বাটে জলপূর্ণ করিয়া যদি দড়ি দ্বারা চারিধারে ঘোরানো যায়, দেখা যায় বাটের জল পড়িয়া যায়না। ইহা হইতে কেন্দ্রাভিমুখী গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ্ জগতে যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ আছে, তাহা তিনি জানিতেন। অভিব্যক্তি ও যোগ্যতমের স্থিতি সম্বন্ধেও তাঁহার একটা স্থুল মত ছিল। তিনি বলিয়াছেন: প্রথমে অসংখ্য জাতীয়, অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট জীব পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। গ্রীবাহীন মস্তক, স্কন্ধহীন বাহু, কপালবিহীন চক্ষু,—শরীরের বিভিন্ন সুঅংশ স্রিয়া

বেড়াইতেছিল— পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য। এই সমস্ত অঙ্গের যদৃচ্ছা ক্রমে মিলনের ফলে ভীষণাকৃতি জীবসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও ছিল অসংখ্য বাহু, কাহারো মুখ ছিল একদিকে, বক্ষ তাহার বিপরীত দিকে. কাহারও ছিল মানুষের মুখ, পশুর দেহ, কাহারও পশুর মুখ, মানুষের দেহ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রকৃতি বিশিষ্ট বন্ধ্যা জীবও ছিল। এই সমস্ত জীবের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সামান্য কয়েকটী টিকিয়া থাকে।

চন্দ্রের যে নিজের জ্যোতি নাই, অন্যের জ্যোতিতে আলোকিত হয়, তাহা এম্পিডক্লিজের জানা ছিল। সূর্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ ধারনা ছিল। আলো আসিতে যে সময় লাগে, তাহা তিনি জানিতেন, এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে চন্দ্রের অবস্থিতির জন্যে যে সূর্য্য-গ্রহণ হয়, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন।

ইতালীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা, এবং প্লেটো ও আরিষ্টটল উভয়েই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-তন্ত্র কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এমপিডক্লিজ আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে পাপের জন্য অনুতাপও করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বহু জন্ম ধরিয়া যাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে, দেবতা-দিগের মধ্যে তাহারা চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী হয়। তাহারাই পরে পৃথিবীতে ধর্ম্মগুরু, কবি, চিকিৎসক অথবা নরপতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পরে তাহারা মানবীয় দুঃখকষ্ট ও অদৃষ্টের কবলমাত্র হইতে মুক্ত হইয়া দেবতাদের সঙ্গে আনন্দে বাস করে।

সত্তা (being) ও শক্তি (force) দুইটি পদার্থ। সত্তা নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প। শক্তি গতিও পরিবর্ত্তনের জননী। এলিয়াতিকগণ কেবল সত্তাই স্বীকার করিয়াছিলেন, শক্তি স্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতে শক্তির পরিচায়ক গতি ও পরিবর্ত্তনের অস্তিত্বই নাই। জগতে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা অলীক মায়া। হেরাক্লিটাস গতি ও পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অবিনশ্বর সত্তা তিনি কোথাও দেখিতে পান নাই। এমপিডক্লিজ এই দুই মতের সমন্বয় বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি সমন্বয়বাদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। তিনি সত্তা ও শক্তি উভয়ই স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই জগতের উপাদানের (matter) সঙ্গে গতি ও পরিবর্ত্তনের মূল রাগ ও দ্বেষ নামে দুইটি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডগোলক (spairos) নিশ্চল সত্তা। তাহার মধ্যে রাগ ও দ্বেষ প্রবেশ করিয়া গতি ও পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। এলিয়াতিকদিগের মূল একপদার্থ তাঁহার হস্তে চারি পদার্থে পরিণত হইয়াছিল। এই চারিপদার্থ এলিয়াতিক একের মতই স্থিতিশীল (static)। সেই স্থিতিশীলতা দূর করিবার জন্য রাগ ও দ্বেষের কল্পনা। পরমাণুবাদিগণের হস্তে এই কল্পনা কতদূর অপরি-বর্ত্তিত হইয়াছিল, পর পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাইব।

জলছবি

বিজয়কুমার বসু

মাটী ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে। বিকট এক অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে' বন্ধ্যা পৃথিবী যেন ব্যঙ্গ করছে মানুষকে, সভ্যতাকে। চোখ ভরে ওঠে নিরুপায়তার অশ্রুতে, কিন্তু মাটীর বুকে সেই অশ্রু এতটুকু দাগ কাটে না। এমনই নির্ম্মম মৃত্তিকা।

সব উজাড় হ'য়ে গেছে। যারা গেছে তারা বেঁচেছে, সরকারী বেসরকারী সাহায্যের আশ্বাসে গাছের পাতা খেয়ে মরণান্তিক রোগে ধুঁকতে ধুঁকতে যারা এখনও বেঁচে থাকবার অভিনয় করছে, তারাই বলে একথা। তবুও ক্ষীণ আশার দগ্ধ সলতেটুকু বাড়িয়ে নাড়িয়ে বাঁচবার জন্ত দুর্ব্বল চেষ্টার অন্ত নেই কারোর।

মাস তিনেক আগে দত্তবাড়ীতে বেগার খেটে মজুরী আর চুরি মিলিয়ে গামলাখানেক মুড়ি এনেছিল দামোদর, তা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল যক্ষের ধনের মত। শেষ প্রত্যেকটি দানা খুঁটে কোঁচড়ে বেঁধে পদ্মার হাত ধরে পথে এসে নামল দামোদর।

নেবার মত আর কিছুই অবশ্য ছিল না। জমিজমা, বাসনপত্র, সমস্ত কবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে অতলের গর্ভে। বাড়তি একখানা কাপড়ের কথা ভাবাটাই যেন একটা অপরাধ, কাপড়ের নামে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়াটায় কোনমতে লজ্জানিবারণ করা চলেছে। ঐটুকু বজায় থাকলেই যেন বাঁচে ওরা। মহাকালের মারণযজ্ঞে এবার দুঃশাসন সহায়।

গলিত শবের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তারই মধ্য দিয়ে শ্মশানচারী শকুনির বহু লুব্ধদৃষ্টির বড়যন্ত্র এড়িয়ে ওরা লোকালয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। একটা নির্বোধ অহেতুক মায়ায় ওদের চোখের জল উপছে উঠল, মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে লাগল।

লক্ষ্য মহানগরী; জনশ্রুতি: অনেক লঙ্গরখানা সেখানে নাকি খুলেছে।

পথ আর ফুরোতে চায় না, কিন্তু এরই মধ্যে কখন পদ্মার সম্বল উবে গেছে। কিন্তু যেভাবে হোক্ বাঁচতেই হবে; অতিক্রম করিতেই হবে এই পথ, যেমন করেই হোক। আশার জারকরসে জিইয়ে রুগ্ন দুর্ব্বল দামোদরকে একরকম টেনে নিয়ে যেতে লাগল পদ্মা। কিন্তু দামোদর আর চলতে পারে না, পথেই সে মরতে চায়। সময় অসময়ের জ্ঞান নেই, খাবার জন্ত অবুঝের মত বায়না ধরে কাঁদে। তবু পদ্মা থামতে সাহস পায় না, তাহলে ওরা এগিয়ে যাবে দামোদর আর পদ্মাকে ফেলে।

ওরা পথচলতি সঙ্গীর দল, যারা আপনা থেকেই জুটেছিল। চামড়ায় ঢাকা কতকগুলো কঙ্কাল, প্রত্যেকের সঙ্গেই একপাল ছেলে। এদের প্রতি কমলার সকল বিরূপতার ক্ষতিপূরণ করেছেন মা ষষ্ঠি তার অপর্য্যাপ্ত দাক্ষিণ্যে ঘর ভরিয়ে দিয়ে।

সেদিন সকালে ককিয়ে কেঁদে উঠল দামোদর: কিছু না খেয়ে নড়বে না সে কিছুতেই। অভিমানে আর ভর্ৎসনার ক্ষতবিক্ষত করে তুলল পদ্মাকে, অন্ত সকলে খুদকুঁড়ো যাই হোক, পায় কোথা থেকে? দামোদর রুগ্ন পঙ্গু বলেই না পদ্মার এই হতশ্রদ্ধা।

জবাব দেয় না পদ্মা, দেবার কিছু নেইও। কি নিদারুণ মূল্যে ওরা খুদকুঁড়োর সংস্থান করছে, পদ্মা তা' জানে। ওদের কাছে চেয়েও কোন ফল হবে না। সন্তানকে বঞ্চিত করে নিজের উদরপূর্ত্তিতে জননীর যখন এতটুকু দ্বিধা নেই, অপরের প্রতি মমত্ব বোধের দুর্মূল্য ভাববিলাসিতা মানুষের কাছ থেকে আশা করা নিতান্তই দুরাশা। কিন্তু একগুঁয়ে ছেলের মত দামোদরের জিদ: কিছু না খেতে দিলে এক পা-ও আর সে যাবে না।

অগত্যা পদ্মাকে রয়ে যেতে হ'ল দামোদরের সঙ্গে। একটা দিনের এই অপচয়ের জন্ত দামোদরকে ক্ষমা করাও পদ্মার পক্ষে কঠিন। নিজের জন্ত পদ্মাকেও না খাইয়ে মারতে চায় না কি দামোদর? কিন্তু পদ্মা জানে,

দামোদরের এই নির্বীর্য্য অবুঝপনায় বিরুদ্ধে তার ক্রোধের কোন মূল্যই নেই। তাই যুক্তির রসে চুঁইয়ে আর্দ্র মিনতিতে পদ্মা ভেঙে পড়ল দামোদরের পায়ে। রাজী হ'ল দামোদর।

আবার চলতে লাগল দুজনে। কিন্তু রৌদ্র খর হ'য়ে উঠেছে ইতিমধ্যে—পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো পাকিয়ে উঠে শরীরটাকে যেন মুচড়ে ভেঙে দিতে চায়। রক্তশূন্যতার অবসন্নতায় দামোদরের সর্ব্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল; কাটা ছাগলের মত ধড়ফড় করে সে পড়ে গেল পথের মাঝেই। জিভ শুকিয়ে টেনে ধরেছে, থুতু দিয়ে জিভটা ভিজাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল দামোদর। থুতুর বদলে বেরোল খানিকটা ছিটে রক্ত।

কোন রকমে পদ্মা দামোদরকে টেনে একটা গাছের তলায় শুইয়ে দিল। এবার কি করতে হবে, পদ্মার জানা নেই। ধারে কাছে বসতির চিহ্ন মাত্র নেই—কোথায় যাবে পদ্মা? দামোদরের পাঁজরায় হাত বুলোতে বুলোতে দামোদরের সঙ্গে পদ্মাও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পদ্মার ঘুম যখন ভাঙল, সূর্য্য ততক্ষণে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। একবার চোখ মেলেই পদ্মা আবার চোখ বন্ধ করল—ঘুমই ভাল, ঔদরিক তাড়না থেকে তবু খানিকটা বিস্মৃতি এনে দেয়। বিচিত্র পদ্মার প্রকৃতি, নববিবাহিতা স্বামীসোহাগিনীর মত দামোদরকে জড়িয়ে ধরে সেই নির্জ্জন প্রান্তরে পড়ন্ত রৌদ্রে পুনরায় ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম আসে কি?

অতন্দ্র স্বপ্নের মধ্যে কালো একটা ছায়া এসে পড়ছে, ধড়মড়িয়ে উঠল পদ্মা। অমঙ্গলের আভাস পেয়ে বুঝি এক সঙ্গেই জেগে উঠল দামোদর। ত্রস্ত বিহ্বল চোখে দুজনে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

না, কেউ কোথাও নেই। শুধু পথের ওপাশে কালভার্টের উপর বসে একজন সিপাহী একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত। মুগ্ধ লুব্ধ নয়নে সেদিকে চেয়ে রইল দামোদর। নির্ভাঁজ নিখুঁত পরিচ্ছদ, গভীর আত্মতৃপ্তিতে টলমল মুখ—দৃষ্টিটাই শুধু একটু তীক্ষ্ণ জলজলে। আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ ঐ সিগারেটটার!

পরনের কাপড়টা যে ছেঁড়া, একথা নতুন করে অনুভব করল পদ্মা। সহস্র ছিদ্রের সহস্র অনাবৃতস্থান পুরুষের উলঙ্গ দৃষ্টির আগুনে পুড়ে সহস্র ক্ষতে পরিণত হল যেন তার জ্বালায় পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে পদ্মা। কাপড়খানাকে জড়িয়ে জবুথবু হ'য়ে সকল লজ্জা সে ঢাকতে চাইল অপরিসর সহস্র ছিদ্র কাপড়ে আঁটসাট যৌবনের ভার অধিকতর নেশায় পুরুষকে মাতাল করে তুলল।

ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ এগিয়ে এল আহার্য্যদানের বরাভয় নিয়ে, এখানে পড়ে কেন দুজনে? কি? কি চাই? খাবার?

খাবার? দামোদর স্বপ্ন দেখছে না কি?

হ্যাঁ, খাবার, খাবারই কে দেবে! মানুষের দুর্দ্দিনে মানুষই যদি না দেখে তবে আর 'ইন্‌সানিয়ৎ' কোথায়?

আনন্দে কেঁদে ফেলল দামোদর। ভগবান তবে আছেন?

কিন্তু খাবার ত সঙ্গে নেই। মাইলখানেক দূরে ক্যাম্প সেখান থেকে জোগাড় করে দিতে হবে।

অবসন্ন নির্জীব দামোদর একমাইল পথ চলা দূরের কথা, উঠে দাঁড়াতেই পারবে না। অগত্যা পদ্মা—

দামোদরের মৃত্যুরও হয়ত কোন মূল্য নেই পদ্মার কাছে, কিন্তু শুধু আত্মাভিমানের অহমিকাকে আঁকড়ে রক্তমাংসের পদ্মা কি শুকিয়ে মরে পুণ্য অর্জ্জন করবে?

সৈনিকটার পাশে পাশে পদ্মা চলতে লাগল।

চীৎকার করে একটা পেঁচা উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। দামোদর তাকিয়ে দেখল অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসছে। কিন্তু একা থাকতে তার ভয় নেই।

পথ কেটে চলেছে অপসৃয়মান দুইটি কালো ছায়া দামোদরও পারত অমনই উদ্ধত গর্ব্বিত ভঙ্গীতে পদ্মাকে পাশে নিয়ে চলতে। বুড়ো বাপ কতই না বুঝিয়েছিল—অজন্মার গ্রামে পড়ে থেকে পচে শুকিয়ে মরে কোন লাভই নেই; টাকা, অঢেল টাকা পাওয়া যায় মিলিটারী চাকরিতে। ইচ্ছাও ছিল দামোদরের, কিন্তু তবুও যেতে পারে নি। রাত্রে সুন্দরী পদ্মা, সর্ব্বনেশে পদ্মা তার সুগোল সুঠাম বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাতর মিনতিতে মানা করেছিল দামোদরকে। প্রদীপের স্বল্পালোকে দামোদর স্পষ্ট দেখেছিল পদ্মার চোখে জল টল টল

করছে। বিশ বছরের যৌবনের প্রস্তুতি ভাসিয়ে নিয়ে গেল অশীতিপরের অভিজ্ঞতার যুক্তিকে।

কিন্তু এত দেরী কেন পদ্মার? মোটে মাইলখানেক ত পথ!

অনেক পরে ফিরে এল পদ্মা, অপেক্ষার ক্লান্তিতে ততক্ষণে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল দামোদর। পদ্মার মৃদু পদশব্দে সোল্লাসে উঠে বসল।

একরাশ জিনিষ এনেছে পদ্মা—রুটি, ডাল, তরকারী, টিনের দুধ, বিস্কুট, এমন কি দামোদরের জন্য গোটাকয়েক সিগারেট আর একটা দিয়াশলাই। উন্মত্ত নেকড়ের মত হুমড়ী খেয়ে পড়ল দামোদর।

রুটীর সঙ্গে একথাবলা তরকারী মুখে পুরে দামোদর পরমানন্দে চিবোতে লাগল, তৃপ্তিতে অবোধ্য একটা শব্দ করে বলল, ভগবান আছেন রে বৌ, ভগবান আছেন।

ভগবান? পদ্মা ঠোঁট উলটে হাসল, তৃতীয়ার চাঁদের মত ম্লান ক্ষয়িষ্ণু হাসি।

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও পদ্মার মৃদু হাসি দামোদরের কানে এসে ঠিক বাজল। আঙুলের ডালটা চেটে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, হাসলি যে বড়?

এমনি। পদ্মা আবার হাসল, হাসছি তোমার কথা শুনে।

হাসবার কি আছে এতে? দামোদর একটু গম্ভীর হ'য়ে বলে।

এর জবাব না দিয়ে পদ্মা বলল, ক্ষীরের মত মিষ্টি দুধ খাও না, আর একখানা রুটী!

দামোদর গলে গেল। দুধ দিয়ে রুটি খেতে খেতে কতক্ষণ পরে দামোদর বলল, যাই বলিস, দয়ামায়া আছে লোকটার। থাকবে নাই বা কেন, মানুষমারা ওদের কাজ হ'লেও ওরাও ত মানুষ! ঘরে মা-বোন ছেড়ে এসেছে, তাদের কথাও ত মনে পড়ে।

পড়ে বৈ কি; শুধু মা-বোন কেন, বউয়ের কথাও। শ্লেষে খনখনে হয়ে উঠল পদ্মার গলা।

হা-হা করে হেসে উঠল দামোদর—এমন চটুল রসিকতাও জানে পদ্মা!

পদ্মা দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হাসি থামিয়ে খেয়ে নাও।

অকস্মাৎ পদ্মার এই গাম্ভীর্যে দামোদর একটু থতমত হ'য়ে গেল। রুটির দলাটা চিবোতে চিবোতে বিস্মিত হ'য়ে সে ভাবতে লাগল মুহূর্তের মধ্যেই পদ্মার গলাটা অমন ধরে গেল কি করে?

এর পরের কয়েক দিনের কাহিনী খুবই সরল ও প্রাঞ্জল। সামরিক ছাউনীর পর ছাউনী অতিক্রম করে ওরা এগিয়ে চলেছে—খাবার অভাব হ'ল না এক-দিনের জন্যও। পথের সন্ধান পেয়েছে পদ্মা, খাবার সে-ই এনেছে জুটিয়ে। পথ চলেও দামোদরের পাঁজরা ক'খানা প্রায় ঢেকে এল এই কয়দিনেই। পদ্মার উপর খুশীতে সে গদগদ।

পদ্মাও স্বীকার করে নিয়েছে এই ভবিতব্যতাকে। দেহ দিয়ে দেহরক্ষা, এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি সে আর খুঁজে পায় না।

কেটে যেতে লাগল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

মহানগরীর বুকে সমবেত অগণিত হতভাগ্যের সঙ্গে ওরাও মিশে গেছে। গাড়ীবারান্দার তলায়, বিমান আক্রমণ-কালীন আশ্রয়স্থলের মধ্যে, কখনও বা উন্মুক্ত পার্কে দিন কাটতে লাগল ওদের।

ওরা জানে, কবে কখন কোথায় খিচুড়ী বিতরণ করা হবে; চোরাবাজারের মুনাফাখোরের বাড়ীর ভোজের হদিশ ওদের নখদর্পণে। কিছুই যদি না জোটে অকূলের কূল পদ্মা ত আছেই। উদর-সর্বস্ব পশু দামোদর, আহার জুটলেই হ'ল। কোথা থেকে যে আনে পদ্মা, জানবার প্রয়োজন নেই দামোদরের। পদ্মাও এজন্য দামোদরের কাছে কৃতজ্ঞ।

সেদিন কোথা থেকে দামোদর আধখানা পাঁউরুটি আর খানিকটা মাংস জোগাড় করে নিয়ে এল। আনন্দের তা'র সীমা নেই।

পদ্মার খেতে মোটে ইচ্ছা নেই, কিন্তু দামোদর ছাড়বে না। পদ্মা তা'র জীবনদাত্রী, পদ্মাকে বাদ দিয়ে ভোজের সকল আনন্দ ম্রিয়মাণ। পদ্মা অনুরোধ এড়াতে পারল না, কিন্তু প্রথম গ্রাস মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খাবার বেরিয়ে এল খানিকটা বমির সঙ্গে। হাউ হাউ করে পদ্মা কেঁদে ফেলল।

দামোদর বিমূঢ়, হতবাক্। কি হয়েছে পদ্মার? কাঁদছে কেন?

জবাব না দিয়ে পদ্মা আরও কাঁদে। পদ্মার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে দামোদর অজ্ঞাত বেদনার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

দামোদরের আদরে ও অভিমানে ত্রস্ত হ'য়ে পদ্মাকে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে হ'ল।

শুনে লাফিয়ে উঠল দামোদর। ছেলে হবে? সত্যি? সত্যি পদ্মার ছেলে হবে? কাঁদছে কেন তবে পদ্মা? এতে ভাবনার কি আছে? জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। মানুষের ত কোন হাত নেই এতে? কিন্তু না, আর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকলে চলবে না দামোদরের। সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য ত পরে আছে, এখন সর্ব্বপ্রথমে সেই অনাগতের গর্ভধারিণীর পুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। দুধ খাওয়াতে হবে পদ্মাকে, আরো নানা জোরালো খাবার।

বিস্ফারিত নেত্রে পদ্মা এই প্রলাপোক্তি নীরবে শুনে গেল, দামোদরকে আঘাত করতে তা'র মায়া হ'ল। হাজার হো'ক স্বামী।

রাত্রির পর এল দিন, দিনের পর রাত্রি।

প্রত্যহ দামোদর ফিরে আসে রিক্ত হস্তে—মেলেনি দুধ, মেলেনি ফল। পদ্মার চোখের কোনে কালি গভীরতর হ'তে থাকে।

হন্যে হ'য়ে ছুটে বেড়ায় দামোদর,—পদ্মার মানা শোনে না, শুনচে না।

আর এক সন্ধ্যার কাহিনী।

সকালে বেরিয়ে দামোদর তখনও ফেরেনি। দূর উপকণ্ঠে ভারী একটা সামরিক ঘাঁটি আছে। [illegible]ান থেকে ভিক্ষে করে সে আনবে টিনের দুধ। [illegible] হোক, সিপাহীদের দয়া আছে। ওদেরই একজন ত একদিন দামোদর আর পদ্মাকে বাঁচিয়ে ছিল।

নিষ্প্রদীপ নগরীর বুকে গাঢ় অন্ধকার। নৈশ-অভিযানে বহির্গত বিলাসীর একচক্ষু মোটরে রাজপথ সমাকীর্ণ। পদ্মা একা, সরল নির্ব্বোধ রক্ষিত দামোদর অনুপস্থিত।

অনন্তোপায়ের মিথ্যাচারে একদিন সে দামোদরকে বাঁচিয়েছিল বলে আক্ষেপের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছে পদ্মা। প্রতারিত হ'য়েও পদ্মার উপর অগাধ বিশ্বাসে আজ স্বপ্ন দেখছে দামোদর। দামোদর জানবে না, তা'র শীর্ণ বাহুর বেষ্টনে আদরে নিষ্পিষ্ট ঐ শিশুর মনে দামোদরের তীব্র শীতল রক্তের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ নেই; ভাবতেও পারবে না দামোদর যে, পত্র-প্রতিবিম্বিত জলের দিকে তাকিয়ে ত কিয়ে দূর সীমান্তের ধূলিরুক্ষ বন্ধুর পার্ব্বত্যপথের স্বপ্ন দেখবে ঐ শিশুর পিঙ্গল চোখ। পদ্মার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত টনটনিয়ে উঠল দামোদরের জন্য।

এরকম আজকাল প্রায়ই হ'য়ে থাকে। মোড়ের পুলিশটা পর্য্যন্ত তদন্ত করতে আসেনা। শুধু মত্ত মালিক নেমে এসে আরক্ত চোখে দেখলেন চাকা ছুটো একটা ভিখারিণীর পেটের উপর দিয়ে চলে গেছে। চাপ খানিকটা রক্ত পড়েছে মসৃণ পীচের উপর, আর ছেঁচে পড়ে রয়েছে একটা মাংসপিণ্ড। বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে তিনি বললেন, All these bloody destitutes!

ঠিক একই সময়ে সহরতলীর একটা থানায় একজন সামরিক অফিসার এজাহার দিচ্ছিলেন—হ্যাঁ, বলে ত শুধু একটা দুধের টিন নিতে এসেছিল, তা' ধরা পড়লে অমন কথা সবাই বলে থাকে!...Should be flogged severely—these bloody destitutes.

নূতন অধ্যায়

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

জাতির জীবননাট্যে এক নূতন অঙ্ক—নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে। এই নূতন অধ্যায়ে 'ক্লাইম্যাক্স'—ঘাত-প্রতিঘাতের মহা সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং হয়ত তাহাতে উত্থান, অথবা তাহাতেই পতন; জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই নবীন অধ্যায়ের যবনিকা উত্থিত হইতেছে। মানুষের জীবন পদ্মপত্রে নীরের সহিত তুলিত হইয়া থাকে; কিন্তু জাতির জীবন এরূপ ক্ষণস্থায়ী অথবা ক্ষণভঙ্গুর নহে।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের আভিধানিক অর্থ ও ব্যাবহারিক রূপ যাহাই কেন হোক না, ভারতবর্ষ যে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিল সাহেব হাহাকার করুন অথবা মর্ম্মান্তিক রোষে ক্ষোভে ও ঈর্ষ্যার বিস্ফোদগার করুন, ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিবার সাহস, শক্তি, সুযোগ, স্পর্দ্ধা অথবা অধিকার মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও আর পাইবেন না। চন্দ্রোদয়ে চীৎকার চিরদিন ধ্বনিত হয়, কিন্তু চন্দ্রমার নিদ্রাভঙ্গের সংবাদ অজ্ঞাত। আজ যদি ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র না হইত, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রী সম্মিলন আহ্বান করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া ভাই কোঁটায় বাটা ও কোঁটা দিবার সুষ্ঠু আয়োজন করিতে হইত না। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ইহাকে ভ্রাতৃত্বের আদান-প্রদানের আসর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরাও তাহাই মনে করি। বৃটিশের প্রধান মন্ত্রী এ্যাট্‌লী সাহেব বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ কথামালা হইতে "বৃটিশ" শব্দটি নিঃশব্দে অপসারিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাও অতীব সুসঙ্গত। আমরা আমাদের "মহাভারত" নামক মহাকাব্যখানিকে ভারতবর্ষের তৎকালীন ইতিহাসরূপে বন্দনা করি। সেই মহাভারতে, অবস্থাবিশেষে কুরুপাণ্ডব একশত পঞ্চভ্রাতার মিলন, এবং শত সৌভ্রাতৃ অভিযানের কাহিনী পাঠ করিয়াছি। একদিকে একশত কৌরব,অন্যদিকে পঞ্চপাণ্ডব; কুরুক্ষেত্র রণ অবধারিত ও অনিবার্য্য অদৃষ্ট-লিখন জানিয়াও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে একশত পাঁচের মিলনে বাধা হয় নাই। ইংলণ্ড ও ভারতের অতীতের কাহিনী যত বিরস ও তিক্ত হোক না কেন এবং ভবিষ্যতের অন্ধতমসাবৃত গর্ভে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন, ভ্রাতৃভাবে রাখীবন্ধনের আজ প্রয়োজন হইয়াছে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে মিলন না হইবে কেন? তবে এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইবে, প্রয়োজন কাহার অধিক? ইংলণ্ডের, না, ভারতবর্ষের? প্রশ্ন কঠিন নহে, উত্তরও সহজ।

বোধ করি 'সহজ' শব্দটি ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে। কারণ কথাটা বলা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নহে। বৃটিশের বিরুদ্ধে মনোভাব এতই উগ্র হইয়া আছে যে, রাখীর-সূতা ছিঁড়িয়া ফেলিতেই ইচ্ছা হইবে। উপরতলা এই উগ্রতা দূরীকরণে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, এখনও করিতেছেন না, তাহা সত্ত্বেও যে নীচের তলার বিরুদ্ধতা কঠোর রহিয়াছে, তাহা কি উপরতলার মহদাশয় ব্যক্তিবর্গ ভালই জানেন না? শেষ পর্য্যন্ত নীচের তলার নগণ্য লোকগুলাকে বাদ দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে হয়ত দ্বিধা হইবে না; কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করিতেই হইবে। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম যদি না হইত, তাহা হইলে কি "বন্দে মাতরমে"র অঙ্গচ্ছেদ ঘটিতে পারিত? আজ যে "বন্দে মাতরম" বরবাদ করিয়া, কংগ্রেসী ভারত গভর্ণমেণ্ট শব্দের ফুলঝুরি "জনগণমন অধিনায়কে"র জয়ঢাক ঘাড়ে ঘুরিয়া বেড়… তেছেন, সে-ও ত' "প্রভুর ইচ্ছা"। গালভর… গণপরিষদে মঙ্গলময় ও দয়াময়দিগের বাঞ্ছ… সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের মনোনী… "অধিনায়ক"কে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও … দিগের "ইচ্ছা পূর্ণ" হইতে বাধা জানিয়াও…

অপেক্ষা করিতে পারেন নাই, 'ভোগের পূর্ব্বেই প্রসাদ', বিচারের আগেই বন্দে মাতরমের ফাঁসীর হুকুম প্রদত্ত হইয়াছে। কাল ও অবস্থাবিশেষে ন্যায়বিচার, লোক-লজ্জা, চক্ষুলজ্জা সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাই বা অস্বীকার করিবে কে? "রাজার মঙ্গল হোক" এবং "জনগণমন অধিনায়কে" বিন্দুমাত্র তারতম্য নাই জানিয়াও স্বাধীন ভারতবর্ষে দামামা পিটিতে হইতেছে না কি? প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে বিলাতে অবস্থিতি করিবার সময়েই ভারতবর্ষকে কমনওয়েল্থ-ভ্রাতৃসঙ্ঘে সংযুক্ত করিয়া দিয়া আসেন নাই, ইহাতেই অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন। পণ্ডিতজীর প্রাণের টান যে কোন্ দিকে, দেশের লোক যত মূর্খই হোক, তাহা জানে। শুধু পণ্ডিতজীই বা 'চোর দায়ে' ধরা পড়িবেন কেন? আমাদের নেতৃবর্গ কি সকলেই কম বেশী 'ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন গ্রেট বৃটেন' নহেন? তাঁহারা যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও কি 'মেড্ ইন ইংলণ্ড' নহে? যে 'পেট্রিয়টিজমের' এত প্রতাপ দেখি, তাহাও কি বিলাত হইতে আমদানী করা হয় নাই? আর তাহা না হইবেই বা কেন? এ্যাটন্ হ্যারো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ কি বৃথা গিয়াছে? গ্ল্যাডষ্টোন ডিস্‌রেলীর কোনও প্রভাবই কি পড়ে নাই? সেক্সপীয়র, মিল, মিল্টন কি নিরর্থক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন? সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ দেশী ভাষায় কথোপ-কথন করিলে, স্বদেশী গ্রন্থ পাঠ করিলে, দেশীয় সাহিত্যের প্রশংসা করিলে আমরা হাতে স্বর্গ পাই, কর্ণে সুধা বর্ষিত হয়, বিস্ময়ানন্দে হাসিব কি কাঁদিব অথবা এক [illegible]রতা নৃত্য করিয়া ফেলিব, তাহা ভাবিতেও সময় [illegible]। লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটনকে লইয়া যে মাতা-[illegible]ইয়াছে, এখনও হইতেছে, তাহাতে পৌনে দুই শত [illegible]রের বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবনোচ্ছ্বাসের কথা [illegible] নাই, হয় মন নামক পদার্থ হইতে [illegible] বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, না হয় [illegible]নীজঠর ত্যাগ করিয়া ধরার আলোক [illegible] নেতৃসমাজ যে কমনওয়েথের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহিবেন ও থাকিবেন, তাহাতে সংশয়ের বিন্দু মাত্র কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মুশ্‌কিল হইয়াছে দেশের লোকগুলাকে লইয়া। দেশের লোক যে বৃটিশের ছায়া দর্শনেও ধৃতাস্ত্র—অন্ততঃ সম্মার্জ্জনী হস্তে সংস্থিত, তদা ন সংশয় সন্ত্রয়ঃ। তবে তাহার জন্য দেশের লোককে (সংস্কৃত ভাষায় যাহারা ক্রাউড অর্থাৎ জনতা বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে) কতখানি অপরাধী করা যায়, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। ন্যূনাধিক পঁচিশ ত্রিশ বৎসর, শতাব্দীর এক পাদেরও অধিককাল, নেতৃবৃন্দের মুখে তাহারা শুনিয়া আসিয়াছে, বৃটিশের শয়তানী শাসন কাঠামোর জন্যই দেশের এই দশ দশা, লোকেরও এই হাঁড়ির হাল। শয়তানের স্বহস্তনির্ম্মিত শাসনযন্ত্রটির উৎসাদন করিতে না পারিলে দেশকে দেশ ও মানুষকে মনুষ্য পদবাচ্য করা যাইবে না। হতভাগ্যরা, শ্রীমুখে মূল্যবান বাক্যাবলী যত শুনিয়াছে মনে মনে কাস্তে কুড়ুল দা সাবল কোদাল ঘাড়ে শয়তানী শাল শাল্মলী তরু ছেদনে মহাজনগণের জয়ধ্বনি দিতে দিতে দিকে দিকে ততই ধাবমান হইয়াছে। ত্যাগমূর্ত্তি নেতৃবৃন্দের প্রতি তাহাদের অগাধ বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, তাই প্রশ্ন করে নাই, তর্ক করে নাই, অগ্র পশ্চাৎ চিন্তাও করে নাই। শুনিয়াছে শাসন সংস্কার নহে, সমূলে সংহার—not to mend, but to end, উদ্দেশ্যই অতএব, তাহারা অবিচলিত দৃঢ় পদক্ষেপে পশ্চাদানুসরণ করিয়াছে। সংসার ছন্নছাড়া হইয়াছে কিন্তু ফিরিয়া চাহে নাই; দেহ জীর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া আসিতে মুখ দেখাও ছাড়িয়া দিয়াছে; সর্ব্বস্ব হরাইয়াছে তবু চোখে জল আসিতে দেয় নাই; মরিয়াছে, মরিবার সময়ে পুত্র-কন্যার হাতে ছেঁড়া নেকড়ার পতাকাখানি উইল—চরম পত্র করিয়া দিয়া গিয়াছে, ছেলে মেয়েও বাপের অমর্য্যাদা করে নাই, সেই পতাকা স্কন্ধে জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে; পাশের বাড়ী হইতে ছেলে মেয়ে ডাকিয়া লইয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছে, কল কারখানা হইতে শ্রমিক মজদুরদের টানিয়া লইয়াছে, ধানের ক্ষেত্র হইতে কৃষককে হাত ধরিয়া দলে ভিড়াইয়াছে। তারপর হঠাৎ একদিন

শুনিল, বৃটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিল। সে কি হর্ষোল্লাসের প্রবল বন্যা! বৃটিশের উপর রাগ তাহাদের কোনদিনই ছিল না; নেতৃবৃন্দও বারম্বার বলিয়াছিলেন, টিয়া পাখী পড়ানোর মত করিয়া শিখাইয়াছিলেন, কলহ বৃটিশ জাতির সহিত নহে, উচ্ছেদ করিতে হইবে শাসন যন্ত্র। নেতৃভক্ত জাতি, বৃটিশ বিদায়ে, হর্ষোল্লাসে ত্রিভুবন প্রকম্পিত করে নাই; করিয়াছিল শয়তানী শাসন যন্ত্রের অবসানে। কিন্তু কি মন্দভাগ্য, অদৃষ্টের কি মর্ম্মান্তিক পরিহাস, দেখুন। বৃটিশ গেল, সত্য সত্যই গেল; কিন্তু পোড়া বরাতের দোষে, শয়তানের স্বকপোলকল্পিত ও স্বহস্তনির্ম্মিত শয়তানী শাসন-যন্ত্রটির কোনখানে একটু টোল্ খাইল না, যাহাকে চিড় খাওয়া বলে, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সূক্ষ্ম সূতার মত একটু চিড় খাইতেও দেখা গেল না। "Not mend, but end" করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহাশয় ব্যক্তিগণকে শয়তান পরিত্যক্ত শাসন কাঠামোখানিকে সযত্নে, সগর্ব্বে, অতিশয় স্নেহে মাথায় করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহারা আর একবার কাঁদিবে কি হাসিবে কিম্বা গলায় দড়ী বাঁধিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে তাহাও ভাবিয়া পাইল না। তাহারা ভাবিয়া না পাক্, অথবা অল্প বুদ্ধি, তাই ভাবিয়া পাইতে তাহাদের যথেষ্ট কাল বিলম্ব হইতে থাকুক, শাসন যন্ত্র নিষ্কর্ম্ম, নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম বসিয়া নাই, বিধিমত নিত্যকর্ম্ম সাধিয়া যাইতেছে। তেঁতুল বীচি হামানদিস্তায় গুঁড়াইয়া হইট্ প্রোডাক্ট—গমজাত আটা ময়দা করিয়া ছাড়িতেছে—পিষান্ করাই তাহার কর্ম্ম! করিতেছে এবং করিতেই থাকিবে। তাহার দোষ কি, লাইন পাতা, ইঞ্জিনে বাষ্পভরা, রেল ঠিকই ছুটিতেছে। লোকের দশগুণ দুঃখ শতগুণ, শতগুণ কষ্ট সহস্রগুণ হইতেছে। কপালে করাঘাত করে আর ভাবে—"কি মোর করমে লেখি!" আর সব চেয়ে বড় দুঃখ যে তাহারাই যাচিয়া, সাধিয়া, সাদর আমন্ত্রণ দিয়া এই বিড়ম্বনা ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহারাই স্কুল-কলেজ কামাই করিয়াছে, তাহারাই হরতাল করিয়া ধর্ম্মের ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া বেড়াইয়াছে, ইংরাজকে দুয়ো দিয়াছে, "জয় বাবা কংগ্রেসের জয়" রবে সারা দেশটাকে তারকেশ্বরের মন্দির-চত্বর করিয়াছে। নির্ব্বোধ তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছিল এবং সে বুঝিয়াছিল—বেদ-বাক্যসম বুঝিয়াছিল, বৃটিশের কাঠামোখানা বঙ্গোপসাগরে অথবা আরব্যসাগরে নিরঞ্জন হইলে সে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে, কটিতে কাপড় জড়াইতে, চাই কি একখানা গাত্রবস্ত্রও চাপাইতে পারিবে। বড় মনের আনন্দেই ভাঙ্গা কাঁসিখানাতে লকড়ি ঠুকিয়া কাঁই নানা কাঁই নানা করিতে করিতে ঘাট পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছিল। নব বিধানে কাঠামো ঘরে রাখিয়া পুরোহিতকে নৌকায় বাচ্ করাইতে হয়, মূর্খ বেচারা সে, তাহা জানিবে কিরূপে? বস্তুতঃপক্ষে বৃটিশ যে বিদায় হইয়াছে, ইহাই সে ভাবিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতেছে, সাহেবরা মেম-সাহেব সঙ্গে লইয়া প্রিভিলেজ লীভে হোমে গিয়াছে, দেশী সাহেবদের হাতে ভার দিয়া গিয়াছে, অবকাশান্তে, ফিরিয়া আসিয়া আবার চার্জ্জ বুঝিয়া লইবে। অনেক গৃহস্থ তীর্থযাত্রাকালে আত্মীয়-স্বজনকে আনিয়া বাড়ীর ভার দিয়া যান্, ইহা আমরা দেখিয়াছি। সজ্জন আত্মীয় স্বজন কিরূপ প্রাণপণ যত্ন সহকারে গৃহ রক্ষা করেন, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি। আসবাব অথবা তৈজসপত্র ত অনেক বড় কথা, দেওয়ালে একটি আঁচড় না লাগে সদাই সতর্ক, সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। অনুকম্পের একমাত্র চিন্তা, যেমনটি রাখিয়া গিয়াছে, ঠিক তেমনটি ফিরাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে।

"খুন চাপিয়া যায়" বলিয়া একটা কথা চলিত আছে। ইংরাজ পরিত্যক্ত ও কংগ্রেস পূজিত কাঠামোখানার পানে চাহিতে, এমন কি তাহার চিন্তা করিতেও দেহাভ্যন্তরস্থ হাড়ে হাড়ে চকমকি ঠোকাঠুকি হইয়া অগ্ন্যুদগম হয়; হয় ত বা সমস্ত দেহের রক্ত মাথায় চড়িয়া বসে, খুন চাপিয়া যায়। তবে নাকি অনেকদিন ধরিয়া তাহারা অহিংসা প্র্যাকটিস্ করিয়াছে, হতোদ্যমে, দন্তে দন্ত ধারণ করিয়া, ছেঁড়া বিছানায় পড়িয়া, কড়ি কাঠ গণনায় মনোনিবে[illegible] করিতেও পারিতেছে। বৃটিশের ছায়া স্পর্শে[illegible] বোধে গঙ্গাস্নানেই তাহার অভিরুচি। [illegible] গভর্ণমেণ্ট দেখিয়াও তাহার ঘৃণা হইয়া গিয়াছে[illegible] শব্দ-বিবর্জ্জিত কমন্‌ওয়েলথেও যে সে প্রলুব্ধ হইবে এমন ত মনে হয় না। তাহার নিকট প্রস্তাব করিতে যাওয়াও

বোধ করি বিপজ্জনক। "বোধ করি" কথাগুলি না বলিলেই বোধ করি ভাল করিতাম। আ হরি। ঐ দেখুন, আবার একটা "বোধ করি"। বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তাহারা বলে, "আবার বৃটিশ"? এততেও "সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা।"

পণ্ডিতজীকে এই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। বড় অত্যাসন্ন, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেই লড়াই করিতে হইবে। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। দেশ বলিতে দেশ, বিদেশ বলিতে বিদেশ, সমস্ত পৃথিবী ত পণ্ডিত নেহেরুর পানেই চাহিয়া আছে; এবং তাঁহার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিবে। আর আমরা? ভারতবাসী হিসাবে আমরা আর কাহার ভরসাই বা করিতে পারি? এইখানে একটা কথা অত্যন্ত গায়ে-পড়া-কথার মত শুনাইবে বটে, হয়ত ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিকও মনে হইবে, তবুও কথাটা রাশছেঁড়া ঘোড়ার মত কলমের মুখ হইতে যথেষ্ট বাধা সত্ত্বেও ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে, ঠেকাইতে পারিলাম না। বাঙ্গালী আত্মভোলা জাতি; বাঙ্গালী কখনও বাঙ্গালী ভাবে ভাবিত না, আজও ভাবে না; কিন্তু আজ দশ জনে "ঐ ভূত। ঐ ভূত।" রবে তর্জ্জনী সঙ্কেত করিতে করিতে ভগবানকেও ভূত নামে অভিহিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালী না থাকিয়া সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাদুষ্ট হইয়াই থাকে, তাহা হইলে এই কথাটা এই ভাবেই বলিতে হয় যে, বাঙ্গালী হিসাবে প্রত্যাশাপন্ন হওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে। আঁস বটী পাতিয়া পাঁশ পাড়িয়া বাঙ্গালীকে কৈ মাছ কুটিতে আজ অনেকের বড়ই আনন্দ দেখা যাইতেছে। দিল্লীর সতেরো নম্বর ইয়র্ক প্লেসের কাশ্মীরী সূপকার হইতে মদ্রদেশীয় ধাত্রীর পালিত খ-শাবকটাও পৃথিবীর চারিভিতে রাষ্ট্রদূতের ধন, প্রাণ, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে আহূত হইয়া থাকে, পোড়া বাঙ্গালী কি ছাই আস্তাকুঁড়েও একটু স্থান পাইতে পারে না? এককালে বাঙ্গালী সর্দ্দারজীর বড় ভরসা করিত; কিন্তু কালহি বলবত্তর। শক্ত লোক, কঠিন ও বাস্তব মনের অধিকারী লৌহ-মনুষ্য বলিয়া তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু কালের কিরূপ কুটীল গতি দেখুন। নাগপুরের বক্তৃতায় প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার অপবাদে বাঙ্গালীকে সর্দ্দার সাহেব লোহার মোটা ডাণ্ডাপেটা করিয়াছেন। বাঙ্গালী একদিনের তরেও বেঙ্গল ফর বেঙ্গলিজ ধ্বনি করে নাই, গৃহস্থের ঘরের ভিতরে, রান্না ঘরে অথবা শয়নকক্ষে নিশীথ রাত্রে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে কি না আমরা জানি না, তবে প্রকাশ্যে, রাজপথে বা সভাসমিতিতে বারেকের জন্যও "খেদাও" শব্দ বাঙ্গালীর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া কেহ শুনিতে পায় নাই। বিহারের সুকার্য্যকলাপের আলোচনা অবশ্যই হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং পরেও হইবে,—ভাল ভাল খাদ্য ও সুস্বাদু চিঠি-পত্র, আদেশ-নির্দ্দেশের প্রতিলিপিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, নিন্দাও করা হইয়াছে, ঠিক; কিন্তু একটা বনে-সর্ব্বস্ব ভেতো বাঙ্গালীও "টিট্ ফর ট্যাট্" ঢিলের উত্তরে পাটকেল প্রক্ষেপের প্রস্তাব করে নাই। আসামে বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারীদের যখন পিটিয়া তক্তা করা হইয়াছিল, তখন পশ্চিম বঙ্গে প্রতিবাদ তীব্র স্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সত্য, কিন্তু উত্তোর শাহিবার জন্য একজন বাঙ্গালীও লাঠিসোটা হস্তে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সংবাদ আসামের গোয়েন্দা টিকটিকি গিরিগিটিরাও উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। পাঞ্জাবীটা "পাইয়া"দের ট্যাক্সির লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, সর্দ্দারজী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করিতেছেন। হা রে অদৃষ্ট! সর্দ্দারজী কাহার মুখে ঝাল খাইলেন, কোন শয়তানী বুদ্ধিজীবী সর্দ্দার সাহেবের চিরকালের সত্যবাদী নামে এমন দধি কড়মা করিয়া দিল, আমরা কেবল সেই কথাই ভাবিতেছি। কিন্তু তর্ক না করিয়া আমরা সবিনয়ে কেবল এই নিবেদন জ্ঞাপন করিব, একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্য কলিকাতায় আসিয়া দাড়ি ও পাগড়ির সমারোহ দেখিয়া যাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। অন্ততঃ গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ও মন্ত্রশিষ্য হিসাবে Experiment in Truth—সত্যের পরীক্ষা গ্রহণ করা বিধেয়। বোঝার উপরে শাকের আঁটির মত দুইচারিখানা ট্যাক্সি বাঙ্গালী পাইয়াছে হয়ত, কিন্তু দাড়ি-পাগড়ির দুর্ভেদ্য অরণ্যে তাহাদের

খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। সর্দারজীর শ্যেনদৃষ্টিও তাহাদিগকে যথেষ্ট আয়াসেও খুঁজিয়া পাইবে কিনা সন্দেহ।

ঐ কথাগুলা না বলিলে ভাল করিতাম; কিন্তু প্রবল জ্বর, বিকারের ঘোরে অন্তরের কথাগুলা অজ্ঞাতসারেও মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। বৃটিশের হাতে অত্যাচার বাঙ্গালী যত সহিয়াছে, তত আর কাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে? বাঙ্গালীর মত নিগ্রহ আর কাহার হইয়াছে? জীবনে মরণের স্বাদ বৃটিশ বাঙ্গালীকে যেমন আস্বাদ করাইয়াছে, এমন তো আর কাহাকেও করে নাই। নিজেরা যখন হাত গুটাইয়াছে, তখন লেঃ লেঃ রবে মুস্লিম লীগকে লেলাইয়া দিয়াছে, নরক দর্শনের, নরক যন্ত্রণার যে-টুকু বাকী ছিল, লীগ সে-টুকু সুদে আসলে ভাল করিয়া উসুল করিয়া দিয়াছে। ক্রোধান্ধ অভিভাবক যেমন দুরন্ত বালককে এক-এক বা কষাঘাত করে ও জিজ্ঞাসা করে—'কেমন, আর করবি?'—বৃটিশ ও লীগও তদ্রূপ, দুই পায়ে বাঙ্গালীকে থেঁৎলাইয়াছে আর রঙ্গভরে প্রশ্ন করিয়াছে—কেমন, স্বাধীনতা বেশ ভাল লাগিতেছে ত'? বাঙ্গালীর মার্কণ্ডের পরমায়ু ছিল; তাই মরে নাই, বাঙ্গালীর কৈ মাছের কড়া জান্, বৃটিশের কাছেও মাথা নত করে নাই; লীগকেও কড়ায় গণ্ডায় গণিয়া গণিয়া দেনা শোধ করিয়াছিল এবং ক্ষণেকের তরেও ক্ষোভ বা দুঃখ করে নাই; কিন্তু আজ বিকারে বেঘোরে পোড়া বরাতের উদ্দেশে কয়েকটি খেদোক্তি বাহির হইয়া পড়িল। উপায় কি! হা-রে বাঙ্গালী, তোর বরাতে এত বৌ-কাঁটকী শাশুড়ীও লেখা ছিল? রামপ্রসাদের গানের মত;দোষ বোধ হয় অন্য কাহারও নহে, আমাদেরই দোষ—বরাতের ফের। নইলে, বাঙ্গলা মায়ের দুলাল সুভাষই বা জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে কেন?

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম, পণ্ডিতজীকে বিষম ঝড়ঝাপ্টা সহিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, নিউজিল্যাণ্ডের মত আমরা খৃশ্চান নহি, ইংলণ্ড আমাদের পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, এমন কি শ্বশ্রূভূমিও নহে, গ্রেট বৃটেনে উদ্ভূত হইয়া আমরা এসিয়া খণ্ডের এক পার্শ্বে বসতি স্থাপন করি নাই, আমাদের আচার ব্যবহার, ভাষা ভূষা এক নহে, এমন কি গাত্রচর্ম্ম তাহাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমরা ইংলণ্ডের গোষ্ঠীভুক্ত হইতে চাহিব কেন? এই প্রশ্ন অবান্তর নহে। আবার আকাশে যখন যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা যাইতেছে, তখন এই প্রশ্ন অতিক্রম করাও সুবুদ্ধির কার্য্য বলিয়া অনেকেই মনে করিবে না। কোনও একটি গোষ্ঠিভুক্ত হইবার ফলে, অন্যের শত্রুর তালিকায় নাম উঠিবার সম্ভাবনা যদি থাকে, ভারতবর্ষ কেনই বা তাহাতে রাজি হইবে? ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্টে নেতৃত্ব গ্রহণের পর হইতে বহুবারই ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতি ব্যাখ্যানে এই কথাই বলা হইয়াছে, ভারত মিত্র সকলের, বৈরী কা'রও নহে। আজ অকস্মাৎ "কি হেতু একের মিত্র, বৈরী অপরের" হইতে পারা যায়?

মানুষের মন অন্ধকার দিকটাই সর্বাগ্রে দেখে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে, তাহাও নহে। রাশিয়ার সহিত বিরোধ ভারতবর্ষের কোন কালেই নাই, কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষ যতই প্রবল হৌক, রাশিয়ার উদ্দেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুবাহিত আকর্ষণ প্রবাহিত হইয়া থাকে, ইহা বাস্তব সত্য; তর্কের বিষয় নহে। মুখপোড়া হনুর উপদ্রবে লাঠিসোটা লইয়া হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া তাড়া লোকে করে বটে, তাই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র কাহারও বিদ্বেষ ভাজন বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে করিতে পারা যায় কি? তাই কমনওয়েলথ গোষ্ঠিভুক্তির কথায় রাশিয়ার গভীর মুখ স্বতঃই সর্ব্বাগ্রে উদয় হয়। এই ধরণের একটা সমস্যা বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দ্বারকায় একদিন উত্থিত হইয়াছিল। এক পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা, অপর পক্ষে নিরস্ত্র ও রণবিমুখ নারায়ণ। সে দুরূহ সমস্যার এই ভাবে সমাধান হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

সহস্র সমস্যা-সমাকীর্ণ ভারতকে একক ও নিঃসঙ্গী রাখিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। ভারতবর্ষ যে আয়ারের মত নির্ব্বিকার থাকিতে পারিবে তাহারই বা আশা কোথায়? ভারতবর্ষের পার্শ্ববার প্রতিবাসীর, বিদর্ভপতি নলের প্রতি কলির অনুরূপ প্রেমদৃষ্টি সতত্তই যে তাহার পদে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাই বা অস্বীকার

করিব কিরূপে? আমাদের খাদ্যসঙ্কট মোচন করিতে হইলেও পরমুখাপেক্ষিতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এসিয়ার নব জাগরণের দুন্দুভিনিনাদ করিয়া প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে পারি কিন্তু তদ্দ্বারা সঙ্কট ত্রাণের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া বিপদভঞ্জন মধুসূদনের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে। ভারতের শিল্প বৃদ্ধি সম্প্রসারণে ইংলণ্ড (ও আমেরিকা) যতখানি সাহায্য করিতে পারে, এমন আর কেহই নহে। গোষ্ঠীর বাহিরে উদারতা প্রদর্শনে ইংলণ্ডের কতখানি অভিরুচি হইবে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আজ দিবালোকের মত সত্য ও ভাস্বর। আমি লোকটি আমার স্বর্ণমুখ লেখনীর সাহায্যে এই সাদা কাগজে কাল কালিতে হাঁড়ী কলসী হিজিবিজি কাটিতেছি ইহাও যেমন বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও কঠিন সত্য, সদেকসদয়, পরম ধৈর্য্যশীল পাঠক ও সুধীরা পাঠিকা এই মাসিক পত্র হস্তে ধারণ করিয়া মস্তিষ্কে 'কাকের ছা' 'বকের ছা' পাঠ করিয়াছেন, ইহাও যেমন অনস্বীকার্য্য সত্য ও ধ্রুব প্রত্যক্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও তদ্রূপ, Cast iron truth। এবং God's truth ইহার মধ্যে যদি নাই, বাষ্প নাই, ধোঁয়া নাই। শত ইংরাজ-সন্তান চেষ্টা করিলেও ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ মুছিতে পারিবে না। গদা ঘাড়ে চার্চ্চিল সাহেব ইয়োরোপ লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিলেও হারানিধি ফিরিয়া পাইবেন না। পেটা কনজারভেটিভ পার্টি এডেনের সামনে দণ্ডায়মান হইয়া, আলিবাবা নাটকের কাশেম সাহেবের মত আলু ফাঁক, কলা ফাঁক, মুর্গীর ডিম ফাঁক, ফাউল কারী ফাঁক, মটন রোষ্ট ফাঁক করিলেও হা হতোস্মি, চিচিন ফাঁক হইবার কোন আশাই নাই। বর্ত্তমান কুর্দ্দনই সার। সুতরাং স্ট্যাটস স্যাট। অতঃপর কমনওয়েলথে থাকিলে যদি ফাউ বা উপরি পাওনা হিসাবে ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ প্রাপ্য হয়, তাহাতে অরুচি হইবে কেন? সমানে সমানে সম্ভাব সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলিতে আপত্তি কিসের? তবে কথাটা আগেও বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলিতে হইতেছে, দেশের শতকরা একজন লোকও কি স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদ করিতে পারিয়াছে? স্বাধীনতা কি 'বস্তু', তাহাই কি তাহারা জানিতে পারিয়াছে? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মহামহোৎসবের অত্যুজ্জ্বল চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্টে অনুষ্ঠিত 'বাৎসরিকে'র মলিন ছবি কি তাঁহাদের দৃষ্টিপীড়া ঘটায় নাই? দ্বিতীয় সাম্বৎসরিকে অবস্থা আরও কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

পণ্ডিতজী বিলাত হইতে ফিরিয়া চিন্তিত দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন, তিনি কোন কথা দিয়া আসেন নাই। কথা উঠিয়াছিল, উত্তর দাবী করাও হইয়াছিল কিন্তু তিনি ভারতবর্ষকে কমনওয়েলথের লেজুড়ে বাঁধিয়া দিয়া আসেন নাই। পণ্ডিতজী উচিত কার্য্য করিয়াছেন। তথাপি রোগী রক্ষা পাইবে কি না সন্দেহ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিনেও কি দেশ খণ্ডের ঘৃণ্য প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই? সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক গণ-পরিষদ; তাহা আমরাও জানি। "জনগণমন অধিনায়ক" কি গণ পরিষদের প্রসাদ লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল? জোড়াতালি দিতে আমাদের নেতৃবর্গ যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, মাত্র দুই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। মুস্লিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকসান প্রস্তাবের কোরবানীর ছুরি উদ্যত থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত মধ্যবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন; মাত্র মুখের কথায় ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুরোধ করিবার ফুরসতও তাঁহাদের হয় নাই। প্রস্তাবটি এখনও বলবৎ রহিয়াছে, সে কথাটাও মনে রাখা ভাল। কমনওয়েলথের ভ্রাতৃসঙ্ঘের একটি ভাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগকে গো-বেড়েন করিতেছে, আর একটি শান্তশিষ্ট সাধু সহোদর কাশ্মীরে ভারতবর্ষের বক্ষে টোয়েন্টিফাইভ পাউডার দাগিতেছে, এবং পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে হিন্দু ঠেঙ্গাইয়া উজাড় করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে, পূর্ব্ব পশ্চিম একাকার ও একরূপ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও রহিয়াছে। নিঃসন্তানের যেমন হর্লিক্স, মেলিন্স্ খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হয় না, আমাদেরও তেমনই সমস্যার সমাধান

হাঁতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না; কথাতেই বলে, মরিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আর কাশ্মীর? সার্ব্বভৌম দাইকে ক্ষুরধার-অক্ষুণ্ণ থাকিবে, "আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?" সাংপ্রিণক্ত, পচ ধরিলে কাটিয়া বাদ দেওয়াই বিধি। হয় না হয় বিধান ডাক্তার সাহেবের কাছে যাচাই করিয়া লহ। ভরসা করি এ-সকল যেমন চলিতেছে, তেমনই নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকিবে। গণপরিষদে এই সব অস্বস্তিকর প্রশ্ন—আলোচিত হইবে কি না বলিতে পারি না; তবে দেশের দুর্জ্জন লোকের মুখে সরা চাপা দেওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। তাই ত বলিতেছিলাম, পণ্ডিতজীকে বড় বড়-ঝাপটার মধ্যে পড়িতেই হইবে। তা হৌক। আমরা তাঁহার হইয়া, তাঁহার পক্ষ হইতে, আত্মত্রাণের পন্থাও নির্ণয় করিতে পারি এই বলিয়া:

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল যেন না টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"

এই কথা বলিতে জওহরলালই পারেন; অন্যে পারিবে না; পারা সম্ভব নহে। যত যাই বলি, আর যত যাই করি, টিক্ টিক্ করি অথবা খিট খিট করি, প্রাণ থাকিতে একথা ত অস্বীকার করিতে পারিব না যে, জওহর সত্য সত্যই জওহর!

জংলা মাঠের ফসলে

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

তিলের চরের রামশরণের মেয়ের বিবাহ, তল্লাটে প্রায় শোরগোল পড়িয়া যায়।

পাঁচ গাঁয়ে রামশরণের নাম-ডাক, ভদ্রলোক হিসাবেও আবার ধনী হিসাবেও।

অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহ, কিন্তু তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে দু'তিনমাস আগে হইতেই।

ময়নাল ভাবে, চলিয়া যায় তিলেরচর রামশরণের কাছে, বিয়ে-বাড়ির কত কাজ, কিছু কাজ হয়ত জুটিয়া যাইতে পারে। একদিন সকালবেলা গামছা কাঁধে করিয়া ময়নাল উপস্থিত রামশরণের বাড়ি।

রামশরণ তখন কেবল গণেশ-বন্দনাদি করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গদিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে। উঠানে আগাইয়া গিয়া ময়নাল বলে,—পেরাত্য-পেন্নাম কত্তা।

—কেরে, জয়নালের পোলা না তুই?

—আইজ্ঞে হ।

—কিরে কি চাই তোর? চট্‌পট্ বল, আমার বেলা হ'য়ে গেছে।

—কিছু কাম চাই।

—কাম? কি কাম করতে পারবি?

—আইজ্ঞে যে কাম দেন।

—চ্যালা করতে পারস্?

—খু-উ-ব।

—আয় তবে, দেখ দেখি এই কাঠ ক'দিনে পারবি, কি নিবি। বলিয়া ত্রস্তব্যস্ত রামশরণ ময়নালকে ডাকিয়া দেখাইল বাড়ির একপাশে স্তূপীকৃত কতগুলি খণ্ড খণ্ড কাঠ। ময়নাল কাঠ পরীক্ষা করিয়া বলে,—এ-যে তেঁতুল কাঠ।

—হ—হ, তেঁতুল কাঠ না কি চন্দন কাঠ দেব তোরে?

—কুড়ালে লয় না কত্তা—।

—না, কুড়ালে লয় না, কাঠ কাড়তে এখন নোতুন অস্ত্র গড়াতে হবে। তুই পারবি কি-না বল, মস্করা করবার সময় নাই আমার।

—পারব না ক্যান্ কত্তা,—মজুরী কিছু বেশী লাগবে।

—তা না হয় রোজ ঠিকা নিলি; রোজ ছ'আনার পয়সার জায়গায় ধর এই—সাত আনা পয়সা নিলি?

কথাটা রামশরণ এমনভাবে বলিল যেন তাঁহার অফুরন্ত দাক্ষিণ্য ঐ একটা কথার ভিতর দিয়া ঢালিয়া দিয়াছে ময়নালের মাথায়।

ময়নাল বলে,—না কত্তা. ছ'আনায় সাত আনায় পারব-না। দশ আনার কমে ত আজকাল আর রোজ-মজুরী নাই-ই।

—দশ আনা না আঠার আনা, আমরা কি বিলাত থেকে আয়লাম নাকিরে মর্দ, কাজ করাই না?

—করাবেন না কেন? আমি গরীব, আমার পোষাবে না।

—নে আর বাগ্‌বাহুল্যে কাম নাই, ঐ পুরো আট আনাই পাবি। যদি পারিস্ ত বাড়ির ভিতর থেকে কুড়ুল নিয়ে আয়, আর না হয় ত সকাল বেলা আর কথা বাড়াবি না, পথ দেখ।

ময়নাল বুঝিতেছে, ঠকা হইল অনেক; কিন্তু আপাততঃ কাজ ত কিছু না করিলেই নয়। চট্ করিয়া কোথায় আবার কাজ জুটিবে? দু'একবার মাথা চুলকাইয়া বলে,—আচ্ছা কত্তা, তাই হবে।

বাড়ীর ভিতর হইতে কুড়াল আনিয়া কাজে লাগিয়া যায় ময়নাল। কিন্তু সাধ্য কি তাহার একখানা চ্যালা বাহির করে। একে তেঁতুল গাছ, তাহাতে আবার রোদে-জলে আরও সিঁটা হইয়া রহিয়াছে। দুপুর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কুড়াল মারিয়াও সে দু'খণ্ড কাঠের চ্যালা করিতে পারে নাই।

দ্বিপ্রহরে রামশরণ গদি হইতে বাড়ি ফিরিয়া প্রথমেই চ্যালার অবস্থা দেখিতে গেল। কাছে আসিয়া বলিল,—সারা দুপুরে এই ক'খানা চ্যালা?

ময়নাল ঘাট স্বীকার করিয়া বলিল,—সারাদিনই আছি কর্ত্তা, আরও হবে; বড় সিঁটে গাছ।

সে সত্যটা রামশরণও জানিত, তাই একটু নরম হইয়া বলিল,—তবে এককাজ কর, বাড়ির ভিতরে চল, কিছু মুড়ি দিয়ে একটু জল খেয়ে গায়ে জোর ক'রে নে, নইলে যে কুড়ুল গাছের ভিতর ঢোকছেই না।

ক্ষুধার্ত্ত ময়নাল আপত্তি করিল না, রামশরণের সহিত বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া গামছায় করিয়া কিছু মুড়ি লইল। বাহিরের আটচালা ঘরে বসিয়া সেই মুড়ি চিবায়, পুকুর পাড়ে গিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খায়—আবার লাগে কাজে।

তিন দিন এমনি করিয়া চ্যালা করিয়া ময়নাল দেখিল, এ কাজ তাহার পোষাইবে না; দুইহাতে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, আর কুড়াল ধরা যায় না। ময়নাল ঠিক করিল, যাহা পায় তাহা লইয়া আজই ভাগিয়া পড়িবে। বসিয়া থাকে ময়নাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রামশরণের আশায়।

আজকাল রামশরণের হাঁটা-চলা কাজ-কর্ম্ম সবটার ভিতরেই একটা ঝড়ের বেগ আসিয়াছে। একেই লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত-সমস্ত, তারপরে আসিতেছে মেয়ের বিয়ে। অর্থীতে প্রার্থীতে রামশরণ সর্ব্বদাই দু'চার জন লোক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে।

বাড়ি আসিয়া রামশরণ একদল লোক লইয়া হন হন করিয়া ঢুকিয়া যায় ভিতর বাড়িতে, ময়নালকে যেন চোখেও পড়ে না।

আটচালা হইতে আগাইয়া আসে ময়নাল—বসে উঠানের এক কোণে।

বাড়ির ভিতরে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে থাকে, তারপরে বাহির হইয়া যায় একদল লোক। গামছা কাঁধে বদনা হাতে পুকুর ঘাটের উদ্দেশ্যে বাহির হয় রামশরণ। চোখ পড়িয়া যায় ময়নালের দিকে,—বলে, কিরে বাপু, তোর আবার খবর কি?

মৃদু কণ্ঠে মিনতির সুরে বলে ময়নাল,—আমার পাওনাটা কর্ত্তা।

—ক্যান্? কাজের ত হ'ল না চার আনিও।

—এ কাজ আর আমি পারব না, হাতে ফোস্কা পড়ল।

হাসিয়া বলে রামশরণ,—ওঃ—হাতে এর ভেতরে একেবারে ফোস্কা পড়ে গেছে? নবাবপুত্তুর আমার, আসলি কেন চ্যালা করতে? এখন কে করবে তোর ফেলে যাওয়া কাজ?

অপরাধীর মতনই ময়নাল বলে—সে ঝাপুর ঘাটখন তিলের চয়ে কাজ করা আমার পোষায় না।

এইবারে ক্ষেপিয়া যায় রামশরণ, বলে,—আসছিলি কেন তবে জ্বালাতে সেই ঝাপুর ঘাট থেকে? তখন ত সব ব্যাটারই কাম চাই কর্ত্তা।—কণ্ঠস্বরটা অতিমাত্রায় বিকৃত হইয়া যায় রামশরণের।

—যা হয় আমাকে দিয়া দেন কর্ত্তা—।

—দিয়ে দিন বললেই হ'ল? তার একটা হিসেব লাগে না? যাস্ একদিন গদিতে, দেব তোর পয়সা। জ্বালাল ব্যাটারা—বলিয়া রামশরণ চলে ঘাটের পথে। ময়নাল ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলে বাড়ির পথে।

সহসা ভিতর বাড়ি হইতে রামশরণের বৃদ্ধা মা ডাক দিয়া বলিল,—রামশরণ, যাস্ কোথায়? ঘরে ফের।

—কেন?

নিশাঠাকুরের পূজা আরম্ভ হবে এবারে, ঘরে ঢোক। রামশরণ বদনা-গামছা লইয়াই আবার ঘরে ঢোকে।

কথা বলছিলি কার সঙ্গে?—জিজ্ঞাসা করে রামশরণের মা।

—সেই যে চ্যালা করত ঝাপুরঘাটের একটা ছোঁড়া—।

—গেল নাকি?

হ্যাঁ—।

ওমা, শীগ্‌গীর বাড়ীর ভেতরে ডাক্—নিশাঠাকুরের পূজায় বসবে যে এখন, পথে আবার কি ঘটে তুই পড়বি ক্যাসাদে। বলি ডাক না বাড়ির ভিতরে।

বারান্দায় নামিয়া ডাকিয়া ফিরায় রামশরণ ময়নালকে; বলে,— ঐ আটচালার ভেতরে ঘণ্টাখানেক বসে থা।

—ক্যান্ কর্ত্তা?

—নিশাঠাকুরের পূজায় বসবে।

তাতে আমার কি?

—অত ফিক্ করিস্ না মর্কট—নিশাঠাকুর কাঁচা দেবতা।

—আমরা কর্ত্তা মোছলমান—আপনাদের দেবতায় আমাদের ছোঁবে কেন?

—নারে বাপু, নিশাঠাকুরের কাছে ও-সব বিশ্বাস নেই;

শেষটায় পথে-ঘাটে কি হ'তে কি হয়ে বসবে—ফ্যাসাদে পড়ব আমি। একটু না হয় বসেই যা।

তিলচরে নিশাঠাকুরের একাধিপত্য—বড় জাগ্রত দেবতা। সাহা বাড়ির পশ্চিমের বাঁশঝাড়ে তাহার পুরুষানুক্রমিক বাস; তাই সে বাঁশঝাড়ে কেহ কখনও হাত দেয় না। না জানিয়া হাত দিয়া অনেকে রক্ত-বমন করিয়া সেই মুহূর্তেই মারা গিয়াছে। রাত্রির মধ্যভাগে রোজ নিশাঠাকুর খড়ম পায়ে চ্যাটাং চ্যাটাং করিয়া একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন; ভাগ্যবানেরা সেই শব্দ বহুদিন শুনিতে পাইয়াছে, অধিকতর ভাগ্যবানেরা কদাচিৎ কখনো তাহার ছায়া-মূর্তিও দর্শন করিয়াছে।

ময়নাল অগত্যা গিয়া আবার আটচালায় বসিয়া দুই হাতে মশা তাড়াইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সাহাবাড়ির সকল ঘরের দুয়ার বন্ধ হইয়া গেল। সব চুপ। রামশরণের মা ঘরের ভিতর হইতেই এ-ঘরে ও-ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—বউরা বাইরে নাই ত কেউ? একবস্ত্রে বা এলোচুলে নাই ত কেউ? শিশুরা সব সাবধানে আছে ত,—তাদের কপালের কোণে একটা কালীর দাগ দেওয়া আছে ত?—উত্তর আসে, সব ঠিক আছে। তারপরে আবার সব নীরব।

চারিদিকের নীরবতা, রুদ্ধ দুয়ার, সাবধান বাণী—ময়নালের সত্যই যেন কেমন একটু ভয় ভয় করে। একা বসিয়া আছে সে বাহির বাড়িতে। পশ্চিমের বাঁশঝাড়টা সত্যই অন্ধকারে কেমন দুলিতে থাকে—তালগাছটায় কেমন একটা খচ্ খচ্ শব্দ হয়, ঝোপটার ভিতরে সরাৎ করিয়া একটু শব্দ হয়। গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে।

হঠাৎ পশ্চিমের বাঁশঝাড়ের ভিতরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল—পরক্ষণেই চঙ্ চঙ্ করিয়া বাজিয়া ওঠে কাঁশর। পশ্চিমের বাঁশঝাড়টা সত্যই কেমন দুলিয়া ওঠে নাকি?

ঘণ্টাখানেকের ভিতরে পূজা শেষ হইল, পূজারী এবং সঙ্গের সব মানুষ, প্রসাদ ও আশীর্বাদী লইয়া বাড়ির ভিতরে ফিরিয়া আসিল, ঘরগুলির দুয়ার খুলিয়া গেল; ময়নালও এক পা দু'পা করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাইতে হইবে সেই ঝাপুরঘাট—অনেক দূর।

পরদিন বিকালে ময়নাল রামশরণের গদিতে গিয়া বসে পয়সার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল রামশরণ তখন কতগুলি হিসাবের খাতাপত্র লইয়া এমন একটা গভীর ব্যস্ততার ভাব দেখাইতে লাগিল যেন চোখ মেলিয়া তাকাইবারই ফুরসুৎ নাই।

ময়নাল আজও বসিয়াই থাকে, বড় সে ঠেকা।

লোকটা বসিয়াই আছে দেখিয়া রামশরণ খাতা রাখিয়া মুখ তুলিল, বলে,—আচ্ছা তাগিদ ত তোমার বাবা,—এই কাল না কাজ করলি—এর ভিতরে তোর পয়সা নিয়ে কি আমি বৈদেশে পালালাম—না কি? কেঁচোর মতন সঙ্কুচিত হইয়া ময়নাল বলে,—পালাবেন ক্যান্ কত্তা, গরীব মানুষ, বড় ঠেকা ছিল।

—ঠেকা কি তোরই আছে—আমাদের নাই? যা বাপু, আজ আর জ্বালাস নে,—অনেক কাজ, আসিস আরেক দিন।

পিত্ত তাতিয়া যায় ময়নালের; একটু রূঢ়কণ্ঠে কয়,—তিন রোজের ত কাজ,—কিই বা এমন হিসাব? কাটতে আপনার ইচ্ছা থাকে ত কিছু কাটুন, বাকিটা দিয়ে দিলেই চুকে যায়।

ভুরু কুঁচকাইয়া বলে রামশরণ,—কি আর হিসাব? খুব ত পয়সা নিতে আসছিস, হেঃ—হিসাব কবব? জানিস্ কিছু হিসাবের? জয়নালের পোলা না তুই? জয়নাল কত টাকা ধার নিয়েছিল আমার কাছ থেকে জানিস্ কিছু? জানিস তার কত সুদ বাকি রয়েছে? খুব মচ্ছমুলো করে জমির ধান খাওয়া হচ্ছে, আটকে দিলে ভাল হ'ত, কেমন? বা ব্যাটাচ্ছেলে, সুদ জমেছে বিশ ত্রিশ টাকা, তিন দিনে কাটলাম দেড় টাকা—বাদ বাকি টাকা নিয়ে এসে হিসাব করিস একদিন, বুঝলি?

ময়নালের সমস্ত দেহটা রাগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে—বলে,—হিসাবে পাবে কত্তা।—যেদিন লেজায় ফোঁড়ে পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার হবে।

বলিয়াই ময়নাল হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। থর থর বলিয়া রামশরণ যতক্ষণে গদির বাহিরে আসিয়া লোকজনে ডাক দিয়াছে ততক্ষণে ময়নাল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামশরণের তর্জ্জন-গর্জ্জন আর কিছুতেই থামিতে চায় না।

সন্ধ্যারাতে ঘরে ফিরিয়া ময়নাল দেখে, মা কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ভাল লাগে না আর ময়নালের এই নিত্য নিত্য কাঁথামুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকা আর ছিঁ ছিঁ করিয়া কাঁদা। এ দৃশ্য অনেক দেখিয়াছে—ছেলেবেলা হইতে দেখিয়াছে—মন বৈচিত্র্য চায়। আর যেন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে না।

মাকে ডাকে না ময়নাল, নিজে ভাত লইয়া খাইবে বলিয়া রান্না ঘরে গিয়া ভাতের হাঁড়ি খোলে। দেখে একটা ভাত নাই। ময়নালের মেজাজ আরও খেপিয়া যায়, রূঢ় হইয়াই মাকে বলে,

কাল ত চা'ল আনলাম তিন সের—আজই হাঁড়িতে একমুঠা ভাত নাই কেন?

কাঁথার ভিতরে মোড়ামুড়ি দেয় লুৎফা—বলে, ভাত রাঁধব গতরে কি সে বল আছে? বিকালে দেখি আবার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসল।

—আবার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসতে গেল কেন? তোমার জ্বরের ত আমি কিছুই তাল-মান পাই না।

আমিও বুঝি চললাম যে ময়নাল।

—চলনা ত চলনা,—তার একটা দিনরাত শোহবৎ কি? অযথা রূঢ় হইয়া যায় ময়নালের কথাগুলি, লুৎফার বুকে গিয়া বাজে। ভাবে সে, কি হইল তাহার ময়নালের? এমন হৃদয়-হীন রূঢ় ত সে কোন দিনই ছিল না।

রাগে গর্‌গর্‌ করে ময়নালের সমস্ত দেহ; বলে, সরকারী ডাক্তারখানার নোতুন ডাক্তার—ডাক্তার না শালার ভাই চোর। কুইনান দেয় না ওর বাজানের মাথা দেয়—কয় কুইনান, দেয় পালোর বড়ি। শোনলাম বাড়িতে দিছে কুইনানের কারখানা—কারখানা বার করব কাল থানায় গিয়া।

লুৎফা আর কথা বলে না। ময়নাল একগাছি দড়ি এবং কাস্তেখানা হাতে লইয়া বাহির হইয়া যায়। ঘরের বাহির হইয়া বলে,—দুয়ার দাও, অনেক রাত হবে ফেরতে।

—এই রাত্তিরে আবার কোথায় চললি ময়নাল?

—কাম আছে, কাম আছে। গা ভরা জ্বর, চুপে চাপে শোও গিয়া, কথা কইও না।

হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া যায় ময়নাল।

রামশরণ সা'কে আজ ময়নাল ভাল করিয়াই শিক্ষা দিবে, তাহাতে থাকে প্রাণ—যায় প্রাণ। বাড়ীর সংলগ্ন মস্তবড় একটা সুপারী বাগ রহিয়াছে রামশরণের। নদীর পাড়ের মাটি, অপর্য্যাপ্ত সুপারী ফলে, অন্ততঃ দুহাজার টাকা শিকের সম্পত্তি।

গাছের সুপারী প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। প্রচণ্ড আক্রোশে ময়নাল পাগল হইয়া গিয়াছে। আজ সে ঠিক করিয়াছে, রাত্রি একটু গভীর হইলে রামশরণের সুপারী বাগানে প্রবেশ করিবে, গাছে উঠিয়া কাস্তে দিয়া পাকা গুপারীর ছড়াগুলি কাটিয়া দিবে,—শব্দ না করিয়া দড়িতে বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিবে—তারপর সারারাত ধরিয়া সেগুলিকে আশপাশের নালা ডোবায় ফেলিবে।

পথে যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়ায়; মনে পড়ে সেদিনকার বৃদ্ধ মামুদ মিঞার কথা—'তোর পিছে শয়তান ঘোরে ময়নাল'—! কিন্তু না,—আক্রোশে শিরাগুলি তার ফুলিয়া যায়, যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়—উচিত শিক্ষা দিতে হইবে আজ রামশরণকে।

প্রহর খানেক রাত হইয়াছে। পল্লীর রাত—প্রায় সন্ধ্যার পরেই গৃহগুলি নিষ্প্রদীপ—তার পরেই অঘোর ঘুম। বিছানায় নিদ্রাহীন চোখে এ-পাশ ও-পাশ করে শুধু বুড়ো-বুড়ীরা।

দুর্নিবার আক্রোশ—যত আক্রোশ বাড়ে তত চলে; যত চলে তত আক্রোশ বাড়ে। পৌঁছায় ময়নাল রামশরণের বাড়ির পাশে।

হ্যাঁ, এইদিকেই ত সুপারী বাগ—এইত যেন একটা পথ, কিন্তু বড় অন্ধকার। চোরের মতন গুটি গুটি পা বাড়াইয়া আগায় ময়নাল। দু'একবার পিছন ফিরিয়া তাকায়—সত্যই শয়তান ঘুরিতেছে নাকি?

চলিতে চলিতে অন্ধকারে হঠাৎ হোঁচট খাইয়া পড়ে ময়নাল। পায়ে ঠেকিয়া ভাঙিয়া গেল একটা মাটির ঘট। ময়নাল উঠিয়া দাঁড়ায়—অন্ধকারে হাতড়াইয়া অনুমান করিতে চেষ্টা করে। তিনদিকে কাৎ করা পোঁতা রহিয়াছে তিনখানি গোজ—মাঝখানের ঘটটি ভাঙিয়া গিয়াছে। তবে? ভুল হইল নাকি তাহার? সুপারীবাগ নয়? চারিদিকে তাকায় ময়নাল। না, ভুলই করিয়াছে, এ যে বাঁশবন। তবে এ কাহার ঘট? নিশাঠাকুরের নাকি? সহসা সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার কথা। এক পা দু'পা করিয়া আবার পিছায়—বাহিরে আসে পরিষ্কার পথে।

তবে থাক আজ,—প্রথমেই বাধা পড়িয়াছে, কেমন ভয় ভয় করিতেছে, আজ তবে ফিরিয়া চলা যাক্‌।

পরক্ষণেই তাড়া করে শয়তান; সত্যই তাড়া করে। ময়নাল স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। পশ্চিম হইতে ঘুরিয়া যায় বাড়ির দক্ষিণে।

হ্যাঁ, এই ত সুপারী বাগ—সারি সারি সুপারি গাছ ও বাঁশ বনের মতন অত অন্ধকার নয়, বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

লম্বা লম্বা গাছগুলি কেমন একটানা দাঁড়াইয়া আছে—হঠাৎ তাহাদের মাথাগুলি দুলিয়া ওঠে নাকি? নিশাঠাকুর নয়ত? ছরাৎ করিয়া সরিয়া যায় একটা গিরগিটি। তাই ত গাটা কেমন ছম্‌ ছম্‌ করিতেছে।

পায়ের নীচে মাঝে মাঝে খচ্‌খচ্‌ করে পালটে মাদারের শুকনো পাতা—পায়ের শব্দে জাগিয়া ওঠে একটা ভুতুম্‌ পাখী—বলে ভুতুতুম্‌ ভুতুতুম্‌। কেমন ভয় ভয় করে!

তবু সে ফেরে না। ওঠে একটা গাছে, কাস্তে দিয়া

সুপারীর ছড়া কাটে, দড়ি বাঁধিয়া নামাইয়া দেয় নীচে। আর একটা—তারপরে আর একটা—তারপরে আর একটা।

সুপারীর ডগাগুলি যেন কেমন অস্বাভাবিক ভাবে দোলে; অস্ফুট শব্দ হয় যেন চ্যাটং চ্যাটং—খড়ম পায়ে ঘোরে নাকি নিশাঠাকুর সুপারী গাছের মাথায় মাথায়? হঠাৎ ময়নালের পা দু'টা কেমন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে—হাত শিথিল হইয়া যায়—ধুপ, করিয়া সে নীচে পড়িয়া যায়।

পাড়ার ডাইনি যত নিদ্রাহীন বুড়ী। সারারাত অন্ধকারে মাথা চোকায় আর উকুন মারে,—আর কান উনাইয়া শোনে কোথায় হইল একটু টু শব্দ।

সুপারীবাগ বাড়ির ভিতর হইতে অনেক দূর, তবু কান এড়ায় না বুড়ী রামশরণের মায়ের। বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া ডাকে রামশরণকে, বলে,—বাইরে একটা শব্দ হল—ধুপ—।

—কোথায়! ঘুমে জড়িত কণ্ঠে বলে রামশরণ।

—দেখ দেখি সুপারী বাগে নাকি!

সুপারিবাগে মাঝে মাঝে প্রায়ই চুরি হয়, হুড়মুড় করিয়া জাগিয়া উঠে রামশরণ, হাঁক পাড়িয়া তাহার সঙ্গে আগাইয়া আয় একবাড়ি মানুষ। লণ্ঠন ধরাইয়া লাঠিসোটা লইয়া ছোটে সুপারীবাগে।

খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখে, সত্যই ত দু' একটা গাছের নীচে ছড়ান রহিয়াছে দু' এক ছড়া সুপারী। সমস্বরে সবাই চীৎকার করে,—চোর চোর চোর—

দেখিতে দেখিতে সুপারীবাগ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়।

যতক্ষণে লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে, লণ্ঠন ধরাইয়া বাগানে বাগানে প্রবেশ করিয়াছে ময়নাল ততক্ষণে চলিয়া যাইতে পারিত অনেক দূরে। কিন্তু অনেক উঁচু হইতে শক্ত মাটিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই দম ফিরাইতে পারিতেছে না।

চোর—চোর—চোর—চারদিকে জাগিয়া ওঠে উল্লাসধ্বনি, ধরা পড়িয়া গিয়াছে ময়নাল। পিঠমোড়া বাঁধ দিয়া তাহাকে আনিয়া রাখা হইল রামশরণের প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যখানে। লণ্ঠনটি আগাইয়া চোরের মুখের কাছে রাখিয়া রামশরণ বলেন,—পাওনার হিসাব করতে আসছিলি বুঝি ময়নাল? বেশ, বেশ—কাল সকালে হিসাব হবে!

ময়নাল তখনও দম ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে।

পরদিন সকালে সংবাদ গেল বাবুগঞ্জ থানায়, বিকাল বেলায় আসিল পুলিশের লোক।

পুলিশের লোক সব শুনিয়া রামশরণকে ডাকিয়া বলিল,—এ যা অপরাধ তাতে শাস্তি হবে দু' এক মাসের। একে ভাল ভাবে যদি আটকাতে চান তবে গ্রামবাসী সবাই মিলে দশধারায় করুন, কমসে কম তিন বচ্ছর।

অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া পড়ে রামশরণ। দশ ধারায় বহু সাক্ষী-সাবুতের দ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, আসামীর চরিত্র সন্দেহাত্মক এবং সে সর্বসাধারণের শান্তির বিঘ্নস্বরূপ।

রামশরণ পুলিশের লোককে বলিয়া দিল, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে তাহার কোনই কষ্ট হইবে না, শুধু দশ পনরদিন সময় চাই।

থানার লোক ময়নালের হাতে দড়ি লাগাইয়া বাবুগঞ্জে লইয়া গেল।

এ সকল ব্যাপারে রামশরণের ন্যায় করিত-কর্মা লোক দুনিয়ায় বিরল। তিনের চারেই জোটাইয়া ফেলিল সে অনেক সাক্ষী। ঘোরাঘুরি করিতে করিতে শুনিতে পায় কালুসর্দারের সহিত ময়নালের সাম্প্রতিক বাধাবাধি এবং তাহার সরস কারণ। হাতে সে স্বর্গ পায়। ছুটিয়া যায় কালুসর্দারের কাছে।

হাতে স্বর্গ পায় কালুসর্দারও। জমিতে কাঁটার বেড়া দিয়া এবং তাহার সমস্ত ধান কাটিয়া লইয়াও তাহার আক্রোশ মিটিতেছিল না। কি করিবে তাহারই পরামর্শ আঁটিতেছিল দুলালের সঙ্গে।

রামশরণের সহিত কালুসর্দারের যাহা কথাবার্তা এবং আলোচনা হইল তাহার গলিতার্থ এই যে, এ বিষয়ে রামশরণের কিছুই করিতে হইবে না, কমসে কম আট দশজন সাক্ষী জোটাইয়া দিবে সে এই এক ভুতুরদিয়া হইতেই।

নাদুস-নুদুস বপুটি দোলাইতে দোলাইতে একগাল হাসিয়া চলিয়া যায় রামশরণ। ঘরের ভিতর হইতে শুনিতে পায় সব কথা বানু।

সেইদিন সন্ধ্যা হইতেই আরম্ভ হইল কালুসর্দারের বাড়ীতে কত রকমের লোকের আনাগোনা, কত জটলা-পটল। তালিম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে কে কি সাক্ষ্য দিবে তাহারই। কাহারও ময়নাল কোঁচ-শিকারের নলী চুরি করিয়াছে, যাহারও থালা পাওয়া যায় নাই—ঘরে যেদিন ময়নাল গিয়াছিল তাহার বাড়ী, কাহারও গাছের নারিকেল থাকে না—আনাগোনা করিতে দেখিয়াছে বাড়ির লোক ময়নালকে সেই সব নারিকেল গাছের গোড়ায়,—কালুসর্দারের আড়ির পাড়ের কলা এর কাঁদিও সে ঘরে আনিতে পারে না যখন ময়নাল কাজ করিতে আসে ভুতুরদিয়ার মাঠে; ইত্যাদি ইত্যাদি—।

ঘরে বসিয়া সবই শুনিতে পায় বাসু। চারিদিকে এত ডাহা মিথ্যার আয়োজন দেখিয়া তাহার মনে হয়, রামশরণের সুপারী বাগের চুরির সংবাদটাও বোধ হয় এই রকমই ডাহা মিথ্যা। কিন্তু তল্লাটের মানুষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে ময়নালের পিছনে, নিষ্কৃতির উপায় নাই। ঘরে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে শুধু বাসু।

আজ সকালে ময়নালের বিচার হইয়া গিয়াছে, বাবুগঞ্জে বসিয়াই। দুপুরের দিকে বাড়িতে ফিরিয়াছে কালু সর্দার, সোল্লাসে কি যেন বলিয়াছে তাহার স্ত্রীর কাছে, বাসু ঠিক শুনিতে পায় নাই।

কিন্তু যত সঙ্কোচ তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া থকুক না কেন, খবরটা না জানিয়া যে সে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছে না। কি করিয়া খবর সংগ্রহ করা যায়। বাসু ঘরের আনাচে-কানাচে ঘোরে আর ভাবে।

দুপুরের পর আসিয়াছে নৈমদ্দি। হঠাৎ খেয়াল আসে বাসুর মাথায়; ওকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? ঘেন্না ঘেন্না করে লোকটার সঙ্গে কথা বলিতে, একটু কথা বলিলেই কেমন অতিরিক্ত উৎসাহিত হইয়া গায় পড়িতে চায়; হয়ত আঁচ পাইয়াছে সে এ বাড়ীতে তাহার অধিকারের।

তবু লোকটা বড় বোকা, হয়ত কথা বাহির করা যাইবে অনেক। কিছুই হয়ত বুঝিতেও পারিবে না।

বাপ ঘুমে—মা পুকুরপাড়ে, বারান্দায় বসিয়া আছে—নৈমদ্দি। একটা পান হাতে করিয়া আগাইয়া যায় বাসু,—চুপি চুপি বলে, পান খাবা নাকি মেঞা?

নৈমদ্দিকে বাসুর এই প্রথম পান আগাইয়া দেওয়া, ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া তাকায় সে বাসুর মুখে, মনে ভাবে, ময়নালের জেলের খবর শুনিয়াছে বাসু, এখন নৈমদ্দিকেই হাত করিতে চায়। রসিকতা করিয়া বলে,—পান দিয়া ঠোঁট লাল কর তুমি বিবি।

মোটা রসিকতার কদর্য্যতায় ঘৃণা মাড়িয়া যায় বাসুর। ভাবে, না;—এ লোকটাকে আর আস্কারা দিতে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে,—খবরটা জানিতেই হইবে—মা ঘরে আসিবার পূর্ব্বে, বাপ জাগিয়া উঠিবার পূর্ব্বে।

বাসুকে নীরব দেখিয়া বলে নৈমদ্দি,—একেবারে চুপ গেলা যে বিবি,—শাড়ী পরবা নাকি—বাবুগঞ্জের লাল শাড়ী। ময়লা দাঁতগুলি বাহির করিয়া বোকার মতন হাসে সে।

মেজাজ খারাপ হইয়া যায় বাসুর। তবু জোর করিয়া হাসে, বলে,—দোকানদারের অত শাড়ী কেনার সখ কেন?

আঘাতকে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করে নৈমদ্দি, বলে,—দোকানদারের বুঝি টাকা নাই? এবারে টরকী বন্দরে যাব টিন কিনতে।

—ক্যান্?

—ঘরে দেব টিনের ছাউনি।

ইস্—বলিয়া ঠোঁট উল্টায় বাসু, উৎসাহিত হয় নৈমদ্দি।

বাসু বলে,—মামলার খবর কি আজ?

—মামলার আবার খবর কি? চোরের হল জেল।

মুখখানি শুকাইয়া যায় বাসুর। চেষ্টা করে হাসিতে, পারে না কিছুতে।

—মনে দুঃখ পায়লা নাকি?—জিজ্ঞাসা করে নৈমদ্দি।

সেই দাঁত বার করা রসিকতা। কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না বাসু। মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু সারা বিকাল ভাবিয়া মরে বাসু; জেল হইল,—কত দিনের? কি রকম? সব কথা জানিবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়া যায়—স্থির থাকিতে পারে না ঘরের ভিতর। কিন্তু কোথায় মিলিবে সংবাদ?

বিকেল বেলায় দিকে তিনটা চালতা ও কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কাপড়ে গুঁজিয়া বাসু উপস্থিত হইল দুলালের বাড়ি। দুলাল মাঠে বাহির হইয়া গিয়াছে, মানুষের সাড়া পাইয়া ঘর হইতে বাহির হইল তিনটি উলঙ্গ শিশু—বাসুর সেই শিম খাইবার সঙ্গী।

বাসু বলে,—মা কৈ রে?

তিনটি শিশুর ছোটটি অকারণে ভেঙচি কাটে, মধ্যমটি ফিক্ করিয়া হাস দিয়া চলিয়া যায়, বড়টি বলে, জানি না।

—জানস্ না কি রকম?

সেটিও ভেঙচি কাটিয়া দৌড় দেয় বাহিরের দিকে।

বাসু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল,—দেখে এক গাঁজা কাঠ কুড়াইয়া ঘরে ফিরিতেছে দুলালের বউ। দূর হইতেই সে জিজ্ঞাসা করে,—কখন আস্‌লি রে বাসু?

—এই যে চাচী,—আসো,—চালতামাখা খাবা না কি? এই নাও—বলিয়া বাসু চালতা ও লঙ্কা বাহির করিল।

—ও মা: দেখ মেয়ের সখ! বলিয়া বাসুকে লইয়া ঘরে ঢুকিল দুলালের বউ।

সেয়ানা মেয়ে দুলালের বউ। বাসু অনেকদিন আসে নাই এ-বাড়ি; জল ভরিতেও আসে না এখন আর; আজ যে সে

হঠাৎ চাল্‌তামাখা খাইতেই আসিয়াছে এই সহজ কথাটাকে তেমন সহজ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না সে।

কিন্তু সেয়ানাগিরির প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ মনের সব ভাব ও কথা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিতে পারা। দুলালের বউ তাই চাল্‌তামাখা খাবার আনন্দটাকেই অতিরিক্ত রকম বড় করিয়া তুলিয়া বাসুকে লইয়া চাল্‌তা কাটিতে বসিয়া গেল।

চালতা কাটিতে বসিবামাত্র চারদিক হইতে আগাইয়া আসিল কয়েকখানি ছোট ছোট হাত—অর্থপূর্ণ নীরবতায়।

দুয়ারের ঠেঙা টানিয়া তাড়া করে দুলালের বউ—তেমনি অর্থপূর্ণ নীরবতায়।

কিন্তু বাদুড়ের মতন ভেল্কি জানে পল্লীর এই জীবগুলি; প্রত্যেক মুহূর্তেই তারা প্রমাণ করিতে পারে তাহাদের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব?

আবার চাল্‌তা কাটে দুলালের বউ। জুড়িয়া দেয় গল্প; লক্ষ্য করে সে বাসুকে। এখনও নিজেকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া চাপিয়া রাখিতে শেখে নাই বাসু, মনের কথা ফুটিয়া ওঠে নাকে মুখে চোখে—নিজের অজ্ঞাতেই। মন তার আটুপাটু করে একটা বিশেষ কথা শুনিতে, লক্ষ্য করে দুলালের বউ—উপভোগ করে মনে মনে।

দুলালের বউ রগড় উপভোগ করিবার জন্যই প্রসঙ্গ টানিয়া বলে,—বাবুগঞ্জের খবর জানস্ নাকি বাসু?

—না চাচী, কি—?

আত্মবিস্মৃত হইয়া মুহূর্তে চঞ্চল হইয়া উঠে বাসু, কণ্ঠে তার প্রকাশ পায় সবটুকু উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কা। এত চাপা সেয়ানা মেয়ে হইয়াও ঠোঁট চাপিয়া না হাসিয়া পারে না দুলালের বউ, অলক্ষিত অগ্নিতাপের মতন সে হাসিটুকু শুকাইয়া দেয় বাসুর কণ্ঠস্বর।

দুলালের বউ বলে,—জেল হইছে পূরা তিন বছর,—ঘোরতে হবে ঘানির গাছে।

বাসুর মনে কোন্ কথাটি কেমন করিয়া আঘাত করিবে তাহা ওজন করিয়াই যেন ফলাও করিয়া সব কথা বলিতে থাকে দুলালের বউ। বাসু যত শোনে তত শুকাইয়া যায়।

স্ত্রী চরিত্রের এইখানেই একটা অতল দুর্জ্ঞেয়তা। একটা অকপট সহবেদনশীলতা যেমন অতি সহজভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের ভিতরে—বিশেষ করিয়া প্রেমের ক্ষেত্রে, তেমনি

'ক্লান্ত বাঁশীর শেষ রাগিণী'
[ফোটো—শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

আবার মানুষের সেই নরম দুর্বল স্থানটিতে অকারণ নির্মম আঘাত হানিবার একটা রূঢ় আনন্দও যেন একেবারে পাইয়া বসে অনেকের মনকে।

বাসু একেবারেই চুপ করিয়া আছে,—দুলালের বউ তাই তাহার কথাগুলিকে যেন তেমন জমাইতে পারিতেছে না। অতএব আনুষঙ্গিক বক্তব্যগুলিকে সে শেষ করিয়া আনে, ফাঁদিতে চেষ্টা করে মূল বক্তব্যটা। বলে,—তোর বাজান যখন সাক্ষী দিল, কি বলল হাবামজাদা ছোঁড়াটা জানস্?

মাথা নীচু করিয়া নীরবে নখ খোঁটে বাসু।

—হারামজাদা ছোড়া বলে, হুজুর, ওর মেয়ে ভালোবাসে আমাকে, বা'র হইবার চায় আমার সঙ্গে—নিজের মেয়ে সামলান যায় না, তাইতে আক্রোশ যত আমার উপর।

সেখান হইতে উঠিয়া পড়ে বাসু, দ্রুতপায়ে রওনা হয় বাড়ির দিকে।

পিছন হইতে ডাকিয়া আগায় দুলালের বউ,—ও কি বাসু, চালতা কাটিলাম, খাবি না?

মুখ ফেরায় না বাসু, তাড়াতাড়ি আগাইয়া চলে [ক্রমশঃ

হাইদ্রাবাদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

নিজামরাজ্য হাইদ্রাবাদের আয়তন ৮২ হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪ লক্ষ। হাইদ্রাবাদের অধিপতিরা আপনাদিগকে ইসলাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদের বংশধর বলিয়া মনে করেন। মাতৃক্রমে তাঁহারা মহম্মদের এবং পিতৃক্রমে প্রথম খলিফা আবু বেকরের সন্তান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান নিজাম এই নৃপ-বংশস্থাপয়িতা আসফ জাহ

হাইদ্রাবাদ নগরের একটি প্রবেশ-তোরণ

হইতে পুরুষানুক্রমে সপ্তম। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মান এবং ২৫ বৎসর বয়সে হাইদ্রাবাদের সিংহাসনে উপবেশন করেন। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৬৩ বর্ষের কাছাকাছি।

এই রাজ্যের রাজধানী হাইদ্রাবাদ নগর কৃষ্ণা নদীর উপনদীসমূহের অন্যতম মুথীর দক্ষিণ তীরে বিরাজিত। এই নগর-প্রতিষ্ঠার মূলে যে কাহিনী রহিয়াছে তাহাকে রোমাঞ্চকর রোম্যান্স বলিয়া অভিহিত করা যায়। গোলকোণ্ডার পঞ্চম সুলতান মামুদ কুলী কুতব শাহের ভাগমতী নাম্নী এক (হিন্দু) প্রণয়িনী ছিল। সুলতানের প্রণয়িনীগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন বলা যায়। ভাগমতীর অবস্থানের জন্য সুলতান একটি নূতন নগর নির্ম্মাণ করান। ঐ নগরের নাম রাখা হয়—ভাগনগর। ফরাসী পর্য্যটক ট্রাভার্নিয়ার নবনির্ম্মিত ভাগনগর পরিদর্শন করেন। তিনি ভাগমতীর প্রতি মহম্মদ কুলী কুতব শাহের অগাধ অনুরাগের কথাও কহিয়াছেন। ট্রাভার্নিয়ারের মতে, এই সুন্দরীর ক্ষুদ্রাকার করাঙ্গুলির ইঙ্গিত অনুসারে তদ্গতপ্রাণ সুলতান সর্ব্বদা চলিতেন। কথিত হইয়া থাকে, সুলতান প্রতি রাত্রিতে গোলকোণ্ডা হইতে ভাগনগরে আসিতেন। নৌকা-যোগে মুথীনদী পার হইয়া নগরে আসিতে হইত। একদিন রাত্রিতে বর্ষাবারিস্ফীতা মুথী অতিক্রম করিবার সময় নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় সুলতানের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। অতি কষ্টে সুলতান রক্ষা পান। মহম্মদ কুলীর এই অনুরাগ আমাদিগের মনে বিল্বমঙ্গলের কাহিনী জাগ্রত করিতে পারে।

এই ঘটনার পর মহম্মদ কুলী মুথী নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করান। এই সেতুটি এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা 'পুরাণা পুল' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ট্রাভার্নিয়ার এই সেতুটি দেখিয়াছিলেন। তিনি এই সেতুটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—প্যারিসের 'পণ্ট নুফ' সেতু অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। ভাগমতীর সহিত সাক্ষাতের সুবিধার জন্য সুলতান ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সেতুটি প্রস্তুত করান। ভাগমতীর মৃত্যু হইলে ভাগনগর আখ্যার পরিবর্ত্তে এই নূতন নগরকে হাইদ্রাবাদ আখ্যা প্রদত্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রণয়িনীর মৃত্যুর পর মহম্মদ কুলী ভাবেন, মুসলমান সুলতানের প্রতিষ্ঠিত নগর হিন্দু প্রণয়িনীর নাম ও স্মৃতি বহন করিবে, ইহা ঠিক নহে। 'হাইদার' অর্থে সিংহ, সুতরাং হাইদারাবাদ শব্দের দ্বারা সিংহ-নগর বুঝায়। এই অঞ্চলের রক্ষণশীল হিন্দুরা ভাগনগর নাম আজিও ব্যবহার করিয়া থাকে।

হাইদ্রাবাদনগরের দর্শনীয়সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক 'চারমিনার' নামক বিখ্যাত স্থাপত্য-কীর্ত্তিটি। এই অত্যন্ত মনোরম ও মহান ইমারতটি গ্রানিটজাতীয় প্রস্তরে প্রস্তুত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে দণ্ডায়মান চারিটি গ্রানিটে গঠিত খিলানের উপর এই মিনার-চতুষ্টয় নির্ম্মিত হইয়াছে। হাইদ্রাবাদের ঠিক হৃদয় প্রদেশে এই কারুকার্য কীর্ত্তিটি বিরাজিত। ইমারতটির প্রত্যেক পার্শ্ব ১ শত ফিট। অলঙ্কৃত খিলানগুলি তলভূমি হইতে ৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। মিনারেট-গুলির উচ্চতা ২ শত ফিট। মহম্মদ কুলীই এই কীর্ত্তিরও স্থাপয়িতা। এই ইমারত স্থাপনের কারণ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ কহেন, নগরে ভয়াবহ মহামারী দেখা দিয়াছিল। পরে মহামারী দূর হইলে উহা হইতে অব্যাহতি পাইবার স্মৃতিচিহ্নরূপে এই মনোরম ইমারত নির্ম্মাণ করা হয়। চার মিনারকে গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী সুলতান বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করা যায়। ঠিক

এইরূপ মনোজ্ঞ মিনার-মণ্ডিত ইমারত সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আর নাই। যেমন কুতুবশাহী স্থপতিরা মনোরম মিনার নির্ম্মাণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তেমনই বিজাপুরী স্থাপত্যশিল্পীরা গুরু গম্ভীর গম্বুজ প্রস্তুত কার্য্যে নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে বলা চলে। হাইদ্রাবাদের চার মিনার এবং বিজাপুরের গোল গম্বুজ ইহারা এই দুই শ্রেণীর স্থপতিদের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি।

হাইদ্রাবাদ নগরবাসীদের বেড়াইবার এবং বসিয়া গল্প করিবার প্রধান স্থান এই চার মিনার। বিশেষতঃ বেকার ব্যক্তিদের গল্প-গুজবের ইহাই প্রধান জায়গা। 'চান মিনার গপ্'. একটা বাক্যেরই সৃষ্টি হইয়াছে। কোন অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য গল্প হইলে লোকে উহাকে চার মিনারী গপ্ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। অন্যান্য দর্শনীয়গুলির মধ্যে নিজামের কলঘরনামা নামক প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সুবিশাল সৌধের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দুইই চিত্তাকর্ষক। একটি পাহাড়ের উপর এই প্রাসাদটি প্রস্তুত। পাহাড়টির শীর্ষ হইতে সমগ্র নগরটির অত্যন্ত মনোজ্ঞ দৃশ্য শিল্পীর অঙ্কিত বিচিত্র চিত্রের মত দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হয়। একজন ওমরাহ এই প্রাসাদ প্রস্তুত করান। নিজাম ৩৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ইহা সেই ওমরাহের নিকট হইতে ক্রয় করেন। ভাইসরয়গণ হায়দ্রাবাদ যাইলে এই প্রাসাদ তাঁহাদের বাসস্থল নির্ব্বাচিত হইত।

হাইদ্রাবাদ নগর এক সময় চোরাই কারবারের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে চোর বাজার নামে বাজার অল্পদিন পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। এই চোর বাজারে চোরাই পণ্যের কারবার চলিত। বর্ত্তমানে চোর বাজার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর একটি অবাঞ্ছিত বস্তুও প্রায়ই বিলোপ পাইয়াছে। এই বস্তুটি বেশ্যালয়। মুসী নদীর তীরে বহু বেশ্যালয় পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। একবারকার প্রচণ্ড প্লাবনে বেশ্যা-গৃহগুলি ডুবিয়া ও ভাঙ্গিয়া যায়। তদনন্তর এই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারকে বিলুপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। ঐ চেষ্টা বহুপরিমাণে সফলও হইয়াছে। নূতন বিচারভবন, উচ্চ ইংরেজী স্কুল, শুশ্রূষাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি মনোমদ উদ্যানসমূহের বক্ষে বিরাজিত বলিয়া দর্শকমাত্রেরই হর্ষ সঞ্চারক। এইরূপ প্রীতিপ্রদ প্রাসাদ শুধু হাইদ্রাবাদে নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতে অতি অল্পই লক্ষিত হয়।

সেই গোলকোণ্ডা নগরী—যাহা হাইদারাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার হেতু এবং যাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ, উহা হাইদ্রাবাদ হইতে মাত্র ৫ মাইল দূরে বিরাজিত তাহা বলা হইয়াছে। গোলকোণ্ডার দুর্গটি ভারতবর্ষের শৈলশীর্ষস্থ দুর্গ-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৫ শত ফিট উচ্চ একটি গুরুগম্ভীর গিরির উপর দুর্গটি সুদক্ষ পটুয়া-প্রস্তুত পটের মত বিরাজিত রহিয়াছে। ৮৭টি ব্যাষ্টিয়ন বিশিষ্ট এই দুর্গের দৃঢ়তা বা দুর্জ্জয়তাও অনন্যসাধারণ। দুর্গ-প্রাচীরের প্রত্যেক কোনে ব্যাষ্টিয়ন। ব্যাষ্টিয়নের উপর আগ্নেয় অস্ত্র রক্ষিত থাকার প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কয়েকটি বৃহৎ বন্দুক রহিয়াছে। এই কুতবশাহী বন্দুকগুলি যেমন বড় তেমনই দৃঢ়। পশ্চিমদিকের ব্যাষ্টিয়নে ৫০ ফিট দীর্ঘ একটি কামান আজিও রক্ষিত আছে। এই ব্যাষ্টিয়নগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং বৃহদাকার গ্রানিটখণ্ডসমূহে নির্ম্মিত।

আদিতে গোলকোণ্ডা দুর্গটি অষ্টতোরণ-বিশিষ্ট ছিল, বর্ত্তমানে তোরণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট বলা চলে। এই তোরণগুলির নাম যথাক্রমে মক্কা, জামালি বাঞ্জারা ও ফতেহ। ইহাদের মধ্যে ফতেহ তোরণটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। ফতেহ তোরণের দরজাগুলি সেগুন কাষ্ঠে প্রস্তুত। দরজার গায়ে বর্শাকৃতি সূচ্যাগ্র লৌহ-সমূহ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। রণবারণগণকে নিবারণ করিবার জন্য এই লৌহগুলির দ্বারা দরজাকে মণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রাচীনকালে কোন দুর্গ আক্রমণ বা অধিকার করিবার কালে রণহস্তীগুলিই সর্ব্ব প্রধান সহায় ছিল। ফতেহ তোরণের নিকটে 'নবমান' নামক একটি সৌধ আছে। প্রাথমিক নিজামগণ

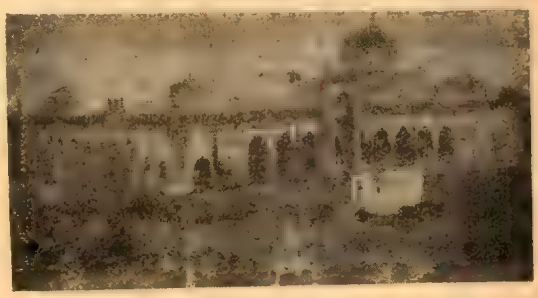

ওলবার্গা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ প্রসিদ্ধ উপাসনাগৃহ

এই সকল সৌধ বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করান এবং প্রত্যেক প্রাসাদেই গোলোকধাঁধাঁ বিদ্যমান আছে। নূতন লোকের পক্ষে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উহা হইতে বহির্গত হওয়া প্রায়ই অসম্ভব। পাছে কোন্ শত্রু পক্ষের লোক প্রবেশ করিয়া দুর্গ আক্রমণে সাহায্য করে বলিয়া এই সকল সৌধে গোলোক ধাঁধাঁ রচনা করা হইয়াছে।

গোলকোণ্ডা দুর্গের একটি কোণে একটি উচ্চ চত্বর রহিয়াছে।

চত্বরের বক্ষে কতকগুলি ছিদ্র বিদ্যমান। এই ছিদ্রপথে চাহিলে বুঝা যায় ভূগর্ভস্থ পথের সহায়তায় পাহাড়টির বক্ষঃস্থলে পৌঁছান যায়। একটি প্রাচীন প্রাসাদ দেখিলে বিচারভবন বলিয়া বুঝা যায়। এই ভগ্নপ্রায় প্রাসাদে যে বেদীবৎ উচ্চ স্থান প্রস্তুত আছে উহার উপর বসিয়া সুলতানরা বিচার করিতেন বলিয়া অনুমান হয়। সুড়ঙ্গাকৃতি যে পথ ভূগর্ভে রহিয়াছে উহা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী গোশামহল নামক সৌধ পর্য্যন্ত গিয়াছে বলিয়া জানা গেল। গোলকোণ্ডা দুর্গের শীর্ষ দেশে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহম্মদ কুলীর সমাধি—গোলকোণ্ডা

বিদার হাইদ্রাবাদ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। হাইদ্রাবাদ শহর হইতে ঔরঙ্গাবাদ যাইতে হইলে প্রায়ই অর্দ্ধ পথে বিদার পৌঁছান যায়। গোলকোণ্ডার ন্যায় বিদার দুর্গও বিখ্যাত! বিদার দুর্গ এখনও প্রায়ই অবিকৃত মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা আমাদের অন্তরে তাহার অতীত গৌরব সম্বন্ধে নানা কাহিনী জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে বিদার দুর্গও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। মালভূমির উপর দণ্ডায়মান এই দুর্গটির আয়তন প্রায় তিন মাইল এবং তিনটি পরিখার দ্বারা ইহাকে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিদার এক সময় বিশেষ মনোজ্ঞ নগর ছিল! ইহাকে কেন্দ্র করিয়াও কতিপয় বিচিত্র রোম্যান্স রচিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগ হইতে এই নগর প্রসিদ্ধ। ইহাই প্রাচীন বিদর্ভ। বিদার দুর্গের প্রধান প্রবেশতোরণটী গীর্জ্জা, দরজা বা সিংহদ্বার আখ্যায় অভিহিত। দুইটি সিংহমূর্ত্তি তোরণটির শীর্ষদেশে নির্ম্মিত রহিয়াছে! প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া সিংহদ্বয় প্রস্তুত। দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে রঙ্গীন মহল নামক একটি সৌধ রহিয়াছে। এই রঙ্গীন মহল বা বিচিত্র প্রাসাদ প্রাচীনকালে বিদারাধিপতিদের দ্বারা সাদরে ব্যবহৃত হইত। ইহার সৌন্দর্য্য আজিও আমাদিগকে চমৎকৃত করে। যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য এই প্রাসাদটি রঙ্গীন মহল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ এই সকল চিত্রণের ভিতর পারস্যের প্রভাব বিদ্যমান বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই মত কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। অজন্তার গুহাগাত্রে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পীর নিজস্ব, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। তবে মুসলমান সুলতানদের রাজত্বকালে ইরাণী শিল্পের প্রভাব সুলতান-শাসিত রাজ্যসমূহে সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব নহে। শিল্পীরা যে অঙ্কন ও চিত্রণ-নৈপুণ্য রঙ্গীন মহলে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। শিল্পীদের রচনা জ্যামিতিক ও পরিমিতিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। নীল রঙের ক্রমশঃ সবুজ ও বেগুনী বর্ণে পরিণতি বা স্বর্ণ ও গোলাপীর সহিত সম্মেলন এই মনোজ্ঞ মহলের 'রঙ্গীন' আখ্যাকে সার্থক করিয়াছে।

রঙ্গীন মহলের নিকটে গগন মহল ও তির্কাশ মহলের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গিনি মহল এবং নাগিন মহল বাহমনী সুলতানগণের অন্যতম মহম্মদ শাহের দ্বারা নির্ম্মিত। গগন মহলে বাহমনী সুলতানরা সপরিবারে বাস করিতেন এবং তির্কাশ মহলে তাঁহাদের দরবার বা বিচারস্থান বিদ্যমান ছিল। বিদার কিছুকাল বাহমনী সুলতানদের রাজধানী ছিল, ইহা এইস্থানে স্মরণীয়। বিদার হইতে উত্তর-পূর্ব্বে অল্পদূর আগাইয়া যাইলে কতকগুলি সমাধি-মন্দির বিক্ষিপ্তভাবে দণ্ডায়মান দেখা যায়। এই সমাধি-মন্দিরসমূহের সবগুলিই বাহমনী বংশীয় সুলতানদের। প্রত্যেক সমাধিমন্দির গুরু গম্ভীর গম্বুজে মণ্ডিত হইয়া মনোমুগ্ধকর।

বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন গঙ্গু বাহমনী গুলবার্গাকে তাঁহার রাজধানী করিয়াছিলেন। গুলবার্গায় এমন একটি মসজিদ আছে, যাহা শুধু হাইদ্রাবাদের মধ্যে নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে অতুলনীয় বলা যায়। সমগ্র উপাসনাগারটি এমনভাবে ছাদের দ্বারা মণ্ডিত যে, বহু উপাসনার্থী সমবেত হইলেও সকলের পক্ষেই সুন্দর আশ্রয়প্রাপ্তি সম্ভব হইবে। যতই ঝড়-বৃষ্টি হউক এই মসজিদে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কোন প্রকার আশঙ্কাই থাকিবে না! গুলবার্গা দুর্গের পশ্চিমে বাহমনীবংশ-প্রতিষ্ঠাতা হুসেন গঙ্গুর সমাধিগৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফিরোজশাহ বাহমনীর সমাধিমন্দিরও গুলবার্গায় বিদ্যমান। হাইদ্রাবাদ রাজ্যের অরা

একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় রাইচুর। রাইচুর দুর্গ বিশেষ দর্শনযোগ্য। গিরিগাত্র উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত এই দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গকে নৈসর্গিক ও মানবিক অবদানের সমবায় বলা যায়। মানুষ নিসর্গের দানকে আপনার শক্তির দ্বারা অধিকতর কার্যাকর করিয়া তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উভয়ের পক্ষেই হাইদ্রাবাদের এই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া ইহার জন্য বহু সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। এই কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রাপরিষিক্ত প্রদেশকে প্রাপ্ত হইবার জন্য দক্ষিণাপথের প্রত্যেক রাজশক্তিই লালসা-লোলুপ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ক্রমান্বয়ে গুলবার্গার বাহ্মনী বংশীয় সুলতানদের, বিজাপুরাধিপতিদের এবং বিজয় নগরের অধিকার গত হইয়াছিল।

ঔরঙ্গাবাদ নগর হাইদ্রাবাদের সুবা বা বিভাগসমূহের অন্যতম ঔরঙ্গাবাদের কেন্দ্রস্থল। ঔরঙ্গাবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। হাইদ্রাবাদ রাজ্যের বিভাগসমূহের মধ্যে ঔরঙ্গাবাদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রিয় বাসস্থল রূপে ইহা মোগল যুগ হইতে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। ঔরঙ্গজেবের নাম হইতে ঔরঙ্গাবাদ নামের সৃষ্টি। হাইদ্রাবাদ রাজ্যের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী এই অংশের আয়তন প্রায় ৭ হাজার ৫ শত বর্গমাইল। মালিক অম্বর ঔরঙ্গাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর প্রাচীন কির্কীনামক গ্রামকে নগরে পরিণত করেন। মালিক অম্বরের পুত্র ফতেহ খাঁ পিতার মৃত্যুর পর এই নগরকে ফতেহ নগর আখ্যায় অভিহিত করেন। পরে ঔরঙ্গজেব পিতার রাজত্ব-কালে দক্ষিণ ভারতের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় এই নগরকে ঔরঙ্গাবাদ নাম প্রদান করেন। কিছুকাল যাবৎ এই নগর মোগল সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ছিল বলিলে ভুল হয় না। ঔরঙ্গাবাদের যে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার বহু অংশ ঔরঙ্গজেবের দান। এই নগরের অতীত গৌরবের অধিকাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঔরঙ্গাবাদ নগরের চারিটি প্রবেশতোরণ বিদ্যমান—মক্কা তোরণ, জালনা তোরণ, দিল্লী তোরণ, পইঠান তোরণ। উত্তর দিক হইতে এই নগরে প্রবেশ করিলে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অতি প্রাচীনকালেও এই স্থানটি গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শালিবাহন নামক বিখ্যাত নৃপতি এখানকার পইঠন নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতেন। রাজা শালিবাহন শুধু একটি রাজবংশের নয়, একটি নূতন অব্দের প্রতিষ্ঠাতা। শালিবাহনাব্দ এই অঞ্চলে এক সময়ে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের দ্বারা দাক্ষিণাত্য আক্রমণ ঔরঙ্গাবাদেই প্রথম সঙ্ঘটিত হয়। নিজামের বাহিনীর সহিত ফরাসী বাহিনীর সঙ্ঘর্ষের জন্য এই স্থান ঐতিহাসিকের নিকট উল্লেখনীয় হইয়া আছে। ঔরঙ্গজেবের পত্নী বিবি আকবারার সমাধি এখানকার দর্শনীয়সমূহের অন্যতম। ৭লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে ইহা প্রস্তুত হয়। আগ্রার অনুপম কীর্ত্তি তাজমহলের আদর্শে ইহা নির্ম্মিত হয়।

আসফজাহী সেতু (ইহা অজন্তা যাইবার পথে অবস্থিত)

ঔরঙ্গাবাদের দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রোজাকে সমাধিসৌধসমূহের শহর বলা যায়। ঔরঙ্গাবাদ জীবিতের এবং রোজা মৃতের বাসস্থল বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। প্রসিদ্ধনামা মুসলমান সাধু ও শাসনকর্ত্তা সমূহের সমাধি এই নগরের বৈশিষ্ট্য। রোজা শব্দের অর্থ স্বর্গীয় আবাস। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইবার পর তাঁহার পার্থিব দেহ এখানে সমাহিত হয় এবং ঐ ব্যাপারের পর এই স্থানটিকে রোজা নাম প্রদান করা হয়। প্রায় দেড় হাজার সমাধি এখানে দেখা যায়। ঔরঙ্গজেব নির্দ্দেশ দিয়া যান তাঁহার সমাধি যেন সাদাসিধা হয়। সেই নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার সমাধি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বা সাদাসিধাই ছিল। কিছুকাল বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের আদেশে সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত আবেষ্টনী সমাধির চতুর্দ্দিকে রচনা করা হইয়াছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধির নিকটে আর একজন বিখ্যাতনামা ব্যক্তির সমাধি বিরাজিত রহিয়াছে। এই বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আসফ জাহ। বর্ত্তমান নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইনি। পূর্ব্বে নিজামশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে আসফজাহী

শাসন স্থাপিত হয়। আসফ জাহের এক পত্নীর সমাধিও এই স্থানেই রহিয়াছে। পতি-পত্নী পাশাপাশি মহানিদ্রায় নিমগ্ন আছেন। শ্বেত মর্ম্মর এবং লোহিত বালুকাপ্রস্তরে মণ্ডিত এই সমাধিদ্বয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক। প্রথম নিজামের সমাধির সন্নিকটে

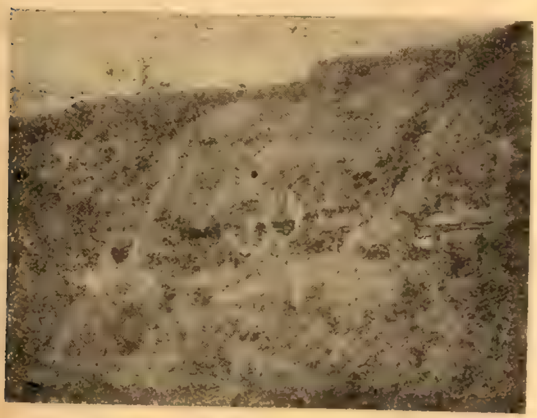

অজন্তার একটি দৃশ্য

প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সৈয়দ হজরৎ বুরহানুদ্দিনের সমাধি। এই সাধু ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে রোজায় অবস্থানকালে পরলোক প্রাপ্ত হন। এই সমাধির দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্থানে দর্শনার্থীদিগকে কতিপয় রজতখণ্ড দেখান হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি আশ্চর্য্য কাহিনীও কথিত হইয়া থাকে। সাধু বুরহানুদ্দিনের শিষ্যগণ গুরুর মৃত্যুর পর দুরবস্থায় পতিত হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট সেই দুরবস্থা বা দৈন্য দূর করিবার উপায় প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঐ স্থানে কতকগুলি রৌপ্যবৃক্ষ রাতারাতি উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষগুলি হইতে রৌপ্যখণ্ড কাটিয়া কাটিয়া লইয়া সাধুর শিষ্যগণ আপনাদিগের ব্যয় (ঐ রৌপ্য বাজারে বিক্রয় করিয়া) নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। যে রৌপ্যখণ্ডগুলি দেখান হয় উহা সেই রৌপ্যগুলির অবশেষ বলিয়া বিবেচিত হয়। পরে সাধুর শিষ্যদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটা জায়গীর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অর্পিত হয়।

হজরৎ সৈয়দ জৈনুদ্দিনের সমাধি রোজার আর একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় দ্রব্য। একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত আবেষ্টনীর মধ্যস্থলে এই সাধুর সমাধি বিরাজিত। এই সমাধি হইতে অদূরে গোলকোণ্ডার শেষ সুলতান আবুল হাসান কুতুব শাহের সমাধি বিদ্যমান। মোগল সরকারের আদেশে ইহাকে দৌলতাবাদ দুর্গে দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া বন্দী করিয়া রাখা হয়। পরে নিজাম কর্ত্তৃক এই সহৃদয় ও বদান্য সুলতানের সমাধিকে সুন্দরতর করার চেষ্টা অভিভূত হইয়াছে। রোজা ধ্বংসোন্মুখ হইলেও পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।

দৌলতাবাদ দুর্গ ঔরঙ্গাবাদ হইতে সাতমাইল উত্তর-পশ্চিমে। সুক্ষ্মাগ্র শীর্ষসমন্বিত একটি শৈলের মস্তকে ইহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শৈলটি ৫শত ফিট উচ্চ। দুর্গের বহিঃপ্রাচীর তিনমাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। তিনটি প্রাচীরের দ্বারা দুর্গটিকে দুর্গম করিয়া তুলা হইয়াছে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা বাহমনী-বংশের অধিকৃত ছিল। পরে হাইদ্রাবাদ নিজামশাহী নৃপগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সম্রাট আকবর ঐ নৃপগণের হস্ত হইতে ইহা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হন। পরে মোগলদিগের পতনে ইহা আসফজাহী নিজামগণের অধিকারে আসে।

অজন্তা এবং এলোরার গুহাগৃহসমূহ হাইদ্রাবাদের ঔরঙ্গাবাদ বিভাগের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অজন্তা এবং এলোরার গুহা-গৃহাবলী—উভয়ের পার্থক্য কি—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। অজন্তার গুহাগৃহগুলির প্রায় সবই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এলোরায় যে সকল গুহাগৃহ রহিয়াছে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। অজন্তা ও এলোরার কথা সংক্ষেপে বলা সম্ভব নহে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এরূপ গুহাগৃহ আর নাই। এই অতুলনীয় দৃশ্যগুলি হাইদ্রাবাদ রাজ্যে বিরাজিত রহিয়া এই রাজ্যকে পর্য্যটক ও পরিদর্শক উভয়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যদর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যে সকল বিস্ময়কর বস্তু দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে সমুচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া থাকেন অজন্তা ও এলোরার সুন্দরতম কন্দর-মন্দিরাবলী তাহাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। স্বতন্ত্র নিবন্ধ ব্যতিরেকে ইহাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করা চলে না।

চোর এসেছিল

মুসাফির

চোর এসেছিল দুপুর রাতে।

রাত দুটোর কম হবে না। ছোড়দির কোলের ছেলেটা রোজ রাত দুটোর সময় কেঁদে ওঠে। সেদিন কিন্তু কাঁদল না, তবে জেগে ছটফট করতে লাগল। ছোড়দির ঘুমটা ভেঙে গেল। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হবে এ খেয়ালটা ছোড়দির আছে, কটা বাজলো তার আন্দাজ ঠিক পাওয়া গেল না। তবু ব্লাউজের বোতাম দুটো খুলে বাইরের বোঁটাটি বের করে ছেলের মুখে পুরে দিল। তারপর রাত্রির আধনেভা স্তিমিত আলোয় টেবিলে রাখা ঘড়িটায় কটা বেজেছে দেখবার চেষ্টা করল। হঠাৎ নজরে পড়ল দেয়ালের কোল ঘেঁসে রাখা স্যুটকেশ দুটো ওখানে নেই। তারপর একটি কালো মূর্তি ছায়ার মত ছোড়দির চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। তারপর আর একটি ছায়া মূর্তি। ভয়ে ছোড়দির মুখ শুকিয়ে গেল, 'চোর' এই কথাটা উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারলে না। তারপর ছোড়দি চোখের সামনেই দেখলে দুটো লোক তার ভারী ট্রাঙ্কটা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল।

লোক দুটো বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দি প্রাণপণ শক্তিতে 'চোর' বলে একটা চীৎকার দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে দুপদাপ কয়েকটা পায়ের আওয়াজও হ'ল। ছোড়দি পরিষ্কার বুঝতে পারলে চোরগুলো পালিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দির সর্ব্বস্বও গেল। ছোড়দি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

পাশের ঘরে নন্দু শুয়েছিল। কদিন থেকে ওর শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না, রাতেও ভাল ঘুম হ'ত না। ছোড়দির 'চোর' চীৎকার নন্দুর কাণে এসে পৌছল, তখন তার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। এ অবস্থায় নন্দুর কিছু করবার কোন উপায় ছিল না, তবে কদিন থেকে পাড়ায় চোরের উপদ্রব খুব বেড়েছে এ রকম কথা সে অনেক শুনেছে। তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ই চোর চোর চোর বলে তিনবার চেঁচিয়ে উঠল।

নন্দিতা ও চিত্রার ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু ওরা ছেলে মানুষ, ভয়টাই ওদের কাবু করে দিল। ওরা লেপটাকে টেনে আরো ভেতরে ঢুকে গেল।

তার পাশের ঘরে সেজদা শুয়ে ছিলেন। তার পাতলা ঘুম। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন এবং চোর চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বাইরে যাবার জন্য দরজাটা খুলতে গেলেন। সেজ বৌদি বাধা দিলেন: তুমি কি ক্ষেপলে নাকি; একটা অন্ততঃ লাঠিও হাতে নাও, টর্চটা নাও।

ঘরের আলোটা জ্বালা হ'ল। টর্চ বা লাঠি কিছুই পাওয়া গেল না। তবু সেজদা দরজাটা খুলে বারান্দায় গেলেন এবং বারান্দার আলোগুলো সব জ্বেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন হাঁক ডাক দিতে সুরু করলেন যে বাড়ী শুদ্ধ সব লোক জেগে গেল, মায় ঠাকুর চাকর পর্য্যন্ত। তারপর লাঠি, বাঁশ, খন্তি, বল্লম জাতীয় এন্টা জিনিষ এবং দুটো টর্চ নিয়ে সমস্ত বাড়ী, সমস্ত উঠোন, গ্যারেজ, গোয়াল ঘর, বাগান বাগিচা সব তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। কিন্তু চোরগুলোর টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না। সেজদা আফশোষ করে বললেন: সব বেটা ভেগেছে।

ছোড়দি মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসে গেল,—আমার সব গেছে, একটা শাড়ীও রইল না।

ছোড়দির ছেলেটাও মহা কান্না জুড়ে দিল।

সেজ বৌদি এসে ছোড়দিকে এক ধমক দিলেন, তুমি বুড়ো ঢেঁকি মেয়ে, কাঁদতে বসেছো কি জন্যে? ছেলেটা যে এদিকে কেঁদে কেঁদে সারা হ'ল, ওকে ঠাণ্ডা কর।

ছোড়দি চোখ মুছে বললে—তুমি বুঝছো না সেজো বৌঠান, আমার যথাসর্ব্বস্ব চোরে নিয়ে গেছে।

—এ্যাঁ, বলো কী?

অনিল সঙ্গে সঙ্গে থানায় টেলিফোন করতে গেল, আর একদল আবার ছুটল বাইরে ভাল করে খুঁজে দেখতে।

এবারে কয়লা রাখবার ঘরের কাছে স্যুটকেস দুটোকে খোলা অবস্থায় পাওয়া গেল, তার একটু দূরে ট্রাঙ্কটাও। সেজদা সেগুলোকে নিয়ে ঘরে চলে এলেন। ও-গুলোর ওই দুরবস্থা দেখে ছোড়দির চোখ দুটো আবার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। অনিল খবর দিল—দারোগা আসছে।

চোর কেমন করে বাড়ীর ভেতর ঢুকল এইবার তার খোঁজ পড়ল। ছোড়দির পাশের ঘরটা খালি থাকতো। কাপড় ছাড়বার ঘর হিসেবে সেটা ব্যবহৃত হ'ত রাতে কেউ থাকতো না সে-ঘরে। কেউ থাকতো না বলেই ছোড়দি তার ছেলের ভেজা কাঁথা সে-ঘরে শুকোতে দিত। ঘরময় দড়ি টানানো ছিল। ঘরে ঢুকেই দেখা গেল দড়িগুলো সব কাটা। ভেজা কাঁথা, সাড়ী, ব্লাউজ সব মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। দুটো জানালার একটা জানালা খোলা। মোটা মোটা লোহার গরাদগুলো দুমড়ে বাঁকানো। সেই ফাঁক দিয়ে একজন লোক অনায়াসে ঢুকতে পারে। জানালার পাশের দরজাটাও খোলা।

অনিল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বললে: এই দেখ কেমন করে চোর এসেছিল।

জানালাটার বাইরে একটা মস্তবড় টেবিল ছিল। সে টেবিলটা দেখা গেল—বারান্দা থেকে নামিয়ে অনেক দূরে উঠোনে রাখা রয়েছে। অনিল হিসেব করে বললে: খুব কম হলেও চারটে চোর এসেছিল।

তার পর পুলিশের দারোগা এল। চারদিক দেখে শুনে সব লিখে নিল। আবার সকালে আসব বলে চলে গেল।

তখনো অনেক রাত। ঘড়ির কাঁটায় চারটে বাজলে কি হবে, শীতের রাত সহজে ফুরোতে চায় না। কিন্তু ওই ঘরটাকে তো ওরকম অবস্থায় রেখে আর ঘুমোনো যায় না, তাই শুভেন্দু, দিব্যেন্দু, নন্দিতা, চিত্রা—এদের বলা হ'ল এই ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে গল্প করতে। তারাও রাজী হয়ে গেল। নন্দিতা বললে: চল, আমরা বসে বসে লুডো খেলি।

পরদিন সকালে আবার বাড়ীটার চারদিকে খোঁজা হল। কতকগুলো জামা কাপড় সেমিজ-ব্লাউজ পাওয়া গেল। এগুলো সাধারণ কাপড়। ছোড়দি বললে—ভাল ভাল কাপড়গুলো আমার ট্রাঙ্কটায় ছিল সিল্কের সাড়ী, বেনারসী সাড়ী, জর্জেট, ক্রেপস্ত সাইন ইত্যাদি মোট ষোল সতেরোখানা। আর ছিল এক জোড়া দুল। এ সব কিছুই পাওয়া গেল না।

বাগানে একটা ফুলগাছের ডালে একটা রুমাল পাওয়া গেল। রুমালের কোনে কয়েকটা টাকা বাঁধা ছিল। পরিষ্কার বোঝা গেল সেগুলো চোরেরা খুলে নিয়েছে।

দশটার সময় পুলিশের দারোগা আবার এল। রাত্রি বেলা ভাল করে দেখা হয় নি, তাই দিনের আলোয় আর একবার ভাল করে দেখা হ'ল। চারদিক দেখে দারোগা বাবু মাথা নেড়ে বললেন: এ চোর বাইরের লোক, স্থানীয় চোরের এ রকম সাহস হবে না।

অনিল বললে: কিন্তু ওরা খবর রেখেছে অনেক। ও ঘরটায় কেউ থাকে না, এ খবর ওরা নিশ্চয়ই জানতো।

দারোগা বাবু বললেন: এ সব খবর নিতে বিশেষ অসুবিধা নেই কয়েকটা ফেরীওয়ালা দিন কয়েক আসলেই বাড়ীর সব খবর তারা টের পেয়ে যায়।

ছোড়দি বললে—ঠিক তো। কয়েকদিন ধরে নূতন নূতন ফেরীআলা আসতে সুরু করেছে।

দারোগাবাবু বললেন, আমিও তাই সন্দেহ করছিলাম।

অনিল বললে: তাহলে কি চোর ধরা যাবে না?

ছোড়দি বললে: পুলিশের লোকেরা চোর ধরবে তা' হলেই হয়েছে। পুরস্কারের লোভ না দেখালে ওরা কোন কাজই করে না। তুমি ওদের বলে দাও—সাড়ীগুলো যদি উদ্ধার করে দিতে পারে, তাহলে একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কথাটা অনিলকে বলা হ'ল, কিন্তু এমন ভাবে বলা হ'ল যেন দারোগা বাবু সব কথা শুনতে পান। দারোগা বাবু কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না, শুধু বললেন: বাইরের চোর, তা ছাড়া পাটনায় এত রিফিউজির আমদানী হয়েছে যে, কে চোর আর কে চোর নয় চেনাই মুস্কিল।

বিকেলে জামাই বাবু এলেন। তিনি সব শুনলেন

কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। ছোড়দির ঘুমটা যদি আর একটু দেরী করে ভাঙতো তাহলে গহনার বাক্সটাও উধাও হ'ত। সেটা যে যায়নি তার ওপর তিনি বেশ জোর দিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রকারান্তরে বোঝাতে চাইলেন যে, কাপড় গেছে গেছে, গহনাগুলো গেলে আরো সর্বনাশ হতো।

জামাইবাবুকে দেখে ছোড়দির দুঃখ যেন আরো উৎলে উঠল। বললে—অতগুলো শাড়ী, আর কি কোনদিন হবে ?

বাইরে বাগানে মজুররা কাজ করছিল, একটা দেওয়াল মেরামত করছিল। কাজ শেষ করে ওরা চলে যাবে এমন সময় ওদের নজরে পড়ল একটা কাঠের তক্তার নীচে লাল নীল কি সব দেখা যাচ্ছে। তক্তটা সরিয়ে নিতেই দেখা গেল অনেকগুলো দামী শাড়ী বোচকা বাঁধা অবস্থায় রাখা রয়েছে। ছোড়দি বললে—এই তো আমার ট্রাঙ্কের শাড়ীগুলি।

শাড়ীগুলো গোণা হ'ল। সবই মিলে গেল, একটাও কম হ'ল না। অনিল বল্লে—তাড়াহুড়ো করবার জন্তে শাড়ীগুলো আর নিয়ে যেতে পারে নি।

জামাইবাবু বললেন, কিম্বা চোরের উপর বাটপারি করবার জন্ত ওগুলো হয় ত কেউ সরিয়ে রেখেছিল, তাড়াহুড়ো করায় ওগুলো ফেলেই পালিয়েছে

অনিল বললেন—তার মানে ওরা আজকে আবার আসবে—তাহলে তো আজকে জেগে জেগে ঘুমোতে হবে।

সেজ বৌদি বললে—যাক, আসল জিনিষগুলি পাওয়া গেছে, ভালই হয়েছে। এখন তো দাম দিলেও এ সব শাড়ী বাজারে পাওয়া যাবে না।

সকলেই মনে মনে খুসি হ'ল কিন্তু ছোড়দির দুঃখ তবুও কমল না। বললে—রোজ পরবার শাড়ীই তো দুটো কমে গেল। তা-ও কি এই কণ্ট্রোলের বাজারে সহজে পাওয়া যাবে নাকি! তা ছাড়া চোরগুলোকে ধরা দরকার, ওদের শাস্তি হওয়াও দরকার।

জামাইবাবু বললেন—কে কাকে শাস্তি দেবে! তোমাদের পুলিশের লোকেরাই কি সাধু নাকি? আর তোমাদের গভর্ণমেণ্ট বা মিনিষ্টারেরাই বা কি?

ছোড়দি বললে—তুমি চুপ করো তো, কথায় কথায় শুধু রাজনীতি এনে ফেলতে চাও। অত তর্ক বাপু পোষায় না; চোরে কাপড় চুরি করে নিয়ে যাবে তবুও কিছু বলতে পারবো না, এ বড় মুস্কিলের কথা।

জামাই বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমাদের বোঝানো মুস্কিল। তোমরা এটুকু কেন বুঝছো না, যে মানুষ বুদ্ধ হতে পারতো, যে মানুষ বিবেকানন্দ হতে পারতো, যে মানুষ মহাত্মা গান্ধীও হতে পারতো, সমাজের চাপে পড়ে সেই মানুষ হয়ে উঠেছে চোর। অথচ এর জন্ত তোমাদের মনে কোন দুঃখ নেই। তোমাদের দুঃখ হ'ল ছাব্বিশখানা শাড়ীর ভেতর একটা ছেঁড়া শাড়ী কেন পাওয়া গেল না। আমরাই আবার সভ্যতা নিয়ে বুক ফুলিয়ে গর্ব করি।

সন্ধ্যার পর জামাই বাবু চলে গেলেন। সকলেই রাতটা থেকে যেতে বললে, কিন্তু জামাইবাবু শুনলেন না। রাতে আবার চোর আসতে পারে এ রকম আশঙ্কা আমাদের সকলের মনেই হয়েছিল, তাই খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। তারপর শুয়ে ঘুম আর কিছুতেই আসতে চাইছিল না। বারে বারে জামাইবাবুর কথাগুলো মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। সত্যিই তো মানুষ ভালো, সুন্দর এবং মহৎ হতে পারে, কিন্তু তা হয় না কেন?

রাত্রির অন্ধকার এই কেন'র কোন জবাব দিতে পারলো না।

C. A.
GM-ROOM

শরৎচন্দ্রের "শেষের পরিচয়"

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

আমরা বিনা দ্বিধায় ভাবিয়া লইতে পারি যে, অন্ততঃ ফটো তোলার সময় পর্য্যন্ত সবিতার মন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করত রমণীর যত্ন করিত; রমণীর কটু স্বভাব আর ইতরামি সবিতাকে বিদ্ধ ও ক্ষুব্ধ করিত; আর, তার যৌন যোগ্যতা তাহাকে তৃপ্ত করিত। নতুবা ১৩টি বৎসর কেমন করিয়া আর কি কারণে রমণীর সঙ্গে সে বাস করিয়াছে?

আমরা শীঘ্রই রমণীরই একটি প্রশ্ন পাইব।

"তখন থেকেই ভেবে রেখেছি ছবির মালিককে একবার শেষ দেখব। সে সাধ আজ মিটল"—উদ্ধরণ এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

সাধ মিটিবার বিগলিত সুসংবাদ দিয়া বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন: "চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন কয়েকের সমুদ্রযাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস্ ষ্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ী আছে, তার উপর-তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত' জানবো, এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।"

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত' কথা দিয়েছি, বিমল বাবু, আমি আসছে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হলো সকলের আগে।

বিমল বাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়ত এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে কহিলেন, অনুমতি হয় তো উদ্যোগ-আয়োজন করি—আমার আফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়ীটার কোথাও যেন ত্রুটি না থাকে। কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, না, এখনও কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন,—কেন সুবিধে হবে না শুনি? লেখাপড়া কালপরশু শেষ হয়ে যাবে, দরওয়ান চাকর বাড়ীতে রইল, ভাড়াটেরাও রইল, বাধার বাধাটা কি? না সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখাশোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু অবশ্য সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখোচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিলেন, না। আমি যেতে পারব না।"

মানবচিত্তের গঠনবৈচিত্র্যে এবং গতি পরিবর্ত্তনের ভিতর ইহার অপেক্ষা অনুচিতভাবে অসুন্দর আর কি হইতে পারে? প্রস্তাব আসিয়াছে: শরীর শুধরাইতে সমুদ্রযাত্রাপূর্ব্বক সিঙ্গাপুরে যাইতে হইবে; সেখানে বিমল বাবুর এমন একখানা বাড়ী আছে যার "উপর তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়" এবং সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য্যোদয়-সূর্য্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়।" খুবই হৃদ্য লোভনীয় প্রস্তাব; কিন্তু সবিতা সম্মত হইতে পারিতেছে না, কারণ তার কন্যার সম্বন্ধে এখনই দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে—কন্যা রেণু অত্যন্ত অসুস্থ, সে কোথায় কি অবস্থায় আছে কে জানে। নিরীহ এবং অপটুদেহ সেজকর্ত্তা স্থানভ্রষ্ট হইয়া আর দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া তার কশাঘাতে বেদনাযুক্ত হৃদয়ে এবং মেয়েকে লইয়া কত বিপন্ন অসহায়-দিশেহারা হইয়াছেন তারই বা ঠিক কি। সবিতার মন সেই মুহূর্ত্তে, মেয়েকে তল্লাস করিয়া বিফলমনোরথ হইবার পর, বেদনায় আর উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। দেহ বদলাইবার আর বিমলবাবুর বাড়ীর উপর তলায় বসিয়া সমুদ্রের হাওয়া খাইবার এবং সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্যের

উদয়-অস্ত দেখিবার অর্থাৎ বাবুয়ানির বিস্তর ঘটা করিয়া সোল্লাসে বিলাসায়োজন করিবার প্রস্তাব তার ভাল লাগিবে কেন। সে অস্বীকার করিল; বলিল,—"না আমি যেতে পারব না।"

অস্বীকার করা খুবই সঙ্গত হইয়াছে—৩ বছরের যে মেয়েকে সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সে বুঝি আজ একযুগ পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু বিমল বাবুর 'তার' করিয়া দিবার কথায় "জবাব দিতে গিয় একবার দুজনের চোখাচোখি" হইতেই "সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত" করিল কেন? হঠাৎ ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো ঠেকে; কিন্তু হেঁয়ালি তা' নয়। শরৎচন্দ্রকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া শব্দ প্রয়োগ এবং বাক্যগঠন করিতে দেখি। কাজেই প্রকাশভঙ্গীর চরণ মনে হইতেছে, ব্যাপারটা সরল নয় লেখক অনন্যসুলভ পার দর্শিতার সহিত একটা দিকে নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিমল বাবু প্রবীণ ব্যক্তি, রমণীর পরম বন্ধু সবিতারও এতদিনে বেশ বয়স হইয়াছে; বিমলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার প্রস্তাবটা সে নবীনা যুবতীর মতো, লজ্জার দোহাই দিয়া নাকচ করিতে চাহে নাই এতক্ষণ লজ্জার বাধা না পাইয়া অসংকোচে বিমল বাবুর সঙ্গে সে বার্তা কথাও কহিয়াছে। হঠাৎ চোখাচোখি হইতেই লজ্জা অনুভব করিবে কেন?

প্রকাশভঙ্গীর কথা বলিয়াছি। "চোখাচোখি" শব্দটার ভিতরেই একটা ভাবোন্মুখতা আছে। চোখের উপর চোখ পড়ার সরল সহজ ঘটনাটাই বাক্যে প্রকাশ করার দরকার যদি লেখকের হইয়াছিল তবে তিনি বলিতে পারিতেন, মুখের দিকে দৃষ্টি (অথবা চোখ তুলিয়া কিংবা 'এবার সোজা মুখের দিকে তাকাইয়া' সবিতা বলিল—"না। আমি যেতে পারব না।" শরৎচন্দ্র তেমন করিয়া কথাটা বলেন নাই—লিখিয়াছেন "এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল।"—

আমরা অনুমান করি, "স্বাস্থ্য এবং রূপে পরিপূর্ণ" বিমলবাবুকে প্রথম দর্শনেই সবিতার প্রাণে অনুরাগরক্ত কিংশুকের মুকুলোদ্গম হইয়াছে; কিন্তু ঐ উদ্গম অনুচিত কারণ সবিতার মনের অবস্থা তখন মোটেই অনুকূল নয় তবে কি মনে করিতে হইবে সবিতা অত্যন্ত চপলচিত্ত যৌন-কাতর বলিয়া এই বিকার সম্ভব হইয়াছে? সবিতার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া মর্য্যাদা যতই থাক, আর রাখাল যতই অবাক হইয়া তাহা দেখুক, পদে পদে সে নিজের মর্য্যাদা হানিই করিতেছে সন্দেহ নাই।

আমরা এই অবস্থায় স্মরণ করিতে পারি যে, ব্রজবাবুর গৃহে রমণীর আগমনের সময় ব্রজবাবুর "বয়স হইয়াছে"—সবিতার ভাষায়: "আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।" আবার রমণীর গৃহে "স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ" বিমল বাবুর আগমনের সময় রমণী "অতি প্রৌঢ়", সবিতা সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে একটু ঝুঁকিবে বই কি!

সবিতা "না। আমি যেতে পারব না" বলার পর যাহা ঘটিল তাহা এই:

"রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, না কেন? আমি বলচি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু? বেঁধে?

—হাঁ, দরকার হয় ত তাই।

—তা' হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না।

কি জানি, ঠিক প্রবেশ মুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁর শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কি না। বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি, আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরে হয় তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু যাবার পূর্ব্বে আমার অনুরোধ রইল, আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড্ টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে; দেখি কতবার 'না' বলে তাঁর জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন; বলিলেন, নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু, আমি চললুম।"

বিমলবাবু রমণীবাবুর গাজুরি কথায় আর জুলুমের উদ্যম দেখিয়া অপ্রসন্ন হইয়াছেন দেখা গেল। কিন্তু ঐ রকম মনে হইলেও অভ্যন্তরবর্তী কথা আরও গভীর; বিমল বাবুর রাগের কারণ রমণীর কর্কশতা নিশ্চয়ই। উপভোগার্থে বাঞ্ছনীয়া এবং সম্ভবতঃ প্রাপ্যাই এই

সুকুমার-কলেবর নারীর উপর আসুরিক শক্তিপ্রয়োগ, এবং তাহার সেই পেলবতায় আঘাত বিমলবাবুর ঠিক বরদাস্ত হয় নাই। নারীর পেলবতা ফুলের পেলবতার মতোই পরম যত্নে, এমন কি সংগ্রাম করিয়াও নিরাপদে রাখার মতো অমূল্য জিনিষ—তাহাকে যে ম্লান করিয়া দেয় এবং সেখানে যে চাবুক চালায় কি আঁচ লাগায় তাহাকে সহ্য করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কাজেই একটা অপ্রসন্নতা লইয়া বিমলবাবু "বাহির, হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল, হয় তো তাহা সত্য নয়"।

তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা পরে দেখা যাইবে এবং সত্য মিথ্যা যাহাই দেখা যাউক, একটা কথা অকাট্য হইয়াই দেখা দিবে যে, বিমলবাবু উপরে সাদা আর ভিতরে কালো অর্থাৎ ছদ্মবেশী সাধু, এবং অত্যন্ত নারী-লোভী।

বিমলবাবু সবিতাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রমণীও নীচে নামিয়া গেলেন; কিন্তু বিমল বাবুর বোম্বাই হইয়া জাহাজে সোজা কর্মস্থলে যাওয়া হইবে না—বোধ হয় বিধেয়বশতঃই গ্রহ বাগড়া দিবে। আমরা দেখিতে পাইব, বিমলবাবু আবার তল্লাস লইতে আসিয়াছেন, সবিতা দেবী কুশলে আছেন, না, শারীরিক অকুশল তেমনি আছে? তিনি তারপর আবারও আসিবেন এবং পুনঃপুনঃ আসিতেই থাকিবেন; কারণ তার জ্যাঠামশাই, বাবার খুড়তুতো ভাই, বড়ই পীড়িত থাকায় তিনি সমুদ্র-যাত্রা স্থগিত রাখিবেন এবং আরো দেখা যাইবে, যথেষ্ট আনন্দপ্রদ প্রচুর অবসর তিনি পাইয়াছেন—জ্যাঠা-মশাইয়ের জন্য যতটা উদ্বেগ তাঁর আছে, ততোধিক উদ্বেগ তাঁর জন্মিয়াছে সবিতার শরীর তত ভাল যাইতেছে না দেখিয়া।

তাঁহার কথা পরে হইবে—

আপাততঃ দেখুন, রমণীবাবু মাননীয় অতিথি-বন্ধুকে বিদায় দিয়া নীচ হইতে আবার উপরে উঠিয়া আসিলেন—আসিলেন সোজা একেবারে সেই ঘরে যে ঘরে সবিতা নিতান্ত মনমরা অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন—বলিতে পারা যায়, দুষ্ট সরস্বতীকে কণ্ঠে বসাইয়া দিয়া দৈব একযেয়ে রমণীবাবুকে সেখানে টানিয়া আনিল; কারণ, দৈবের অধিকর্তার প্রিয়পাত্র বিমলবাবুর জন্য স্থান চাই।

দৈবের বিধেয়, চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রবশতঃ তাই সবিতার সঙ্গে রমণীর কলহ বাধিয়া গেল। রাগের মাথায় আর ঝগড়ার ঝোঁকে লোকে যা' তা' বলে, প্রেমাস্পদকে ধুলিসাৎ করিয়া দিতে চায়, মিথ্যা দোষারোপ করিয়া প্রিয়পাত্রকে অপদস্থ করে, সম্মুখ হইতে খেদাইয়া দেয়; এমন কি, প্রিয়জনকে 'মর্' বলিয়া গা'লও দেয়; প্রাত্যহিক কাজে আচরণে যে খুঁৎ ত্রুটি গ্রাহ্যই হয় না, ঝগড়ার সময় তারই খোঁচায় খোঁচায় স্ত্রীকে, স্বামীকে, ভাইকে অর্থাৎ বাড়ীর যে-কাহাকেও, নাস্তানাবুদ করিয়া দেওয়া যায়; যে-অপরাধ ক্রমাগত ক্ষমা করা হইয়াছে, রাগের মাথায় তাহাকেই ক্ষমার অযোগ্য দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া তোলা হয়। অথচ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-সব কর্তব্য মনে হয় না।

কিন্তু সবিতা আর রমণীর আজকার এই ঝগড়ার পরস্পরের প্রত্যেকটি কথাকে দুঃসহ আর বীতশ্রদ্ধা-প্রণোদিত মনে হইয়া দু'জনেই খানিকক্ষণের জন্য বেহুঁশ হইয়া গেল। সারদা সবিতাকে অনেক কষ্টে নিরস্ত করিয়া শ্রাদ্ধ আরও কতদূর গড়ায় তাহা আমাদের দেখিতে দিল না।. কলহের ফলে উভয়ে, রক্ষিতা ও রক্ষক, পরস্পর একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেদিন সবিতার মন অসহনীয় কারণে যারপরনাই খারাপ হইয়াছিল—গুরুজন আর ভক্তিভাজন স্বামী বিপন্ন, এবং তাঁর ঔরসজাত কন্যা রেণু পীড়িতা, ইত্যাদি। আর রমণী সেদিন "মাত্র একটি বোতল" মদ খাইয়াছেন। ইহার, এই একাধিক ঘটনার এককালীন সম্মিলনের, যা' অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাই ফলিল—কাহারো কথা কাহারো গায়ে সহিল না; যে বাঁধনটুকু আছে বলিয়া মনে হইত তাহা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

সবিতার সম্বন্ধে আমরা আর একটি কথা বলিতে চাই। মনখারাপের কথাটা স্বতঃপ্রতীয়মান প্রকাশিত

'খোকা মাকে শুধায় ডেকে…'

[ফটো—বিভূতিভূষণ রায়]

কথা। আমরা আলোচনাপূর্ব্বক দেখাইয়াছি "যে, বিমলবাবুর সঙ্গে সবিতার নিমেষের জন্য চোখের মিলন হইয়াছে, এবং তার দরুণ সবিতার যে লজ্জা তাহা অনুরাগের লক্ষণ, অর্থাৎ একটা উৎকৃষ্টতর নূতন স্থানে দাঁড়াইয়া সবিতার স্তিমিত যৌন-চেতনার পুনরুন্মোচন। রমণী "অতি প্রৌঢ়", বিমলবাবু "স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ"। কাজেই বিমলবাবুর সঙ্গে তুলনায় রমণী সবিতার চোখে আজ বেজায় নামিয়া গেছেন—তাঁর অতি প্রৌঢ়ত্বের কদর্য্যতা, আর, তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আচরণের বীভৎসতা আজ এমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, সেই দুর্ব্বিষহতা সবিতার পক্ষে পরিপাক করা কঠিন।

১০৮ পৃষ্ঠায় যে কলহের শুরু তাহা শেষ হইল ১১১ পৃষ্ঠায়। অতবড় ঝগড়ার সবটা তোলা অন্যায় হইবে। তবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধার করা নিতান্তই প্রয়োজন :

(১) সবিতা বলিল,……"এ কি তুমি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও"?—দেব-ভক্তিতে, প্রবীণত্বে, ক্ষমাশীলতায়, মৃদুতায়, সহিষ্ণুতায়, রসনার সরসতায় রমণীবাবু যে ব্রজবাবুর "পায়ের ধুলোর যোগ্য নন্" এ-কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার্য্য।

(২) "অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠে, আমার এই ভালো যে, এ-লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোনো সত্যিকার সম্বন্ধও নেই"।—এই দ্বিতীয় উক্তির দ্বারা সবিতা রমণীকে জানাইয়া দিল যে, রমণীর সঙ্গে তার "কোন সত্যিকার সম্বন্ধও নেই।"

এই "রূঢ় এবং অপমানকর" উক্তির উত্তর দিতে গিয়া রমণী "সদম্ভে" যাহা বলিলেন, অর্থাৎ যে-প্রশ্ন করিলেন, তাহা 'শেষের পরিচয়' নামক উপন্যাসের মধ্যবর্ত্তী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত বলিয়া সাহিত্য-জগতের একটা চিরকালব্যাপী প্রশ্ন হইয়া রহিবে, অবশ্য যদি আমাদের দেওয়া উত্তরটা গ্রহণ করা না হয়।—রমণী "সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে থাকো কিসের জন্যে"? আমরা বলিয়াছি, সবিতার মন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রমণীর সঙ্গে বাস করিয়া আসিয়াছে—এক ভাগ তাঁর ব্যবহারে ক্লিষ্ট, অন্য ভাগ তাঁর যৌন-ক্ষমতায় তুষ্ট। তাই স্বামীর কাছে না হোক্ অন্য কোথাও সে যাইতে চাহে নাই।

কিন্তু এইবার বিমলবাবু আসিয়াছেন—তিনি "স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ"।

সবিতার স্বামী ব্রজবাবু সবিতার পক্ষে খানিক্ ভগবানের স্বরূপ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। আমরা যেমন খাই-দাই, মজা লুটি, ফুর্ত্তি করি, আর, ঠেলায় পড়িলে ডাকি ভগবানকে, তেমনি কষ্টের সময় স্বামীকে তার খুব মনে পড়ে, উচ্চ শ্রেণীর মানুষ আর পরম মিত্র বন্ধু বলিয়া মনে হয়। ব্রজবাবু নির্ব্বিকার খুঁটো—সেই খুঁটোর সঙ্গে নিজেকে লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া সে চরিয়া বেড়াইতে চায়। [ক্রমশঃ

জিজ্ঞাসা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এ আমার দুঃখ ব্যথা—যন্ত্রণা অপার,
নীরব ক্রন্দন মোর নিঃসঙ্গ আত্মার,
এই হাহাকার—এই উষ্ণ অশ্রুজল,
বারবার অদৃষ্টের সাথে
সম্মুখ সমরে যুঝি' তবু পরাজয়—
এ কি অকারণ?
হায়,
এ কি শুধু নির্ম্মম কৌতুক
অন্ধ প্রকৃতির?
কর্ম্মফল?—মিথ্যা কথা! ছলনা অলীক!
শাস্ত্রকার ভিষকের শীতল প্রলেপ
দুঃসহ প্রাণের ক্ষতে!
জন্মান্তরবাদ···
সংশয় সঙ্কুল···
চির অনিশ্চিত!
ছায়াচ্ছন্ন অতীতের মাঝে
আরোপিয়া বর্ত্তমান ব্যথা—
পরিতৃপ্তি দুর্ব্বল প্রাণের!
সব অন্ধকার—
ঈশ্বর, করম ফল—উদ্দেশ্য সৃষ্টির—
জীবাত্মার পরিণাম!
শুধু জানি—
মৃত্যুর মতন সত্য এ যন্ত্রণা মোর—
অদৃষ্টের মত ধ্রুব।
সংসারের মাঝে
সুযোগ্যের উদ্বর্ত্তন;
দুর্ব্বলের হেথা কোথা স্থান?
বিথারি' দারুণ দংষ্ট্রা মত্ত জিঘাংসায়
হিংস্র ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া ছাগশিশু 'পর
চূর্ণ করে তুণ্ড তার।

ভীত ত্রস্ত অসহায় পশু
তুলি' শুধু ক্ষণিকের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ
পড়ে ঢলি' মরণের কোলে।
সে কি তার কর্ম্মফল—
জন্মান্তর বাহি'
ছুটিয়াছে পশ্চাতে তাহার
ছায়া সম?
হায়,
অকারণ কারণ খুঁজিয়া মরি!
হয়তো এ বিশ্বজগতের
সব-ই অকারণ—
সব-ই অর্থহীন
পাগলের প্রলাপের মত!
বীরভোগ্যা এ বসুধা—মিথ্যা সে তো নয়;
পারি নাই বাহুবলে আহরিতে সুখ
তাইতো বেদনা মোর!
জীবনজলধি মথি' পেল আর সবে
কৌস্তুভরতন;
আর আমি—বেদনার তীব্র হলাহল!
পৌরুষ—করমফল সত্য কিবা তবে?
কাহারে শুধাই—
হায়,
বধির ঈশ্বর!
অথবা ঈশ্বর নাই—এ মূক প্রকৃতি
লীলাময়ী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী
ঘটিকার শঙ্কুসম চিররাত্রিদিন
ধাবমান অন্ধবেগে?
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ, পতন, উত্থান
সব অহৈতুক!

চারুচন্দ্র সেন

মবারক মিঞা তাহার ১২ বৎসরের শিশুপুত্র ইউসুফকে স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করিয়া এবং গ্রাম্য জমিদার মদন মিত্রকে শেষ সেলাম দিয়া ইহধাম ত্যাগ করিল। গৃহস্থ হিসাবে তাহার অবস্থা ভালই বলিতে হইবে এবং স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ছিল না। গ্রাম্য স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ইউসুফ তাহার পাঠ শেষ করিল। মবারক ছিল গ্রাম্য জমিদার মদন মিত্রের ডান হাত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চর-দখল বে-দখলি জমির পুনরুদ্ধার এইসব বিষয়েই সে ছিল সবার এগুতে। তাহার মৃত্যুতে জমিদারের যে দুঃখ হইল তাহাই নয়, তিনি হইলেন সহায়হীন, দুর্ব্বল। মবারক ছিল অনুগত ভৃত্য এবং সুহৃদ। ইউসুফ হইল ঠিক বিপরীত। সে আনন্দ পাইত জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, বিরোধ করিয়া আর তাহার বিরুদ্ধে দল পাকাইয়া। সাকিনা বিবিকে ডাকিয়া অনেকবার মদন মিত্র সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ফল হয় নাই। নিজে ডাকিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ফল। সম্মুখে অতীব বিনীত অনুগত জনের মত ইউসুফ ব্যবহার করিত, কিন্তু দূরে গেলেই অন্যরকম। সম্মুখে আজানু হাত লম্বা করিয়া সেলাম দিত, জোরে কথার উত্তর দিত না, দূরে সরিয়া গেলেই অন্যরকম।

সে কমিউনিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত একখানা দৈনিক সংবাদ-পত্র রাখিত এবং সেই সব মত প্রচার করিত সাধারণ লোকের মধ্যে। ভাল লাগিলে সে "বন্দে-মাতরম্" চীৎকার করিয়া কংগ্রেস দলেও ঝুঁকিয়া পড়িত। তাহার রাজনৈতিক মত ছিল এইরূপ। ঋণ-সালিশী আইনের সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে খাজনার নালিশ ঋণ-সালিশী বোর্ডে বিচার হইবে বুঝাইয়াছিল এবং যথাক্রমে প্রায় ৩।৪ হাজার মামলা সালিশী বোর্ডে আসিয়া জমিল। মদন মিত্র গুণিলেন প্রমাদ, ভবিষ্যত দেখিলেন অন্ধকার। একদিন পাইকসহ বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে যাইয়া মবারকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সাকিনা বিবিকে তিনি বলিলেন—"সাকিনা, সব বুঝিয়ে বলো, ইউসুফ তো আমাকে জাহান্নমে দিতে বসেছে, প্রজারা যদি বিদ্রোহী হয় তবে দাঁড়াব কোথায়? আজ মবারক নেই তাই ভেবেছিলাম যে, ইউসুফ আমার হয়েই লড়বে।"

সাকিনা উত্তর করিল—"ওকে কত বোঝাই কিছুতে যেন বাগে আনতে পারছি না। আমি আরও বলবো, নিশ্চয়ই বলবো। আমাদের ন-পাড়ার জমিটা থেকে কিছুই ফসল আসছে না, আপনি যদি দয়া করে এর একটা বিহিত করেন।" মদন মিত্র উত্তর করিলেন—"কালকেই পেয়াদা পাঠিয়ে ভাগদারদের তলব দেওয়াব। আর তারাই বা দেবে কেন, তোমার ছেলেই তো সবাইকে ওসব তেভাগা—টাগা শেখাচ্ছে। তা তুমি ভেবো না, আমি দেখবো "খন।" মদন মিত্র উঠিয়া পড়িলেন। সাকিনা মাটিতে পড়িয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

ঠিক সেই সময় বাড়ী ফিরিল ইউসুফ। জমিদারকে দেখিয়া কিরূপ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। মা বলিলেন, —"মাটিতে পড়ে সেলাম কর।" দ্বিরুক্তি না করিয়া সে হাঁটু-গাড়িয়া মদন মিত্রের পদধূলি গ্রহণ করিল। মদন তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"তা বেশ,

তা বেশ, কিন্তু অত সব দুষ্টুমি করো না। আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

পৌষমাসে এবার আর ভাগদাররা কেহ ফসল দিল না। তাহারা তাহাদের নিজেদের দুইভাগ ফসল কাটিয়া লইয়া গেল। জমিদারের ভাগ জমিতেই রাখিল। এ সবই ইউসুফের প্ররোচনায়। নায়েব জমিদারকে বলিল—"ইউসুফকে শিক্ষা দিতে না পারলে সব উচ্ছন্ন যাবে। জমিদারী রাখা কঠিন হবে।" মদন মিত্র উত্তর করিলেন,—"তাই ত। কি, করা যায়, মব রকের ছেলে,—একটা এধা মামলা করেই বা জেলে দিই কি করে।—আচ্ছা ওকে ডেকেপাঠাও।"

দুর্গা প্রতিমার ভাসানের দিন যখন গ্রামের মুসলমানরা বাজনা বাজাইয়া প্রতিমা লইয়া নৌকায় তুলিবার সময় বাধা দিবার জন্য জড় হইয়াছিল, সাকিনা ইউসুফকে ডাকিয়া বলিল—"বাবা, সে ঠিক নয়, এরা এখান দিয়ে বাজনা বাজিয়ে ওদের ঠাকুর নিয়ে যায়, বাধা দেওয়া অন্যায় হবে। তুমি ওদের সবাইকে বুঝিয়ে বলো।" ইউসুফ যাইয়া দলটি ভাঙিয়া দিল এবং নিজেই সাহায্য করিল নৌকায় প্রতিমা তুলিয়া দিতে।

আবার সেদিন জমিদারের ছোট ছেলে যখন বাজারে একটা লোককে গলায় গামছা দিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছিল, তখন এই ইউসুফই যাইয়া প্রতিবাদ করিল এবং তাহাকে ছিনাইয়া মুক্ত করিয়া আনিল। দৈনিক বরকন্দাজ হৈ হৈ করিতেই সে হুঙ্কার দিয়া সেস্থান হইতে দৌড়াইয়া পালাইল। যথাসময়ে জমিদারের কানে কথাটি পৌঁছাইতেই তিনি বলিলেন—"তাই ত, মবারকের ছেলে। আর তোমরাই বা আজকাল যেখানে সেখানে জমিদারী ফলাতে যাও কেন?" তিনি কিন্তু ইউসুফকে ডাকিয়া গরম গরম সবই বলিলেন। ইউসুফ কোন উত্তর করিল না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মদন মিত্র এই কথাও বলিয়াছিলেন—"তুমি মবারকের পুত্র না হলে আজ চাবকে তোমার খাল তুলে দিতাম।" ইউসুফ নির্ব্বাক্।

জরিপের সময় নবগ্রাম আর বিদগাঁওএর সীমানা লইয়া ডিসপুট বাধিল। একদল লোক বলিল—"এইবার মদন মিত্রকে শিক্ষা দেব, আমরা দল বেঁধে বিদগাঁওয়ের সীমানা মেনে নেব, তা হলে এবার বুড়ো মদন মিত্র খুব জব্দ হবে।" ইউসুফ বলিল—"যেমন বুদ্ধি তোমাদের, বিদগাঁওয়ের জমিদার তোমাদের কোন কুটুম এলো? মদন মিত্রের চেয়ে তিনি অনেক অত্যাচারী। সে হবে না, শপথ করে যাও যে, আমরা সবাই সমর্থন করবো আমাদের জমিদার মদন মিত্রের দাবী।" তাই হইল; সীমানার বিরোধে মদন মিত্র জয়লাভ করিল। সব কথাই জমিদারের কানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি কেবল বলিলেন—"তাইত, তারা ব্রহ্মময়ী।"

গ্রামের স্কুল-কমিটির মেম্বার মনোনয়নের সময় আসিতেই ইউসুফ বলিল—"আমাদের মুরুব্বিদের থেকে নিতে হবে তিনজন।" জমিদারের বড় ছেলে উত্তর করিলেন—"বলিস কিরে, লিখতে পারিস না, নাম সই করতে জানিস না, তোদের থেকে মেম্বার হবে তিনজন? রেখে দে, রেখে দে, তোকে মেম্বার করে নেব, বাস এই পর্য্যন্ত।" ইউসুফ আর অপেক্ষা না করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং যাওয়ার সময় বলিয়া গেল—"কর্ত্তা তিনজনই মেম্বার করতে হবে, লিখতে পড়তে না পারলে করবেন না। কিন্তু আমরা তিনজনই হবো।"

ইউসুফের দলের তিনজনই মেম্বার হইল। একটি মুসলমান—সে নিজে; একটি বাউরি আর একটি কাপালি। তিনমাসের অক্লান্ত চেষ্টায় অপর দুই জনকে সে নাম সই করিতে, মোটামুটি পড়িতে শিখাইয়াছিল। জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্র চটিয়া গেল এবং শাসাইতে লাগিল স্কুল উঠাইয়া দিবে। ইউসুফ বলিল,—"স্কুল তাদের পৈতৃক সম্পত্তি হলেও সর্ব্বসাধারণের স্কুল, ইচ্ছা করলেই উঠানো যায় না।" মদন মিত্র সব কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না।

গঙ্গার নূতন চর লইয়া বাধিল ঝগড়া। অপর পক্ষ প্রতাপান্বিত ক্ষমতাশালী নিমৃতিতার জমিদার। মদন মিত্র ইউসুফকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ মবারক নেই, তাই আমি দুর্ব্বল, সে বেঁচে থাকলে আমার কোন ভাবনাই ছিল না। এই চরটা আমাদের ভাজনডাঙ্গা মৌজার পয়স্তি জমি। কিন্তু নিমৃতিতা চায় আমাদের

জোর করে তাড়াতে। তার জনবল, অর্থবল দুই-ই বেশী। তাই এবার আমার পরাজয় নিশ্চিত।" ইউসুফ সেলাম ঠুকিয়া বলিল—"বাবা নেই, কিন্তু আমি তো আছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে চর আপনার প্রজা ছাড়া কেউ দখল করতে পারবে না।" আর বিলম্ব না করিয়া সে জমিদারকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিল। ইউসুফকে ভালবাসিত হিন্দু মুসলমান অনেকেই। সেই রাত্রিতেই সভা করিয়া স্থির হইল যে, বালুঘাটার চরে তাহারা ঐ রাত্রিতেই যাইয়া দুইখান একচালা তুলিয়া ফেলিবে, এবং হইলও তাই। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, সমস্ত চর লোকে এবং ঘরে পরিপূর্ণ। নিবৃত্তিতার নায়েব লাঠিয়াল বরকন্দাজ সব নিয়া হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। পাণিপথের যুদ্ধ না হইলেও অন্ততঃ খাণ্ডোয়া অথবা বক্সারের যুদ্ধের মত একটা যুদ্ধ হইয়া গেল বটে। ইউসুফ ইহার মধ্যেই এক ফাঁকে থানায় গিয়া সংবাদ দিয়া আসিয়াছিল। কাজেই নিবৃত্তিতার লোকজন, কিছু কিছু বে-আইনী জনতা এবং লুঠতরাজের চার্জ্জে গ্রেপ্তার হইল, শেষ পর্য্যন্ত মদন মিত্রেরই জয় হইল। কিন্তু তাঁহার ছেলেরা জমি বিলি করিবার সময় আরম্ভ করিলেন অত্যাচার ও জুলুম, প্রথমটায় ইউসুফ যাইয়া মদন মিত্রের নিকট নালিশ জানাইল। বয়স হইয়াছিল এবং শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই ছেলেরা আর তাঁহার কথা সেরূপ গ্রাহ্য করিত না। তখন প্রজারা বিদ্রোহী হইল এবং নায়েব গোমস্তা কিছুই করিতে পারিল না, শেষে ইউসুফ জানাইয়া দিল, জোর করিয়া উচ্ছেদ করিতে চাহিলে সমঝাইয়া দিবে—উচ্ছেদ করা কাহাকে বলে? বাধিল মারামারি, হইল খুন-জখম।

ইউসুফ যাইয়া দাঁড়াইল ৩০ জন আসামীর মধ্যে একজন। মদন মিত্র প্রায় এক বৎসর হয় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন ছেলেরা নবীন জমিদার, অনভিজ্ঞ, তাই মামলা বাঁধাইয়া প্রজা শাসন করিতে চাহিতেছিলেন বুঝিতে চাহিতেন না যে, ইহাতে প্রজারা যাইবে আরও ক্ষেপিয়া। যথাসময়ে মামলা শেষ হইল; মাত্র ৫ জন আসামীর সাজা হইল। ইউসুফ সহ অপর পঁচিশ জন মুক্তি পাইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া মায়ের পায়ের ধূলা নিতেই মা তাহাকে আদরে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন সাকিনা তাহাকে বলিল—"বাবা, আর জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করো না। বিধু, সিধু, (জমিদারের ছেলেরা) যে তোমার ভাই, মদন মিত্রই যে তোমার বাবা ইউসুফ লাফাইয়া উঠিল—"মা, এতদিন একথা বলনি কেন?" সাকিনা সে কথার জবাব না দিয়া বলিল —"আসছে কাল হিন্দুদের তর্পণের দিন, তুমিও গঙ্গায় গিয়ে তোমার বাবা মদন মিত্রের জন্য তর্পণ করবে আমি শিখিয়ে দেব। বাবা, আমিও হিন্দুই ছিলাম মবারক জোর করে আমাকে নিয়ে আসে। সেই অবধি আমি তার সঙ্গে বাস করেছি। তুমি তর্পণ করতে গিয়ে প্রথমে বলবে—

গঙ্গে চ, যমুনে চৈব, গোদাবরী সরস্বতী;
নর্ম্মদে কাবেরী সিন্ধু, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

তারপর এইভাবে আচমন করলে পর হাতে জল এবং তিল তুলসী নিয়ে মন্ত্র পড়বে—বিশ্বামিত্র গোত্র পিতা মদন মিত্রস তৃপ্তর্থে সতিল গঙ্গোদক স্বাহা।

পরদিন যথাসময়ে ইউসুফ চুপ করিয়া যাইয়া পিতা মদন মিত্রের তৃপ্তির জন্য গঙ্গায় তর্পণ করিয়া গৃহে ফিরিতেই—Chatterjee & Chatterjee Soliciter-এর চিঠিতে জানিতে পাইল যে, মদন মিত্র মহাশয় তাঁহার উইলে রাখিয়া গিয়াছেন নিজের ঔরসজাত পুত্র ইউসুফ মিঞার জন্য—বাসপুর, হরিপুর, মুক্তাকপুর এবং বালুটীচর এই মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলি এবং অপর সম্পত্তি পাইবে তাঁহার পুত্র বিধু এবং সিধু।

বাঙলা সাহিত্যের অদ্যতনী

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগী এবং সুধী সমালোচকগণ প্রায়শঃ যে অভিযোগ করিয়া থাকেন তাহা এই যে, আধুনিক যুগে বাঙলা সাহিত্যে কোনও চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে না এবং সাহিত্য পদবাচ্য যাহা রচিত হইতেছে তাহা সাময়িক সাহিত বা যুগ-সাহিত্য ভিন্ন আর কিছুই নয় অর্থাৎ যুগের পিপাসা নিবারণ করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়া এই জাতীয় সাহিত্যের পরিণতি। স্থায়ী সম্পদ হিসাবে দেশ তথা জাতির সমৃদ্ধির এবং অগ্রগতির কার্য্যে ইহা কিছুই সহায়তা করে না। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি তাঁহাদের এই অভিযোগকে ভিত্তি করিয়াই কিছু আলোচনা করিব এবং কি কি কারণে আমাদের সাহিত্য দৈন্ত দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছে, যাহাতে কোনও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচিত হইতে পারিতেছে না, সেই সম্বন্ধে মোটা-মুটিভাবে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকের অভিযোগটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইলেও তাহা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, আংশিক ভাবে সত্য। সব কালের স্তায় এ কালেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং আধুনিক সাহিত্যিকগণ সে বিষয়ে সচেতন থাকিয়া তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন এবং দিতেছেন। তবে যথেষ্ট সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও যে তাঁহারা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিয়া স্ব স্ব আদর্শ এবং সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ বর্ত্তমান যুগের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা, জাগতিক পরিবেশ এবং তাহার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। বিগত দশ বৎসর কালের বাঙ্গলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনি ইহার আনুপূর্ব্বিক ধারা এবং বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি অনুশীলন করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে কালে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি এবং যে কালের সাহিত্য হইতে আমরা প্রাণরস আহরণ করিতেছি, তাহা সর্ব্বপ্রকারে যুগসন্ধির কাল। অর্থাৎ শতাব্দীব্যাপী সুদীর্ঘ এক যুগের পূর্ণ অবসানের পর নূতন এক যুগ-সম্ভাবনার মুখে আজ আমরা আসিয়া পৌছিয়াছি। বস্তুতঃ মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বাঙলা সাহিত্যে যে রেনেসাঁস যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং যাহা পরবর্ত্তী কালে দুইজন মনীষীর অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং আজীবন সাধনায় নব কলেবর পরিগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সেই চরমলগ্নের অবসান মাত্র অল্পকাল পূর্ব্বে আমাদের সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি, ঐই দুই মনীষীর কীর্ত্তি যেমন একদিকে বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ ও সমাদরের মর্য্যাদা দান করিয়াছে, তেমনি অপর দিকে তাঁহাদের তিরোধানে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ সেই সুউচ্চ ও মধুর ভাবকল্পনা এবং অমৃতনিস্যন্দী রূপনির্ঝর হইতে আপনার রসপিপাসা নিবারণ করিতে না পাইয়া বঞ্চিত অবস্থায় সতৃষ্ণ নয়নে চিত্তক্ষোভ অনুভব করিতেছে। অথচ জীবন ধারণের জন্ত অপরিহার্য্যভাবে তাহাকে যাহা গ্রহণ করিতে হইতেছে তাহাতে শারীরিক ক্ষুধায় কিছু নিবৃত্তি হইলেও মানসিক পুষ্টিলাভ হইতেছে না। অর্থাৎ যে-পাঠক একবার রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রের সাহিত্যরস আকণ্ঠ পান করিয়া বিভোর হইয়াছেন, তাঁহাকে পরবর্ত্তী বারে শরৎ-রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্য হইতে আপনার বাঞ্ছিত বস্তুর অন্বেষণ করিতে বলিলে তাঁহার মন যে বিমুখ হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলিতেছিলাম যে, বর্ত্ত-মানের এই কাল সর্ব্বপ্রকারে যুগপরিবর্ত্তনের কাল।

অতঃপর আমি এই যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে কিছু আলোচনা করিয়া এই কালে সৃষ্ট সাহিত্যের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য হইতে তাহার উৎকর্ষ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্বাগ্রেই বলিয়া রাখি যে, এই নবোন্মেষিত যুগকে কখনও অখণ্ড বলা যায় না। বস্তুতঃ এই যুগ আংশিক

লক্ষণাক্রান্ত। সেই কারণে এই যুগের সাহিত্য সর্ববিভাগে সম্পূর্ণ না হইয়া কেবলমাত্র একটি বিভাগে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়—এই যুগের কথা-সাহিত্যই, গল্প ও উপন্যাস তাহার একমাত্র নিদর্শন।

সাহিত্য-জগৎ হইতে অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর হইতে কিঞ্চিদধিক এক দশক অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বহু শক্তিশালী লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অপরিমেয় দানে সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সকল সাহিত্যিকগণ শরৎচন্দ্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে না পারিলেও তাঁহারা যে যথেষ্ট নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রকৃত সাহিত্যের মাধ্যমে দেশ তথা জাতির রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণের একমাত্র যে আকুতি ও জীবনের শ্রেষ্ঠতম আশা এবং আকাঙ্ক্ষা—সেই মুক্তিকামনায় পরাধীনতার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া সমাজ এবং রাষ্ট্রকে সার্থকভাবে গণবিপ্লবের দিকে পরিচালিত করিতে এই সাহিত্যিকগণ যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। পূর্ববর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষিগণ পরাধীন জাতির প্রতি বৈদেশিক শাসননীতির মূলগত অসাম্য ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা সর্বত্র সক্রিয় বা সুফলপ্রসূ হয় নাই। কারণ, তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থার প্রতিকূল পরিবেশে এবং শাসকগণ কর্তৃক অবলম্বিত কঠোর দমননীতির ফলে জাতীয়শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণ রাষ্ট্রীভাবধারা ও রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে এত বেশী অজ্ঞ ছিল যে, দেশের একাংশে কোনরূপ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইলে অপর প্রান্ত হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু পরবর্তী কালে অবস্থার পরিবর্তনে দেশের জনসাধারণ রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হইতে সক্ষম

হইয়াছিল। তাই 'আনন্দমঠ', 'গোরা', 'পথের দাবী'তে যাহা অস্ফুট এবং অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল, তাহা আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের রচনায় সার্থকভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ একমাত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' এই চারখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তারাশঙ্কর একজন শক্তিধর কথাসাহিত্যিক। তাঁহার লেখনীর অবারিত বেগে ও দৃপ্ত তেজে পরাধীন জাতি তাহার শতাব্দীব্যাপী জড়তা ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে এবং সকল প্রকার ভয়—রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় ভুলিয়া বিপ্লবের হোমাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে শিখিয়াছে। একদিকে সামাজিক অনুশাসন ও কুসংস্কার এবং অপরদিকে বৈদেশিক শাসকগণের অনুসৃত ধনতান্ত্রিক বৈষম্যনীতি—এই দুইয়ের ফলে হিন্দুসমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে যে বিক্ষোভ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে চালনা করিতেছে, তাহা তারাশঙ্কর কর্তৃক এমন নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে ও নিখুঁতভাবে চিত্রিত হইয়াছে, বাঙলাসাহিত্যে তাহা যেমন অনন্যসদৃশ তেমনি মৌলিক। বাঙলাসাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন যে, বিদেশী শাসকগণের অন্যায় অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে জাগ্রত জনগণ কিরূপ দ্রুতগতিতে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং সেই গণবিপ্লবের দুর্নিবার শক্তি পুরাতন জীর্ণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া যে নূতন সমাজকে সৃষ্টি করিবে তাহারও ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন। তারাশঙ্কর আশাবাদী, তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যৎ কালের সমাজে মানুষ তাহার দস্যুবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত অর্থের কৃত্রিম আভিজাত্যে নয়, তাহার মনুষ্যত্বের গৌরবে এবং মহত্ত্বের গুণে নির্ভীকচিত্তে উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই অনাগত কালের সমাজ-ব্যবস্থার বহুবিঘোষিত আধুনিক নাম সাম্যবাদী সমাজ বা সোস্যালিষ্ট ষ্টেট্। বাঙলা কথাসাহিত্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারা যথার্থভাবে যাঁহারা অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন, তারাশঙ্কর যে তাঁহাদের অগ্রণী একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু সেকথা যাক। যাহা বলিতেছিলাম, তাহা এই যে, আধুনিক যুগে রাজনৈতিক

চেতনায় পূর্ণ বিকাশ যাহা গণমানসকে সার্থকভাবে জাতীয় সংগ্রামে আত্মবলি দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বহুলাংশে এই কালের সাহিত্যিকেরই দান। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিকগণের রচনার নাম কিছু উল্লেখ করিব। যেমন, মনোজ বসু প্রণীত 'ভুলি নাই', 'সৈনিক', সরোজ রায় চৌধুরী প্রণীত 'শতাব্দীর অভিশাপ', রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'শতাব্দী' এবং পরবর্তী কালে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রণীত 'জাগরী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'মন্ত্রমুখর', বনফুল প্রণীত 'সপ্তর্ষি', সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'কল্লোল', বিজন ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'জনপদ,' রণজিৎ কুমার সেন প্রণীত 'চক্রধারী' ও 'শোণিত-স্বর্গ,' সুবোধ ঘোষ প্রণীত 'একটি নমস্কারে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপরিলিখিত উপন্যাসগুলির সব কয়টিই সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট বা প্রথমশ্রেণীভুক্ত নয়। সত্যকার সাহিত্যের বীজ উহাদের দুই তিনটির মধ্যেই নিহিত আছে। তবে অন্যান্য পুস্তকগুলির নাম করিবার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথম, সাধারণ পাঠকগণকে শ্রেণীবিশেষের বা আধুনিক রাজনীতি-প্রভাবিত এরূপ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করা—যাহাতে সমজাতীয় চিন্তার স্রোত বর্ত্তমান এবং দ্বিতীয়, নিছক দৃষ্টান্তের অনুসরণ বা উক্তির সমর্থন। অতঃপর এই যুগের সাহিত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতেছি। উহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্প্রসারণ। সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত বিস্তারের মূলে আছে উভয়ের আদর্শগত সৌসাদৃশ্য। অর্থাৎ উভয়ের উদ্দেশ্যই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্লোকের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া সমগ্রভাবে মানবসমাজের কল্যাণে প্রয়োগ করা। এতদ্ভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর বা মানবজাতির অপর একটি প্রয়োজনেও সাহিত্যিকগণ বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইয়াছেন—তাহা মনস্তত্ত্বের গবেষণা মানুষের মগ্ন চৈতন্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা মানবস্বভাবের গূঢ়গভীর অনুভূতি বা যৌনতা-বোধ—যাহা বহুযুগ ধরিয়া তথাকথিত সভ্যতা এবং সামাজিক বিধিনিষেধের চাপে অস্বাস্থ্যকর, অপরাধজনক ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা এই কালের কয়েকজন শক্তিশালী সাহিত্যিকদের দ্বারা আশ্চর্য্যজনক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিব—বনফুল রচিত 'রাত্রি', 'সে ও আমি', ধূর্জ্জটি মুখোপাধ্যায় রচিত—'অন্তঃশীলা,' 'মোহানা', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত—'অহিংসা,' সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য রচিত—'বৃত্ত' ইত্যাদি।

এইবার যুগসাহিত্যের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া আজিকার দিনের কথা-সাহিত্য কেন শাশ্বতকালের সাহিত্য না হইয়া যুগবিশেষের সাহিত্য হইতেছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের ন্যায় বাঙলা সাহিত্যেও কথা-সাহিত্যের জন্ম হইতে অত্যল্পকালের ব্যবধানে যে বহুল পরিমাণ সমৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক (সাঁতে বুর্ভ) যে একদা কথা সাহিত্যের দ্রুত সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, অচিরেই ইহা অন্যান্য সকল প্রকার সাহিত্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ প্রায় সত্য হইতে চলিয়াছে। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলা সাহিত্যে আজ গল্প উপন্যাসের অসাধারণ বিস্তৃতি ও জনপ্রীতি যে অন্য সকল সাহিত্য সম্প্রসারণের পক্ষে একপ্রকার পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহা অস্বীকার করিবে কে? অতি আধুনিক যুগের কথা সাহিত্য অর্থাৎ রবীন্দ্রশরদুত্তর যুগের কথা-সাহিত্য ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলে যে অপূর্ব্ব এবং অনন্যসদৃশরূপে প্রকাশমান হইয়াছে তাহার বহিরঙ্গের কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। এক্ষণে তাহার মূলগত বৈশিষ্ট্য বা সৃজনীলক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। কথা-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ ব্যক্তি-চরিত্রাঙ্কন। ইহার মূলে আছে সমাজ বা গোত্র চেতনার বিপরীত একরূপ ব্যক্তিচেতনার উন্মেষ। অর্থাৎ ইহা এমন এক-প্রকার রূপকর্ম্ম বা রসপ্রেরণা, যাহার বলে দেশ, সমাজ ও সভ্যতার ঐতিহ্য সংস্কার দ্বারা জাতির ভাষায় জাতির আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ বিশ্বজগৎ এবং প্রকৃতির নিগূঢ় লীলায় পরিচালিত মানব-সমাজের জীবন-যাত্রাপথে যে-রহস্য নিত্য নব নব রূপে প্রকাশমান হইয়াও

দুর্জ্ঞেয় রহিয়া যাইতেছে, সেই বহুরূপী ও বিচিত্রধর্ম্মী রহস্তের অন্তরালে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া যে সত্যের সন্ধানে আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, তাহার সেই সাধনার কাহিনীই কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে। সহজ কথায় বলা যায় যে, মানুষের সমস্তাসুখর প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত—তাহার ব্যক্তিজীবনের সহিত ব্যষ্টি বা সমাজ-জীবনের অভিন্ন এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনলব্ধ অনুভূতি জীবনদর্শনের ধারকে রসায়িত করিয়া প্রকাশ করাই কথা সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্ম। অর্থাৎ চলমান জগৎ ও জীবনকে আপনার অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে তাহার সকল গূঢ়গভীর কাহিনী অনাবৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করা এবং তাহার অস্পষ্ট অন্ধকার কোণে আলোর সম্পাত করিয়া জটিল অস্ফুট স্থলকে স্ফুটতর করিয়া তুলাই কথাসাহিত্যিকদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান কালের ফরাসী সমালোচক মঃ লেগ্রাদের (Ignace Legrand) একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য —"A Novel should be to the reader like a new friend enlightening him about himself, about life, about Man in general and about the period in which we are living, with all its problems and all its Complications." সাধারণ ভাবে ইহাই হইল উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সত্য। কিন্তু যে সকল উপন্যাস কেবল মাত্র সাধারণের পর্য্যায়ভুক্ত নয় অর্থাৎ যাহা চিন্তাশীল লেখকের একনিষ্ঠ সাধনা এবং বাস্তবানুগ জীবনদর্শনের অভ্রান্ত অভিব্যক্তি তাহার একটি বিশেষ লক্ষণ বা স্বভাবধর্ম্ম আছে। উহা মানুষের মনকে পার্থিব জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া এমন এক বৃহত্তর জগৎ বা ভূমার মধ্যে লইয়া যায়—যেথায় সে অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরিয়া আপনার ব্যক্তিত্বকে উন্নততর করিতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উল্লিখিত খ্যাতনামা ফরাসী সমালোচকের অপর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"A good novel should be to the reader like the unforeseen discovery, the unhoped for discovery, of a human person able to exalt and develop and expand his own personality on all planes"। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতএব যাহা উচ্চাঙ্গের উপন্যাস বলিয়া স্বীকৃত তাহা কখনই স্বল্পকালস্থায়ী যুগসাহিত্য নয়, অর্থাৎ তাহা যুগবিশেষের মধ্যে অবস্থান করিয়া ঐ কালের মুষ্টিমেয় পাঠকগণের পিপাসা নিবারণ করিয়া সাহিত্য-জগৎ হইতে বিলীন হইয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তাহা শাশ্বত আনন্দের রসে ভরপুর থাকিয়া বহু কাল যাবৎ বিদগ্ধ-সমাজে সমাদৃত হয় ও রসিকচিত্তের বিনোদন করিয়া থাকে।

এই জাতীয় কথা-সাহিত্য যুগধর্ম্মে সৃষ্ট হইলেও বিষয়বস্তুর মৌলিকতায়, ভাবের ব্যঞ্জনায়, ভাষার মাধুর্য্যে, রচনা নৈপুণ্যে ও চরিত্রচিত্রণের অভিনবত্বে যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে বা চিরন্তন সামগ্রীরূপে খ্যাতি লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগের সাহিত্য হইতে কিছু উল্লেখ করিতেছি।—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত—'কবি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা,' বনফুল রচিত 'নির্ম্মোক', 'রাত্রি',' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', প্রেমাঙ্কুর আতর্থী রচিত—"মহাস্থবির জাতক', সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প সংগ্রহ 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "রাণুর কথামালা", "স্বর্গাদপি গরীয়সী", মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সহরতলী" "পুতুল নাচের ইতিকথা", "দিবারাত্রির কাব্য", "অহিংসা", মনোজ বসুর "নরবাঁধ", "বর্মমর্ম্মর",নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' ইত্যাদি।

আলোচনার পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান কালের সাহিত্যিক প্রধানতঃ যুগ সাহিত্যিক হইলেও তাহাদের অনেকেই যুগোত্তর সাহিত্য রচনার অধিকারী। একই লেখকের লেখনী হইতে বিভিন্ন সময়ে দুই জাতীয় সাহিত্য রচিত হওয়া বিরল হইলেও অসম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের কথা প্রথমেই ধরা যাক। আধুনিক কালে রচিত তাঁহার গ্রন্থগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি অতিশয় অল্পকালের

মধ্যেই "মন্বন্তর" '১৩৫০' এর ন্যায় সাময়িক সাহিত্য বা "অভিযানের" ন্যায় ফরমাইসি (প্রকাশকের) সাহিত্য এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র ন্যায় অনবদ্য সাহিত্য রচনা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শুধু তারাশঙ্কর কেন, অন্যান্য সাহিত্যিকদেরও রচনা ভালভাবে অনুসন্ধান করিলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। যেমন সুবোধ ঘোষ, যিনি একদা 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার' রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, তিনিই আবার অল্পকালের মধ্যেই "তিলাঞ্জলি", 'গঙ্গোত্রী' ইত্যাদি রচনা করিলেন। এইরূপে যিনি 'ময়ূরাক্ষী', 'সোমলতা', 'গৃহকপোতী'র লেখক, তিনিই 'শতাব্দীর অভিশাপ' হইতে 'কালোঘোড়া' ও 'মহাকালের' লেখক হইলেন। আবার যে শক্তিশালী লেখনী হইতে একদা 'অতসী মামী', 'দিবারাত্রির কাব্য,' 'পুতুলনাচের ইতিকথা,' 'পদ্মানদীর মাঝি' নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা হইতেই একালে 'দর্পণ', 'মাটি', 'টিল' ইত্যাদি অতিশয় দুর্ব্বল কাহিনী আত্মপ্রকাশ করিল।

এখানে অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন যে, সাহিত্যিকের এইরূপ হঠাৎ মান পরিবর্ত্তনের বা আপাত-অবনতির কারণ কি? ইহার জবাবে বলিতেছি যে, ইহার কারণ নির্ব্বিশেষ বা একাধিক। প্রথমতঃ, সাহিত্যিকের স্বপক্ষে বা অনুকূলে যে যুক্তি আছে তাহা এই যে, আধুনিক কালে মানুষের জীবন যেরূপ সমস্যামূলক ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনি কল্পনাতীত। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সুদূরপ্রসারী ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব পুরাতন জগতকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থা বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূলে আঘাত হানিয়াছে। এই দানবীয় শক্তির নিকট সমস্ত গঠনমূলক বা সৃষ্টিধর্ম্মী প্রচেষ্টা পরাজিত হইয়া নতশিরে পলাইয়া যাইতেছে। উপরন্তু আবহমান কালের নাগরিক পরিবেশের আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যাহার বাস্তব-দারুণতা লেখকের ভাবপ্রবণ মনকে নাড়া না দিয়া থাকিতে পারে না। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে রাজনৈতিক গণজাগরণ, দেশব্যাপী বিক্ষোভ, বিদেশী শাসকের কঠোর দমননীতি অবলম্বন ইত্যাদি অথবা বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রভৃতি লেখককে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করিয়াছে। চলমান জগতের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী হইতে যে লেখককে তাঁহার সাহিত্যের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয়, তিনি যদি বাহিরের কঠোর বাস্তব হইতে মুখ ফিরাইয়া নিছক কল্পনার মুক্তপক্ষে ভর দিয়া মাটির পৃথিবীর দুঃখব্যথা-বিরহিত খেলীর গগনচারী উদাসী ভরত পক্ষীর মত আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিহার করিতে করিতে সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করেন, তবে তাঁহার সকল প্রচেষ্টাই খাঁটি সাহিত্য না হইয়া সাহিত্যের বিলাসিতায় পরিণত হইবে। সেই কারণেই বলিতেছি যে, যুগধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আজিকার দিনে কোন সাহিত্যিকই সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন না। অথচ আজিকার সাহিত্য যাহা মুখ্যতঃ যুগপ্রভাবে রচিত অর্থাৎ যুগবিশেষের দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল ঘটনার পটভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা স্বল্পকালের ব্যবধানেই পাঠকের সমাদর হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

দ্বিতীয় কারণ—সাহিত্যিকের বিপক্ষে এবং প্রতিকূলে। কথাটি রূঢ় সত্য হইলেও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আজিকার দিনের সাহিত্যিক পূর্ব্বযুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ যে দৃষ্টিভঙ্গীর বলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ন্যায় কথা-সাহিত্যিক জীবনকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় তাহার সকল দিকগুলিই পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড দৃষ্টিশক্তির একান্ত অভাব আমাদের কালের সাহিত্যিকদে মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। খণ্ড এবং আংশিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবলম্বনে এ-কালে সাহিত্য রচনা হওয়ায় তাহার পরিধি যেমন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইতেছে, তেমনি আবার তাহার শেষরক্ষাও আশানুরূপ হইতেছে না। গল্পের অসম্পূর্ণ সমাপ্তি বা হঠাৎ পরিণতি এই যুগের সাহিত্যের অত্যধিক নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গালয় এবং ছায়াচিত্রের দাক্ষিণ্যে খ্যাতির মোহ এবং অর্থলোলুপতা তাঁহাদের এমনভাবে আকৃষ্ট করিতেছে যে,

আধুনিক সাহিত্যিকগণ আপনাদের একনিষ্ঠ সাধনা ও একাগ্রচিত্ত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পুনঃ পুনঃ স্খলিত হইয়াও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। কথাটি এই, আধুনিক সাহিত্যিকগণ সকলেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে এমনভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছেন যে, তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস বা আত্মচেতনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ফলে আশার বাণী অপেক্ষা তাঁহাদের সাহিত্যে ব্যর্থতার বেদনাই অধিক পরিস্ফুট। অথচ আজিকার এই সঙ্কটকালে, জাতির চরম দুর্দ্দিনে, তাহার ক্ষতবিক্ষত দেহে ও রক্তঝরা মনে আশার অমৃত-বারিই একমাত্র মহৌষধ। কিন্তু আজিকার সাহিত্যিক এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে অগ্রসর হইতেছেন কই?

এই মাটি

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

আমার মজ্জার সাথে এ-মাটির মেদ-রক্ত নিত্য মিশে আছে :
এই মাটি, বসুমতী, এ আমার দেশ :
এ মহা ভারতবর্ষ নিত্য অশেষ ;
তারই প্রাণ-শক্তি নিয়ে অশেষ অর্ব্বুদকাল এই প্রাণ বাঁচে।

মাটিরে যেখানে তাই পথের ধূলায় কভু খর্ব্ব হ'তে দেখি,
বিদ্রোহের বাণী তুলে সেখানেই এ-প্রাণের রক্ত-লেখা লেখি।

ফাঁকি

বীরু সরকার

তেজদীপ্ত রামকৃষ্ণ পাঠক নির্ঝরিণীর মত সংসার-সীমার বাহিরে ছুটিতেছিল। তাহার মনটা ছিল আসল বৈরাগী মনের মত, পাওয়া না পাওয়ার কোন বিচার ছিল না। যাহা সে অকস্মাৎ লাভ করিত—আমাদের মত সে সযত্নে তুলিয়া রাখিত না, পথচলা পথিকের বোঝা লাঘব স্বরূপ পথে ফেলিয়া যাইত।

আমরা তাহাকে জানিতাম সে ভাগ্যবান, সে মনে করিত ইহা শুধুমাত্র তাহার সাধনাকে ব্যর্থ করিবার পরীক্ষা মাত্র। তাহার এই বিশ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে লাবণ্য বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। অথচ তাহার মত বোধ করি রামকৃষ্ণকে দুনিয়ার আর কেহ এত বেশী শ্রদ্ধা করে নাই, ভালবাসিতে পারে নাই।

রামকৃষ্ণ বলিত, সংসার আর ভালবাসা—এ তো শুধুমাত্র অতি ভাল মানুষের জন্য।

লাবণ্য একদিন জিজ্ঞাসা করিল, কোনদিন কি তুমি বাঁধন নেবে না রাম দা?

—নেব। কিন্তু সে বাঁধন যে আমি নিয়েছি, এই বলিয়া রামকৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, শুধু একটা ছোট্ট সংসারের জন্য আমার সৃষ্টি হয় নি, লাবণ্য, বিশ্বপ্রভাবের ডাক পেয়েছি আমার মনে।

লাবণ্য বলিল, ওটা বড় কথা বলে সঠিক মেনে নিও না, ঠিক চরম সত্যও নয়।

রামকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইল এবং সবিস্ময়ে লাবণ্যের প্রতি চাহিল। লাবণ্য বলিল, জীবধর্ম্মের প্রভাব কাটিয়ে বিশ্বভাবের সৃষ্টি হ'তে পারে না।

রামকৃষ্ণ স্বীকার করিতে পারিল না—উপরন্তু সে মনে করিল, তাহাকে কর্ত্তব্য হইতে পদস্খলিত করিবার জন্য লাবণ্য বেহায়াপনাতে লজ্জা বোধ করিল না। আমি ছিলাম তাহাদের দুইজনের মাঝখানে। রামকৃষ্ণ বলিল, অনেক ভেবে দেখেছি সুধীর—ঘর-সংসারের ঘাত আমার ঠিক সয়ে উঠবে না।

লাবণ্য আমাকে বলিল, কর্ত্তব্যে রামদা' অন্ধ।

আমি সস্নেহে তাহার হাত টানিয়া বলিলাম, দুঃখু করিসনে যেন। পৃথিবীর সকল মানুষের স্থান কি এক আসনে হ'তে পারে!

আমার কথা শুনিয়া লজ্জায় লাবণ্যের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল এবং নিজেকে প্রকৃত ধাতে আনিয়া বলিল, ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার পথে মেয়েদের ভয় করে বীররূপী অতি দুর্ব্বল মানুষেরা। এ কথা তোমায় কে বলবে না সুধীরদা। একটা সত্যকে মানতে রামদা আর একটা বড় সত্যকে অবহেলা করছে। সংসারে তো কেবল আমি একা মাত্র তাকে পেতে চাইনি। আরও অনেকে আছে।

আমি কহিলাম, সে-তো মোহ এবং মোহ বলেই রাম বহু দূরে থাকতে চায়।

লাবণ্য ম্লান স্বরে বলিল, না সুধীরদা, মোহ ঠিক নয়—এটা ফলবান সত্যধর্ম্ম। ধর্ম্মকে আদর্শের আবডালে রাখা বীরত্ব হ'তে পারে—কিন্তু মিথ্যা। ওতে অহঙ্কার বাড়ে, অন্তরে অশান্তি বহন করে। রাম-লাবণ্যের এই সংবাদটি ঠিক আমাদের গল্পের ঠাকুরপূজার পূর্ব্বে পূজার যোগাড়-যন্তর করিবার মত। পূজাটা সত্য—কিন্তু সাজগোজ করাটা সাধনার মন তৈরী করে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে পরাধীনতা রোগের যে কড়া দামের 'মুক্তি' নামক পাচন তৈয়ারী হইয়াছিল—কিশোর বয়সে আমরা গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। দুঃস্বপ্নের মত আমাদের জীবন কাটিতেছিল। রামকৃষ্ণের ঔষধ মাত্রা একটু বেশী মাত্রায় পড়িয়াছিল বলিয়াই তাহাকে আমাদের নিকট অতি বিস্ময়কর মনে হইত। সংসারে দয়া-মায়া বলিয়া যে শব্দটি শ্রদ্ধার ভিতর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে—রামকৃষ্ণ বলিত, ঠিক বলিত না, ধ্রুব বিশ্বাস করিত,—মনুষ্যজীবনে ইহা অপেক্ষা বড় দুর্ব্বলতা আর কি হইতে পারে! দয়াহীন, মায়াশূন্য মানুষ সে তাহার আকাঙ্ক্ষা-উদ্দেশ্যের পথে কোন প্রতিবন্ধক মানিবে না। এইরূপ কৃতনিশ্চয়তা তাহার ছিল বলিয়া ঘর-বাড়ী

আত্মীয়-পরিজন কে‐থায় কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে আর সে আপনার তালে নাচিয়া সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিপ্লবী দলে তাহার স্থান ছিল সকলের ঊর্দ্ধে। সে আসিয়াছিল প্রদীপ্ত প্রতিভা বহন করিয়া। তাহার সুন্দর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সম্মুখে আমরা ম্লান হইয়া উঠিতেছিলাম। তাহার গতি ছিল দুর্ব্বার—আর সেই গতির সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল লাবণ্য, তাহাকে রুখিবার মত দুর্জ্জয় শক্তি লাবণ্যের ছিল না। আমরা জানিতাম বিলাত হইতে ডিগ্রী আনিবার জন্য তাহার ধনাঢ্য পিতা প্রস্তুত হইতেছেন। ভাবিতাম, রামকৃষ্ণের জীবনের পটপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

ইহার পূর্ব্বে বৃটিশরাজত্বাবসানের দুর্দ্দান্ত ষড়্যন্ত্রে আমরা সদলবলে কারাগৃহে প্রবেশ করিলাম। একান্ত ভাল ছেলে আমরা—আমাদের এই অত্যাশ্চর্য্য কৃতকর্ম্মে আত্মীয়স্বজন অপ্রতিভ হইলেন। আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের আশা কোথায় কোন শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, জয়ের গর্ব্বে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রামকৃষ্ণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার চরিত্রের একটা প্রধান অংশ ছিল নির্ভীকতা। যাবজ্জীবন কালাপানির স উদ্দেশ্যে সে হাসিমুখে বিদায় লইয়া গেল। আমাদের মধ্যে দুই-একজন মুক্তি পাইলেন, অবশিষ্ট সকলে—বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগের অদৃষ্ট স্বীকার করিলেন। আমার অংশে অল্প করিয়া তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড মিলিল।

রামকৃষ্ণ আমার বন্ধু, কিন্তু তাহার মত স্বদেশব্রত আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি নাই। বুঝিতাম, বৃহৎ প্রাণের ডাকে তাহারা ক্ষুদ্র পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের জাত আলাদা, স্বভাব আলাদা এবং তাহাদের চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে আনা-গোনা করিয়া থাকে।

আমি এই দুই বিপরীত স্থানের মাঝখানে পড়িয়াছিলাম। তাহাদের মত আদর্শের পশ্চাতে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিলাম না—আবার দুঃখিনী বাস্তু ও বাস্তুভিটার মায়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারাবাস অন্তে বাটিতে ফিরিয়া একমাত্র মাতৃদেবীর উৎকণ্ঠা দূর করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুভবিবাহ কার্য্যে সম্পন্ন হইলাম এবং লতিকা আমাদের ঘরে আসিলেন। আমি নিশ্চয় জানিতাম – রামকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিলে সে কহিত, ভাঁয়া যে টনিক তোমার মাতৃদেবী দিলেন, স্বাধীনতা রোগের প্রকৃত যোগ্য বটে। দোহাই তোমার—নিজে যেন স্বাধীনতার পরম শত্রু হয়ে যেও না।

পাঠক-পাঠিকার নিকট রাম-লাবণ্যের খণ্ড ইতিহাস উল্লেখ করিবার মত একদিন গল্পচ্ছলে লতিকার নিকট প্রকাশ করিলাম। লতিকা কি ভাবিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার হাস্য-কৌতুকদীপ্ত চক্ষু দুইটি কাতর হইয়া উঠিল। সে ম্লানস্বরে কহিল, লাবণ্যের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তোমার বন্ধুরত্নটী নিজেকে প্রতারণা করেছেন।

আমি বলিলাম, কেন?

সে হাসিয়া বলিল, কারণ নির্দ্দেশের কাজ আমার নয়। তোমাদের চোখের পাতা যদি মোহাবিষ্ট না হয়ে যেত তবে বুঝতে পারতে। এ জিনিষ প্রকাশের নয়—সম্পূর্ণ উপলব্ধির।

লতিকা শান্ত প্রকৃতির, তর্ক করিবার মন তাহার নাই। আমি নীরব থাকিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরের কথা। সারা পৃথিবীটা জুড়িয়া রণ-দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বশেষ বৃটিশ বিতাড়ন সম্মুখ আন্দোলন হইয়া উঠিয়াছে। জেলখানাতে তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না, রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত আমার ডাক আসিল। রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু পুরাতন নোটবহি হইতে নাম উজাড় করিয়া ও কয়েদখানার চালান দিয়া সরকারপক্ষ ভারত রক্ষার কার্য্যকরী বিধান বহাল করিলেন।

কারান্তরালে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিলাম—ইহার রং পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের মত উত্তম আনন্দের সহিত রুদ্ধকারার দিন কাটিল না। আমার ছোট শিশুপুত্রের জন্য মন ভার হইয়া উঠিল। লতিকা পুত্রসহ একবার দেখা করিতে আসিয়া আমার নীরব অন্তর্জ্বালা

শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া গেল। নীরব মুহূর্তে শিশুর হাস্য-মুখর মুখচ্ছবি অন্তরপটে জাগিয়া উঠিত, আর আমি দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতাম এবং কাতর হইয়া উঠিতাম।

যুদ্ধের জন্ত আন্দামানের বন্দীগণ পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কয়েক মাস পরে উত্তর বঙ্গের জেলে বদলী হইয়া রামকৃষ্ণের সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ ঘটিল। দুই বন্ধুর মিলন-আনন্দের এই খবরটির বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক নাই।

বন্দীগণের মধ্যে কত বিচিত্র রকমের খেয়াল অর্থাৎ 'হবি' দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকে একটা না একটা হবির পশ্চাতে সময় ব্যয় করে। রামকৃষ্ণের ছিল মুরগী পালনের সখ। গোটা কত মুরগীছানার পিছু তাহার সময় কাটিয়া যাইত। ছানাগুলির এক একটা নামকরণ সে করিয়াছিল, যথা—বড় গিন্নী, ছোট গিন্নী, জেলরাণী প্রভৃতি। আমি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম—শাবক-গুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি ও যত্নের সীমা ছিল না। ঠিক সময়মত সে ছাতুর-গুলি লইয়া গোটা জেলখানা ঘুরিয়া শাবকগুলির খাদ্য পরিবেশন করিত।

তাহার জীবনে বিরাট পরিবর্তনও ঘটিয়াছিল। ইহা হইতেছে তাহার আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত ধ্যান করে, ভগবদ্গীতা—উপনিষদ পাঠ করে. এবং যতদূর সাধ্য সে নিজেকে পারিপার্শ্বিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গভীরতম ভাব-জগতের সৌন্দর্য্য-রসে মগ্ন থাকে।

অতি প্রত্যুষে রামকৃষ্ণ ধ্যানাসনে চণ্ডী পাঠে রত ছিল। কয়েদী কালতু রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতে কহিল, বাবু—বাচ্চা খতম হো গিয়া। আমি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, খতম হো গিয়া কিয়ে?

রামকৃষ্ণ ধ্যানাসনে মন্ত্র পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া বন্ধ দ্বার টানিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, জলদী জমাদারকো বোলাও।

তখন পর্যন্ত দ্বার খুলিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় বিলম্ব ছিল। রামকৃষ্ণ অতি ব্যস্ত পদে কারাকক্ষে পদচারণ করিতে লাগিল এবং দ্বার খুলিবা মাত্র দ্রুত বেগে বাহির হইয়া গেল।

কয়েদী কালতুর নিকট হইতে অতঃপর খবর পাইলাম যে, রামকৃষ্ণ মৃত শাবকটিকে প্রাচীর-সংলগ্ন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ যখন শাবকগুলির ছাতুর গুলি লইয়া কক্ষের বাহিরে ছিল, কি একটা প্রয়োজনে তাহাকে খুঁজিয়া পশ্চিম প্রাচীরের নিকটে দেখিতে পাইলাম। তাহার নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম সে তৃণাসনে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মুদিত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া উঠিয়াছে। কৌতূহল দৃষ্টি প্রাচীরের উপর পতিত হইল—ইটের কুচিদ্বারা গোটা অক্ষরে লিখিত ছিল, "যুবরাজের মৃত্যু—১৮ই মার্চ, ১৯৪৩"।

নিঃশব্দে তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আমার মনে লতিকার কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ইহা প্রকাশের নহে—উপলব্ধির মাত্র।

মালাই

শ্রীদুলাল গুহ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ক'লকাতার বুকে নিত্য নতুন পরিবর্ত্তন এসে দেখা দিচ্ছে—এটা বুঝিয়ে দিতে —যুক্তির আর প্রয়োজন হবে না নিশ্চয়ই ? প্রত্যেকটি বিশেষ্যরই এক একটা নতুন বিশেষণ হয়েছে সেই থেকে—যেমন ধরুন—বাজারের আগে কালো বসে হয়েছে কালো বাজার,—ট্রামযাত্রীদের নাম হয়েছে বাদুড়ঝোলা-যাত্রী—ফিল্মের নতুন আর্টিষ্ট যারা চান্স পেয়েছে—তাদের সে চান্সকে আখ্যা দেওয়া হয় শেয়ার কেনা চান্স বলে। তেমনি আবার ধরুন ক'লকাতার বুকে বাড়ী পেতে হ'লে—মাসে জুতোর খরচ ধরে রাখতে হবে সতেরো টাকা সাড়ে তেরো আনা—আনুষঙ্গিক ধরুন—একে চা খাওয়ান—ওকে চপ্ খাওয়ান—এমনি বহু মেহনৎ করে খোঁজ পাওয়া গেল—ঠাকুর্দ্দার আমলের একখানা পুরোণো বাড়ীর—একখানা স্যাতসেঁতে ঘর। ভাড়ার কথা পরে—সেলামী দিতে হবে পাঁচশোটি টাকা। এর নাম না কম হ'লো সেলামী—এর আগে যে কত বন্ধুর পরিচিত বন্ধুকে আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে, তার তো হিসেবই নেই।

—বাড়ী চান। বেশ তো—বাড়ীর অভাব। কালই পাবেন—আজকে গোটা পনেরো টাকা এ্যাড্ভান্স দিয়ে দিন—

বন্ধুর পরিচিত বন্ধু, অবিশ্বাস আর কি করে করি বলুন—কিন্তু হায়। সেই বন্ধুর বন্ধুটি যে এ্যাড্ভান্স্ নিয়ে কোথায় আবার এ্যাড্ভান্স্ নেবার জন্য এ্যাড্ভান্স হলেন—তা ভগবানই জানেন। মরুকগে থাক—বাড়ী যখন একখানা মিলেছে—তখন আর তাদের উপর আক্রোশ জমিয়ে রাখব না—আর লাভই বা কি বলুন!

যাক, যা বলছিলাম—এহেন পরিবর্ত্তিত ক'লকাতার বুকে যদি আবার একটা অসম্ভব পরিবর্ত্তন দেখা যায়—তাতে অবাক হবার কি আছে—সবই হচ্ছে, এ আর হতে পারবে না ? আজ যদি দেখি হঠাৎ ক'লকাতার বুকের মানুষগুলোর এক একটা লেজ বেরিয়েছে—আর গরুগুলি ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্টে চড়ে—মেট্রোতে গিয়ে ছবি দেখছে, অবিশ্যি এমন কিছু হয়নি—হবার মধ্যে—খেতে বসে দেখি মাছের ঝোলের বাটিতে বাটি জোড়া একখানি মাছের খণ্ড। হঠাৎ এহেন পরিবর্ত্তন দেখে—হাসবো কি কাঁদবো কি নাচবো তাই ভাবলুম। আপাততঃ কিছুই কোরলাম না যা হোক—গিন্নীর বালাই আমার নেই——তাই মাকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলাম—

—ব্যাপার কি মা ? এত বড় একখানা মাছ ?

মা বল্লেন—

—হ্যাঁ—সে কি—জানিসনে। মাছের সের যে দশ আনা হয়েছে। পৃথিবী সুদ্ধু লোক জানে—আর—

তাই তো। আমি জানি না ? যা হোক আজকের খাওয়াটার বিবরণ আর কি দিব বলুন ? কল্পনা করে দেখুন—আমার মাছের ঝোলের বাটিটি জোড়া একখানি মাছের খণ্ড—আর আপনার মাছের ঝোলের বাটির এক-কোনে একখানা ছোট্ট কাঁটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামান্য একটু মাছ। তাহ'লেই বুঝতে পারছেন—আজকের খাওয়াটা আর আগের খাওয়াটার তফাৎ ততটুকুই, যতটুকু তফাৎ—আপনার আমার বাটির মাছের। কিন্তু এহেন তৃপ্তি করে খাওয়াটার আনন্দ তখনই উবে গেল, যখনই মনে পড়ল বাদুড় ঝোলা হয়ে অফিসে যেতে হবে। কি আর করি। দৈনন্দিন ব্যাপার, তাই কোন মতে জামাটাকে চাপিয়ে দুর্গা দুর্গা করে বেরিয়ে পড়ি—এই গলিটুকু পার হয়ে পৌছুতে হবে বড় রাস্তায়। তারপর ট্রাম ষ্টপেজে—হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে—তিন চারখানা ট্রাম চলে গেল। তারপর সুবিধে বুঝে ঝুলে পড়তে হবে—একটার ডাণ্ডা ধ'রে—মরি আর বাঁচি। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরুতে গিয়ে চক্ষু তো মশাই চড়ক গাছ—সামনের বাড়ীটার দরজায় ও কি ঝুলছে। "বাড়ী ভাড়া" : মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই

আর কি! কিন্তু পড়লে চলবে না—তাই মাথাটাকে কোনমতে সামলে নিয়ে ছুটলাম—বড় রাস্তার দিকে। দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী—নতুন চাকরী, তায় বড় সাহেব যা কড়া মেজাজের লোক। কিন্তু যাওয়ার কি আর জো আছে মশাই—পাশের আর একটা বাড়ীর উপর চোখ পড়তেই দেখি ঝুলে আছে—"টু-লেট"। আরে:—ওপাশেও একটা "বাড়ী ভাড়া," নাঃ—"বাড়ী ভাড়া" আর "টু—লেট" আমার মাথাটাই খারাপ করে দেবে দেখছি। এই টু—লেটই আজ আমার লেট করিয়ে ছাড়বে—এঁ্যা, দশটা বাজতে দশ মিনিট—সর্ব্বনাশ—দৌড়ো। কোনমতে চোখ বুজে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলাম বড়রাস্তায়—যাক, ঐ ষ্টেপেজ—বাঁচা গেল। কিন্তু—এ কি! ষ্টপেজে যে একটা লোকও নেই—ব্যাপার কি! যাকগে, না থাকে না থাক! ঐ তো, একটা ট্রাম আসছে। ভগবানের নাম স্মরণ করে তাকালাম একবার, ট্রামের দরজাটার দিকে—এ কি! ভুল দেখছি না তো? না, সত্যিই তো। ফুটবোর্ডে আজ একটা লোকও নেই। হোল কি আবার? আবার—প্লেগ লাগলো নাকি ক'লকাতায়—আর যদি বা লেগেই থাকে, তা'হলে এক দিনেই সারা হ'য়ে গেল সব লোক। যাক—যাক। বিকেলে এসে, একটা ইনজেকসান্ নিলেই হবে। উঠেতো পড়ি। কিন্তু এ কি? সর্ব্বনাশ—এ ব্যবস্থা আবার কবে থেকে হোল—মেয়েদের জন্তে আলাদা ট্রাম! তাই তো—এই ট্রামে উঠলাম! কি লজ্জার কথা বলুন তো! হঠাৎ চমক ভাঙলো ট্রাম কণ্ডাক্টারের সরু গলা শুনে,—জেন্‌টস্ সিট্ ছোড় দিজিয়ে।

এঁ্যা, বলে কি হতভাগা কণ্ডাক্টার!—তাকিয়ে দেখি—হায়! হায়! এ তো কণ্ডাকটর নয়—এ যে কণ্ডাকট্রেস!—ব্যাপার কি? যাকগে—ও বেটি কি বলছিলো,—"জেন্টস্ সিট্ ছোড় দিজিয়ে!" সে কি! আরেঃ, সত্যিই তো ঐ মেয়েটা উঠে দাঁড়াল—কি, কি লেখা রয়েছে সিট্‌টার পেছনটায়,—"জেন্টস্ অনলি," তবে কি—মেয়েদের সমঅধিকার দাবীর আন্দোলন সফল হয়েছে? কিন্তু,—হ'লো কবে? থাকগে—পরে ভাবা যাবে—ট্রামে উঠে বসিনি তো কোনদিন—আজকে একটু বসে নি। লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। কোন মতে এককোণে স'রে ব'সে জড়সড় হয়ে মেয়েটিকে বললুম—

—বসুন না আপনি।

চটে গেলো না তো? নাঃ, কি বললে?—

—থ্যাঙ্ক ইউ।

সত্যিই তো বসে পড়লো মেয়েটি। ওমা, কি অসভ্য—এই মেয়েটি, এদিকে এ রকম সরে আসছে কেন? কি আর করব? আর একটু সরে বসলাম। হঠাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে অবাক্ হয়ে দেখি—আমারই বন্ধু রতন এসে আমার পাশে বসল। আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কি বললে।—

—থ্যাঙ্ক ইউ।

আমার দিকে নির্ব্বিকার চিত্তে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল—

—কি রে, কেমন আছিস?

যেন কিছুই হয়নি। নাঃ, মাথাটা আমার খারাপ হয়ে যাবে দেখছি। এই রতন বন্ধুটি বহুদিন ধরে সিনেমার একটা চান্সের জন্ত ঘুরছে—বেচারী শেয়ারও কিনেছে অনেক। কিন্তু চান্স আর বেচারীর বরাতে মেলেনি। সেই সব ভুঁইফোড় কোম্পানীগুলো যদি দয়া করে টিকে থাকতো—তাহ'লে বেচারীর চান্স না মিলুক—অন্ততঃ পনেরটি ফিল্ম-কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার তো হোতে পারতো। এহেন রতনকে বললাম—

—কি রে কতদূর?

রতন তো অবাক!

—কিসের কতদূর!—ওঃ! চান্সের—কেন? আমার স্যুটিং তো আরম্ভ হয়ে গেছে! যতগুলো কোম্পানীর শেয়ার কিনেছিলাম—তার প্রত্যেকটিরই বই আরম্ভ হয়েছে—তবে হ্যাঁ—আমার শেয়ার কেনার টাকাগুলোও তারা ফিরিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট একটু উত্তর করলাম,—ওঃ!

অবাক্ আর হ'লুম না—রাতারাতি এত কাণ্ডই যখন হ'য়ে গেল—তখন, এতে আর অবাক্ হবার কি আছে

বলুন? যাকগে—এসে পড়েছি, এবার নাবতে হবে। ঝামেলা নেই, ধীরে সুস্থে নেবে গেলাম। কিন্তু, এ কি!—দশটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে—সর্ব্বনাশ, চাকরীটা বুঝি গেল—বড়সাহেব যা কড়া। এত কাণ্ড হয়ে গেল, আর ঘড়িটা দশ মিনিট স্লো হতে পারলো না। আরেঃ—এ কি, সত্যিই তো দশ মিনিট স্লো হয়ে গেল—দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। তাহ'লে কি তখন ভুল দেখেছিলাম—না এখন—একটা কিছু হবে। যাকগে- চাকরীটা তো বাঁচলো। দুর্গানাম স্মরণ করে—ঢুকে পড়লাম অফিসে, কোনদিকে না তাকিয়েই সটান গিয়ে বসলাম নিজের জায়গ টায়। বসে চারিদিক তাকিয়ে নেওয়াটা আমার একটা অভ্যেস—কাজেই—কিন্তু, চারিদিক আর তাকানো হ'ল না—একদিক তাকিয়েই চক্ষু স্থির মশাই—এরা আবার কোত্থেকে এল—ওরা। ওরা সব কোথায় গেল—বিনয়দা, অনঙ্গবাবু, বিলাসবাবু—তাই তো, বিনয়দার জায়গায় কে এসেছে!—আরেঃ—বিনয়দার স্ত্রী,, যে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো—তাহ'লে, অনঙ্গবাবু আর বিলাসবাবুদের জায়গাতেও বোধ হয় এসে বসেছেন তাঁদের স্ত্রীরা। ব্যাপার কি। এত কাণ্ড হয়ে গেল—আর আমি কিছুই জানতে পারলুম না। কিন্তু হ'লো কখন? বেয়ারাটা আবার এদিকে আসছে কেন—আরে আরে। বেয়ারাটার অতবড় গোঁফজোড়া কোথায় গেল—সর্ব্বনাশ। তবে কি, এ বেয়ারারা স্ত্রী?

—কি বলছ?

—বড় মেম আপকো বোলাতা?

বড় মেম। সর্ব্বনাশ—বড়সাহেবের জায়গাতেও তার মেম, নাঃ নিজেকে আর সামলে রাখা দায় হ'য়ে উঠছে দেখছি। যা হোক—চেয়ার ছেড়ে অগ্রসর হ'লাম—বড়সাহেব মানে বড়মেমের চেম্বারের দিকে। চেম্বারের পুস্ ডোর ঠেলে দাঁড়াতেই দেখলাম—সত্যিই বড়সাহেবের মেম। আমি গিয়ে দাঁড়াতে, একবার আড়চোখে তাকিয়ে মিহি গম্ভীর গলায় বললেন—

—এত লেট করে আসেন কেন?

এবার আর অবাক না হয়ে পারলুম না মশাই।—জড়সড় হ'য়ে কোনমতে বললুম—

—আজ্ঞে আমি তো লেট হইনি। এই দেখুন—

নিজের হাতঘড়ীটার উপর আগে একবার নিজেই চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে চমকে উঠলাম—দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট—হল কি আমার? মদফদ খেয়েছি নাকি? কেবলই ভুল দেখছি যে? কি আর করি। চোরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বড় মেম এবার মুচকি হেসে সেই মিহি গম্ভীর গলায় বল্‌লেন—

কাল থেকে আপনি আর অফিসে আসবেন না—আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন।

সর্ব্বনাশ—স্ত্রী কোথায় পাব? আমি যে কুমার। পঁয়তাল্লিশ টাকার মাইনের কেরাণী—একটা ইস্ত্রিকরা জামা গায়ে দিতে পারি না, তার পর আবার স্ত্রী।

ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম—

—আজ্ঞে আমার তো বিয়ে হয় নি।

সত্যিই তো হয় নি। কিন্তু, বড় মেম যদি বলে বসেন…"চলুন আপনার বাড়ীতে যাবো—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" আর সেখানেও যদি ঘড়ির মতো আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে বেকুব হই—ঘরে গিয়ে যদি দেখি সত্যি সত্যিই আমার একটি জলজ্যান্ত স্ত্রী আছে? হতে পারে—অসম্ভব কিছুই নয়—এতই হচ্ছে, আর এ হ'তে পারে না?—যাকগে, বাঁচা গেল—বড় মেম সে-সব কিছুই বল্‌লেন না,—হেসে শুধু বল্‌লেন—

আই সি, বেশ, আপনি তাহ'লে আজ থেকে আমার চেম্বারে টাইপিষ্টের কাজ করবেন।

আবার সেই সর্ব্বনাশ—টাইপ জানি না তো, মরুকগে যাক, ও একভাবে চালিয়ে নোব। বেশী কথা বলে কাজ নেই বাবা—বড় মেম যা কড়া। ধীরে ধীরে টাইপ-রাইটিং-টেবিলটার কাছে চেয়ারটা টেনে বসলাম। বসে ভাবছি, কি করা যায়। আড়চোখে একবার বড় মেমের দিকে তাকাতে দেখি—বড় মেম দেরাজ থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে উঠে দাঁড়ালেন প্যাকেট-টাকে খুলে কি বার করলেন ও-খানা। একখানা শান্তিপুরী ধুতি? তাই তো। চমকে উঠলাম, বড় মেমের গলা শুনে—

—দেখ, কেমন একখানা ধুতি এনেছি—তোমার জন্তে।

আমার বড্ড ভয় হ'ল। নাঃ—বড় মেমটার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—আমি চাকরি ছেড়ে দেব। নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব। লজ্জায় ঘৃণায় আমার কপাল ও ভাঙা গাল দুটো রাঙা হ'য়ে উঠলো। মাথা নীচু করে বসে রইলুম। কিন্তু, এ-কি! বড় মেম যে আমার দিকেই আসছে—নাঃ—আমি চীৎকার করে উঠব—সত্যি বলছি। নাঃ—তবুও আসছে! আমার চোখটা কি রকম ঝাপসা হ'য়ে আসছে, ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না! কাছে—আরো কাছে—প্রবল ধাক্কা।

—এই…

ওরে বাপ রে! চমকে উঠলাম.—

—কে?

—কি রে উঠবি নে? আটটা বাজে—

এঁ্যা, সেকি, আটটা—বড় মেম, বড় মেম কোথায়? এ যে বড়দি—কি বলছে?—ভাখ, কাপড় এনেছি—পছন্দ হয়েছে—

পছন্দ! বড়দি? বড়মেম, তবে কি এতক্ষণ…। কিন্তু এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে? হঠাৎ মনে পড়লো—ওহো কালকে রাত্রে তিনটে মালাই খেয়ে বাড়ীতে এসেছিলাম। এ মালাইয়েরও যে বিশেষণ আছে একটা—সিদ্ধির মালাই—এমনি নয়। তারই এ্যাকসন্ চলছিল তা হ'লে—যাকগে বাঁচা গেল।

—বড়দি, কখন এলি!

—এই তো—এইমাত্র। তা এ কি বাড়ী ভাড়া করেছিস? ভাল দেখে একখানা বাড়ী দেখ।

কি আর বলি? ভাল বাড়ী মেলানো যে কতো অসম্ভব—তা তো আর বড়দি বুঝবে না, কিন্তু হঠাৎ কি মনে পড়তে আমার চোখ ফেটে জল এল, তাই তো—যদি সম্ভব হ'ত। কিন্তু অসম্ভব সম্ভবে শুধু তারই কৃপায়।

UDENT … G. A … MON-ROO

গান

শ্রীরমেন মৈত্র

নয়ন ঘুমালে মন জেগে রয়
স্মৃতির সুরভি নিয়া,
অশ্রুতে আঁখি ভরে ওঠে যবে
ঘুমায় বিরহী হিয়া।
মনে পড়ে কবে এমনি গোধূলি
বিদায় দুয়ার দিয়েছিল খুলি,
তুমি চলে গেলে মোর বাহুপাশে
রাখীবন্ধন নিয়া।

আজ দিন অবসানে উদাসী হাওয়ায়
ঝরে যে তাহারি ফুল,
বেলা নাহি যেতে খেলা না ফুরাতে
কোন্‌খানে হোল ভুল!
মনে ভাবি যেই সুর একদিন
বেঁধেছিল দু'টী হৃদয়ের বীণ,
না বাজিতে হায় কোথায় হারালো
মিলালো কোথায় গিয়া।

পরিব্রাজক কামনীত

লেখক—কার্ল গিয়েলারপ

অনুবাদক—শুদ্ধোধন সেন

স্বামী

একদিন সকালবেলা প্রধান মালিকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যানের এদিক ওদিক দেখছি ; কোন স্থানে কী ধরণের পরিবর্ত্তনে কতখানি চমৎকারিত্ব সাধিত হ'তে পারে আলোচনা চলছে তারই। এমন সময় নিজস্ব বুড়ো গাধায় চেপে বাবা দর্শন দিলেন।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। সশ্রদ্ধভাবে নামতে সাহায্য ক'রে উদ্যানের দিকে যাচ্ছি ; তখনও আমার ধারণা, তিনি আমার উদ্যানের পুষ্পরাজির শোভা সন্দর্শনে এসেছেন। তিনি কিন্তু প্রথমেই যে ঘরখানি পড়ল তাতেই ঢুকে পড়লেন। জলযোগের ব্যবস্থা করতে আদেশ করলাম, বললেন, প্রয়োজন নেই। নিভৃতে কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

বুঝলাম সংক্রান্তি সন্নিকট ; মস্ত একটা অস্বস্তি নিয়ে নীচু একটা আসনে বসলাম।

গভীর আগ্রহে পিতৃদেব বলতে আরম্ভ করলেন, "পুত্র, এ পর্য্যন্ত তোমার স্ত্রী তোমায় দুটী কন্যা উপহার দিয়েছেন ; তুমি পুত্রহীন, ভবিষ্যতে হবারও কোন আশা নেই। যার মৃত্যুর পর পিণ্ড দেবার জন্য আত্মজ রইল না, তার অপেক্ষা হতভাগ্য কে ? মৃত্যুতে তার সান্ত্বনা কোথায় ?"

আমার অস্বস্তি অস্থিরতায় পরিণত হ'ল ; অবস্থা বুঝে পিতৃদেব কথা ঘুরিয়ে বললেন, "তোমায় দোষ দিই নে পুত্র !" আমার অবস্থা হ'ল আরও বিব্রত। এতে আমার দুষবারই বা কী থাকতে পারে। তবু লোকাচার অনুযায়ী সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম ; কৃতজ্ঞতাকে বাস্তবতার রূপ দেবার জন্য নত হ'য়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম।

বললেন, "নাঃ, দোষ আমারই। দোষই বা বলি কেন, ভুল। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময় পাত্রীর দৈহিক রূপ আর তাঁর পিতৃকুলের আর্থিক সঙ্গতিটারই সবিশেষ বিবেচনা করেছিলাম, মেয়ের লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখি নি। এবার তোমার জন্য যে পাত্রীটি স্থির করেছি, তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থাকে কোন প্রকারে সচ্ছল মাত্র বলা চলে ; চপলমতিরা যাকে নারীর রূপ বলে, তাও মেয়ের নেই। কিন্তু লক্ষণের দিক হ'তে পাত্রী একান্ত যোগ্যা। নাভি সুগভীর, দক্ষিণ দিকে ঈষৎ বক্র। হাতে পায়ে পদ্মরেখা, চক্র, অটুল, কেশ সরল মসৃণ, শুধু ঘাড়ের কাছে দুটী কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ আছে। গুণীদের মতে এ বড় সুলক্ষণ, "এইরূপ সুলক্ষণা পঞ্চ বীর-পুত্রের জননী হন।"

জানালাম, সৌভাগ্য অর্জ্জনের এমন সুযোগ লাভে আমি কৃতার্থ এবং তিনি যে অনুগ্রহ করে আমার জন্য এতখানি চিন্তা করেছেন তার জন্যও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ভাবলাম যখন "নান্য পন্থাঃ তখন আর…", জানিয়ে দিলাম পাত্রীকে গৃহে বরণ করবার জন্য তন্মুহূর্ত্তেই আমি প্রস্তুত।

"এখনই !" পিতৃদেব সাতঙ্ক বিস্ময় প্রকাশ করলেন। "ধৈর্য্য ধর, বৎস ! এখন দক্ষিণায়ন। সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণ হ'ক, শুভ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একটা শুভদিন দেখে চারি হাতে মিলিয়ে দেব। তার আগে নয়, বৎস, তার আগে হ'তে পারে না। তা না হ'লে যে পাত্রীর সর্ব্ব সুলক্ষণই অলক্ষণে পরিণত হ'য়ে যাবে।"

তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলাম—শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। নির্দ্দেশিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে থাকব, তা ছাড়া, তিনিই আমার ভরসা ; তাঁরই জ্ঞানালোকে আলোকিত পথই আমার একমাত্র পন্থা। পিতৃদেব বিশেষ তুষ্ট হ'লেন ; আমার কর্ত্তব্যপরায়ণতার সবিশেষ প্রশংসা করলেন, তাঁর আন্তরিক আশিষে অভিষিক্ত হলাম।

পিতৃদেব জলযোগের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্ব শুভসমন্বিত শুভ দিনটীর প্রতি আমার কোন লোভ ছিল না ; কিন্তু যথাকালে তার আবির্ভাব হ'ল। আনুষ্ঠানিক কৃত্যগুলি এবার আরও বেশী বিরক্তিকর বোধ হ'ল। পুরো চৌদ্দদিন মন্ত্রগুলি মুখস্থ করতে লেগে

গেল। বিবাহের দিন নূতন শ্বশুরবাড়ীতে আমি তো ভয়েই অস্থির—কোথায় কোন মন্ত্র ভুল হ'য়ে যায়, কোন শব্দ বাদ পড়ে, কি উক্তির সঙ্গে কৃত্যের সমন্বয় না হয়—শঙ্কায় ঘেমে উঠি। জানতাম এ সব শুভের ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি হ'লেও পিতৃদেব ক্ষমা করবেন না। ফলে প্রধানতম কৃত্য—কন্যার অঙ্গুষ্ঠধারণ যার ফলে পুত্রের জন্ম সম্ভব, তা না করে ধরতে গেলাম তাঁর তর্জ্জনী—এর অবশ্যম্ভাবী মারাত্মক ফল কন্যালাভ, কিন্তু পাত্রীর উপস্থিত বুদ্ধি অতুলনীয়। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী বাড়িয়ে দিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য গাড়ীতে উঠে বসে তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তখনও দেখি অদৃষ্টের কৃত্য আছে। স্ত্রী আমার কণ্ঠবেষ্টনীর ছিদ্রগুলিতে একটী করে ফলবান শাখা পরাবেন আর আমায় একটী মন্ত্র একবার করে আবৃত্তি করতে হবে। সত্যসত্যই আমার ঘর্ম্মস্নান তখন সম্পূর্ণ। তথাপি আমার মনে তখন সান্ত্বনা, সঙ্কট মোচন তা হ'লে হ'ল। কিন্তু প্রকৃত সঙ্কটের সূচনা হ'ল সেখানেই।

এ সব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র প্রকারের অশুভ শুভযাত্রীদের প্রতি পদে ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং অতি উদ্গ্রীব হয়ে থাকে আত্মপ্রকাশের জন্য। কিন্তু আমার শুভযাত্রা বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত পুরোপুরি শুভই থেকে গেল। গাড়ী হ'তে বধূবরণ করলেন তিনটী সধবা সপুত্র এবং অপাংশুলা ব্রাহ্মণী। কিন্তু অশুভের কি আর শান্তি আছে, বধূর চরণ চৌকাঠ স্পর্শ করে করে—চক্ষের নিমেষে আমি তাঁকে শূন্যে উত্তোলন করলাম! এ প্রেরণা সহসা সেদিন কোথা হ'তে পেয়েছিলাম আজও জানি নে। কিন্তু ঐ প্রকারে তোলাটাও নাকি একটা খুঁৎ। কী আর করা যাবে? বিমর্ষ চিত্তে গৃহপ্রবেশ করছি; বাম পদক্ষেপটী আগে করতে হ'ত, মনের আলোড়নে করলাম দক্ষিণ পাদক্ষেপ। ভাগ্য ভাল! পিতৃদেব ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা তখন চৌকাঠ স্পর্শের সম্ভাব্য বিপদের আলোচনায় আত্মহারা, আমার অশিষ্ট পদক্ষেপ উপেক্ষিত থেকে গেল।

আঙিনার কেন্দ্রস্থলে রক্ষিত হয়েছিল লোহিত ষণ্ডের সলোম চর্ম্ম, অজিনের স্কন্ধদেশ পূর্ব্বাভিমুখী; সস্ত্রীক তার উপর বসলাম; বধূ রইলেন দক্ষিণে, আমি বামে। বহু সন্ধান ও অপরিমিত কষ্টে পিতৃদেব কোথা হ'তে একটী বিস্ময়কর ব্রাহ্মণ তনয় আবিষ্কার করেছিলেন, এর শুধু সহোদর আছে, জীবিতা বা মৃতা সহোদরা নেই; এর পিতারও শুধু সহোদর ছিল, সহোদরা ছিল না; এর পিতামহ ও প্রপিতামহ সম্বন্ধেও ঐ একই ইতিহাস। সাক্ষ্যপ্রমাণ সহকারে ইতিবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এবার বালককে আমার স্ত্রীর কোলে বসান হবে। স্ত্রীর পার্শ্বে সপদ্ম তাম্রস্থালী রক্ষিত হয়েছে; পদ্মটী বালকের অঞ্জলিতে দেওয়া হবে। সবই প্রস্তুত। কিন্তু ঠিক এই শুভ মুহূর্ত্তে বালকের আর কোথাও দেখা নাই। বহু অন্বেষণের পর একটী ভৃত্য তাকে যজ্ঞাগ্নির পার্শ্বস্থ যজ্ঞশয্যায় আবিষ্কার করলে, তৃণশয্যায় সে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত। এদিকে নির্দ্ধারিত কাল উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে; নূতন যজ্ঞ-শয্যারও প্রয়োজন; তার জন্য প্রয়োজন সূর্য্যোদয়ে কুশসংগ্রহ। নির্দ্ধারিত সমস্ত ব্যবস্থাই উল্টে গেল।

যা হ'ক লগ্ন অতিক্রান্ত হ'তে দেওয়া হ'ল না। কোন্ প্রকারে শুধু পুত্রবতী কোন নারীর এক তনয়কে নিয়ে কৃত্য সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু অনুষ্ঠানের এই শ্রেষ্ঠ কৃত্যের ত্রুটিতে পিতৃদেবের সে কি উত্তেজনা। আমার তো বেশ ভয়ই হ'ল, এর জন্য তাঁর মূল্যবান প্রাণটা না যায়! তবু ভরসা তাঁর সুবিবেচনা। এমন সময় অনর্থক যায় তিনি অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'তে কিছুতেই দেবেন না! কিন্তু এই মহান সান্ত্বনা ঠিক সেই সময়টাতে পাই নি। শঙ্কায় দুশ্চিন্তায় তখন আমি প্রায় শহীদ হ'য়ে গেছি। স্থির করলাম, অবিরত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলব, পিতৃদেব যেন প্রাণত্যাগ করবার সময় না পান।

মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করে চললেও মনে অবিরত বলছিলাম, ভাগ্যে স্বর্গ নরক যাই থাক বিবাহ আর করছি না।

শেষ পর্য্যন্ত করবার যা কিছু ছিল শেষ হ'ল; এখন দ্বাদশ দিবস ও রাত্রি নূতন স্ত্রীর সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। মন্দের ভালো। হ্যাঁ, পিতৃদেবের বর্ণনা হ'তে আমার ধারণা হয়েছিল, স্ত্রী হবেন রূপে রাক্ষসী; দেখলাম রূপসী না হ'লেও রাক্ষসী নন। দেহমনের পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে কঠোরভাবে ব্রত ও উপবাস ক'রে

চলেছেন, ব্রতের আঙ্গিকরূপে কম্বল হয়েছে তাঁর পবিত্রতম শয্যা। এ দিকে আমার প্রাণ যায়, পিতৃদেবের লক্ষ্য, বেশী হ'ক ক্ষতি নাই, কম না হয়ে যায়; কাজেই পল অনুপলের হিসাবে দ্বাদশটা রাত্রি অতিবাহিত করতেই হবে। আমার ভোজনবিলাস অন্য সকল কিছুর মতই যুরে রইল। কোথায় সুপাচিত ভোজ্য আর কোথায় ফল আর মূল।

যা হ'ক শিক্ষানবিশীর বারটা দিন ও বারটা রাত্রি তো? কাটল শেষ পর্য্যন্ত। আবার পূর্ব্বাভ্যস্ত জীবন আরম্ভ হ'ল, কিন্তু অভ্যাস রইল, পূর্ব্বের জীবন আর রইল না—পূর্ব্বের ও এখনের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য অনেকখানি এসে গেল। অনতিবিলম্বে বুঝতে পারলাম, বাবা বিবাহের প্রস্তাব করবামাত্র মনে যে একটা শঙ্কা ঢুকেছিল তাকে অমূলক বলা চলে না। তখন অবশ্য মনে হয়েছিল, সংসার যখন করেছিই তখন স্ত্রী একটা থাক বা দুটো থাক, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার এমন কী থাকতে পারে? পরে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলাম সে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা।

প্রথমা স্ত্রী এতদিন একান্ত শান্ত ছিলেন, এত শান্ত যে বোকাটে বললে অত্যুক্তি হয় না, জলে উঠতে কখনও দেখিনি। আর দ্বিতীয়া স্ত্রীর তো কথাই নেই—নারীসুলভ নম্রতার জন্যই তিনি পিতৃদেবের মনোনীতা এবং পরিচিত মহলে যশস্বিনী। কিন্তু ঐ যে বলে হাঁড়ির জল আর উনুনের আগুন—যতক্ষণ নিজের-নিজের গণ্ডীতে ততক্ষণ উপকারের উৎস, সুখের আকর; কিন্তু যেই এক সেই কোঁস; যার দাপট বেশী সে বরং কিছু শান্ত কিন্তু দুর্ব্বলের নিনাদ যে কাণকে অবাঞ্ছিত ইন্দ্রিয় বলে বুঝিয়ে দেয়। ত্রয়োদশ কুপ্রভাতে আমার গৃহে কোঁসকোসানি আরম্ভ হ'ল। কিন্তু তাতেও কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে চলছিলাম। এর পর দ্বিতীয়া যখন প্রতিশ্রুত পঞ্চবীর পুত্রের প্রথমটির জন্ম দিলেন তখনকার অবস্থাটা, পারেন তো, একবার কল্পনা করুন। প্রথমার অভিযোগ আরম্ভ হল, দ্বিতীয়বার উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রবল আগ্রহ নাকি আমার পূর্ব্বাপরই ছিল এবং সেই আগ্রহ বশে তাঁর গর্ভে প্রথম পুত্র লাভের যোগ্য যজ্ঞ করি নি অর্থাৎ সজ্ঞানে তাঁকে বঞ্চনা করেছি। এদিকে উভয়ে বিবাদ হলে দ্বিতীয়া রীতিমত শয়তানী নৃত্য শুরু ক'রে দিতেন। তারপর দুজনের পদাধিকার নিয়ে বিবাদের তো অন্ত নাই। প্রথমা প্রথম আগমনের অধিকারে প্রথম স্থান দাবী করেন, দ্বিতীয়া প্রথম পুত্রের জননীরূপে প্রথম স্থান দাবী করেন। কিন্তু এই শেষ নয়। একদিন দ্বিতীয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে দাবী জানালেন, প্রথমাকে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত করা হ'ক, কারণ, তিনি নাকি আমার আত্মজটাকে বিষ দেবার প্রচেষ্টা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে দুলালকে অত্যধিক মিষ্টান্ন ভোজন করান হয়েছিল, ফলে অন্ন ও শিশুর অবস্থা বিপর্য্যস্ত, প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাঁকে তাড়ালাম।

হাঁফ ছাড়ছি, আবির্ভাব হ'ল প্রথমার। তাঁর দুলালিকে নাকি বিষপ্রয়োগের জন্য দ্বিতীয়ার যড়যন্ত্রের বিরাম নাই, সন্দেহের কারণ যথোপযুক্ত—প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কন্যাদ্বয়কে অপসারিত করতে পারলে পুত্রের সম্পদ হ'তে আর যৌতুক দিতে হবে না। অতএব দাবী হ'ল সে শয়তানীকে বাড়ি হ'তে বিতাড়িত করা হ'ক।

বাড়িতে আর শান্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত রইল না। ভাই, আসবার সময় এখানকার এক ব্রাহ্মণবাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কি? বেশ, তা'হলে আপনি আমার বাড়ির অবস্থা বেশ কল্পনা করতে পারবেন। নিশ্চয় শুনেছেন, কেমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব্রাহ্মণীদ্বয় পরস্পরের প্রতি কর্কশ বিশেষণ নিক্ষেপ করছেন। ব্যাস, তা হলেই আপনি আমার বাড়ির পাশ দিয়ে গেছেন ধ'রে নিতে পারেন।

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় এবার উজ্জেনীতে প্রবাদ হ'ল—"আহা দুজনে কী মিল, ঠিক যেন কাম'নীতর দুই বৌ!"

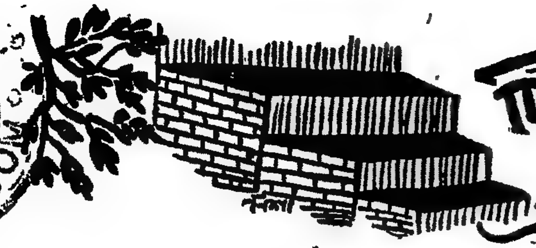

দিদিরাণীর ঘাট

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বারো

আশ্চর্য্য! যমুনার কথা মনে পড়াতেই প্রাণে যেন একটা জোর পেলাম—সটান গিয়ে শুয়ে পড়লাম শোবার ঘরে, বিছানায়, বরুণকে জড়িয়ে ধরে। মাথার মধ্যে তখনও কিরকম করছে—বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

শোবার ঘরে আজকাল পাশাপাশি দু'খানা খাট পাতা আছে—একটায় আমি বরুণকুমারকে নিয়ে শুই, আর একটায় শোন ডাঃ রায়। পরের দিন ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—চেয়ে দেখি ডাঃ রায় পাশের খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছেন। মাথা যেন আচ্ছন্ন, কোন কথাই পরিষ্কার মনে পড়ছে না, মনের মধ্যে সবই যেন কেমন এলোমেলো। তবে—ডাঃ রায়ের দিকে চোখ পড়াতেই মন কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। কোনও কিছু না ভেবেই বিছানা থেকে উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

বারান্দায় এসে ভোরের আলোর দিকে চেয়ে একে একে সমস্ত কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। সত্যিই কি ছবিখানা ফেলে দিয়েছি রাস্তায়—নিঃশব্দে মাঝের ঘরে ঢুকে গিয়ে দেখি, দেওয়ালে ছবি নেই। সামনের বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—ছবি ত' সেখানেও নেই। নিজের কাছে নিজেই যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

মনে পড়ে গেল কাল রাত্রের পিছনের আতঙ্কের কথা—সত্যিই কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল!

ডাঃ রায় রাত্রে খেয়েছেন ত? —তাঁর খাবার রান্নাঘরে উনুনের কাছে ঢাকা দিয়ে রেখে আমি এসে বসেছিলাম মাঝের ঘরে—তিনি ফিরে এলে খাবার সাজিয়ে দেব। তাড়াতাড়ি গেলাম রান্নাঘরে—খাবার ত যেমনি ঢাকা দেওয়া ছিল তেমনি রয়েছে, খান নি ত'। রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—চাকরটা নীচে থেকে হাত-মুখ ধুয়ে উঠে এল।

গম্ভীর ভাবে শুধালাম, "রাত্রে বাবু খান নি কেন?"
বল্লে, "আমি ত' বলেছিলাম—বল্লেন, খাব না।"
ধমকের সুরে শুধালাম, "তা আমাকে ডাকলি না কেন?"
বল্লে, "দু'তিন বার ডাকলাম ত—আপনি উঠলেন না।"
"বাবু আর ডাকতে বারণ করলেন।"
আমি কি ছাই সত্যিই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

* * *

সমস্ত দিন ডাঃ রায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলই না। আমিও এড়িয়ে চললাম—তিনিও কিছু বল্লেন না। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে কলেজে চলে গেলেন—আজই কলেজের শেষ দিন।

সমস্ত দিন ছবিটার কথা মনের মধ্যে নানান দিক দিয়ে তোলপাড় করেছে—একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত প্রাণের মধ্যে রইল ফুটে। ছবিখানা ও-রকম ভাবে ফেলে দিয়ে অন্যায় কাজ করেছি এ কথা নিজের কাছে মানতে নিজে লজ্জা পাই, তাই যেন মানতে চাই না। অথচ ব্যাপারটা না ঘটলেই যেন হ'ত ভাল। ক্রমে মনকে বোঝালাম—অপরাধী যদি হইও আমার এ-অপরাধের অনুপ্রেরণা এল কোথা থেকে? কেন ও-ছবিখানা আমাকে অমন করে পাগল করল? কে ছিল ঐ ছবিখানার পিছনে তার জাগ্রত মনের সমস্ত অনুভূতি নিয়ে?

ছবিখানার কথা যদি শুধান কি বলব সেদিক দিয়েও প্রাণের মধ্যে একটা অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলাম। মিছে কথা বলব না অথচ সত্যকথা বলতেও পারব না। সত্য কথা বলতে হলে সেই ত এসে দাঁড়াবে আমাদের কথার মাঝখানে। এ কি উপদ্রব! সে যেন জুড়ে

বলেছে সব—তাকে যেন এড়িয়ে চলার আর উপায়ই নেই।

* * *

ফিরে এলেন সন্ধ্যা ঘুরে গেলে। আজ ত' সকাল সকাল ফিরে আসার কথা কলেজে কোনও কাজই ত' নেই—এত দেরী হওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। মুখে কিছু শুধাতে বাধল। উনিও কিছু না বলে মুখ হাত ধুয়ে মাঝের ঘরে একটা বই নিয়ে বসলেন।

একটা সেলাই নিয়ে গিয়ে চুপ করে বসলাম মাঝের ঘরে; আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, "কাল রাত্রে তোমার হয়েছিল কি?"

শুধালাম, "কেন?"

বল্‌লেন, "অত ডাকাডাকিতেও উঠলে না।"

বল্‌লাম, "বড্ড মাথা ধরেছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

শুধালাম, "তা ধাক্কা দিয়ে ডাকলেই হ'ত।"

বললেন, "কি তার প্রয়োজন—আমিও ক্লান্ত ছিলাম।"

শুধালাম, "কাল রাত্রে খাওনি কেন?"

বললেন, "ক্ষিদে ছিল না—ছেলেরা খাওয়া দাওয়ার প্রচুর বন্দোবস্ত করেছিল।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এইবার উনি কথা কইলেন।

শুধালেন, "ছবিখানা খুলে নিয়েছ দেখছি কেন?"

বললাম, "ও-ছবিখানা দেখতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না।"

শুধালেন, "কেন? তুমিই ত' ছবিখানার খুব প্রশংসা করেছিলে আমার কাছে।"

বললাম, "করেছিলাম—এখন আমার মত বদলে গেছে।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বেশ, ছবিখানা না হয় ও-ঘরে আমার লেখার টেবিলের সামনে টাঙিয়ে রেখে দিও।"

একটু চুপ থেকে বললাম, "ছবিখানার প্রতি তোমার একটা নিদারুণ নেশা আছে দেখছি।"

বললেন, "হ্যাঁ—ছবিখানার মধ্যে আমি অনেক কিছু পাই।"

বললাম, "কি? হারিয়ে যাওয়া সব অনুভূতি?"

ডাঃ রায় হঠাৎ কেমন একরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলেন। চোখ নামিয়ে নিলাম। বললেন, "ঠিক তা নয়। নিজেকেই যেন খুঁজে পাই ছবিখানার মধ্যে।"

শুধালাম, "নিজেকে হারালে কত দিন?"

বললেন, "মাঝে মাঝে সকলেই নিজেকে হারায়।"

বললাম, "ছবিখানা তাহ'লে তোমার জীবনের ধ্রুবতারা।"

বললেন, "তা' হবে।"

গম্ভীরভাবে বললাম, "ও-ছবি এ-বাড়ীতে টাঙান চলবে না।"

শুধালেন, "কেন?"

বললাম, "ও-ছবিখানার মধ্যে তুমি নিজেকে খুঁজে পেতে পার কিন্তু আমি নিজেকে হারাই। নিজেকে হারাতে রাজী নই আমি।"

বল্‌লেন, "বেশ।—ছবিখানা আমাকে দিও, আমি আমার টেবিলের দেরাজে রেখে দেব।"

বল্‌লাম, "এবং লুকিয়ে মাঝে মাঝে দেখবে—এই ত'?"

বল্‌লেন, "তা' ছাড়া আর উপায় কি?"

বল্‌লাম, "তা হবে না।"

বল্‌লেন, "কেন?"

বল্‌লাম, "লুকোচুরি সইতে পারবো না আমি।"

একটু স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে সোজা চাইলেন আমার দিকে।

শুধালেন, "ছবিখানা কোথায়?"

বল্‌লাম, যেখানেই থাকুক, সে-সন্ধান তোমাকে আমি দেব না।"

আবার একটু চুপ করে থেকে তিক্তভাবে বল্‌লেন, "তুমি আমার উপর অত্যাচার সুরু করলে।"

একটু অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "আর তুমি? তুমি কি করছ? তুমি অত্যাচার করছ না?"

গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

প্রাণের উত্তেজনা যেন সপ্তমে চড়ল। চেঁচিয়েই

বললাম, "যা করছ, তাতে মাথা খারাপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। তিলে তিলে দগ্ধ করছ আমাকে—এত নিষ্ঠুর তুমি। কি—কি করেছি আমি তোমার ? তোমাকে বিবাহ করেছি—সে-কি আমার অপরাধ ? তুমিই ত' চেয়েছিলে—আমি ত' যেচে তোমার কাছে আসিনি।"

নিদারুণ আবেগে কথা জড়িয়ে গেল। বুক ছাপিয়ে কান্না এল, তাকে রোধ করার শক্তি পেলাম না।

ডাঃ রায় উঠে এলেন আমার কাছে—বসলেন আমার চেয়ারের হাতলের উপরে। একখানা হাত রাখলেন আমার পিঠে। তাতে স্নেহের স্পর্শ ছিল—সহজেই পিঠের ভিতর দিয়ে অন্তরে গিয়ে পৌঁছল। ক্রমে কান্নার বেগ রোধ হয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রায় বললেন, "শরীরের মত মনেরও ত' ব্যাধি আছে—হলে কষ্ট পেতেই হয়। ক্রমে সেরে যাবে।

চুপ করে রইলাম—কি-ই বা বলব। কিছুক্ষণ পরে পরম স্নেহভরে বললেন, "ভয় পেও না। মেঘ করেছে—কেটে যাবেই। মেঘ চিরদিন থাকে না।"

একটু পরে বললাম, "আমার একটা কথা রাখবে ?"

বললেন, "বল।"

বললাম, "তোমার ত' ছুটী হ'ল। চল আমরা কলকাতা থেকে কোথাও বাইরে যাই। না হয় সেই গাজুড়ীই যাই—চল।"

ডাঃ রায় চুপ করে রইলেন—কোনও জবাব দিলেন না।

বললাম "চুপ করে রইলে কেন ? চল, কালই রাত্রের ট্রেণে রওয়ানা হই। আমি কাল দিনের মধ্যেই সব গুছিয়ে নেব। আমি কলকাতায় আর এক দণ্ডও থাকতে পারছি না।"

ধীরে ধীরে ডাঃ রায় বললেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে—এখুনিই কলকাতা থেকে বেরুনো সম্ভব নয়। বাবার শরীর আবার ভীষণ খারাপ হয়েছে—আমি সেইখানেই সমস্ত বিকেলটা ছিলাম। একটু ভালর দিকে গেলেই তোমাকে নিয়ে বাইরে যাব।"

* * *

ভগবান যখন মারেন—বেঁধে মারেন। মেজ বৌদির গোপালের কাছে কি এমন অপরাধ করেছি যে, চারিদিক থেকে আমাকে এমন শাস্তি দিচ্ছেন।

ডাঃ রায় বলেছিলেন—'মেঘ করেছে কেটে যাবেই। কিন্তু মেঘ কাটা ত' দূরের কথা—আরও যেন ঘনিয়ে এল। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে—আমার দিগন্তের কোথাও মেঘ কেটে যাওয়ার এতটুকুও আভাষ পাই না।

নিজেকেই শুধাই—কি হয়েছে আমার ? কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাই না। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কিছুই ত ঘটে নি—সবই ত ঠিক আছে। কিন্তু অন্তর আমার কেন কাঁপে ? তার দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু প্রতিমুহূর্তে ধ্বসে ভেঙে যাচ্ছে কি ? ডাঃ রায় বলেছেন—এ আমার মনের ব্যাধি। সময় সময় ভাবি হয় ত ওঁর কথাই ঠিক, তাই মন কাঁপে—তার দাঁড়াবার ঠাঁই মজবুত পাথর দিয়ে বাঁধান, ধ্বসে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু ব্যাধিই যদি হয় তার ত চিকিৎসার প্রয়োজন। সে চিকিৎসা ত করবেন উনিই। ব্যাধিকে অবহেলা করলে ত ব্যাধি বেড়েই যাবে।

আকুল হয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালাম—সে কথার কি কোনই মূল্য হল না ওঁর কাছে ? পিতার অসুখ বেশী—কিন্তু আমার মনের ব্যাধির পরিচর্য্যা কে করে। দিনের পর দিন কেটে যায়, বেশীর ভাগ সময় এখন সেই বাড়ীতেই থাকেন। রাত্রে অবশ্য এ বাড়ীতেই এসে শোন—দুদিন পরে হয় ত তাও দেবেন বন্ধ করে।

যতটুকু এ বাড়ীতে দেখতে পাই—একটা দারুণ উদ্বিগ্ন মন নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন, আমার দিকে ফিরে চাইবার যেন ফুরসুৎই নেই। সমস্ত দিন বরুণকুমারকে নিয়ে থাকি—সেই যেন আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। সত্যই কি আমি কিছুই নই ওঁর কাছে ? অনুপমার স্মৃতির কথা ছেড়েই দিচ্ছি—ওঁর পিতাও কি আমার চেয়ে ওঁর মনের দিক দিয়ে বড় ? আমি কি বানের জলে ভেসে এসে ওঁর দুয়ারে আশ্রয় নিয়েছি ? দয়া করে দিয়েছেন আমাকে আশ্রয় ?

মনের যখন এইরকম অবস্থা,—একদিন দাদাকে

একখানা চিঠি লিখলাম। দাদা ইদানীং অবনীবাবুর মোকদ্দমা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন—প্রায়ই খুলনা যাতায়াত করেন এবং ইতিমধ্যে একবার মাধবপুরে গিয়েও ঘুরে এসেছেন জানি।

দাদাকে লিখলাম "দাদা! আমার শরীরটা ইদানীং মোটেই ভাল যাচ্ছে না। এখন ত ওঁর কলেজের ছুটী, দিনকতক কোথাও হাওয়া বদলাতে বাইরে ঘুরে এলে ভাল হয়। কিন্তু শুনেছ ত ওঁর বাবার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ চলছে—তাই ওঁর এখন কলকাতা ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। তুমি যদি তোমাদের জমিদারী থেকে নির্ভর-যোগ্য কোনও কর্ম্মচারীকে দিতে পার তাহলে আমি বরুণকুমারকে নিয়ে কলকাতা থেকে কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি।

আবার কবে খুলনায় যাচ্ছ? যাওয়ার আগে একদিন দেখা করে যেও কিন্তু।"

ঝোঁকের মাথায় চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলাম, তার পরেই মনে একটা দ্বিধা এল। আমার শরীর খারাপ, হাওয়া বদলান দরকার, অথচ দাদাকে এতদিন কিছু জানাই নি—দাদা ভাববেন কি? কি হয়েছে আমার—শুধালেই বা কি বলব! ডাঃ রায়কে যদি দাদা শুধান তিনি হয় ত অবাক্ হয়ে যাবেন, হয় ত বলবেন—আমি কিছুই জানি না—ছিঃ ছিঃ! দাদার কাছে চরম খেলোমির পরিচয় দেওয়া হবে যে। হায় রে! এত লোকের অসুখ করে আমার শরীরে কি ছাই কোনও অসুখও হতে নেই। সেই দিন রাত্রেই মেজবৌদির গোপালের কাছে প্রার্থনা করলাম "তুমি যদি সত্য হও, তবে এইটুকু করুণা আমাকে করো, আমার যেন নিদারুণ একটা অসুখ করে। এমন অসুখ করে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়—যে কোনও মুহূর্ত্তে শেষ হয়ে যেতে পারে।"

প্রার্থনা করে মনে যেন একটা তৃপ্তি পেলাম। যদি প্রার্থনা পূর্ণ করেন কি ভালই হয়! সেই অগ্নিপরীক্ষায় ডাঃ রায়কে ফেলে ওঁর প্রাণের খাঁটী সত্যটুকু আমি যাচাই করে নিতে চাই। দেখি, আমার সেই অবস্থায় উনি কি করেন—নিজের পিতাকেও ছাড়তে পারেন কি না?

*

দাদা এলেন পরের দিনই বিকেল বেলা। ডাঃ রায় ত বেশীর ভাগ সময়ই ওবাড়ীতে পিতার কাছে থাকেন কিন্তু এ সময়টা বাড়ীতেই ছিলেন। না থাকলেই যেন হত ভাল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দায় আমার সঙ্গে দাদার দেখা—পাশের ঘরের মধ্যেই ডাঃ রায় আছেন বসে। দাদা একটু ব্যস্তভাবে শুধালেন—"কি হয়েছে তোর?"

হেসে বললাম "ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়।"

"তবে?—দাদা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

ডাঃ রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "এই যে আসুন।"

দাদা শুধালেন—"আপনার বাবা আছেন কেমন?"

ডাঃ রায় বললেন—"এখনও বিপদ কাটে নি। তবে হার্টের যন্ত্রণা এ ক'দিন যেমন ঘন ঘন হচ্ছিল কাল থেকে একটু যেন কম হয়েছে, অর্থাৎ অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর হচ্ছে।"

দাদা শুধালেন—"ডাক্তাররা কি বলেন?"

ডাঃ রায় বললেন—"কি আর বলবেন—যখন যন্ত্রণা সুরু হয় তখন যে কোনও মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটতে পারে।"

দাদা বললেন—"তাই ত, আপনার ত তা হলে দারুণ দুঃসময় চলেছে।"

ডাঃ রায় বললেন—"এ রকম দুঃসময় বেশীর ভাগ মানুষের জীবনে কোনও না কোন দিন আসেই—মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি।"

দাদা বললেন—"যে কোনও মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটতে পারে—এ অবস্থায় ওঁকে ছেড়ে চলে আসাও ত মুস্কিল।"

একটু চুপ করে থেকে ডাঃ রায় বললেন—দিনের বেলাটা ত বেশীর ভাগ সেখানেই থাকি, রাত্তের জন্য ভয় পাই। বলা আছে অবশ্য, রাত্রে তেমন কিছু হলেই দৌড়ে এসে আমাকে খবর দেবেন—তবে রাত্রে একবার যদি ঘুমিয়ে পড়েন আর বড় একটা কিছু হয় না। যা অদৃষ্টে আছে হবে—"

এই বলে ডাঃ রায় চুপ করে গেলেন। দাদাও একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে শুধালেন "কি

ব্যাপার ? তোর শরীর খারাপ—এতদিন ত কিছু শুনি নি।"

ডাঃ রায় একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

মাথা নীচু করে বললাম—"তেমন কিছু নয়;"

এইবার ডাঃ রায় শুধালেন—"কি হয়েছে ?"

দাদা শুধালেন—"কেন ? আপনি কিছু জানেন না ?"

ডাঃ রায় বললেন—"না—আমাকে ত বলে নি কিছু।"

তাড়াতাড়ি বললাম—"বাবার অসুখ নিয়ে উনি এত ব্যস্ত যে, এ সময় আমার শরীরের কথা বলে ওঁকে আর বিব্রত করতে চাই নি।"

দাদা শুধালেন "অসুখটা কি ?"

কোনও রকমে ঢোঁক গিলে বললাম—"এই বিকেলের দিকে কেমন জ্বর জ্বর মনে হয়—কিছু খেতে ইচ্ছে করে না—কেমন কাহিল বোধ হয়—"

দাদা যেন সত্যই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—"তা কোনও ডাক্তার দেখাস নি ?"

বললাম—"না—এই সামান্য ব্যাপারে আর ডাক্তার দেখিয়ে কি হবে ?"

দাদা বললেন—"চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও দরকার। শুধু হাওয়া বদলালেই কি হল ?"

বললাম, "আমার মনে হয়, দিনকতক কোথাও ঘুরে এলেই, এ-সব ভাল হয়ে যাবে ?"

ডাঃ রায় শুধালেন, "বুলা বুঝি দিনকতক কোথাও যেতে চায় ? কোথায় ?"

দাদা বল্লেন, "তা কিছু লেখেনি। শুধু লিখে পাঠিয়েছে—শরীর ভাল নয়, দিনকতক কোথাও হাওয়া বদলাতে যেতে চাই। আপনি ত' এখন নিয়ে যেতে পারবেন না, তাই জানতে চেয়েছে—কোনও কর্ম্মচারী সঙ্গে দিতে পারি কি না।"

ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন, "তা বেশ ত'। দেখুন না, যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনি ত' সে-দিন বলছিলেন—মাধবপুরে আবার গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে, বুলাকেও সঙ্গে নিয়ে যান না।"

দাদা বল্লেন, "মাধবপুর ত' একটা স্বাস্থ্যকর স্থান নয় এবং তা'ছাড়া আগে একবার ডাক্তার দেখিয়ে অসুখটা কি বুঝে নেওয়া ত' উচিত।"

ডাঃ রায় বল্লেন, "তা না হয় করা যাবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ-দিক দিয়ে বুলার কথাই ঠিক। দিনকতক কোথাও ঘুরে এলেই শরীর যাবে ঠিক হয়ে।"

ভবিষ্যতে শরীর ঠিক হয়ে যাওয়া ত' পরের কথা, আপাততঃ ওঁর কথা শুনে শরীর যেন জ্বলে গেল। আমাকে ঘুরে পাঠিয়ে দেওয়ার এত আগ্রহ কেন। আমি কি সর্ব্বদিক দিয়ে ওঁর জীবনের একটা বাধা হয়ে দাঁড়ালাম শেষ পর্য্যন্ত। আমারই জন্য এ-বাড়ীতে এসে রাত্রে থাকতে হয়, তাই আমি চলে গেলেই বাঁচেন। শপথ করলাম—ওঁকে না নিয়ে আমি এ-বাড়ী থেকে এক পাও নড়ব না।

দাদাকে বল্লাম, "দাদা! তুমি ও নিয়ে এত ভেব না। ঝোঁকের মাথায় লিখেছিলাম—তেমন আমার কিছু শরীর খারাপ হয় নি। আর এখন আমার এ-বাড়ী থেকে বেরুনো চলবেও না।"

দাদা যেন একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বল্লাম, "ওঁর এই রকম অবস্থা, কখন কি বিপদ ঘটে ঠিক নেই। এখন কি আমার এ-বাড়ী থেকে যাওয়া চলে—তুমিই বল না দাদা।"

একটু চুপ করে থেকে দাদা বললেন, "তা অবশ্য। যাই হোক, একজন ডাক্তার দেখান দরকার। ডাঃ রায়ের ত' যেরকম অবস্থা দেখছি ওঁর দ্বারা এখন হওয়া কিছু সম্ভব নয়। আমিই কাল একজন ডাক্তার নিয়ে আসব।"

তাড়াতাড়ি বললাম, "না না দাদা, কোনও দরকার নেই, এই ত' আজ বেশ ভালই আছি। প্রয়োজন বোধ করি, আমি তোমাকে জানাব।"

ডাঃ রায় শুধালেন, "আপনি আবার যাবেন কবে ?"

দাদা বল্লেন, "এখন ত' কোর্ট ছুটী—এই সামনের সপ্তাহেই খুলনা হয়ে মাধবপুর যাব। পূজোর ছুটীর পরেই দায়রা আদালতে অবনীবাবুর মকোদ্দমা সুরু হবে—একবার মাধবপুরে গিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখি, কোনও দিক দিয়ে কিছু করা যায় কি না।"

ডাঃ রায় শুধালেন, "কি করবেন ঠিক করেছেন?"

দাদা বললেন, "শশাঙ্ক খুড়ো টাকাকড়ি খাইয়ে পুলিশকে বেশ হাত করেছে এবং মকোদ্দমাটা সাজিয়েছেও ভাল। একবার গিয়ে দেখি, কোনও দিক দিয়ে কিছু ভাঙতে পারি কি না—দরকার হয় মহলেও যাব।"

ডাঃ রায় শুধালেন, "মিটিয়ে ফেলার আর কোনও উপায় নেই?"

দাদা বললেন, "শশাঙ্ক খুড়োকে হাত করে যদি সাক্ষী প্রমাণ ভেঙে দেওয়া যায়। কিন্তু লোকটা ত' সোজা নয় এবং তার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়। দেখা যাক—আপনার মামাও ত' যথেষ্ট চেষ্টা করছেন—গিয়ে ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই যা হয় করব। হ্যাঁ, ভাল কথা—আপনার বাক্সটা এবার গিয়ে নিয়ে এসেছি খুলনা থেকে। আনতে ভুল হয়ে গেল।"

ডাঃ রায় বললেন, "পরে পাঠিয়ে দেবেন।"

দাদা বললেন, "আমি এবার উঠি। বরু বাড়ীতে নেই বুঝি?"

বললাম, "বরুকে নিয়ে চাকরটা বেড়াতে গেছে—একটু পরেই এসে পড়বে।"

উঠে দাঁড়িয়ে দাদা শুধালেন, "তা কি বলিস্—কাল একবার ডাক্তার নিয়ে আসি?"

বললাম, "না দাদা। আরও দু'চার দিন দেখি। শুধু শুধু কতগুলো ঔষধ গিলতে পারব না।"

ডাঃ রায় বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। প্রয়োজন হলে আমিই ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করব।"

রাত্রে বিছানায় শুয়ে গোপালের কাছে আবার প্রার্থনা করলাম—সত্যিই যেন ওঁর ডাক্তার নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়।

[ক্রমশঃ

হয়তো

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

বনের আড়াল থেকে লঘুপায়ে চাঁদ উঠে আসে,
তারায় তারায় কথা সুরু হয় সাগরে-আকাশে।
কথায় নতুন গান নীল লাগে নীড়ে আর ঘরে,—
সমুদ্র-হাওয়ার ছায়া ভরে দিলে ধু-ধু বালুচরে।
কুমারী ধানের মেয়ে, দুটি চোখে স্বপ্নের সোনা,
অতসী নদীর মতো নীলাকাশ ছোঁয়ার বাসনা।
কামনার সে-আকাশ কোনখানে তুমি খুঁজে পাবে?
চাঁদের ছোঁয়ায় তুমি সেই পথ কেবলি হারাবে!
অচেনা হ্রদের মতো বন হরিণীর কালো চোখে—
তারার চাঁদের ছায়া ছাখো যদি রাতের আলোকে,
অথবা সাগর থেকে যদি কিছু লোনা হাওয়া এসে—
মনের ঘুমানো মেয়ে, তার কালো মেঘমায়া কেশে
যদি কিছু দোলা দেয়,—তবে বুঝি থেমে যাও তুমি!
পায়ে চলাপথ বেয়ে পার হ'য়ো নীল বনভূমি।
ছায়া ভরা মাঠ শেষ,—তবু নীল ধূসরের ধাঁধা।
কতো পথ বাকি থাকে, কতো মিছে ইশারার বাধা।
কানে কানে বলে রাখি: পাহাড়-সাগর-চাঁদ-তারা
কবিতার মতো মিঠে,—মিছে নয় তাদের ইশারা।
ঝরানো পাতার গায়ে মৌ ঝরে মৌচাক হ'তে—
তাই শুনে ভয় পাবে হয়তো বা চাঁদের আলোতে!
রাতের শিশিরে, চুলে হয়তো বা হবে মাখামাখি
হয়তো উঠবে ডেকে কয়েকটি ঘুম-ভাঙা পাখি।
তেমনি অনেক পথ পার হ'তে পারবে আবারো?
হয়তো বা সে-আকাশ কোনদিন ভবে পেতে পারো!

এলিয়টের কাব্য

ওঙ্কারনাথ গুপ্ত

টি, এস্, এলিয়ট

এ বছরে টমাস ষ্টার্ন্স্ এলিয়টের (Thomas Stearns Eliot) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটাকে অন্তত দুদিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ, নোবেল পুরস্কারের হোতারা প্রায় তিনপুরুষ কাল ধ'রে যে-ঠুলি-আঁটা গোঁড়া সাহিত্যাদর্শকে পরম বলে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলেন—তা থেকে তাঁরা যে ক্রমশঃ মুক্ত হচ্ছেন, আঁদ্রে জিদের পর তার প্রমাণ দ্বিতীয় বারের মতো পাওয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ, এলিয়টের সৃষ্ট নবকাব্য যা গত আটাশ বছরের দীর্ঘ জীবনেও "পরীক্ষাধীন' এ বদনাম কাটিয়ে উঠতে পারে নি, সনাতনীদের স্বীকৃতি-পঙক্তিতে আসন পেয়ে তা এবারে সরকারী ভাবে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হল। 'বিপ্লব' শব্দটা বেহিসেবী অতি-ব্যবহারের ফলে 'স্বাধীনতা' শব্দটারই মতো হৃত-অর্থ হয়ে গেছে, নইলে মূল অর্থ টা উদ্ধার করা গেলে মনে হয় নিঃসন্দেহেই বলা যেত, বিশ শতকীয় বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটনাটি দ্বিতীয় বিপ্লব।

লক্ষণ-কর্ম্ম মিলিয়ে অপ্রতিবাদেয় সমাজশাস্ত্রী এবং ইতিহাসবেত্তারা বলেছেন : শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষের বিশেষ ক'রে ইয়োরোপীয় মানুষের জীবনযাত্রা যে-হারে আজ অবধি বিবর্ত্তিত হয়েছে, তার যোগফল পরিমেয় হলে তা প্রাক্-উনিশ শতকীয় সমগ্র ইতিহাসে মানুষের যত ইতি কীর্ত্তি আছে, তার সব কিছুকেই নাকি ছাপিয়ে যেত। এ খতিয়ান শুধু ব্যবহারিক জীবনের নয়, মানুষের চিন্তা-জীবনেরও। বাষ্পীয় শক্তি থেকে পরমাণু শক্তি—কালের এই কক্ষপথে বস্তুর যেমন রূপান্তর ঘটেছে; দেকার্তে থেকে আইনষ্টাইন ফ্রয়েড্ এবং বার্গসঁর অবদানের মধ্যে মানুষের চিন্তামানসও সেই পরিবর্ত্তনমার্গে পিছিয়ে থাকে নি। রূপতত্ত্বরও (Aesthetics) একই দশা। উনিশ শতকের শেষ ধাপে কলাশিল্পে ফ্রান্সের ইম্প্রেশনিষ্ট্দের প্রচেষ্টা থেকে যার সুরু, হাল আমলে সাহিত্যের সাহচর্য্যে সুর-রিয়ালিজ্ম্-এর মধ্যে সেই রূপান্তরের পরিণতি।

কিন্তু আশ্চর্য্য রক্ষণশীল শিল্পবোধ ছিল নোবেল কমিটির সাহিত্যশাখার কর্ণধারদের। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের সহকর্ম্মীরা যে চিন্তাবিপ্লবীদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই বিপ্লবীদেরই সহযাত্রীদের তাঁরা নিজেরা রেখেছিলেন একঘরে করে। তাঁরা যেন পণ করেছিলেন যে, যায় যাক্ প্রাণ মান, ভিক্টোরীয় যুগের পিউরিটান মানদণ্ড থেকে তাঁদের শিল্পদৃষ্টিকে তাঁরা কিছুতেই সরিয়ে নেবেন না। মনোরম জীবন-প্রশস্তি ছাড়া যে সাহিত্যের আরো কিছু বক্তব্য এবং কর্ত্তব্য থাকতে পারে, একথাও তাঁরা সম্ভবতঃ মানতে রাজি ছিলেন না। ফলে আমরা দেখেছি যে নোবেল কমিটির সাহিত্য শাখার বিচারে মুড়ি-মিছরির একদর ছিল। রবীন্দ্রনাথ, রোলাঁ, শ' এবং বার্গসঁ আর আনাতোল ফ্রান্সের পাশেই তাঁরা আসন দিয়েছিলেন দ্বিতীয়-শ্রেণীর সব সাহিত্যিকদের এবং সেই বেমক্কা বিচারে তৃতীয়শ্রেণীর কিপলিংকে সম্মানিত ক'রে টমাস হার্ডি এবং এলিয়টকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। নোবেল সাহিত্য

বিচারকদের এই অবিচারের ফিরিস্তিটা যথাযথ খতিয়ে দেখতে পারলে সেটাই একটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু অলম্ অতি বিস্তারেণ। আমাদের উপস্থিত বক্তব্য সে বিবরণের বহির্ভূত।

সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ না পাওয়া গেলেও সাহিত্যের অনস্বীকার্য যুগধর্ম সম্পর্কে নোবেল বিচারকদের সেই সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীটা যে পাল্টাচ্ছে তার আভাষটা মনে হয় স্পষ্টই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপ থেকে সনাতন আদর্শের এলাকা ডিঙিয়ে আচার (form) ও উপজীব্য (content) নিয়ে শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের যে অভিনব অভিযানের আরম্ভ—ফ্রান্সের আঁদ্রে জিদ্ সেই অভিযানের অন্যতম প্রধান পথিকৃত। জিদ্ জীবনের পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত অর্থকে মানেন নি, এতাবৎ আচরিত সাহিত্যের সমুদয় আঙ্গিককেও তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। সাহিত্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন কেবল মানুষের সৃষ্টিসত্তার এক বিশেষ অভিব্যক্তি হিসেবে। তাই সেই অভিব্যক্তিকেই তিনি যথেচ্ছভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তার বেশী কিছু নয়। সনাতনীদের বিচারে সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে এটা চরম ব্যভিচারেরই সামিল ছিল। কিন্তু অতিবিলম্ব হলেও নোবেল কমিটি শেষ পর্য্যন্ত গেল বছরে সেই নিরপোষ বিদ্রোহীকেই মেনে নিলেন। সাহিত্যাদর্শ তথা কাব্যাদর্শ সম্পর্কে টি, এস্, এলিয়টের বিদ্রোহ আবার জিদের চেয়েও এককাটি প্রবলতর। জিদের সৃষ্টিতে ঐতিহ্যের তবু কিছু উপাদান ছিল, কিন্তু এলিয়টের সৃষ্ট কাব্যের অভিনব রূপ শুধু অভূতপূর্ব্ব নয়, তা পূর্ব্বাপর অভাবিত-পূর্ব্ব। রচন, ছন্দ ও ভাবানুষঙ্গ—এই তিনটি কাব্যের মুখ্য অঙ্গ। এখানে ওখানে দু-একটি রিপুকর্ম্ম ছাড়া এই তিনের মূল আদলটা ইয়োরোপীয় কাব্যাদর্শে এরিষ্টটল্-এর কাল থেকে প্রুফ্রকের (এলিয়টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ) আত্মপ্রকাশের আগে পর্য্যন্ত একই চেহারায় ছিল। কিন্তু এলিয়ট ইয়োরোপীয় কাব্যের সেই তিন অঙ্গকে একেবারে খোল্-নলচে শুদ্ধু পাল্‌টে দিয়েছেন, নিঃসঙ্গ হয়ে নয়, পরবর্ত্তী কালের একলব্য শিষ্যদের সমেত এলিয়টের পরে রাশিয়া বাদে ইয়োরোপে এমন কোনো দেশে এমন কোনো ক্ষমতা সম্পন্ন কবি আত্মপ্রকাশ করেন নি, যিনি কোনো না কোনো রকমে এলিয়ট দ্বারা অনুপ্রাণীত না হয়েছেন। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এ ঘটনাটি যে কোনো অর্থেই বৈপ্লবিক পদবাচ্য। কিন্তু বদ্ধ সনাতনীরা সে বিপ্লবকে স্বীকার করেন নি বলেই এতদিন তা ছিল খণ্ড-বিপ্লব। এবছরে তাঁদের মুখপাত্র নোবেল-কর্ম্মকর্ত্তারা এলিয়টের সৃষ্টিকে স্বীকার করে নেওয়াতে সে বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ সূচনা হ'ল।

বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীদের জীবন সাধারণতঃ খুব ঘটনা-বহুল হয় না, ব্যবহারিক জীবন তাঁদের প্রায়ই নিস্তরঙ্গ। জীবনের অভাবনীয় এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে তাঁরা আস্বাদন করেন তাঁদের চিন্তার মধ্যে, স্বকীয় সৃষ্টির মধ্যে। এইজন্যেই যদি কোনো অত্যুৎসাহী জীবনীকার তাঁদের জীবন থেকে নাটকীয় উপাদান উদ্ধারের জন্যে কোমর বাঁধেন তাহলে অনায়াসেই সেই ছিদ্রান্বেষীর উদ্দেশে তাঁরা গান্ধীজীর সেই বহুশ্রুত উক্তিটাকে উল্টে বলতে পারেন—আমাদের বাণীই আমাদের জীবন। এলিয়ট নিজেও খুব সম্ভব তাঁর জীবনীকারকে এই কথাই শোনাবেন। সত্যিই চমকপ্রদ বলা যায়, তেমন কোনো ঘটনা তাঁর জীবনে এসেছে একথা শোনা যায় নি। ইংলণ্ডীয় সমাজের যেকোনো একজন উচ্চ মধ্যবিত্তের মতনই তাঁর নিরুদ্বেগ জীবন। ১৮৮৮ সালে আমেরিকা প্রবাসী এক ইংরেজ পরিবারে তাঁর জন্ম, তারপর সাতাশ বছর বয়স অবধি তিনি জন্মভূমিতে ইংল্যাণ্ডে এবং প্যারিসে লেখাপড়া ইত্যাদিতে অতিবাহিত ক'রে ১৯১৫ সালে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে তখন থেকেই সে দেশে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন। অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রেও একজন উচ্চমধ্যবিত্ত ইংরেজের চেয়ে তিনি পৃথক নন। প্রথমে ছিলেন লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক বিভাগের কর্ম্মচারী, বছর কয়েক পরে বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ফেবার এ্যাণ্ড ফেবারের পরিচালক -দে বৃত হয়েছেন। এ ছাড়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেছিলেন তিনি।—ব্যবহারিক পৃথিবীতে এলিয়টের জীবনের ভূমিকা মোটামুটি এইটুকু মাত্র। এ ছাড়া তাঁর জীবনের বাকি অধিকাংশ সময়ই কেটেছে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত

চিন্তা ও উপলব্ধির অন্দরমহলে। তাঁর কাব্যই তাঁর সেই অন্দরমহলের জীবনকথা। কাজেই এলিয়টের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে তাঁকে তাঁর কাব্যের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে।

বিশেষ কোনো একজন কবির রচনা লঘু কি গুরু তা বিচার করতে গিয়ে রসজ্ঞ সমালোচকরা এতদিন প্রধানত ছুটি বস্তুর খোঁজ করেছেন। প্রথমতঃ, আলোচ্য কবির বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মনন। এ ছুইয়ের প্রকৃষ্ট সমন্বয়কেই তাঁরা বলেছেন মহৎ কাব্য; কিন্তু পৃথকভাবে এ দ্বয়ের কোনো একটার মাত্র প্রকৃষ্টতাকে তাঁরা কদর করেন নি। রূপ-নিরপেক্ষ জীবনদর্শন শত সূক্ষ্ম বা গভীর হ'লেও তার নাম রসজ্ঞরা দিয়েছেন নীরস পণ্ডিতি, ওদিকে জীবনকে না মেনে যে-কাব্য শুধুই রূপকে আশ্রয় ক'রেছে তাকে তাঁরা বলেছেন খেলো কারু-নৈপুণ্য, craftsmanship। এলিয়ট নিজেও একজন উঁচুদরের সমালোচক। কিন্তু কাব্যবিচারের সূত্রকে তিনি মানেন না। কাব্য কী, এ-সম্বন্ধে তাঁর অভিমত :—"It is never what a poem says that matters, but what it is"। কাব্য হচ্চে উপভোগের সামগ্রী, তা উপদেশ বা কথকতা নয়, সুতরাং কাব্যের লঘু-গুরু যাচাই করাতে কেবল তার রূপটাই ধর্তব্য। এলিয়ট তাঁর নিজের রচনা নাকি কাব্যের এই রূপ-সর্বস্ব উপাদান নিয়েই গড়েছেন, অন্ততঃ এ তাঁর নিজের মত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এটা সম্ভবতঃ কবির অতি-বিনয় প্রসূত মন্তব্য অথবা আর্ট সম্বন্ধে তিনি যে চূড়ান্ত formalism-এর পৃষ্ঠপোষক, এ তারই প্রতিক্রিয়া। তাঁর অগনন অনুরাগীদের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকরা কিন্তু এলিয়টের এই অভিমতকে স্বীকার করতে গররাজি। তাঁরা বলেন, বলার ঠাটটো 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের' কবির অভাবনীয় এবং অনন্যই, অধিকন্তু তাঁর কাব্যের বক্তব্যও অসাধারণ। এবং সে-বক্তব্য স্পষ্টোচ্চারিত, সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু আপাতত এলিয়টের নিজের কথাটাকেই অকাট্য বলে ধরে নিয়ে তাঁর কাব্যরূপের আমরা একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

কিন্তু, Poetry is what it is—বা কাব্য কাব্যই, কাব্যের পরিচয় নেবার পক্ষে এটুকু অত্যন্ত ধোঁয়াটে বিবরণ। তাহ'লে কাব্য বলতে এলিয়ট প্রকৃতপক্ষে কী বুঝেছেন? এ-প্রশ্নের কোনো স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আমরা স্বয়ং কবির কাছে পাই নি। কিন্তু তাঁর একজন নামকরা উকীল Herbert Read এ জিজ্ঞাসার একটি সাদামাটা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> "মানুষের সত্তার মধ্যে যে অনুভূতি-লোক আছে, তার একটা বিশেষ দশারই নাম কাব্য। অন্যান্য আর্টেরও এই একই উপাধি। কিন্তু শুধু অনুভূতিটাই আর্ট বা কাব্য নয়। প্রকাশের আগে সেই অনুভূতিকে আর্টিষ্টের অভিজ্ঞতারও সঙ্গে একাত্ম হবে। কেন না প্রত্যক্ষত বিষয়গ্রাহী (objective) হ'লেই তবে না অনুভূতি পুরোপুরিভাবে রূপায়িত হ'তে পারলো।

> "কেটে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বরাবের বেলুনটার যে অবস্থা, জৈবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রূপকামী অনুভূতির নিজের চেহারাটাও সেই রকম। কাব্যপ্রক্রিয়ার এটা আদি স্তর, এর দ্বিতীয় স্তর হল অনুভূতির ভাষায় সঞ্চারিত হওয়া। সাধারণ ক্ষেত্রে মানে গদ্যের বেলায়, আমরা জানি যে ভাষার কাজ হ'ল শুধু চিত্তবৃত্তিকে অর্থে বিন্যস্ত করা, সেটি শেষ করেই গদ্যের ভাষা দায়মুক্ত। কাব্য সৃষ্টির বেলায় কিন্তু এত সহজেই তার পার পাবার জো নেই। এ প্রক্রিয়ায় ভাষাকে সচেতন মনোস্তূপে হাজির হ'তে হয় ভাবাবেগ থেকে পৃথগাত্ম এক বিষয়মুখ (objective) সাজ পরে, অথচ তাকে আবার রূপে গুণে হতে হয় কাঁটায় কাঁটায় ভাবাবেগেরই সধর্মী। কিন্তু এত করেও খালাস পায় না কাব্যের ভাষা। এর পরেও যতক্ষণ না কবির মন থেকে কাব্যের ভূত নামলো, প্রকাশের আগে ততক্ষণ তার সাজপাজরের নেপথ্যে দাঁড়াতে হ'ল—একের পর একে, সার বেঁধে ছন্দ আর অনুক্রমের বিভঙ্গে।"

(Form in Modern Poetry).

সাধারণ পাঠকের উপলব্ধির পক্ষে কাব্যের এ-ব্যাখ্যাও খুব সম্ভব স্বচ্ছ নয়। অতএব এ-বিবৃতিটি সহজতর বিশ্লেষণে কী দাঁড়ায় দেখা যাক্। কাব্য হচ্ছে একজনের একটা বিশেষ অনুভূতি, কিন্তু প্রকাশিত না হ'লে কোনো অনুভূতিই শিল্পপদবাচ্য হয় না। কাব্যানুভূতি তাহ'লে প্রকাশিত হচ্ছে কী ভাবে?—না ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু

চিরাচরিত প্রথায় শুধু অর্থযুক্ত বা অলঙ্কৃত হলেও তাহা কাব্য হল না। প্রকাশের আগে কাব্যানুভূতি কবির মননের মধ্যে যে আবেগ যে সংরাগে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কাব্য-ভাষার মধ্যেও সেই আবেগ ও সংরাগের অবিকল প্রতিরূপ থাকা চাই।* কবির অনুভূতিরা হয়তো তাঁর ভাবমানসে সাধারণ লৌকিক কথনরীতির চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয় নি; তারা হয়তো এসেছিল কতকগুলি অনির্বচনীয় ছবির মধ্য দিয়ে কতকগুলি ভাষাতীত প্রতীককে ভর করে, তাদের চলার ছাঁদও হয়তো ছিল কবিতার বাঁধাধরা ও তালগোনা ছন্দের মতো নয়, তা হয়তো শুধু তালনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সুরের মতন এবং তাদের অর্থসংকেত, অনুষঙ্গ তারাও হয়তো কবির বহু গঠনের ফলে অত্যন্ত দূরাশ্রিত। কিন্তু যেমনই হোক,—সেই ছবিগুলির, তাদের চলার সেই নিশ্ছন্দ সুরেলা ছাঁদ আর তাদের অনুষঙ্গের হুবহু প্রতিচ্ছবি আঁকাই সত্যকার কবিকর্ম, কাব্য। এলিয়ট কাব্য বলতে একেই বুঝেছিলেন। এই কারণেই আত্মপ্রকাশের জন্যে পূর্ববর্তী কবিরা যে-বাচন, যে-ছন্দ এবং যে-অনুষঙ্গের আশ্রয় নিতেন, এলিয়ট সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তাঁর কাব্যে একেবারে আনকোরাদের পদস্থ করেছেন।

এবারে দৃষ্টান্তের আশ্রয় নেওয়া যাক্:

প্রথমে বাচনের দৃষ্টান্ত। বাহুল্য হলেও বলে নেওয়া দরকার যে, কাব্যের কথনভঙ্গী ঋজু নয়, বঙ্কিম। অনেক উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা আর পরোক্ষোক্তি দিয়ে কবি তাঁর আত্মলীন উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন। এই পরোক্ষোক্তিই কাব্যের বাচন (অনেক কবি এবং সমালোচক আবার শুধু একেই বলেছেন খাঁটি কবিত্বের একমাত্র করণীয়)। এলিয়টের আগে ইংরেজ কবিদের এই বাঁকা বিবৃতির উৎস ছিল গ্রীক্ পুরাণ, বাইবেলের এলিগরি এবং নিসর্গ প্রকৃতি অথবা স্বপরিকল্পিত আকাশচারী স্বপ্ন-আলেখ্য। কাব্যকে এদিকে তাঁরা বলতেন জীবনের দর্পণ, অথচ জলজ্যান্ত যন্ত্রসভ্যতার পরিবেশের মধ্যে থেকেও ভিক্টোরিয় কবিরা এমন-কি বিংশ শতাব্দীর জর্জিয়ান কবিরা অবধি তাঁদের বাচনের মধ্যে নিজেদের কালকে প্রতিফলিত করতে পারেন নি। এই প্রকট অনামপ্রস্তকে এলিয়ট তাঁর কবিতায় ঘটতে দিলেন না। কবিতাকে তিনি চাইলেন সমসাময়িক বাচনে কথা কওয়াতে। Prufrock তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ ১৯১৭ সাল)। এই বইয়েতেই সেই নতুন কথা ফুটলো:

'Let us go you and I
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table.'

'The yellow fog that rubs its back upon
the windowpanes,
(The Love Song of J. Alfred Prufrock)

'The voice returns like the insistent out of tune
Of a broken violin on an August afternoon.'
(The Portait of a Lady)

'The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices
Smells of chestnuts in the streets
And female smells in the shuttered rooms
And cigarettes in corridors
And cocktails smells in bars.
(Rhapsody on a Windy Nigh

ইংল্যাণ্ডের খোলামন পাঠকেরা এবং উচ্চাভিলাষী নতুন কবিরা কবিতার এই আনকোরা বোল্ শুনে বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। নিষ্প্রাণ সন্ধ্যা-আকাশ যে ইথারবিবশ রোগীর সঙ্গে উপমিত হতে পারে, সন্ধ্যার কুয়াশা যে সার্সির গায়ে পিঠ রগড়াতে পারে অথবা অবাঞ্ছিত কণ্ঠস্বর যে পারে আগষ্ট-অপরাহ্নের ভাঙা বেহালার বেসুরো আওয়াজের প্রতিধ্বনি করতে—এ ছবির সম্ভাবনা তাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। তারপর বাতাস-উদ্বেল রাতে কবির স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত নাগরিক

* এলিয়টের সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং একদিক দিয়ে এলিয়ট এবং এজ্রা পাউণ্ড-এর মন্ত্রগুরু T.E. Hulmee বলেছিলেন—"In short, the great aim of poetry is accurate, precise and definite description of a unique feeling.

জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলির সেই বিচিত্র গন্ধময় চিত্রালী। অপরূপ সংকেতের মধ্যস্থতায় ছবিগুলি যেন শুধু পাঠকের চোখের ওপরে এসেই থেমে থাকে না, অনুভূতির প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও তারা যেন চারিয়ে যায়। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হ'ল ছবিগুলির অপূর্ব্ব আধুনিকতা। গ্রীকপুরাণ বা বাইবেলের উপাখ্যান নয়, বহুভোগ্যা নিসর্গও ঠাঁই পায় নি, ধর্মান্ত রূপকও অপসৃত, ওরা সবাই যেন বিশ শতকীয় মানবসমাজের প্রত্যহের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরিবেশ থেকে জীবন্ত সত্তা নিয়ে উঠে এসেছে।

শেক্স্পীয়র্-এর পর তিনশ বছর ধরে একঘেয়ে চণ্ড ও প্রতীকে কথা বলতে বলতে ইংরেজি কবিতা, শুধু ইংরেজি কবিতাই বা কেন, সারা পৃথিবীরই কবিতার দশা হ'য়েছিল যেন কাটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো—তাতে সঙ্গীত আছে, তাল লয় আছে, কিন্তু নেই বৈচিত্র্য, একই তার কথা একই সুর। 'প্রুফ্রক' সেই কাটা রেকর্ডটি পাল্টে দিয়েছে। এরপর থেকে আধুনিক মানুষের কাব্য, বিশেষ ক'রে ইংরেজি কাব্য সেই নতুন রেকর্ডের সুরে গান গাইছে।

'প্রুফ্রক' বেরোবার পাঁচ বছর পর ১৯২২ সালে The Waste Land-এর* আবির্ভাব। ১৯০৫ সাল থেকে অর্থাৎ সতেরো বছর বয়েস থেকে এলিয়ট প্রকাশ্যভাবে তাঁর কাব্য সাধনা সুরু ক'রেছিলেন—'দি ওয়েষ্ট্ ল্যাণ্ড' তাঁর এই সতেরো বছরের কাব্য সাধনার সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী সৃষ্টি। এবং শুধু তাঁর নিজের নয়, সমগ্র আধুনিক কাব্যেরই এক তাজমহল। কাব্যের যে নতুন বাচন অপরূপ ছবি আর রূপকের পত্তন হয়েছিল 'প্রুফ্রকে', 'দি ওয়েষ্টল্যাণ্ডে' তা যেন পরম পরিণতি লাভ ক'রলো। কিন্তু কেবল নতুন বাচনভঙ্গী এ কবিতার পুরো পরিচয় নয়। কাব্যের ঐতিহ্যাশ্রিত আর-যে মুখ্য অঙ্গ দু'টি ভাবানুষঙ্গ আর ছন্দ, এলিয়ট তাদেরও পূর্ব্বরূপকে এবারে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব সাজ পরিয়ে দিলেন। এটা মাত্র বিস্ময়েরই বিষয় নয়, সমালোচকেরা এবারে চমকে উঠলেন।

কাব্যের ভাবানুষঙ্গ বলতে কী বোঝায়, আশা করি সে সম্বন্ধে আমাদের পাঠকরা সম্যক অবহিত। আগেই একবার বলা হয়েছে যে, অনুভূতিকে পাঠকের প্রাণে সংক্রামিত ক'রতে গিয়ে সোজা ভাষায় কথা বলা কবির স্বভাব নয়, ও তাঁর কর্ত্তব্য নয়। কাব্যানুভূতি অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু তবু তাকে জানান দিতে হবে। তাই কবিতায় প্রয়োজন ইঙ্গিতের আভাষের, প্রকটকে ব্যক্ত ক'রে অপ্রকাশ্যের সংকেত দেওয়ার। রূপতত্ত্বের (Aesthetics) পরিভাষায় এই সংকেতবাক্যেরই অভিধা ভাবানুষঙ্গ, association।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে আরো কথঞ্চিৎ স্বচ্ছ করে নিচ্ছি—

'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সেকথা যে যাই পাসরি'।

'আমি চঞ্চল হে' কবিতার একটি স্তবক। বদ্ধ সীমিত প্রতিবেশের মধ্যে কবি অসীম সুদূরের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন—এখানকার অনুভূতি এ-ই। কিন্তু এ অব্যক্ত ভাবকে কবি ব্যঞ্জনা দিচ্ছেন কি দিয়ে? আধুনিক কবি পাঠককে আভাষ দিচ্ছেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের আঁকা রাধার একটি ছবির। সমাজবিধির গণ্ডী আর কলঙ্ক ভয়ের বেরাটাপের মধ্যে বাঁধা পড়েছে শ্রীরাধা—এমন সময় শ্যামের বাঁশী বাজলো। বাঁশী বললো—'চলে এসো রাধে, যমুনার কূলে।' রাধা আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি ভুললেন কূলের কথা সমাজের নিষেধ—শ্যামের সঙ্গ পাবার জন্যে, তিনি আকুল হ'য়ে উঠলেন। সীমিত

* The West Land সম্বন্ধে কটি কথা প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন বোধ ক'রছি। এলিয়টের এই কবিতার রস গ্রহণ রীতিমত পণ্ডিত পাঠকেরও অসাধ্য। অতএব বলাই বাহুল্য, বর্ত্তমান লেখকের এমন কোনো মূঢ় দাবী নেই যে সে তা পুরো উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের' বিশদ উল্লেখ ব্যতীত এলিয়ট সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে বাদ দিয়ে মহাভারত বিবৃত করার সামিল। এই জন্যেই অংশত পরের কথা ধার ক'রে সেই অপূর্ণতার ফাঁক ভরাট ক'রতে হল। সহায়ক F. O. Mathiessen-এর লেখা The Achievement of T. S. Eliot. —লেখক।

প্রতিবেশের মধ্যে কবির হৃদয়ও যেন সমাজবদ্ধ শ্রীরাধা; শ্যামের বাঁশীর মতো সীমাহীন সুদূর তাঁকে ডাক দিয়েছে, আর কি তিনি সীমার তোয়াক্কা করেন? এত গভীর এত আবেগময় একটা ছবি কত সূক্ষ্মরেখায় কবি আঁকলেন! 'ব্যাকুল বাঁশরী', 'রুদ্ধ দুয়ার' আর বৈষ্ণব কবি-বচনের ঢঙে 'পাসরি'—এই তিনটি শব্দের তিনটি ছোট্ট সঙ্কেত—কিন্তু কবির হৃদয়ের সমস্ত প্রচ্ছন্ন বারতা যেন উদ্বোধিত হয়ে উঠেছে। কবিতার ভাবানুষঙ্গ হচ্ছে এইসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভাবানুষঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন, আমাদের পাঠকেরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, সেগুলির অধিকাংশরই রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্ণ আমাদের বহু পরিচিত। বিগত দিনের কবিরা তাঁদের রচনার আঙ্গিকে এদেরকে বহুবার যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অপরিসীম, তাই তাঁর অতুলনীয় প্রয়োগের ফলে এই ব্যবহার-জীর্ণরাই তাঁর মনোভাবকে ব্যঞ্জনাময় ক'রতে পেরেছে। কিন্তু অন্য কবিরা হয়তো এদেরকে এত নিপুণভাবে মুখর ক'রতে পারতেন, বহুবার একই কথা বলার পরিশ্রমে এই ইঙ্গিতগুলি হয়তো তাঁদের সৃষ্টিতে রুদ্ধবাক হতো। অন্ততঃ এলিয়টের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার ইংরেজি কাব্যের তে এই দশাই ঘটেছিল। ভাবানুষঙ্গের পুরোণো রূপকল্প কবিদের অনুভূতির আবেগকে সমবেগে সঞ্চারী করতে পারতো না। এলিয়ট 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে' তাই ভাবানুষঙ্গের নতুন প্যাটার্ণ গড়লেন:

'HURRY UP PLEASE ITS TIME
HURRY UP PLEASE ITS TIME
Goonight Bill . Goonight Lou . Goonight May .
Goonight.
Ta ta . Goonight . Goonight .
Good night, ladies, good night, sweet ladies,
good night, good night.'

স্তবকটি 'The Game of Chess' অংশের সব শেষের কটি পঙক্তি। এখানে কবির উদ্দেশ্য, একটি মর্ম্মন্তুদ বিদায় দৃশ্যের আবহাওয়াকে রূপ দেওয়া। এই আবহাওয়া এলিয়টের অভিনব অনুষঙ্গ দিয়ে কী ভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে দেখতে হবে। আগে প্রথম চার লাইনের ছবিটা কী, দেখা যাক্। এ ছবিটাকে যে কোনো মধ্যবিত্ত ইংরেজ চেনে। এক জায়গায় মিলিত পরস্পরের পরিচিত কজন নরনারী কিছুক্ষণ একত্র থাকার পর গৃহস্বামীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাছে বিদায় নিচ্চে। প্রথম চার লাইনের কাটা কাটা শব্দ ক'টি তাদেরই সে সম্ভাষণের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশ। এই অনুষঙ্গের অবশ্য কোনো মুন্সিয়ানা নেই—অভিনব হ'ল পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটির প্রয়োগ। এটি শেক্‌স্পীয়রের হ্যামলেট নাটকের একটি আস্ত বচন,—উদ্ধৃতির কোনো চিহ্ন নেই, তবু অজান্তে এসে কখন প্রথম চার লাইনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে।

প্রশ্ন হবে, কিন্তু এ আগন্তুক হঠাৎ এলো কেন? বলা কওয়া নেই বাক্যটা হঠাৎ কেন শেক্সপীয়রের নাটক থেকে এলিয়টের কবিতায় উড়ে এসে জুড়ে বসলো? এর উত্তর পেতে হলে ও উক্তিটার সেটিং অর্থাৎ পরিবেশটিকেও স্মরণ করতে হয়। হ্যামলেট নাটকের চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রাজা ক্লডিয়স ও রাণী গের্ট্রুডের কাছে ওফেলিয়ার উক্তি। প্রিয় হ্যামলেটের কাছে রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়েছে ওফেলিয়া, ওদিকে আবার তার পিতা পলিনাস্ নিহত—এই দু-ফলা শোকের আঘাতে ওফেলিয়া প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। ও উক্তিটা ওফেলিয়ার সেই শোকার্ত্ত অবস্থার একটি উচ্ছ্বাস। উক্ত কবিতাংশে এলিয়ট এই মর্ম্মন্তুদ সেটিংটারই সঙ্কেত করেছেন। এবারে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো না গোটা বিদায় দৃশ্যের চিত্রটা, কবির অনুভূতি—বিশেষ ক'রে হ্যামলেটের সঙ্গে যার পরিচয় আছে তার কাছে?

আরেকটি নমুনা—

Ganga was sunken, and the limp leaves
Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant,
The jungle crouched, humped in silence
Then spoke the thunder
Da
Datta: what have we given?
(What the Thunder Said)

এখানকার কাব্যানুভূতিটা হচ্ছে, এক উষর পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ক'রে কবির জীবন-জিজ্ঞাসা। প্রাণদ বারির অভাবে দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড অর্থাৎ অপচয়িত পাশ্চাত্য দেশের (The Waste Land শব্দটিও এক অভিনব সংকেত; 'ওয়েষ্ট' ধ্বনিটার বানান ভেদে দুটি অর্থ, যথা (১) West—পশ্চিম, (২) Waste—অপচয়; এলিয়ট Waste-এর সঙ্গে 'ল্যাণ্ড' শব্দ ব্যবহার করে 'ওয়েষ্ট' ধ্বনির দুটি অর্থেরই ইঙ্গিত করেছেন) হৃদয় শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাথরে গড়া এই দেশে জল নেই, Here is no water but only rock—প্রথম চার লাইনে কবির উদ্দিষ্ট ছবিটা এই। কিন্তু এ আলেখ্যকে সোজাসুজি না দেখিয়ে তিনি আঁকলেন, ইংরেজের উপলব্ধির পক্ষে দুরাশ্রিত এক অনুষঙ্গ দিয়ে—সুদূর ভারতের একটি উষর প্রান্তর। গঙ্গা মজে গেছে, বিকলাঙ্গ পাতারা জলের জন্যে যখন আকুল—কালো মেঘেরা কিন্তু তখন ভিড় করে জমে আছে অনাবৃত হিমাবন্তের শীর্ষে। কিন্তু ইংরেজি কাব্যে হঠাৎ ভারতকে আবার কেন টেনে নিয়ে এলেন কবি? এখানে পাবো আমরা এলিয়টের অভিনবত্ব। কারণ এই ছবিটার অব্যবহিত পরেই আরো একটি ভারতীয় অনুষঙ্গ আসছে; এবং উপস্থিত স্তবকের এইটাই প্রধান বক্তব্য। Then spoke the thunder, Da, Datta:—বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি কাহিনীর ইঙ্গিত:

প্রজাপতির তিন পুত্র মানুষ, অসুর আর দেবতা সৃষ্টিকর্তার কাছে উপদেশ চাইল। প্রজাপতি সে প্রার্থনার উত্তরে তাদের কাছে শুধু একটি মাত্র অক্ষর 'দ' উচ্চারণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'কী বুঝলে?' এর উত্তরে মানুষ বল্লে, 'দত্ত' দান করো; অসুর বল্লে, 'দয়া-ধ্বম্'—দয়া করো; আর দেবতা জবাব দিলে—'দাম্যত'—দমিত হও। তিন জনের তিন রকম উত্তর; কিন্তু প্রজাপতি তাদের প্রত্যেককেই বল্লেন—'ঠিকই বুঝেছো।' বজ্রধ্বনি নাকি সৃষ্টিকর্তার সেই সংকেতময় উপদেশেরই প্রতিধ্বনি করে—'দ' 'দ' 'দ'। এলিয়ট এখানে সেই কাহিনী-কথিত মানুষের প্রসঙ্গটার উল্লেখ করেছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবনের নির্দেশ পেয়েছে, দান করো। কিন্তু what have we given? আত্মসর্বস্ব পশ্চিমের মানুষ কাকে কী দিয়েছে?

—উদ্ধৃত স্তবকের সারা কাব্যানুভূতিটাই একটি গভীর দর্শনের তত্ত্ব, প্রকাণ্ড একটা তাত্ত্বিক আলোচনা চলে এই তত্ত্বের ওপরে। কিন্তু কী অপরূপ ইঙ্গিতময় আঙ্গিকে দুটি মাত্র অনুষঙ্গে সেই দীর্ঘ প্রসঙ্গকে এলিয়ট পাঠকের কাছে জীবন্ত ক'রে তুললেন।

অল্প কথায় ছোট্ট দুটি নমুনার সাহায্যে এলিয়টের আবিষ্কৃত কাব্য আঙ্গিকের অভিনব অনুষঙ্গের সঙ্গে আমাদের পাঠকদের পরিচিত করাবার চেষ্টা করা হ'ল। এবারে এ প্রসঙ্গে একটি কথা উঠ্‌তে পারে। কথাটি অনেকবারই কাব্যের সনাতন পন্থীরা বলেছেন। তাঁরা ঠোঁট উল্টে বক্রোক্তি করেছেন—নয়, মেনে নিলাম যে এলিয়টের প্রযুক্ত উপরোক্ত অনুষঙ্গ দুটি অভিনব, কাব্য রচনার এ এক অভূতপূর্ব ম্যাজিক; কিন্তু অবস্থাটা যদি এমন হয় যে, হ্যামলেটের সঙ্গে উদ্দিষ্ট পাঠকের কোনো জানা শোনা নেই, উপনিষদের কাহিনী তার কাছে অজ্ঞের বিদেশী বলে প্রতিভাত। তাহলে? তাহলেও কি এলিয়টের অনুষঙ্গকে কলাসম্মত বলা যাবে? তখন কি এদের মূল্য দুর্বোধ্য প্রলাপের চেয়ে বেশী হবে কিছু?—এ প্রশ্নের উত্তরটা একজন নাম করা সমালোচক, Montgomery Belgion-এর কথা উদ্ধৃত করেই দেওয়া যেতে পারে: "The suppositions afford no reason why a poet should not insert quotations or such allusions in his work for the benifit of those readers who will identify them. There is nothing new in a poet's making an allusion." জবানিটা মেনে নিতে আমাদেরও আপত্তি হবে না বোধ হয়। এটিকে আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথের উপরি উদ্ধৃত স্তবকটিকে সাক্ষী রেখেই প্রমাণ করতে পারি। শ্যামের বাঁশরী শুনে আকুল রাধা কুল হারাবার ভয়কেও পাসরি গিয়েছিলেন—এ খবরটা কোনো কোনো পাঠকের জানা নাও থাকতে পারে। কিন্তু

তাই ব'লে কি বলা যাবে,—রবীন্দ্রনাথের এই অনুসঙ্গটা অর্থহীন বা শিল্পরীতি বিরুদ্ধ ?

এলিয়টের যাদুস্পর্শে ইংরেজি ছন্দও এক অনাচরিত-পূর্ব্ব ঠাট পরিগ্রহ করেছে। রূপতত্ত্ব অনুযায়ী কবিতার ছন্দের ভূমিকা হচ্ছে এই যে, তা কবির অনন্ত অনুভূতির আবেগকে বেগময় করে। ধ্বনিকে এই বেগটার ওপরে না চাপালে একের অন্তর-রহস্য অপরের অন্তরে পৌঁছয় না। এ তত্ত্বটা থেকে স্বভাবতই একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কবির অনুভূতির আবেগটা যখন তাঁর নিজের, তখন সেই আবেগের বেগটাও কবির নিজস্ব হওয়া উচিত। কিন্তু উচিত হলেও এলিয়টের আগে ইংরেজি কাব্যে সেটা ঘটা কার্য্যত বড় সম্ভব হয় নি। কারণ সাধারণ ক্ষেত্রে ইংরেজি ছন্দের ধ্বনি ও ঝোঁক বিন্যাসের নিয়মটা বাঁধাধরা, সিলেবল্ ও মিটার সাজানোর পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত-নিয়মকানুনের নির্দিষ্ট। মানে যে মানুষটা প্রাণের দুর্লঙ্ঘ্য আবেগে ছোটবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাকে যেন ছোটবার আগেই চোখ রাঙিয়ে বলে দেওয়া হ'লো—সাবধান, নিয়মমত পা ফেলো, নইলেই কিন্তু ছন্দপতন। বিদ্রোহী এলিয়ট অনুবন্দের মতো, বাচনের মতো ছন্দের এই অসামঞ্জস্যকেও বরদাস্ত করেন নি। স্বতন্ত্র বেগকেই তিনি তাঁর অনুভূতি-জাত আবেগদের বাহন ক'রে দিলেন। তার ফলেই এসেছে ইংরেজি কাব্যের এই নতুনবেগ :

'April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull root with spring rain.'

(The Waste Land-এর প্রথম চার লাইন)

ইংরেজি ছন্দতত্ত্বের সঙ্গে যারই কিছু পরিচয় আছে, তিনিই চিনতে পারবেন এই নতুন ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ঠিক মিল যাকে বলে পঙক্তি চারটি তা অনুসরণ করে নি। অথচ এরপর blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দও নয়, কারণ ইংরেজি তত্ত্ব অনুযায়ী অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও চলনটা বাঁধাধরা। তাকে ambic লয়ে অর্থাৎ প্রতি চরণে এক-ফাঁক্ একঝোঁক্ এই তালে পা ফেলতে হয়, এবং পদ-ক্ষেপের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু এলিয়টের এই স্তবকে আমরা দেখছি ঝোঁক আর ফাঁকগুলি যেমন খুশী বিন্যস্ত, ধ্বনিগুলির চলন মুক্ত। অথচ এদিকে, প্রথম তিন লাইনের প্রত্যেকটির শেষে ing-অন্ত তিনটি দীর্ঘ ধ্বনি আমদানি ক'রে নতুন এক রকম ঝোঁকের সৃষ্টি করা হয়েছে—গড়িয়ে চলার সুর। ফলে সবসুদ্ধ মিলিয়ে দাঁড়াচ্চে এই যে, গোটা স্তবকটা যেন এক মন্ত্রোচ্চারণের সুর আওড়াচ্ছে।

এই হ'ল এলিয়টের কাব্যের নতুন গতি, যে গতি কবির অন্তরবেগের সঙ্গে একাত্ম। কবির অনুভূতি লোকে এক-একটি স্বয়ংজ ছবি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তারপর প্রকাশ-আবেগের ধাক্কায় সে ছবিগুলিতে এসেছে বেগ—সবশেষে দুইয়ে মিলে নিজেকে প্রকাশ ক'রেছে অপরূপ প্রাণীন সুরে। এই সুরের আগুন এখন আধুনিক পৃথিবীতে প্রায় সব খাঁটি কবিরই প্রাণে জ্বলমান।

আঙ্গিকের উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার ছাড়া কাব্যের মাধ্যম নিয়ে আরো একটি পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন এলিয়ট—নাট্যকাব্য। এই পরীক্ষায় তিনি চেষ্টা ক'রেছিলেন প্রাচীন গ্রীক্ মেলোড্রামার আধারটাতে আধুনিক জীবনের আধেয়কে খাপ খাওয়াতে। এবং এই আঙ্গিকে লেখা দুটি নাটক The Family Reunion আর Murder in the Cathedral রসজ্ঞদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট ক'রেছে খুব। কিন্তু তবু এলিয়টের এই নতুন পরীক্ষার মূল্য নিয়ে বড় বেশী মতদ্বন্দ্ব হয়েছে। একদল গদ্গদ হয়ে বলেন, এই নাট্যকাব্যের পথেই আসবে কবিতার ভবিষ্যৎ রূপ ; আরেকদল এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন—ওগুলি ব্যর্থ চেষ্টা। দুটো দলই ভারী, দ্বন্দ্বটাও প্রবলতর আর মীমাংসার পথও দুস্তর। এ কারণে এদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি।

শিল্পাচারের দিক থেকে এলিয়ট কাব্যের যে অনা-স্বাদিতপূর্ব্ব রূপ আধুনিক পৃথিবীর রূপ ও রসপিপাসু মানুষকে দান করেছেন, তাকে মোটামুটি ভাবে চিনিয়ে দেবার মতো একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র সম্ভবতঃ এতক্ষণের চেষ্টায় তৈরি করে ওঠা গেল। আগেই একবার বলেছি যে, এলিয়ট স্বয়ং তাঁর কীর্তির দাম কষতে গিয়ে এই সবিশেষ রূপটাকেই বলেছেন তাঁর কাব্যের সব। কারণ, তাঁর মতে কাব্য—কেবল তাঁর নিজের কাব্য

নয়, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালেরই কাব্য হচ্ছে পুরোপুরিভাবে শিল্পী। সে ছবি আঁকে, গান গায়, নাচে—কিন্তু সে কথক নয়। কিন্তু, এ কথাটাও আগে একবার বলে রেখেছিলাম—এলিয়টের অতিবড় ভক্তরাও কাব্য সম্বন্ধে গুরুর এই মতবাদকে মানেন নি। জীবন-নিরপেক্ষ রূপসর্ব্বস্ব কাব্য যে খাঁটি কাব্যপদবাচ্য নয়, তা শুধু শব্দ প্রয়োগের নিকৃষ্ট কারুনৈপুণ্য—সনাতনীদের এই কথাটি তাঁরা মনে প্রাণে স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলে একথাও যেন না মনে করা হয় যে, এলিয়টের সৃষ্টিকেও তাঁরা খেলো ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ্‌ বলে বরবাদ করছেন। এলিয়টের কথা তাঁরা মানেন নি মানে নিজের কাব্য সম্বন্ধে শুধু তাঁর ধারণাকেই তাঁরা স্বীকার করেন নি। এলিয়টের সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁদের স্বকীয় অভিমত, সর্ব্ব-লক্ষণ মিলিয়ে তা মহৎ কাব্য। কারণ দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের কবি নিজে না মানলেও জীবন সম্বন্ধে সত্যই তাঁর একটা সুস্পষ্ট বলার বিষয় আছে এবং সে বক্তব্য তাঁর মতো মর্ম্মস্পর্শী করেও কেউ বলতে পারে নি। কথাটি নেহাৎ মিথ্যে নয়।

সমাজশাস্ত্রীদের ব্যাখ্যায় এলিয়ট হচ্ছেন আধুনিক ইতিহাসের ডেকাডেণ্ট (decadent) পর্ব্বের প্রতিভূ কবি। এই পর্ব্বটার সূচনা ভিক্টোরীয় যুগের শেষ কটি বছর থেকে। শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে ব্যবহারিক জীবনে নতুন উন্নয়ন-পথ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় ইয়োরোপের মানুষ ভেবে-ছিল, এবার পৃথিবীতে এলো মিলেনিয়াম, শান্তি ও প্রাচুর্য্যের দৈবরাজ্য, কিন্তু পুরো প্রায় একটি শতাব্দী কেটে গেল—শিল্পবিপ্লবের ফল ভিক্টোরীয় যুগে চরম রূপ নিয়ে দেখা দিল, ইউরোপ ছেয়ে গেল প্রাচুর্য্যে। কিন্তু কই শান্তি? প্রাচুর্য্যে বলীয়ান হয়ে ইয়োরোপ তো বরং পরস্পরের প্রতি জিঘাংসাবৃত্তিতেই মেতে উঠেছে। জীবনকে উন্নীত করার পথের সন্ধান পেয়েছিল ইয়োরোপ কিন্তু সে তো এগিয়ে চলেছে মৃত্যুরই দিকে। তা হলে কি জীবন মানেই মৃত্যু? তবে আসুক মৃত্যু!—এই যে অবিশ্বাসে ভরা জীবন-চৈতন্য বা অন্য ভাষায় মৃত্যু-প্রবণতা—এইটাই ডেকাডেণ্ট পর্ব্বের জীবন-দর্শন। এই মৃত্যু-প্রবণ দর্শনের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ম্যাথু আর্ণল্ড-এর লেখায়।

এর পর গড়িয়ে গেল আরো কটি বছর…এলো ১৯১৪ সালের প্রলয়। অকস্মাৎ কে জানে কেন ইয়োরোপের সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা ঘোষণা করলেন, মা ভৈঃ, এবারে সত্যিই আসচে মিলেনিয়াম, উপস্থিত প্রলয়ের গর্ভে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইতিহাসের নাড়িজ্ঞানটা যাঁদের যথার্থ ছিল, তাঁরা ঠিক বুঝলেন রাষ্ট্র-নায়করা ধাপ্পা দিচ্ছেন। তাঁরা টের পেয়েছিলেন, এপথে শান্তি আসবে না, জীবনও আসবে না—জীবন ও শান্তির লক্ষণ এ নয়, জীবনকে কখনও চিনতেই পারে নি পশ্চিমের মানুষ। এ প্রলয় ডেকাডেণ্ট ধ্বংসনাট্যেরই প্রথম অঙ্কের অভিনয় মাত্র। এলিয়ট হচ্ছেন মানব ইতিহাসের এই যথার্থ নাড়ীজ্ঞদেরই অন্যতম। তাঁর কাব্যে এই নাড়ী-জ্ঞানটাই রূপরূপ হয়ে ফুটেছে:

'What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man
You cannot say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter,
the cricket no relief
And the dry stone no sound of water.'

এ বক্তব্য 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের'। এবং সারা গ্রন্থে এই কথাটিই নানা বিন্যাসে বিবৃত হয়েছে। 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' প্রকাশের বছর তিনেক পরে বেরোয় The Hollow Men. এই কবিতা দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডেরই এক মুদ্রার অপর পিঠ। প্রস্তরীভূত অপচরিত পশ্চিম দেশে যে-জীব বাস করছে, বেঁচে থাকার নামে নিরর্থ কালক্ষেপণ করছে, তারাই হচ্ছে দি হলো মেন—ফাঁপা শূন্যগর্ভ মানুষ—

'We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw...

* * *

Shape without form, shade without colour
Paralyzed force, gesture without motion;

* * *

Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.'

কিন্তু সম্প্রতি বছর কয়েক হ'লো, সাধারণ মানুষ না হ'লেও ইয়োরোপের স্বর্ণ সভ্যতাক্রান্ত এবং আশাহত কবি ও চিন্তাজীবীরা আবার যেন মনে হয় হৃতবিশ্বাকে ফিরে পাচ্ছেন, পাচ্ছেন জীবনকে স্বীকার করার প্রেরণা। অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে ফিরে আসার এই যে তীর্থযাত্রা, এর সুরু মোটামুটি ১৯৩০ সাল থেকে। কিন্তু যাত্রার উদ্দেশ্য এক হ'লেও গন্তব্যটা সকলেরই এক নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ ঝুঁকেছেন রাষ্ট্রহীন সাম্য-সমাজের দিকে, কেউ ইয়োরোপেরই অবহেলিত ধর্ম ক্যাথলিসিজম্-এর দিকে, কেউ বা আবার যাত্রা বদল ক'রে দৃষ্টি রেখেছেন পূবদেশের দিকে, প্রাচীন ভারতের 'উপনিষদের ধর্ম'। এলিয়টও ১৯০০ সালে এই তীর্থযাত্রায় এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি প্রধানত মধ্য পথেরই পথিক—কিন্তু পূর্ব্বাচলের দিকেও তাকান মাঝে মাঝে। Ash Wednesday থেকে এই যাত্রারম্ভ; পথ পরিক্রমণ এখনও চলছে। Ash Wednesday-তে তিনি যেমন বলেছেন :

Blessed sister, holy mother, spirit of the fountain,
Spirit of the garden off the margin
Suffer us not to mock ourselves with falsehood
Teach us to care not to care ;
Teach us to sit still
Even among these rocks.

আবার একেবারে হাল আমলের লেখা Dry Salvages-এ তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা স্মরণ ক'রেছেন,

I ha e said, 'take no thought of the harvest, But
only of the proper sowing'

সোজা কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এলিয়ট প্রথমে যেমন জীবনের সার হিসেবে শুধু বুঝেছিলেন মৃত্যুকে, এখন বুঝেছেন যে জীবন মৃত্যুর নামান্তর না হলেও, মানুষের একার শক্তি নয় সার্থক জীবনকে সৃষ্টি করা। 'We build in vain unless the LORD build with us. Can you keep the city that the LORD keeps not with you?' অতএব ত্বং গতি পরমেশ্বর।

উপস্থিত আলোচনার শেষ দাঁড়িটা টানবার আগে আরো একটি কথা বলার প্রয়োজন হচ্চে। কথাটি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এলিয়টের প্রভাব সম্পর্কিত। এ-প্রভাবের দুটি চিত্র, পাশাপাশি কিন্তু পরস্পর বিরোধী। প্রথম চিত্রটা সাধারণ পাঠকের, যাঁরা এলিয়টের নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি। কিন্তু তাঁরা আমাদের আলোচ্য নন। আমাদের লক্ষ্য অপর দিকটা, যেটার কুশীলবরা হ'লেন আমাদের তথাকথিত আধুনিক কবিরা। এলিয়টকে নিয়ে আধুনিক বাঙালী কবি মাতামাতি করছেন প্রায় বছর কুড়ি ধরে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা পাঠকরা যে ফল পেয়েছি তাকে প্রীতিপ্রদ বলতে পারি না। দু'একজন যথার্থ প্রতিভাবান কবি যেমন জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাদে এলিয়টের প্রভাব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বাঙালী কবিকুলের মাথাই খেয়েছে। কারণটা অবশ্যই এলিয়ট সম্বন্ধে বাঙালী কবির অজ্ঞতা। এলিয়টের সৃষ্টি রস ও রূপের মাহাত্ম্যে অপরূপ হ'লেও তা যে তেমন রামা-শ্যামার বোধ্য নয় সে-কথা আমাদের পাঠকরা আশা করি উপস্থিত আলোচনার পর অংশত আঁচ করতে পারেন। বাঙালী কবিরাও অবশ্য এলিয়টের এই আপাত অস্বচ্ছতা চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সম্ভবতঃ ইচ্ছে করেই বুঝতে পারেন নি যে, এ অস্বচ্ছতা স্বাভাবিক গভীরতার, ইচ্ছাকৃত ঘোলানো হাঁটুজলের নয়। এলিয়ট অস্বচ্ছ অথচ তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁকে নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার অন্ত নেই অথচ তাঁর প্রভাবও অনতিক্রমণীয়। অতএব করো কাব্যকে অস্বচ্ছ—আমাদের আধুনিক কবিরা যেন এলিয়টের কাছে কেবল এই মন্ত্রই পেয়েছেন। এবং সে মন্ত্রের পূজা (অথবা ভৌতিক কীর্ত্তন?) কেমন হচ্চে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে, তা তো আজও অবধি অধিক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্চি।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের দুইটি পত্র

শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তী

'পত্র সাহিত্য' আমাদের বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিক আমদানী। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের পত্রাবলী এই বিভাগটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইদানীং সকলেই এই বিভাগটির আরো উন্নতির জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহার নানা শুভ ফলও দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান পত্র দুইটি বাংলা সাহিত্যের কতখানি উপকারে আসিবে সে কথা আমরা জানি না, কিন্তু গত শতাব্দীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত কবির দুর্লভ রচনা প্রকাশের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করিয়াই পত্র দুইটি পত্রস্থ করিতে সাহস পাইলাম।

বহু বৎসর পরে এইবার কলিকাতায় মহাবোধি হলে ও ঢাকায় 'ঢাকা প্রকাশ' কার্য্যালয়ে দুইটি অতি সুন্দর সভায় সময়োচিত ভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় 'ঢাকাই কবি'কে লোকে আজও ভুলিয়া যান নাই। অবশ্য অনেক ক্ষীয়মাণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার 'চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে', 'একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে', 'কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদতলে,' 'অয়ি সুখময়ী উষে!' ইত্যাদি কবিতাগুলি বাংলার ছেলে-বুড়োর কাছে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

স্বাধীনতার পর যে দায়িত্ব লোকের মাথায় আসে পূর্ব্ববর্ত্তী কৃতবিদ্য কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি জাতি শ্রষ্ঠাদের স্মৃতি তর্পণে তাহার অনেকখানি লাঘব হয় এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে কয়প্রকার 'দায়ের' কথা আছে, তাহার মধ্যে মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ অন্যতম। আমরা সেই দায়িত্ব ও দায়ের কথা স্মরণ করিয়াই এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের পত্র দুইখানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে কবির দৃষ্টি শক্তির ব্যাপকতা লক্ষ্যকরা সম্ভব হইবে। তাঁহার বিজ্ঞান ও রাজনীতি জ্ঞানের একটা অস্পষ্ট পরিচয়ও ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

সকলেই মনে করেন পত্রের মধ্য দিয়া ব্যক্তিবিশেষের যে পরিচয় পাওয়া যায় অন্যত্র তাহার সন্ধান পাওয়া খুবই কষ্টকর। এই জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ও জীবন দর্শনকে বুঝিতে হইলে পত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অবশ্য একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রে ভাব ও ভাষা সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন যে তাঁহার পত্র অনেকস্থানেই 'পত্র' না হইয়া সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর পাশে রাখিলে এ কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্রের এই পত্র দুইটিকেও পত্র বলা চলে না। কারণ ইহার মধ্য দিয়া তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

পত্র দুইটিই ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশিত এবং সে সময়ে তিনি সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিয়াছেন। পত্রদুইটির মধ্য দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে কিছুটা সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে করি।

ক

অনেকে অনুমান করিতে পারেন, রাজকুমার আল্‌ফ্রেড কেবল ভারতবর্ষের প্রজাগণের রাজাভাবের উন্নয়ন করিতে আসিয়ায় আগমন করিয়াছেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, তাহা হইলে তিনি অগ্রে ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী কলিকাতায় উপস্থিত না হইয়া চীনের রাজধানীতে উপস্থিত হইতেন না। অগ্রে সঙ্কল্পিত কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া অন্য কর্ত্তব্য করায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রবৃত্তি কিরূপ বিনাশ হয় তাহা তিনি উত্তম জানেন সন্দেহ নাই। অনেকে অনুমান করিতে পারেন, রাজকুমার চীন প্রভৃতি রাজ্যের সম্রাটদিগের সহিত আত্মভাব সংবর্দ্ধন করিয়া পৃথিবীর সাধারণ শান্তি সুস্থির করিতে আসিয়াছেন। ইহার অন্যথা পক্ষে কোন কারণ দেখা যায় না। অনেকে অনুমান করিতে পারেন, রাজকুমার ভারতবর্ষ প্রভৃতিস্থানে আমোদপ্রমোদ সম্ভোগ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু অনেকে রাজকুমারের উন্নতবংশ গৌরব ও নীতি এবং জ্ঞান শিক্ষার মহাসম্পদ-

রূপে প্রতিকার প্রদর্শন করিয়া তাহাতে ধৃতি করিবেন না। তাঁহারা ইহার এই অন্ত একটিও প্রতিকারণ প্রদর্শন করিবেন যে. যাহাদিগের কোন না কোনরূপ আভ্যন্তরিক গৌরব আছে তাঁহারা লঘু ক্রিয়ায় প্রবৃত্তিমান হন না। আমরাও নীতি প্রাকৃতির নাশকর নীচ আমোদ প্রমোদপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া লিখিতেছি, যে স্থলে ঐ সকল অবিকল্প প্রতিকারণ, সে স্থলে রাজকুমারের নীতি প্রভৃতির নাশকর নীচ আমোদপ্রমোদের কারণে আসিয়ায় আসেন নাই ও সুতরাং তাহা করিয় প্রজাগণের তাহা মায়াজনক করিবেন না। অনেকে অনুমান করিতে পারেন, রাজকুমার আসিয়ায় প্রধান প্রধান স্থানের স্থান ও লোকতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে আসিয়াছেন। তিনি তদ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানে সমাধিরূপে জীবনন্যাস করিবেন।

রাজকুমারের ভারতবর্ষ গমনে প্রজাগণের র তত্ত্বজ্ঞান প্রস্ফুটতর হইবে। যাহা এতদিন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের মত মৃদু মৃদু ছিল, তাহা এক্ষণে কোন নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হইবে। তাঁহাদিগের রাজ সম্বন্ধ আত্মভাবেরও উন্নমন হইবে। তাহাতে ভারতবর্ষের এই এক গুরু কল্যাণ হইবে যে নিতান্ত দুর্ব্বার, প্রবৃত্তি মদন্তঃকরণ * হইতেও ক্রোধ প্রবৃত্তির অপনয়ন হইবে। সাধারণ জ্ঞান ও লোকপ্রকৃতিই ইহার প্রমাণ। আত্মভাবের উন্নমন স্থলে নিতান্ত নীতি বিরুদ্ধ প্রকৃতিরও উদ্ভ ত দণ্ড এক চমৎকার শক্তিতে ফিরিয়া আইসে। নির্ম্মল যথাগৌরব জ্ঞানে জ্ঞান শরীরের পৃথক্‌রূপ পোষণ হয় ও তাহা বহিঃ শরীরকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রকাশ পায়। যাঁহারা রাজকুমারকে দেখিবেন, তাঁহারা তাঁহার সেই জ্ঞান গৌরব শরীর দেখিবেন ও তাহাতে তাঁহাদিগেরও জ্ঞান গৌরবের পোষণ হইবে। গৌরবের ভাব প্রত্যক্ষ হইলে জ্ঞানের গৌরব হয়। আমরা দূর হইতেও রাজধানীর গৌরবের ভাবে জ্ঞান-শরীরে উন্নত হইব।

রাজকুমারকে চীনের সম্রাট উপযুক্ত সমাদর করেন নাই। রাজকুমার রাজভাবে ও বয়ঃক্রমে তাঁহার সমান নহেন, এই কারণে তাহা করিয়াছেন অথবা দ্বেষে তাহা করিয়াছেন। প্রথম কারণে সম্রাটের প্রতি আমাদিগের ভক্তির উদয় হইল। (প্রকাশকাল ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল, ইং ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ সন)

খ

শীতল পরমাণু সকলের ভূবেগ একটি গুণ। তেজস্বল্ পরমাণু সকলের উর্দ্ধবেগ একটি গুণ। শীতল পরমাণু জলাদির ভূবেগ গুণ আমাদিগের চক্ষু ও অনুভব দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে। ধূম ও বাষ্প তেজস্বল্ পরমাণু। তাহা উর্দ্ধবেগ গুণে উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে দেখি ও অনুভব করি। অগ্নি তেজস্বল্ পরমাণু। তাহাও উর্দ্ধবেগ গুণে উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা কহিয়াছেন; বায়ু ইহার কারণ। বাস্তব প্রতি কারণ। তাহাতে অগ্নি ধূম ও বাষ্পের উর্দ্ধবেগের কিছু বাঁধা জন্মায়। লগ্ন জাহাজের ধূম নির্গমন কলের কিছু উর্দ্ধগত ধূম যে ঠিক সরল ভাবে উর্দ্ধে না পড়িয়া বাঁকা হইয়া পড়ে, উপরের শীতল বায়ুর ভূবেগ বাঁধা তাহার কারণ।

প্রজ্বলিত অগ্নি যাহাতে সম্বন্ধ থাকে তাহা যদি গুরুতর ভূ-বেগী না হইত, তাহা হইলে অগ্নি তাহা লইয়া উর্দ্ধে পড়িত। কাগজ ও খেড় কিছু লঘু ভূবেগী। অতএব তাহাতে আগুন দিলে তাহা আগুনের উর্দ্ধবেগে কিছু উর্দ্ধে উঠে।

জলাদিদ্বারা অগ্নির যুক্ত অবস্থা বিযুক্ত করিলে তাহা অশীতলীভূত পরমাণু সকল উর্দ্ধে গিয়া থাকে। তাহাতে গৃহের চাল উত্তপ্ত ও অনুভূত হয়। ধূমও তাহার এক কারণ। যে আগুনে ধূম না হয় ও যাহার তাপ চাল পর্য্যন্ত না যায়, তাহা কেবল উর্দ্ধ বেগী বিযুক্ত অগ্নির পরমাণুতে তেজস্বল্ হইয়া থাকে। ঐ পরমাণু সকলের দাহি তেজ থাকিলে চাল জলিয়া উঠিতে পারে।

একখানি কাষ্ঠ হইতে প্রজ্বলদগ্নি যদি এইরূপে বিযুক্ত করা যায় যে তাহা সমুদায় কাষ্ঠ বিযুক্ত হয়, ও তাহার পরমাণু সকলের তেজ যথাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহা উর্দ্ধবেগ গুণে উর্দ্ধে উঠিতে দৃষ্ট হইবে। উর্দ্ধবেগী ফানুস-বাজীর উর্দ্ধবেগ অনুভূত হইয়া থাকে।

আমি একদিন দৃষ্টি সমাধিতে ছিলাম; একটি ঢেলা কোন নক্ষত্র তল হইতে ছাড়িয়া দিলে তাহা কোথায় পড়িবে। এক্ষণ দৃষ্টি জন্মিয়াছে; তাহা তাহার ভূবেগ গুণে পৃথিবীতে পড়িবে। ও যদি উপরে শীতল হওয়ার কারণ না থাকিত, তবে পৃথিবীর উর্দ্ধ পতিত সকল তেজস্বল্ পরমাণুই গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে পতিত হইত। (প্রকাশকাল—২৫শে মাঘ, ১২৭৬, ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০)

* শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ছাপা হইয়াছে, হইবে—নিতান্ত দুর্ব্বার প্রবৃত্তিমৎ অন্তঃকরণ।

ভিক্ষার্থী

[এণ্টন সেকফ্]

শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

"দয়া করুন, হুজুর, পেটের জ্বালায় মরছি, এ গরীবকে দয়া করুন—তিন দিন আহার জোটেনি, পয়সা খরচ ক'রে যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই ক'রে নেব সে-সঙ্গতি নেই। ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি, বিশ্বাস করুন। আটবচ্ছর গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতী ক'রেছি, কিন্তু লোকের চক্রান্তে সেটি হারাই, মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়েছে। এখন বছর ঘুরতে চলল; আজও কোনও কিছু জুটল না।"

এ্যাডভোকেট মহোদয় এই সাহায্যপ্রার্থীর দিকে তাকাইলেন, তার ছেঁড়া বাদামী রংয়ের ওভারকোট মাতালের মত হীনপ্রভ ঢুলুঢুলু চোখ, দুইগালের মাঝখানকার রক্তিম ছোপ দেখিয়া তাঁর মনে হইল, কোথায় যেন ইতিপূর্ব্বে লোকটিকে দেখিয়াছেন।

প্রার্থী বলিয়া চলিল, "কালুগা প্রদেশে একটা কাজের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, কিন্তু সেখানে যে যাবো তার পয়সা নেই। দয়া ক'রে আমায় সাহায্যদান করুন। লোকের কাছে চাইতে লজ্জাবোধ হয়, কিন্তু কি করবো, অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে তা'ছাড়া আর উপায় নেই।

এ্যাডভোকেট মহোদয়ের চোখ পড়িল লোকটির জুতার উপর,—দেখিলেন, একটি জুতা বড়, একটি ছোট, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—

"শোনো ত' বাপু, পরশু তোমায় রাস্তায় দেখেছিলাম? তখন ত' তুমি বলেছিলে তুমি একজন ছাত্র, বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হ'য়েছ? শিক্ষক ছিলে বলনি ত'? কি, মনে পড়ছে?

ভিক্ষার্থী হতচকিত হইয়া তোৎলাইতে লাগিল,—"না-না-না, তা' হ'তে পারে না, আমি গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত, দেখতে চান ত' কাগজপত্র দেখাতে পারি।"

"থামো, আর মিথ্যে কথা বলতে হ'বে না। তুমি নিজেকে ছাত্র ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে, কেন তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে তাও বলেছিলে। কি? মনে পড়ে না?"

এ্যাডভোকেট মহোদয় লাল হইয়া উঠিলেন, ঘৃণায় ঐ জীর্ণবেশপরিহিত লোকটির দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন।

ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "একেই বলে অসাধুতা, বুঝেছেন মশাই, এর নামই প্রবঞ্চনা! বেটা! পুলিসে দেব তোকে! আচ্ছা, গরীব আছিস, খিদেয় মরছিস, বেশ বুঝলাম, কিন্তু তাই বলে এমন নির্জ্জলা মিথ্যেগুলো নির্লজ্জের মত বলবার তোর কী অধিকার আছে?"

লোকটা দরজার হাতলটা ধরিয়া, হাতে-নাতে-ধরা-পড়ে-যাওয়া চোরের মত ঘরটার চারিদিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, অস্ফুটকণ্ঠে বলিল,—আ-আ-আমি ত' মি-মিছে কথা বলছি না, আপনাকে কাগজপত্র দেখাতে পারি।"

ক্রুদ্ধস্বরে এ্যাডভোকেট মহোদয় বলিলেন,—"কে বিশ্বেস করছে তোর কথা? লোকে গ্রাম্য শিক্ষক আর ছাত্রদের জন্যে সহানুভূতি বোধ করে, সেই সহানুভূতি ভাঙিয়ে খাওয়া কত বড় ইতরামি, কতবড় মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয়, জানিস না? ঘেন্না, ঘেন্না!"

ভদ্রলোক ক্রোধে দিশাহারা হইয়া ঐ লোকটিকে ভৎসনা করিয়া চলিলেন। নিজের মধ্যে দয়া, কোমল অন্তঃকরণ, আতুরজনের প্রতি অনুকম্পা এইগুলি আছে বলিয়া তিনি বিশেষ গর্ব্ববোধ করিতেন, আর এই হতভাগাটা কিনা সেইখানেই আঘাত দিয়া বসিল। নিষ্কলুষ হৃদয়ের যে পবিত্র প্রেরণায় তিনি এই দয়াদাক্ষিণ্য করেন, লোকটির এই মিথ্যাভাষণ, এই অসদ্ভাবে লাভবান হইবার চেষ্টা তাহাকে মলিন, দূষিত করিয়া দিল। প্রথমে হতভাগা লোকটি নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু অবশেষে চুপ হইয়া গেল এবং অপ্রতিভভাবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বুকে হাত দিয়া লোকটি বলিল,—"হুজুর! সত্যিই আমি মিছে কথা বলছিলাম। আমি শিক্ষকও নই, ছাত্রও নই, ও সবই ভুয়ো, আগে আমি এক গানের

দলে গান গাইতাম, মাতলামির জন্যে আমার সে কাজ যায়! কিন্তু ও ছাড়া আমি কি করতে পারি? মিছে কথা না বলে চালাই কি ক'রে? সত্যি কথা বল্লে কেউ আমায় কিছু দেবে না। সত্য আঁকড়ে থাক্‌তে হ'লে হয় অন্নাভাবে মরতে হ'বে, না হয় বাসস্থানের অভাবে শীতে জমে মর্‌তে হ'বে। আপনি যা' বলেছেন, যুক্তিযুক্তই বলেছেন, আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু কী কর্‌তে পারি আমি?"

"কি কর্‌তে পারো? বল্‌ছি, কি কর্‌তে পারো?" চীৎকার করিয়া বলিলেন এ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয়, লোকটির কাছে ঘেঁষিয়া আসিলেন,—"কাজ! তুমি যা' কর্‌তে পারো তা' হ'ল কাজ! তোমাকে কাজ কর্‌তেই হ'বে।"

"কাজ! হ্যাঁ, সে-আমিও জানি, কিন্তু কাজ পাবো কোথায়?"

"যত সব বাজে কথা! তরুণ বয়স, সুস্থ সবল দেহ, কাজ কর্‌তে চাইলে কাজ সব সময়েই পেতে পার্‌তে, কিন্তু তা' নয়, তুমি হ'লে নবাব, আলসে, মাতাল—গা থেকে যেন শুঁড়িখানার গন্ধ বেরুচ্ছে। হাড়বজ্জাত। স্বভাব গেছে নষ্ট হ'য়ে, পারো শুধু মিথ্যে কথা বলতে। যদি বা কৃপা করে কাজ কর্‌তে সম্মত হ'লে ত' কাজ চাই কোনো আপিসে, বা ঐ গানের দলে কিম্বা ঐ জাতীয় একটা কিছু অর্থাৎ এমন কাজ, যাতে বিনা পরিশ্রমে পয়সা আসে! কেন, দৈহিক পরিশ্রম ক'রে, দিন মজুরী খেটে রোজগারের চেষ্টা দেখ্‌লে কি হয়? না, তা' কি ক'রে হ'বে, মস্ত লোক তুমি! ফ্যাক্টরীতে মজুরগিরি, কুলিগিরি, এসব তুমি কেমন ক'রে কর্‌বে!"

লোকটি বিরস হাসি হাসিয়া বলিল,—"হায় ভগবান্! বড় কঠোরভাবে বিচার কর্‌ছেন আমায়! মজুরগিরি আমি কোথায় পাবো? এ বয়সে কেরাণীগিরি আমায় দেবে কে? ব্যবসাতে ঢুক্‌তে হ'লে অল্প বয়সে ঢুক্‌তে হয়, এখন আর আমার সে বয়স নেই! কুলিগিরিও আমায় কেউ দেবে না, কারণ আমায় ফরমাস ক'রে খাটাবার ক্ষমতা নেই কারো। আর ফ্যাক্টরীতে? সেখানে ত' নেবেই না, সেখানে ঢুক্‌তে হ'লে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা থাকা দরকার, আমার সে-সব নেই।"

"বাজে কথা! ওজর আছেই একটা না একটা! আমার এখানে কাঠ ফাড়ার কাজ কর্‌বে? কি বল?"

"ও কাজ কর্‌তে আমি অস্বীকার কর্‌ছি না। কিন্তু আজকাল ওস্তাদ কাঠ-ফাড়িয়েরাই কাজ না পেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।"

"হেঃ! তোমাদের মত নিষ্কর্মাদের কথাই ঐরকম। যেই কাজের কথা বলা হ'ল অমনি তাই-না নাই-না-না! কি, আস্‌বে? ফাড়্‌বে?"

"হ্যাঁ, হুজুর, ফাড়্‌বো।"

"বহুৎ আচ্ছা! দেখা যাবে এখুনি—চমৎকার দেখা যাবে—"

এ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয় হাত কচলাইতে কচলাইতে দ্রুতপদে চলিলেন, মনে যে একটু আক্রোশের ভাব না ছিল, তা নয়, পাচিকাকে রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"এই নাও, ওল্গা, এই ভদ্রলোকটিকে কাঠের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাঠ ফাড়্‌তে দাও।"

জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাব্যঞ্জক একটা ভঙ্গী করিল, তারপর যেন দোলায়মান চিত্তে পাচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল তার যাইবার ভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছিল, সে কাঠ ফাড়িতে যাইতেছে, ক্ষুধার্ত হইয়াছে বা কাজ চায় বলিয়া নয়, যাইতেছে কতকটা আত্মসম্মান বোধের তাড়নায়, কতকটা লজ্জার খাতিরে, কি আর করিবে, নিজেরই কথার জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে শরীর তার শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, স্বাস্থ্যও তার খারাপ আর পরিশ্রম করিতে তার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।

এ্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয় তাড়াতাড়ি খাবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। এ ঘরের জানালা দিয়া কাঠের ঘরটি দেখা যায়, আঙিনায় যা কিছু ঘটে সবই নজর করা যায়। জানালায় দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন, পাচিকা ও সেই লোকটি পিছনের দরজা দিয়া আঙিনায় প্রবেশ করিল এবং মলিন বরফের উপর দিয়া কাঠের

ঘরের দিকে চলিল। ওল্গা কটমট্ করিয়া সঙ্গীর দিকে তাকাইল, কনুই দিয়া ঠেলিয়া তাকে পাশে সরাইয়া দিল। তারপর দরজার তালা খুলিয়া ক্রুদ্ধভাবে দুম্ করিয়া সশব্দে দরজাটা খুলিল।

এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয় মনে মনে ভাবিলেন,—"ও বোধ হয় কফি খাচ্ছিল, এমন সময় ওর কফি খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফেলেছি। কী বদ্‌মেজাজ, বাবাঃ!"

তারপর দেখিলেন, সেই তথাকথিত শিক্ষক, সেই তথাকথিত ছাত্র, একখণ্ড কাঠের উপর বসিয়া তার লাল গাল দুটি দুই হাতের উপর রাখিয়া কি-এক চিন্তায় যেন তন্ময় হইয়া গেল। ওল্গা তার পায়ের কাছে একটা কুড়ুল ছুঁড়িয়া দিয়া সক্রোধে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, এবং বিড় বিড় করিয়া কি-যেন বকিতে লাগিল, তার ঠোঁটের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, লোকটিকে তিরস্কার করিতেছে। লোকটি দোমনাভাবে একখণ্ড কাঠ কাছে টানিয়া নিল, দুই পায়ের মাঝে রাখিয়া কুঠার দিয়া উহাতে ক্ষীণভাবে আঘাত করিল. খণ্ডটি গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকটি আবার কাঠটি টানিয়া লইল; শীতে জমা হাতে একটু ফুঁ দিয়া লইয়া আবার কুঠার দিয়া অতি সন্তর্পণে কাষ্ঠখণ্ডটিতে মৃদু আঘাত করিল, যেন ভয়, কুঠারের আঘাতে তার পা-ই কাটিয়া না যায়! কাষ্ঠখণ্ডটি আবার গড়াইয়া পড়িল।

এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয়ের রাগ পড়িয়া গিয়াছে; এখন তাঁর মনে একটু দুঃখবোধই জাগিতেছে, এমন একটা অকর্ম্মণ্য মাতালকে—বেটা রুগ্ণও হইতে পারে—এই শীতের মধ্যে অমন শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করায় মনে মনে একটু লজ্জিত বোধই করিতেছেন।

খাবার ঘর হইতে পড়ার ঘরে যাইতে যাইতে ভাবিলেন;—"যাক্‌গে, অত ভাবনা কিসের? ওর ভালর জন্যেই ত' এ-কাজ ক'রেছি।"

এক ঘণ্টা পরে ওল্গা আসিয়া জানাইল, সব কাঠ ফাড়া হইয়া গিয়াছে।

এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয় বলিলেন,—"বেশ, ভাল কথা। ওকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে দাও। বলে দাও, যদি ইচ্ছে হয় ত' প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে এসে কাঠ ফেড়ে দিয়ে যেতে পারে। এলে সবসময়েই কিছু-না-কিছু কাজ ওকে দিতে পারবো।"

মাসের পয়লা তারিখে লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে-দিন দুর্ব্বলতার জন্য সে ভাল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেই পারিতেছিল না। তবুও সে আবার আট গণ্ডা পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া গেল। সেইদিন হইতে প্রায়ই সে আঙ্গিনায় আসিয়া দেখা দিত এবং প্রত্যেকবারই তাকে কিছু-না-কিছু কাজ দেওয়া হইত। কখনও বা কোদাল দিয়া বরফ সরাইত, কখনও বা কাঠের ঘর সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিত, কখনও বা লাঠি দিয়া গদী-তোষকের ধূলা ঝাড়িত। আর প্রত্যেক বারেই ছ'সাত গণ্ডা পয়সা লাভ করিত, একবার তাকে একজোড়া পুরাতন 'ট্রাউজার্স'ও দেওয়া হইল।

এ্যাডভোকেট মহোদয় যখন বাড়ী বদল করিয়া অন্য এক বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন তখন জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা টানাহেঁচড়া করিবার জন্য লোকটিকে নিযুক্ত করিলেন। এবার লোকটি প্রকৃতিস্থই ছিল, মদ খায় নাই, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণভাব, মুখেও কথা নাই। জিনিষপত্রে সে হাত দিলই না বলিলেই হয়। মাথা নীচু করিয়া গাড়ীর পিছনে পিছনে সারাক্ষণ শীতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাটাইল, ব্যস্ত থাকিবার ভাণমাত্রও করিল না। গাড়োয়ানেরা যখন তার আলস্য ও শক্তিহীনতার জন্য তাকে বিদ্রূপ করিতেছিল, তার ঐ শতচ্ছিন্ন সৌখীন ওভার কোটটির প্রতি কটাক্ষ করিয়া রঙ্গরস করিতেছিল, তখন সে যেন বিব্রত ও অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল। বাড়ী বদল হইয়া গেলে এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয় তাকে ডাকিয়া তার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন—"বেশ, ভাল, আমার কথায় কাজ হ'য়েছে তাহ'লে? এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। প্রকৃতিস্থ আছ, কাজেও আর আপত্তি নেই! বেশ, কি নাম তোমার?"

"লুস্কফ্।"

"শোনো তবে লুস্কফ, আজ তোমায় একটা অন্য কাজের কথা বল্‌ছি। তুমি লিখ্‌তে পারো?"

"পারি।"

"আচ্ছা, তবে এ-চিঠিটা কাল আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যেও, সে তোমাকে কিছু নকল করবার কাজ দেবে। খুব খেটে কাজ করো, মদ খেও না আর, যা' যা' বলেছি সব মনে রেখো। আচ্ছা, এসো এবার।"—একটা লোককে সৎপথে আনা গেল ভাবিয়া এ্যাড্‌ভোকেট্‌ মহোদয়ের মন বেশ খুশী হইয়া উঠিল; তিনি সস্নেহে তার পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন, বিদায়কালে 'হ্যাণ্ডসেক' করিতেও দ্বিধা করিলেন না। লুকক্‌ চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। সেইদিন হইতে সে তার কাজের জন্ত এ্যাড্‌ভোকেট্‌ মহোদয়ের দ্বারে দেখা দিল না।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এ্যাড্‌ভোকেট্‌ মহোদয় থিয়েটারের টিকিট কিনিতেছেন, হঠাৎ নজরে পড়িল তার পাশে একটী স্থূলকায় লোক, মাথায় সিলকিনের টুপী, গায়ে ফারের কলারযুক্ত কোট। লোকটি অতি সঙ্কোচভরে টিকিটবিক্রেতার কাছে গ্যালারীর টিকিট চাহিল এবং টিকিটের স্বল্পমূল্য তাম্র-মুদ্রায় চুকাইল।

এ্যাড্‌ভোকেট্‌ মহোদয় চিনিলেন,—"এ তাঁর সেই 'কাঠফাড়িয়ে'। বলিলেন, "কে? লুকক্‌ না? কেমন আছ? কি করছ? কেমন চলছে তোমার?"

"ভালই। আমি এখন দলিলপত্রাদি লিখে দেবার কাজ করি, মাসে টাকা পঁয়ত্রিশেক পাই।"

"সত্যি! বাঃ, খুব ভাল কথা। সত্যি বড় আনন্দিত হ'লাম, লুকক্‌, ভারি আনন্দিত হ'লাম। দেখ, তুমি বলতে গেলে আমার পালিত পুত্রের মত, সৎপথের মুখে তোমাকে সেই যে ঘাড়ে ধরে ঠেলে দিয়েছিলাম। উঃ, মনে আছে তোমার, কি বকুনিটাই না দিয়েছিলাম! তুমি ত' আমার প্রায় পা ধরে পড়েছিলে। যাক্‌, তুমি যে আমার কথাগুলো ভোলোনি সেজন্ত তোমায় ধন্তবাদ।"

লুকক বলিল,—"আপনাকেও আমি ধন্তবাদ দি। যদি আপনার কাছে না যেতাম তবে আজও হয়ত' আমি নিজেকে ছাত্র বলে বা শিক্ষক বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াতাম। সত্যি, আপনার আশ্রয়ে গিয়েই আমি ঐ দুর্দ্দশার কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছি।"

"বাস্তবিকই, আমি বড় খুসী হ'য়েছি।"

আপনার সদয় ব্যবহার আর মিষ্ট কথার জন্ত আপনাকে ধন্তবাদ। সেদিন কথাগুলো আমায় চমৎকার-ভাবেই বলেছিলেন। আমি চিরকৃতজ্ঞ—আপনার কাছে ও আপনার পাচিকার কাছে। ঐ মেয়েটি বড় ভাল, বড় উচ্চমনাঃ, ভগবান তার মঙ্গল করুন। হাঁ, সেদিন আপনি কথাগুলো চমৎকারই বলেছিলেন বটে। আমার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আপনার পাচিকা ওল্‌গাই আমায় বাঁচিয়েছে।"

"কি রকম?"

"আমি যখনই আপনার বাড়ীতে কাঠ কাড়তে যেতাম তখনই ওল্‌গা শুরু করতো,—"ওরে মদখোর,ওরে হতভাগা, তোর কপালে চরম দুর্দ্দশা ছাড়া আর কি আছে!" এই বলতে বলতে সে আমার সামনে বসতো, আর বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো অবশেষে কাঁদতে আরম্ভ করতো—"ওরে ও হতভাগা, তোর ভাগ্যে ইহকালে পরকালে কোনও কালেই সুখ নেই। পাঁড় মাতাল তুই! তোর কপালে আছে নরকযন্ত্রণা, হায়রে অভাগা!" এইভাবে বিলাপ করতে থাকতো, আমার জন্ত কত-যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতো, কত-যে অশ্রুবর্ষণ করতো, কি বলবো? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা,—সে আমার হ'য়ে কাঠ ফেড়ে দিত। আপনি জানেন? আপনার কাঠ এক টুকরাও আমি ফাড়িনি, সব সে-ই ফেড়েছে। এতে কেন যে আমার উদ্ধার সম্ভব হ'ল, আমার পরিবর্ত্তন ঘটল, তাকে দেখবার পর কেন যে আমি মদ খাওয়া ছাড়লাম, এসব আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তবে এটুকু জানি যে, তার ও কথা আর ও মহৎ কাজের প্রভাবে আমার অন্তরে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হ'ল। সে-ই আমাকে সৎপথে চালিত ক'রেছে। এ কথা আমি কখনই ভুলবো না। যাক্‌ এবার যাবার সময় হ'ল, ঐ ঘণ্টা বাজছে।"

লুকক অভিবাদন করিয়া গ্যালারীতে তার আসনে চলিয়া গেল।

বিচার চাই

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মেয়েটিকে নিয়া খুব বিপদে পড়া গেল।

অনিল আমার টেবিলের সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমার সহকারী। সে বলিল, 'ভাবছেন কি'?

বলিলাম—'ভাবছি ঐ মেয়েটিরই কথা...সে কখনো বেশ সহজ মানুষের মতো কথা বলেছে, তারপর এতো বেঠিক বলছে যে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না একটু আগে তার মাথা ঠিক ছিল।'

অনিল বলিল—'ও যা' বলছে কোনটাই বেঠিক নয়। তবে আগে যা 'বলেছে তা' একটু রেখে ঢেকে—আর শেষে যা' বললে তা' বে-আবরু সত্যি। আপনি এ'র মধ্যে সহজ অ-সহজ কি দেখলেন? মানুষ যখন নিজের বুক ছিঁড়ে ফেলতে চায়, তখনি পারে এইসব বলতে।" —বলিতে বলিতে অনিলের নাক-কান লাল হইয়া উঠিল। মেয়েটির প্রলাপোক্তি এত উত্তেজিত করিয়াছে অনিলকে যে, সে নিজেকে সামলাইতে পারিতেছে না।

আমি বলিলাম—এমন বীভৎস কথাগুলো পুরনারী-দের মুখ থেকে বেরোয় কেমন করে...যতই হোক না কেন অসহ্য।

রাগে লাফাইয়া উঠিল অনিল...তার দাঁতগুলো কড় মড় করিয়া উঠিল।

একটি আশ্রয়প্রার্থীদের কেন্দ্রে কাজ করিতেছি। আমিই প্রধান কর্মচারী। কাননগোগিরি থেকে এই কাজে যখন বাহাল হইলাম, হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম মনে হইল। ভাবিলাম দিন কতক রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু দেখিতেছি সেই রোদবৃষ্টি বরং ভালই ছিল...এ কোথায় আসিলাম...এ যেন একটা হা-হাকারের রাজ্য... তা'র সঙ্গে আছে পাগলা গারদের উপদ্রব। অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। সহকারীটিও একটি পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ঘা-খাওয়া ছোকরা। হয় তো সেও সর্ব্বহারা হইয়াছে, তাই একটুতেই লাফাইয়া ওঠে। যতো বলি—'বাপু হে, অতো বড় বড় রাজনীতির কথায় কাজ কি তোমার...ওসব কথা বলে লাভ কি বল তো? তোমার দুঃখ তোমারই থাকবে, আমার দুঃখ আমারই থাকবে...কারো দুঃখ কেউ ঘুচাবে না। এখন যারা রাজ্য চালাচ্ছে তারা আগে কি বলেছে, তার কি করলে, কি করলে না—তাতে তোমার কি এসে যায়?... তুমি বাপু চোখ বাঁধা বলদের মতো ঘানি টেনে যাও।... মনিবের দানা খাও, তার হুকুম তামিল ক'রে যাও। ছোঁড়া কিন্তু কথায় কথায় লাফায়। তার বরাতে দুঃখ আছে বুঝিতেছি।

আশ্রয়প্রার্থীদের ভিতর কত জেলার লোক যে আসিয়াছে, কত রকমের উচ্চারণ যে তাদের! তবে মেজাজ যেন সবারই সপ্তমে বাঁধা। সবাই রাগে ফুলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের লোক একটু রাগী হয় শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহারা যেন এক একটি অগ্নি অবতার ...যেন কাছে পাইলে চিবাইয়া খাইতে চায় প্রতিপক্ষকে।

যাক্ সে সব কথা। যে মেয়েটির কথা বলিতেছিলাম তারই কথা বলি,—যে দলটির সঙ্গে তারা গোয়ালন্দর গাড়িতে আসিল, তাদের প্রায় সবই মেয়েছেলে। তাদের দেখিয়াই অনিলের মাথা বিগড়াইয়া যায়। আমারও ছোঁয়াচ লাগিল...আমিও মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। কি মর্ম্মন্তুদ এক এক জনের কাহিনী?...উঃ। তবুও মনকে তাড়া দিলাম। বলিলাম—'চাকরি করতে এসে-ছিস, চাকরি বাঁচিয়ে যা'...চাকরের আবার বিচার করার কি আছে?...গোলামের আবার ভালমন্দ বুদ্ধি?' কিন্তু যখন শুনিলাম—এই মেয়েটি এই তিন প্রহর পর্য্যন্ত শুধু অঝোরে কাঁদিতেছে, মুখে জলবিন্দু পর্য্যন্ত দেয় নাই... তখন আমার সারা অন্তরাত্মা যেন জিঘাংসায় কুঁচকাইয়া শক্ত হইয়া গেল। জানিলাম, এই দলকে—দলই সম্ভব শীলতার আঘাতপ্রাপ্ত নারী। সকলেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিশিখা। তবুও তাদের আর সবাই যা' হোক কিছু মুখে দিয়াছে। কিন্তু এই তরুণী আসিয়াই সেই যে

STUDENTS

পড়িয়াছে, শত অনুরোধেও আর সেখান থেকে উঠিতেছে না। তার কান্নায় যেন পাথর ফাটিয়া যায়।

মেয়েটির কাছে যাইবার জন্য উঠিলাম। পা ওঠে না। বিবেক ঠেলিতেছে। কয়েকটি কলেজের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা ছিল। তারা তাকে সমবেদনায় ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আমি তাদের কাছে শুনিলাম মেয়েটির নাম বিনীতা। মেয়েটির কাছে গিয়া আমি বলিলাম—'দেখ মা, আমি তোমার বাবার বয়সী, তুমি আমার অনুরোধ রাখ, স্নান কোরে যা'হোক একটু কিছু মুখে দাও···ধর মা, আমার হাত ধরে ওঠো।' আমি আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম। মেয়েটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ছোঁবেন না···ছোঁবেন না···এ দেহ পশুতে অপবিত্র করে দিয়েছে।' আমার মন তখন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে সেই সব দানবদের উপর। তবুও শক্ত করিয়া বুক বাঁধিয়া বলিলাম—'বাপের হাত ধরতে মেয়ের কোন লজ্জা নেই মা।' বিনীতা বলিল—'আগুনে পুড়িয়ে ফেলব এ দেহ···কি হবে এ দেহ রেখে।' তারপর শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল তার চোখ দিয়া। তার সঙ্গে ফাটিয়া পড়িল যত স্বেচ্ছাসেবিকাদের চোখ। ও দিকে আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল অনিলের চোখ দিয়া।

আমি বিপদ গণিতে লাগিলাম।

বিনীতাকে বাঁচানো বুঝি সম্ভব হয় না। স্বেচ্ছাসেবিকারা ছাড়া কেই বা তাকে বাঁচাইবে। কিন্তু তারা তো ধৈর্য্য হারাইয়াছে। আমি তাদের বলিবই বা কি? তবুও বলিলাম—'এই তরুণীটি মারা গেলে তোমরাও কিন্তু অপরাধী হবে···শিক্ষিত মেয়ে তোমরা, ভাল করেই জানো যে, স্বাধীনতার রথের চাকা আসে অরাজকতার পথ দিয়ে···তখন অনেকেরই অনেক কিছু যায়···বহু দাম দিয়ে স্বাধীনতাকে কিনতে হয়।' বিনীতা হঠাৎ খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'চাই বিচার···বিচার চাই।' তারপর দেখা গেল উত্তেজনায় আবেগে বিনীতা মূর্চ্ছা গিয়াছে।

এইবার স্বেচ্ছাসেবিকারা কর্ত্তব্যে অবহিত হইয়াছে। তারা ঠাণ্ডা জলের ছাট্ দিয়া, মাথা ধোয়াইয়া হাওয়া করিতেছে বিনীতাকে। তবু তার দাঁত ছাড়ে না।

অনেক কষ্টে যেন তার একটু চেতনা হইল। স্বেচ্ছাসেবিকারা তাকে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কমলার রস খাইতে দিতেছে। খানিকটা অবচেতন অবস্থায় বিনীতা বলিতে লাগিল—"তোমরা আমায় বাঁচাতে চেষ্টা কর না বোন··· যার সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তার বেঁচে লাভ কি আছে?···স্বামী আমার জাহাজে কাজ নিয়েছিলেন।···যা' যে-দেশে ভাল পেতেন তাই খুঁজে নিয়ে আসতেন। মগের মুলুকের বাঁশের ফুলদানি, তাতে সোনার জলের হল্কা করা।···দ্বীপান্তরের সব পলার খেলনা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।···জৌলুষেভরা জাপান দেশের রেশমী কাপড়।···আরও আনতেন কত কি যে খাবার জিনিষ তার সব নামই জানি নে।···তিন বছরে তিনি দিলেন দালান-বাড়ী।···পাত্তা ধরে আমার বিয়ে হয়েছিল···দাদা ছাড়া কেউ অভিভাবক ছিল না··· গেল বার থেকে এতো দাম বাড়লো খাদ্য-খাদকের যে আমাদের দুটো ভাতের সংস্থান করতে দাদাকেও চলে আসতে হ'ল কোলকাতায়।···তার পর আগুন লেগে গেল দেশে।···আমাদের জেলার সকলের শেষে অত্যাচার হ'ল আমাদের গাঁয়ে।··· নমঃর দল যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের কিছু রাখলে না দুশমনরা। তাদের ঘর-দোর পুড়ল, তবু মেয়ে-পুরুষে লড়লে তারা···মান দিলে না, প্রাণ দিলে।···আমরা তখন হ'লাম নিরুপায়।...তখন সেই কুকুরগুলো আমাকে আর বৌদিদিকে এক আঁস্তাকুড় থেকে আর এক আঁস্তাকুড়ে নিয়ে বেড়ালে...আর আমাদের উপর কি-যে অকথ্য অত্যাচার···উঃ। কি অকথ্য অত্যাচার।···ছোঁবেন না বাবা, ছোঁবেন না এ-পাপ দেহটা···ছোঁবেন না।—ইহার পর সে আবার বুকফাটা চীৎকার করিয়া উঠিল—'বিচার চাই···বিচার চাই···স্বাধীন দেশের কাছে সুবিচার চাই এই অত্যাচারের।'

দেখা গেল এই বারকার চীৎকার তার মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ আবেদন। ইতিমধ্যে সেই আশ্রয়প্রার্থীদলের আর একটি তরুণী বিনীতার মাথাটি নিজের উরুতে নিয়া জোরে

জোরে পাখার বাতাস দিতেছে। আর স্বেচ্ছাসেবিকারা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।

অধিক রাত্রে বিনীতার অবস্থা উদ্বেগজনক হইল। আর তো লেবুর রসও গলায় তলায় না। তার চোখ বসিয়া গেল। যে-তরুণীটি তাকে সেবা করিতেছিল, সে ডুকরাইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—'ঠাকুরঝি… ঠাকুরঝি, এ-পাপ সংসার ছেড়ে চলে গেলে সতীরাণী… আমায় কেন ফেলে গেলে…কোন্ লজ্জায় আমি বেঁচে আছি?'

মৃত্যুর দ্বারে এ কি পরিচয়!

ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে। কে তাহাকে দেখে…কে তাহাকে বুঝায়!

সহসা একটা হুঙ্কারের শব্দে চমকাইয়া উঠিল সবাই। কি কড়্‌কড়্, কড়্‌কড়্ দাঁতের শব্দ। উন্মত্ত আক্রোশে লাফাইতেছে অনিল। গগনভেদী আওয়াজ তুলিয়া সে বলিতেছে—'শুধু এই পশুদের বিচার নয়…তাদের মাথায় করে নাচছে যারা সেই অমানুষদেরও বিচার চাই।'

তেমনি দাঁত কড়্‌কড়্ করিতে করিতে বিদ্যুৎবেগে অনিল বাহির হইয়া গেল। যে-তরুণীটির কোলে বিনীতার মাথাটি ছিল সেও লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর বলিল—দাঁড়াও…ওগো দাঁড়াও…যাব, যাব, আমিও যাব তোমার সঙ্গে …তুমিও ছিলে এখানে, তবে!…দাঁড়াও… তোমার সঙ্গে নাও…অসুর বিনাশ করব আমরা—আমরাই তাদের বিচার করব—তার পর ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলব— হাঃ! হাঃ! হাঃ!

তরুণীটিও ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িয়াছে—সে আজ স্বামীকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশে কোথায় চলিয়াছে সে?—শেষে ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা কাটিয়া নিজের রক্ত খাইবে না তো?

স্মৃতি

শ্রীনির্ম্মলকান্তি চক্রবর্ত্তী

তোমার ছবি আমার মনে আছে,
প্রেমের পরশ দিয়েছ তুমি
বুকের কাছে কাছে।
নয় সে সাধারণ;
ফুলের মালা গন্ধ ঢালা
কোমল পরশন।
তারা আমার নবীন প্রান্তে
রক্ত আলোর নৃত্যে মাতে,
তারা ফাগুন পূর্ণিমাতে
দোলায় ত্রিভুবন।
নয় সে সাধারণ;
আলোর মালা গন্ধ ঢালা
ফুলের পরশন।
হায় গো কবি হায়,
পাথর কেটে ঝরণা ধারা
চিহ্ন এঁকে যায়।
নয় সে মুছিবার;
চলার পথে এ যে গো তার
প্রাণের অধিকার।

উদাসী মেঘ যাবার কালে
উছল ধারা সেথায়ই ঢালে,
প্রাণের গাঙে ঢেউ লাগে ওই
শ্যামল দুনিয়ার।
এ যে গো তার চলার পথে
প্রাণের অধিকার।
তোমার ছবি আমার মনে আছে,
সুধার ছোঁয়া লাগিয়েছ মোর
বুকের কাছে কাছে।
আজো আমার বকুল শাখে,
বউ-কথা-কও নিত্য ডাকে,
আজো সুদূর পথের বাঁকে
হারায় পরাণ মন।
নয় এ সাধারণ;
হাল্কা বাঁশীর সুরের হাসির
মৃদুল পরশন।

রূপ-লোক

আজকাল সাধারণতঃ সমালোচনা-পত্রে দেখিতে পাই যে, পুরাতন অভিনেতারা প্রায়ই অসাড় হইয়া পড়িতেছেন। একসময়ে যাঁহারা প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সময়ের সঙ্গে চলিতে না পারিলে তাঁহাদের যে বিশেষত্ব থাকে না, তাঁহারা একঘেয়ে হইয়া পড়েন, এ-কথা সত্য, সুতরাং সমালোচকদের কি করিয়া দোষ দিব? একদিন যে দানিবাবু আলেকজাণ্ডার ও ললিতাদিত্য চরিত্রের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া 'শ্বেতহস্তী' বলিয়া আখ্যা পাইয়াছিলেন, তিনিই আবার যোগেশ, দুর্গাশঙ্কর, চাপাল- গোপাল প্রভৃতি ভূমিকায় এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন যে, তথাকার নূতনের দলও দানিবাবুকেই অবিসম্বাদী নেতা এবং নূতন পুরাতনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নটশিল্পী বলিয়া অভিনন্দিত করেন। কিন্তু আজকাল পুরাতনদের সেই সাধনা কোথায়? যাহা হউক, এই সময়ও নূতন নূতন এমেচিয়ার ক্লাবের স্থানে স্থানে অভিনয় দেখিয়া আবার আশান্বিত হই। সম্প্রতি আমরা গণনাট্য-সঙ্ঘের "তরঙ্গ" নাটকখানির অভিনয়ের কথা বলিতেছি। শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই নাটকখানি শ্রীরঙ্গমে যে-দিন অভিনীত হয়, বিভিন্ন চরিত্রের স্বাভাবিক অভিনয় দেখিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। বাজারের তোলা সম্বন্ধে যে সত্যাগ্রহ হয়, তাহাতে ন্যায়পক্ষেরই জয় হয়। অভিনয় যাঁহারা করেন, তাঁহারা কেহই নামকরা শিল্পী নহেন, কিন্তু অভিনয়ে সকলেই এমন প্রাণসঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, মনে হইয়াছিল —প্রকৃত ঘটনাই চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি। গোপাল মিস্ত্রীর ভূমিকায় নকুল চক্রবর্ত্তীর, শশীবাবুর ভূমিকায় পূর্ণেন্দু পালের, বিপিনবাবুর ভূমিকায় জীবন মুখার্জ্জীর, সার্কেল অফিসারের ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষের, ছোটছেলে নন্দের ভূমিকায় মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মাইনুদ্দিনের ভূমিকায় ধীরেন রায়ের, নিবেদিতার ভূমিকায় শোভা সেনের ও মঙ্গুর ভূমিকায় অঙ্গু রায়ের অভিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইয়াছিল আশা করি, গণনাট্যসঙ্ঘ মাসে মাসে এরূপ অভিনয়ের আয়োজন করিয়া একদিকে লোকশিক্ষা প্রদান করিতে ও অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিতে যত্নের ত্রুটী করিবেন না।

*

এবার বড়ই শোকাকুল চিত্তে কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পীর পরলোক গমনের কথা উল্লেখ করিয়া পাঠকগণকে ব্যথিত করিব। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় প্রখ্যাতনাম্না কুসুম কুমারীর কথা। স্বর্গীয় অমর দত্তের থিয়েটারে ইনিই ছিলেন প্রধানা নায়িকা। ইঁহার মর্জ্জিনা (আলিবাবা), ভ্রমর, দেবী চৌধুরাণী, উর্ব্বশী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি ভূমিকা একসময়ে রঙ্গজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও ইনি মিনার্ভা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ম্যাকবেথ, মুকুলমঞ্জরী, জনা, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যশ অর্জ্জন করেন। ক্লাসিক, মিনার্ভা, ষ্টার, গ্রাণ্ড ন্যাশনাল প্রভৃতি থিয়েটারেও ইঁহার যশ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯২৯ সালের পরে শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে আলমগীরে উদীপুরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েন। মনোমোহন মিত্র থিয়েটারেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শেষ দিন পর্য্যন্তও তিনি অভিনয় করিতে পারিতেন, কিন্তু বয়স হওয়ায় রোগে শোকে বড় জর্জ্জরিত হন। ইঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল বিয়োগে ইনি বড়ই মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং শেষ অবস্থায় অর্থাভাবে অভাবিত কষ্ট ভোগ করেন।

আমাদের দেশে পুরাতন কৃতী শিল্পীগণকে সহায়তা করিবার কাহারও প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু এক সময়ে লোক-শিক্ষায় জন্য ইহাদের অবদানও বড় সামান্য ছিল না।

*

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নিখিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব অর্দ্ধেন্দুর পিতা ব্রজেন্দ্রনাথ দেবের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্যামপুকুরে ইঁহাদের বিস্তর বিষয়-প্রতিপত্তি ছিল। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ইঁহার আপন পিসামহাশয়। রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত চুণীলাল

দেব ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। দুই ভাইয়ে একসঙ্গে অনেক থিয়েটার গড়িয়াছিলেন। ইনিও অভিনয় করিতেন খুব ভাল। কিন্তু শেষ অবস্থায় দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহাকে দাতব্য হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং সেখানেই আত্মীয়-স্বজন বিহীনাবস্থায় অঘোরে প্রাণ যায়।

উভয় শিল্পীর সঙ্গেই আমাদের সদ্ভাব ছিল, আমরা ভগবানের নিকট উভয় শিল্পীর আত্মার তৃপ্তি ও সদ্গতি কামনা করি।

*

আনন্দ-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্রের অকাল বিয়োগেও আমরা বিশেষ ম্রিয়মাণ; তিনিও পরলোকে শান্তিতে অবস্থান করুন, আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আনন্দ-পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তারক মুখার্জ্জী নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। তাঁহার 'রামপ্রসাদ' ও 'যুগ-মানব' বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। তাঁহার লেখনীতে অবিশ্রান্ত গতিতে আরও নাটক প্রসূত হউক, এই কামনাই করি।

*

৭ই নভেম্বর, ২১শে কার্ত্তিক, রবিবার বরাহনগর ১০৪নং অক্ষয় মুখার্জ্জি রোড 'লক্ষ্মীনারায়ণ নিবাস'-এ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কর্ম্মীবৃন্দ কর্ত্তৃক 'বর্গেবর্গী' নাটক অভিনীত হয়। বাংলার মারাঠা দস্যুর আক্রমণের ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই; এই মারাঠা দস্যুই তদানীন্তন কালের বর্গী নামে কুখ্যাত। মারাঠা দস্যুর এই আক্রমণের ইতিহাস বাংলার সামগ্রিক সাহিত্যে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি কাব্যে, কি নাট্যে, কি কথাসাহিত্যে, কি ছেলে ভুলানো ছড়ায়—বাংলা সাহিত্যের সর্ব্ব স্তর জুড়িয়া আছে মারাঠা দস্যুদের অত্যাচার-কাহিনী। এখনও শিশুদের ঘুম পাড়াইতে বসিয়া মা মাসী দিদিরা সেই ছড়ার আশ্রয় নেন:

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবে কে সে!...

এইভাবে সেই বর্গীর বিভীষিকা এখনও বাঙ্গালীচিত্তে জাগ্রত রহিয়াছে। এই দিক হইতে বর্গেবর্গীর অভিনয় বিশেষ সময়োপযোগী হয়। একদিকে ভাস্কর পণ্ডিতের তেজোদীপ্ত বজ্রনির্ঘোষ ও উদ্ধত আক্রমণ, অন্যদিকে আলীবর্দ্দী ও সিরাজের অবিরাম বাংলা রক্ষায় অদম্য প্রয়াস—প্রধানতঃ ইহারই পটভূমিকায় আলোচ্য নাটকের কাহিনী রচিত। অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ভাস্করের ভূমিকায় অনাথ চৌধুরী, তানোজী—নলিনী ভট্টাচার্য্য, আলিবর্দ্দী—কিরণ চৌধুরী, মির্জ্জাফর—সুধীর মুখোপাধ্যায়, মোহন লাল—ফণী রায়, শ্রীদাম—হরিপদ ঠাকুর, উপানন্দ—অনাথ ভট্টাচার্য্য, —প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

মঞ্চটি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত হয় এবং মনোরম আলোকসজ্জাও তৃপ্তি দান করে। এই অনুষ্ঠানের পিছনে যাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনা বিশেষভাবে কাজ করে, তাঁহাদের অন্যতম রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও মিল-ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহোদয় দর্শক-মণ্ডলী ও কর্ম্মিবৃন্দের ধন্যবাদার্হ। ভবিষ্যতেও আমরা আবার এই রকম একটি মনোরম অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগের অপেক্ষায় রহিলাম।

*

শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও শ্রীনিশানাথ মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় গত ১৯শে নভেম্বর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ষ্টীল কন্‌ট্রোল রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্ত্তৃক 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনীত হয়। চরিত্র-চিত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল সভ্যই প্রশংসনীয়। তন্মধ্যে হায়দারের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, টিপু—অজিত গড়গড়ি, নানাফড়নবীশ —সত্যরঞ্জন ব্যানার্জী, জ্যোতিষ—কান্তি দত্ত, সোফিয়া—সত্যব্রত সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিশেষ ভাবে দর্শক-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা যত বেশী দৃষ্ট হয়, ততই আনন্দের বিষয়।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস : স্বপ্নের ও বাস্তবের

বার্নার্ড শ'কে একদা তাঁহার এক ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'আধুনিক পৃথিবী সম্বন্ধে আপনার যতকিছু বক্তব্যকে আপনি তো একটিমাত্র পুস্তকের পরিসরের মধ্যেই গুছাইয়া লিখিতে পারেন। তবে কেন আপনি সেই কথাগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে নানা পুস্তকের মধ্যে প্রকাশ করেন?'

এই প্রশ্নের উত্তরে শ' নাকি বলিয়াছিলেন, 'বাপু হে, পৃথিবীর মানুষ স্বয়ং তোমাদের ভগবানের চেয়েও বধির। তাই তাহার কাছে কোনো কথা একবার বলিলে সে কথা তাহার কানে পৌঁছয় না। কিন্তু আমি চাই, আমার কথা মানুষে শুনুক। এইজন্যই আমার বক্তব্যের বহু পুনরাবৃত্তি।'

কংগ্রেস সম্পর্কে আমরাও একই ধরণের কথা ইতিপূর্বে নানাপ্রসঙ্গে উত্থাপিত করিয়াছি। এবারও কিছু বলিব। কিন্তু কেন বলিয়াছি এবং আবার কেন বলিব, সে কৈফিয়ৎ আমরা ইতিমধ্যেই শ'য়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া রাখিয়াছি। মহাজনের প্রদর্শিত পথে চলাফেরা করা সব রকমেই নিরাপদ, এ উপদেশ আমরা মহাজনের কাছেই পাইয়াছি।

অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই জয়পুরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন—এই কারণেই ইহার গুরুত্ব অনেক। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই গত ১২ই ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটি উক্ত আগামী অধিবেশনে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সে সম্বন্ধে একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু সে খসড়াটির আনুপূর্ব্বিক বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়, আমাদের আলোচনার লক্ষ্য উক্ত খসড়ার গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকাটি, যেখানে কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণধারগণ কংগ্রেসের সার্বত্রিক রূপ বা স্বরূপ সম্বন্ধে সুললিত অলঙ্কৃত ভাষায় প্রচার-কীর্তন গাহিয়াছেন। সেটি এই :

"ভারতের অগণন জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসকে অনুরূপ সকল কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। জাতির পিতার প্রদর্শিত আদর্শের কথা স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে নিঃস্বার্থ লোকসেবা যেমন তাহার একমাত্র কর্তব্য ছিল, ভবিষ্যতেও সেই লোকসেবার স্বার্থকেই তাহার 'পরম' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কংগ্রেস-আদর্শের এই মহান্ কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া যাহারা ক্ষমতা ও উচ্চপদের প্রত্যাশী, তাহারা দেশের অনিষ্ট সাধন করিতেছে।"

কংগ্রেস ও কংগ্রেসসেবীদের এই আলেখ্যটা আমাদের অপরিচিত নয়। স্বাধীনতা আসার আগে মহাত্মাজীর জীবিত কালে আমরা দেখিয়াছি, কংগ্রেসসেবীদের আত্মদান, আপামর ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তাহাদের জীবনোৎসর্গ। কিন্তু স্বাধীনতা পাইবার পরে, গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে আজ? আজিকার কংগ্রেসসেবীদের অন্ততঃ নেতৃস্থানীয়দের স্বরূপ কী? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে দাখিল করিতে পারি বটে, কিন্তু সেটা আইনের দিক হইতে তেমন প্রমাণসহ নহে বলিয়াই আমরা আমাদের প্রমাণসিদ্ধ অভিজ্ঞতা ও মন্তব্যের শরণ লইতেছি। নজির ব্যতীত কোনো উক্তি আজকাল তেমন গ্রাহ্যও হয় না।

"কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত, তখন কংগ্রেসের নেতাদের সহিত আপনজনের মত ভারতীয় জনগণের সাক্ষাৎ হইত সহরের পার্কে, গ্রামের মাঠে, তখন পার্কে বেড়াইয়া কংগ্রেসের নেতারা বলিতেন, 'হে মজদুর ভারতবাসী! বৃটিশ আমলাতন্ত্র তোমাদের রক্ত শোষণ করিতেছে। অতএব যতদিন না তোমরা উদর পূরণের অন্ন পাও, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পাও, ততদিন বিদেশী আমলাতন্ত্রের তোমরা বিরোধিতা কর। তাহাদের

সহিত অসহযোগিতা কর এবং এ কথাও ভুলিও না যে, ভারতের পুঁজিপতি কারখানার মালিকরাও তোমাদের বন্ধু নয়, তাহারা বিদেশী শাসকের দালাল।' গ্রামে মাঠে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসী নেতা ঘোষণা করিতেন, 'হে ভারতবাসী, তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, অন্তায্য করের ভারে তোমাদের পিঠের শিরদাঁড়া কি-ভাবে ভাঙিয়া পড়িতেছে, জমিদারেরা কিভাবে তোমাদেরই শ্রমার্জ্জিত মুখের ভাত কাড়িয়া নিজেরা পেট মোটা করিতেছে—এই অবিচারের বিরুদ্ধে তোমরা প্রতিবাদ কর, সংগ্রাম কর। তারপর একদিন যেদিন জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসিবে, এবং আজ হয় কাল হয় স্থির জানিও এ ক্ষমতা একদা আসিবেই—তখনই আমাদের পূজ্যপাদ মহাত্মাজীর স্বপ্নকে সফল করিয়া আমরা ভারতের বুকে রামরাজ্য গড়িয়া তুলিব।'

"আজ আইনতঃ জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে; কিন্তু সেই নেতারা কোথায়? তাঁহারা সরকারী আনন্দ-ভবনে সর্ব্বোত্তম পরিবেশের মধ্যে ডুবিয়া আছেন। সর্ব্বোত্তম তাঁহাদের খাদ্য, বস্ত্র, বিলাস-ব্যসন, সর্ব্বোত্তম তাঁহাদের পানীয়। যে-চোখে আগে ছিল আবেদনের রঙ, নেতাদের সেই চোখে আজ উক্ত পানীয়ের প্রতিক্রিয়াগত বর্ণ। অপ্রবুদ্ধ জনসাধারণকে অত্যাচারীর অত্যাচার সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রচেষ্টায় যে চোখ আগে সমবেদনায় ছল ছল করিত, কিন্তু জনসাধারণের আর্ত্তনাদ শুনিলে সে চোখই আজ তীব্র ঘৃণায় ক্রোধে জলজল করিয়া ওঠে। আত্মত্যাগের মূর্তিমানেরা আজ আত্মভরণকেই পরমার্থ বলিয়া জানিয়াছেন।"

কংগ্রেসীদের উপরোক্ত স্বরূপ-চিত্রটি বিবৃত করিয়াছেন বোম্বাইয়ের জনৈক প্রবীণ ও গান্ধীপন্থী কংগ্রেসী নেতা; তাঁহার নাম শ্রীলেখরাজ শর্ম্মা। Blitz-এর ২০শে নভেম্বর সংখ্যায় এই চিত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীদের দুটি আলেখ্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে হাজির করিবার চেষ্টা করিলাম—একটি স্বপ্নের আলেখ্য, আর একটি বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। এখন একটা প্রশ্ন, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের পরিস্থিতিরূপ ফ্রেমে এই চিত্রদ্বয়ের কোনটি লাগসই হইবে? কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর আমরা দিব না, সে জবাব দিবার ভার আমরা পাঠকদের স্কন্ধেই চাপাইয়া দিতেছি।

সাত-স্বাধীনতা

'স্বাধীনতা' শব্দটির সহিত আমাদের পরিচয় বহু দিনের—প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর। কিন্তু তবু 'স্বাধীনতা' বলিলে সত্য-সত্যই কি যে বুঝায় সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের জনসাধারণের ধারণা যে খুব পরিষ্কার, সে কথা সম্ভবতঃ বলা চলে না। স্বাধীনতা বলিতে ভারতের ছা-পোষা জনগণ বুঝিত এমন একটি বস্তু,—যাহা পাইলে মানুষ মানুষের মত বাঁচিতে পারে। কিন্তু এটুকু মাত্র অনুমানই, পরিপূর্ণ উপলব্ধি নয়।

স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ধারণা সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের মত পৃথিবীর অন্তান্য দেশের জনগণেরও একই অবস্থা। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষীয় নেতাগণ ঘোষণা করিতেন, 'এ যুদ্ধে আমাদের প্রাণ দিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, কারণ অত্যাচারী দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আমাদের প্রাণাধিক স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে।' মিত্র পক্ষের জনসাধারণ বছর পঁচিশ ত্রিশ পূর্ব্বে প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়ও স্ব স্ব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মুখে একই বক্তৃতা শুনিয়াছিল যে, 'স্বাধীনতার জন্যই তাহারা সংগ্রাম করিয়াছে।' কিন্তু এতদিন ধরিয়া শুনিয়াও তাহারা বোঝে নাই স্বাধীনতা নামক বস্তুটি কী? তাহাদের নেতারা তাহাদের সে কথা বুঝাইয়া বলেন নাই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চোখে এই অসামঞ্জস্যটা ধরা পড়ে এবং তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এবারের যুদ্ধে স্বাধীনতার সহিত পৃথিবীর জনসমাজকে পরিচিত করা প্রয়োজন। তাই তিনি গত বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর মানুষকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, 'স্বাধীনতার অর্থ এক চতুরঙ্গ মুক্তি—ভয় হইতে মুক্তি, অভাব হইতে মুক্তি, ধর্ম্মাচরণের মুক্তি, আত্মপ্রকাশের মুক্তি। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে পাইবার জন্যই পৃথিবীর জনগণকে প্রাণপাত করিতে হইবে।'

গত বছর-চারেক হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণের ন্যায় এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে আমরা চিনিয়া-

ছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম—ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কিন্তু এবারকার ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে দেখিলাম স্বাধীনতা শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণের পক্ষে আমাদের আইন-সচিব ডক্টর আম্বেদকার মহাশয় রুজভেল্টের চেয়েও তিন পা বেশী আগাইয়াছেন। ভারতবাসীর জন্ত তিনি সাত দফা স্বাধীনতার বরাদ্দ করিয়াছেন। সেই সাত দফা স্বাধীনতা এই :—(১) আত্মপ্রকাশের (২) সম্মেলনের (৩) সংগঠনের (৪) চলাচলের (৫) সমভূমি স্থিরীকরণের (৬) সংগ্রহের এবং (৭) সম্পত্তির মালিকানা রক্ষণ ও বিক্রয়ের। কিন্তু বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডাক্তার সাহেব তর্জনী তুলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, বে-হিসাবী ও অনিয়ন্ত্রিত বা রাশছাড়া কোনো অধিকারই কল্যাণকর নয়। তাঁহার নির্দেশিত সাত স্বাধীনতা ভোগ করিতে গিয়া যদি কোনো ভারতীয় নাগরিক খোদ দাতাই মানে স্বয়ং রাষ্ট্রই বিপন্ন হয়, তবে কিন্তু সে-নাগরিক উক্ত সপ্তামৃত হইতে বঞ্চিত হইবে!

উপরোক্ত ফিরিস্তিটা এক নজরে দেখিয়া হিসাব করিলে মনে হইবে, আমাদের ডাক্তার আম্বেদকারই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা উদ্ঘাটিত করিলেন এবং তাঁহার ঐ সাতদফার স্বাধীনতা পাইলেই ভারতবর্ষে মহাত্মাজীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই মনে হয়, এই আপাত-গৃহীত সিদ্ধান্তটা ধোপে টেকে না। অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত স্বাধীনতার কোনো অর্থই সার্থক নয়। কিন্তু অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা মানে ডাক্তার সাহেবের সম্পত্তি রক্ষণ-বিক্রয়ের স্বাধীনতা নয়; অভাব হইতে মুক্ত হইবার স্বাধীনতা, মানুষের মত বাঁচিবার জন্ত যে জীবিকার প্রয়োজন, সেই জীবিকার প্রতি প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্মগত সমান অধিকার। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সেই অধিকারের উল্লেখ ডক্টর আম্বেদকারের ফিরিস্তিতে কোথায়?

ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শে আরও এক স্বাধীনতার উল্লেখ ছিল—ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা। কিন্তু আইন-সচিব মহাশয়ের হিসাব হইতে সেই অভাগা শুধু বাদই পড়ে নাই, প্রাদেশিকতার জিগির তুলিয়া তাহার ভবিষ্যতের আগমনের পথও প্রায় অগম্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনকল্পে অবিলম্বে যে ভারতে যন্ত্রোৎপাদনের প্রসারণ অতি আবশ্যক, এ কথা ভারতের অজ্ঞতম অধিবাসীটি পর্য্যন্ত ইতিমধ্যে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যন্ত্রোৎপাদন ফাঁকা মাঠে হয় না। তার জন্ত যন্ত্রের প্রয়োজন। এই যন্ত্র ভারতবর্ষকে দিবার মালিক প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড অথবা আমেরিকা। কিন্তু আমেরিকা হইতেও ভারতের প্রয়োজনানুরূপ যন্ত্রপাতি পাইবার সম্ভাবনা কম। ষ্টার্লিং চুক্তির ফলে উক্ত দেশ দুটি হইতে আমদানির যে পরিমাণ আগে হইতেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে, আমাদের সে সুযোগটুকুও অপচয়িত হইয়াছে খাদ্য আমদানি করিয়া। ভারত-গভর্ণমেণ্ট ষ্টার্লিংএর এই অপচয় বন্ধ করিবার চেষ্টায় হাত দিয়াছেন। অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া যদি ভারতীয় পণ্যের পরিবর্ত্তে খাদ্য আমদানি করা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ পাওনা ষ্টার্লিংএর প্রায় সবটুকু দিয়াই যন্ত্রপাতি আমদানি করা চলিবে। এই জন্যই ভারত-গভর্ণমেণ্ট গত কয়েকমাস হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসারকল্পে নানাবিধ চেষ্টা ও পরিকল্পনা করিতেছেন।

এই প্রচেষ্টারই সূত্র ধরিয়া গত ২২শে নভেম্বর নয়া-দিল্লীতে গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত বহির্বাণিজ্য উপদেষ্টা কাউন্সিলের এক অধিবেশন আহূত হয়। হার্ড কারেন্সি এলাকায় ভারত কী উপায়ে তৈলবীজ ইত্যাদি চালান দিতে পারে, উক্ত অধিবেশনে ইহাই আলোচ্য বিষয় ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ছোট্ট একটি বক্তব্য আছে। বহির্বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ভারত গভর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিধ পরিকল্পনাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু শুধু পরিকল্পনাই সাফল্যের একমাত্র উপায় নয়। পরিকল্পনাও যেমন প্রয়োজন, আবার সেই পরিকল্পনা অন্ত কোনো স্বার্থ ব্যর্থ করিতে না পারে, গভর্ণমেণ্টের

পক্ষে সেই দৃষ্টিও প্রয়োজন। সম্প্রতি কোনো একটি সংবাদপত্রের দিল্লীস্থ সংবাদদাতার পত্রে দেখিলাম যে, রাশিয়া হইতে ভারতের যে এক লক্ষ টন গম পাওয়ার চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের আনাড়ি ব্যবস্থাপনার ফলে নাকি সেই চুক্তি অনুযায়ী উক্ত গম পাইবার সম্ভাবনা বানচাল হইবার পথ ধরিয়াছে। ভারতের পক্ষে এখন এক লক্ষ টন গমের দাম কম নয়, সুতরাং উক্ত সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদ সত্য হইলে সেটাকে শোচনীয়ই বলিতে হইবে।

আমাদের বিশ্বাস, বিভাগীয় সচিব মহাশয় এবং তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীরা অতিবিলম্বের পূর্ব্বেই এই দুর্ঘটনাকে প্রতিহত করিবেন এবং ভবিষ্যতে এইজাতীয় দুর্ঘটনা ঘটিবার সকল পথই রুদ্ধ করিবেন।

বৈমানিক ভারত

প্রগতিশীল বহির্বিশ্বের সহিত তালে তাল ফেলিয়া চলিতে হইলে ভারতবর্ষকে এখনও বহু অপূর্ণতা ভরাট করিতে হইবে; ভারতবাসীর অশন-বসনের সংস্থান করা ব্যতীতও বহু উপচারের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। আন্তর্দ্দেশীয় এবং বৈদেশিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ভারতের এমনি এক অপূরিত প্রয়োজন। এবং এ প্রয়োজন কেবল দেশরক্ষা কল্পে সামরিক বিমানবহরের সম্প্রসারণেই সাধিত হইবে না, বেসামরিক চলাচলের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করিতে হইবে। আমাদের উপস্থিত বক্তব্য শেষোক্ত ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার পর, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিবার পর আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, ভারতের বেসামরিক বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার এই ক্রমবৃদ্ধি এবং উহাদের ততোধিক বর্দ্ধমান বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা ভারতের সামগ্রিক অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রের বুঝি উন্নতিরই পরিচায়ক। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিমান-সম্মিলনে প্রদত্ত রায় সাহেব এন, সি, ঘোষের ভাষণ পাঠ করিয়া আমরা এক বিপরীত ঘটনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ১৯৪৭ সালের তুলনায়, মোট উড়িবার দূরত্ব, যাত্রী সংখ্যা এবং বাহিত মালের পরিমাণের দিক দিয়া যদিও বর্ত্তমান বৎসর অনেকখানি উন্নতির দাবী করিতে পারে, তবু মোট হিসাবে নাকি জানা গিয়াছে যে, একটি ব্যতীত অবশিষ্ট নয়টি প্রতিষ্ঠানই নাকি ক্রমাগতই লোকসান দিয়া যাইতেছেন। ঘোষ সাহেবের হিসাবটা ঠিক হইলে ব্যাপারটাকে কোনদিক হইতেই আশাপ্রদ বলা যায় না। কারণ, ভারতবর্ষ যেটুকু পেট্রল সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার অনেকখানিই বেসামরিক বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়, এবং বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির এই প্রয়োজন ভারতের স্থলচল যানবাহনাদিকে অংশতঃ বঞ্চিত করিয়াই ভারত সরকারকে মিটাইতে হয়। ইহার ফলে স্থলচল যানবাহনকে রীতিমত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু একদিকের ক্ষতি যদি অন্যদিকে পূরিত না হয়, তা হইলে ক্ষতিটা হয় দুই দফা। উপরোক্ত বিমান-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই দুই দফা ক্ষতি হইতেছে। এক দফা ক্ষতি হইতেছে বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির পেট্রোলের অপচয়ে; দ্বিতীয় ক্ষতি হইতেছে উক্ত পরিমাণ পেট্রোল পাইলে স্থলচল যানবাহনগুলি আভ্যন্তরীণ মাল চলাচলের সুবিধা করিয়া যে লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহা হইতে ভারতবাসী ও ভারত সরকারের বঞ্চিত হওয়ায়।

ঘোষ সাহেব স্বয়ং অবশ্য ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচলের এই ব্যর্থতার বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে নিজে কোনো নৈরাশ্যসূচক উক্তি করেন নাই। বরঞ্চ আমেরিকা, কানাডা, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি কিছু সান্ত্বনার কথাই উচ্চারণ করিয়াছেন। কারণ, গত বৎসরে ভারতের তুলনায় অপরিমেয় পরিমাণে অগ্রসর থাকিয়াও মোটামুটি হিসাবে উক্ত দেশগুলিও নাকি বেসামরিক বিমান ব্যবসায়ে তেমন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারে আমরা কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু সান্ত্বনার পথ দেখিতেছি না। আর্থিক সংস্থানের দিক দিয়া ভারত এখনও দুর্গত দেশ, এমতাবস্থায় যে পরিকল্পনায় বা

প্রচেষ্টায় তাহার ক্ষতির সম্ভাবনা, বিশেষতঃ সেই জাতীয় ক্ষতি—যাহা বহন করিতে গিয়া অন্যদিকের এক নিশ্চিত সম্ভাবনার পথকে রুদ্ধ করিতে হয়—সেইরূপ ক্ষতির পথে ভারতবর্ষের অগ্রসর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অস্পৃশ্যতা

গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশনকে একদিক দিয়া ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্রের একাদশতম বিধান অনুযায়ী পরিষদের সমবেত সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এখন অস্পৃশ্যতা আইনের চোখে নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান। অতঃপর অস্পৃশ্যতার প্রশ্রয়কে আইনতঃ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হইবে।

বহু শতাব্দী হইতে অস্পৃশ্যতা ভারতের সবচেয়ে দুষ্টতম সামাজিক ব্যাধি। ইহার ফলে ভারতীয় সমাজের এক-বৃহদংশ অধিবাসী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পাশবিক জীবন অপেক্ষাও ঘৃণ্যতর জীবন যাপন করিতে বাধ্য ছিল, এখনও আছে। শুধু তাই নয়, ভারতের সর্বাঙ্গীণ ঐক্যও বিপন্ন হইয়াছিল এই কাল ব্যাধিরই জন্য, ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথও ইহারই জন্য বহু দিক হইতে ব্যাহত ছিল। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বাল্যকালেই এই অভিশাপকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেই এই অভিশাপ হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করিবার ব্রতে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জীবিতাবস্থায় মহাত্মাজীর এই ব্রত পরিপূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হয় নাই, আজ সেই ব্রত পূর্ণ হইল। পরলোকের তত্ত্বটা সত্য হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, গণপরিষদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে স্বর্গত গান্ধীজী আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছেন, ভারতের উদ্দেশে আশীর্ব্বাণীতে তিনি শতকণ্ঠ হইয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকেই সতর্ক করিয়া দিতে চাই। যে-কোনো দেশ বা সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কোনো একটা বিষয় পাইবার বা বর্জ্জন করিবার পক্ষে কেবল আইন করাটাই সর্ব্বশেষ কর্তব্য নয়। আইনের চোখে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ বহুদিন হইতেই নিষিদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলা যায় যে, ভারত হইতে বাল্যবিবাহ-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে? সংখ্যাবিশারদের কাছে উত্তর চাহিলে আমরা হয় তো উল্টা উত্তরই পাইব যে, ভারতীয় সমাজে বাল্য-বিবাহ আদৌ বর্জ্জিত হয় নাই। যে-ব্যাধি সামাজিক প্রথা রূপে কোনো সমাজদেহের প্রতি কোষে-কোষে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে সমস্ত সমাজকেই সেই ব্যাধির অনিষ্টতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে হয়। কিন্তু বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে ভারতীয় সমাজ সে-চেতনা লাভ করে নাই বলিয়াই ভারত হইতে আইন সত্ত্বেও সে অভিশাপ দূরীভূত হয় নাই। তাই আমাদের মনে হয়, যদি অস্পৃশ্যতার বেলাতেও এই ভাবে আইন করিয়াই আমাদের সরকার নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা হইলে তাহার দশাও হইবে তথাকথিত নিষিদ্ধ বাল্যবিবাহেরই মত। ভারতবর্ষকে যদি মহাত্মাজীর আদর্শ অনুযায়ী সত্যসত্যই অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে হয়, তবে আইন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই আইন-বিরোধী অপরাধ সম্পর্কেও দেশের আপামর জনসাধারণকে অবহিত করাইতে হইবে। ঠক-তস্কর প্রভৃতি সাধারণ অপরাধীকে ধরিবার জন্য দেশের শাসন-বিভাগ যেমন সদাজাগ্রত দৃষ্টি নিয়া সতর্ক থাকে, অতঃপর অস্পৃশ্যতা-চারীকে শাস্তি দিবার জন্যও তাহাদিগকে অনুরূপ পরিমাণে সতর্ক থাকিতে হইবে।

বস্ত্রোৎপাদন ও বণ্টন

দিন কয়েক পূর্ব্বে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উক্ত অধিবেশনের সভাপতি শ্রী এস, সি, রায় ভারতের বর্তমান বস্ত্র-সঙ্কটের উপরে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতে এক্ষণে যে সঙ্কটাপন্ন বস্ত্র-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য দায়ী মোট বস্ত্রোৎপাদনের অল্পতা নয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের বণ্টন-বিভাগই ইহার জন্য দায়ী।

শ্রীযুক্ত রায়ের উক্ত বিবৃতি হইতে আমরা ভারতের বর্তমান বস্ত্রোৎপাদন এবং বণ্টন সম্বন্ধে যে তথ্য এবং হিসাবটুকু পাইয়াছি, তাহা মোটামুটি এইরূপ :

অনুরূপ পরিমাণ তুলার পরিবর্ত্তে ভারতকে এ বৎসরে পাকিস্তানে ৪৫ কোটি গজ কাপড় প্রেরণ করিতে হইবে। ইহার উপরে আরও ৪০ কোটি গজ ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে বরাদ্দ আছে। কিন্তু উক্ত ৮৫ কোটি গজ কাপড় দিয়াও বেসামরিক খাতে ব্যবহার করিবার জন্ম ভারতের নাকি মিল ও তাঁতজাত বস্ত্রের পরিমাণ ন্যূনাধিক ৫৮০ কোটি গজ—অর্থাৎ প্রতি বৎসরে গড়পড়তায় মাথাপিছু প্রায় ১৬ গজ করিয়া কাপড়। এই হিসাবের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৎসরগুলির তুলনায়ও অধিক রূপে বিবেচিত হইবে, কেননা, তখন ভারতবাসীর মাথাপিছু বাৎসরিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৪'২ গজ। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রমাণিত হইয়া যায় যে, ভারতের সাম্প্রতিক সমস্তার পিছনে সমস্ত দায়িত্ব রহিয়াছে ভারত সরকারেরই বণ্টন-ব্যবস্থার।

ভারত সরকারের এই বণ্টন-ব্যবস্থা কিরূপ নিষ্ক্রিয় এবং ঢিমে-তেতালা, সে বিষয়েও কিছু আভাষ শ্রীযুক্ত রায়ের উক্ত বিবৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন মিলে, সরকারী গুদামে এবং পাইকারী মজুৎ-দারদের কাছে নাকি মাসের পর মাস ধরিয়া হাজার হাজার গাঁট কাপড় অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার ফলে কেবল বণ্টনেই বিঘ্ন ঘটে নাই, বিপুল পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধনও আটক হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত রায়ের হিসাব অনুযায়ী এই আটক মূলধনের পরিমাণ নাকি দাঁড়াইবে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। এই টাকাটা যথোচিত সময়ে যথানুরূপ খাটানো গেলে ইতিমধ্যে বস্ত্রের উৎপাদন আরও অনেকখানি বাড়ানো চলিত। এটাও আর এক দফা ক্ষতি।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত রায়ের এই অভিযোগ কতখানি প্রমাণসহ তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু অভিযোগগুলি প্রকৃতই যদি প্রামাণ্য হয়, তবে অবশ্যই আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভারতের কুলনারীরা যখন বস্ত্রের জন্ম লজ্জায় গলায় দড়ি পরিতেছেন, তখন সমাধানের অভিনয় করিয়া আমাদের রক্ষকরা শুধু লম্বা লম্বা বিবৃতি পড়িয়াই নাকে তৈল দানপূর্ব্বক অমার্জ্জনীয় ভাবে কালক্ষেপণ করিতেছেন।

বিক্রয়করের বিসদৃশতা

যতদূর স্মরণ হয়, বছর আড়াই পূর্ব্বেই হইবে বোধ হয় কলিকাতার দোকানদারেরা এই প্রদেশের ক্রমবর্দ্ধমান বিক্রয়-করের এবং উহার অসামঞ্জস্যের প্রতিবাদে ক্রমাগত বেশ কিছু দিনের জন্ম এক ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। ধর্ম্মঘটটি সম্পূর্ণ সফল না হইলেও একেবারে ব্যর্থও হয় নাই। তখন লীগ মন্ত্রিত্বের আমল। উক্ত মন্ত্রিসভা বিক্রয়-করটা একেবারে উঠাইয়া না লইলেও, প্রস্তাবিত হারের বৃদ্ধিটাকে আর কার্য্যকরী করিতেও সক্ষম হন নাই। সেই হইতে পূর্ব্ব হারেই পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিক্রয়-কর প্রথা বলবৎ আছে। এবং উক্ত ধর্ম্মঘটের পর বিক্রয়কর সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আর কোন প্রতিবাদ বা সেই-জাতীয় আলোচনাও ইতিমধ্যে হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রাদেশিক বিক্রয়-করের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অসামঞ্জস্যটা বহুদিন হইতেই প্রকট হইয়া রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে এক্ষণে জনসাধারণের মধ্যে এবং সরকারী ভিত্তিতে যথোচিত আলোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কিছুদিন হইতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভারতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্ম সেই অর্থনীতিকে প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে এক সর্ব্ব ভারতীয় কাঠামোতে বিন্যস্ত করিবার চেষ্টায় হাত দিয়াছেন। বিক্রয়কর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনটা আমরা ভারত সরকারের সেই চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অনুভব করিতেছি।

বিক্রয় করের যে-ব্যাপারটা সব চেয়ে বিসদৃশ, তাহা এই যে, উহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে কেবল প্রাদেশিক সরকারগুলিরই এক্তিয়ার ভুক্ত। এদিকে আর্থনীতিক সামর্থ্যের দিক দিয়া ভারতের কোনো প্রদেশই স্বাবলম্বী নয়। ভারতীয় জনগণের হাতে দৈনন্দিন ব্যবহারের অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলিও পৌঁছাইয়া দিতে গেলে প্রদেশগুলিকে ক্রমাগত পরস্পরের সহিত উক্ত পণ্যসমূহের বিনিময় করিতে হয়। ফলে এই সর্ব্বভারতীয় বিনিময় অথচ কেবল প্রাদেশিক বিক্রয়-কর-ব্যবস্থার জন্ম এখন এমন অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে যে একই দ্রব্য বহুবার বহু বিক্রেতার হাতবদলের পর

যখন সর্ব্বশেষ ক্রেতার হাতে গিয়া পৌঁছে, তখন সে দ্রব্যের মূল্য তাহার মূল দামের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ইহাতে ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান অকারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ছাড়াও প্রচলিত বিক্রয়-কর-ব্যবস্থার বিসদৃশতার বিরুদ্ধে আরো একটি আপত্তির কারণ আছে। প্রদেশে প্রদেশে বিক্রয় প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার-সমূহের ঘাটতি বাজেটের পূর্ত্তি। কিন্তু বিক্রয়-করের খাতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যবহারকের খরচ হয়, তাহার সবটাই কি প্রাদেশিক সরকারদের তহবিলে গিয়া উঠে? অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, কলিকাতায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাহা হইতে আমরা জানি যে, সাধারণতঃ দোকানদারেরা বিক্রয়-করের অজুহাতে নিজেদের লাভের অঙ্কটাই বাড়ান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, দোকানদারেরা ক্রেতাদের কাছে সব জিনিষেরই জন্য বিক্রয়-কর গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য কোনো রসিদ কাটেন না। তা ছাড়া, পাইকারী হারে বিক্রয়-কর দিয়া খুচরা হারে তাঁহারা ক্রেতাদের কাছে যে বিক্রয়-কর আদায় করেন তাহাতেও তাঁহাদের লাভ মন্দ হয় না। কিন্তু এই লাভের খোঁজ গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই ঘুণাক্ষরেও পান না।

পাঠকরা প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে এই বিসদৃশতা দূর করিবার উপায় কী? একমাত্র উপায়, বিক্রয়করকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। আবগারী প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ট্যাক্স্ খুচরা বস্তুর উপরেও ধার্য্য হয়, কিন্তু সে খুচরা হার পাইকারী হারেরই যথানুযায়ী অংশ। ইহার ফলে সেই ট্যাক্সের সবটাই সরকারী তহবিলেই স্থান পাইয়া থাকে; আত্মগোপন করিয়া প্রবঞ্চকের থলিতে গিয়া ওঠে না। বিক্রয়করেরও বিসদৃশতা এবং অসামঞ্জস্যতা দূর করিতে হইলে উহাকে কেন্দ্রীয় কাঠামোয় পুনঃ সংস্কৃত করিতে হইবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সম্ভাবনা আপাততঃ বেশ কয়েক বৎসরের জন্য ধামাচাপা পড়িল এবং সে ধামা ভবিষ্যতে আদৌ আবার কোনো দিন উঠিবে কিনা, সে বিষয়েও রীতিমত সন্দেহ রহিয়াছে।

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাহার শোষণমূলক শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাভাষী জনগণকে যথেচ্ছ ভাবে এক একটা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল। বৃটীশের এবম্বিধ প্রদেশ ভাগ করিবার অন্যতম প্রধান বৈষম্য ছিল মাদ্রাজ প্রদেশের গঠনে। মাদ্রাজে মাদ্রাজি ভাষাভাষী বলিয়া কোনো ভাষার অস্তিত্ব নাই; অন্ধ্র, কেরল, তামিলনাদ ও কর্ণাটক এই চারটি পরস্পরের পৃথক্ ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া এই প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু বৃটীশ ইহা অপেক্ষাও অমার্জ্জনীয় অবিচার করিয়াছিল বাংলাদেশের প্রতি। বিদ্রোহী বাংলাকে সায়েস্তা করিবার জন্য সেই বিদেশী সরকার বাংলা দেশের একটা বড় অঙ্গ মূল দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া তাহারা পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশের সহিত জুড়িয়া দেয়। বৃটীশরাজের এই অনাচার ও অবিচার মূলক প্রদেশ বিভাগের তথ্যটা কিছু নূতন নয়। ভারতের গণ-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কংগ্রেস এই অবিচার সম্বন্ধে গত ১৯১১ সাল হইতেই অবহিত, এবং সেই তখন হইতেই কংগ্রেস এই ঘোষিত আদর্শ গ্রহণ করে যে, ভারত স্বাধীন হইলে বৃটীশ রাজের এই অবিচার আমূলে সংশোধিত করা হইবে!

বৎসরাধিক কাল হইল সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আজ ভারতের করতলগত। তাই এই বৎসরাধিক কাল হইতে পূর্ব্বোক্ত অবিচার-পীড়িত প্রদেশগুলি আশা করিতেছিল যে, এবারে কংগ্রেসের সেই পূর্ব্বগৃহীত সংকল্প বুঝি কার্য্যে পরিণত হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, সকলই গরল ভেল। ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমানার পুনর্গঠন বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে গণপরিষদ যে কমিশন নিযুক্ত করেন, তাঁহারা রায় দিয়াছেন যে, "ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ ব্যবস্থা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য সম্ভব নহে। ভারতের এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ, প্রাদেশিক উপজাতীয়তাবোধ নহে। এই সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ যখন আপামর সকল ভারতবাসীরই

চিত্তে সম্পূর্ণ-ভাবে বদ্ধমূল হইবে, তখনই একমাত্র সম্ভব হইবে প্রাদেশিক পুনর্গঠনের বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করিবার। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কদাচ নহে।"

কিছুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছি, সর্ব্বভারতীয় নেতারা আজকাল প্রাদেশিকতাতঙ্কে বড় বেশী আক্রান্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের সেই আতঙ্কের উৎস যেন কেবল একটি বিশেষ প্রদেশেই। বাহুল্য বা ভণিতা না করিয়া বলিতেছি, সেই প্রদেশটি, নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। আত্মরক্ষা বা আত্ম উন্নয়ন যে কোনো ব্যাপারেই বাঙালীরা সচেষ্ট হোক, সেই প্রচেষ্টার মধ্যেই উক্ত সর্ব্বভারতীয় নেতারা প্রাদেশিকতার অপদেবতাকে দেখিতে পান। এই প্রদেশে আগত স্বজাতি আশ্রয় প্রার্থীদের অন্নসংস্থানের জন্ম যদি বাংলা সরকার নবপরিকল্পিত কোন প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ বাঙালীকেই নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করেন, অমনি সর্ব্বভারতীয় নেতা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বলেন, ঐ দেখ, বাঙালীরা ভিন্ন-প্রদেশীদের প্রহার করিতেছে। কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে যদি বাঙালী প্রতিবাদে সচেষ্ট হয়, তখনি সর্ব্বভারতীয় নেতা চীৎকার করিয়া বলেন, ছি, ছি, বাঙালীরা মারোয়াড়িদের খেদাইতেছে। অথচ বাংলার পাশেই যে প্রদেশটি বাংলাদেশেরই একটি অংশ লইয়া গত ১৯১১ সাল হইতে পুষ্ট হইতেছে, ডোমিসাইল আইনের নামে প্রাদেশিকতার বিষ সর্ব্বপ্রথমে ভারতের দেহে প্রবেশ করাইয়াছে,—সেই প্রদেশটির কার্য্যকলাপে কিন্তু সর্ব্বভারতীয় নেতারা বিন্দুমাত্রও প্রাদেশিকতার নামগন্ধ পান না।

বহু তথ্য ঘাঁটিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসের বহু নজিরের সহিত মিলাইয়াই কংগ্রেস ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক আত্মসংগঠনের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেই পরিকল্পনার মধ্যে তখন কংগ্রেসের কর্ণধারেরা উন্নততর সর্ব্বভারতীয় ঐক্যেরই প্রতিচ্ছবি দেখাইয়াছিলেন, ভেদপন্থী উপজাতীয়ভাবোধের কোন হদিস পান নাই। কিন্তু আজ তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বতন আদর্শের সবকিছুকেই উন্টা করিয়া দেখিতেছেন কেন? গণ-পরিষদ নিয়োজিত ভাষা-প্রদেশ-কমিশন কংগ্রেসের পূর্ব্ব পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় ঐক্য ব্যাহত হইবার পথের সন্ধান পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহাদের প্রতি একটি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতে চাই। ইতিপূর্ব্বে অন্যায্য ও অবাস্তব প্রদেশ বিভাগের অবিচারের জন্ম অবিচারপীড়িত প্রদেশ দুটির যত কিছু অসন্তোষ ছিল বিদেশী সরকারেরই বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও যদি আজ সেই দীর্ঘ কালের অবিচারের কোন উপশম না হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রদেশ দুটি, বৃটীশ সরকারের স্থলাভিষিক্ত ভারতীয় সরকারের প্রতি বিশেষ প্রীত হইতে পারিবে কি?

কাসিম রাজ্‌ভির বিচার

ভারতীয় ইউনিয়নে আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদে প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরিয়া যে নরক-রাজত্ব চলিতেছিল, উহার প্রধান হোতাটি কে ছিল, তাহা আমরা ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছি। সে ব্যক্তি ইত্তেহাদ উল মুসলেমিন্ এবং রাজাকর প্রতিষ্ঠানের নেতা কাসিম রাজ্‌ভি। শীঘ্রই হায়দ্রাবাদে সেই রাজভির বিচার হইবে।

রাজভিকে এতদিন লাল কেল্লায় আটক রাখা হইয়াছিল, সেই হেতু আমাদের অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল যে, রাজভির বিচার বুঝি সেখানেই হইবে। কিন্তু সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, অপরাধীর বিচার তাহার অপরাধের অকুস্থলেই হওয়াটা প্রশস্ত। ধ্বংসের পথ নিশ্চিত জানিয়াও রাজ্‌ভি এবং তাহার অনুচরবর্গ হায়দ্রাবাদের অজ্ঞ মুসলমানদের দিয়া ভারতের মধ্যে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ বাধাইবার ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। সেই ষড়্‌যন্ত্রের স্বরূপ হায়দ্রাবাদের জনগণের বিশেষতঃ বিভ্রান্ত মুসলমান জনগণের প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত হওয়া প্রয়োজন। হায়দ্রাবাদে রাজ্‌ভির বিচার অনুষ্ঠানের ইহাই উদ্দেশ্য।

সাম্প্রতিক সংবাদে আরো প্রকাশ যে, রাজ্‌ভির বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেবল একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এসম্পর্কে এখনও জানা যায় নাই যে, রাজ্‌ভির বিচার সামরিক ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে —না সে-বিচার সাধারণ আদালতে গৃহীত হইবে। হায়দ্রাবাদের উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীদের ধারণা, রাজ্‌ভির বিচার শেষোক্ত আদালতেই হওয়ার সম্ভাবনাটা অধিক। কিন্তু যেখানেই হোক, অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তিটা কী রূপ হয়, আমরা শুধু সে খবরটা অবিলম্বে পাইবার আশাতেই উন্মুখ প্রতীক্ষায় রহিলাম।

পুস্তক ও আলোচনা

হুগলী জেলার ইতিহাস : শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭১+১২। মূল্য—১৫৲ টাকা মাত্র।

সুধীর বাবু তথ্যসন্ধানী লেখক। ইতিহাসকে সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় সরল কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনার ভঙ্গীটি সুধীরবাবুর নিজস্ব। দীর্ঘকালের বহু তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার কীর্ত্তি তাঁহার 'হুগলী জেলার ইতিহাস'। এই গ্রন্থের বহু ঘটনা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠকসাধারণ তখনই ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। অপূর্ণ কাহিনীতে বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস আজও অবধি বিকলাঙ্গ হইয়া আছে। বিভিন্ন জেলার নির্ভুল ইতিহাসের মধ্য দিয়াই সেই পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক সামগ্রিকতা রক্ষা সম্ভব। স্বস্তির কথা এই যে, কয়েকজন উৎসাহী ও কৃতী ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ পর্য্যন্ত কয়েকটি জেলার স্বয়ং-ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সবগুলিকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ বলা যায় না। যেমন—গৌরীহর মিত্র প্রণীত 'বীরভূমের ইতিহাস'। গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া পরবর্ত্তী প্রতিশ্রুত তথা অতিপ্রয়োজনীয় খণ্ডটি আর প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত ঐতিহাসিক মহাশয়ও পরলোকগত হইয়াছেন। এই অসম্পূর্ণতা জাতির জীবনে যে কতখানি ক্ষতিকর, তাহা বোদ্ধা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। ইহার অবশ্য যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। প্রথমতঃ, এই জাতীয় গ্রন্থের উপযুক্ত প্রকাশক পাওয়া কঠিন; দ্বিতীয়তঃ, যদি-বা বহু কষ্টে প্রকাশিত হইল, ভাল বিক্রী হইল না। এই সব অসুবিধার লক্ষণ বিচার করিয়া আলোচ্য গ্রন্থের শুধু লেখককেই নয়, প্রকাশককেও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। বর্ত্তমান কাগজ-সঙ্কটের দিনে বহু অর্থব্যয়ের সম্মুখীন হইয়াও প্রকাশক মহাশয়ের এই গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারা তাঁহার সমাজ-সচেতন ও দেশ-দরদী হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।

হুগলীজেলাকে শুধু তাহার ভৌগোলিক সংবেশের মধ্যে দেখিলে ভুল করা হইবে। হুগলীকে মনীষার শ্রীক্ষেত্র বলা যায়। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি এই হুগলীই, যুগাবতার রামকৃষ্ণ দেবের লীলাভূমি কামারপুর, নির্ভীক ও আত্মত্যাগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান পূর্ব্বে এই হুগলীই ছিল, মহাত্মা মহসীনের ট্রাষ্টি-অর্থে যে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মাধ্যমেই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, জাষ্টিশ দ্বারকানাথ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিশেষ যশস্বিতা লাভ করেন। এইখানেই সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সিঙ্গুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। মিশনারী সাহেবদের উদ্যোগে এইখানেই শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা অভিধান পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়। নাট্যসম্রাট্ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের পিতৃভূমি এইখানেই হরিপাল গ্রামে; কবি ভারতচন্দ্রের শিক্ষাভূমিও এই হুগলী। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানও এইখানেই দেবানন্দপুরে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাষ্টিশ মন্মথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ-শার্দ্দুল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সারদা মিত্র, প্রভৃতির বাড়ীও এই হুগলী জেলাতেই। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বাড়ীও এই স্থানে। আরও কত নাম করিব? বস্তুতঃ—দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত মনীষী বাংলা তথা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া দেশের বরণীয় সন্তানরূপে জনসাধারণের শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকেরই জন্মস্থান এই হুগলী। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এমন কি বিভিন্ন রচনাকারের বিপুল গ্রন্থরাজির ধারাবাহিক নামপঞ্জীও গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইয়াছে। বাংলার Cultured Society বা শিক্ষিত মহলে গ্রন্থখানি বিশেষভাবে কাজে আসিবে। লেখককে তাঁহার অসাধারণ শ্রম স্বীকার ও গবেষণার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাইতে হয়। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —র

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কে. ভি. আপ্পারাও

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক ঃ

১। বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

২। আষাঢ় হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে-কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গশ্রী প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ সার্টিফিকেট-অব-পোষ্টিং-এ পত্রিকা পাঠান হয়।

৪। জমা-টাকা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকদের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভি পি করা হয়। মনি-অর্ডারে টাকা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মনি-অর্ডার-কূপনে অথবা নির্দ্দেশ-পত্রে "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা অথবা পত্র পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যাটি উল্লেখ করিবেন।

রচনা ঃ

৬। রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় পত্রাদি 'সম্পাদক, বঙ্গশ্রী, এই নামে পাঠাইতে হইবে। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৭। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। রচনাদি ফেরতের জন্য উপযুক্ত ডাক-মাশুল দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞাপন ঃ

৮। বিজ্ঞাপনের সর্ত্তাদি পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য। পুরাতন বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ ১০ তারিখের মধ্যে না আসিলে সেই অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলেও ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

ম্যানেজার—বঙ্গশ্রী, ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সংস্কৃত গ্রন্থমালা

কৌলজ্ঞাননির্ণয় (বৌদ্ধতন্ত্র)	৬৲	সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী	১।।০
বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী	৪৲	সামবেদসংহিতা মূল	১৲
কাব্যপ্রকাশ	৮৲	গোভিলগৃহ্যসূত্র	১২৲
মাতৃকাভেদতন্ত্র	২৲	ন্যায়দর্শন (১—৩ অধ্যায়)	১০৲
সপ্তপদার্থী	৪৲	,, ২য় খণ্ড (৪—৫ অধ্যায়)	৬৲
ন্যায়ামৃত অদ্বৈতসিদ্ধি	১২৲	শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ১ম খণ্ড	১১৲
ভাকার্ণব	৫৲	ঐ ২য় খণ্ড	২৲
অধ্যাত্মরামায়ণ—২ খণ্ড	১২৲	চতুরঙ্গদীপিকা	৩৲
দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণম্	৫৲	ন্যায়পরিশিষ্ট	৫৲
কুমারসম্ভব	১।।০	নন্দিকেশ্বর-কাশিকা	।০
ছন্দোমঞ্জরী	১৲	প্রাসাদমণ্ডনম্	১০৲

বাল্মীকি-রামায়ণম্—৬০ খণ্ডে সমাপ্ত—মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲

কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ

১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

১৬শ বর্ষ ফাল্গুন—১৩৫৫ ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

রূপমঞ্চ

রাজগীরের জন্ম-কথা (প্রবন্ধ) ... শ্রীমতী অমিয়া বসু, এম-এ, বি-টি ১৮৫
'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' (কবিতা) ... সত্য দাস ১৮৯
মা (গল্প : সমারসেট মম) ... অনুবাদ : শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৯০
পুরাতন দিল্লী (সচিত্র প্রবন্ধ) ... শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০
তন্ময় (কবিতা) ... শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২০৯
অকর্ম্মণ্য (গল্প) ... সুবোধ বসু ২১০
চোখ (কবিতা) ... সুধা চক্রবর্ত্তী ২১৪
'স্নেহ' (প্রবন্ধ) ... শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ২১৫
একাডেমির চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র প্রবন্ধ) ... রূপরসিক ২২২
ক্রমশঃ (গল্প) ... শ্রীহরিপদ দে ২২৪
সাহিত্য ও সামাজিক দায়িত্ব (প্রবন্ধ) ... শ্রীরণজিৎকুমার সেন ২২৭
গান্ধীজীর জীবন-মৃত্যু (সচিত্র কবিতা) ... শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ ২৩১
নেতাজী (সচিত্র কবিতা) ... শ্রীসুবোধ রায় ২৩১
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় (প্রবন্ধ) ... শ্রীননীমাধব চৌধুরী ২৩২
নিঃসঙ্গ (কবিতা) ... শ্রীআশুতোষ সান্যাল ২৩৫
জংলা মাঠের ফসল (উপন্যাস) ... শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ২৩৬
বিবেকানন্দ বীর (কবিতা) ... শ্রীপ্রণতি দাশগুপ্তা ২৪২
পরিব্রাজক কার্ম্নীত (অনুবাদ উপন্যাস) ... কার্ল গিয়েলারপ্
... অনুবাদ : শুদ্ধোধন সেন ২৪৬
পুণ্যাত্মা পুরুষ সচ্চিদানন্দ (সচিত্র জীবনী) ... ২৪৯
'জনগণ-মন-অধিনায়ক' কে ?
(আলোচনা) ... প্রবোধচন্দ্র সেন ২৫১
শরৎচন্দ্রের "শেষের পরিচয়"
(সাহিত্যালোচনা) ... শ্রীজগদীশ গুপ্ত ২৫৭
আর্থিক উৎপাদন ও কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি (প্রবন্ধ) ... শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ২৬৩
ক্ষমা কর (কবিতা) ... রঘুনাথ ঘোষ ২৬৬
রূপলোক :
বাংলা চিত্রনাটকে হাস্যরস : "মন্ত্রমুগ্ধ" (সচিত্র প্রবন্ধ) ২৬৯
নাট্যানুষ্ঠান ... ২৭০

পুস্তক ও আলোচনা ২৭১

মন্দার পর্ব্বত (উপন্যাস); চৌকো চোয়াল (রোমাঞ্চকর উপন্যাস); রক্তাভ বৃক্ষ (রোমাঞ্চকর কিশোর-উপন্যাস)।

সম্পাদকীয়— ২৭৩

"জনগণ-মন-অধিনায়ক"; মহাত্মাজী ও নেতাজী; কলিকাতার হাঙ্গামা; এশিয়া-সম্মেলন: ডারবান-হত্যাকাণ্ড; মাধ্যমিক শিক্ষা বিল।

একবর্ণ—

ফসল — ফটো—সুবোধচন্দ্র করণ

খেয়া — ফটো—অনিল বিশ্বাস

চিত্র-সূচী

প্রবন্ধান্তর্গত

পুরাতন দিল্লী ২০০

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ; পৃথ্বীরাজ; জাম-ই-মসজিদ; লালকেল্লা; বিমান হইতে পুরাতন দিল্লীর দৃশ্য।

একাডেমির চিত্র-প্রদর্শনী ২২২

সরস্বতী (শিল্পী—সুনীলকুমার পাল); দুর্ব্বাসার অভিশাপ (শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ লাহা)

গান্ধীজীর জীবন-মৃত্যু— ২৩১

মহাত্মাগান্ধী

নেতাজী— ২৩১

সুভাষচন্দ্র বসু

পুণ্যাত্মা পুরুষ সচ্চিদানন্দ— ২৪৯

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

শরৎচন্দ্রের "শেষের পরিচয়"— ২৫৭

শরৎচন্দ্র

রূপলোক— ২৬৯

রমা নেহেরু; মীরা সরকার; পারুল কর; কালী সরকার; জওহর রায় ও সুনীল দাশগুপ্ত।

ইম্পিরিয়াল টি কোং
৪, রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ
খুচরা ও পাইকারী খরিদ্দারগনের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গশ্রী

STUDENTS' P.G.A. COMMON ROOM

ষোড়শ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৫৫ | ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

রাজগীরের জন্ম-কথা

শ্রীমতী অমিয়া বসু

বিহার অঞ্চলের পাটনা জিলার অন্তর্গত রাজগীর বহু প্রাচীনকালে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। স্থানটী স্বল্পায়তন গিরি-উপত্যকাতে অবস্থিত। এখন জনবিরল, নীরব নিস্তব্ধ, চারিদিকে গিরিশ্রেণী, অরণ্যানী। রাজগীরের জন্মকথা সুদূর অতীতে নিহিত। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের চেষ্টা ও গবেষণার ফলে অতীত গৌরবময় কাহিনীর অধিকাংশ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরাজাদের রাজধানী ছিল। জনকোলাহলে, সান্ধ্য-বন্দনার শঙ্খধ্বনিতে উপত্যকাটী মুখরিত হইত, সুরম্য অট্টালিকা, নানা বিপণিতে বিভূষিত ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ বুদ্ধদেব, মহাবীর, অগণিত সাধুসন্ন্যাসীদের পদধূলিতে উপত্যকাটী পূত হইয়াছিল। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের পীঠস্থান। বর্ত্তমান রাজগীর ভগ্নস্তূপে, শিলালিপিতে অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে। স্থানীয় আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ প্রবাহিত। রাজগীর আজ স্বাস্থ্যান্বেষণকারীদের স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে।

পুরাতন ইতিহাসে রাজগীর 'গিরিব্রজ', 'কুশগরপুর' এবং 'রাজগৃহ' এই তিনটী নামে পরিচিত। মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে এবং চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এবং হুয়েন-চাং-এর বিবরণীতে রাজগীর পুরাতন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। উপত্যকাটী পাঁচটী গিরিশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত থাকাতে 'গিরিব্রজ' বলা হইত। সুগন্ধ কুশঘাসের প্রাচুর্য্যের জন্য 'কুশগরপুর' এবং রাজার আবাস ছিল তজ্জন্য 'রাজগৃহ' নামকরণ হইয়াছিল। Dr. Hamilton, Buchanan এবং General Cunningham এই উপত্যকাকেই ঐতিহাসিক 'গিরিব্রজ', 'কুশগরপুর', ও 'রাজগৃহ' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। হুয়েন-চাং কুশগর-

পুরকে 'Kiu-She-Ku-lo-pu-lo' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে উল্লিখিত আছে—খৃষ্টপূর্ব্ব আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে গিরিব্রজ মগধের রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল, সহরটী সমৃদ্ধিশালী ছিল। বাসুদেব বলিতেছেন,..."হে পার্থ, মগধের মনোরম রাজধানীর প্রতি অবলোকন কর,নানারূপ পশুপক্ষী বিচরণ করিতেছে, সুস্বাদু সলিল প্রবাহিত, সুরম্য অট্টালিকাতে সজ্জিত, চতুর্দ্দিক পর্ব্বতবেষ্টিত, মধ্যস্থল অশ্বত্থবৃক্ষ ও লোধ্রপুষ্প দ্বারা শোভিত। হে পার্থ,...গৌতমের আবাস ঐ মনোরম বৃক্ষকুঞ্জের দিকে দৃকপাত কর...।"

উল্লিখিত পাঁচটী গিরিশ্রেণীর নাম যথাক্রমে—প্রথম, বৈভার (পালিগ্রন্থে 'ওয়েভার')। বৈভারগিরি অতি বিখ্যাত। ইহার পার্শ্বদেশে 'সত্যপানী গুহাবাস' যেখানে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে বৌদ্ধ-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ গুহাবাসে সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করেন। পরে সংগৃহীত উপদেশাবলী বৌদ্ধদের পবিত্রগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' নামে অভিহিত হয়। এই অধিবেশনের পরে সম্মিলনের বিভিন্ন যুগে বিভিন্নস্থানে আরও তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। Cunningham বলিয়াছেন, গুহাবাসের মধ্যস্থিত কক্ষ দৈর্ঘ্যে ৪০ ফিট্ এবং প্রায় ৫০০ শত শ্রোতার বসিবার বন্দোবস্ত ছিল, কক্ষে একটী দ্বার ও একটী গবাক্ষ। দ্বিতীয়, বিপুলগিরি (পালিগ্রন্থে 'ওয়েপেল্লো')। তৃতীয়, রত্নগিরি বা খবাগিরি। ফা-হিয়ান্ খত্মগিরিকে 'Fig tree Cave' বলিয়াছেন। খত্মগিরি বৌদ্ধদিগের নিকট পবিত্রস্থান। এইখানেই বুদ্ধদেব মধ্যাহ্নভোজনান্তে ধ্যানস্থ ছিলেন। মহাভারত ও পালিগ্রন্থে খত্মগিরির উল্লেখ আছে। একটী বাঁধান আঁকাবাঁকা রাস্তা গিরিশৃঙ্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং শৃঙ্গোপরি একটী জৈনমন্দির স্থাপিত। উক্ত মন্দিরের ইতিবৃত্ত অদ্যাবধি অজ্ঞাত। জৈনগণ সুদূর অতীতকাল হইতে এখনও মন্দিরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। চতুর্থ, 'উদয়গিরি' এবং পঞ্চম, 'সোনাগিরি'।

কথিত আছে, জরাসন্ধ এবং তৎপরে ক্ষত্রিয় বসুবংশের রাজাদের রাজধানী গিরিব্রজে ছিল। গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে কুশাগ্রজ বসুর আমলে তাঁহার কর্ম্মচারী পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ (Engineer) মহাগোবিন্দ এই নগর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন। Hamilton—Buchanan-এর মতে বর্ত্তমান রাজগীর পুরাতন নগর হইতে প্রায় এক মাইল ব্যবধান। পুরাতন সহরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে একটী দুর্গ এবং দুর্গের উত্তর-পশ্চিমাংশে সহর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। সহরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দুইটী বিশাল স্তম্ভ ছিল এবং একটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে একটী বৃহদাকার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে মগধের রাজা শ্রেণীক তথা বিম্বিসারের রাজধানীও গিরিব্রজে ছিল। বিম্বিসার শেষ তীর্থঙ্করের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহারই সময় গিরিব্রজে জৈনপ্রভাব বিস্তারিত হয়। এইখানেই মহাবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। জৈনগণের নিকট এই উপত্যকা পীঠস্থান। পার্শ্বনাথের মূর্ত্তির পাদদেশে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, বিপুলগিরিতে অষ্টম ও নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈনপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান এবং মুসলমানদের আগমনের ফলে জৈনপ্রভাব অনেকাংশে ম্লান হইয়া পড়ে। মুসলমান আধিপত্যের শেষাশেষি অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর পর পুনরায় রাজগীরে জৈনপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিম্বিসারের পর অজাতশত্রু রাজধানী গিরিব্রজ হইতে কিয়ৎ দূরে স্থানান্তরিত করেন এবং নূতন রাজধানীকে রাজগৃহ বলেন। ফা-হিয়েন্ এবং হুয়েন-চাং রাজগৃহ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অজাতশত্রুর পর তাঁহার পুত্র উদয়ন রাজগৃহ হইতে রাজধানী পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত করেন।

জৈনপ্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজগৃহতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে। বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য শারিপুত্র এবং মোগ্‌গল্লান রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসার কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না। ধর্ম্মমতে তিনি উদার ছিলেন। জৈনধর্ম্মের প্রধান সমর্থক হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মেরও

তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, বুদ্ধদেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। বৈভারগিরিতে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী শুনিতে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সময়ে দুইটী বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপিত হয়। সম্রাট্ অশোক পাটলীপুত্রে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার পর রাজগৃহ ব্রাহ্মণদের দান করেন। কিংবদন্তী আছে যে, সম্রাট বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে রাজগৃহতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে প্রায় ৮০০ হাজার ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সম্রাট তাঁহাদের যথাযথ 'দক্ষিণা' বিতরণ করেন। একথা সত্য যে, বর্ত্তমান রাজগীর অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়। বহু শতাব্দীর পর শুঙ্গ ও কণ্ববংশের রাজত্বকালে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হয় এবং রাজগৃহে বৌদ্ধপ্রভাব একরকম বিলুপ্ত হয়, এমন কি, বৌদ্ধমন্দির, বিহার প্রভৃতি ধ্বংসোন্মুখ হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আধিপত্য বিলীন হয়। ইতিমধ্যে রাজগৃহে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব স্থাপিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজগৃহে হিন্দু দেবালয়ের পূজা অর্চনা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কনৌজে যশোধর্ম্ম এবং গৌড়ে আদিশূরের সময় পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিপত্তি লাভ করে। পরে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনর্জাগরণ হয়। পালরাজগণ হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। হিন্দুগণ রাজগৃহে পুনরায় তাঁহাদের দেবালয়ের সংস্কার সাধন করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মিলন হয়। ফলে রাজগৃহ হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধদের পীঠস্থানে পরিণত হইল।

শুধু তাহাই নহে, মুসলমানগণের নিকটও রাজগীর পীঠস্থান। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজীর বিহার বিজয়ের পর বহু মুসলমান সাধু, ফকির রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণ ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য সেখানকার অধিবাসী হন। তন্মধ্যে বিখ্যাত মুকদুম খাঁ শৃঙ্গশৃঙ্গের কুণ্ডের নিকট বাস করিতেন। অচিরেই তাঁহার ধর্মভাবের জন্য হিন্দু—জৈন এবং বৌদ্ধগণ মুকদুম খাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে শৃঙ্গশৃঙ্গের কুণ্ড 'মুকদুমকুণ্ড' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুকদুমকুণ্ড এখনও মুসলমানদিগের নিকট পবিত্রস্থান। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর এখানে একটা মেলা বসে। সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান মেলাতে সমবেত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী, জৈন, বৌদ্ধ এবং মুসলমান—এই চারিটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পীঠস্থান, মিলনসঙ্গম রাজগীর।

ভগবান তথাগতের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সারিপুত্ত (শারিপুত্র) ও মোগ্গল্লানই (মৌদ্গল্যায়ন) ছিলেন সর্ব্বপ্রধান অগ্রশ্রাবক। ত্রিপিটকাচার্য্য ধর্ম্মপাল ভিক্ষু-সঙ্কলিত এই শিষ্যশ্রেষ্ঠদ্বয়ের ধর্ম্মজীবন ও ইতিহাস এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

'এই শিষ্যদ্বয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের তৎকালীন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকাতলে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। ভারতের সমস্ত রাজা দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভারতে এক পরম শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুদীর্ঘ দুইশত বর্ষকাল এই অহিংস-ধর্ম্ম সমভাবে ভারতের বুকে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া যখন 'পরিহানি'র প্রথম সোপানে অবতরণ করিল, তখন সেই পতনোন্মুখ সদ্ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হইলেন সম্রাট অশোক।—বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্রাট অশোককে পরম হিতৈষীরূপে লাভ করিয়া প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার অহিংসার জয়-গান গাহিয়া উঠিলেন :

'নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।'

অহিংসার এই জয়গান, সর্ব্বদুঃখ নাশের পথপ্রদর্শক এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মমতবাদ শুধু ভারত নহে, তিব্বত, ভুটান, চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, শ্যাম, ব্রহ্ম, সিংহল—সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইল।

সেদিনের সেই ভারত জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, ভাস্কর্য্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, সংস্কৃতিতে ও সভ্যতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বহু দূর-দূরান্ত হইতে

সহস্র সহস্র শিক্ষার্থী নরনারী ভারতে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেন। তাহার পর প্রায় দুই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। বৌদ্ধশিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই কেন্দ্রসমূহ—নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা আজ লুপ্ত হইয়াছে। ভারতের বহু কৃতী সন্তানের ইতিকথাই আজ বিস্মৃতপ্রায়।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতের তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কমিশনার কানিংহাম যখন সাঁচীতে বিলুপ্ত বৌদ্ধস্তূপগুলির খননকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি পাওয়া গিয়াছিল। এতদিন তাহা ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ছিল।—সম্প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি-মঞ্জুষাদ্বয় ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। সেগুলি ভূপাল রাজ্যের সাঁচিতে নব পরিকল্পিত চৈত্যগিরি বিহারে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এবার শারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান মহাপুরুষদ্বয়ের যৎসামান্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব।

রাজগৃহের অনতিদূরে উপতিষ্য বা নালক ও কোলিত নামে দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। উপতিষ্য গ্রাম নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্ত্তী ছিল। এই দুই গ্রামে প্রচুর ভোগৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ দুইটি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিতেন। এই দুই পরিবার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ হইতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। একই দিবসে দুই পরিবারে দুইটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ-দিবসে উপতিষ্য গ্রামে জাত শিশুটির নাম উক্ত গ্রামের নামানুসারে উপতিষ্য ও কোলিত গ্রামে জাত শিশুটির নাম কোলিত রাখা হয়। পরবর্ত্তী জীবনে উপতিষ্য তাঁহার মাতা সারি (বা শারি) ব্রাহ্মণীর নামানুসারে সারিপুত্ত (বা শারিপুত্র) ও কোলিত তাঁহার মাতা মোগ্‌গলীর (বা মোগ্‌গলী) নামানুসারে মোগ্‌গল্লানে (বা মৌগ্‌গলায়ন) নামে পরিচিত হ'ন। পূর্ব্বপুরুষদের প্রথানুযায়ী তাঁহারা শৈশবকাল হইতে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় সখ্য স্থাপন করিলেন। অনুচরবর্গসহ উভয়ে একত্রে আমোদে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত পাঁচ শত সুবর্ণ-শিবিকা ও পাঁচ শত অশ্বরথ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নানা বিদ্যা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়ে প্রত্যহ রাজগৃহে নৃত্যাভিনয় দেখিতে যাইতেন।

একদিন অভিনয় দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিষাদক্লিষ্ট চিত্তে উভয়ে ভাবিতে লাগিলেন—'কি প্রকারে এই মায়ামুগ্ধ দুঃখময় ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব?' উভয়ের মনে একই ভাব জাগ্রত হওয়ায় দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা গৃহত্যাগ করতঃ কোনো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিবেন। সেই সময় সঞ্জয় নামক পরিব্রাজক মহৎ পরিব্রাজক পরিষদের আচার্য্য ছিলেন। তিনি তাঁহার পঞ্চশত শিষ্য-প্রশিষ্য পরিচালনা করিয়া জনসমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান সঞ্জয় পরিব্রাজকের যশঃকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনুচরবর্গের সহিত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা সঞ্জয়ের অধিগত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'প্রভো! আপনার নিকট আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় কি এই পর্য্যন্ত? না কি আরও অতিরিক্ত কিছু শিখিবার আছে?' সঞ্জয় বলিলেন: 'বৎসগণ, এই পর্য্যন্ত। তোমরা সব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছ এখন তার সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হও।'

আচার্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া মোক্ষ সন্ধানে জম্বুদ্বীপের গ্রাম, নগর, জনপদ, তপোবন প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরাশ হইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে উভয়ে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন যে, যিনি প্রথমে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পাইবেন, তিনি আসিয়া অপরকে বলিবেন।

সেই সময় শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যান্তে চারি আর্য্যসত্য পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার যাটজন অর্হৎ শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চরথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়,

অথায় হিতায় দেবমনুস্‌সানীং।' তাঁহার সেই আহ্বানে ভিক্ষুগণ অপূর্ব্ব প্রাণস্পন্দন অনুভব করিলেন; চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। জনকল্যাণ সাধনে শিষ্যগণকে প্রেরণ করিয়া তথাগত স্বয়ং রাজগৃহের অন্তর্গত বেণুবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রথম পঞ্চ শিষ্যের অন্যতম অশ্বজিৎ স্থবির স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ শাস্তার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সত্যান্বেষী সারিপুত্ত পরিব্রাজকারাম হইতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া বাহির হইবার পথে অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তেন্দ্রিয় ও শীলগুণমণ্ডিত অশ্বজিৎ স্থবিরকে দেখিয়া ভাবিলেন, যাঁহারা জগতে অর্হৎমার্গসম্পন্ন বলিয়া (যাঁহাদের সকল প্রকার তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়াছে) কথিত আছে, ইনি সম্ভবতঃ তাঁদেরই একজন হইবেন। অতঃপর ব্রাহ্মণকুমার সারিপুত্ত সেই প্রশান্ত ও জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধপুরুষের সম্মুখে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী? আপনার শাস্তা কে এবং আপনি কাহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল অপনোদন করুন।'

পরিব্রাজকের কথা শুনিয়া অশ্বজিৎ বুদ্ধের গভীর দর্শনতত্ত্বমূলক একটী চতুষ্পদী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন:

'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা,
তেসং হেতুং তথাগত আহ,
তেসং চ যো নিরোধো
এবং বাদী মহাসমনোতি।

অর্থাৎ জগতের যাবতীয় (ধর্ম্ম) বস্তু বা জিনিষ হেতু হইতে সমুৎপন্ন। ভগবান বুদ্ধ সেই হেতু (মূল কারণ) আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কিরূপে কার্য্য-কারণশৃঙ্খলার উপশম হয়, তাহাও মহাশ্রমণ গৌতম উপলব্ধি করিয়াছেন।' এই অশ্রুতপূর্ব্ব চতুষ্পদী শ্লোক শ্রবণ করিয়া সারিপুত্ত অন্তরে অনুভব করিলেন, 'নিব্বানং পরং সুখং;' সেই মুহূর্ত্তেই তিনি স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান (নির্ব্বাণের প্রথম স্তর) লাভ করিলেন। সারিপুত্ত অশ্বপতির নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, বুদ্ধদেব তখন বেণুবনে অবস্থান করিতেছেন।—সারিপুত্ত মোগ্‌গল্লানের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া স্থবিরের কথিত শ্লোকটি নূতন ছন্দে আর একবার আবৃত্তি করিলেন। গাথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোগ্‌গল্লানের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল; তিনিও 'স্রোতাপন্ন' হইয়া অমৃতের আস্বাদ লাভে ধন্য হইলেন।—উভয়ে আসিয়া বুদ্ধের পাদমূলে বন্দনাপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন, 'তোমরা দুঃখের নির্ব্বাণ লাভ করিবার নিমিত্ত সম্যক্‌রূপে পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর।' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন। (সংক্ষিপ্তসার)

'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু'

সত্য দাস

লাখো লাখো সৈনিকের কচি-কাঁচা-খুন—
দেশব্রতী সন্তানের তাজা রক্তারুণ—

লালে লাল রাজপথ। বীর জনগণ
দীর্ঘ দুই শতাব্দীতে অনেক যোজন
অতিক্রম করে গেছে সংগ্রামের পথে।
অনেকে দিয়েছে প্রাণ তাজা রক্তস্রোতে
বিদিশার নিশা থেকে সজোরে ছিনিয়ে—
একটি আশ্চর্য-সূর্য কেড়ে নিতে গিয়ে।

ক্রান্তিমুক্তে তাই আজ আশ্চর্য সকাল—
মুক্তি-বার্তা বয়ে আনে প্রত্যাশিত কাল।
তবু যেনো হৃদয়েতে তীব্র-হাহাকার—
'এখনো তো এ-পৃথিবী হলো না সাবার',—
তবু এই নবলব্ধ মুক্তির সংস্কার
ভবিষ্যের স্বপ্ন দেখি সমুদ্ধ আত্মার।

মা

সমারসেট মম

অনুবাদক—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

প্রাঙ্গণে ঝগড়ার আওয়াজ শুনে দু' তিনজন লোক তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। একজন স্ত্রীলোক বলল, "ও ঐ নতুন ভাড়াটে। যে কুলীটা ওর মালপত্তর বয়ে এনেছে তারই সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে।"

এটা একটা দোতলা বাসাবাড়ী—শেভিলের রুক্ষতম অঞ্চল, লামাকারেনার পিছন দিককার রাস্তার ওপর একটা প্রাঙ্গণকে বেষ্টন করে তৈরী। যাদের নিয়ে স্পেন দেশ জনাকীর্ণ—ডাক-হরকরা, পুলিশের লোক কিম্বা ট্রামের কণ্ডাক্টার—এই ঘরগুলো সেই সব শ্রমজীবীদের এবং স্বল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই ভাড়া দেওয়া হয়েছে এবং জায়গাটায় ছোট ছেলেমেয়ে গিজগিজ করছে। এখানে কুড়িটি পরিবার নীড় বেঁধেছে। তারা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ করে, আবার আপোষে মিটিয়ে নেয়, তারা বাজে কথায় মাথা ঘামায়, কিন্তু দরকারের সময় তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে, কেননা আন্দালুসিয়ার লোকেরা স্বভাবতঃই ভালমানুষ এবং মোটের ওপর তারা সকলে মিলে মিশে একরকম ভালভাবেই দিন কাটায়। একটা ঘর কিছুদিন থেকে খালি পড়ে ছিল। আজ সকালে একটি স্ত্রীলোক সেটা ভাড়া নিয়েছে এবং ঘণ্টাখানেক পরে সে তার জিনিষপত্র নিয়ে এসেছে। নিজে সে যতগুলো সম্ভব নিয়েছে এবং বাকী সব কুলীটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে ঝগড়াটা আরও ঘোরাল হ'য়ে উঠল এবং দোতলার স্ত্রীলোক দুটি এমন ভাবে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বারান্দায় ঝুঁকে পড়ল যেন তাদের একটা কথা শুনতেও ভুল না হয়।

সবাই নবাগতার গালাগালের বানডাকানো কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং কুলটার সরোষ আক্ষেপ শুনতে থাকল। স্ত্রীলোক দুটি একে অপরকে কনুই দিয়ে ঠেলা মারল। কুলীটা বলতে থাকল, "যতক্ষণ না আমি পাওনা বুঝে পাচ্ছি ততক্ষণ এখান থেকে নড়ব না।"

"আমি তো তোমায় মিটিয়ে দিয়েছি। তুমি নিজে এই কাজটা ছের আনায় করতে রাজী হয়েছিলে।"

"কখনই না। আপনি আমায় এক টাকা দেবেন কথা দিয়েছিলেন।" তারা চার আনারও কম পয়সা নিয়ে দরকসাকসি করতে থাকল।

"এই সামান্য কটা জিনিষ আনবার জন্যে এক টাকা, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

স্ত্রীলোকটি তাকে ঠেলা দিয়ে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

সে আবার বলল, "পুরো পয়সা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি উঠব না।"

"আর এক আনা বড় জোর দিতে পারি"

"ও আমি নেব না।"

বিবাদটা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। স্ত্রীলোকটি তখন কুলীটার ওপর চীৎকার করে উঠে তাকে অভিসম্পাত দিল। ঘুসি পাকিয়ে তার মুখের কাছে নাড়তে থাকল। অবশেষে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল।

"চুলোয় যাক, খুব হয়েছে, এক আনাই দিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার মত একটা জঘন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে সময় নষ্ট করতে চাই না।"

সে পয়সা দিল এবং লোকটা তার বিছানা তোষক ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সে যাবার সময় স্ত্রীলোকটিকে একটা অশ্লীল কথা তার ওপর বর্ষণ করল। তার পর নিজের জিনিষগুলো ভেতরে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং বারান্দার স্ত্রীলোক দুটি সেই অবসরে তার মুখমণ্ডল দেখতে পেল।

"উঃ, মুখখানা কি ভয়ানক। দেখলেই মনে হয় যেন একটা খুনী।"

সেই সময় একটি বালিকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে এল এবং তার মা ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "রোজালিয়া ঐ মেয়েমানুষটাকে লক্ষ্য করেছিস?"

"আমি কুলিটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কোথা থেকে এসেছে, সে বলে যে, ত্রিয়ানা থেকে ওর জিনিষগুলো এনেছে। ওকে এক টাকা দেবে বলেছিল কিন্তু পরে তা দেয় নি।"

"সে কি ওর নাম-টাম তোকে কিছু বলেছে ?"

"তা সে জানে না। তবে ত্রিয়ানার লোকে নাকি ওকে লা কাসিয়া নামেই ডাকত।"

উগ্রস্বভাবের স্ত্রীলোকটি ভুলে যাওয়া একটা পোঁটলা নিতে আবার বেরিয়ে এল। বারান্দায় থেকে যে স্ত্রীলোকগুলি উদাসীনভাবে তাকে লক্ষ্য করছিল তাদের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছুই বলল না। রোজালিয়া ভয়ে কেঁপে উঠল।

"ওকে দেখে আমার ভয় লেগেছে।"

লা কাসিয়ার বয়স প্রায় চল্লিশ; বিকট-দর্শনা এবং কৃশকায়া, হাতগুলো হাড়সার এবং আঙুলগুলো শকুনির থাবার মত। তার গাল দুটো তোবড়ান, চামড়াটা কুঁচকে গেছে এবং রংও ক্যাকাসে হয়েছে। সে যখন তার পুরু ঠোঁটগুলা বিবর্ণ মুখটা কেলে তখনই হিংস্র জন্তুর মত তার ছুচাল দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। তার চুল ঘনকালো ও মোটা, একটা বিশ্রী গাঁট পাকিয়ে সে এটাকে রেখে দিয়েছে যা দেখলেই মনে হয় তার কাঁধের ওপর গড়িয়ে যাবে এবং দুই কানের সামনের দিকে একটা সোজা নুড়া ঝুলে পড়েছে। কোটরের ভেতর সমান তার বড় বড় কালো চোখ দুটো দুর্দ্দান্তভাবে জলছে তার মুখে এমন একটা ক্রুরতার ব্যঞ্জনা আছে যে কেউ তার কাছে এসে কথা কইতে সাহস পায় না। সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। প্রতিবেশীদের কৌতূহল বেড়ে উঠল। তারা জানতে পারলে সে খুবই গরীব, কেননা তার পোষাক-পরিচ্ছদ সবই জীর্ণ। প্রত্যহ সকাল ছ'টায় সে বেরিয়ে যায় এবং রাত্রি না হওয়া পর্য্যন্ত ফেরে না। কিন্তু তারা টের পেল না সে কি উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। সেই বাড়ীতে পুলিশের যে লোকটি বাস করে তাকে তারা অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করল।

সে বলল, "যতক্ষণ না ও কোন রকম শান্তিভঙ্গের কাজ করছে, ততক্ষণ ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই করব না।"

কিন্তু সেভিলে কুৎসা তাড়াতাড়িই রটে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একজন রাজমিস্ত্রী যে উপরকার ঘরে বাস করে, খবর নিয়ে এল যে ত্রিয়ানায় তার একটি বন্ধু স্ত্রীলোকটির বৃত্তান্ত জানে। মাত্র এক মাস আগে লা কাসিয়া জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং সেখানে খুনের দায়ে সে সাত বছর আটক ছিল। ত্রিয়ানায় একটা বাড়ীতে সে বাস করছিল। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে তা জানতে পেরে সেখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন তার ওপর ঢিল ছুঁড়ত বা গালাগাল দিত এবং অশ্লীল কথা বলতে বলতে ঘুঁষি উঁচিয়ে তাদের দিকে তেড়ে যেত তখন সমস্ত জায়গাটায় এমন হুলুস্থুল পড়ে যেত যে, জমিদার ওকে নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করে দিল। যারা তার পেছনে লেগেছিল তাদের এবং জমিদারকে অভিসম্পাত দিতে দিতে লা কাসিয়া হঠাৎ একদিন সকালে নিরুদ্দিষ্টা হ'ল।

রোজালিয়া জিজ্ঞাসা করল, "কাকে ও খুন করেছে ?"

"লোকে বলে ওর প্রেমাস্পদকে।" মিস্ত্রী উত্তর দিল।

অবজ্ঞার একটা হাসি হেসে রোজালিয়া বলল, "ওর কখনও প্রেমাস্পদ থাকতে পারে না।"

তার মা পাইলার চীৎকার করে উঠল, "ভগবান রক্ষা করুন। আশা করি ও আমাদের কাউকে খুন করবে না। আমি বলেছিলাম ওকে দেখতেই ঠিক খুনীর মত।"

রোজালিয়া ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। সেই মুহূর্ত্তে দিনের কাজ সেরে লা কাসিয়া বাসায় ফিরল এবং আলাপকারিণীদের মধ্যে একটা আলোড়ন উঁকি দিল। তারা একসঙ্গে গাদাগাদি ক'রে সরে যাবার মত একটা হাবভাব দেখাল এবং সভয়ে দুর্দ্দান্তচক্ষু স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল। তাদের মৌনতায় সে যেন একটা অমঙ্গল দেখতে পেল এবং তাদের দিকে দ্রুত ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানল। পুলিশের লোকটি আলাপ করার উদ্দেশ্যে তাকে অভিবাদন (শুভ সন্ধ্যা) জানাল। ভ্রূকুটি সহকারে সে জবাব দিল 'শুভ সন্ধ্যা' এবং তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

তারা ঘরে চাবি দিতে শুনল। ওর বিকট বিষাদময় চোখগুলো তাদের একটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছে এবং তারা সবাই নীচু গলায় আস্তে আস্তে কথা শুনতে লাগল যেন একটা অনিষ্টকর যাদুমন্ত্র তাদের বশীভূত করেছে।

রোজালিয়া বলল, "ওর ভেতর শয়তান বাস করছে।"

তার মা পুলিশের লোকটিকে বলল, "ম্যাছুয়েল, তুমি যে আমাদেরর রক্ষা করবার জন্তে কাছেই আছ এই ভেবে আমি আশ্বস্ত হচ্ছি।"

কিন্তু লা কাসিরা আলাতন করার মত আদৌ ইচ্ছা প্রকাশ করল না। অনমনীয় ভাবে সে নিজের পথে চলতে থাকল। কাউকে ডেকে একটা কথাও কইল না এবং কেউ বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করলে সরাসরি তার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করল। তার মনে হল প্রতিবেশীরা তার গোপন কথা এবং দীর্ঘকাল জেলবাসের কথা জানতে পেরেছে। তার মুখের রেখাগুলো আরও কঠিন হয়ে উঠল, তার কোটরনিহিত চোখের চাহনিও অমানুষিক আকার ধারণ করল।

কিন্তু সে যে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমশঃ দূর হল। এমন কি অতিভাষিণী পাইলারও তার সেই নীরব মূর্ত্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করল—যে প্রায়ই প্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ দলের কাছ ঘেঁসে যাতায়াত করত।

"আমার মনে হয়, জেলখানায় থাকার সময় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, লোকে বলে এ রকম প্রায়ই হয়।"

কিন্তু একদিন পুরাতন কথাকে জাগিয়ে তুলতে একটা ঘটনা ঘটল। একটি যুবক 'রেজা'র শেভিলের সব বাড়ীর সামনেকার লোহার কটকের কাছে এসে দাঁড়াল এবং আন্টোনিয়া সানচেজ নামে কাউকে খুঁজতে লাগল। একটা স্কার্ট রিফু করতে করতে পাইলার তার মেয়ের দিকে তাকাল এবং নিজের কাঁধ নাড়ল।

সে বলল, "ওই নামে এখানে কেউ থাকে না।"

যুবকটি জবাব দিল, "হাঁ, এইখানেই থাকে। লোকে তাকে লা কাসিরা নামে চেনে।"

"হাঁ"। রোজালিয়া কটকটা খুলে দিল এবং দরজার দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ, ওর ভেতর থাকে।"

"ধন্যবাদ।"

যুবকটি তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। সে একটি রমণীয় বালিকা, তার রং খুব ফরসা এবং চোখ দুটিও সুন্দর। একটা গোলাপী রংয়ের ফুল তার চকচকে কালো চুলের ভেতর গোঁজা থাকায় চুলগুলো ফুলে উঠেছে। তার স্তন দুটি উন্নত এবং ব্লাউসের তলায় তার বোঁটাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটা অতি প্রচলিত কথা আউড়ে সে বলল, "যে মা তোমায় পেটে ধরেছিল সে ধন্য।"

পাইলার জবাব দিল "ভগবান্ তোমার সহায় হউন।"

সে চলে গেল এবং গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারল। স্ত্রীলোক দুটি কৌতুহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। পাইলার জিজ্ঞাসা করল, "ও কে হতে পারে?" লা কাসিরার কাছে এর আগে তো কোন লোক আসেনি।"

তার ধাক্কায় কোনও সাড়া না পেয়ে সে আবার ধাক্কা মারল। তারা শুনতে পেল লা কাসিরা কর্কশ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছে—"কে ওখানে?"

সে ডাকল "মা"

একটা অস্ফুট স্বর শোনা গেল। দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

"কিউরিটো!"

স্ত্রীলোকটি দু বাহু বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং সাগ্রহে তাকে চুম্বন করল। তাকে আদর করতে করতে দু'হাত দিয়ে স্নেহভরে তার মুখে মৃদু আঘাত করল। যে-মেয়েটি এবং তার মা এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করছিল তারা আদৌ বিশ্বাস করতে পারে নি যে স্ত্রীলোকটি এমন সস্নেহ ব্যবহারে পারদর্শিনী। অবশেষে আহ্লাদে একটু ফুপিয়ে কেঁদে সে তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

রোজালিয়া সবিস্ময়ে বলল, "ও ওর ছেলে তা হলে। কে একথা ভাবতে পেরেছিল। ঐ রকম একজন সুদর্শন যুবক।"

কিউরিটোর মুখটা লম্বাটে এবং সাদা দাঁতগুলোর পাটি সমান, তার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, দুপাশের রগ অবধি কামান এবং সত্যিকার আন্দালুশিয়াদের মত পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত। তার অপরিণত দাড়ির ছাপ তামাটে চামড়ার ওপর নীল দেখাচ্ছে। তাকে দেখতে সত্যিই বাবু। মিহি পোষাক-পরিচ্ছদের ওপর তার একটা জাতীয় প্রীতি আছে এবং তার পাজামা দেহের সঙ্গে আঁটাআঁটিভাবে পরা, তার ছোট জামা

(জ্যাকেট) এবং চুলট দেওয়া কামিজটাও যতদূর সম্ভব আনকোরা। সে একটা চওড়া ধারওলা টুপী মাথায় দিয়েছে।

অবশেষে লা কাসিরার ঘরের দরজা খুলল এবং সে তার ছেলের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে বাইরে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আগামী রবিবার আবার আসছ তো?"

'যদি না অন্য কাজে আটকে পড়ি।'

সে রোজালিয়ার দিকে তাকাল এবং মাকে বিদায় জানিয়ে তার দিকেও ফিরে ঘাড় নাড়ল।

"ভগবান তোমার সহায় হউন"—মেয়েটি বলল।

সে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল এবং কালো চোখের দৃষ্টি হানল। লা কাসিরা তার দৃষ্টিকে প্রতিহত করল, এবং নিবিড় আনন্দে তার যে বিষাদ দূরীভূত হয়েছিল হঠাৎ তা বজ্রমেঘের মত তার মুখকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করল। সে সুন্দরী বালিকাটির দিকে ভ্রুকুটিকরা দৃষ্টি হানল।

যুবক চলে যাবার পর পাইলার জিজ্ঞাসা করল "ও তোমার ছেলে নাকি?"

ঘরে ফিরে যেতে যেতে রূঢ়ভাবে লা কাসিরা জবাব দিল, "হাঁ, ও আমারই ছেলে।"

কিছুতেই তাঁকে প্রশমিত করতে পারে না, এমন কি যখন তার অন্তর সুখে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তখনও সে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাবকে গ্রাহ্য করল না।

রোজালিয়া বলল, "লোকটি বেশ প্রিয়দর্শন এবং এর পরে দিনকয়েক তার কথা কেবলই ভাবতে থাকলে। ছেলের প্রতি লা কাসিরার একটা দুর্দান্ত ভালবাসা আছে। দুনিয়ায় সেই তার সর্বস্ব এবং এমন একটা হিংসানল-মিশ্রিত কামনা নিয়ে তাকে ভালবাসে যা প্রতিদানে অসম্ভাব্য ভক্তিই পেতে চায়। সে তার কাছে সর্বেসর্বা হ'য়ে থাকতে চায়। কার্য্যগতিকে তাদের একসঙ্গে থাকা হয় না, তাই যখন সে তার কাছ থেকে দূরে থাকে তখন সে যে কি করে তা ভাবতে তার পীড়া হয়। তার ছেলে কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় এটা সে বরদাস্ত করতে পারে না এবং যদি সে কোনও মেয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হয় তাতে সে মানসিক যন্ত্রণাই ভোগ করে।

কেবলমাত্র প্রেমের বিলম্বিত অভিনয়—যাতে কুমারীরা অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত লোহার গরাদ-ঘেরা জানালায় বসে থাকে আর তাদের প্রেমাস্পদরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের অভিলাষী কর্ণকুহরে উল্লাস ঢেলে দেয়, এই ছাড়া শেভিলে আর কোনও আমোদপ্রমোদই বেশী প্রচলিত নয়। এমন সুদর্শন যুবক যে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের সুমিষ্ট হাস উপভোগ করবে একথা জানতে পেরে লা কাসিরা ছেলেকে তার কোনও প্রণয়িনী আছে কি না জিজ্ঞাসা করল এবং যখন সে এই বলে শপথ করল যে, প্রত্যহ সন্ধ্যায় সে কাজ করেই কাটায়, তখন বুঝল যে সে মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু এই অস্বীকার তাকে একটা উগ্র রকমের আনন্দ দিল।

যখন সে রোজালিয়ার উদ্দীপ্ত চাহনি এবং ক্রিউরিটোর সাদর হাসি দেখতে পেল তখন ক্রোধে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। এ পর্য্যন্ত সে তার প্রতিবেশীদের ঘৃণাই ক'রে এসেছে, কেননা তারা সবাই সুখী আর সে দীনা, কেননা, তারা তার ভয়ঙ্কর গুপ্ত কথাটি পর্য্যন্ত জানে, কিন্তু তারা যে তার ছেলেকে কেড়ে নেবার পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র করছে এই কথা ভেবে এখন অর্দ্ধ উন্মাদের ন্যায় তাদের আরও বেশী ঘৃণা করতে থাকল। পরের রবিবার বৈকালে লা কাসিরা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই রকম ব্যবহার এতই অস্বাভাবিক যে, প্রতিবেশীরা এই নিয়ে কানাকানি করতে থাকল। একটা চাপা হাসি হেসে রোজালিয়া বলল, "তোমরা জাননা ও কেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে? ওর ধনমণি ছেলে আসবে, তাই। আমরা তাকে দেখি, ও তা পছন্দ করে না।"

"ও কি মনে করে আমরা তাকে খেয়ে ফেলব।"

কিউরিটো এসে পৌছল এবং তার মা তাড়াতাড়ি তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। পাইলার বলল, "মা ওর ওপর এত ঈর্ষ্যান্বিতা ও যেন ওর প্রেমাস্পদ।"

রোজালিয়া বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল, তার দীপ্ত চক্ষু দুষ্টামিভরা। তার খেয়াল হল

যে কিউরিটোর সঙ্গে একটা কথা বললে বেশ রগড় হবে। লা কাসিয়ার রাগের কথা ভেবে রোজালিয়ার সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

সে ফটকের কাছে দাঁড়াল, যাতে তারা দু'জন বেরিয়ে আসবার সময় তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু লা কাসিয়া মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে তার ছেলের সামনের দিকে চলে গেল যাতে তাদের দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হ'তে না পারে। রোজালিয়ার কাঁধ দুটো কেঁপে উঠল।

সে মনে মনে বলল, "অত সহজে তুমি আমাকে হারাতে পারবে না"।

পরের রবিবার লা কাসিয়া যখন ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, রোজালিয়া তখন বাইরে বেরিয়ে রাস্তার যে দিক থেকে কিউরিটোর আসবার কথা সেই দিকে ঘুরে বেড়াতে থাকল। এক মিনিটের মধ্যেই সে কিউরিটোকে দেখতে পেল এবং তাকে একবারে না চেনার ভান ক'রে চলে গেল।

সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে, চললে কোথায়?"

"ওঃ! তুমি নাকি? আমি ভাবলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভয় লাগছে।"

সে সদম্ভে বলল, "ভয় আমি কাউকেই করি না"।

"শুধু মাকে ছাড়া।"

সে এগিয়ে চলল, যেন কিউরিটো তাকে ছেড়ে চলে যায় এই সে চায়, যদিও সে ভাল ভাবেই জানে যে সে তার সঙ্গ ছাড়বে না।

সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে"?

"তাতে তোমার কি দরকার, কিউরিটো? যাদুধন মার কাছে যাও, নইলে মার খাবে। মা যখন সঙ্গে থাকে তখন তুমি যে আমার দিকে ফিরে তাকাতেই ভয় পাও।"

"কি সব বাজে কথা বকছ।"

"আর থাক, খুব হয়েছে। এখন ভালোয় ভালোয় যাও দেখি। আমার জরুরী কাজ আছে।"

গোবেচারীর মত সে চলে গেল, আর রোজালিয়া নিজের মনে হাসতে লাগল। আবার যখন সে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তখন দেখল যে লা কাসিয়ার সঙ্গে সে ফিরে যাচ্ছে, এই সময় সাহসে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল এবং বিদায় জানাল। লা কাসিয়া রাগে আরক্তিম হয়ে উঠল।

কর্কশ কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল, "চলে এস কিউরিটো; ওখানে দাঁড়ালে কেন?"

সে চলে গেলে স্ত্রীলোকটি রোজালিয়ার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল যেন তাকে কিছু বলবে, কিন্তু কি ভেবে নিজেকে সম্বরণ করল এবং তারপর অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরে ফিরে গেল।

দিন-কয়েক পরে সেভিলের বিখ্যাত মহাপুরুষ স্যান্‌-ইসিডোরার মহোৎসব এল এবং সেই ছুটীর দিনটি পালন করতে রাজমিস্ত্রী ও আরও দু'একজন লোক প্রাঙ্গণে দড়ি টাঙিয়ে চৈনিক লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল। মেঘমুক্ত গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে সেগুলি খুব জোরে জ্বলতে থাকল। নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত হয়েছে। বাড়ীর, লোকেরা প্রাঙ্গণের মাঝখানে সমবেত হয়ে চেয়ারে আসীন হয়েছে; স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউ কেউ ছেলে কোলে নিয়ে কাগজের হাতপাখা দিয়ে বাতাস খাচ্ছে। কেউ বা নিজেদের অশান্ত কথা বলা থামিয়ে কিশোর বয়স্ক কাউকে ধুলোময়লা মাথার জন্যে বকুনি দিচ্ছে। দিনের শ্বাসরোধী গরমের পর ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশ আরামদায়ক। যারা 'ষাঁড়ের লড়াই' দেখতে গিয়েছিল তারা অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগ্য জনদের কাছে সেই সব কথা শোনাচ্ছে। ' বিখ্যাত বৃষহন্তা বেলমণ্টি যে আশ্চর্য্য রকম নৈপুণ্য দেখিয়েছিল তা তারা সবিস্তারে বর্ণনা করছে। তাদের নিখুঁত কল্পনাশক্তিতে খেলার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বর্ণে এবং রসে স্পষ্ট ও মধুর হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন সেভিলের ইতিহাসে এত সুন্দর প্রদর্শনী এর আগে কেউ দেখেনি। লা কাসিয়া ছাড়া আর সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে; তার ঘরে একটিমাত্র মোমবাতির আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

"ওর ছেলে কোথায় গেল?"

পাইলার উত্তর দিল, "সে তো ওর ভেতরেই আছে। আমি ঘণ্টাখানেক আগে তাকে যেতে দেখেছি।"

রোজালিয়া হেসে বলল, "সে নিশ্চয়ই আমোদ করছে।"

একজন বলল, "মরুক গে যাক, লা কাসিরাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং তুমি আমাদের একটা নাচ দেখাও, রোজালিয়া।"

তারা সমস্বরে বলল, "হাঁ, হাঁ, যাও মা, নাচ গে যাও।"

স্পেনের লোকেরা নাচতে এবং নাচ দেখাতে ভালবাসে। অনেক বছর আগে একটা প্রবাদ খুব প্রচলিত ছিল যে, সমগ্র স্পেনে এমন একটাও মেয়ে জন্মায় নি যে নাচতে পারে না। চেয়ারগুলো তাড়াতাড়ি বৃত্তাকারে সাজান হল। রাজমিস্ত্রী ও ট্রামকণ্ডাক্টর তাদের সেতারা নিয়ে এল। রোজালিয়া তার নাচের অলঙ্কার পরল এবং অপর একটি মেয়ের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে নাচ আরম্ভ করল। ছোট্ট ঘর থেকে বাজনার আওয়াজ শুনে কিউরিটো তার কান দুটো খাড়া করল।

"ওরা নাচছে." সে বলল এবং তার সারা গা-টা শিউরে উঠল।

পর্দার ভেতর দিয়ে সে তাকাল এবং চৈনিক লণ্ঠনের ঈষৎ আলোয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে দেখল। সে দেখল যে দুটি মেয়ে নাচছে। রোজালিয়া তার রবিবারের পোষাক পরেছে এবং যথারীতি অত্যধিক পাউডার মেখেছে। তার চুলগুলো থেকে একটা অত্যুজ্বল গোলাপী আভা ঠিকরে পড়ছে। কিউরিটোর বুকটা ধড়ফড় ক'রে উঠলো। স্পেনে প্রেম খুব শীঘ্রই জন্মায় এবং যে দিন সে ঐ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে প্রথম কথা বলেছে তারপর থেকেই প্রায় তার কথা ভেবেছে। সে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

"ও কি করছ?" লা কাসিরা জিজ্ঞাসা করল।

আমি ওদের নাচ দেখতে যাচ্ছি। তুমি কখনই চাও না যে আমি কিছুটা আমোদ-প্রমোদ করি।"

"তুমি তো রোজালিয়াকে দেখতে চাও।"

তাকে আটকাবার চেষ্টা করতে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল এবং বাইরে যারা নাচ দেখছিল তাদের সঙ্গে মিলিত হ'ল। লা কাসিরা দু'এক পদ অনুসরণ করল এবং অন্ধকারে নিজের দেহের আধখানা লুকিয়ে দাঁড়াল, ক্রোধ তার অন্তরকে কামড়ে চিবিয়ে দিচ্ছে। রোজালিয়া কিউরিটোকে দেখল।

তার কাছ দিয়ে চলে যাবার সময় সে কানে কানে বলল, "তুমি কি আমার দিকে চাইতে ভয় পাও না?"

নাচ তার মাথাকে হাল্কা ক'রে দিয়েছে এবং সে লা কাসিরার জন্যে আদৌ ভয় পেল না। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর তার সঙ্গিনী যখন চেয়ারে বসল তখন রোজালিয়া কিউরিটোর দিকে এগিয়ে গিয়ে মাথাটাকে পিছন দিকে ঠেলে এবং ক্রুতসঙ্কারণে বুক ফুলিয়ে সোজাভাবে তার সামনে দাঁড়াল।

সে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই নাচতে জান না।"

"জানি বৈ কি।"

"আচ্ছা, তবে এস দেখি।"

রোজালিয়া উত্তেজিত হ'য়ে হাসল, কিন্তু সে ইতস্ততঃ করতে থাকল। ঘাড় ফিরিয়ে সে তার মাবের দিকে একবার তাকাল—যাকে অন্ধকারে দেখার চেয়ে খুঁজেই বার করতে হয়। রোজালিয়া সেই চাহনি ধ'রে ফেলল এবং তার মর্মও বুঝল।

"তোমার কি ভয় লাগছে?"

ঘাড় নেড়ে সে বলল, "ভয় কিসের?"

সে আসরে নামল। সেতারা-বাদকগণ বাজাতে আরম্ভ করল এবং দর্শকেরা তালে তালে হাত-তালির সঙ্গে মাঝে মাঝে বাহবা দিতে থাকল। একটি মেয়ে কিউরিটোকে একজোড়া অলঙ্কার দিল এবং তারা যুগলে নাচ আরম্ভ করল। অন্ধকারে তারা সাপের মত একটা হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেল এবং একরকম মরিয়া হয়েই রোজালিয়া সেই ছায়ান্তরালস্থিতা বিকট-আকৃতি সাদা ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকাল। লা কাসির নড়ল না। সে নাচের গতি-বিধি, দেহভঙ্গী এবং জটিল পদচারণা লক্ষ্য করতে থাকল; সে দেখল রোজালিয়া সুন্দর অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঝুঁকে পড়ল এবং অলঙ্কার বাজিয়ে, কিউরিটো যখন তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল তখন সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তার চোখ দুটো থেকে আগুন বেরিয়ে এল এবং মনে হল যেন কোটরের ভেতর থেকে তারা জ্বলছে। নাচ শেষ হ'ল

এবং রোজালিয়া প্রশংসার আনন্দে হাসতে হাসতে কিউরিটোকে বলল যে, সে-যে এত ভাল নাচতে পারে তা' সে আদৌ ভাবে নি।

লা কাসিরা ছুটে নিজের ঘরে ঢুকল ও দরজার আগলটা লাগিয়ে দিল। কিউরিটো এসে যখন তাকে খুলতে বলল তখন সাড়াও দিলে না।

সে বলল, "তবে আমি চল্লাম।"

তার অন্তর বেদনায় টন্‌টন্ করতে থাকল, কিন্তু সে একটি কথাও বলল না। সে-ই তার সর্ব্বস্ব, জগতের সব চেয়ে প্রিয়তম বস্তু; আর সেই কি না তাকে অগ্রাহ্য করল। রাত্রে সে ঘুমোতে পারল না, কিন্তু আর্ত্তোন্মাদের মত শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে থাকল যে, তার ছেলেকে তারা চুরি করে নিচ্ছে। সকালে সে কাজে বাহির হল না, রোজালিয়ার অপেক্ষায় বসে রইল।

অবশেষে বালিকাটি বেরিয়ে এল, রাত্রের উৎসবানন্দের ক্লান্তির কিছুটা ছাপ তার মুখে তখনো আছে এবং লা কাসিরাকে সামনে দেখতে পেয়ে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল।

"আমার ছেলেকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?"

বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে রোজালিয়া বলল, "কি তুমি বকছ?"

লা কাসিরা রাগে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে এবং নিজেকে সংযত রাখবার জন্যে হাতটা কামড়াচ্ছে।

"হাঁ, আমি কি বলছি তা তোমরা ভালভাবেই জান। তোমরা তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ।"

"তুমি কি মনে কর আমি তোমার ছেলেকে চাই? তাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখ না কেন। আমি যেখানে যাই সে যদি সেখানে আমার পিছু পিছু যাওয়া করে তাহ'লে আমি কি করতে পারি?"

"এ সব মিথ্যা কথা।"

"তাকে জিজ্ঞাসা কর গে।" এর পর রোজালিয়ার কণ্ঠস্বর এত অবজ্ঞাসূচক হ'ল যে লা কাসিরা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। "আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে এক ঘণ্টাকাল রাস্তায় চাহিয়া থাকে। তুমি তাকে নিজের কাছে রাখ না কেন?"

"তুমি মিথ্যা বলছ, সব মিথ্যা। তুমি নিজে গিয়ে তার যাতায়াতের রাস্তায় দাঁড়াও।"

"আমার যদি প্রেমিকের দরকার হ'ত তাহ'লে না চেয়েই অনেক পেতাম। আমি খুনীর ছেলেকে চাই না।"

তারপর লা কাসিরার কাছে সব জিনিষ গুলিয়ে গেল, তার রক্ত মাথায় চড়ে গেল এবং চোখে সে অন্ধকার দেখতে থাকল। সে রোজালিয়ার ওপর লাফিয়ে পড়ল এবং তার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল। বালিকা তারস্বরে চীৎকার করতে করতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন পথচারী এসে তাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল।

লা কাসিরা চীৎকার করে বলল, "তুমি যদি কিউরিটোকে ছেড়ে না দাও, আমি তোমায় খুন করব।"

"তুমি কি ভাবছ আমি ভয় পেয়েছি? পার যদি তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখ। হায় নির্ব্বোধ, দেখতে পাচ্ছ না যে, সে তার নিজের চোখের চেয়েও আমায় বেশী ভালবাসে?"

"আচ্ছা ঢের হয়েছে; এখন যাও," "রোজালিয়া, ওর কথার জবাব দিও না।"

শিকার সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত বন্য জন্তুর মত লা কাসিরা রাগে গর্জ্জন ক'রে উঠল এবং ছুটে রাস্তার দিকে বেরিয়ে গেল।

সেই নাচের পর থেকেই রোজালিয়ার প্রতি কিউরেটো পাগলের মত প্রেমাসক্ত হয়েছে এবং তারপর সব দিনই সে তার গোলাপী ঠোঁট দুটীর কথা ভেবেছে; তার চোখের দীপ্তি তার অন্তরকে আলোকিত ক'রে তাকে সম্মোহিত করেছে। সে দুর্দ্দান্তভাবে তাকে বাসনা করেছে। রাত্রি হবার পর সে ম্যাকারেনার দিকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। যতক্ষণ না তাকে প্রাঙ্গণে দেখতে পেল ততক্ষণ অন্ধকারে বাইরের চাঁদনীতে অপেক্ষা করতে থাকল। বিপরীত দিকে তার মায়ের ঘরে একটিমাত্র বাতি জ্বলছে দেখা গেল।

সে নীচুগলায় ডাকল "রোজালিয়া।"

বিস্ময়ে চীৎকার দমন ক'রে সে ফিরে তাকাল।

তার কাছাকাছি এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আজ কি মনে করে এখানে এসেছ?"

"তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারছি না।"

"কেন?" সে হাসল।

"কেননা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তুমি জান যে, আজ সকালে তোমার মা আমাকে একরকম মেরেই ফেলেছিল?" তারপর আন্দালুসিয়াদের স্বভাব-অনুযায়ী যথোচিত অলঙ্কারে সাজিয়ে সে সেই ঘটনার বর্ণনা করল, কেবল যে-বিদ্রূপের কথাটি লা-কাসিয়ার ক্রোধকে অসহনীয় ক'রে তুলেছিল সেটুকু বাদ দিয়ে গেল।

"ওর স্বভাব শয়তানের মত হয়েছে," কিউরিটো বলল; এবং তারপর সগর্বে বলল, "আমি তাকে জানিয়ে দেব যে, তুমি আমার প্রণয়িনী।"

রোজালিয়া স্নেহের সঙ্গে বলল, "তা হলে তো সে খুসীই হবে।"

"কাল কি তুমি কটকের সামনে আসবে?"

"বোধ হয় আসব," সে জবাব দিল।

সে মৃদু হাসি হাসল, কেননা ওর গলার স্বর থেকেই সে বুঝতে পারল যে ও কাল আসবেই। বাড়ী ফেরার পথে সে অতিরিক্ত আস্ফালন করতে থাকল। পরদিন যখন সে এসে উপস্থিত হল তখন সে দেখল যে, রোজালিয়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে এবং সেভিলনগরের প্রেমিকদের মত তারাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোহার কটকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটানা কথা বলে গেল এবং একথা কিউরিটোর মনে কখনও উদয় হলনা যে, এটা একটা অনাবশ্যক প্রতিবন্ধ। রোজালিয়া তাকে ভালবাসে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে সামন্ত প্রণয়মূলক দীর্ঘশ্বাসে তার উত্তর দিল। পরস্পরের চক্ষে যে-প্রেম অত্যুজ্জ্বলভাবে জ্বলছে তারা তাই দেখতে চেষ্টা করল। তারপর সে প্রত্যেক রাত্রেই আসতে থাকল।

কিন্তু মা তার এই যাতায়াতের কথা জানতে পেরেছে ভেবে ভেবে কিউরিটো পরের রবিবার তার সঙ্গে দেখা করতে গেল না। হতভাগী স্ত্রীলোক বেদনাবিধুর হৃদয়ে অপেক্ষায় বসে রইল। সে প্রায় নতজানু হ'য়ে তার কাছে ক্ষমাভিক্ষার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু তার পরেও যখন সে এল না তখন সে তাকে ঘৃণা করতে থাকল। সে তাকে নিজের পায়ের তলায় মরে প'ড়ে থাকা দেখতেও রাজী হল। যখন সে ভাবল যে, এক সপ্তাহ না কাটলে তার সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই তখন তার হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু তবুও সে এল না। এটা আর সে সহ্য করতে পারল না।

কি যন্ত্রণা, নিদারুণ যন্ত্রণা! সে তাকে এত ভালবাসে যা তার কোন প্রেমাস্পদই পারবে না। সে মনে মনে বলল যে, এ সব রোজালিয়ারই কাজ এবং তার কথা ভাবতে গিয়ে রাগে তার অন্তর ভরে গেল। অবশেষে কিউরিটো সাহস সঞ্চয় ক'রে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল; কিন্তু তাকে (মাকে) অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। মনে হল যেন তার স্নেহ মরে গেছে যখন সে তার মাকে চুম্বন করতে গেল তখন সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

"কেন তুমি এতদিন আস নি?"

"তুমি আমার ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি ভাবলাম তুমি আমাকে চাও না।"

"এই কি একমাত্র যুক্তি? আর কি অন্য কারণ নেই?"

কাঁধ নেড়ে সে বলল, "আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।"

"ব্যস্ত? তোমার মত একজন ভবঘুরে। কি কাজ করছিলে? রোজালিয়ার সঙ্গে দেখা করবার সময় তো ব্যস্ত হ'তে না?"

"তুমি তাকে মেরেছিলে কেন?"

"কেমন ক'রে জানলে আমি তাকে মেরেছিলাম? তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

লা কাসিয়া তার ছেলের কাছাকাছি এগিয়ে এল; তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, "সে আমায় খুনী বলেছে।"

"বেশ, তাতে হয়েছে কি?"

"কি হয়েছে?" সে এমন তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল যে, প্রাঙ্গণের সকলেই তার কথা শুনতে পেল।

"আর আমি যদি খুন করেই থাকি সে তো তোমার জন্যেই করেছি। হাঁ, আমি পীপী শাস্তিকে খুন করেছি;

কিন্তু তার কারণ এই যে সে তোমায় মারত। তোমার জন্যেই আমায় সাত বছর জেল খাটতে হয়েছে—পুরো সাতটি বছর। ধিক্ মূর্খ, মনে করেছ সে তোমার জন্যে ভাবে এবং প্রত্যহ রাত্রে ফটকের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়।"

"আমি জানি।" দন্ত বিকশিত ক'রে কিউরিটো জবাব দিল।

লা কাসিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। সে তার দিকে একটা হতবুদ্ধিভরা দৃষ্টি হানল এবং তারপর তার চমক ভাঙল। অব্যক্ত একটা যন্ত্রনায় ও রাগে সে হাঁপাতে থাকল; বুকটাকে সে চেপে ধরল—যেন এই যন্ত্রণা সহ্য করা তার সাধ্যাতীত।

"তুমি রোজই রাত্রে সদর দরজায় এসেছ অথচ আমার সঙ্গে দেখা করনি? উঃ কি নিষ্ঠুর! আমি তোমার জন্যে দুনিয়ার সব কিছুই ক'রেছি। তুমি কি মনে কর আমি পাপী শান্তিকে ভালবাসতাম? আমি তার ঘুসি সহ্য করতাম যাতে তোমার মুখে রুটি তুলে দিতে পারি; তাই যখন দেখলাম যে, সে তোমায় পর্যন্ত মারতে সুরু করেছে তখনই তাকে খুন করলাম। হায় ভগবান, আমি তোমার মুখ চেয়েই বেঁচে আছি। তোমার চিন্তা না থাকলে আমি সাত বছর জেল খাটার চেয়ে মৃত্যুই বরণ করতাম।"

"শান্ত হও বাছা, একটু বিবেচনা কর। আমার বয়স কুড়ি হয়েছে। তুমি আর বেশী কি আশা করতে পার? রোজালিয়া যদি আজ না থাকত তা' হ'লে অন্য কেউ থাকতই।"

"চুপ কর জানোয়ার, আমি তোকে ঘেন্না করি। আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা।"

সে সদর্পে প্রাঙ্গণে নেমে গেল এবং ফটক পার হ'য়ে পেছন থেকেই ভেজিয়ে দিল। লা কাসিয়া তার ছোট ঘরে ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকল। সময় ধীরে ধীরে বয়ে চলল। অনেক রাত অবধি সে জানালায় বসে বসে লম্ফনোদ্যত একটা বন্য জন্তুর মত স্থির ও ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আশপাশের সব কিছু লক্ষ্য করতে থাকল। মাংসপেশীর আক্ষেপের দরুণ যে অস্থিরতা তার হৃদয়তন্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করছিল তাকে দমন করতে সে দাঁড়িয়ে উঠল। ফটকের কাছাকাছি একটা হাততালির আওয়াজ শোনা গেল, যা' বাইরে কারও উপস্থিতিরই ইঙ্গিত করছে এবং সে হাঁপাতে হাঁপাতে সামনের দিকে উঁকি মারল, তার অগ্নিবর্ষী চক্ষু প্রায় কপালে উঠে গেছে। লোকটি সেই রাজমিস্ত্রী। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে সে দেখল যে রোজালিয়ার মা পাইলার এসে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরের দিকে চলল। লা কাসিয়া তার শ্বাস-প্রশ্বাসের অসহ্য কষ্ট নিবারণ করার জন্যে নিজের গলাটা চেপে ধরল। তবুও সে অপেক্ষা করতে ছাড়ল না। মাঝে মাঝে তার সমস্ত দেহ থেকে একটা কাঁপুনি খেলে গেল। অবশেষে ফটকে একটা হাল্কা হাতের তালির শব্দ শোনা গেল এবং ওপর থেকে একজন বলে উঠল: "কে ওখানে?"

"চুপ কর।"

লা কাসিয়া রোজালিয়ার কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। জয়ের একটা অপূর্ব উল্লাসে সে মুখ ব্যাদান করল। ওপর থেকে দরজা খুলে গেল এবং রোজালিয়া ভেতরে ঢুকে সহজ শান্ত পদক্ষেপে প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে এল। তার প্রত্যেকটি গতিভঙ্গীতে জীবনের উচ্ছলতা আছে। যেমন সে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছে সেই সময় লা কাসিয়া সামনে লাফিয়ে প'ড়ে তার পথরোধ করল। সে তার একটা হাত এমনভাবে চেপে ধরল যে, মেয়েটি নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

"তোমার মতলব কি?" রোজালিয়া বলল, "আমাকে যেতে দাও।"

"আমার ছেলের সঙ্গে কি করছিলে?"

"আমায় যেতে দাও, নইলে আমি কেটে বেরিয়ে যাব।"

"এ কথা কি সত্যি যে রোজ রাত্রে ফটকের সামনে তোমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়?"

রোজালিয়া তারস্বরে চীৎকার করতে থাকল; "মা রক্ষা কর। এন্টোনিও!"

"জবাব দাও।"

"সত্যি যদি জানতে চাও, তবে শোন। সে আমায়

বিয়ে করবে। সে আমায় ভাল বাসে এবং আমি—আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।”

তার দুর্বৃত্ত মুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সে লা কাসিরার দিকে ফিরল।

তুমি কি ভাব যে তুমি আমাদের বাধা দিতে পারবে? তুমি কি মনে কর সে তোমায় ভয় করবে? সে আমায় বলেছে যে, সে তোমায় ঘৃণা করে। সে এ-ও বলে যে তুমি জেল থেকে ছাড়া না পেলেই ভাল ছিল।”

“এ কথা সে তোমায় বলেছে?”

লা কাসিরা এক পা পিছিয়ে গেল। রোজালিয়াও সুযোগ বুঝে আরম্ভ করল। হাঁ, সে আমাকে এ কথা বলেছে, সে আরও অনেক কিছু বলেছে। সে বলেছে যে, তুমি পীপী শান্তিকে খুন করেছ, তুমি সাত বছর জেল খেটেছ, আর সে বলে যে, তুমি মারা গেলেই ভাল হয়।”

রোজালিয়া সাপের বিষ উদ্গীরণের মত কথাগুলো বলল এবং যখন দেখল যে, হতভাগী স্ত্রীলোকটি যেন প্রবল বাতাসের বেগে পিছিয়ে পড়ছে, তখন সে একটা বিকট হাসি হাসল। “তা ছাড়া, তোমার গর্ব্ব হওয়া উচিত এই জন্যে যে, আমি একজন খুনীর ছেলেকেও বিয়ে করতে অমত করছি না।”

তার পর লা কাসিরাকে একটা ঠেলা দিয়া সে সিঁড়ির ওপর উঠিল, কিন্তু তার এই নড়ন-চলন দারুণ বিদ্রূপে স্তম্ভিত স্ত্রীলোকটিকে পুনরুদ্দীপিত করে তুলল এবং সে পাশবিক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চীৎকার করতে করতে রোজালিয়ার ওপর লাফিয়ে পড়ল এবং তার ঘাড় ধরে টানতে টানতে নীচে নামিয়ে আনল। রোজালিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখের ওপর একটা ঘুঁসি লাগিয়ে দিল। তখন লা কাসিরা তার বুকের ভেতর থেকে একটা ছুরি বার করল এবং একটা শপথ নিয়ে মেয়েটির গলায় বসিয়ে দিল। রোজালিয়া থর থর করে কাঁপতে থাকল।”

“মা, ও আমায় খুন করছে;”

সে সিড়ির নীচে পড়ে গেল এবং জড় পুঁটুলি পাকিয়ে পাথরের ওপর লটকে পড়ল। মাটির ওপর রক্তের একটা ছোট দীঘি তৈরী হয়ে গেল।

সেই আর্ত্ত চীৎকারে ছ'সাতটা দরজা একসঙ্গে খুলে গেল এবং লোকেরা লা কাসিরাকে ধরবার জন্যে ছুটে এসে পড়ল, সে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে এমন একটা হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে, কেউ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না। কিন্তু এই ইতস্ততঃ ভাব ক্ষণিকের জন্যেই রইল, এবং পাইলার যখন কাঁপতে কাঁপতে বারান্দা থেকে নীচে নেমে এল তখন সকলের দৃষ্টিই বারেকের জন্য বিভ্রান্ত হল। সুযোগ দেখে লা কাসিরা সামনের দিকে ছুট দিল। সোজা ঘরের ভেতর গিয়ে সে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল।

হঠাৎ সমস্ত প্রাঙ্গণ লোকে ভরে গেল। ভয়ার্ত্ত চীৎকারে পাইলার তার মেয়ের ওপর ঢলে পড়ল এবং তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে দিল না। কেউ ডাক্তার ডাকতে ছুটল আর কেউ পুলিশের খোঁজে গেল। রাস্তা থেকে জনতা দরজার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। কালো ব্যাগ হাতে তাড়াতাড়ি ডাক্তার এসে হাজির হল। পুলিশ এলে তৎক্ষণাৎ দশ বারজন লোক উত্তেজিত হয়ে ঘটনার বিবরণ দিল। তারা লা কাসিরার ঘরের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল এবং পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকল। একটা ধস্তাধস্তির পর তারা লা কাসিরাকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে এল। জনতা এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পুলিশ তাকে ঘিরে রাখল এবং হাতের রুল দিয়ে লোকদের ঠেলে হটিয়ে দিল, কিন্তু তারা ঘুসি উঁচিয়ে তাকে অভিশাপ দিতে থাকল। সে অবজ্ঞা ভরে তাদের দিকে তাকাল। কোনও রকম জবাবদিহি করা প্রয়োজনই মনে করল না। তার চোখগুলো জয়োল্লাসে দীপ্ত। পুলিশ তাকে প্রাঙ্গণের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেল এবং লোকেরা রোজালিয়ার মৃতদেহের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

“ও কি মারা গেছে?” লা কাসিরা জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, “হাঁ”।

সে বলল “ভগবানকে ধন্যবাদ।”

পুরাতন দিল্লী

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ ভারতের—স্বাধীন ভারতের রাজধানী ; নয়াদিল্লী,– হিন্দু, তুরক, (তুর্কী) পাঠান ও মোগল আমলের মহাভারতের, মহানগরী পুরাতন দিল্লী নয়া দিল্লীর গঠনে পারিপাট্য আছে, স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় আছে, কিন্তু পুরাতন দিল্লীর মত বিরাট ঐতিহ্য, বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন কালের, সম্রাট ও সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি-চিহ্নের পরিচয় এবং কীর্ত্তি-গৌরব নেই। নয়াদিল্লীর ইতিহাস দুশ বছরের ইতিহাস—পুরাতন দিল্লীর ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের সমগ্র উত্থান এবং পতনের ইতিহাস। এখানে ভারত ইতিহাসের প্রতিটী যুগের কীর্ত্তি-চিহ্ন আজ কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট, কতক ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। পুরাতন দিল্লী ঠিক যেন প্রাচীন জমীদার বংশের সাতমহল বাড়ী—আজ তার অনেক সৌন্দর্য্য কালের করাল আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এলেও অট্টালিকার অনেক মহল ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠলেও—এক দৃষ্টিতেই অট্টালিকার অতীত সৌন্দর্য্যের বিরাটত্বের আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষে পরিপূর্ণ গগনচুম্বী অট্টালিকাও সেই ধ্বংসোন্মুখ সাতমহলা প্রাসাদ অপেক্ষা বিরাটত্বে এবং নয়া দিল্লী সুশ্রী হলেও, বিগত যুগের পাকা সোনার উপর হীরামতির কাজ করা কঙ্কনের তুল্য পুরাতন দিল্লীর মত সুন্দর ও মর্য্যাদা সম্পন্ন নয়। ঠিক এই কারণেই নূতনদিল্লী আভিজাত্যে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়। নয়াদিল্লী ও পুরাতন দিল্লীর প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাই বলা যায়।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ
গুপ্ত তুগল দ্বিতীয়
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

নয়াদিল্লীর আধুনিকতায় ভরা নগরনির্ম্মাণ-রীতি প্রশংসার যোগ্য হলেও, পুরাতন দিল্লীর আভিজাত্য তাতে নেই। হাল ফেশানের নক্সাকাটা চুড়ীর মত পরিভ্রমণ একদিনেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু পুরাতন দিল্লী প্রতিদিনই অতীত কীর্ত্তির বিরাট সৌন্দর্য্যসম্ভার নিয়ে নয়নে বিস্ময় সৃষ্টি করে। কাঁটা ঝোপঝাড়, পাথরের স্তূপ, ভগ্নপ্রায় সমাধি, বিরাট প্রান্তরের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তাই পুরাতন দিল্লীর উপর—অতীত ইতিহাসের সমাধির উপর, সাধারণ ভ্রমণকারী কিম্বা ঐতিহাসিক উভয়েরই নিবিড় বিস্ময়াবিষ্ট পথচলা যেন শেষ হতে চায় না। পথের প্রতি বাঁক বাঁকেই হারানো দিনের স্মৃতির ছবি, ভগ্নপ্রায় কীর্ত্তির মধ্যদিয়ে যেন চোখে উপর ভেসে উঠে।

কথায় বলে 'দিল্লী-লাহোর'। সত্যিই তাই! কলকাতা থেকে দিল্লীর দূরত্ব অনেক। রেল-পথে প্রায় দেড়দিনের সময় লাগে। কলকাতা থেকে একটানা 'দিল্লী' আসা দেহ ও মনের উপর অপরিসীম নির্য্যাতন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'দিল্লী' দেখবার স্বপ্নে ও কল্পনায় উল্লাসিত হয়ে এই পথশ্রম ও ক্লান্তিকে পরিহার করবার চেষ্টা করতে করতে যখন 'দিল্লীর প্রায় নিকটে এসে উপস্থিত হলাম, তখন আশায় ও আনন্দে মন ভরে উঠল। দীর্ঘ দেড়দিনের পথশ্রম এবং শারীরিক ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে জানলা দিয়ে বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম।

গাড়ী 'গাজিয়াবাদ' ছেড়ে 'দিল্লীর' সমীপবর্ত্তী হচ্ছে। দূরে ধূ ধূ করছে বিরাট প্রান্তর, আর ধ্বংসাবশেষ। হিন্দু, তুর্কী ও মোগল আমালের কীর্ত্তিগৌরব কালের করাল আঘাতে নিঃশব্দে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধরণীর ধূলিতে বিলীন হতে চলেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলাম—মানুষের জীবনের মত মানুষের কীর্ত্তি ও গৌরব একই পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। কাল-স্রোতে জীবন-যৌবন ধন-মান সবই কোথায় কোন সুদূরে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। একদিন যেখানে ছিল পাণ্ডবের 'ইন্দ্রপ্রস্থ' সেখানে আজ বিরাট প্রান্তর ধূ ধূ করছে, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপের উপর প্রখর সূর্য্যালোকে যেন অগ্নি বর্ষণকরছে।

ঘড়ঘড় করে ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ী চলে গেল। নিচে শুষ্ক খাতে নীল জলরেখা! বদ্ধ জল, স্রোত নেই, প্রবাহ নেই। বিরাট চড়া ক্রমশঃ উচুঁ হয়ে উঠেছে এবং সেখানে স্থানে স্থানে উঠেছে বড় বড় গাছ,—সেই গাছের ছায়ায় কুটীর তৈরী করে চাষী মজুরেরা ঘর বেঁধেছে। দূরে, অনেক দূরে, সর্পিল গতিতে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে নীল জলরেখা। নদী নাকি এটা? এই সকীর্ণ, কুণ্ঠিত বদ্ধ জলরেখাকে কি নদী বলে অভিহিত করা চলে?

হ্যাঁ, নদীই এটা। শুধু নদী নয়, ইনিই সেই যমুনা নদী? ঊর্ম্মিমুখরা, খরপ্রবাহিতা, নীলাম্বরা ইনিই সেই যমুনা—এঁরই কূলে কূলে একদিন বেজেছিল ব্রজের বাঁশরী,—এঁরই বুকের উপর একদিন ফুলদলে সজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসিয়ে, জলবিহার করেছেন সম্রাট, সুলতান ও বাদসাহেরা! আজ সেই যমুনায় বোধ হয় হাঁটুভোর জলও নেই! বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, এই কি সেই যমুনা নদী? অনেকদিন পূর্ব্বের শোনা একটা গান মনে পড়ল:—

—"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী—?"

সত্যিই তাই। এই কি সেই যমুনা? দিল্লীর গরিমা অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যমুনাও, দিল্লীর আশে পাশে প্রায় মজে এসেছে। একই পরিণতিতে অগ্রসর হচ্ছে কীর্ত্তি ও পৃথিবী।

যমুনার ধারেই সম্রাট শাজাহান-নির্ম্মিত লাল কেল্লা। লোহিতবর্ণ জয়পুরী পাথরের তৈরী লালকেল্লার মধ্যে বাদশাহদের হারেম, দরবার-কক্ষ এবং সৈন্যাবাস ছিল। মুঘলদের পরাজিত করে ইংরাজ ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করবার পর লালকেল্লায় ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্যদের ব্যারাক হয়। আজ অবশ্য লালকেল্লায় বৃটীশ ফৌজ নেই। দুশ' বছরের কর্ত্তৃত্ব করবার পর ভাগ্যচক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে ইংরাজ ভারত ছেড়ে গেছে। ১৫ই আগষ্টের স্মরণীয় দিনে লালকেল্লার উপর উড্ডীয়মান 'ইউনিয়ান জ্যাক্' পতাকা নামিয়ে দিয়ে নবভারতের আশা ও উদ্দীপনার প্রতীক অশোকচক্র-শোভিত জাতীয় পতাকা পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু উত্তোলন করেন। দুশ' বছরের একটানা বিদেশী শাসনের পর, ভারতে জাতীয় শাসনের নবযুগের সূচনা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের (ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের) পর শেষ মুঘল সম্রাট্ বাহাদুর শাহকে ইংরেজ তাঁর পিতৃপুরুষের এই দুর্গের মধ্যেই বন্দী করেন,—স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ (বিদ্রোহ) করার অপরাধে এই লালকেল্লার মধ্যেই তাঁর বিচারের প্রহসনের শেষ হয়। একদিন যে মুঘল সম্রাটদের দরবারে, বাংলাদেশে বাণিজ্য ও কুঠী তৈরী করবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য, ইংরাজ-বণিকদের বাদশাহের সম্মুখে দিনের পর দিন নতজানু হয়ে আবেদন করতে হত—সেই বংশের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহকে ইংরাজ তাঁর নিজ গৃহে বন্দী করে,—বিচার করে, এবং বর্ম্মায় নির্ব্বাসিত করে। সত্যই ভাগ্যচক্রের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। ইংরাজের ভাগ্যেও এই পরিবর্ত্তন লেখা দিল

দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ
(অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত রাজপুত চিত্র)

প্রায় দুশ' বছর পরে। ইংরাজকে আজ ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হল। আবার লালকেল্লার উপর বায়ুস্তরে মৃদু মন্দ আন্দোলিত হতে লাগল, ভারতের জাতীয় পতাকা।

লালকেল্লার পূর্ব্বদিকে আজ যমুনা সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবাহিতা। ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যমুনা খরস্রোতে এই লালকেল্লার কোল ঘেঁসে খরতর বেগে প্রবাহিত ছিল। কেল্লার চারপাশে বিরাট খাতের সঙ্গে সংযোগ ছিল যমুনার জলপ্রবাহের। জলপূর্ণ সেই খাত অতিক্রম এবং দুর্গের উপর অবস্থিত কামানের গোলা সহ্য করে, কোন শত্রুর দুর্গে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। মুঘল বাদশাহদের শৌর্য্য ও বীর্যের হীনাবস্থায়, অবশ্য নাদির শাহ (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ) এবং আহম্মদ শাহ দুররানী, (আবদালী) দিল্লী আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করেন। হীন-বল বাদশাহ মুহম্মদ শাহ এই অভিযানকারীদের বাধা দিতে পারেন নি। নাদির শাহ সমগ্র দিল্লী সহর লুণ্ঠন করেন এবং নির্ম্মমভাবে কয়েক লক্ষ অধিবাসীর প্রাণ বধ করেন। লালকেল্লার কোষাগার লুণ্ঠন ক'রে তিনি বহু ধন-রত্ন সাজাহানের অপরূপ 'ময়ূর সিংহাসন' কোহিনুর

শাহজাহানের জাম-ই মসজিদ (দিল্লী)

হীরক প্রভৃতি নিয়ে পারস্যে ফিরে যান। লালকেল্লায় আজও নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ অবদালীর কামানের আঘাত-চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

সাজাহান-নির্ম্মিত লালকেল্লায় 'দেওয়ানী আম' ও 'দেওয়ানী খাস' সভাগৃহ কারুকার্য্য এবং স্থাপত্য-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। মুঘলযুগের স্থাপত্য-কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় এর মধ্যে বর্ত্তমান। দুর্গের মধ্যে বাদশাহদের বাসকক্ষ ও স্নানাগার দ্রষ্টব্য বস্তু। বাদশাহদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র মুঘলযুগের অনেক কারু-কার্য্য সমন্বিত তৈজস-পত্রাদি, অনেক সুন্দর চিত্র, কেল্লার মধ্যে মিউজিয়াম কক্ষে সাজান আছে। মুগলযুগের চিত্রকলার অনেক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বাদশাহদের প্রতিকৃতিতে বর্ত্তমান।

লালকেল্লার চার কোণে চারটী গেট। বিরাটত্বে এবং দৃঢ়তায় গেটগুলি সত্যই চেয়ে দেখবার মত। পূর্ব্বকালে দুর্গজয়ের প্রকালে দুর্গপ্রবেশের সময়, হাতী দিয়ে চার্জ্জ করে যে দুর্গের দরজা ভাঙতে হত তা লালকেল্লার গেটগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। লোহার বিরাট চাদর এবং তার উপর গজাল বসানো সেই গেট, কামানের মুহুর্মুহুঃ আঘাত কিংবা দলবদ্ধ হস্তিযূথ দিয়ে চার্জ্জ করে ভাঙা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। দুর্গের প্রাকার মাটী থেকে অনেক উচ্চ এবং তার উপর বন্দুক ও কামান বসাবার জন্য খাঁজ করা আছে। দুর্গপ্রাকারের উপর পূর্ব্বকালে প্রহরীরা যে উন্মুক্ত কৃপাণ ও বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত, তা সহজেই বোঝা যায়। প্রাকারের উপর মাঝে মাঝে গম্বুজ আছে—সেখান থেকে সম্রাটদের বাহিরে যাওয়া, ভিতরে আসা এবং অন্যান্য কারণে তূর্য্যধ্বনি করা হত।

লালকেল্লার সম্মুখে বিরাট মাঠ। পুরাতন দিল্লীর এস্প্লানেড। সেই মাঠের সুদূর কোণ থেকে দৃষ্টিপাত করলে লালকেল্লাকে বিরাট প্রহরীর মত অবিচলভাবে দণ্ডায়মান বলে মনে হয়।

লালকেল্লা থেকে সম্মুখে কিছু দূরেই দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদ। ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মুস্লিম ভজনালয়। জুম্মা মসজিদের চেয়ে আকারে, গঠনে এবং উচ্চতায় বাংলাদেশের পাণ্ডুয়ায় (গৌড়) "আদিনা মসজিদ" অবশ্য এক সময় যে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু "আদিনা মসজিদ" এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। বাংলার সোনার যুগে গৌড়েশ্বর সিকান্দার সাহ (১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ) এই আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। আজ ৭০০ বছরের

কালের করাল আঘাত সহ্য করে এবং সংস্কারের অভাবে সেই "আদিনা মসজিদ" প্রায় ধ্বংসোন্মুখ।

লালকেল্লার মত "জুম্মা মসজিদ" নির্ম্মাণও শিল্প-সাধক শাজাহানের অপর কীর্ত্তি। লাল পাথরে তৈরী এবং শ্বেত গম্বুজ-বিশিষ্ট জুম্মামসজিদ, সত্যই সৌন্দর্য্যে এবং আকারে বিরাট। স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে মুস্লিম স্থাপত্য-শিল্পের বিশিষ্ট পদ্ধতির পরিচয় এই মসজিদে বর্ত্তমান। শোনা যায় যে, মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কাবা মসজিদের চেয়ে জুম্মা মসজিদ উচ্চতায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি ক্ষুদ্র। পাশ থেকে দেখলে অপরিচিত দর্শকের মনে হবে যে,এটাও বোধ হয় একটা দুর্গ। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে জুম্মার প্রাকারের কাছে এসে, উচ্চতায় এবং বিরাটত্বে আমারও মনে হয়েছিল যে, এটাও বোধ হয় কোন দুর্গ। পরে যখন কাছে এলাম এবং শুনলাম এই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদ, তখন মনে হয়েছিলো—হ্যাঁ, প্রসিদ্ধ হবার যোগ্য মসজিদই বটে। "জুম্মা মসজিদে"র মধ্যে নাকি এক সঙ্গে লক্ষ লোকের উপযোগী নামাজ পড়বার স্থান আছে। বাহির থেকে দেখে মনে হয়, কথাটা সত্য। মাটী থেকে উপরে উঠবার জন্য লম্বা সিঁড়ি আছে এবং তার উপরে বিরাট আর্চ্চ (খিলান) সমন্বিত প্রবেশপথ। মাটী থেকে সেই প্রবেশ-চত্বর অন্ততঃ ৫।৬ তালা উচ্চ বলে মনে হলো। মুঘল যুগের স্থাপত্য-কলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পয়েন্টেড আর্চ্চ—অর্থাৎ দুধার ঈষৎ বৃত্তাকার ও উপরকার অংশ সূক্ষ্মাগ্র। যেন দুটী অর্দ্ধবৃত্ত ঈষৎ হেলান অবস্থায় উপরের একটী বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। জুম্মা মসজিদের তোরণ-দ্বার এই স্থাপত্য-কলার এমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন যে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হয়।

জুম্মার অনতিদূরে দিল্লীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাঁদনী-চক। বাদশাহী আমলে এই চক বা বাজার সারাক্ষণই কলকোলাহল-মুখরিত থাকত। আনন্দে, কোলাহলে, পণ্য-দ্রব্যের পারিপাট্যের, রঙ তামাসার প্রাচুর্য্যে, নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত এই চাঁদনী চক। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে বসত চাঁদের হাট—রঙমহলের বাঁদীরা, দিল্লীর সুরসিকা বিলাসিনীর দল,মধুমত্ত আমীর ওমরাহ প্রভৃতিরা এখানে সওদা করতেন,—আতর গোলাপ ও আতসবাজিতে সুরভিত হয়ে ও উজ্জল হয়ে উঠত চাঁদনী চক্। সুন্দরীদের নূপুর-নিক্কণে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে, এখানে যেন আনন্দের বান ডেকে উঠত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বিগত দিনের এই বিখ্যাত চাঁদনী চকের ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ-প্রবাহের চমৎকার বর্ণনা আছে।

সম্রাট শা-জাহান নির্ম্মিত লাল কেল্লা

বর্ত্তমানের চাঁদনী চক অবশ্য পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিবাহক বড় বাজার মাত্র—এখানে এখন ব্যবসা চলে পুরোমাত্রায়, কিন্তু বাদশাহী যুগের সেই শোভা ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত আনন্দপ্রবাহের অস্তিত্ব নেই। যুগ বদলে গেছে—মানুষের মন থেকে রঙ দেওয়ার ও রঙ নেওয়ার নেশা কঠোর জীবন-স্বপ্নের তাগিদে আজ অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত। তাই আজ 'রঙমহালও' নেই,—চাঁদনী চকে সারেঙ্গীর সুরে গজল গান ও দ্রুত তালে মনোহর নৃত্য-ছন্দের স্থানে, এখন পূর্ণোদ্যমে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়বিক্রয় চলেছে। তার মধ্যে সে সুর, সেই জীবন-প্রবাহ নেই—নেই আতর গোলাপ ও আতসবাজির মধ্যে "দরিয়া বিবির" আনন্দ-মধুর নৃত্যছন্দঃ।

বর্ত্তমানের পুরাতন দিল্লী—মুঘল আমলের দিল্লী। বাদশাহ সাজাহান রাজধানী স্থাপিত করেন এই দিল্লীতে এবং এই দিল্লীর অধিকাংশই তাঁর দ্বারা নির্ম্মিত। পূর্ব্বতন মুঘল সম্রাটদের রাজধানী ছিল আগ্রায়।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে (ফতেপুর সিক্রী) সংগ্রাম সিংহ ও পাণিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ক'রে বাবর দিল্লীতে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তা মুঘল রাজবংশ। বাবর তুর্কী তৈমুর-

লঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হলেও, মাতার দিক থেকে তিনি মুঘল "চেঙ্গিজ খাঁর" সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন ব'লে তাঁর বংশের নাম মুঘল বংশ। বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে রাজ্যসীমা প্রায় গোয়ালিয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। বাবরের রাজধানী ছিল আগ্রায় এবং কথিত আছে বাবরের সময় থেকে আগ্রা নগরীর সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত বাবরের পুত্র বাদশাহ হুমায়ুনের নিকট থেকে শের সাহ দিল্লী হস্তগত করেন। যমুনার তীরে বর্ত্তমান "দিল্লী সাহদারা" দুর্গ শের সাহ নির্ম্মিত করেন। শের সাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু সিংহাসনে বসবার অনতিকাল পরেই, বর্ত্তমানের 'পুরাণ কেল্লা' দুর্গের এক সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, মারা যান। হুমায়ুনের পর আকবর আগ্রায় রাজধানী স্থাপিত করেন এবং আগ্রা নগরীর বর্ত্তমান সমৃদ্ধি প্রধানতঃ আকবরের দ্বারাই সাধিত হয়। আকবরের পর জাহাঙ্গীর আগ্রাতেই রাজধানী স্থাপিত করেন। জাহাঙ্গীরের পর শাজাহান ও ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত করেন। বর্ত্তমান পুরাতন দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির (হুমায়ুনস্ টুম্ব) আকবরের নির্ম্মিত। মুঘল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই হুমায়ুনস্ টুম্বে বর্ত্তমান। সিপাহী বিদ্রোহের পর বাহাদুর শাহ দিল্লী-দুর্গ হতে পলায়ন ক'রে এই সমাধি-মন্দিরে আত্মগোপন করেন। এখানে এক মুসলমান ফকির তাঁকে আশ্রয় দেন। অবশেষে সেই ফকিরই অর্থের লোভে মুঘল বংশের শেষ সম্রাট হতভাগ্য বাহাদুর শাহকে ক্যাপ্টেন হাড্‌সনের হাতে সমর্পন করেন। বন্দী সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লী দুর্গে নিয়ে আসেন হাডসন্। পরদিন হুমায়ুনস টুম্বেই বাহাদুর শাহের দুই পুত্র আত্মসমর্পণ করেন। কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে।

দিল্লী গেটের কাছে সম্রাট্-পুত্রদের নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন হাডসন নিজের হতে তাঁদের গুলি করেন। দিল্লীর পথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে হতভাগ্য সম্রাট্-পুত্রদের রক্তধারায়। সম্রাট-পুত্রদের মৃতদেহ চাঁদনী চকে তিন দিন উন্মুক্তভাবে প্রদর্শনীর জন্য ফেলে রেখে দেওয়া হয়। সম্রাট-পুত্রদের মৃতদেহের দিকে ফিরে শিউরে ওঠে নাগরিক বৃন্দ—হতভাগ্য রাজপুত্রদের জন্য সমবেদনার অশ্রু অবাধে গাল বেয়ে ঝরে পড়ে। মুঘল বংশের শেষ শক্তির অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতার সূর্য্যও প্রায় দুইশত বৎসরের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়।

•

পুরাতন দিল্লীর চারপাশেই পূর্ব্বে সুউচ্চ পাথরের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা ছিল। নগরে প্রবেশ করবার জন্য চারদিকে বড় বড় দরওয়াজা (গেট) ছিল। আজ অবশ্য ২১ টী গেটের অস্তিত্ব বজায় আছে। বিরাট পাথরের পাঁচীল ভেঙে বহু স্থানে ইংরাজ অমলে রাস্তা প্রভৃতি বার করা হচ্ছে। স্থানে স্থানে এই বিরাট পাঁচীলের যে অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে তা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কামানের মুহুর্মুহু আঘাত ছাড়া সে পাঁচীল যে কোন ক্রমেই ভাঙা সম্ভবপর ছিল না, তা একদৃষ্টিতেই বোঝা যায়।

দিল্লীতে আমরা যেখানে ছিলাম তার নাম সীতারাম বাজার। কলকাতার বড় বাজারের মত এখানে মাড়োয়ারী, বিহারী ও রাজপুতদের প্রাধান্য অধিক। পুরাতন দিল্লীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রাধান্যের পরিচয় বর্ত্তমান। ব্যবসায়ে এবং অর্থে এদের প্রাধান্য কলকাতার মত দিল্লীতেও প্রায় ধমান। ফতেপুর, পাহাড়গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মুসলমান। দিল্লীতে মুস্লিম ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। প্রায় দুদিন-ব্যাপী পুরাতন দিল্লীতে অবস্থানের মধ্যে আমরা কোন বাঙালীকে দেখবার সুযোগ পাইনি। 'দিল্লীতে' বাঙালী যাঁরা আছেন তাঁরা অধিকাংশই গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী। নয়াদিল্লীর সরকারী কোয়াটার ব্রিডিং রোডেই শতকরা ৯৮ জন বাঙালীর বাস। পুরাতন দিল্লীতে বাঙালী খুব কমই আছেন বলে আমার বিশ্বাস।

দিল্লীতে পৌছাবার পর দিন বৃহত্তর পুরাতন দিল্লী দেখবার জন্য বেরুন গেল। পুরাতন দিল্লীর 'আজমীর' গেটের কাছ থেকে মেহেরুলী এবং কুতবের বাস পাওয়া যায় শুনে সে দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

'আজমীর গেটের' কাছে পুরাতন দিল্লীর প্রাকারের অনেক অংশ বর্ত্তমান আছে দেখলাম। প্রথম দৃষ্টিতে প্রকার বলে মনে হয় না—মনে হয় বিরাট পাথরের স্তূপ যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'আজমীর গেট' অর্দ্ধবৃত্তাকার বিরাট খিলানের উপর স্থাপিত। দুপাশে পাথরের পাঁচীল—উপরে অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলান মুঘল স্থাপত্যপদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত।

বিমান হইতে পুরাতন দিল্লীর দৃশ্য

পুরাতন দিল্লীর সহর-সীমার মধ্যে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী, টাঙ্গা প্রভৃতি যানবাহন আছে। কিন্তু কোনটিই আরামপ্রদ নয়। ট্রামের অবস্থা দেখলে মনে হয়, কলকাতা ট্রামের 'হাওড়া-শিবপুর' লাইনের ট্রামের চেয়েও পুরাতন দিল্লীর ট্রাম অনেক নিকৃষ্ট। G. N. I. T. (Gwalior North India Transport Co.) কোম্পানীর বাস যদিও সহর ও সহরতলীর সর্ব্বত্র যাতায়াত করে কিন্তু তাতে কেউই নির্ভর করতে পারে না। বাসের ছাড়বার বা আসবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। কখন যে বাস আসবে ও কখন ছাড়বে তা রীতিমত গবেষণার বস্তু। সৌভাগ্য থাকলে ৫ মিনিটের মধ্যেই ২।৩ খানা বাস পাওয়া যায়—আবার ২০।২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করেও বাসের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। আমাদের অবশ্য অত সৌভাগ্য ছিল না, তাই ২০।২৫ মিনিট অপেক্ষা করেও বাস যখন পেলাম না তখন মনে হলো দিল্লীর জনসাধারণ G. N. I. T কোম্পানীর যে নাম দিয়েছে Goes Never in time তা খুবই সার্থক।

কুতবগামী একটী মুসলমান ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় হল। অন্যদিক থেকে বাস ধরবার জন্য তাঁর সঙ্গে আমরা অগ্রসর হলাম। ভারতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাজনিত অবস্থার জন্য আমার অন্যান্য বন্ধুরা একজন মুসলমানের সঙ্গে অগ্রসর হতে রীতিমত সঙ্কুচিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি ও আমার বন্ধু চুনীলাল চ্যাটার্জ্জি নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চললাম। অতীত ইতিহাসের ক্ষেত্র দিল্লীতে ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠার পরিচয় পাবার উত্তেজনা ও আগ্রহে পরিপূর্ণ অন্তর তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতা এবং শঙ্কিত মনোভাবে দূর করে দিয়েছিল অন্তর থেকে।

অবশেষে অনেক কষ্টে একটী Special বাসে করে অগ্রসর হওয়া গেল তুর্কী ও পাঠান আমলের দিল্লীর দিকে।

*

নির্জ্জন, নিস্তব্ধ পথ। দু'পাশে শুধু প্রাচীন অট্টালিকা ও সমাধির ধ্বংসাবশেষ। মনে হয় শ্মশানের উপর দিয়ে চলেছি। কে, কবে এই সব অট্টালিকা, মসজিদ ও সমাধিমন্দির তৈরী করেছিল তার ইতিহাস আজ মাটীর নীচে চাপা পড়ে গেছে। মৃত ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ এই ধ্বংসস্তূপ লোকালয় থেকে বহুদূরে, একান্ত অনাদরে ও অবহেলায় পড়ে আছে। কালের করাল আঘাতে মানুষের কীর্ত্তি নিঃশব্দে ধরণীর ধূলিকণায় মিশে যাচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি চলে খালি ধ্বংসস্তূপ— পাথর আর প্রাচীরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তূপ। হয়ত কবে ইতিহাসের কোন বিস্মৃত যুগে, এখানে ছিল নগর, ছিল প্রাসাদ, ছিল দুর্গ। আজ তা শুধু ভাঙা পাথরের স্তূপে পরিণত হয়ে কালের অমোঘ বিধানের সাক্ষী হয়ে আছে। যে-পথ একদিন অশ্ব-খুরতাড়িত ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত,—মুখর হ'য়ে উঠত অশ্ব-পদ-শব্দে, আজ সে-পথের চারপাশে শুধু ঝিল্লী-রব ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতার মহা অরণ্যকে সচকিত, চমকিত ক'রে বাস ছুটে চলে মেহেরালীর দিকে। যুগ-যুগান্তের ঘুম ভেঙে

ইতিহাসের মৃত আত্মারা চারপাশ থেকে গুঞ্জরণ করে উঠে—"হে পথিক, ক্ষণেক দাঁড়াও। শুনে যাও আমাদের কথা। আমাদের মধ্যে যুগ-যুগান্তরের কথা প্রকাশের ব্যাকুল বেদনায় অস্থির হয়ে আছে।"—

নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, সত্যই অতীত ইতিহাসের এই সমাধি-তীরে বলতে ইচ্ছা হয়,—"কথা কও কথা কও। হে অতীত ইতিহাস, তুমি মুখর হয়ে উঠে প্রকাশ কর, তোমার গোপন কথা। উদ্‌ঘাটন কর সেই রহস্য; যা' হাজার বৎসর ধরে এখানে স্তব্ধ হয়ে আছে। হে অনাদি অতীত, তুমি কথা কও! কথা কও।"

*

অবশেষে কুতবে পৌঁছালাম। দূর থেকে কুতবের শ্রী চোখে পড়তেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল অন্তর। এই সেই কুতব,—এই সেই স্থান; যেখানে রাজত্ব করে ছিলেন দাসরাজবংশীয় তুর্কী সুলতানেরা। ইতিহাসে পড়া সেই কুতবউদ্দীন, আলতামাস, রিজিয়া,—আলাউদ্দীন, মহম্মদ তুঘলক প্রভৃতি একদিন এখানে রাজত্ব করেছিলেন;… স্থাপন করেছিলেন দিল্লীনগরী। বাস থেকে নেমে চারিদিকে তাকালাম। সামনে কুতবমিনার—আশে পাশে পশ্চাতে যত দূর দৃষ্টি যায় খালি ভগ্নস্তূপ। যেখান থেকে প্রায় ৭০০ বছর পূর্ব্বে ভরত ইতিহাসের যে দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়, (মুসলমান আমল) আজ সেখানে জনমানব নেই—নেই লোকালয়। সুলতানদের অধিকাংশ কীর্ত্তিই আজ মাটীর নীচে চাপা পড়ে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও আজ সন্ধান করতে পারেন না কোথায় ছিল মহম্মদের হাজার স্তম্ভের প্রাসাদ? কোথায় বাস করতেন আলাউদ্দিন খিলজী? রিজিয়া বেগম?

কুতবমিনারের সামনে চমৎকার একটী বাংলো আছে। নানা ফুল, লতা-গুল্ম দিয়ে কুতবের সম্মুখভাগে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করা হয়েছে। দিল্লীতে যাঁরা আসেন, অধিকাংশই কুতবমিনার দেখে যান বলে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই বাংলো তৈরী করেছেন। যাত্রীরা যাতে এখানে বিশ্রাম করতে পারে, খাদ্য ও পানীয় পেতে পারে, তার জন্য গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা যে খুবই প্রশংসনীয় এতে কোন সন্দেহই নেই। তবে দুঃখ এই যে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ আশে পাশের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে অতীত ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠাকে উন্মোচন করতে বিশেষ তৎপর নন। কেন না, সে-দিক থেকে কোন প্রচেষ্টাই চোখে পড়ল না। অধিকাংশ স্থানই লতা, গুল্ম এবং কাঁটা ঝোপে এমন আচ্ছন্ন যে, ইচ্ছা থাকলেও সেখানে যাবার কোন রাস্তা নেই।

কুতবমিনারে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই চোখে পড়ে উন্নত-শীর্ষ চারতলা বিরাট মিনার। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এই মিনার আজও উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। পাশ থেকে দেখলে মনে হয়, কুতবমিনার ঈষৎ হেলান অবস্থায় উপরে উঠে গেছে। শোনা যায় ভূমিকম্পে কুতব ঈষৎ হেলে গেছে। কুতবমিনারের গঠন-প্রণালী এবং শিল্পচাতুর্য্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। পণ্ডিতেরা বলেন কুতবমিনারে পুরোপুরিভাবে মুস্লিম স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় না থাকলেও মুস্লিম স্থাপত্যকলার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে ইহা নির্ম্মিত। কুতবে উঠবার জন্যে সিঁড়ি আছে—অবশ্য অনেকেই উপরে উঠতে সাহস করেন না। কুতবমিনারের সর্ব্বোচ্চ তলা থেকে সমগ্র দিল্লী ও তার চারপাশ ছবির মত দেখায়।

ইতিহাস বলে, দাস-রাজ কুতুব উদ্দিন কুতুবমিনারের ভিত্তি স্থাপনা করেন এবং আলতামাস কুতুবমিনারের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। 'কুতব' নামক সাধুর স্মৃতি-রক্ষার্থে এই মিনার নির্ম্মিত হয়। জন-প্রবাদ এই যে, হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ, তাঁর প্রিয়তমা কন্যার যমুনা দর্শনের জন্য এই মিনার নির্ম্মাণ করেন। আমাদের গাইড্ পীর মহম্মদের মুখেও এ কথা শুনলাম। জনপ্রবাদ ও ইতিহাস কার মধ্যে যে প্রকৃত সত্য আছে—তা আজ অবগত হবার কোন উপায় নেই।

কুতবমিনারের ঠিক সম্মুখেই আলাউদ্দিন খিলজী নিজের নামে একটী মিনার স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আকারে সেই মিনারটী কুতবের প্রায় দ্বিগুণ হবে, কিন্তু বিশেষ কারণে শুধু ভিত্তি-চত্বর স্থাপনা করেই মিনার-নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। আজ সেই অসমাপ্ত মিনারের বিরাট চত্বর দেখলে মনে হয়, আকারে ও আয়তনে আলাউদ্দিন খিলজীর

সেই মিনার, কুতব্ মিনারের অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ হয়ত হয়ে উঠত।

কুতবমিনারের কিছু দূরেই কুতবউদ্দিন-নির্ম্মিত দিল্লী গেটের (দিল্‌হী দরওয়াজা) ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। সুউচ্চ ও বিরাট সেই গেটের আজ যা অবশিষ্ট আছে, তার দিকে চাইলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। গেটের আশেপাশে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো আছে। এক সময় সেগুলি গেটের অংশবিশেষ ছিল। কুতব গেটের অংশবিশেষ ছিল। কুতব-গেটের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হচ্ছে এর বিরাট খিলান। অর্দ্ধ-বৃত্তাকার খিলানটী এখনও অতীতের সাক্ষীরূপে দর্শকের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

সুলতানী আমলের দিল্লী নগরী কুতবের চারপাশে অবস্থিত ছিল। ভারতে মুসলমান যুগ এখান থেকেই সুরু হয়। যুবরাজ মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পরাজিত ও নিহত পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তারাঈনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর সংগে সঙ্গেই হিন্দু সাম্রাজ্যের অবসান হয় দিল্লীতে—সুরু হয় মুসলমান রাজত্বের যুগ।

মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি, তুর্কী ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন আইবেক (আইবক্) ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করেন। মহম্মদ ঘোরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ঘিয়াসুদ্দীন মামুদ, কুতবউদ্দিনকে 'সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। ভারতে কুতবউদ্দীন-প্রতিষ্ঠিত তুর্কী ক্রীতদাস সুলতানদের আমল, দাস রাজবংশের রাজত্বের সুরু হয়।

কুতবমিনারের কিছুদূরে আলতামাসের (মতান্তরে ইলতুতমিস্) সমাধি আছে। সমাধির উপরতলায় নকল সমাধি এবং নীচে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আসল সমাধি বর্ত্তমান; নীচের তলায় নামবার জন্য সিঁড়ি আছে। সমাধির অনেক স্থান ভগ্নপ্রায় হলেও, মোটামুটীভাবে আলতামাসের সমাধি অন্যান্য সমাধির তুলনায় ভালই আছে, বলে মনে হল। আলতামাসের সমাধির কিছু দূরে খিলজী বংশীয় তুর্কী (অনেকে বলেন পাঠান) সম্রাট অসাধারণ রণকৌশলী, বীর ও বিজয়ী আলাউদ্দিন খিলজীর সমাধি বর্ত্তমান। আলাউদ্দিনের সমাধির কোন বৈশিষ্ট্য নেই, সামান্য একটী চতুষ্কোণ ঘরে বীরশ্রেষ্ঠ প্রায় সমগ্র ভারতজয়ী আলাউদ্দিন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। সমাধির উপরকার ছাত ভেঙে পড়েছে, সমাধির আশে পাশে ঘাস ও জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। একদিন যে আলাউদ্দিনের নামে সারা ভারত শিউরে উঠত, আজ তার সমাধির এই হীন অবস্থা দেখে বেদনায় মন ভরে উঠল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ সমাধির কোন বিশেষ যত্ন নেন বলে মনে হল না। সমাধি-গৃহের ভাঙা প্রাচীরে টিনের ফলকের উপর "Tomb of Alauddin Khilji" এবং তার রাজত্বকালের তারিখটাকে রেখে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তব্য শেষ করেছেন বলে মনে হল।

আলাউদ্দিনের সমাধির প্রায় সম্মুখে একটী লৌহস্তম্ভ বর্ত্তমান। এক সময় আলাউদ্দিন খিলজী এই লৌহ-স্তম্ভটীকে তুলে ফেলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেও, মাত্র কয়েক ফিটের বেশী তুলতে পারেন নি, যেটুকু আলাউদ্দিন তুলে ফেলেছিলেন, সেটুকু ছাড়া স্তম্ভের উপরাংশ উজ্জ্বল ও মসৃণ। মনে হয় যেন এইমাত্র পালিশ করা হয়েছে। গাইড আমাদের বললে যে, এই স্তম্ভটী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের স্থাপিত। কিন্তু একথা সত্য নয়। এই লৌহস্তম্ভটী গুপ্ত-বংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের স্থাপিত।

আলাউদ্দিনের সমাধির কিছু দূরে উঁচু ঢিপির উপর ভাঙা ভাঙা পাঁচীলের এবং গৃহের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। ঢিপির উপর ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গলের মত গজিয়ে উঠেছে। ঢিপির কতক কতক স্থান তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ফলকের উপর লেখা আছে যে, এখানে আলাউদ্দিনের কলেজ, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল। আজ অবশ্য ভগ্নস্তূপ এবং ঝোপ ছাড়া সেখানে কিছুই দেখবার নেই। মাটীর নীচে সম্ভবতঃ কলেজ ও চিকিৎসালয়ের গৃহাদি সমাহিত হয়ে গেছে।

গাইড আমাদের ঝোপঝাড় এবং কাঁটাগুল্মের সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে মহম্মদ তোগলক নির্ম্মিত এক সমাধি-মন্দিরের দিকে নিয়ে চলল। পথে একস্থানে খাঁজকাটা কাটা একটী গোলাকারের ঘরের কাছে নিয়ে এসে

বললে, এখানে বাদশাহরা বেগম প্রভৃতিদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন। এর মধ্যে গোলক ধাঁধার মত নানা অলি গলি আছে এবং এর মধ্যে সুড়ঙ্গ আছে যার অপর মুখ আগ্রার লুকোচুরি খেলবার ঘরের মধ্যে অবস্থিত; এক সময় এর মধ্য দিয়ে আগ্রা যাওয়া যেত। আজ অবশ্য কোথায় সেই সুড়ঙ্গ, তার অস্তিত্ব কেউ জানে না। দু একজন উৎসাহী ঐতিহাসিক সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের চেষ্টায় এর মধ্যে প্রবেশ করে নাকি আর বেরুতে পারেন নি। ইংরাজ আমলে এর প্রবেশপথ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সত্যি। লুকোচুরি খেলাবার ঘরটা বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, এর মধ্যে অনেক জীবজন্তুই বোধ হয় নিরাপদে বাস করে। গাইডের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ঘর খুঁড়লে অনেক গুপ্ত রহস্যের আভাস পাওয়া যাবে—অনেক ধনরত্নাদিও পাওয়া যেতে পারে। স্বাধীন ভারতে হয়ত এই প্রচেষ্টা একদিন হবে এবং হয়ত অনেক গুপ্ত রহস্যের পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

মহম্মদ তুঘলক নির্ম্মিত "কামালু জামালু"র সমাধি গৃহে আসা গেল। সাধু ফকির কামালু জামালুর সমাধির উপর এই সৌধ, মহম্মদ তুঘলক নির্ম্মাণ করেন। সমাধি-গৃহ-সন্নিহিত একটা মসজিদও বর্ত্তমান। অবশ্য সে মসজিদে কিছুই হয় না। যুগের পরিবর্ত্তনের পর আজ মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় লোকালয় থেকে বহু দূরে পড়ে আছে; "কামালু জামালুর" সমাধিটী আজও এরূপ সুদৃশ্য এবং কারুকার্য্যময় অবস্থায় আছে যে, মনে হয় না এই সমাধিটী প্রায় ৬৫০ বছরের পুরাতন। সমাধিগৃহের দেওয়াল, চত্বর এবং সমাধির উপরে মসৃণ পালিশ আজও ঝক ঝক করছে। দেওয়ালে ও সমাধির উপর নক্সা-কাটা ফুল-লতার কারুকার্য্য আজও এতটুকু বিকৃত হয় নি, মলিন হয়নি। দেওয়ালে মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাঁজ কাটা আছে। গাইডের মুখে শুনলাম এক সময় এই খাঁজে উজ্জ্বল রত্ন-প্রস্তর গাঁথা ছিল। পরবর্ত্তী কালে জাঠ-দস্যুরা সেই রত্নাদি অপহরণ করে নিয়ে যায়।

সমাধি-গৃহের সংলগ্ন মসজিদে উঠলাম। সিঁড়ির দু' পাশে বড় বড় ঘর—মাঝে মাঝে হলের মত লম্বা পথ। কোথাও আলো, কোথাও ঈষৎ অন্ধকার। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ মসজিদের মধ্যে আমাদের পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে—মাঝে মাঝে চামচিকের দল হঠাৎ সচকিত হয়ে ছুটে পালায়, এঘর থেকে ওঘরে তাদের পাখার ঝাপটে মনে হচ্ছে এই নিস্তব্ধ পাষাণ-স্তূপ, যেন যুগ-যুগান্তের মৌন ভঙ্গ করে কলরব করে উঠছে। বহু বর্ষ পূর্ব্বে এখানে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের সমাধি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে এই মসজিদের আশে পাশে, তাঁরা যেন প্রায়ান্ধকার এই মসজিদের মধ্যে মনুষ্যসমাগমে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অদৃশ্য চক্ষু আমাদের দিকে যেন বিস্ময়ে চেয়ে আছে—তাঁদের অদৃশ্য আত্মা যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে অস্ফুট ভাষণে হারানো দিনের কত কাহিনী বলে যাচ্ছেন। ক্ষুধিত পাষাণের কত বেদনার কত দীর্ঘশ্বাসের অশ্রু-সজল ইতিহাস কে যেন আমাদের কানের কাছে অস্ফুট স্বরে বর্ণনা করে যাচ্ছে—আমরা তা শুনতে পাচ্ছি না। যে পাথরকে মাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি; সে পাথরের বুকে কাহিনীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে—কত অশরীরী আত্মা সেখানে নিশিদিন বিচারণ করতে করতে আমাদের কানে কানে বলছে—শোন? দাঁড়াও। ইতিহাস তোমাদের যে কথা জানে না, আমাদের কাছে শোন সে কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপরে উঠলাম। উপরের বিরাট গম্বুজটা প্রখর রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে কাল হয়ে গেছে। মসজিদ থেকে আশে পাশে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করলাম, শুধু ধূ ধূ করছে বিরাট প্রান্তর আর ধ্বংসস্তূপ। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ইতিহাস সমাহিত। কিম্বদন্তী শুধু বলছে ওই দূরে পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর। ওই খানে যুদ্ধ হয়েছে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ইতিহাস বলছে, ওই 'তুঘলক বাদ।' তুঘলক বংশীয় ফিরোজ শাহ ওখানে নগর স্থাপন করেছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের প্রাসাদ ফিরোজ শাহ কোটলায় আজও কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকের শ্মশানক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলাম,—তার কিছু দূরেই রিজিয়ার

(সুলতানা) সমাধি-মন্দির। দূর থেকে সমাধি-মন্দিরটী ভালই লাগল। গাইড্ বললে ওর মধ্যে রিজিয়া এবং রিজিয়ার প্রণয়ী হাবসী ক্রীতদাসের (অনেকের মতে আলতুনিয়া) সমাধি আছে। রিজিয়ার প্রাসাদের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এবং স্নানাগারের স্থান দূর থেকে দেখলাম। রিজিয়ার টুম্বে যাবার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাস্তা না থাকার জন্য যাওয়া হল না। তার উপর গাইড্ বললে যে নানা প্রকার হিংস্র জীব-জন্তুরও বাস আছে ওখানে।

নিজামুদ্দীন আউলিয়া বা দরগা অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। সাধু নিজামউদ্দীনের সমাধি এখানে। প্রবাস-ধারণের জন্য ফকির যে জলাশয় খনন করেন তার তীরে প্রতি-বৎসর বিরাট মেলা বসে। অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ফকিরের পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে ধন্য হন। এখানে সম্রাট শাজাহান-দুহিতা জাহানারার সমাধি এবং অনেক ওমরাহ ও আমীর বংশীয়দের সমাধি আছে। জাহানারা ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জাহানারার পিতৃভক্তি ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। জাহানারার সমাধির উপর তাঁর স্বরচিত কবিতা উৎকীর্ণ আছে।

আবার পথ। ফিরে চলেছি অতীত ইতিহাসের শ্মশানক্ষেত্র থেকে। জনহীন নির্জ্জন পথকে সচকিত করে বাস ছুটে চলেছে অতীত দিনের দিল্লী থেকে,— নূতন যুগের, নূতন দিনের দিল্লীর পথে। চেয়ে রয়েছি পিছনের দিকে—হাজার বছর পূর্ব্বের অতীত কীর্ত্তি-রাশির ধ্বংসস্তূপ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে দৃষ্টির উপর। অতীতকে পশ্চাতে রেখে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে নূতন যুগের নূতন পৃথিবী—আমরাও চললাম পুরাতন দিল্লীকে পিছনে রেখে, নয়াদিল্লীর পথে।

তন্ময়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তন্ময় আছে সে একের চিন্তায়
বিপুল বিশ্ব কোথায় ভাসিয়া যায়!
কিছুই দেখে না সে এই ধরিত্রীর
যেন পার্থের লক্ষ্য বেঁধার তীর।
একরূপ শুধু জাগে চক্ষেতে তার,
তাহা ছাড়া আর সকলি অন্ধকার।
নাসা পায় তার একের অঙ্গবাস,
দেহ পায় এক পরশ ও নিঃশ্বাস।

শ্রবণেতে পশে কেবল একটী সুর,
তাই নিতি নব, নিতি অতি সুমধুর।
রসনার তার নাহিক অন্য সাধ,
লভিয়াছে এক অমৃতের আস্বাদ।
একই মনন, শুধু এক চিন্তন,
রাঙায়েছে তার সারা দেহ সারা মন।
যত অপমান তত তার গৌরব,
সব হারাইয়া একেই পেয়েছে সব।

সে যে কি? কেমনে বুঝাবো তাহার কথা,
বাহির পুতুল ভিতর তার দেবতা।

অকর্ম্মণ্য

সুবোধ বসু

অমিয়ভূষণ প্রেম করিয়াই শিপ্রাকে বিবাহ করিয়াছিল। অমিয়ভূষণ সবেমাত্র ইংরেজি সাহিত্যে এম, এ পাস করিয়া বাহির হইয়া চাকুরির অভাবে কবিতা লেখায় নিযুক্ত ছিল; শিপ্রা দুটো রেকর্ড করিয়া এবং মাসে একবার হিসাবে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে আধুনিক বাংলা গান গাহিয়া গায়িকা-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই ঘৃত ও অগ্নিতে যোগাযোগের ফলে যে প্রেমের শিখা প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি।

কিন্তু মুস্কিল হইল বিবাহের পর কিছুদিন কাটিয়া গেলে। অমিয়ভূষণ কবি-মানুষ। চাকরি জোগাড়ে তার কৃতিত্ব একেবারেই নাই। তাহার উপর তার পিতার মৃত্যু হইল। দাদারা চাকরি সংগ্রহের নানা উপদেশ দেন, কিন্তু জোগাড় করিতে সাহায্য করিতে পারেন না।

শিপ্রার গানের সুযোগ খর্ব্ব হইয়াছে। গান-ভূত দাদাদের সহিত ইচ্ছামত মেলামেশা করিতে না পারিলে কি রেকর্ড করা, কি রেডিয়ো প্রোগ্রাম জোগাড় করা সহজ নয়।

এই অবস্থায় তাহাদের নতুন প্রেমের উপর অর্থাভাবের রাহু ছায়া বিস্তার করিল। দাদারা অমিয়ভূষণকে অকর্ম্মণ্য বলা শুরু করিল, জায়েরা শিপ্রার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কার করিল। বাপ বাঁচিয়া থাকিতে অবস্থা এমন অসহনীয় ছিল না; বেকার ছোট ছেলের অক্ষমতাকে সর্ব্বদাই কিছুটা প্রশ্রয়ের সঙ্গে দেখা হইত। এবার দাদারা অমিয়ভূষণের উপার্জ্জন-ক্ষমতার অভাবকে কড়া সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিল।

শিপ্রা বলে, 'যা হয় কিছু একটা করো। আর যে পারা যায় না।'

অমিয় দার্শনিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বলে, 'অত উতলা হচ্চো কেন? সময় হইলেই একটা চাকরি-বাকরি হয়ে যাবে। খারাপ সময় কি লোকের চিরকাল চলে?'

'গত এক বছর ধরেই তো এ কথা শুনে আসচি।' শিপ্রার মুখে হতাশা ফুটিয়া ওঠে, 'আর কত দিন এ কথা শুনতে হবে?'

'আরে বুঝচ না,' অমিয় ভরসা দিয়া বলে, 'যা-তা কাজ তো আর নিতে পারিনে। একজন জলজ্যান্ত এম্. এ, সদ্বংশের কালচার্ড ছেলে, ষাট টাকার কেরাণী-গিরি কি করে নিই বলো?'

কিন্তু কেরাণীগিরিই নিতে হইল। তবে ষাট টাকার নয়, সওয়া-শ টাকার। অমিয়ের মেজো মামা এক বিলিতি সওদাগরী অফিসে তার কবি-ভাগ্নের জন্য কাজ সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

একটা সুযোগ পাইয়া অমিয় তার পাঁচ শো টাকার চাকরির স্বপ্ন বিসর্জ্জন দিয়া সওয়া-শ টাকায়ই গভীর নিষ্ঠাসঙ্গে লাগিয়া গেল। যাহারা আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এক হপ্তা পার হইবার আগেই অমিয়ভূষণ পরিশ্রান্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিবে, তাহারা হতাশ হইল। বাড়িতে শিপ্রার সম্মান আবার বৃদ্ধি পাইল। সুন্দরী মেয়ে যে অপয়া হইয়া থাকে, এই অকাট্য সিদ্ধান্তের কথা আর শোনা যায় না। মাসান্তে মাহিনা পাওয়ার পর অমিয়ভূষণ যখন বৌদি ও ভাইপো ভাইঝিদের তৃপ্ত করিল, তখন শিপ্রার আদর দেখে কে।

কিন্তু এইখানে অতি অকস্মাৎ যবনিকা-পতন। দ্বিতীয় মাসের সপ্তাহ দেড়েক চাকরি করিবার পর আবার সব ভেস্তাইয়া গেল। অমিয়ভূষণ চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছে।

দাদাদের অসন্তুষ্ট প্রশ্নে সে কহিল, 'সওয়া-শ টাকার চাকরি করি বলেই সাহেবগুলি "বাবু" "বাবু" বলে ডাকবে, আর আমি তা মুখ বুজে সয়ে যাব? "বাবু" মানে তো নীচু স্তরের লোক।'

মামা অবাক হইয়া বলেন, 'বলিস্ কি? আমাদের দেশে কত খরচ-খয়রাত করলে তবে লোকে "বাবু" উপাধি পেত, আর তোকে…'

'সে "বাবু" উপাধি দিত দেশের লোক সম্মান করে', অমিয় ঘাড় শক্ত করিয়া কহিল। 'আর এ ডাক তৈরি করেছে বিদেশী শাসকের গুষ্টিবর্গ দেশীয় লোকদের ছোট প্রতিপন্ন করবার মতলবে। এ আমি সহ্য করব না'।

'এখন তবে কি করা হবে?' অমিয়ের বড় দাদা রাশভারি গলায় প্রশ্ন করিলেন।

'ব্যবসা করব।' অমিয় কহিল।

'হাঁ, ব্যবসা করবে তুমি। কি ব্যবসা?'

'মানে, যাই হোক, কিছু একটা ব্যবসা।' অমিয় বিব্রত হইয়া বলে। বস্তুতঃ কি ব্যবসা করিবে সে সম্বন্ধে তার নিজের কোনও ধারণা নাই।

অমিয় ও শিপ্রা পুনর্মুষিক হইল।

অসন্তুষ্ট বৌদিরা আড়ালে বলিতে আরম্ভ করিল, 'যার উপার্জ্জনের মুরোদ নেই, তার বিয়ে করা কেন শুনি? আর এ তো আমাদের মতো ছা-পোষা মেয়ে নয়, ইনি যে মেম-সাহেব! নিজের সাজ-সজ্জা পাউডার ক্রীম নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত আছেন।'

পারিবারিক আবহাওয়া ক্রমেই অধিক প্রতিকূল হইয়া উঠিতে লাগিল। অমিয়ের অকর্ম্মণ্যতার অপরাধ স্ত্রী শিপ্রার স্কন্ধে বর্ত্তাইল। ইহার এতটা বাড়াবাড়ি শুরু হইল যে, অমিয়ভূষণের দার্শনিকতা আর টিকিল না। মরিয়া হইয়া সে ঘোষণা করিল যে, সে ছাপাখানা খুলিবে।

প্রস্তাব শুনিয়া দাদারা প্রমাদ গণিলেন। ছাপাখানা খোলার অর্থ যে, পৈতৃক অর্থের উপর আশু দাবি, ইহা বুঝিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন।

বড়দা কহিলেন, 'ব্যবসা করা চাট্টিখানি কথা নয়। বুদ্ধি চাই, খাটবার ক্ষমতা চাই, সাংসারিক জ্ঞান থাকা চাই...'

মেজদা বলিলেন, 'ছাপাখানা দু পাঁচ হাজার টাকার কর্ম্ম নয়। কম টাকা নিয়ে ছাপাখানা খুলতে যাওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।'

বড় বৌদি মেজো বৌদিকে কহিলেন, 'যার চাকরি করবার মুরোদ নেই, সে করবে ব্যবসা! এ আর কিছু নয় মেজো বউ, এ ছোট বউয়ের টাকা হাত করবার ফন্দি।'

কিন্তু অমিয়ভূষণ কোনও সুপরামর্শই শুনিবে না। সে নানা জায়গায় প্রেস, টাইপ, ফার্নিচার প্রভৃতির দামাদামি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নাওয়া-খাওয়ার দিকে নজর নাই; রীতিমত খাটিয়ে লোকের মতো 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ভঙ্গিতে সে ছাপাখানা-জগত চষিয়া বেড়াইতেছে।

এইরূপ কিছু দিন করিবার পর দাদারা যখন পৈতৃক পুঁজির কয়েক হাজার টাকা মারা যাওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছে, তখন একদিন খবর পাওয়া গেল, অমিয়ভূষণ ছাপাখানা খোলার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছে।

পুলকিত হইয়া বড়দা কহিলেন, 'এ তো জানতামই। ওর দ্বারা হবে ব্যবসা!'

মেজো বউ বড় বৌকে কহিল, 'ঠিকই বলেছিলে দিদি। এ ছোট বউয়ের টাকা আদায়ের ফন্দি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ঠকিয়ে নেবারও মুরোদ থাকা চাই তো। ঠাকুরপোর যদি সে মুরোদ থাকবে তবে আর ভায়েদের গলগ্রহ হয়ে থাকতো না, অন্ততঃ দালালি করে 'দু-পাঁচ পয়সা ঘরে' আনবার চেষ্টা করত।'

সেদিন শুইতে আসিয়া হতাশ শিপ্রাও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অমিয়ভূষণের এই আকস্মিক আচরণের কৈফিয়ৎ দাবি করিল। চোখ পাকাইয়া কহিল, 'এটা কি হলো শুনি?'

'কোন্‌টা কি হলো?' অমিয়ভূষণ বর্ম্মা চুরুটের ধোঁয়া তৃপ্তি সহকারে ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল।

'ঘড়ি-ঘড়ি মত বদলালে তাকে লোকে মানুষ বলে? যদি শেষ পর্য্যন্ত এই করবে, তবে ছাপাখানা নিয়ে মিছিমিছি এত হৈ-চৈ করলে কেন?' শিপ্রার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসে।

'হৈ-চৈ আর কোথায়, She -?' অমিয়ভূষণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল। 'ব্যবসায়ে নামতে গেলে আগে খোঁজ-খবর নেওয়া চাইতো। খোঁজ নিয়ে দেখলুম, এ আমার পোষাবে না। তাই...'

'কেন পোষাবে না?'

'ছাপাখানা দারুণ ঝামেলার ব্যাপার,' অমিয়ভূষণ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে কহিল। 'এক গাদা ক্যাপিটেল তো আটকে ফেলতে হবেই, তা ছাড়া নিত্য নতুন ফ্যাকড়া লেগে আছে। অর্ডার জোগাড় করো, কম্পোজিটর

ঠেঙিয়ে কাজ আদায় করো, মেসিনম্যান সময় বুঝে কামাই করেছে, সময় রাখতে না পেরে কাষ্টমারের কাছে বকুনি খাও। বিলের টাকা আদায় করতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হও। আজ মেসিন বিগড়োল, কাল টাইপ চুরি গেছে; পরন্তু হ্রস্ব উ-কার আর রেফ শর্ট পড়েছে, সে যে কি ঝামেলা, তুমি ভাবতে পারবে না। এত হাঙ্গামা পোহান কি আমার মতো নিরিবিলি মানুষের সম্ভব। এ কাজ করতে হলে চামড়া আরও মোটা হওয়া চাই…'

'ঠিক আছে। বাড়িতে নিরিবিলি বসে থাকো।' শিপ্রা সাভিমানে কহিল। 'চামড়া মোটা করে' দরকার নেই।'

মরিয়া ভাবের পরের জোয়ারে অমিয়ভূষণ এক খ্যাতনামা ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানীর বিশেষ এজেন্টের কাজ লইল; এবং কিছুদিন বন্ধুবান্ধব, পরিচিত অর্দ্ধপরিচিত এবং অপরিচিতদের পিছনে ঘুরিয়া 'ছুত্তোর' বলিয়া বেঁকিয়া বসিল। কহিল, 'এ কি ভদ্রলোকের কাজ। স্বাধীন ব্যবসা না হাতি। যত রাজ্যের যত অভদ্র বড় লোকের মর্জ্জি মেনে চলতে আমি পারব না।'

'কিছু তো করতে হবে।' শিপ্রা কহিল, 'নইলে এখানে যে আর তিষ্ঠান যায় না।'

'কিছু ভেবো না, She, আমার একটা প্ল্যান্ আছে।' অমিয়ভূষণ সোৎসাহে আশ্বাস দিয়া কহিল।

'এবার কি প্ল্যান ?'

'এবার কি প্ল্যান মানে ? ভেরেচ খেলা করচি। তা মোটেই নয়।' অমিয়ভূষণ রীতিমত প্রতিবাদের সুরে কহিল, 'এর প্রত্যেকটা ডিটেইল ভাবা হয়ে গেছে। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লাভালাভের হিসেব করা হয়েচে। এ মোটেই চালাকি নয়। অনেক ভেবে দেখলাম, এটাই আমার লাইন। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বাদ দিয়ে অফিসে পরের গোলামি করা আমার পোষাবে না। রবীন্দ্রনাথের "মালঞ্চে" তরকারী চাষের কথা লেখা আছে কি না মনে নেই, নইলে এটা একটা পুরোপুরি "মালঞ্চ।"'

মালঞ্চই বটে। সোনারপুরে অমিয়ভূষণদের পৈতৃক কিছু জায়গা, গোটা দু'-এক এঁদো পুকুর এবং একটা ভাঙা পাকা বসত-বাটী আছে। অমিয়ভূষণ অন্যান্য পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির উপর স্বত্বত্যাগের বিনিময়ে সোনারপুরের এই অপূর্ব্ব "বাগান-বাড়িটা" নিজস্ব করিয়া লইবে। ভাঙা বসত-বাটী মেরামত করিয়া বাসযোগ্য করা হইবে। দালানের সামনের জমিতে ফুলের ও তরকারীর চাষ হইবে। পুকুর সাফ করিয়া মাছ ছাড়া হইবে। পুকুরের পাড়ে গোয়াল-ঘর ও তরকারী বাগানের প্রান্তে হাঁস ও মুর্গীর খোঁয়াড় তৈরী হইবে। তিনটী মালীর খবরদারি করিবে অমিয় নিজে। ইহার ফলে তাহাদের সকল আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যার যে অতি আশ্চর্য্য সমাধান হইয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি।

শিপ্রা সন্দেহ প্রকাশ করিতে গেল। কিন্তু অমিয়-ভূষণের যুক্তির কাছে এবার তাহাকে হার মানিতে হইল। প্রথমতঃ কলিকাতার বাড়ীর মূল্যবান্ অংশের পরিবর্ত্তে সোনারপুরের বাড়ীটা চাহিলে দাদারা আপত্তি করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যবস্তুর অভাবের মরসুমে খাদ্য-উৎপাদন অতি লাভজনক কাজ। প্রত্যহ সকালে ডালি ডালি রজনীগন্ধা, গোলাপ, পদ্ম ও অর্কিড, ধামা ধামা বিন্-বরবটি, লাউ-কুমড়া এবং শালগম-ফুলকপি মাথায় চাপিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইবে পাইকারদের কাছে। জেলেদের কাছে পুকুরের বড় বড় রুই-কাৎলা চড়া দামে বেচা চলিবে। দুধ বা ছানা চালানের ব্যবস্থা এমন কোনও কঠিন কাজ হইবে না; আর সব চেয়ে লাভজনক হইবে পোল্‌ট্রি। অর্দ্ধেক ডিম বিক্রি করা হইবে। আর অর্দ্ধেক ডিম হইতে হাঁস ও মুরগীর বাচ্চা তৈরী করা হইবে। এই বাচ্চারা কয়েক মাস পরে ডিমের দশগুণ দামে বিক্রি হইতে পারিবে। মাছের চাষ এবং হাঁস ও মুরগীর চাষ যতটা লাভের, সব্‌জি বা ফুলের চাষ তার সিকিও নয়। এ-জন্যই এই দুই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

নানান্ তোড়-জোড় সুরু হইল। নানা বই আসিল, নানা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া হইল। রাজমিস্ত্রী, মুটে মজুরদের আনাগোনা চলিল। কলিকাতার বাড়ীর

অংশের বিনিময়ে ম্যালেরিয়াকম্পিত সোনারপুরের ভাঙা পৈতৃক ভিটাটি দিলেই চলিবে দেখিয়া অমিয়ভূষণের দুই দাদাই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিলেন।

বড়দা কহিলেন, 'আমার এক পিসতুত শালার পোল্‌ট্রির ব্যবসা ছিল। তার কাছে শুনেছি; করতে পারলে এ খুবই লাভের।'

মেজদা বলিলেন, 'তরকারির দিকে নজর না দিয়ে আমি বরঞ্চ এ-দিকেই পূরা দৃষ্টি দিতে পরামর্শ দেব। একটা ছোট মুরগীও কি আজকাল দেড় টাকা দু'টাকার কমে পাওয়া যায়। আজকাল ডিমে তা দেবার জন্য বৈজ্ঞানিক Incubator বেরিয়েচে, বাচ্চা ফোটাতে কোনও কষ্ট নেই। পোল্‌ট্রির দিকেই বেশী নজর দাও।'

পরামর্শটা অসঙ্গত বোধ হইল না। সোনারপুরের জায়গাটা এত বড় নয় যে, খুব বেশী সব্‌জী উৎপন্ন করা চলে। তা ছাড়া একটা বড় বেগুনের যা দাম, একটা ছোট মুরগী বা হাঁসের দাম তার পাঁচ সাত গুণ। পোল্‌ট্রি-বিজ্ঞানের বইয়েতে এবং বিভিন্ন জাতের হাঁস ও মুরগীর নমুনায় অমিয়ভূষণের ঘর ও বারান্দা ভরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। ইহাদের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোঁয়াড় তৈরীর প্ল্যান্‌ প্রস্তুত হইল। মুরগী ও হাঁসের শাবকদের জন্য পুকুরের কাছে অগভীর জলাশয় খোঁড়ার ব্যবস্থা হইল। এইখানে ডিম-নির্গত বাচ্চাগুলি বিক্রির উপযুক্ত হইবার জন্য বড় হইয়া উঠিবে। অমিয়ভূষণ লাভের হিসাব করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। এক হাঁস মুরগীর শাবকেরাই যে তাহার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। অমিয়ভূষণ আধুনিক পোল্‌ট্রি স্থাপনের খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় মনোযোগ দিল। তরকারি উৎপাদন অনেকটা মামুলি ব্যাপার; যে কোনও মালীর হাতেই তাহা ভরসা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। পোল্‌ট্রির দিকেই অমিয়ভূষণের সমস্ত নজর দিতে হইতেছে।

দাদারা সম্পত্তি-ভাগের সকল বন্দোবস্ত করিলেন। মুলাবিদা প্রস্তুত হইল। রেজেষ্টারির দিন ধার্য্য হইল।

এমন সময় শিপ্রার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। অমিয়ভূষণ জানাইল, সোনারপুরের কৃষি-ব্যবসায়ের প্ল্যান সে পরিত্যাগ করিয়াছে।

দাদারা ক্ষেপিয়া আগুন হইলেন। সমস্ত ঘাড়িকে নাচাইয়া শেষ মুহূর্তে সরিয়া পড়া বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি! অকর্ম্মণ্যতারও একটা মাত্রা থাকা উচিত। চিরকাল কি তাহারা দু' দু'জন সমর্থ লোককে বসাইয়া বসাইয়া খাওয়াইবেন?

বড় বৌদি কহিলেন, 'এ আমরা জানতাম। কাজ করবেন উনি! তবেই হয়েছে। কাজ করবার নাম করে' ক'দিন নিজেদের সম্মান বাড়িয়ে নেওয়া...'

মেজ বৌদি কহিলেন, 'তোমরাই তো দিদি নেচে উঠেছিলে। আমি সবই জানতাম। কাজ করবার মুরোদ থাকা চাই। বিবি বউয়ের আঁচল ধরে' বসে থাকলে সে মুরোদ জন্মায় না...।'

সেদিন রাতে দেরী করিয়া শুইতে আসিয়া অমিয়ভূষণ দেখিল, শিপ্রা খাটে নাই, মাটিতে বিছানা করিয়া শুইয়াছে। অমিয়ভূষণ অপরাধীর মতো সেখানে আগাইয়া গেল। শিপ্রা ঘুমের যত ভানই করুক, সে জানে শিপ্রা এখনও ঘুমায় নাই।

'শিপ্রা?' অমিয় তাহার শিয়রে বসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল।

কোনও সাড়া আসিল না।

অমিয়ভূষণ কহিল, 'শিপ্রা, আর যেই ভুল বুঝুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। এ কাজ আমি পারব না বলেই ছেড়ে দিয়েছি, নইলে খাটতে আমার কোনও অপমান নেই। ফার্মিং করতে আমার...'

'ঢের হয়েচে, এবার থামো।' শিপ্রা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল।

'তোমাকে সত্যি বলছি, এ আমার উপযুক্ত কাজ নয় বলেই ছেড়ে দিলাম। নইলে তুমি দেখো, কোনও একটা কাজ আমি আসচে হপ্তার মধ্যেই...'

'সে অনেক শুনেছি।' শিপ্রা কহিল। 'আর শুনতে চাইনে।...'

'সত্যি বলচি, এটা আমি পারতাম না। এটা বড় নৃশংস কাজ! এ কি আমি পারি?...'

'কেন? নৃশংস কেন?' শিপ্রা ক্রুত জবাব দাবি করিল।

'নৃশংস নয়?' অমিয়ভূষণ প্রায় শিহরিয়া উঠিল। 'পোল্‌ট্রি করা কি আমার সাজে! তার জন্ত যে আরও অনেক কঠিন হৃদয়ালা লোক হওয়া চাই। দেখেচ তো, ঐ গলির মোড়ের বস্তির বাড়িটা থেকে কিলবিল করে কি সুন্দর এক গাদা হাঁস আর মুর্গীর বাচ্চা বেরিয়ে আসে? কি নরম, কি দুর্ব্বল! আমার ফার্ম্মেও এমনই ছোট, এমনি নরম, এমনি দুর্ব্বল হাজার হাজার শাবক জন্মাবে, আর আমি কশাইয়ের মতো পয়সার জন্ত তাদের বাজারে পাঠিয়ে দেব! জবাই হবার জন্ত আমি এতগুলি প্রাণী তৈরী করব? তা আমি পারব না, শিপ্রা। এত নিষ্ঠুর আমি হ'তে পারব না। আমার যদি উপোস করে মরতেও হয়, তবু আমি এমন নৃশংস কাজ পারব না। এ আমার উপযুক্ত কাজ নয়!...'

শিপ্রা উঠিয়া বসিল। সম্পূর্ণ অর্দ্ধ মিনিট স্বামীর করুণ মুখটার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অমিয়ভূষণের একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে কহিল, 'এমন স্বামী পেয়েচি বলেই তো এত দুঃখ সইতে পারি। পাগল, আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি? ঠিক আছে।'

চোখ

সুধা চক্রবর্ত্তী

কে জানতো ঐ চোখে বরষার মেঘ ছিল কোনও
ছিল সেথা কান্নার লবণ ছড়ানো।
ঐ চোখে ছিল কত তৃষ্ণার জল—
ছিল মাখা ভ্রূকুটীতে যাদুকরী ছল।
কে জানতো ঐ চোখ খোঁজে এক নীড়হারা পাখী,
নিরালা নিশিতে হাতে বেঁধে দিল রাখী।
জানতো কে ঐ চোখ হানে শুধু বিষমাখা তীর;
হৃদয় দিগন্তে সে যে ছড়ায় আবীর।

ঐ চোখে জাগে এক প্রবালের দ্বীপ,
কপালে পরালো মোর কাজলের টীপ।
চোখ নয়, মনে হয় চিত্ত-মুকুর :
রুমুঝুমু বাজে তাই মনের নূপুর।
আকাশে যখন চলে হংস-বলাকা,
ও-চোখ মনের কোণে মেলে দেয় পাখা।
ঐ চোখে ভেসে ওঠে সমুদ্র সৈকত—
রচিল হৃদয়ে মোর বনছায়াপথ।

'প্লেজ'

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নামে কি করে? ঠিক কথা। বৃটিশ রাজ্যের অবসান কল্পে কম-বেশী ত্রিশ বৎসর ভারতবাসিগণ যে সকল কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাকে যুদ্ধ, সংগ্রাম, আন্দোলন, লড়াই কিম্বা অন্য যে কোনও আখ্যায় আখ্যাত করা হোকনা কেন, সেটা যে একটা বেশ কিছু-গুরু-গম্ভীর ব্যাপার, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের দাপটেই তল্পীতল্পা গুটাইয়া ও পুঁটলী পাঁটলা বাঁধিয়া ভারত মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছিল কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাকে খেদাইবার জন্য আমাদের চেষ্টার সামান্য ত্রুটীও যে ছিল না, সে বিষয়ে মতৈক্য ধরিয়া লইতে পারা যায়। আমাদের ঢাল ছিল না, তরোয়াল ছিল না, থাকিলে আমরা সেগুলার সদ্ব্যবহার করিতাম; অভাবে নিধিরাম সর্দ্দার হইয়াই আমরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। আমাদের তীর-ধনুক থাকিলে অবশ্যই আমরা গাণ্ডীবী হইয়া জ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক বোঁ বোঁ রবে তীর ছুঁড়িতাম; বন্দুক থাকিলে নিশ্চয়ই গুলি চালাইতাম, কামান ও গোলাবারুদ থাকিলে দমাদ্দম্ কামানও দাগিতাম; এমন কি বংশাবতংস লাঠি থাকিলে লাঠিটাই বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরাইতাম। কিন্তু সাদা সত্য কথা এই যে, কিছুই ছিল না: তাই তূণভরা বাক্যবাণ সম্বল করিয়াই বৃটিশের বিরুদ্ধে সেই অসম ও দুর্দ্দম অভিযান চালাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাগ্দেবী সদৈবসদয়, সহায় ও সুপ্রসন্ন ছিলেন, ব্ল্যাক মার্কেটের টাকা ও মালের মত আমাদের অস্ত্রও অফুরন্ত ও অগণিত ছিল। পৃথিবীর কোন অংশে সাগর হয়ত শুষ্ক হইয়াছে, সাহারা মরুভূমিও হয়ত বালু বিহীন শস্য শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসীর আজীবন এবং আমরণের নিত্যসঙ্গী চোখের জলও হয়ত ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের তূণীর শূন্য হয় নাই। গোলা-গুলি অস্ত্র শস্ত্রের যুদ্ধ হইলে কালক্রমে এক পক্ষ—দরিদ্র ও দুর্ব্বল পক্ষ—সেইগুলার অভাববশতঃ ঘায়েল হইয়া পড়িত, হারিয়া ঢোল হইয়া, নাকে খত ও কাণ মোচড়া দিয়াও হয়ত অব্যাহতি পাইত না, পাপিষ্ঠ তাস্কোর মত ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইত। দেবী ভারতীর বরে, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব হয় নাই, হইতে পারে না, সুতরাং জয় অনিবার্য্য জয় করতলগত ত বটেই, উপরন্তু দেখিতেছি যুদ্ধান্তেও অস্ত্রশালায় অস্ত্রসম্ভার এতই আছে যে, প্রয়োজন হইলে আরও কতকগুলা যুদ্ধে নামিয়া পড়িতে পারা যায়।

সেই অত্যদ্ভুত যুদ্ধকালে সঙ্গত অসঙ্গত অনেক কথা বলিতে হইয়াছিল। সম্ভব-অসম্ভব অনেক ভরসা দিতে হইয়াছিল, রক্ষণীয় অরক্ষণীয় চ বহু প্রতিশ্রুতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। প্রেমে এবং রণে ইহা করিতে হয়, শাস্ত্রবিধি আছে। ত্রিশ বর্ষ ব্যাপী ভারতবর্ষের যে যুদ্ধের কথা আমি বলিতেছি, সেই যুদ্ধের সহিত প্রেম (Love) ও নাকি জড়াইয়া গিয়াছিল। কথাটা রহস্য করিয়া বলিতেছি না। আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে, বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্যটাকে চূর্ণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু বৃটিশকে নহে। বৃটিশের অঙ্গে ঐ সাম্রাজ্যটি এঁটুলী অথবা পরগাছার মত লগ্ন থাকিয়া বৃটিশকে জগতের চক্ষুতে হেয় করিতেছে, এঁটুলা মুক্ত করিয়া অথবা, পরগাছাটি অপসারিত করিয়া, বৃটিশকে রাহুবিমুক্ত শশধর করিবার জন্যই ভারতবাসীর সেই যুদ্ধ-যাত্রা। বৃটিশের মঙ্গলের তরেই বৃটিশের সাম্রাজ্যলুপ্তি। যে রোগী ঔষধ খায় না, ধমক দিয়া ঔষধ খাওয়াইবার যে ব্যবস্থা, তাহা স্নেহ ও প্রেম হইতে উদ্ভূত। যে ছেলে স্কুল যাইতে চাহে না, তাহার কাণ ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া স্কুলে লইয়া যাওয়া কি দোষের? না, তাহাতে স্নেহের অভাব সূচিত হয়? আসল কথা এই যে, আমাদের যুদ্ধটা হিংসাপ্রণোদিত নহে, পরন্তু প্রেম সঞ্জাত। ইহাকে প্রেম-রণ বলা যায়। কাজেই শাস্ত্র এখানে ডবল লাইসেন্স দিয়াছিল। প্রেমে সত্য মিথ্যার একাকার—প্রেমিকমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন; আর যুদ্ধ? হা হতোস্মি! সে কথাও কি আবার বলিতে হইবে? যুদ্ধও আগাগোড়া মিথ্যারই বেসাতি—ছড়াছড়ি, হুড়াহুড়ি—একেবারে হরির লুট। মিথ্যার মহামহোপাধ্যায় ভিন্ন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে,

এমন একজনের নামও ত ইতিহাস তল্লাস করিয়া পাইলাম না। এ বিষয়ে আমরা মহাগুরুর শিষ্য। বিদ্যাটা পুরাপুরি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি কিনা বলা কঠিন হইলেও, খুব যে পিছনে পড়িয়া নাই, আত্মশ্লাঘা না করিয়াও ইহা বলা চলে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে দেশের লোককে তাই ভবিষ্যতের আশা-ভরসা প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতিগুলাও বেশ খানিক উঁচু ও চড়া দরেই দিতে হইয়াছিল। এখন নাকি হিসাব-নিকাশের সময় আগত, ডেবিট ক্রেডিট মিলাইয়া ব্যালেন্স কাটিতে হইবে, অডিট আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা অডিটার নহি, শৈশবে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মনে নাই, শুভঙ্কর ঠাকুর প্রণীত ধারাপাতখানির সহিত আড়ি হইয়াছিল, দু'কুড়ি বারোর পরেও দেখিতেছি, গ্রাড়ী গাড়ী ডাব কিনিলাম ও পিত্তনাশক নেওয়াপাতি ডাব অনেক খাইলাম, কিন্তু শুভঙ্করের সহিত এ জীবনে ভাব আর হইল না, ভাবের অভাবই রহিয়া গেল: কাজেই জমার অঙ্ক ও খরচের খতিয়ানে নাসিকা প্রবিষ্ট করিবার সাধ্যও নাই, সাহসও কুলাইবে না। প্রতিশ্রুতি কতগুলি ছিল এবং তাহাদের পরিণতি বা কি হইল, খবরদারী করিবার সামর্থ্য আমার আদৌ নাই। দু' একটা মোটামাটা কথা যাহা মনে আছে, রাস্তার মুটে মজুর ক্ষেতের চাষী কিষাণও যাহা জানে, আমরা শুধু সেই রকমের দুই একটি 'প্লেজের' কথা বলিব।

ন্যাশান্যালাইজেসন। ভূমি, ব্যবসা বাণিজ্য, চলাচল, যানবাহন জাতীয় করণের প্রতিশ্রুতি নাকি বারবার দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি, কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারেও প্লেজটা দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছিল। ইংরাজের 'কপিবুক' দেখিয়া মুখস্থ করা পাঠ গড় গড় করিয়া আওড়াইয়া যাইতে নেতৃবৃন্দের আদৌ বাধে নাই। ইংরাজ ন্যাসান্যালাইজেসন ন্যাশান্যালাইজেসন করে, আমাদের নেতৃবর্গেরও তাহাতে বড়ই রুচি। বড় মিঠে বুলি। তাঁহারাও দাতা কর্ণ সাজিয়া যেদিকে যত দূরে দৃষ্টি যায়, যাহা মনে পড়ে, হাতে যে দ্রব্যই স্পর্শ করা যায়, সবই জাতীয় করণ করিবার প্লেজ বা প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিতে লাগিলেন। বেচারা রাজা হরিশ্চন্দ্র দান করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন যে, নিজের বসিবার,দাঁড়াইবার স্থান-টুকুও অবশিষ্ট রাখেন নাই, বেচারা। যে স্থানে পা দিতে যান সেইখানেই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ ট্রেসপাসার হইতে হয়। অনেক গবেষণার পর ভদ্রলোকটি খবর পাইল যে, শিবের কাশী পৃথিবীর বহির্ভূত এবং সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও বরুণা ও অসি নাম্নী নদীভগিনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু দাতার একতিয়ারের বাহিরে আছে, হরিশ্চন্দ্র তথায় যাইয়া বসবাস করিলে ন্যায় ও ধর্ম্মের বিধান অনুসারে তাঁহার পরপ্রবেশের পাপ স্পর্শ করিবে না। শুনিয়া ভূতপূর্ব্ব পৃথ্বীপতি সেইখানে গিয়া শ্মশানে শবদাহীদের সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন। জাতীয় করণের ধুয়ার ঠেলায় ভারতবর্ষের ব্যবসায়ের অবস্থা সসেমিরে—আরও কিছুকাল এইরূপ চলিলে ভারতের বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটে শবগাদায় শয়ন কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। ম্যালেরিয়া রোগীর জ্বর কদমে কদমে বৃদ্ধি পায়; কর্ত্তৃপক্ষের আক্কেলও বোধ করি ধাপে ধাপে গজাইতেছে। 'আজই জাতীয় করণ,' 'এখনই জাতীয়করণ,' 'এই দণ্ডেই জাতীয়করণ' হইতে উঁবৎ পশ্চাদপসরণ করত: এক্ষণে দশ বৎসরের পরে জাতীয় করণ করা হইবে ধুয়া উঠিয়াছে: অতঃপর আরও দশ বৎসর পিছাইয়া বিশ বৎসরে আসিয়া দাঁড়াইলেও আশ্চর্য্য হইব না। প্রথম দিকে 'আজই' 'এই মুহূর্ত্তেই' এই ধরণের খাঁড়া না ঝুলাইলে ক্ষতিটা কি ছিল? ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক চাকুরী নহে, চেয়ারে চাদর বাঁধিয়া বুক পকেটে কলম গুঁজিয়া হাটে বাজারে সনাতন ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া বেড়াইলেও মাসকাবারে মাহিনা পকেটস্থ হইতে বাধে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে (চোরা কারবারে কি হয় বা না হয় বলা কঠিন।) প্রথম পাঁচ সাত দশ বৎসর লাভ না হওয়ার কথাই শুনা যায়। কথাটা বাজে নয় বলিয়াই বিশ্বাস। যদি এই কথা কতকাংশেও সত্য হয় তাহা হইলে, ঘরের পয়সা বাহির করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া দশ বৎসর পরে পবিত্র জাতীয় করণের খাতিরে ভবিষ্যকালের অজ্ঞাতকুলশীল নেপোদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ বা পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, এমন পিতৃমাতৃদায়

কাহার? কাহার বিবাহ—কে বরণডালা সাজায়! একদিকে ঘোর রবে আর্ত্ত আবেদন, প্রোডিউস আদারওয়াইজ পেরিস। হয় উৎপাদন, না হয় উৎসাদন। অন্য দিকে সেই শ্মশানসঙ্গীত—"ক'রে নাও দু'দিন বৈ ত নয়।" ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন কচ্ছপের মুণ্ড। এক ইঞ্চি বাহির করে ত আড়াই ইঞ্চি ভিতরে গুটাইয়া ফেলে।

অতঃপর প্রোহিবিশন্। পবিত্র প্লেজ দেওয়া আছে, বহুরূপ বৃটিশ ভারতবর্ষ হইতে পাততাড়ি গুটাইবামাত্র দেশটাকে স্বামীজী মহারাজের আশ্রম করিয়া ফেলা হইবে। ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে মহাত্মা-বৈবাহিক শ্রী ১০৮ শ্রীশ্রীরাজা গোপালাচারীর প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে মদ্রদেশ প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। মাতাল গাঁজাল চণ্ডুখাল তাড়িয়াল খাঁটিয়াল মাত্রেরই সন্ধ্যার ঝোঁকে গা-ম্যাজ ম্যাজ ও হাই উঠিবার উপক্রম করিলেই খোল করতাল শিঙে ভেঁপু কেনেস্তারা, রামশিঙে সহযোগে—

নিতাই এনেছে নাম
রাখে কেষ্ট রাখে শ্যাম

গাহিয়া আকাশ চৌচির করিতেছিল। আমরা জাত আছি, নামের গুণে জলে শিলা ভাসিয়া যায়, বানর মল্লারবাহারে সঙ্গীত গায়, তা তুচ্ছ, গা ম্যাজ ম্যাজ ও ততোধিক তুচ্ছ হাই। এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিল। বৃটিশ বেণিয়া ধূর্ত্ত কম নহে, রাজাজী মহারাজকে রাজ-অতিথি করিয়া জেলখানায় পুরিয়া পুনরায় খোলা ভাঁটি চালু করিয়া দিতে দেরী করে নাই। মাদ্রাজের কংগ্রেসী সরকার এক্ষণে আবার নূতন করিয়া প্রোহিবিশন্ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন আশা আছে, এবার শুধু শুষ্ক নহে, বিশাল মদ্রদেশ শুকাইয়া ফুটি ফাটা হইয়া যাইবে। মাদ্রাজের এই অসামান্য সাফল্য দর্শনে অন্যান্য প্রদেশগুলিও বিশুদ্ধ হইয়া জনগণের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির পথ সাফ ও সুগম করিতে সমুদ্যত হইবেন ইহাও খুবই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যখন তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসী, তাঁহারাও উদয়াস্ত অঙ্গে গান্ধী নামাবলী ধারণ ও অনুক্ষণ গান্ধী নাম স্মরণ এবং মহাত্মা মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তন করিতেছেন, "পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে" তাঁহাদের সহ্য হইবে কিরূপে? মাদ্রাজ একাই প্লেজ দেয় নাই, 'ফ্রি এণ্ড অন্ রিহাফ অফ ইণ্ডিয়া (নট্ পাকিস্তান।)' গুজরাৎ খোদ কংগ্রেস হইতে আঁটি বাঁধিয়া পাইকারী দরে 'প্লেজ' দেওয়া হইয়াছিল, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি মহাপাতক নহে? কালে কালে কালপ্রবাহে ও আবহাওয়ার দোষে আমরা ক্ষুদ্র মানবক হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের এই ধমনীতে কি শান্তনুনন্দন দেবব্রতের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে না? আমরা কি ভীমপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মেরই বংশধর নহি?

একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রোহিবিশনের কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল,কাঁসি-বাঁশীর শব্দ এখনও শুনিতে পাই নাই: নতুবা উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ যায় আসাম, সর্ব্বত্রই মাদক দ্রব্যের বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে। ছেলেবেলায় খেলাঘরের কথাতে ছিল—"কথা দিয়ে কথা রাখে না, কালীঘাটের কুকুর হয়।" দেখিতেছি, সে ভয় এখনও আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এমন পিছনে পড়িয়া ভ্যাংচায় কেন? কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত। পরে ভাবা যাইবে; কিন্তু যদি প্লেজের কথা বলা হয়, তাহা হইলে বলিব, প্লেজ ত আরও অনেক দেওয়া ছিল, "হাত ঘুরোলে নাড়ু দোব" সুরে অচেল, অথৈ, অনন্ত, যত চাই তত পাবে এই রকম দরেই আকাশের চাঁদা মামার গোষ্ঠিসুদ্ধ ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল; বৃটিশ ত অনেকদিন ভাগল্-বা, কোন্ প্লেজটা রক্ষিত হইয়াছে, শুনিতে পাই কি? দু' বেলা পেট ভরিয়া অন্ন দিবার ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। "অভাগা যত্তপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" কালে কালে চার কালে, চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া, এদেশে যখকথা চলিত ছিল, লোকে সের দরে জিনিষ কিনিত, এক্ষণে ঐ প্লেজ মাহাত্ম্যে, খাদ্য ছটাক দরে বিক্রয় হইতেছে, রতি কাঁচ্চায় নামিতে কতক্ষণ? প্লেজে, কটিতে লজ্জাবস্ত্র দিবার কথা ছিল। মিলওয়ালারা দল বাঁধিয়া দুর্য্যোধন দুঃশাসন কর্ণ শকুনি সাজিয়া দ্রৌপদীর (পুং এবং স্ত্রীং উভয়তঃ) বস্ত্র হরণ করিতেছে, ইহাই ত চাক্ষুষ করিতেছি। একখানি লজ্জাবস্ত্র সংগ্রহ করিতে (নগর মূল্যের বিনিময়ে।) আজ মানুষকে মনুষ্যদেহে কুকুর বিড়ালে

পরিণত হইতে হয়। সেকালে, যাঁহারা কুড়িদরে, পণের হিসাবে, পূত পবিত্র "প্লেজ" দিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বপক্ষে সান্ত্বনা এই যে, এই অমানুষিক দুর্দ্দশার চিত্র তাঁহারা চাক্ষুষ করিতে আসেন না। "দেবলোকে" বাসের ঐ এক মস্ত সুবিধা। দেবগণ সদয় হৌন অথবা নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন, "দয়াময়" নাম কেহই ঘুচাইবে না। তবু মনে হয়, একদিন, একটিবার এই দৃশ্য তাঁহারা অবলোকন করুন। জাতিটাকে কোন্ অধস্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা একবার স্বচক্ষুতে দেখিয়া যান্। দেখিয়া যান্, দেশের নরনারী ভিক্ষাবৃত্ত না হইলেও এক খণ্ড বস্ত্রের জন্ম অধম ভিক্ষুকে রূপান্তরিত। কি নর, কি নারী, কি খর রৌদ্র, কি শ্রাবণের বারিধারা, কি দিবস, কি রাত্রি, কাপড়ের দোকানের সম্মুখে মনুষ্যপিপীলিকার সারি দেখিয়া যান্। আমার এই ছার লেখনী, ততোঽধিক ছার আমার ভাবা-জ্ঞান, সে মর্ম্মান্তিক নিগ্রহের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ প্রকাশ করিতে পারি, হেন সাধ্যও আমার নাই। ভিক্ষুকের সম্মুখে এক দরজা বন্ধ থাকিলেও অন্য দশটি দ্বার খোলা থাকে; হায়, এই হতভাগা হতভাগিনীদের যদি সে সুযোগটুকুও থাকিত! কালেভদ্রে একটি দোকানে কাপড় আসে, ভিখারীর অধম নর-নারীগুলা তাহারই সম্মুখে হত্যা দেয়। আবার কবে, কোন্ মহামহেন্দ্রক্ষণে স্বাতি নক্ষত্রের বারি কোথায় পতিত হইবে, এই লাঞ্ছনার বেদনা মিলাইতে না মিলাইতে হয়ত সেখানে গিয়াও "জয় হোক্" হাঁকিতে হইবে। হায় পণ্ডিত জওহরলাল, আপনি শুধু অধৈর্য্য জনগণের তীব্র কণ্ঠস্বরই শুনিতে পান, সমালোচনার কর্কশধ্বনিই কেবল আপনার কাণে পশে—আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। হে সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসি! একবার স্বপ্নরাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিতে আছে কি? ভৎর্সনা নহে, তিরস্কার নহে, রূঢ় বাক্যও নহে, ধনীর দুলাল হইয়াও আযৌবন দারিদ্র্য ব্রতধারী পণ্ডিতজী, সুন্দর সুকুমার আননে মুক্তা বিন্দু সম নয়নাশ্রু রোধ কিরূপে সম্ভব হয়, আমরা শুধু তাহাই দেখিতে চাহির। জওহরলাল প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন, জওহরলাল পাথরে নির্ম্মিত বিগ্রহ নহেন। জওহরলাল রুথ রেশন সপে ক্রেতার দুর্গতি দেখিলে, আমাদের দুর্গতি লাঘব হইবে না, তাহা জানি, বস্ত্রাভাব ঘুচিবে না, তাহাও জানি; তথাপি, দরিয়া বিবির মত (বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ।") হাসিয়া গাহিয়া করতালি দিয়া নাচিয়া পরমানন্দে বলিতে পারিব—"বহুৎ আচ্ছা! চোখে জল।"

রোগে চিকিৎসা সর্ব্বজনপ্রাপ্য হইবার কথা দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে মা কালীকে মাঠে গিয়া ফড়িং ধরিয়া খাইতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। চিকিৎসার কথা বলিতে গিয়া সত্যমৃত আসামের লাট সুহৃদ্বর স্যার আকবর হায়দারীর শোচনীয় মৃত্যুর কথাটা স্বতঃই স্মরণ হইতেছে। হিজ্ এক্সেলেন্সি, একটা প্রদেশের মহামান্য লাট,—সন্ন্যাস রোগে অজ্ঞান হইয়া, পাঁচ ঘণ্টা ভিতরে ভিতরে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, তবু এক কৌটা ঔষধ পড়িল না, কেহ নাড়ী টিপিল না, কেহ ছুরী ধরিল না, একটা সূচিকাভরণের ব্যবস্থাও হইল না। ৫৪ বৎসর বয়স্ক সুস্থ সবলকায় একজন লাট যদি এমন সুচিকিৎসা লাভ করিয়া সজ্ঞানে ও সশরীরে স্বর্গযাত্রা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের মত গোলা পায়রারা আর কি বা ভরসা করিতে পারে? আমরা যে বাঁচিয়া আছি, সেই কি ঢের নহে? না থাকিলেও ত অনায়াসে পারিতাম। তবে আছি যে, তাহার জন্যই খোদাকে ধন্যবাদ দিতে হয় না কি? শিক্ষা বিনা মাশুলে সর্ব্বজনলভ্য, সমস্ত স্বাধীন ও সভ্য দেশেই এই ব্যবস্থা। প্লেজ-সাইক্লোপিডিয়া খুলিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিরাণী কর্ম্মা সাজিয়া সোলেম্ প্লেজ দেওয়া আছে। কিন্তু হায়, আজ অভাগা আমাদের অদৃষ্টেই শুনি—লেখা পড়া শিখিয়া কে কবে বড় লোক হইয়াছে? কুম্ভক ভট্টের উপদেশই সারাৎসার—"লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে, কমিউনিজম করিবে, থাকিবে সুখে।"

শোনিছিবিবন্, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও পরখ করিয়া দেখা হইয়াছে; আমেরিকা একদিন গোটা দেশটাকে 'ওভেন্ ড্রাই' রুটি সেঁকা সেকিয়া "দুত্তোর, ভাল হোক্" করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। মদের দোকান মার্কিন মুল্লুক হইতে লোপ পাইয়াছিল সত্য, তবে, দর্জ্জির দোকানে

সেলাই কলের আশে পাশে বোতল গ্লাস থাকিত; কেতাবের দোকানে আলমারীর আড়ালে দাঁড়াইয়া জ্ঞান-পিপাসুর "তৃষ্ণা" নিবারণে কোন বাধা ছিল না। ট্যাক্সি-চালক তাহার ওভারকোটের ভিতর হইতে সুধাভাণ্ড বাহির করিয়া তৃষিতের প্রাণ শীতল করিত। আমেরিকায় মাদক দ্রব্যের সম্মুখে, এক দুয়ার বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু শতেক দ্বার মুক্ত হইয়াছিল। লাভের মধ্যে সরকারের পাওনা-গণ্ডাটাই বেঘোরে মারা গিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, বিহার প্রদেশের অতীত অভিজ্ঞতাও বিশেষ স্বাদু হয় নাই। বে-আইনী মদ চোলাইয়ের ভাঁটির খবরদারী এমনই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, পুলিশ নাকি চোর-ছ্যাঁচড় ধরা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সরকার বাহাদুরের "টেণ্টেড্ মানি" জলে ত গিয়াছিলই, লোকের মুখ শুঁকিয়া বেড়াইবার জন্য নিত্য নূতন নূতন বাহিনী গঠন করিতে হইয়াছিল। জীব-বিশেষকে যেমন স্থান অস্থান সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা আঘ্রাণ করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, এই বাহিনীরও সেই কাজ মিলিয়াছিল। মদ্র দেশ, প্রদেশ হইতে মাদক দ্রব্য নিষ্কাশনে সাফল্য অর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প। রাজস্বের ক্ষতিপূরণের উপায়ও তাহারা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। আমার পাঠিকা ও পাঠকগণের পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা থাকিলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধান্য মাড়াইয়ের দৃশ্য দেখিয়াছেন। তথাপি প্রক্রিয়াটা প্রথমাবধি বর্ণনা করা ভাল। যাঁহাদের ধারণা আছে যে, ধান্যবৃক্ষে দ্বার জানালা কড়ি বরগা রেলের স্লীপার প্রস্তুত হয়, তাঁহাদের কোনও উপকার করিতে পারিব এমত ভরসা আমার নাই, তবে যাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহারা হয় ত বর্ণনা হইতে ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিবেন। মাঠে ধান পাকিলে, কাস্তে সাহায্যে ধান কাটিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখা হয়; সরু সরু গাছগুলি শুকাইলে কতকগুলিকে একত্রিত করিয়া আঁটি বন্ধনের রীতি আছে। আঁটিগুলিকে মাঠ হইতে তুলিয়া আনিয়া গোলাঘরে জমা করিয়া পাটা পাতিয়া ধোপার কাপড় কাচার মত হিঁসুসো-হিঁসুসো রবে আছড়াইতে হয়, শীর্ষজাত শুষ্ক ধানগুলি ঝরিয়া পাটাগ্রে জমা হয়, তথা হইতে গোলা, মরাই বা গৃহে নীত হইয়া থাকে। পাটায় আছাড়ের সময় কতকগুলা শীর্ষসমেত 'বৃক্ষ' অথবা 'বৃক্ষশাখা' ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেও পারে। ধান্য ঘরে উঠিয়া গেলে, খড়ের গাদা তৈরী হইয়া যাইবার পরে কৃষকের দৃষ্টি সর্ব্বশেষে ঐ বিচ্ছিন্ন বৃক্ষ বা বৃক্ষাংশের প্রতি নিপতিত হয়। সেগুলির নাম পোয়াল। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধান সম্পর্কে পোয়াল মেসো। পোয়ালগুলিকে এক যায়গায় জড়ো করিয়া, মধ্যস্থলে খুঁটি পুতিয়া এক সারি গরু বাঁধিয়া দেওয়া হয়। গরুগুলা বৃত্তাকারে পোয়ালের উপর ঘুরিতে থাকে। স্বভাবদোষে গরুগুলার ঘুরিতে যত না আগ্রহ দৃষ্ট হয়, ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে, যথারীতি লাঙ্গুল বিমর্দ্দন দ্বারা তাহাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রক্রিয়াটা অনেকখানি কলুর ঘানি গাছের মত। ক্রমাগত বিঘূর্ণনের ফলে পোয়ালের অঙ্গে যে কয়েকটি ধান্য-কণা ছিল, তাহাও মৃত্তিকায় স্খলিত হইয়া পড়ে। খরচ পোষায় কি না জানি না, তবে ধান গাছ আছাড় সহিবে আর "মেসো" পোয়ালগুলা ফাঁকি দিয়া হাস্য পরিহাস করিবে, সাম্যবাদী কৃষক ইহা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহে। সেল্স্ ট্যাক্স—"বিক্রয় কর" সকল প্রদেশেই আছে, তাহারা দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা ঘৃণা করিয়া খাদ্যবস্তুগুলাকে বিক্রয় কর* হইতে রেহাই দিয়াছে, মাদ্রাজ মাদকদ্রব্য বর্জ্জনে বদ্ধপরিকর, তাই চাল ডালেও "বিক্রয় কর" আদায় করে। অর্থাৎ, খাও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিও না। দুর্দ্দশা ও দুরবস্থায় পড়িয়া যুদ্ধারম্ভ কাল হইতে, অস্মদ্দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী সৌখীন দ্রব্য ক্রয় করা ভুলিয়াই গিয়াছে, তাহারা সরকার বাহাদুরকে একটি কাণাকড়িও দেয় না ইহা অত্যন্ত অনুচিত। রাষ্ট্রে বাস অথচ রাষ্ট্রকে কদলী প্রদর্শন ?

* কথাগুলো কি কুক্ষণেই লিখিয়াছিলাম। ছাপা হইয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকার 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ' হিসাবে সরিষার তৈল, ফল ফুলারীর প্রতিও দৃষ্টি দান করিয়াছেন। মদ্র বঙ্গ যে দূর নহে, আশা হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে চাল, ডাল, কচু-ঘেচুতে বিক্রয় কর বসাইয়া নিঃসন্দেহে তাহাই সপ্রমাণ করিবেন। —লেখক

বোধ হয় তাঁহাদের বঞ্চনা-নীতির বিরুদ্ধেই সরকারকে সজাগ ও সক্রিয় হইতে হইয়াছে। না খাইয়া, শুকাইয়া মরিয়া কেহ যদি সরকারকে ঠকাইতে চাহে, অবশ্যই তাঁহা * পারিবে, অন্যথা সর্ব্বাগ্রে সরকারের অগ্রভাগ। মাদ্রাজকে প্রোহিবিষন্ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছিল, কেন্দ্র হইতে খয়রাতের আশা নাই তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, মাদ্রাজ তাহাতেও ডরায় নাই। কেনই বা ডরাইবে? না খাইয়া মরিবার বাসনা যখন প্রজাপুঞ্জের নাই, অপিচ, ভোজনের প্রয়োজন এবং অভিলাষ যখন পূরামাত্রাতে বর্ত্তমান, তখন "বিক্রয়-কর" দিয়াই বাজেটের সাম্য রক্ষা করা যাইবে। করভারে লোক মরে মরুক, মদ ভাং চণ্ডু গাঁজা গুলি আফিম্ খাইয়া গোল্লায় না গেলেই হইল।

প্লেজ রক্ষা করিতেই হইবে। স্বর্গ নামে দেশটা আজও বিদ্যমান আছে কি না জানি না, এককালে ছিল, তাহা জানি। সেই কালে যদি কংগ্রেসীরা ইলেক্সানে জয়লাভ করিয়া স্বর্গ প্রদেশ (ডোমিনয়ন অফ্ হেভেন্) ক্যাপচার করিত, এবং ইলেক্সান্ প্লেজ রিডিম্—সার্থক করিতে লাগিয়া পড়িত, তাহা হইলে স্বর্গের দেব-দেবীদের অবস্থা কিরূপ হইত আমাদের পক্ষে তাহা অনুমান করাও কঠিন, তবে পুরাণাদি মহাকাব্যসমূহের বহু রসাশ্রিত অম্ল, তিক্ত, কষায়, আদি, রৌদ্র, রুদ্র, কটু, মধুর গল্প-গাছা হইতে আমরা যে বঞ্চিত হইতাম, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুধা না থাকিলে দেবতারাও কি স্বর্গে থাকিতেন? বিশ্বাস হয় না। তাঁহাদের নিকট নিশ্চয়ই "স্বর্গ আর স্বর্গ নহে" হইত। কে জানে, তাঁহারা হয় ত ফরাসী দেশে মাইগ্রেট্ করিতেন। স্বর্গ 'ড্রাই' হইলে উর্ব্বশী কি 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী' থাকিয়া দেবরাজ সভায় যুগপৎ আলো ও স্বপ্ন সৃজন করিতে পারিত? সে বিষয়ে আমাদের দারুণ সন্দেহ আছে। স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্য ও পুরাণ তেয়াগিয়া বর্ত্তমানে আসিয়া দেখি, খোদাতালাহের খিদমতে (আমাদের সিকিউলার ষ্টেট্—ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, হিন্দুর ঠাকুর-দেবতার নাম গ্রহণে বিপদ আছে, খোদাতালাহ—নিরাকার ও নির্দ্দোষ।) ভাগ্যে কংগ্রেসীরা আজিকার পূর্ব্বে বঙ্গদেশকে ড্রাই ডকে পরিণত করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই আমরা বঙ্গসাহিত্য পাইয়াছিলাম, তাই নিমচাঁদ এখনও সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া আছে, তাই আজও দেবেন্দ্র দত্ত হীরামালিনীর কুঞ্জ আলো করিয়া রহিয়াছে, আজও তাই জেব-উন্নিসা-উদিপুরী আদি রোমাঞ্চ ঘটাইতেছে, আর কত বলিব? শরৎ বাবুর দেবদাস হয় ত তাহা হইলে ভোলানাথ দাস হইয়া আলু পোস্তার বেণে মসলার দোকান দিত; সতীশ হয়ত উপীনদা' স্থাপিত প্রাইমারী স্কুলে গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিত এবং গোটা বাঙ্গলা সাহিত্যটাই ভারতের একমেবাদ্বিতীয়ম্ রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী গুলেবকাউলীর খাপরার ঘরের স্যাঁতানে মেঝেয় পড়িয়া খাবি খাইত।

"ভাল কথা মনে হোল আঁচাতে আঁচাতে, ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।" গুলেবকাউলী গোলাপী গেণ্ডারীর বরাতেও, রাজটীকা লিখিত ছিল, ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে বসিয়া রাষ্ট্রভাষার গৌরব তাহারই। ইহাও নাকি 'প্লেজ' দেওয়া ছিল। হ্যাগা, ঘুঁটেকুড়ুনী কি রাজরাণী হয় না?

পশ্চিমবঙ্গে যে প্রোহিবিষনের ধুয়া উঠে নাই, তাহার জন্ম আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতৃগণকে অভিনন্দিত করিতে পারি। ভাবী রাষ্ট্রসঙ্গীতের রাক্ষুঁা নকল করিয়া—জয় হে জয় হে করিতেও দ্বিধা নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রীসভার শুদ্ধ খাদিপরিহিত গণেশ উল্টাইলে, বিধান রায় মহাশয় মন্ত্রিসভা গঠন করিলে নির্জ্জলা নিভাঁজ কংগ্রেসীদের মনঃপীড়ার অবধি ছিল না। একে ত বিধান রায় মহাশয়ের জেল-সার্টিফিকেটের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হ্রস্বতা ছিলই, অধিকন্তু তৎসহ আরও কতিপয় জেল্-ক্রেডেন-শিয়ালশূন্য ব্যক্তির আগমন,

* "হেসে নাও, দু'দিন বই ত নয়" কালটির রূপান্তর করিয়া বলিব, "মরে নাও দু'দিন বইত নয়।" কারণ মৃত্যুকরও আগতপ্রায়। বরিফা সংসারের লোকগুলাকে ফাঁকি দিতে পারলেও, আর কিছুদিন পরে, মৃত্যুকর বসিলে ঢাকের কড়ি গণিতে সংসারকে দেউলিয়া হইতে পারে। যম আসিয়া মার্ ধর্ করিয়া কর্ত্তাটিকে লইয়া গেল, কিছুদিন কাঁদিয়া কাটিয়া চোখের জলের ট্যাঙ্ক খালি করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, তাহার যো কি! যমদূতের পিছনে পিছনে ট্যাক্সদূত হাজির হায়েহাল।—লেখক।

বিচলিত হইবারই কথা। বিধানচন্দ্র রায় ডাক্তার লোক (গোবৈদ্য ডাক্তার নহে), বোধ করি বা মন্ত্রিসভার অঙ্গে সূচিকাভরণের দ্বারাই সে যাত্রা বল হরি হরি বোল্—খুড়ি, রাষ্ট্র ভাষানুসারে রাম রাম সত্য হায় হয় নাই; কিন্তু প্রোহিবিষন অনভিরুচির ফল যে কি হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে অনুমান করা কঠিন। 'প্লেজ'—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে শালপ্রাংশু বিধান বাবুকে শূলে বা শালে চড়িতে হইতেও পারে। তা হোক, "যায় প্রাণ, নাড়ী টিপে খাব"। অভাগা পশ্চিম বঙ্গের দুঃখেরও অভাব নাই, দুর্দ্দশারও অন্ত নাই, সমস্যারও শেষ নাই। ইংরাজ এই বঙ্গদেশেই সর্ব্বপ্রথম ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়াছিল, একশত নব্বই বৎসরকাল তুলা ধুনিয়া খাল্ খুলিয়া হাড়মাস গিলিয়া, ছালের ডুগ্‌ডুগি বানাইয়া অনাগত বহু সহস্র বৎসর সদা স্মরণীয় থাকিবার আশায়, দয়া করিয়া গা-ঢাকা হইয়াছেন। তারপর ইংরাজের বড় ও নিকট কুটুম্ব মুশ্লিম লীগের পালা। দশ বৎসর ধরিয়া মুশ্লিম লীগ এই পশ্চিম বঙ্গকেই বিধিমতে হালাল করিয়াছিল, যাইবার কালে করিভুক্ত কপিত্থবৎ ফেলিয়া গিয়াছে, দিল্লীও বহুদূরে, করুণাবারি-কণা দুই তিনটা প্রদেশ পার হইয়া আসিতে আসিতে ইথারে—বাষ্পে বাষ্প মিশিয়া নস্যাৎ হইয়া যায়, ছিটে ফোঁটা কদাচিৎ বর্ষিত হয়। বঙ্গদেশের প্রতি কংগ্রেসের ভালবাসার লাঘব হইয়াছে এই কথা কেহই বলিবে না; বরং বলিবে ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের পক্ষী বিশেষের প্রতি গভীর প্রেমের মত এই প্রেমও নিকষিত হেম এবং তুলনা রহিত বলিলেও চলে। পশ্চিম বঙ্গকে দাদার ভরসা পরিহার করিয়াই তাহার রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তান পয়গম্বরের অনুকম্পা ও পীরের দয়ায় সুখে থাকুক, তণ্ড দোয়ায় পশ্চিম বঙ্গের নিত্য নূতন ও কঠিন হইতে কঠিনতর সমস্যার অভাব কোনদিন হইবে না, বিশ পঁচিশ লক্ষ ত এখনই এক বৎসরের মধ্যেই, "যা শত্রু পরে পরে" করিয়া দিয়াছে, মা জানি পরে আরও কত পাহছার করিবে,-পশ্চিম বঙ্গ যদ্যপি আবগারীর সতেরো আঠারো কোটী টাকার মমতা ত্যাগ না করিতেই পারে, অহিংস কংগ্রেস অনাস্থার বারুদ ভরিয়া কামান দাগিতে থাকিলেও, লোকে বিধান বাবুর অপযশঃ করিবে না। কংগ্রেসীরা বড় জোর আড়ালে আবডালে চাপা গলায় চোখের পাতা কুঁচকাইয়া বলিবে, "হুঁ হুঁ বাবা, জানি বাবা।" তা বলে বলুক, অদ্যাক্ষাতে রাজার মাকেও লোকে ডাইনী বলে। তাই বলিয়া রাজা কি রাস্তা হইতে লোক ধরিয়া ধরিয়া গর্দ্দানা গ্রহণ করেন! অনেক কালের পুরাতন একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। কলিকাতার কোন একটি রাজপথ হইতে পতিতা বিতাড়নের প্রস্তাব আলোচনার সময়ে একজন সৌখীন মহারাজা পরামর্শ দিয়াছিলেন, পুলিশের লেড়িকুত্তা লেলাইয়া তাড়াইবার পূর্ব্বে ঐ হতভাগিনীরা কোথায় গিয়া বাসা বাঁধিবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত। ঐ ভদ্রব্যক্তিটির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই; কিন্তু সভাস্থলে এমন একটা নিগূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ চাপা গুঞ্জন গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার অর্থ অনুধাবন করিতে কাহারও এক পলতমা বিলম্ব হয় নাই। তিনি যতবার কথা বলিতে যান, গুঞ্জন-ধ্বনি চঞ্চল হইয়া তাঁহাকে নীরব করিয়া দেয়। বহুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটি বক্তব্য শেষ করিলেন এই বলিয়া যে, ঐ সকল গৃহচ্যুতা পতিতারা লম্বা ঘোমটা টানিয়া ভদ্র গৃহস্থপল্লীতে ঢুকিয়া পড়ে, ইহা কি সভার মত? "না, না, নিশ্চয় নয়, কখনও নয়" শব্দে সভা প্রকম্পিত হইল বটে কিন্তু কটাক্ষগুলা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় নাই। বিধান বাবু যতই বলুন এ জীবনে মাদকদ্রব্য হস্তস্পৃষ্ট হয় নাই, বিলাতে তাঁহার যৌবনকালে পঠদ্দশাতেও প্রধান শিক্ষকের গৃহে ব্র্যাণ্ডি-প্রজ্বালিত খৃষ্টমাস কেক্ গ্রহণ না করিয়া গৃহত্যাগ করায় শিক্ষক-পরিবারের দুঃখের অবধি ছিল না, তাহা জানিয়াও তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই, দীর্ঘ আটষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত মত ত অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া গেল, কিন্তু তাহাতেও কংগ্রেসীদের অব্যক্ত গুঞ্জন থামিবে কি? 'প্লেজ' যে! আমরা ত মহারথ ভীষ্মের বংশধর!

কিন্তু প্লেজ ত আরও ছিল। অহিংসার প্লেজ ছিল, স্বার্থত্যাগের প্লেজ ছিল, অসাধুতা ত্যাগের প্লেজ ছিল, দরিদ্র নারায়ণ সেবার প্লেজ ছিল, সমান চোখে দেখিবার, সম প্রেম, সম ভালবাসা, এ প্লেজও ত ছিল গো! এগুলা যদি সাময়িকভাবে শিকায় উঠিতে পারে, ভবিষ্যতের ভরসায় 'তাকে' তুলিয়া রাখা যাইতে পারে, তবে মানুষগুলাকে শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া প্রোহিবিষনের প্লেজটা স্মরণ করাইলে কাহার কি ও কতটা অনিষ্ট হইত? ভাল করিয়া কাছা কোঁচা আঁটিতে পারে না, আবা কত? বন্দুক ছুঁড়িয়া বাঘ মারিবে! ভ্যালা মোর বাপধন সকল, বেঁচে থাক! পশ্চিম বঙ্গ ভালই করিয়াছে, হুক্কা হুয়া ধ্বনি শুনিয়াই হুক্কা হুয়া জুড়িয়া দেয় নাই।—বেটার লাক্ নেক্সট্ টাইম্।

একাডেমির চিত্র প্রদর্শনী

রূপরসিক

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে (বড়দিনের সময়) কলিকাতায় একাধিক চিত্র ও মূর্ত্তি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। গত ১৫।১৬ বৎসর যাবত "একাডেমি অব ফাইন আর্টস্" তেরটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া নিখিল ভারতীয় শিল্প সাধনার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পরিচয়-স্থলের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশ ও দেশ বিদেশ হইতে বহু বিখ্যাত শিল্পীর কাজ এই প্রদর্শনীতে সংগৃহিত হয় এবং কলিকাতার শিল্পামোদিগণ বহু পদ্ধতির কাজ দেখিবার সুযোগ লাভ করেন।

এই সময়ে কার্নিভাল সারকাস, হোটেলে হোটেলে নৈশ-নাচের আসর ইত্যাদি না না আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থায় কলিকাতা নগরী মুখরিত হইয়া উঠে। পরাধীন দেশের আনন্দ উল্লাসের ব্যবস্থা দেশের জাতীয় উৎসবের তিথি নক্ষত্র দেখিয়া হয় না। শাসকের চাপে তাহাদের অভিরুচি মত শাসিতকে নাচিতে ও গাহিতে হয়। স্বাধীনতা পাইলেও দেশ এখন পরাধীনতার গ্লানী হইতে বিমুক্ত নহে। বড়দিনের আনন্দের ব্যবস্থা দেশের জাতীয় উৎসবগুলিকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

চিত্র-প্রদর্শন-প্রণালী দর্শককে সর্ব্ব-প্রথমে হতাশ করিয়া দেয়, যদিও গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর এ প্রদর্শনী কিছু উন্নততর হইয়াছে। অতি আধুনিক চিত্রগুলির একটি পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলেই ভাল হইত। চার-কোল, পেনসিল স্কেচ বা এচিং ছবিগুলির মাঝে যদি সূর্য্যাস্তের গোধুলি-লগ্ন অবলম্বনে এক খানি তৈল চিত্র রাখিয়া দিলে যেমন অবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়—সেই রূপ পিকাশো পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবিগুলি ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত পৌরাণিক ও অন্যান্য চিত্রের মধ্যে ঢুকিয়া দর্শককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। রাগপ্রধান গানের আসরে যদি কেহ ট্রামশেট সহযোগে ইন্দ-ভারতীয় গানের আমদানী করেন তখন কিরূপ শোনায়?

সরস্বতী

শিল্পী—সুনীলকুমার পাল

একাডেমির চিত্র নির্ব্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ তৈল-চিত্র বিভাগে এমন কতকগুলি বিরাট চিত্র অযথা স্থান-জোরা করিয়া আছে যাহা চিত্র-রসিককে আকৃষ্ট করে না। একাডেমী অপেক্ষা সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীর ছবি ও মূর্ত্তি সাজাইবার ধরণে অনেক সুরুচি ও নিপুনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চারিটি আলাদা ঘরে ভাগ ভাগ করিয়া সাজানর সুবিধা একাডেমীর ছিল না। এক যায়গায় ৭০০ ছবির ও মূর্ত্তির পাশাপাশি একত্রী করণ প্রদর্শনীতে খানিকটা মেলাতলীর প্রভাব আনিয়া দিয়াছে।

এই বৎসর ছবি ও মূর্ত্তি লইয়া ২০।২১ খানি কাজ পুরস্কার-ভূষিত হইয়াছে। এ বিশেষ ছবি ও ভাস্কর্য্য ছাড়াও আরো অন্ততঃ ১০০ খানি চিত্র ও মূর্ত্তি আছে যাহা রূপে গুণে শিল্পামোদিদের উপভোগের বস্তু হইয়াছে এবং প্রদর্শনীর সুনাম বর্দ্ধন করিয়াছে।

নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের কাজ শিল্পামোদিরা একাডেমীতে না দেখিতে পাইয়া হতাশ হইয়াছেন। আশাকরি "একাডেমীর" 'সংগ্রহ বিভাগে' ভারতীয় শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের ছবি দেখাইয়া প্রদর্শনীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবেন। এই বিভাগে কয়েকটি জয়পুরী চিত্র, জাপানী চিত্র ও দাক্ষিনাত্যের পিতলের মূর্ত্তী দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছিল।

শ্রীরমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীসতীন্দ্র নাথ লাহার পৌরাণিক চিত্রগুলি পর পর সাজাইয়া সুরুচির পরিচয়

দিয়াছেন। অন্যান্য বারে একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে পৌরাণিক চিত্রগুলি একই স্থানে সাজাইবার ব্যবস্থা দেখি নাই।

শ্রীরমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রামায়ণ অবলম্বনে পৌরাণিক চিত্রগুলি এবার একাডেমির বিশেষ দ্রষ্টব্য চিত্র বলা যাইতে পারে। এই ছবিগুলির বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্য, বর্ণপরিবেশের চাতুর্য্য ও ভারতীয় পদ্ধতীর সহিত দূর প্রাচ্যের অঙ্কনপদ্ধতির নিপুণ সমন্বয় চিত্র-রসিককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। য়ুরোপে অবস্থান কালে তাঁহার পশ্চাত্য পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিলে তাঁহার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কিরূপ দখল তাহা দর্শককে আকৃষ্ট করে। একই হাতে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির উৎকর্ষ-সাধন সচারাচর দেখা যায় না।

সতীন্দ্রনাথ লাহার শকুন্তলা (৩৩৫-৩৪১) অবলম্বনে চিত্রগুলির বিষয়বস্তু পরিবেশন ও বর্ণ-পরিবেশের পটুতা অতি সুন্দর। জাপানী পদ্ধতির সহিত তাঁহার ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ দর্শককে আকৃষ্ট করে।

এন্ এস্ কেন্দ্রের "নালান্দার কৃষ্ণ বুদ্ধ" (৩২) ছবিটিতে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনও অতি মনোরম। তাহার নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির তারিফ্ করিতে হয়। সতীশ সিংহের "একটি শিশু" চিত্রটী সরলতা-সমৃদ্ধ। জয়পুরী বা কাঙরা চিত্রে নূতন পাশ্চাত্য পদ্ধতির সংমিশ্রণ করিয়াছেন শৈলজ মুখার্জ্জি। বর্ণোজ্জ্বলতাই তাঁহার ছবির বৈশিষ্ট্য। সুশীল পালের "সরস্বতী পটে" নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর ছাপ ও তাহার নিপুণ কলাকুশলতার পরিচয় দেয়। "হোবের" "চাষের ফল" চিত্রটিতে নতুনত্বের ছাপ আছে ও সরসতায় সমুজ্জ্বল।

চিঞ্চলকারের "পৈতৃক পেশা" চিত্রে চিত্রকর পাশ্চাত্য অঙ্কন পদ্ধতিতে তাঁর বিশেষ দখলের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ণোজ্জ্বলতা ও রচনা ভঙ্গীর জন্য "রাজার চিত্রগুলি দর্শককে আকৃষ্ট করে।

"আগাডুম বাগাডুম" চিত্রের চিত্রকর অনাথবন্ধু সেনকে তা'রফ করিতে হয় তাঁহার রচনা ভঙ্গী ও বিষয় বস্তু নির্ব্বাচন—কৌশলের জন্য। ছাড়ার কাব্য ছবিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ণ-পরিপাট্যও ছবিটির আর একটি আকর্ষণ। এ ছাড়া খ্যাতনামা শিল্পী কে, পি, গঙ্গোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বন্দোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাখন দত্তগুপ্ত বিমল মজুমদার ও হুমুমিয়ার ছবিগুলিও একাডেমির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে ও তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের কাজ একাডেমিতে না থাকিলেও তাঁহাদের প্রভাব ছড়াইয়া আছে একাডেমির সব কিছুর মধ্যে তাঁহাদের অনুগামীদের ভিতর দিয়া।

দুর্ব্বাশার অভিশাপ [শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ লাহা

ক্রমশঃ

শ্রীহরিপদ দে

আগুন! আগুন! ইতিহাসের পাতা পুড়ে গেল—এ মিথ্যা, এ বড়যন্ত্র!

রত্নময়ী আচম্‌কা শয্যার উপর উঠে বসে। ভয়ে-বিস্ময়ে এসে দাঁড়ায় সুইচটার ধারে। কম্পিত হাতে জ্বেলে দেয় আলো। ধীর-পদক্ষেপে এগিয়ে আসে স্বামীর শয্যার পাশে। সন্তর্পণে বসে পড়ে ঘর্ম্মাক্ত ললাটে বুলিয়ে দেয় তার কোমল হাতখানা। কী আশ্চর্য্য, এই প্রচণ্ড শীতে এত ঘাম? দারুণ দুশ্চিন্তায় রত্নময়ীর বুক শুকিয়ে যায়।

এ কি, আবার প্রলাপ!

মৃদু ধাক্কা মেরে স্বামীকে জাগায় রত্নময়ী। রূপকুমার তড়াক করে উঠে ব'সে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমজড়িত বিহ্বল নেত্রে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে:—ষড়যন্ত্র, পুড়ে গেল!

"আঃ কী পুড়ে গেল? কী-সব অলুক্ষুণে কথা বলচো বল তো? বাবারে বাবা, ঘুমের ঘোরে এমন চেঁচাতে পারে মানুষ!"

বিরক্তির ঝঙ্কারে টুটে গেল রূপকুমারের ঘুমের নেশা। প্রেতপুরীর কোলাহল পরশমণির স্পর্শে গেল থেমে—নেমে এলো রূপকুমার বাস্তবপুরীতে—তার ঘরে—স্ত্রীর বাহুবন্ধনে।

অসীম লজ্জায় রূপকুমার ভাষা হারিয়ে ফেলে। অপরূপ রূপলাবণ্যের লালিত্য সহসা বিবর্ণ পাংশু হয়ে যায়। নিজের অজ্ঞাতে বলে: "কী হয়েচে কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না রত্না।"

স্ত্রীর বাহুপাশ মুক্ত করে উঠে দাঁড়ায় রূপকুমার। ঘরের প্রতিটি জিনিসের দিকে চোখ বুলিয়ে যথাস্থানে এসে বসে পড়ে।

রত্নময়ী বলে: "আচ্ছা, তোমার হয়েচে কী বল তো? রোজ রাতে কী-সব আজগুবি কথা বল—আমার তো ঘুম নেই চোখে—না, না, না এ-সব ভাল লক্ষণ নয়—কালই ডাক্তার দেখাও—শুনচো?"

উচ্চরোলে হেসে ওঠে রূপকুমার। স্ত্রীর চোখের উপর চোখ তুলে সকৌতুকে বলে: "যা অলীক, যা অসত্য, তাকে এতো বড় করে ভাব কেন?"

"কিন্তু এ-যে ভোরের স্বপ্ন?"

"হোক ভোরের স্বপ্ন, তাতে হয়েছে কী? স্বপ্ন স্বপ্নেই মিলিয়ে যাবে রত্না শক্তিমানের সামনে এসে কোনদিনই দাঁড়াতে সক্ষম হবে না—যাও, এবার যথাস্থানে গিয়ে শয্যা নেও—কেমন?"

*

প্রাত্যহিক কাজ সেরে রূপকুমার এলো তার প্রিয় ড্রইং রুমে—যেখানে সে রোজ আসে, এমনি সকালে। একটা প্রকাণ্ড টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো রূপকুমার। থরে থরে সাজান দেশবিদেশের নানা ধরণের নানাবর্ণের সাময়িক পত্রিকা, চিঠিপত্র,—শেলী, বায়রণের কবিতাগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, শরচ্চন্দ্রের শেষ প্রশ্ন আর সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ। ঘরের আশে-পাশে ছোট বড় টেবিল, চেয়ার, কৌচ, পিয়ানো, আলমারী যথাস্থানে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো-গোছান। টেবিলের সন্নিকটে টিপ'য়ে প্রাতরাশ ঢাকা। দেয়ালের গা'য়ে নরওয়ে ফ্রেমে বাঁধান পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীদের বিচিত্রবর্ণের ছবি। আভিজাত্যের প্রতিটি সেতু যেন আদিম যুগ ধ'রে শিকড় গেড়ে বসে আছে। কী অপরূপ মোহিনী মায়াজালে ঘিরে আছে ঘরটা। অপূর্ব্ব পরিবেশ অথচ একটা থম্‌থমে ভাব। এক কথায় বোঝান শক্ত—কাব্য দিয়ে হয়তো উপমা চলে।

রূপকুমার ইজি-চেয়ারে গা' ঢেলে দিয়ে দু'টো পা' তুলে দেয় পাশের চেয়ারটার উপর। প্রতরাশ শেষ ক'রে পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো উল্টায়। এমনি করে প্রত্যেকটি কাগজ, বই, চিঠি-পত্র চোখ বুলিয়ে রেখে দেয়। কোনটারই উপর নেই কোন আকর্ষণ, মোহ, কৌতূহল। চেয়ারের দুটো হাতলে দুটো হাত রেখে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে কী যেন দেখে। দুটো ছোট্ট ছায়া-মূর্তি, অস্পষ্ট! ধীরে ধীরে তারা যেন অদূরে ঐ গৃহদেবতার দেবমন্দিরে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। রূপকুমার হাত দিয়ে রগড়ে নেয় চোখ দুটো। চোখ তুলে চাইতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে 'মাডুলী' পত্রিকার সম্পাদক

অচীনকুমার, হাতে তার ঝকঝকে বাঁধান পত্রিকাটি। রূপকুমার অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে বলে: "বসুন অচীন বাবু, সকালে কী মনে করে?"

প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্ত পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে অচীনকুমার। 'মাদুলী' পত্রিকাটি এগিয়ে দেয় রূপ-কুমারের হাতে—হেসে বলে: "দেখুন স্তার, কভার পেজটি কী সুন্দর হয়েচে—মানে ট্রাই-কলারে প্রিন্ট।"

হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটি হাতে নেয় রূপকুমার। একটু নেড়ে-চেড়ে বলে: "বাঃ চমৎকার হয়েছে তো! ভিতরের রংটা এমনি হলে তো সার্থক।"

"কোন ত্রুটি হয় নি স্তার,—বলিষ্ঠ লেখকদের লেখা এ-সংখ্যায় ছাপা হয়েচে। আর আপনার প্রবন্ধট অনবদ্য, মানে, চাবুক—মানে এই রকমই তো আজকাল দরকার।"

"নিজের ভালর উপর গুরুত্ব না দিয়ে পাঠক মহলের উপর ছেড়ে দিন—তবে 'মাদুলীর' মামলার খরচটা মাত্র তুলেছি, রুজু করা এখনো বাকী।"

কথাটার গূঢ়ার্থ তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা তথাকথিত সম্পাদক মহাশয়ের মগজের বাইরে। কী একটা ভেবে বলে: "দিন স্তার রুজু ক'রে এবার—মানে জানেন তো অনেক কিছু ওঁদের—মানে, নবারুণ হর্ষ বাবুদের নামে জানেন তো অনেক কিছু ওদের।"

আধপোড়া সিগারেটটা অ্যাস্‌ট্রের ফাঁকে রেখে দিয়ে টেবিলের উপর ঈষৎ ঝুঁকে রূপকুমার বলে: "ঠিক জানেন, জানি?"

"নিশ্চয়ই স্তার! ছোট বেলাকার বন্ধু—আপনার সঙ্গে ঘুরতে দেখি ওঁদের প্রায়ই—বাবাঃ কথার কী তেজ? যেন ঝ'ড়ো হাওয়া!"

"হাঁ বহুরূপী, চেনার ভান ক'রে বলি অনেক কিছু। সত্যিই বলছি কিছুই চিনতে পারিনি ওদের।"

"ওটা আপনার বন্ধুপ্রীতি। আপনি হৃদয়বান, ক্ষমার চোখে সবাইকে দেখেন।"

"মোটেই নয়—ক্ষমা করতে পারলে সত্যকে স্বীকার করতে পারতাম অচীন বাবু! আর পেতামও মনে শান্তি। যে-কথা অহরহঃ মনে প্রশ্ন তোলে, তাকে গ্রহণ, বর্জন, ক্ষমা কোনটাই করা চলে না। আর 'ক্ষমা'র কথা আমি ভাবতেই পারি না। সব-কিছু না-জেনে, না-দেখে, না-শুনে আর্জি পেশ করবেন না, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়বেন! যাক্ অনেকদূর এসেচি—হাঁ অন্ত কিছু খবর থাকে তো বলুন?"

অপ্রস্তুত হয়ে দমে যায় অচীনকুমার। একটা অস্বাভাবিক ঢোক গিলে বলে: "একটা অন্যায় ক'রে বসেছি স্তার, যদি অভয় দেন তবে বলি—মানে ভরসা পেলে।"

"মানের মাত্রাটা কমিয়ে বলুন, কী বলবেন।"

"এই সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছি আপনার অনুমতি না নিয়ে—মানে, ক'দিন বাইরে গিছলেন কিনা তাই! চমৎকার প্লট স্তার, নিউ টেকনিকে লেখা বেশ সহজ সরল সাবলীল গতি···এই দেখুন স্তার!" বলে বিরূপাক্ষের প্রবন্ধটা খুলে ধরে রূপকুমারের চোখের সামনে।

রূপকুমারের পাথরের দেহটা মুহূর্ত্তে ন'ড়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মতো চোখের মণি দুটো জ্বলে ওঠে। প্রবন্ধটা প'ড়ে পত্রিকাটি রেখে দেয় টেবিলের উপর। মিনিট খানেক কী-যেন ভাবে, তারপর বলে: "কপি-গুলো বাইরে ছেড়েছেন কি?"

"আজ্ঞে না স্তার, কাল—পরশুর মধ্যে ইলে পাঠাব ভেবেছি।"

"প্রবন্ধটা সমস্ত বইয়ের পাতা থেকে খুলে ফেলুন—ভবিষ্যতে বিরূপাক্ষের রচনার পাণ্ডুলিপি আমাকে না-দেখিয়ে ছাপবার অর্ডার দেবেন না···বুঝলেন?"

"কিন্তু স্তার!"

"যা বলছি তাই করুন না।"

শঙ্কাকুল মনে 'মানের' শেষ করে অচিন কুমার স্থান ত্যাগ করে।

ঘূর্ণি হাওয়ায় সাগরের ঢেউয়ের মতো চঞ্চল বাঁধন-হীন গতির তালে পদচারণা করতে থাকে রূপকুমার। অস্বাভাবিক ভাবে নাটকীয় ভঙ্গিমায় নিজের খেয়ালেই বলে:—"স্বপ্ন! শক্তিমানের সামনে মাথা উঁচু ক'রে কোনদিনই সে দাঁড়াতে পারবে না।"

"যদি দাঁড়ায়"—বলে হাসতে হাসতে নবারুণ ঘরে প্রবেশ ক'রে চেয়ারটায় ব'সে পড়ে! চঞ্চল দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে:—"কী ব্যাপার, যুদ্ধের আয়োজন করছো নাকি?"

কোন রাক্ষসী মায়াপুরীর কঠিন লৌহদ্বার পেরিয়ে এক শান্ত আবেষ্টনীর মাঝে নেমে এলো রূপকুমার। হাসির বন্যায় গা' ঢেলে বসে পড়ে পাশের একটা কৌচে।

দুজনা মুখোমুখি। দুই সুনিপুণ শিল্পী অনর্গল হেসে চলেছে সৃষ্টির বিপুল রহস্যের রাজমহলে। ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের দু'টি পৃষ্ঠা যেন মোহিনী মায়ায় দু'জনার দুইপার্শ্বে দোল খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে হারবে, কে জিতবে, কোন ভাবীকালের উদার পটচ্ছবি নব-জীবনের আশায় জীবন্ত হ'য়ে চিরদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে কে জানে!

দেয়ালের কোণ থেকে ওঠে একটা টিকটিকি—টক্ টক্ টক্!

উভয়ে সেদিকে তাকায়। থেমে যায় হাসি। রূপকুমার সকৌতুকে প্রশ্ন করে:—"বড় দেরী করে প্রচার করলো নবারুণ।"

"দেরীতেই তো বৃহতের সন্ধান মেলে।"

"ঐ তোমার স্বভাব—বড় বড় কথার মারপ্যাচ—"

"কাজ যখন করবার সুযোগ পাচ্ছি না, তখন কথা ছাড়া বাঁচব কী ক'রে বল,—কাজে যখন নাকো তখন কথা কী আর বেরুবে।"

রূপকুমার বাধা দিয়ে বলে: "থাক্, থামাও তো তোমার বেদান্ত দর্শন আর তর্কশাস্ত্র—এখন বল, এই সকালে কী মনে করে?"

"কিছুই না—সৌভাগ্যক্রমে পা' দুখানা চ'লে এলো, তাই!"

"বক্তৃতা ছেড়ে পেছনে চেয়ে দেখ কে দাঁড়িয়ে!"

নবারুণ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে স্বপ্নকুমার- তার শিশু বাহু দিয়ে চেয়ারটা জড়িয়ে ধ'রে দেয়ালের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে আছে তাকিয়ে। নবারুণ আদর ক'রে কাছে টেনে নেয় স্বপ্নকুমারকে। কোলে বসিয়ে সস্নেহে বলে:—"আচ্ছা খোকন,আমি তোমার কে হই বলতো?"

স্বপ্নকুমার হেসে ফেলে—কচি-কচি দাঁতগুলো যেন মুক্তার মতো ঝক্ ঝক্ করে উঠে। আধ-ভাষায় বলে, "কাকু।"

"মিছে কথা? আমি তোমার কেউ নই।"

শিশু অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলে নবারুণকে বিব্রত করে তোলে—বলে:—"কলে, বাবা, মা, বললে যে"—রূপকুমারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে স্বপ্নকুমার বলে: "কাকু, না বাবা?"

"হাঁ! কতোবার বলবো;"

নবারুণ স্বপ্নকুমারের মুখখানা দেয়ালের দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা খোকন, বলতো ওটা কার ছবি?

স্বপ্নকুমার টপ্ করে বলে: "মহাতা!"

"হাঁ মহাত্মা গান্ধী—"

"ওটা কার ছবি!"

"দেশবন্ধু।"

"হাঁ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।"

"ওটা কার ছবি।"

"নেতাজী।"

"বেশ বেশ! এইবার বলতো তুমি 'কার' মতো হবে!"

স্বপনকুমার রূপকুমারের মুখের দিকে একবার, আর একবার ছবির দিকে কৌতূহল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে সহসা ফিক্ ক'রে হেসে উঠে বলে: "বাবা বলেচে, জানো কাকু?"

"কী বলেছে?"

"বলেচে, দেশবন্ধু, নেতাজী, গান্ধীর মতো হতে হবে তোকে—তই না বাবা?"

দুই বাহু বেষ্টনে জড়িয়ে ধ'রে অজস্র স্নেহচুম্বনে ভ'রে দেয় স্বপনকুমারের মুখ। নবারুণ যুক্তকরে প্রণাম জানায় ঐ-সব দেহাতীত মহামানবদের উদ্দেশে। খোকোনকে লক্ষ্য ক'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে: "যে মহামানবদের নাম আজ তোমার শিশুকণ্ঠে বেজে উঠেছে আমি আশীর্ব্বাদ করি, ঐ মুক্তিত্রাতা মানব ঋষিদের আদর্শে বেড়ে উঠে মানুষের মতো মানুষ হও। দুঃখ-জর্জ্জরিত, ক্ষুন্নিবৃত্তের আশ্বাস দাও—অভুক্ত জনগণের মুখে অন্ন তুলে দাও—অন্ধ-কুসংস্কার, গলিত আভিজাত্যের পঙ্কিল সেতুর সিংহ-দ্বার চুরমার করে ভেঙ্গে ফেল। দূর কর কলঙ্কিত জাতির গৃহদ্বন্দ্ব আর ভেদাভেদ—রচনা কর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ইতিহাস।

নবারুণের হৃদয়ের আবেগময়ী উচ্ছ্বাসবাণীর কণামাত্র স্বপনকুমারের অপরিপক্ক মনের দুয়ারে পৌঁছিল কিনা কে জানে? শুধু অদূরে গৃহদেবতার পূজামন্দিরে বেজে উঠলো মঙ্গল আরতির বিজয়শঙ্খ।

সাহিত্য ও সামাজিক দায়িত্ব

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রতিটি জনপদে আমাদের যে কত আত্মীয় ছড়িয়ে র'য়েছে, এক একটি নতুন ক্ষেত্রে, নতুন পরিবেশে আমাদের পারস্পরিক মিলন-মুহূর্ত্তেই তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। 'দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ' : ঋষির ঐ বাক্য মিথ্যে নয়। বিশ্বের মানব-সমাজ আমরা একই সূত্রে গ্রথিত। একই সূর্য্যালোকে সঞ্জীবিত, একই চন্দ্রালোকে আলোকিত, একই মাটি প্রাণ সঞ্চার ক'রছে আমাদের দেহে। আমরা এক এবং একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযুক্তি থেকেই সাহিত্য।

জীবনের সঙ্গে এই যে জীবনের যোগ—সাহিত্যের কাজ হ'চ্ছে সেই সংযুক্তিকে নিজের ক'রে নিয়ে মানব-তীর্থের পথে পথে নতুন জীবন সঞ্চার করা। যেখানে এই সঞ্চারণ-শক্তির অভাব, শিল্পীর অপটুতার মাঝ দিয়ে বুঝতে হবে—সাহিত্য জীবনকে দর্শন করে নি ; জীবনের আসল দেখাটি, আসল পাওয়াটি সেখানে নকল প্রকাশে ভ'রে উঠেছে। সে-সাহিত্যিক প্রকাশ যতখানি রূপসজ্জা নিয়েই গ'ড়ে উঠুক্ না কেন, শিল্প-নিদর্শনের চরম শীর্ষে তা আরোহন ক'রতে পারে নি। আপনার আমার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, অনুভূতি, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের সর্ব্বাঙ্গীন চিন্তাধারা ও চিত্তের বোধ-শক্তি যে-সাহিত্যের অঙ্গ-সম্বন্ধ হ'য়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেলো না—তাকে একশ্রেণীর সমালোচক রোমান্টিক ভাবালুতা ব'লে আখ্যায়িত ক'রে থাকেন। যুগের ক্রম-ধারায় এ মত-বাদের উপর হয়ত তর্ক জ'মে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু সে তর্কে যোগ দেওয়া বালকসুলভতারই লক্ষণমাত্র। সাহিত্য হবে দেশ ও সমাজের স্বচ্ছ দর্পন-স্বরূপ। দেশ ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থক প্রতিফলন যদি তাতে না ঘ'টলো—তবে তা শিল্পীর মোহাঙ্কিত বিলাসময় অভি-ব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। "Face is the index of mind' : মুখাবয়বের মধ্যে যেমন মানুষের মন মূর্ত্তি নিয়ে জেগে ওঠে, সেই মুখ তেম্‌নি নিজেকে খুঁজে পায় আত্ম-দর্শনের মধ্য দিয়ে দর্পনে। সাহিত্য হবে তেম্‌নি। সমগ্র দেশ, দেশের তরু-লতা, ধূলি-মাটি, জীব-জীবন পূর্ণ সাকারময় হ'য়ে উঠবে সাহিত্যে। এই কথাটিকেই মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে নতুন শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাজ হবে শিল্পাঙ্কন-সাধনায় ব্রতী হওয়া।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে দায়িত্ব বেড়েছে বহু। আমাদের সামাজিক কাঠামো আজ যেমন একদিকে ভেঙে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তেম্‌নি অন্যদিকে স্বাধীনতার অমিয়-স্পর্শে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠচে। এ দু'য়ের মাঝখানে কিন্তু ব্যবধান অনেকখানি। এতদিন আমাদের সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নি ; পদে পদে সংশয়, পদে পদে ইংরেজের রক্ত-চক্ষুর ভয় আমাদের সমস্ত প্রয়াসকে প্রতিহত ক'রেছে, বিপর্য্যয় এনে দিয়েছে আমাদের শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, ধর্ম্মে। এ দেশে সর্ব্ব-প্রথম ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন হ'য়েছিল ইংরেজেরই সরকারী দপ্তরে কাজের সুবিধার প্রয়োজনে। সে-শিক্ষার মোহে প'ড়ে তৎকালীন বঙ্গসমাজে একশ্রেণীর বাবু গ'ড়ে উঠেছিলেন—যাঁদের অধস্তন পুরুষেরা আজও নেক-টাই প'রে পাইপে চুরুট টেনে সভ্যতার ধারকরূপে বিরাজ ক'রছেন। ইংরেজ আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রের যথেষ্টতর ব্যাপকতার প্রবর্ত্তনা ক'রেও তার ভাষা ও সংস্কৃতির যে দীপাধারটি এনে এ দেশের মাটিতে বসালো, তা ক্রমে বঙ্গসমাজকে আলো দান না ক'রে বরং মরীচিকার জালে চোখ ঝ'লসে দিল। মোহ-মুদ্গরের মতো একশ্রেণীর মানুষ আইনের শাসনে, শ্বেতাবের শিক্ষায় ও ব্যক্তিগত পদাধিকারের লোভে রীতিমত আধা-ইংরেজ হ'য়ে উঠলো—যার 'ট্র্যাডিশন' আজও চ'লেছে। গত দু'শো বছর ধ'রে আমাদের সমস্ত ঐতিহ্য আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল ইংরেজি আচার-পদ্ধতিতে। আমাদের যে শক্তি আছে, আমাদের যে সাহস আছে, এ কথা বিস্মৃত হ'য়ে ছিলাম আমরা ; একটা সামগ্রিক সন্ত্রাস এসে বাসা বেঁধে ছিল আমাদের হৃদয়-রাজ্যে।

হৃদয়কে তাই কোথাও খুলে দেখাতে পারি নি, সত্যকে চেপে যেতে হ'য়েছে সর্ব্বত্র।

আজ দেশ থেকে ইংরেজ অপসারিত হ'য়েছে, দেশ আজ আত্মশাসনাধীন। আজকের সাহিত্য নির্ভয়ের সাহিত্য, সত্যকে সত্য ব'লে প্রকাশ ক'রবার সাহিত্য। আমাদের বাঙালী-জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান যদিও সীমাবদ্ধ, তবু তার মাঝ দিয়েই আশার কথা এই যে, সাহিত্যধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা আজ ধীরে ধীরে রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখনও যে সন্ত্রাস অপসারিত হ'য়েছে, তা নয়। সব দিক থেকে আজ একটা বিপুলতর ভাঙন ও পরিবর্ত্তনের যুগ চ'লেছে পৃথিবীতে। আমাদের দেশের সমস্যাও সেখানে একেবারে কম কি! এই ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়েও বাঙালী শিল্পীরা একদিকে স্বাধীনতা-ব্রতকে গ্রহণ ক'রেছিলেন সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে; যদিও আমাদের কাম্য-স্বাধীনতা আমাদের সমষ্টিগত জাতির জীবনে আজও অবধি দেখা দেয় নি, তবু শাসন-ক্ষমতা আজ দেশ-নায়কদের হাতে এসেছে। (আমাদের অপূর্ণ আকাঙ্খা শীঘ্রগিরই ফলবতী হবে মনে করি)। অন্তদিকে তেমনি জাতীয় শিক্ষা ও আনন্দের বাণী বহন ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। সমস্ত কিছু দুঃখ, বিপদ, ঝঞ্ঝা ও দুর্দ্দিনের মধ্যেও তাঁরা সত্যের মশাল-হাতে অগ্রনী হ'য়েছেন দেশের পুরোভাগে। জাতির ভাগ্যে একান্ত শান্তি ও সান্ত্বনার স্বাক্ষর হ'চ্ছে—'৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পুণ্য দিনটি—যেদিন থেকে ইংরেজ শুধু এ-দেশের মর্ম্ম-ফলকে শুধু স্মৃতি হ'য়েই জড়িয়ে রইল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হ'য়ে আর এখানকার আকাশকে প্রকম্পিত ক'রবার অধিকার পেলো না। স্বাধীনতার বিজয়-শঙ্খ বাজলো ভারতবর্ষের মাটিতে। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও কি আমাদের দুর্দ্দিনের ঘনঘোর অমানিশার সন্ত্রাস কেটেছে? কাটে নি। স্বাধীনতা এসেছে মাটিকে খণ্ড-ছিন্ন ক'রে, সহস্র ভাবে দেশকে বলি ক'রে। দেশ ভাগ হ'য়ে পশ্চিমবঙ্গ আর পাকিস্থানে বিভক্ত হ'য়ে গেছে স্বর্ণপ্রসূ বাংলা। আজ মানুষের বাস্তুভিটের ঠিক নেই, খাদ্য-সংস্থানের প্রকৃত ব্যবস্থা নেই। বিতাড়িত পশুর মতো মানুষ ছুটছে আজ এক অঞ্চল থেকে আর-এক অঞ্চলে। কোথাও স্থিতি নেই, কোথাও প্রতিশ্রুতি নেই সার্থক জীবন-যাত্রার। দুর্মূল্যের বাজার, অনবরত দুর্ভিক্ষ উঁকি দিচ্ছে চারপাশ থেকে। দুর্ভিক্ষ ভিন্ন একে আর কি ব'লবো? মানুষের ক্রয়-শক্তির বাইরে গিয়ে যখন বাজার দাঁড়ায়,—যখন ভাতের অভাবে মুড়ি চিবিয়ে, মুড়ির অভাবে ছাতু খেয়ে অর্দ্ধা-শনে দিন কাটাতে হ'চ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষের, তখন দেশের এই অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ ভিন্ন আর কি নামে আখ্যায়িত করা যায়?—এই যে নিগ্রহময় পরিবর্ত্তনের যুগ চ'লেছে, এখানে সত্যিকারের সাহিত্যের বেঁচে থাকা কঠিন। আসলে জীবনের শিল্পবুদ্ধি ও তন্ময়তার মধ্যেই তো সাহিত্যের জন্ম! সে জীবন আজ বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষীপ্ত, পর্য্যুদস্ত। জীবনের বীণা যেখানে সুরে বাজে না, সেখানে সার্থকতায় জয়যুক্ত হবে কেমন ক'রে সাহিত্য! —এতকিছু ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও আমাদের আনন্দের কথা এই যে, বাংলাসাহিত্য এখনও নব নব শাখায় পল্লাবত হ'য়ে উঠচে। আধুনিক সমালোচক-দের দৃষ্টিতে সে-সাহিত্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীনতা প্রকাশে অপটু হ'লেও সমাজের সর্ব্ব স্তরে গিয়ে নাড়া দিয়েছে। এই সন্ত্রাসময় দুর্ভিক্ষ-সঙ্কুল পরিবর্ত্তনশীল যুগে আমাদের মাতৃ-ভাষাকে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে তার স্বকীয় ঐতিহ্য ও গৌরবে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব দেশের শ্রেণীহীন গণ-জীবনের উপর ন্যস্ত। শিল্পীদের নির্ভর-যোগ্য অনুকূল জীবনযাত্রার মধ্যে যাতে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে পারে—তার দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন জনসাধারণের। কারণ জনসাধারণই সাহিত্যের মূলাধার ও মূল কেন্দ্রস্থল। জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছু নির্ভর করে সুষ্ঠু জীবন-যাত্রার উপর: কি শিল্পী-জীবন, কি আপামর সর্ব্বাঙ্গীন সমাজ-জীবন। কোনো একটিতে ভাঙন ধ'রলেই শিল্পের মৃত্যু, সংস্কৃতির মৃত্যু।

আজ দ্বিখণ্ডিত বাংলায় বাংলা ভাষার স্থান ক্রমেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে আসচে। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের পাতা ন'ড়ে উঠেছে: সেখানে দশ আনি ছ' আনি হ'য়ে গেছে বিদ্যায়তনগুলি। তৎসত্ত্বেও স্বস্তির

কথা এই যে, দশ-আনি-প্রধান পূর্ব্ব-পাকিস্তান-সরকার সেখানকার শুভবুদ্ধি-প্রবণ জনসাধারণের একান্ত দাবীতে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এতে বাংলা-ভাষার প্রযোজকদেরই বিশেষ গৌরবের কথা। কিন্তু ছ'-আনি-প্রধান পশ্চিম-বাংলার সমস্যা আজ জটিল হ'তে জটিলতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র তার সীমানা-সংস্থাকে কেন্দ্র ক'রেই। এই কারণেই কার্জ্জন-আমলের শাসন-নীতির চাপে প'ড়ে তৎকালে বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছিল, বাংলার সাথে সেগুলোর পুনঃসংযোজনার দাবী নিয়ে আজ নতুন ক'রে জন-মত গ'ড়ে উঠেছে। পশ্চিম বাংলার এ দাবী তার ন্যায্য দাবী। এ দাবী সরকারী মহল কর্তৃক কার্য্যকরীরূপে স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু বাঙালীর সমাজগত জীবন মাত্রই নয়, তার ভাষা-সংস্কৃতিরও ক্রমবিলীনতা অবধারিত। ভাষাগত প্রদেশ-গঠনের কথা কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হ'য়েছিল দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই, আবার নতুন ক'রে তার আলোচনা চ'লেছে কমিশন-গঠনের ভিত্তিতে। এখানেও একটা বড় রকমের কিছু 'প্লেবিসাইটিক' অভিনয় সুরু হবে কিনা, বলা শক্ত। বহুতর ক্ষেত্রেই আজ 'বাঙা খ্যাদা' আন্দোলন সুরু হ'য়ে বাঙালী মাত্রেরই গায়ে আঘাত হানা হ'য়েছে। জাতীয় সরকার তথা কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদিও উক্ত অঞ্চলগুলির এই-জাতীয় মনোবৃত্তিকে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা ব'লে নিন্দা করা হ'য়েছে, তবু এর মূল উপশম হয় নি; স্পষ্টতঃই লক্ষ্য ক'রে দেখা যাচ্ছে—সমস্ত দিক থেকে বাংলা, তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর আজ একটা বড় রকমের চাপ এসে প'ড়েছে।* সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে আজ বাংলা কেঁচোর মতো মাটির নিচে আশ্রয় নিতে ব'সেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ যেমন তার উপযুক্ত নায়কের অভাব, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তাই। ভারতের রাষ্ট্রভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে কিছুকাল সগৌরবে বাংলাভাষাকে দাঁড় করানো হ'য়েছিল। আজ সে হুজুগ (!) অনেকখানিই প্রশমিত হ'য়ে আসছে ব'লেই মনে হয়। আজ মতবাদের অন্ত নেই বাজারে। কেউ চান সংস্কৃতকে, কেউ চান হিন্দিকে, কেউ চান গান্ধিয়ানী উর্দ্দু-হিন্দি-মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষার রাষ্ট্রীয় প্রবর্ত্তন। এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি নিয়ে যথার্থ ই কি বাংলা ভাষা দাঁড়াতে পারে? অথচ ধ্রুব-কথা ধ্রুব যে, সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানে বাংলাই একমাত্র সমৃদ্ধ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ভাষা—যাকে সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে, সমাজ ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে তিলে তিলে পূত-পবিত্র ও প্রাণময় রসসিক্ত ক'রে সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ন্যায় রত্ন-সন্তান। সেই বাংলা আজ রিক্তা, অসহায়া। তাকে বাঁচাবার একমাত্র দায়িত্ব আজ জনসাধারণেরই হাতে। যতবড় সঙ্ঘাতই আজ সমুদ্যত হ'য়ে থাক্ না কেন মাথার উপরে, তার মধ্যেই সত্যকে ধ্রুবতারা ক'রে নির্ভয়ে মাথা উঁচু ক'রে সার্থক কর্ম্মসংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে আজ বাঙালীকে, বাংলার জন-সাধারণকে।

বাংলার জনসাধারণ অর্থে আজ শুধু বাঙালীকেই বোঝায় না, কোনোদিন হয়ত বোঝাতো। আজ বাংলার মাটি 'ওপ্‌ন্ ল্যাণ্ড্' (Open Land) হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অ-বাঙালীদের কাছে। আজ তাদেরই প্রভুত্বের পসরা সাজানো চারপাশে। সেই অগণিত গণ-গণেশকে প্রণাম ক'রেই তবে বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্মারম্ভ বহুতর ক্ষেত্রে। রুমালে চোখ ঢেকে তাই তাকে সুদূর আরাবল্লীর প্রান্ত থেকেও শুনতে হয়—'বাঙালী ভীরু, বাঙালা শুধু কাঁদতেই জানে।' পর্ব্বত-প্রকাম্পিত সেই বাণীকে কি সত্যিই আমরা ব্যর্থ

* বিহার-সরকার কর্তৃক পুরুলিয়া জিলা-স্কুলে হিন্দিকে জন-পূর্ব্বক শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রযোজনা বিশেষভাবে একটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলার বাইরে এমন ঘটনা অভিনব কিছু নয়। বাঙালী-প্রধান অঞ্চল তথা শিক্ষায়তনগুলির উপর এইভাবে ক্রমাগত অভিঘাত জ'মে উঠছে।

ক'রতে পেরেছি ? বাবুরাও প্যাটেলের বোম্বাই-ভাষণটিও উল্লেখযোগ্য : 'The Bengalees are a race of lazy and unenterprising thinkers, they eat too much, sleep too long, talk too much and work too little.' বাংলার শত শত শহীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, শত শত মনীষীর নিঃস্বার্থ দান সে কি আজ সত্যিই তবে কিছু নয় ? একদিন মহামান্য গোখেল কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ ক'রেছিলেন—'What Bengal thinks to day, India thinks to-morrow.' সেদিন কর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি আর সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান-প্রসূত সংস্কৃতি আলো দেখাতো সমগ্র ভারতকে। সে আজ বেশীদিনের কথা নয়। আজই কি সেই আলোক-বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হ'য়েছে বাঙালীর হাতে! হয়নি। বাঙালীর শৌর্য্য, বীর্য্য ও কীর্ত্তির যশ পলাশী থেকে কোহিমা, কোহিমা থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত, বিনন্দিত। কিন্তু ইতিহাসের পটক্ষেপে আজ সুরের তারতম্য ঘ'টেছে। আজ সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত বুঝি একমাত্র টিকতে ব'সেছে 'বন্দেমাতরম' আর 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক'-এর কাঠামোটুকু শুধু! সংস্কৃতিময়ী বাংলার মূর্ত্তিমতী প্রাণ-লক্ষ্মীর পরম পরিতৃপ্ত ভিন্ন কি!

এমনই এক একটা যুগ আসে দেশ ও জাতির জীবনে। জীবন-সমুদ্রের সাম্যরা তখন ডাক ছেড়ে বলে : 'সামাল সামাল ডুবলো তরী।' কিন্তু কে সামলায় সেই তরী ? আজ সেই তরী সামলাবার ভার একমাত্র জনসাধারণেরই উপর ন্যস্ত। বহুতর সমস্যার ভারে পীড়িত হ'য়ে, বহুতর কণ্টকে কণ্টকিত হ'য়ে আজ যদি বাঙালী জনসাধারণ সত্যিকারের নিষ্ঠা ও যথেষ্টতর আত্মত্যাগের দ্বারা বাংলার শিল্পসাহিত্যকে তথা জাতির মেরুদণ্ডকে রক্ষা ক'রতে না পারে, তবে বাংলার সংস্কৃতিময় প্রাণ-পুরুষের পূর্ণ সমাধির দিনটিও বড় বেশী দূরে নয়।—কোনো কোনো সমালোচক হয়ত উক্তিগুলোকে ঘোরতর প্রাদেশিকতার অপরাধে অভিযুক্ত ক'রে নতুন কোনো "criminal code'-এর পাতা খুলে ব'সতে পারেন, কিন্তু সবার আগে নিজের মাকে রক্ষা করার প্রশ্ন ; সেখানে সত্যকে চেপে যাওয়া আরও বেশী criminal.

বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা-সাহিত্য তার ন্যায্য আসন পেয়েছে। এই নিয়েই আজ তৃপ্ত বা পুলকিত হবার কারণ নেই। যাতে সেই আসন, সেই ঐতিহ্যের গরিমা প্রোজ্জ্বল হ'য়ে আরও দীপ্ততর ভাস্বর রশ্মিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিরাজ করে, তারই জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজ একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই ব'লেছি—কি শিল্পী-জীবন, কি আপামর সর্ব্বাঙ্গীন সমাজ-জীবন—কোনো একটিতে ভাঙন ধ'রলেই শিল্পের মৃত্যু, সংস্কৃতির মৃত্যু। এ-সব কিছুর মূলাধার একমাত্র জনসাধারণ। জনসাধারণের মধ্যেই যেমন শিল্পী র'য়েছেন, শিল্পীর মধ্যেও তেম্নি জীবনধর্ম্মে উজ্জীবিত হ'চ্ছে জনসাধারণ। শিল্প-প্রয়াস বা শিল্পীর সাধনা যেখানে ব্যহত হ'চ্ছে—তাকে রক্ষা ক'রবার একমাত্র হাতিয়ার সেখানে জনসাধারণেরই হাতে। এক-একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে নতুন ক'রে জন্ম নিচ্ছে সমাজ। এমন প্রতিভার আবির্ভাব তো কতবারই লক্ষ্য ক'রেছি যুগে যুগে। তাঁরা যে সমাজকে রেখে গেলেন, যে সুন্দর পরিকল্পিত দেশকে গেঁথে রেখে গেলেন তাঁদের কর্ম্মে ও চিন্তায়, সেই সমাজ ও দেশের মানুষদের মধ্যেই র'য়েছে তাঁদের অধীত অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদনার সুচারু-প্রস্তুতা। আজ সে-কাজকে নানাভাবে নানাক্ষেত্রে রূপ দিতে হবে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, হলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়েই বন্দনা ক'রতে হবে প্রত্যাসন্ন প্রশান্ত উষার। যখন চারদিক থেকে বিপর্য্যয় ঘনিভূত, তখনই যে সত্যিকারের সার্থক কাজের মুহূর্ত্ত। ভাবী বংশধরদের জন্য সঞ্চয় রেখে যাবার এই তো প্রশস্ত সময়। এ-সময়কে এড়িয়ে যাওয়া মানেই হ'লো আত্মনিমজ্জন, আত্মঘাত। বাংলার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যই যদি না বাঁচলো তবে বাঁচবে কি নিয়ে বাঙালী ? আজ কেবল 'কালচার'-এর জিগীর তুললেই কাজ মিটে যাবে না। সেই 'কাল্চার'কে একদিকে ধারণ ক'রতে হবে নিজেদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধির দ্বারা, প্রত্যেকটি নাগরিককে সংস্কৃতিবান ক'রে গ'ড়ে তোলার দ্বারা ; তেম্নি অন্যদিকে তাকে বহন ক'রে নিতে হবে ভৌগোলিক সীমা-ব্যাপ্তির বৃহত্তর সম্ভাবনার মধ্যে। এর গুরু দায়িত্ব নির্ভর ক'রছে একমাত্র জনসাধারণেরই উপরে। সামাজিক জীব হিসেবে কেউ কাউকে ছেড়ে থাক্বার নয় ; গোড়ায়ই ব'লেছি : প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের প্রত্যেকের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ ঘনীভূত হয় সম্প্রীতির দ্বারা, সারল্য ও সহজতার দ্বারা। সাহিত্য হ'চ্ছে এই ত্রয়ী সাধনার মূল প্রাণবস্তু। এই প্রাণকে জাগাতে হবে, বাঁচাতে হবে—তবেই চিরন্তন বিশ্ব-চেতনার মধ্যে, বাংলার, বাঙালীর তথা বাংলা-ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্থিতি ও জীবন-সমৃদ্ধি।

---

* সুন্দরবন (মাধবনগর) সাহিত্য-সম্মেলনে (পৌষ, ১৩৫৫) উদ্বোধনী-ভাষণের সারাংশ।

গান্ধীজীর জীবন-মৃত্যু

শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ

জীবন আমার বাণী আমার, মৃত্যু আমার ধ্যান,
ভারত আমার জীবন আমার, মৃত্যু আমার শ্যাম।
জীবন আমার ঘর আমার, মৃত্যু আমার পথ,
বিশ্ব যেথায় অচল আছে সেথা চালাই রথ।
জীবন আমার মিলনগীতি মৃত্যুসুরে সাধা--
সম্মিলিত বিশ্ব আমার প্রাণের সুরে গাঁথা।
জীবন আমার মৃত্যু শুভ, মৃত্যু নব জীবন ;
অন্ধজনের ব্যথার বোধে আমার মন-বোধন।
মৃত্যু অমা-শুক্ল-নিশা জীবন আমার দিন,
হিংসা-ন্যায়ে মৃত্যু আমার জীবন সংজ্ঞাহীন।
মৃত্যু পরমাত্মা আমার প্রকাশ জীবন-দেহে—
সেবাগ্রামে জীবন আমার মৃত্যু সবরমতী ;
এই পৃথিবীর ভুলের আগুন জীবন আমার দহে,
চোখের জলে ভাসায় বিশ্ব আমার মৃত্যু-রতি ॥

নেতাজী

শ্রীসুবোধ রায়

ধর্ম্ম যবে গ্লানিময় অধর্ম্মের বন্ধধারা জলে,
মানব যখন বন্দী দানবের স্বার্থের শৃঙ্খলে,
নটনারায়ণরূপে যুগনাট্য পঞ্চমাঙ্ক শেষে
আসো নব নান্দী ল'য়ে,—নবযুগসূত্রধারবেশে।
তব নব মন্ত্রবাণী,—কথা নয়, কালান্তর-ভেরি,
নরনারী ছুটে চলে,—নাহি দ্বিধা, করেনাকো দেরি।
দারুণ দুর্য্যোগভরা ভারতের কালরাত্রি শেষে,
তেমনি কি এলে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীর বেশে ?
তাঁহার আহ্বানবাণী,মনে হোলো তোমারি সে ডাক ;
কুরুক্ষেত্রমাঝে যেন বেজে ওঠে পাঞ্চজন্য শাঁখ।
সে-দিনের মুক্তিযজ্ঞে শুনি সেই উদাত্ত আহ্বান,
ধনপ্রাণ সব দিয়া ধন্য হোলো সহস্রের প্রাণ।
এখনো অপূর্ণ ব্রত !—তাই কি গো অভিমানভরে
এলে না স্বদেশে ফিরে, হে নেতা, রয়েছ দূরে স'রে ?
আজি তব জন্মদিনে তোমা' স্মরি' করি এ-শপথ—
থামিবে না, থামিবে না—এই স্বাধীনতা-জয়রথ।
দেশের ললাট হ'তে দিব মুছি' দাসত্বের কালি,
মাতৃমুক্তি-মহাযজ্ঞে শেষপ্রাণ-বিন্দু দিব ডালি।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

[দ্রাবিড় বা মেডি টারেনীয়ান গোষ্ঠী]

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে সকল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নেগ্রিটো সংমিশ্রণের স্তর। নেগ্রিটো সংমিশ্রণের পরের স্তর প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠী। ইহার পরের জাতিসংমিশ্রণের স্তর দ্রাবিড় বা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত। এই দ্রাবিড় বা মেডিটারেনীয়ান সংমিশ্রণ সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক হইয়াছে। বিতর্কের অন্তরালের তথ্যটি বুঝিতে অসুবিধা না হয় এজন্য এই বিতর্কের খানিকটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধটিকে দ্রাবিড় বা মেডিটারেনীয় গোষ্ঠীভুক্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের পরিচয়ের ভূমিকা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই গোষ্ঠীর প্রধান দৈহিক লক্ষণ লম্বামুণ্ড। কিন্তু নিষাদগোষ্ঠীও লম্বামুণ্ড। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় পরে বলা হইতেছে। এই গোষ্ঠীর দ্রাবিড় বা মেডিটারেনীয়ান নামকরণ কেন হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এখানে বলা আবশ্যক যে নিষাদগোষ্ঠীর আদিবাসী বাদে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সকল লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর অধিবাসীকে ডাঃ গুহ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলেন। তাঁহার মতে এই গোষ্ঠীর কয়েকটি শ্রেণী আছে এবং কোন কোন অঞ্চলে এই গোষ্ঠীর সহিত অন্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ আছে।

সে যাহা হইক, Dravidian বলিতে সাধারণতঃ তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাভাষী দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলিকে বুঝায়। Dravidian কথাটি দ্রাবিড়ের ইংরেজি অনুবাদ। তামিল জাতির প্রাচীন নাম দ্রাবিড়। তামিল জাতি ও তামিল ভাষা সম্বন্ধে প্রযুক্ত এই প্রাচীন নামটির অতি ব্যাপক ভাষা-তাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ড্রাবিডিয়ান থিওরী সম্বন্ধে ইহার পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে, এখানে এই কথাটির নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার উল্লেখ করা হইতেছে। দ্রাবিড় পদটিকে এই ব্যাপক সংজ্ঞা প্রথমে দিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত বিশপ ক্যাল্ডওয়েল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বিশপ ক্যাল্ডওয়েল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী না হইলেও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীরা যে একটি পৃথক্ জাতি এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা তখন হইতে একটি পৃথক দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ সিভিল সার্ব্বিসের চাকুরীয়া ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী স্যর হারবার্ট রিজলে। রিজলে সাহেব বাঙ্গালী জাতিকে দ্রাবিড় ও মোঙ্গল গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিলে এদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার অনেক সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। রিজলে সাহেবের ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে বহু গলদ বাহির হইয়াছে। বড় একটি গলদ এই যে, তিনি প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠীকেও দ্রাবিড় বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন, আদিবাসী ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে তাঁহার মতে কোন পার্থক্য নাই। রিজলের পরবর্ত্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা নিষাদ গোষ্ঠী ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া নিষাদ গোষ্ঠীকে প্রাক্‌দ্রাবিড়ী (Pre-Dravidian) আখ্যা দিয়াছেন। দ্রাবিড় জাতি বলিয়া যে স্বতন্ত্র একটি জাতি দক্ষিণ-ভারতে রহিয়াছে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার পরে দেখা যায় যে Dravidian কথাটি যে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে ভাষাবিজ্ঞানের কথা এবং নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহারে জটিলতা ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া কোন কোন আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী জাতি সংমিশ্রণ ও জাতি লক্ষণের

আলোচনায় এই কথাটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা Dravidian কথাটির পরিবর্ত্তে মেডিটারেনীয়ান কথাটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পরে তথাকথিত Dravidian জাতির মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর গ্রন্থের পৃষ্ঠায় এবং সাধারণ লোকের মনে ইহা এখনও সুস্থ শরীরে জীবিত আছে দেখা যায়।

যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর কথা এখানে বলা হইতেছে তাহার প্রাক্তন Dravidian নাম হইতে দ্রাবিড় দেশ ও ভারতবর্ষের সহিত তাহার সম্পর্ক বুঝিতে অসুবিধা হইত না। অবশ্য গোড়ায় ইহারা যে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছিল, বেলুচীস্থানের ব্রাহুইদিগের উল্লেখ করিয়া অনেক পণ্ডিত তাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই গোষ্ঠীর মেডিটারেনীয়ান নাম হইতে এই কথা স্পষ্ট হইতেছে যে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে এই গোষ্ঠী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর এই প্রকার নামকরণ করিয়াছেন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Sergi। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, উত্তর-আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চল এবং নিকটবর্ত্তী এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর উৎপত্তি কেন্দ্র এবং এই গোষ্ঠীর যে সকল শাখা দেখা যায় সেই সকল শাখার উদ্ভব হইয়াছিল এই অঞ্চলে। এই অঞ্চল হইতে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী পূর্ব্ব ও পশ্চিমমুখে ছড়াইয়া পড়ে। য়ুরোপের দক্ষিণ অঞ্চলের জাতিগুলি প্রধানতঃ এই গোষ্ঠীয়।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ঈলিয়ট স্মিথ এই গোষ্ঠীর মেডিটারেনীয়ান নামকরণ অনুমোদন করেন না। তাঁহার মতে ব্রিটিশ দ্বীপগুলি ও ফ্রান্সের নূতন প্রস্তর-যুগের অধিবাসী, মিশরের অধিবাসী ইথিওপিয়ার কতকগুলি উপজাতি, আরব ও পারস্য উপসাগরের উপকূলের অধিবাসী, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, শিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীকে এক শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। তিনি এই গোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন ব্রাউন রেস। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মেডিটারেনীয়ান, সেমিটিক ও হেমিটিক গোষ্ঠীর জাতি আছে।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে মেডিটারেনীয়ান জাতির সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে তাহার কথায় আসা যাউক। ইহারা কবে ও কোন পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই যে, তাহারা মেসোপটেমিয়া হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং তাহাদের ভারতবর্ষে আসিবার সময় খৃঃপূঃ ৪০০০ বৎসর বা তাহার পূর্বে। সিন্ধু সভ্যতার যুগের পূর্বে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—কেহ কেহ এই প্রকার অনুমান করেন।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর যে সকল দৈহিক লক্ষণের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হইতেছে। মধ্যমাকৃতি দৈর্ঘ্য, মুখ ডিম্বাকৃতি, নাসিকা সরল ও উচ্চ কিন্তু মোটা। (nose straight, leptorrhine, but rather broad)। নিষাদ গোষ্ঠী লম্বামুণ্ড, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য এবং মুখ ও নাসিকার গঠন ভিন্ন, গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ কৃষ্ণ।

এখন দেখা যায় যে, লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে নিষাদ গোষ্ঠী বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে বাদ দিলে যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহারা সকলে এক টাইপের নহে, তাহাদের মধ্যে দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিভাবে ইহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা যায় তাহা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের নিকট সমস্যার বিষয়।

এই সমস্যার একটা সমাধান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইহারা সকলেই মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর কিন্তু এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাভুক্ত। যে ধরণের যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা কতকটা এই রকমের : মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর উৎপত্তি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে হইয়াছিল সন্দেহ নাই এবং এই গোষ্ঠীকে এখন প্রধানতঃ দক্ষিণ য়ুরোপের দেশগুলিতে দেখা যায় তাহাও ঠিক। কিন্তু ইহারা য়ুরোপের মেডিটারেনীয়ান টাইপের লোক। ভারতবর্ষে যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে মেডিটারেনীয়ান বলা হইয়াছে তাহারা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে আসিয়াছে, কিন্তু সকলে এক সময়ে আসে নাই। বিভিন্ন

শাখাভুক্ত জাতি বিভিন্ন সময়ে আসিয়াছে। কোন টাইপ কোন সময়ে আসিয়াছিল তাহা মোটামুটি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

য়ুরোপীয় মেডিটারেনীয়ান টাইপের জাতি আসিয়াছিল সিন্ধু সভ্যতার যুগে। মোহেঞ্জোদারো নাল ও মাক্রাণে এই টাইপের জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের মেডিটারেনীয়ান জাতি এই টাইপের, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মত এইরূপ। তাহাদের পূর্বে আরেকটি টাইপের জাতি আসিয়াছিল। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্যালী-মেডিটারেনীয়ান (Palae-Mediterranean)। প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে এই টাইপের জাতির প্রতিনিধিদিগকে দেখা যায়। সকলের শেষে যে টাইপের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে প্রাচ্য-জাতি (Oriental race)। এই জাতিকে উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অন্য জাতির সহিত সংমিশ্রিত দেখা যায়।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর যে শাখাকে প্যালী-মেডিটারেনীয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে, অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে তাহারাই দ্রাবিড় বা Dravidian জাতি। এই শাখার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন ইহারা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। অন্য দল বলেন দাক্ষিণাত্যের তৃণময় অঞ্চলে (open grass lands of the Deccan) প্রাচীন নিষাদ গোষ্ঠী হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন এই জাতি বিদেশ হইতে আসিয়াছিল, তাঁহাদের মত এই যে, উত্তর মিশরের 'প্রি-ডাইনাষ্টিক' আমলের সমাধিক্ষেত্রে যে টাইপের লম্বামুণ্ড জাতির করোটি পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত দক্ষিণ-ভারতের এই প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান টাইপের সাদৃশ্য এত বেশী যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এই জাতি ছড়াইয়া ছিল।

লম্বামুণ্ড নিষাদ গোষ্ঠী হইতে প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান, প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান হইতে য়ুরোপীয় মেডিটারেনীয়ান ও য়ুরোপীয় মেডিটারেনীয়ান হইতে প্রাচ্য জাতি, এইভাবে লম্বামুণ্ডগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা হইলেও দেখা যায় যে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অন্যান্য দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য বিচার না করিয়া সকল লম্বামুণ্ড জাতিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করিতে ইচ্ছুক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইলয়ট স্মিথের ব্রাউন রেসের উল্লেখ করা যায়। প্রাচীন মিশরী ও আধুনিক মিশরী তাঁহার মতে ব্রাউন রেস। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বাক্সটনের মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, উত্তর হইতে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর দুইটি অভিযান ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসী (Pre-Dravidian) প্রথম ঔপনিবেশিক দলে ছিল, দ্বিতীয় দলে যাহারা ছিল তাহারা Dravidian. এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য নাসিকার গঠনে এবং এই পার্থক্য জলবায়ুর প্রভাবে ঘটিয়াছিল।

বাক্সটনের মত হেডন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই মতের উল্লেখ করা হইল Dravidian কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের বিরোধ এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কিরূপ কঠিন, তাহা দেখাইবার জন্য। এই কথা আরও অনেকবার বলিবার প্রয়োজন হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর তিনটি টাইপের সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে সেই তিনটী টাইপের পার্থক্য অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, তাঁহারা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর এইরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকার না করিলেও দক্ষিণ-ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য Dravidian নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আসল প্রশ্ন, দক্ষিণ-ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসী ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসীদিগের মধ্যে যে দৈহিক লক্ষণের কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়, কি ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। রিজলে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, দক্ষিণ ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসী, দ্রাবিড় জাতি ও

উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসী আর্য জাতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া। এই উত্তর পরবর্ত্তী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা নানা কারণে অসন্তোষজনক মনে করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই কথা বলিয়া যে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড অধিবাসিগণ মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর দুইটি টাইপের। দক্ষিণ ভারতের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী প্যালী মেডিটারেনীয়ান ও উত্তর ভারতের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী শুধু মেডিটারেনীয়ান। প্রথম জাতির সম্পর্ক মিশরের বাদারীয়ান টাইপের সহিত, দ্বিতীয় জাতির সম্পর্ক য়ুরোপের মেডিটারেনীয়ান টাইপ অর্থাৎ দক্ষিণ ইটালী, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, গ্রীক দ্বীপগুলির অধিবাসীদিগের সহিত।

বর্ত্তমান আলোচনায় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের নির্দ্দিষ্ট পথই বরাবর অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন সন্দেহ উঠিলে তাহা প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া যাইবার কোন কারণ নাই। এখানে একটি সন্দেহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা মনুষ্য-সমাজকে উন্নতিশীল ও আদিম অবস্থায় অবস্থিত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। সকল উন্নতিশীল, লম্বামুণ্ড, মাঝারি দৈর্ঘ্যের, সরল নাসা জাতিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করিবার, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে সকল লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতির আদি বাসভূমি বলিয়া মনে করিবার কি বিচারসহ প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে? ঈলিয়ট স্মিথ সেমাইট, কোন কোন হেমাইট জাতি ও যাহাদিগকে প্রকৃত মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলা যায় তাহাদের সকলকে একদলে ফেলিয়াছেন। সেমাইটগণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও আরবে গিয়াছিল—ইতিহাস এ কথা বলে না। মেডিটারেনীয়ান নামটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যে মনুষ্য-গোষ্ঠীর বাস ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নাম।

এই বৈশিষ্ট্য কি, তাহা মোটামুটি বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু সকলে একমত নহেন। ইহার ফলে অবস্থা কতকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত বা ভূমধ্যসাগরীয় টাইপের সহিত সম্পর্ক প্রমাণ করা সম্ভব হউক বা না হউক, লম্বামুণ্ড, মধ্যম দৈর্ঘ্য, সরল নাসা অথবা লম্বামুণ্ড, হাল্কা গড়নের জাতিমাত্র মেডিটারেনীয়ান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বাক্‌সটনের মত ইহার প্রমাণ। এই ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা কঠিন।

ডাঃ হাটন এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠনে মেডিটারেনীয়ান প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে যে মেডিটারেনীয়ান জাতি আসিয়াছিল তাহারা ছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মেডিটারেনীয়ান নামটি ব্যবহার করিলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন Dravidian মতবাদে বিশ্বাসী।

ইহার পর দক্ষিণ ভারতের মেডিটারেনীয়ান জাতির কথা বলা হইবে।

নিঃসঙ্গ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমিও তোমারি মত নিঃসঙ্গ ধরায়,—
হে ধূসর মহামৌন বিষণ্ণ আকাশ
সায়াহ্নের! কেহ নাই—যতদূর চাই,
হু হু করে মুহুর্মুহুঃ মোর মর্ম্মতল
প্রধূমিত ব্যর্থতার কোন্ বেদনায়!
কোলাহলমুখরিত বিপুল সংসার—
মনে হয় নিরজন কারাকক্ষসম
দুঃসহ স্তব্ধতা নিয়ে সম্মুখে আমার
বিরাজিছে রাত্রিদিন! জীবন-মনের
সাথী কোথা? কোথা শান্তি? কোথা অবকাশ?
আবেগ-কল্পনা-ভাবখচিত এ হিয়া
তব তারাঝলমল উরসের প্রায়,
তোমারি মতন তার অনন্ত বিথার;—
কে তারে বুঝিবে—কোন্ রসিক সুজন!

ফসল-স্বপ্ন— [ফটো—সুবোধচন্দ্র করণ

জংলা মাঠের ফসল

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

জেল হইতে প্রথম ফিরিয়া আসিয়া ময়নাল বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিয়াছিল, ঘরের দুয়ার খোলা, সারা ঘর গোবর আর প্যাঁটা ছাগলের নাদে ভরিয়া আছে। হোগলের বেড়াগুলি উইতে খাইয়া ফেলিয়াছে, বেতের বাঁধ খসিয়া গিয়া বাঁশের বাখাড়িগুলি চারিদিকে এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে। উপরে চালে ছনের ছাউনি পচিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ভাঙ্গা-চোরা দু'খানি বাঁশের চেলা পাশাপাশি দুমড়াইয়া পড়িয়াছে, বর্ষার জলে ভিজিয়া ভিজিয়া ভিতের মাঝে মাঝে খাদ হইয়া গিয়াছে, পাশের মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। মাচার উপরে কয়েকটা মাটির হাঁড়ি—পাতিল শূন্য পড়িয়া আছে, আর আছে একটা জড়ান হোগলা, তাহার ভিতর দিয়া ইঁদুরে টানিয়া বাহির করিয়াছে একখানা ছেঁড়া কাঁথা, আর একটা তুলা-বার-করা বালিশ।

ময়নাল ভাবিল, মা কোথায়। বহুদিন ম্যালেরিয়ার কম্পজ্বরে ভুগিতেছিল, রুগ্নদেহে নিরাশ্রয়ে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছে?

ঘরের চারিপাশে একবার ঘোরে ময়নাল—তারপরে বাড়ির পাশে গিয়া তাকায় মাঠগুলির দিকে—দেখে আশেপাশে কচুরির সহিত মিলিয়া মিশিয়া আগাছা'র প্রতাপান্বিত রাজ্যব্যবস্থা চলিয়াছে।

কি করিয়া যেন মামুদ মিঞা টের পাইল, ময়নাল আসিয়াছে; লাঠি ভর করিয়া তির তির করিয়া হাঁটিয়া আসিল মামুদ মিঞা। দেখে ময়নাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে জামরুল গাছটার শিকরের উপর। মামুদ মিঞাকে দেখিয়াই ময়নাল মুখ তুলিয়া বলিল,—বুড়া মেঞা, আমার মা?

মামুদ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল,—মা কি কারো চিরদিন থাকে ময়নাল? দুঃখ করিস্ না বাজান, চল আমার ঘরে চল।

ময়নাল ঘরখানির দিকে আর একবার তাকাইয়া দুই হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজিল—বহুক্ষণে আর তুলিল না।

মামুদ বলিল,—দারুণ কম্পজ্বর ময়নাল, চিকিচ্ছা করছি, কুইনাইল অনেক দিছি,—জোর করল না কিছুতে—শোমন যেন টান মারল।

ময়নাল মাথা তোলে না, বাহু দু'টি আড়াআড়ি করিয়া বুকে জড়াইয়া দিল।

মামুদ বলিল,—একলা রাখি নাই ময়নাল, নিয়া গেলাম মোর বাড়ি, তোর দাদী অনেক করল, অযত্তোন হয় নাই।

ময়নাল কথা বলে না, মাথা তোলে না।

মামুদ বলে, মাটিতে বসিসনা বাজান, চল মোর বাড়ি চল।

ময়নাল মাথা নীচু করিয়াই বলিল,—যাব একটু পরে। খাবি কিন্তু দুইটা মোর ঘরে।

—আচ্ছা।

মামুদ মিঞা আবার লাঠি ভর করিয়া চলিয়া যায়। ময়নাল একাএকা সেই জামরুল তলায় বসিয়া রহিল অনেকক্ষণ। শূন্য দৃষ্টিতে সে বারবার করিয়া তাকায়—সামনের ধ্বসিয়া পড়া ঘরখানির দিকে—শ্রীহীন সমস্ত বাড়িটার দিকে। এই ঘরখানা—এই বাড়িখানার মতন তাহার জীবনটাও যেন ছন্নছাড়া হইয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। এই ভিটামাটিটুকু, এই ভাঙা ঘরখানি—ইহার জন্য এতখানি আকর্ষণ সে আর কোন দিন অনুভব করে নাই, আজ শুধু ইচ্ছা হইতেছে, এই ভিটামাটিটুকু বুকে আঁকড়াইয়া সে এইখানে পড়িয়া থাকে নির্জীব হইয়া।

সেইদিন হইতে ময়নাল মামুদ মিঞার বাড়িতেই আছে। ভাঙা ঘর নূতন করিয়া তুলিয়া লইতে সে আর কোন উৎসাহ পাইতেছে না। বাড়ির কাছের জমিগুলির কি ব্যবস্থা করিবে তাহাও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। পিতৃদত্ত ধনের ভিতরে একটি বলদ এবং একখানি হাল তাহার ছিল, তাহার জেলে যাইবার পরে মামুদ মিঞা তাহা তাহার নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছে। এই ভুতুরদিয়ার জমিখানি সম্বন্ধে তাহার মনে একটা গভীর কৌতূহলের সহিত একটা অসম্ভব সঙ্কোচ জড়িত হইয়া রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে মামুদ মিয়ার সঙ্গে বহুবার কথা বলি বলি করিয়াও বলা হয় নাই।

জেল হইতে ফিরিয়া কিছুদিন ময়নাল কোথায়ও বাহির হয় নাই, মামুদের বাড়িতেই একরূপ আত্ম-গোপন করিয়া আছে। কিন্তু মামুদ মিঞার নিরন্তর তাগিদে এবং টানা-হিঁচড়াতে সে আর বেশী দিন আত্ম-গোপন করিতে পারিল না। এখন একটু একটু করিয়া হাটে-বাজারে বাহির হয়, লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে, গত কয়েক বৎসরের স্মৃতি পিছনে ফেলিয়া সে আবার সহজ জীবন-যাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মামুদ মিঞাই সেদিন একরূপ জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইয়াছিল বাইচচরে বাইচ খেলিতে দলের সর্দার হইয়া। বাইচ খেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে যখন ময়নাল মামুদকে তাহার ইনামের কাপড় দেখাইয়াছে, তখন রসিকতা করিয়া মামুদ বলিয়াছিল, শাড়ী হইলে রাখতে পারতিস তোর কবিলার জন্ম।

কয়দিন ধরিয়া আকাশে ঘন মেঘ করিয়া অনবরত গুড়িগুড়ি বর্ষা পড়িতেছে। খাপুরের নদীতে অবশ্য ইলিস মাছ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ক'দিন ধরিয়া হাটে-বাজারে মাছ আর ধরে না। খাট মাঠে সর্বত্র খালি ইলিস মাছের গাল-গল্প ও খালে-বিলে দিনে-রাতে চলিয়াছে শুধু ইলসে-জাল সহ অগণিত ডিঙি নৌকার সারি। অধিবাসীদের মধ্যে রীতিমত একটা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। জাল বা নৌকা অভাবে যাহারা এই আনন্দে যোগ দিতে পারিল না, তাহারাই হতভাগ্য।

সারা দিনটা ধরিয়া টিপ্ টিপ্ বর্ষা পড়িতেছে। পূবাল হাওয়া আসিয়া কেমন একটা শির শির শীতও ছড়াইয়া দিয়াছে। বিকালবেলা একখানি কাঁথা গায়ে জড়াইয়া মামুদ মিঞা একখানি পিড়ি পাতিয়া দুয়ারের কাছে বসিয়া 'চাই' প্রস্তুত করিবার জন্য ছুরি দিয়া বাঁশের শলা চাছিতেছে। ময়নাল আসিয়া আব্দারের সুরে বলিল,—বুড়া মেঞা, একটা কাম করাতে লাগবে।

—কি রে ময়নাল? কি-কাম বাজান?

ময়নাল এতদিনে মামুদের ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছে; শুধু মামুদ মিঞা নয়, মামুদের পুত্রগণ এবং ঘরের অন্যান্য সকল লোকও ময়নালকে তাহাদের ঘরের একজন লোক করিয়া লইয়াছে।

ময়নাল তাহার আব্দারের সুর চড়াইয়া দিয়া বলিল, একখান ইলসা জাল যোগাড় করা চাই।

—ক্যান?

—নাও নিয়া যাব গাঙে।

—দেরী কর ময়নাল, একা যাইস্ না, গাঙে আজকাল বড় তুফান। তোর মেঞাভাই কাল-পরশু আসবে মাদারীপুরেথন, সে আইলে একসঙ্গে যাবি।

—এর মাঝে যে মাছপড়া বন্ধ হবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। বর্ষাকালে তিনচার দিন ধরিয়া হয়ত ইলিস মাছের মরশুম আরম্ভ হইয়া যায়, আবার দু'এক দিনের ভিতরেই চট্ করিয়া থামিয়া যায়।

মামুদ বলিল,—পূবাল বাতাস, বড় তুফান ময়নাল, একা পারবি?

—খু-উব পেঞা, জাল হইলেই হয়।

মামুদ আর আপত্তি না করিয়া জোমড়াটা মাথায় দিয়া লাঠি ভর করিয়া বাহির হইয়া পড়িল সেই টিপ্ টিপ্ বর্ষার ভিতরেই।

সন্ধ্যার পূর্বেই মামুদ জাল লইয়া ফিরিল, বলিল, ছেঁড়া জাল ময়নাল, সাবধানে বাইস্।

নদীর ভিতরে পড়িয়াই ময়নাল পা দিয়া বৈঠা জড়াইয়া ধরিয়া জাল ফেলিল।

খুট্—।

ময়নাল বুঝিল জালে মাছ পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি জাল টানে, দেখে, একটা।

আরও আগাইয়া গেল মাঝ নদীতে। সত্যই বড় হাওয়া দিয়াছে, নদীতে বড় তুফান। পা দিয়া বৈঠা আঁটিয়া ধরা শক্ত—স্রোতে তরতর করিয়া টানিয়া লইতে চায়, তুফান আসিয়া ঠিক আড়াআড়ি আঘাত করিয়া নৌকা উল্টাইয়া ফেলিতে চায়। তবু ময়নাল আবার জাল ফেলে।

খুট্—খুট্—।

এবারে দুইটা।

ময়নাল আরও আগাইয়া গেল। আবার জাল ফেলিল। জালে মাছ পড়িয়াছে টের পাইল, কিন্তু জাল আর টানিতে পারে না। ঝুম্-ঝুম্ করিয়া বর্ষা পড়িতেছে—দমকা পূবাল হাওয়া—শীতে হাত কাঁপাইয়া আনে, জাল টানিতে গেলে নৌকা কাৎ হইয়া যায়—ঝলকে ঝলকে জল ওঠে।

ময়নাল জালটাকে কোনও রকমে টানিয়া তুলিল,—কিন্তু মাছ পালাইয়া গেল। ময়নাল দেখিল আর পারা যাইবে না, একলা অসম্ভব—নৌকায় অনেক জল হইয়া গিয়াছে। ময়নাল জল হইতে বৈঠা তোলে। জালটাকে নৌকায় তুলিয়া রাখে, তার পরে বাঁশের সেঁউতি দিয়া জল সেচিতে আরম্ভ করিল। স্রোতের টানে নৌকা দক্ষিণের দিকে অনেকটা ভাসিয়া চলিল।

আকাশে মেঘ যেন একটু পাতলা হইয়া আসিতেছে, তবু টিপ টিপ বর্ষণের বিরাম নাই। জ্যোৎস্না রাত্রি, পাতলা মেঘের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার একটা আবছায়া আভাস যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার কিছু পরিচয় রহিয়াছে দুই পাড়ের গাছ-

পালার একটা অস্পষ্ট কালো রেখার ভিতরে—কিছু পরিচয় রহিয়াছে। নিরন্তর ভাঙিয়া-পড়া ঢেউগুলির শুভ্র-ফেনায় ফেনায়। পূবাল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ-ভাঙার শব্দ—তাহার সঙ্গে নদীর জলের উপরে বর্ষার একটা ঝাপসা বর্ষণধ্বনি মিলিয়া গিয়াছে।

নৌকার জল সেঁচা হইয়া গেলে ময়নাল বৈঠাখানি জলে ফেলিয়া চারিদিকে একবার চাহিল। দেখিল সে ভাসিয়া ভাসিয়া দক্ষিণে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে।

রাত্রিটা ময়নালের মন্দ লাগিতেছে না। জাল ফেলিতে না হইলে বৈঠা ধরিয়া থাকিতে খুব অসুবিধা হয় না। এদিক ওদিক কেবলই দোল খাইয়া নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, ময়নালের লোভ হইতে লাগিল, এমনই চলি না কিছুক্ষণ ভাসিয়া,—মন্দ লাগিতেছে না।

ময়নাল অনেক দূর ভাসিয়া আসিয়াছে—স্রোতের টানে ভাসিতেছে—কিন্তু উজাইয়া ফিরিতে হয়। না, আর না,—এইবারে ফিরিতে হয়। ময়নাল এদিক-ওদিক তাকায়,—আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাতাস আরও বাড়িয়া যায়।

ফিরি ফিরি করিয়াও ফেরা হয় না—ভাসিয়া চলে ময়নাল। ভাসিতে ভাসিতে মনে হয়, সেই সায়েস্তাবাদের বাঁকটা আর কত দূর? সেখান হইতে বাঁ স্রোতে আগাইয়া গেলেই কালাবদর নদী—তার পরে ইলসা—তার পরেই মেঘনা—সেই মেঘনার মুখেই নাকি জাগিয়াছে নূতন নূতন কত চর! লোভ হয়, ভাসিয়া আরও আগাইয়া যায়—সেই বাঁকটা ঘুরিয়া আরও আগাইয়া যায়—অনেক দূরে—অজানিত এক দেশে—মেঘনার চরে।

আজ যদি সঙ্গে বাহু থাকিত! এই নৌকায়—এমনি রাতে। তবে সে হারিত—এমনি ভাসিয়া চলিতে—এমনি ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাইতে—ভাসিয়া যাইত অনেক দূরে—অনেক দূরের চরে—সেই অনেক দিনের স্মৃতি—অনেক দিনের স্বপ্ন। ময়নাল স্রোতে ভাসে—ঢেউয়ে দোলে—আর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখে। নদীর স্রোতের সঙ্গে নৌকার নীচ দিয়া বাস্তব সংসারটা যেন কোথায় গলিয়া সরিয়া যাইতেছে। একা-একা সে উত্তেজিত হইয়া ওঠে—বাতাস বাড়িয়া যায়—কূল হইতে আসে পাড় ভাঙিয়া পড়িবার ঝুপঝাপ শব্দ।

এখন কি আর হয় না? এমন এক রাতে এমনি করিয়া একখানি ডিঙিনৌকায় বাহুকে লইয়া ভাসিয়া পড়া? বাহু আসিবে না? খুব আসিবে—নিশ্চয় আসিবে; ময়নাল যত ভাবে ততই তাহার মনে হয়, ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া একদিন ডাক দিলেই বাহু নিশ্চয়ই আসিবে। হাতের বৈঠা শিথিল হইয়া যায়, ঢেউয়ের বাড়ি লাগিয়া নৌকা হঠাৎ পাক খাইয়া ঘুরিয়া যায়—এক ঝলক ঘোলা ঘোলা জল ছিটকাইয়া আসে ময়নালের নাকে মুখে চোখে—স্বপ্ন যায় ভাঙিয়া।

না—এইবারে ফেরা যাক্।

ফিরি ফিরি করিয়াও ফেরা হয় না, কেমন যেন গান পায় ময়নালের। ময়নাল গান-জানে না; তবু গলা ছাড়িয়া শোঁ-শোঁ, সাঁই-সাঁই বাতাসের সুরে গান ধরে—

তুমি কি খাইয়াছ মধু না কি—
কাল ভ্রমরা,
মধু কি খাইয়াছ ফুলের দেশে।

ঝপাৎ করিয়া ঢেউ ভাঙে নৌকার গায়, ময়নাল পড়িতে পড়িতে টাল সামলায়।

না—এইবারে সে সত্যই ফেরে। উজান ঠেলিয়া সে বৈঠায় জোরে টান দেয়। অন্ধকার খানিকটা কাটিয়া উঠিয়াছে, বৃষ্টিও একটু থামিয়াছে—কিন্তু পূবদিক হইতে ঊনপঞ্চাশ বায়ু যেন সবই ছাড়া পাইয়াছে।

উজানে নৌকা ঠেলিয়া ময়নাল ঘোষকাঠীর বড় খালের মুখে আসিবা মাত্র দমকা হাওয়ায় নৌকাখানির মুখ ঘুরাইয়া খালের ভিতরে ঢুকাইয়া দিল; ময়নাল খালের ভিতরেই একটু আগাইয়া গিয়া কেয়াবনের ঝোপ ঘেঁষিয়া নৌকাখানা লাগাইল; ভাবিল, বাতাসটা একটু থামুক!

ময়নাল দেখে, সেই খালের মুখ দিয়া অনেক নৌকা, এখনও জাল লইয়া নদীতে যাইতেছে, অনেকে আবার গান গাইয়া ফিরিতেছে।

আর একখানি ডিঙি প্রায় ময়নালের পাশ ঘেঁষিয়া নদীতে যাইতেছিল। ময়নাল ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে যাস্, হোচন নাকি রে—ও হোচন—

'হয়' বলিয়া হোচন নৌকার গতি মন্দীভূত করিয়া দিল। ময়নাল বলে,—মাছ ধরতে যাস্?

—হয়।

—একা?

—হয়।

—কেম হোচন, একা পারবি না।

—ক্যান্ ?

—পূবাল বাতাস, বড় তুফান—একা পারবি না। আমিও গেছিলাম, পারলাম না, তাই ফেরলাম।

বৈঠা ধরিতে ময়নালের ওস্তাদি সেদিন বাইরচরে সকলেই দেখিয়াছে, সুতরাং সেই ময়নালই যখন ফিরিয়া আসিয়াছে তখন আর হোচন একা অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না।

কুতুব খাঁর ছেলে হোচন, ময়নালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছুতুরদিয়ার মাঠে। হোচনের বাড়ি মৈনদ্দির বাড়ি হইতে বেশী দূরে না; মৈনদ্দির সহিত বাছুর বিবাহের কথা এতদিনে ময়নাল সবিস্তারেই জানে।

হোচন ময়নালের নৌকার পাশেই নৌকা লাগাইল, তারপরে চলিতে লাগিল অনেক কথা—নানা রকমের—গ্রামের কথা—পাড়ার কথা—জমাজমির কথা—ধানপাটের খন্দ—জিনিস-পত্রের দাম ইত্যাদি।

হোচন বলে, মাছ-পা'লা কয়টা ?

—দুই খেপ জাল ফেলতে পারছিলাম—দুই খেপেই উঠল তিনটা। তারপরে দেখি জাল টান দিলেই নাও উল্টায় আর জালই ফেললাম না। তুই ত হোচন কিছুই পাইলি না; কাল সকালে খাবি লঙ্কাপোড়া ভাত। শোন্ হোচন শোন—। বলিয়া ময়নাল হোচনের ডিঙিখানি টান দিয়া আরও কাছে আনিল এবং নিজের নৌকায় বাঁশের চালির নীচে হাত দিয়া মস্তবড় একটা মাছ বাহির করিল।

হোচন বলে, কয় কি মেঞা, কয় কি ?

ময়নাল বলে, চুপ থাক হোচন, চুপ থাক। বলিয়াই মাছটা হোচনের নৌকার ডারায় ফেলিয়া দিল।

—করলা কি ভাই, তিনটা মাছেরই একটা মাছ—

হোচন বলে,—তামুক খাবা নাকি ময়নাল ?

—হুঁকা কলকি আছে ?

—সব আছে।

—তা'লে হোচন ভর এক ছিলুম, হাত-পা কাল হইল ঠাণ্ডা বাতাসে।

তামাক ভরে হোচন—ভরিয়া হুঁকা দেয় ময়নালের হাতে। আরামে টান দেয় ময়নাল।

আস্তে আস্তে হোচন বলে,—বলল কি সেদিন বাছু বিবি ?

—কবে ?

—আরে সেই বাইরচরের খালে।

—হাসিয়া বলে ময়নাল, তুই ঠিক চিনতে পারছিলি ?

—পারব না ? আমার যে বোজের বউ।

—কে তোর বোজ ?

—মৈনদ্দি।

—মৈনদ্দি ? কবে'খন ?

—সে অনেক দিন।

—না, অনেক দিন কেমনে ? আমি হাজতে যাবার পর। থাক গা। তা কেমন আছে মৈনদ্দি নোতুন কবিলার সঙ্গে ?

—ভালই আছে।

—কাইজ্জা নাই ত ?

—সোয়ামী-ইস্তিরির কাইজ্জা—থাকলেও বা আমরা টের পাব ক্যান ?

ময়নাল সহসা কেমন আনমনা হইয়া যায়, চুপ করিয়া কি যেন ভাবে। তার পরে বলে,—মৈনদ্দির বাড়ি যাস্ হোচন ?

—খুব যাই—আজও গেছি।

—ভাব-সাব আছে ?

—খুব।

ময়নাল চুপ করিয়া আবার কি ভাবে। হোগল-বন কেয়া-বনের গাছ ঘেঁষিয়া খস্ খস্ করিয়া আসে বাঁর কত ডিঙি—বৈঠা পড়ে ছলাৎ ছলাৎ—দুল দুল করিয়া ওঠে ময়নালের মন। নৌকা হইতে আর মাছ দুইটা তুলিয়া বলিল,—নে এই মাছ দুইটা কাল সকালে দিয়া আসিস্ মৈনদ্দিকে, বলিস্ তুই ধরছিস্ আজ জালে।

হোচন সবই জানে, সবই বুঝিল। কৌতুকে সে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল,—নিজে একটাও রাখলা না ময়নাল ?

—থাক, কাল আবার ধরব। যাবি কাল ?

—হ, ভাবছি ত।

—আসিস্, আমি চার দণ্ড রাত্তিরে অপেক্ষা করব এইখানে।

—আচ্ছা।

—রাত্তির এখন কত হবে রে হোচন ?

—এক প'র হবে ?

—তা'লে এখন ফিরি।

—আচ্ছা।

ঘোরকাঠীর খাল ধরিয়া হোচন আগাইল,—ময়নাল আবার গিয়া নদীতে পড়িল। আরও খানিক দূর উত্তরে আগাইয়া তাহাকে ছোট খাল ধরিতে হইবে।

কিছুদূর আগাইয়া আবার বাঁ হাতি নালা ধরিয়া গ্রামের

ভিতরে ঢোকে হোচন। একা চলিতে চলিতে একটা কৌতুকরসে হোচন অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছিল। কৌতুকরসের পিছনে ময়নালকে অপদস্থ করিবার কোন মতলব ছিল না, শুধু মোটাবুদ্ধির মৈনদ্দিকে ক্ষেপাইয়া একটু আনন্দ অনুভব করিবার মতলব।

কাল সকালের অপেক্ষায় থাকা হোচনের পক্ষে সম্ভব হইল না। সে বাড়িতে না যাইয়া সরাসরি গিয়া উঠিল মৈনদ্দির বাড়ি, নিজের মাছটাকে ঘাসপাতা দিয়া নৌকার ভিতরেই ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া অপর দুইটা মাছ হাতে লইয়া গিয়া ধাক্কা দিল মৈনদ্দির দুয়ারে।

মৈনদ্দি ততক্ষণে পুরা একঘুম দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। দুয়ারে ধাক্কা দিয়া হোচন ডাকিল,—মৈনদ্দি মেঞা সজাগ আছ নাকি ?

মোড় ফিরিয়া মৈনদ্দি বলে,—কে ?

—আমি হোচন, একবার ওঠ মেঞা।

—এত রাত্তিরে ক্যানরে হোচন ?

—একবার সেইজন্যেইত ওঠই না মেঞা।

মৈনদ্দি উঠিয়া ডিবি জ্বালাইল, বারান্দায় আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতেই হোচন মস্ত বড় ইলিস মাছ দুইটা রাখিল মৈনদ্দির সামনে।

মৈনদ্দি বলে, এ কি মেঞা ?

—বলব কাল সকালে, এখন রাত্তির দেড়প'র, বাড়ি যাই।

—আরে বও মেঞা, তামুক খও। মাছ ধরতে গেছিলে বুঝি ?

ধরছ ঠিকই।

—পাইলা কয়টা ?

—তেরটা।

—তের—টা ? বিস্মিত হইয়া তাকায় মৈনদ্দি।

হ, হ,—আমি একা তেরটা, আর সবাই—তিন—তের। জলে-মাছে সমান বাপুরের নদীতে।

—বও মেঞা, তামুক খাওয়া—উৎসাহিত হইয়া পড়ে মৈনদ্দি। এতক্ষণে বানুও উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দুয়ারের পাশে।

মৈনদ্দির সহিত বানুর বিবাহের পর হইতেই যেন মৈনদ্দির সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছে হোচনের, সেই সূত্রে পরিচয় বানুর সঙ্গেও। বানুকে দেখিয়া হাসিয়া হোচন বলে,—বস্তোয়া দিলাম বিবি, এত রাত্তিরে আবার চুলা ধরাবার লাগবে।

মাছ দুইটি দেখিয়া খুশীতে বানুরও মন ভরিয়া গিয়াছে,—হাসিয়া বলিল,—বস্তোয়া ত বাড়ির বিবিরও কম না।

'হ' 'হ' বলিয়া হাসিয়া দেয় হোচন।

বার বার বানু অত বড় তাজা মাছ দুইটার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে।

মৈনদ্দি মাছ দুইটা তুলিয়া বানুর হাতে দিয়া বলিল,—যাও সর্দারের ঝি, খোদের দেওয়া মাছ, যত্তোনে রাখবা কিন্তু।

বানু হোচনের দিকে তাকাইয়া হাসিল, হোচনও হাসিল।

এতক্ষণে মৈনদ্দির তামাক সাজান হইয়া গিয়াছে। হুঁকা-কলকি হোচনের হাতে দিয়া সে গল্প জুড়িয়া দিল। মাছ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছে বানু।

উঠিয়াছে আজকারের মাছ ধরার গল্প। হোচন তামাক টানে আর কথা কয়—মিথ্যা কথা বলিতে আটকাইতেছে না কিছু মুখে, বানাইয়া বানাইয়া বলিতেছে অনেক গল্প—কখন বাড়ি গিয়াছে, ক'বার জাল ফেলিয়াছে; ক'বার মাছ পাইয়াছে, কবার পায় নাই ; নৌকার অবস্থা, নদীর অবস্থা, যাহারা মাছ ধরিতে গিয়াছে তাহাদের অবস্থা—আরও কত কি।

অনেক মিথ্যা বলিয়াছে, কিন্তু এখন সত্য কথাটা না বলিয়া যেন উঠিতে পারিতেছে না সে, সে কথাটা এতক্ষনে কণ্ঠদেশে আসিয়া যেন ঠেলাঠেলি করিতেছে। হোচন আর পারে না, বলে,—আসল কথাটা তবে বলি মেঞা। সাগ্রহে মৈনদ্দি বলে,—কি, কি ?

—গোসা করবা না মেঞা তাই কও।

—কি কি, কও না মেঞা কথাটা।

—মাছটা দিল বাপুরের ময়নাল, তোমার জন্ত।

মৈনদ্দি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া একটানে বানুর হাত হইতে মাছ দুইটা কাড়িয়া লইয়া যতদূর জোরে পারিল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল বাহিরে ; বলে,—চোরা বুঝি আবার খালাস পাইছে।

নিমেষে বানুর মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

চোখ দুইটি আগুনের মতন লাল করিয়া মৈনদ্দি বলিল,—চুপ থাক্ গিয়া বিছানায়, জন্মের মতন মাছ খাওয়াব তোরে—

রাগের মাত্রা দেখিয়া অপ্রতিভ হোচন ভাবে, কাজটা সে ভাল করে নাই। আস্তে আস্তে বলে, অত চটলা ক্যান্ মেঞা।

রাগে গর্ গর্ করিয়া বলে মৈনদ্দি—বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, তোমার এত রাত্তরে আর কাম নাই ?

হোচন অপ্রস্তুত হইয়া ঘরের বাহিরে নামিল। মৈনদ্দি

ঝপাৎ করিয়া পাটখড়ির ঝাঁপটা ফেলিয়া দিল। হোচন তাহিল তামাসা দেখিতে গিয়া কাজটা সে ভাল করে নাই।

হঠাৎ রাগের মাথায় মাছটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল বটে মৈনদি, কিন্তু বিছানায় শুইয়া কেমন যেন আবার লোভ হইতে লাগিল। টাটকা মাছটা—গাঙের ইলিস। কিনিয় মাছ দু'একটা খাইয়াছে বটে, কিন্তু কেনা পচামাছ এবং জালে ধরা টাটকা মাছের স্বাদের তফাৎ অনেকখানি। কি লাভ মাছটাকে শেয়াল-ভোঁদড়ের পেটে দিয়ে? হোচন ত চলিয়া গিয়াছে, এখন আর দেখিবেই বা কে? আস্তে আস্তে আবার উঠিয়া বসে মৈনদি—আস্তে আবার ঝাপটা খোলে, কুড়াইয়া আনে উঠান হইতে মাছ দুটি। বাঃ, মাছ বটে,—অন্ততঃ একবিঘৎ প'শ।

ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে আবার বাছুকে ঠেল দেয় মৈনদি—বলি ঘুমে পড়লা নাকি আবার এরি মধ্যে?

বাছু শক্ত হইয়া থাকে, সাড়া দেয় না।

আবার হাত ধরিয়া টান দিয়া মৈনদি বলে,—অননালোকের অত রাগ ভাল না,—ওঠ কইলাম—

বাছু হাতটা ছিটকাইয়া ছাড়াইয়া লইল,—অন্ধকারে বাছুর হাতের লোহায় ছিঁড়িয়া গেল খানিকটা মৈনদির হাত। আবার মাছটাকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মৈনদি বলিল,—আল্লার হুকুম তোরগ-পায়ের তলে রাখা—তাই না করারই ত মরলাম।

আজ ঝাপুরঘাটের হাটবার। পড়ন্ত বেলায় কয়েকটা ঝিঙা এবং মুরগীর ডিম লইয়া মামুদ রওনা হইয়াছিল হাটে। কিছু তামাক কিনিবার প্রয়োজন, ঝিঙা ও ডিম বিক্রী করিয়া কিছু কিনিবার ইচ্ছা।

এ-সব মুলুকের যাহারা স্বচ্ছল বাসিন্দা, অর্থাৎ যাহারা দু'বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারে, তাহাদেরও হাতেও সাধারণতঃ নগদ পয়সা থাকে না। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আহার্য্য প্রায় নিজেরাই বাড়ি ঘর, মাঠ-ঘাট, ভিট-পুকুর হইতেই সংগ্রহ করিতে পারে; বাদ বাকী প্রয়োজনের জন্য দরকার হয় কিছু নগদ পয়সার, সে-পয়সা সংগৃহীত হয় এই-জাতীয় হাটে বাজারে।

পথের মাঝে দেখা মামুদের সহিত ময়নালের; মামুদের হাত হইতে ঝিঙা ও ডিমের ডালাটি হাতে লইয়া ময়নাল বলিল,—বাড়ি যান বুড়া মেঞা, তামুক আমি নিয়া আসব।

মামুদ বলিলেন,—দু'পয়সায় ডিমের জোড়া দিস্ না কিন্তু ময়নাল, কাল আগরপুরের হাটে কিন্তু ডিম গেছে আড়াই পয়সা।

'আচ্ছা—আচ্ছা—' বলিয়া ময়নাল চলে হাটের পথে। খানিক আগে পথের মাঝে দেখা পুণ্য মালীর বউয়ের সঙ্গে, হাতে তাহার এক জোড়া নোতুন হোগলা।

—ময়নাল বলে, কোথায় যাও খুড়ী?

—যাই দেখি একটু হাটের পথে।

—কেন হোগলা বেঁচবা নাকি?

—হয় বাবা।

—ক্যান্, তোমার পোলা কই?

—কি জানি কোথায় নিল যমে; আটকপালে বাপরেরে কি সারাদিনে দেখা পাই? দেখা মেলে তিন বেলা তিনগ্রাস পেটে সান্ধাবার বেলায়। আজ দু'দিন ঘরে নুন নাই, কত বললাম, এই হোগলা জোড়া নিয়া বেঁচে হাটে, কিছু নুন নিয়া আয়; তা আবাগা যে দুপুরে বার হইছেন আর এখন অবধি দেখাই নাই। এখন আমি মেয়ে মানুষ চললাম হাটে—।

—তুমি যাবে ক্যান্ খুড়ী, আমি যাই হাটে, আমার কাছে দাও, তোমার নুন নিয়া আসি।

সাগ্রহে হোগলা জোড়া ময়নালের হাতে দিয়া পুণ্যের বউ বলিল, আর দু'পয়সার কেরোসিন তেল ময়নাল;—

আনব কিসে? জিজ্ঞাসা করে ময়নাল।

একটা নারিকেলের মালা বাড়াইয়া দেয় পুণ্যের বউ।

—এ মালা দিয়া কি হবে খুড়ী, এতে নাকি তেল আনা যায়?

—তবে কি করবি ময়নাল? আন্ধারী রাত—একটু যে তেল নাই।

—ক্যান্ তোমার ঘরে বোতল নাই?

—আছে ময়নাল, তুই একটু খাড়া—

—তাড়াতাড়ি যাও খুড়ী—সন্ধ্যা হবে।

পুণ্যের বউ প্রায় দৌড়িয়া গেল বোতল আনিতে, ময়নাল দাঁড়াইয়া থাকে।

পুণ্যের বউ ফিরিয়া আসিয়া একটি বোতল দিল, আর বলিল, পারিস্ যদি ময়নাল দু'পয়সার কুচা চিংড়ি আনিস্, তিন দিন ধরে খাই চ্যাং মাছ, আর ভাল লাগে না।

কুচা চিংড়ি আবার কিসে আনি? বিরক্তি সহকারে বলে ময়নাল।

—কুচা চিংড়ি আনতে পাত্তোর লাগে নাকি ময়নাল? এই একটু কচুপাতা নিলেই ত হয়।

বিরক্তিভরে চলিয়া যায় ময়নাল। [ক্রমশঃ

বিবেকানন্দ বীর

শ্রীপ্রণতি দাশগুপ্ত

বিবেকানন্দ-বীর!
তোমার অভয় চরণ স্মরণে
নুয়ে নুয়ে পড়ে শির।

বিশ্বে তিমির নাশি—
জ্ঞানদীপ জ্বেলে করিলে কীর্ণ
রজত আলোক রাশি।

সপ্ত সাগর পারে—
ভারত-ধর্ম্ম-কেতন বহিয়া
ঊর্দ্ধে উড়ালে তারে;

জীবের মাঝারে শিব—
নূতন করিয়া জানিল আবার
অসহায় নির্জীব।

ত্যাগের মন্ত্রধ্বনি—
নবীন করিয়া প্রবীণ ভারতে
উঠেছিল রণরণি'।

আজি সসাগরা ধরা
স্বার্থ, হিংসা, অন্যায়, পাপে
কান্নায় কান্নায় ভরা।

মানব-হৃদয় হ'তে
সেবা, দয়া, মায়া বুঝি বা বিদায়
ল'য়েছে কালের স্রোতে।

লালসার তরবারি
দস্যুর হাতে ঝলসিছে আজি,
চলিছে বিজয় তারই।

এস এস আরবার,
দিশে দিশে তোলো সত্য-বীণায়
প্রদীপ্ত ঝঙ্কার।

লহ সুবিশাল বুকে
মরম যাদের দৈন্যপূর্ণ
অন্ন নাহিক মুখে।

বজ্র কঠিন করে—
অসত্য সব বিষধর ফণী
পিষে ফেল চিরতরে।

এখনও ঘুমায়ে রবে!
সুপ্ত মোদের দরদী বিবেক
প্রদীপ্ত হবে কবে?

এস এস দেবঋষি,
লাঞ্ছিত ন্যায় বড় বেদনায়
ডাকিতেছে দিবানিশি।

আন তপোবন যুগ,
সৌখ্য, শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায়ে
ভর বিশ্বের বুক।

তব হিয়া-জ্যোৎস্নায়
মানব-হৃদয়-প্রীতির কুমুদ
প্রণতি জানাতে চায়।

STUDENTS
P. G. A.

পরিব্রাজক কাম'নীত

লেখক—কাল গিয়েলারপ

গৃহহীনতার পথে

প্রত্যেকটি লোককে প্রত্যেক স্থানে নিয়োগ করে গৃহে প্রবেশ করলাম, গৃহ স্তব্ধ; অজ্ঞাতপূর্ব্ব একটা নৈঃশব্দ্য চতুর্দ্দিক হ'তে আমায় আবেষ্টন করলে। স্ত্রীদের কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছি না, এটা তো বাহিরের নিঃশব্দতা; তোরণপথে তাদের চ্যাচানি বেরিয়ে যেতে দেখেছি, সুতরাং সেদিক হ'তে কোন আশঙ্কা ছিল না। আমি অনুভব করছিলাম অন্তরের একটা নৈঃশব্দ্য। এ তো বহুদিন অনুভব করতে পাইনি; কখনও অনুভব করেছি কি না কে জানে। এক একটা বিশেষ ক্ষণ আসে, যখন এক একটা বিশেষ অবস্থায় মানুষ মনে পরশ পায়, অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব এক একটা ভাবের পরশ।

যাক, যা বলছিলাম। গৃহে প্রবেশ করলেই অনাশঙ্কিত ছুটি কোণ হতে মিলিত বা বিচ্ছিন্ন ছুটা কদর্য্য শব্দবন্দের আশঙ্কা আর নেই। এইটেই এখন পরম প্রশান্তি।

গৃহশীর্ষ হ'তে আমার সমগ্র বাড়ীটা অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকেও চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল; সৌধটিকে বেষ্টন ক'রে সুপরিকল্পিত সুন্দর উদ্যান, এর প্রতিটী তরুলতা, প্রতিটী বীথিকা কত পরিচিত; এদের দেখবার জন্ত আর আলোকের প্রয়োজন হয় না। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই এ সব নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। অনিচ্ছাতেও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটা তরু, একটী লতা, ললিত-কারু-খচিত-মর্ম্মর স্তম্ভের একটাও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমার কতদিনের নিঃসঙ্গ চিন্তা, শ্রান্তিময় দীর্ঘ প্রচেষ্টাকে অট্টহাস্যে উপহাস করবার জন্তে পড়ে থাকবে বিকৃত কিমাকার একটা ধ্বংসস্তূপ। অঙ্গুলিমালের অভিযানের ফল আমার অভিজ্ঞাত। মিথ্যা আশা করবার এর মধ্যে কিছু ছিল না।

এ এক অসহনীয় অবস্থা; অপেক্ষা করা ছাড়া করবারও আর কিছু নেই। মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে, আর এখন সবে সন্ধ্যা।

অবিশ্রান্ত ব্যস্ততার মধ্যে এতদিন জীবন কাটিয়ে এসেছি, ব্যবসা-বাণিজ্য ভ্রমণ আমোদ-প্রমোদ। মনের গভীরে চাইবার অবকাশ কোনদিন হয় নি। মনের মুখোমুখী কোনদিন দাঁড়াই নি। আজ? অন্ধকার একটা প্রকোষ্ঠে আমি উপবিষ্ট, একদিকে উপবনের অস্পষ্ট বীথিকা, অপর দিকে মর্ম্মর-স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘ অলিন্দ, প্রথম যৌবনের পর নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হ'ল এই প্রথম, সময়টুকুর পূর্ণ ভোক্তা ও কর্ত্তা আমি নিজে, একা। সমগ্র জীবনটা ধীরে ধীরে চিত্রিত পটের মত উন্মোচিত হতে লাগল—আমি এর স্রষ্টা, দ্রষ্টা, সমালোচক। তবু যেন আমি অপরিচিত। এ দীর্ঘ দৃশ্যের কোন অংশই তো ভাল লাগল না। উন্মাদের মত ছুটে এসেছি, দুধারে ছিটকে পড়েছে জীবনের অমূল্য দিনগুলো; সারি বেঁধে তারা এগিয়ে যায় আমার সামনে দিয়ে; কত করুণ, আনন্দের পরশ তো কারও ওপর নেই।

নাঃ। হঠাৎ উঠে পড়লাম, আমার চিন্তাস্রোতকে আমি নিজেই বাধা দিতে চাই। বেরিয়ে পড়লাম রক্ষণ-ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণে। আবার—তৃতীয়বার—চতুর্থবার বেরিয়ে পড়ি। না, সকলেই সজাগ আছে, সকলেই কর্ত্তব্যরত। স্বার্থবাহুল্য পরিচালনা ক'রে ক'রে নক্ষত্রের গতি ও অবস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হ'য়ে গিয়েছিল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'তে আর মাত্র আধ ঘড়ি বাকী। লোকজনদের আর একবার সাবধান করে দিয়ে এসে নিজের ঘরে বসলাম। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে, শিরায় শিরায় রক্তের তপ্ত স্রোত খরধার হ'য়ে ওঠে—উত্তেজনায়, দুর্ভাবনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। পূর্ব্বচিন্তায় ফেরবার চেষ্টা করলাম। অসম্ভব!

অনুবাদক—শুদ্ধোধন সেন

বুকের ওপর একটা ভীষণ চাপ অনুভব করি, মনে হয় এখনই দম বন্ধ হ'য়ে মরে যাব।

বসে থাকতে পারি না। ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস টানবার জন্ত ছুটে বেরিয়ে পড়ি। অনিলের শীতল স্পর্শে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ শান্ত হ'য়ে আসে। কোথায় একটা

পেচক কাকে আহ্বান জানায়। নিশিপদ্মের সুবাস ভেসে আসে উদ্যানের দীঘি হ'তে। প্রকৃতিমাতার স্নেহের পরশে মনটা জুড়িয়ে যায়। সময় জানবার জন্য আকাশের দিকে আবার চোখ তুলি। আহা! কালিমাখা বৃক্ষশীর্ষের উপর অনন্ত আকাশের নক্ষত্রখচিত আচ্ছাদন —তার মধ্যস্থলে কোমল আভায় শোভিত ছায়াপথ।

নিজের অজ্ঞাতেই বললাম—"আকাশ-গঙ্গা"। বুকের ভার হালকা হ'য়ে তপ্ত তরঙ্গের মত উথলে উঠে ঝরে পড়ল উষ্ণ অশ্রুধারায়। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জীবনটা পর্য্যালোচনাকালে বশিষ্ঠ টির কথা এবং আমার জীবন-পর্ব্বের প্রেরণাতুর কথাটাও মনে এসেছিল—কিন্তু সে সব তখন মনে হ'য়েছিল বিস্মৃতপ্রায় নির্বোধ স্বপ্নের মত। তখন আর সে প্রেম-জীবনের চিন্তা নয়, সেই জীবনেই নূতন বেঁচে উঠলাম। আমার অতীত সত্তা বর্ত্তমানের সহিত মিলিত হয়ে গেল। সেদিন এক ছিলাম আমি আর আমার প্রেম। এই দুটী তখন অভিন্ন। আজ? কী নাই আমার? দুটী স্ত্রী, সন্তান, হস্তী, অশ্ব, গাভী, মেষ, বলদ, পরিচালক ও ক্রীতদাস, পূর্ণ বাণিজ্যশালী, স্বর্ণ, রৌপ্য, নিজস্ব প্রমোদোদ্যান, আর সকল গৃহস্থের হিংসাস্থল এই প্রাসাদ—কিন্তু আমি? আমি কোথায়? একটা ভিশপ্ত ফল শাঁসটা শুষ্ক, শূন্য—সমস্তটার পরিণতি একটা ফাঁকা খোলায়, আকৃতি আছে, অন্তর নাই···

সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাইলাম।

বিস্তৃত সজ্জিত উদ্যান হ'তে বৃক্ষশীর্ষ বৃক্ষ আকাশে নিঃশব্দে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নিঃশব্দে নক্ষত্রদল ছায়াপথ ছড়িয়ে রয়েছে অনন্ত আকাশে, প্রাসাদ-অভ্যন্তরে মণিদীপসমূহ মর্ম্মর-স্তম্ভ হ'তে বিলম্বমান—এও তো এ সব দেখেছি, কিন্তু আজ এরা নব রূপে প্রতিভাত হ'ল। এরা সকলে মিলে উজ্জ্বল বিরাট একটা রক্তপায়ী জীবের মত আমার আজীবনের হৃদ্রক্ত পান করছে, আজ শেষ প্রাণরসবিন্দু পান করতে চায়—এর পানোৎসব সমাপ্ত হ'লে পড়ে থাকবে শুধু একটা মৃণ্য শবজীবনের শব।

একটা দূরাগত অনামা শব্দ—মনে হ'ল কাদের যেন ধ্বনি—লাফিয়ে উঠলাম। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কখন অসি কোষমুক্ত ক'রে কয়েক পদ এগিয়েও গেছি। দাঁড়িয়ে পড়লাম—একাগ্র কাণ পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম। দস্যুদল!—না তো। বাইরে কোন শব্দ ছিল না, নেই। কাছে দূরে কোথাও কিছু নড়ছে না। এ রাত্রির সেই অজ্ঞাত অতলস্পর্শী নিজস্ব শব্দ, সার্থবাহদল পরিচালন-কালে এ শব্দের সঙ্গে কতবার পরিচয় হ'য়েছে, প্রথম প্রথম নৈশ অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে থাকবার সময় এর পরিচয়ে চমকে উঠতাম। সে ব্যতীত বাইরে আজ কিছু নাই। কিন্তু আমার অন্তরের এই জাগ্রত শব্দের পরিচয় কে বলে দেবে? যে ভীতিপ্রবাহ কপোলে রক্ত নাচায় সে তো এ নয়; হতাশার দুঃসাহসও একে বলা যায় না। না, এ উদ্ধারণের আনন্দ।

"স্বাগত দস্যুদল। এখানে সুস্বাগত তুমি, অঙ্গুলি মাল। ধ্বংস কর, ভস্ম কর। এরাই আমার মারাত্মক শত্রু, তোমরা এদের বিধ্বস্ত কর, আমার সত্তাকে পিষ্ট করছে এরা, সরিয়ে নিয়ে যাও। এই যে আমি এখানে। এদিকে এস। আমার রক্তে তোমাদের অসির তৃষ্ণা তৃপ্ত হ'ক। কামুক ভোজনবিলাসী এই দেহ—এই আমার প্রধান শত্রু, একে তোমরা চূর্ণ ক'রে দাও। আমার সর্ব্ব দুঃখের উৎস আমার এই জীবন, কেড়ে নাও, বঞ্চিত কর আমায় এ হ'তে। দস্যুদল, পুরাণো সাথী, বন্ধুগণ, স্বাগত।"

আর বিলম্ব নাই। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। আসন্ন যুদ্ধের আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম। অঙ্গুলিমাল সন্ধান করবে আমাকেই—দেখব, এবার হাত হতে তরবারি খসিয়ে দিতে পারে কি না। সেই আমার সর্ব্ব দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ—তার বুকে এ অসি আমূল বিদ্ধ করে মরব—সেও হবে আমার সুখের মরণ।

"আর বিলম্ব নাই"—এই তো এখন আমার সান্ত্বনা—নিজেকে নিজেই যে কথা কটী কতবার শোনালাম! মধ্য-রাত্রি অতিক্রান্ত, স্থিরগতিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। আমি মনকে বোঝাই—"আর বিলম্ব নাই।"

এবার—এতক্ষণে! না, এ যে বৃক্ষশীর্ষের মর্ম্মর-ধ্বনি। দূরে মিলিয়ে যায়। আবার ওঠে, মিলিয়ে যায়। যেন লোমশ একটা বিরাটকায় জন্তু, নিজেকে ঝাঁকানি দিচ্ছে।

বার বার শব্দ ফিরে আসে। একটা নিশাচর পাখীর তীক্ষ্ণ ডাক কোথায় উঠে কোন দূরে মিলিয়ে গেল।

আসন্ন উষার আভাস নয় এরা ?

শঙ্কায় স্থির হ'য়ে যায়। আশঙ্কায় হতাশ হব, এও কি সম্ভব। তা হ'লে ওরা না আসতেও পারে। কথাটা মনে হ'তেই অন্তরটা কেঁপে উঠল। কত কাছে, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে আমার অন্ত দেখতে পেয়েছিলাম—মহোত্তেজনায় প্রচণ্ড একটা যুদ্ধ, তার পরই মৃত্যু—তার আগমন অনুভব করতেও হ'ত না। আর একটা উষা এসে এখানেই আমার চিরন্তন আবেষ্টনীর মধ্যে দৈনন্দিনাসক্ত পুরাতন আমাকেই দেখতে পাবে, এর চেয়ে হতাশাব্যঞ্জক চিন্তা আর কী হতে পারে। বাস্তবিকই আমার আশা অবাস্তব হ'য়ে যাবে ? আমার মুক্তিদাতারা আসবে না ? নিশ্চয়ই আসবার সময় হ'য়ে গেছে—দেখবার সাহস হ'ল না। তবু না আসাটা কি সম্ভব ? তা হ'লে সে সন্ন্যাসী অঙ্গুলিমাল নয় ? আমারই ভুল ? মোহাচ্ছন্নতা ? বার বার নিজেকে প্রশ্ন করি, কিন্তু নিজের চোখকে যে অবিশ্বাস করতে পারি না। আবার, আমার দৃষ্টমূর্তি যদি সে হত, তা হ'লে নিশ্চয় আসত। বিনা উদ্দেশ্যে সে আমার বাড়ী আসে। অমন ছদ্মবেশ, অমন চাতুরীতে আমার বাড়ি বটে কি না ঠিক জেনে নিয়ে, হঠাৎ যেন উবে গেল, বসুমতী যেন দ্বিধা হ'য়ে গিলে ফেলল। ফিরে এসে লোক দিয়ে তার সন্ধানও করেছিলাম, আর কোন খোঁজ তার পাওয়া যায় নি—আর কোন গৃহে ভিক্ষার্থী হ'য়ে উপস্থিত হয় নি।

আঙিনায় সত্তজাগা একটা বাচ্চা মোরগ ডেকে উঠল। —উষা। চিন্তাচ্ছন্নতা কেটে গেল। আকাশে আলোর প্রথম পোঁচ পড়েছে—সময় জানবার জন্য একটা নক্ষত্র দেখবার জন্য মুখ তুললাম—সে ও তার বহু সঙ্গী নবালোকে ডুবে গেছে। ঠিক মাথার ওপর তখনও এক গুচ্ছ নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে—তারাও ম্লান হ'য়ে এসেছে। আর সন্দেহের অবকাশ নাই। দেখতে দেখতে উষা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। না, অঙ্গুলিমালের অভিযানের আর প্রশ্নই ওঠে না।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করেছি, নিশান্তে অদ্ভুততমটি অনুভব করলাম।

বুঝলাম, এখন সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত। কিন্তু তাতে না এল হতাশা, না এল বিপন্মুক্তির কোন আনন্দ। সম্পূর্ণ নূতন চিন্তার উদয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম :—

"বাস্তবিক কেন আমি দস্যুদলের আগমন আশঙ্কা করছিলাম।"

আমি চাইছিলাম তারা আসুক, এসে আমার ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র এই সৌধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে যাক; সম্পদের শৃঙ্খল হ'তে আমায় মুক্ত করুক। কিন্তু এমন মানুষও তো আছে—যারা স্বেচ্ছায় সকল সম্পদ ত্যাগ করে দণ্ডীর দণ্ড ধারণ করে পথে দাঁড়ায়। নীড়হারা পক্ষীর একমাত্র সম্বল তার দুটি পাখা, এ দুটিকেই অবলম্বন ক'রে সে যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। সন্ন্যাসীও তো তাই। শুধু একটা গৈরিক বেশ আর ভিক্ষালব্ধ অন্ন—এই নিয়ে সে জীবনধারণ করে আর এগিয়ে চলে। সে জীবনের প্রশংসায় তাদের বলতে শুনেছি, "গার্হস্থ্য জীবন কারাগার, বেষ্টালয়—আকার্শের মুক্তবায়ু সন্ন্যাসের জন্য।"

চেয়েছিলাম দস্যু-অসি এ দেহ দ্বিখণ্ডিত করুক, কিন্তু এই দেহটা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলে আবার একটা নূতন দেহ ধারণ করতে হবে। কর্মের মতই পুরাতন দেহের পরিণাম নূতন দেহ। তা হ'লে কোন জীবন আমি ত্যাগ করতাম ?

সেদিনের কথা মনে পড়ে। বশিষ্ঠটি আর আমি অকাশগঙ্গার নামে পবিত্র শপথ করেছিলাম, পশ্চিম স্বর্গের পুণ্যাত্মা লোকে আমরা মিলিত হব, পুণ্যতোয়া স্বর্গগঙ্গার পুণ্যধারা পতিত হ'চ্ছে স্ফটিক হ্রদে; শপথের সঙ্গে সঙ্গে স্ফটিক হ্রদের শান্ত জলধারায় একটি জীবনকোরক জাগে; বশিষ্ঠটি বলেছিলেন, প্রতিটি সৎকার্য্যের ফলে জাতকের কোরক একটু বাড়ে, কিন্তু কুকার্য্য করলেই সে কোরক কীটদুষ্টের মত শুকিয়ে যায়। কুকার্য্য-কীট এতদিন হয়তো আমার কোরকটি খেয়ে ফেলেছে। চলে আসা জীবনের দিকে চাইলাম—পুরোপুরি মূল্যহীন হ'য়ে গেছে;

এর ফলও অপদার্থতা। এ জীবনের বিনিময়ে কী লাভ হত?

কিন্তু এও তো আমরা জানি, এমন লোকও আছেন, যাঁরা ইহ জীবনেই পুনর্জন্মের সকল সম্ভাবনাকে পরাজিত করেন। এ দেহে বাস করেই তাঁরা পুণ্যলোকে অনন্তকাল বাস করবার চির অধিকার লাভ করেন। এই মহাপুরুষরাই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

তা হ'লে দস্যুর জ্বলন্ত মশাল বা তীক্ষ্ণ অসি আমার কী করতে পারত?

আর আমি! একবার দস্যুদলের ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম, আবার কিছুক্ষণ পরে সাগ্রহে তাদের আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম—যেন তারাই আমার একমাত্র ভরসা! আর এখন, তাদের ভয় করবার বা তাদের কাছে কিছু আশা করবার কিছুই আমার নাই, সর্ব্ব ভয় সর্ব্ব আশা হ'তে আমি এখন মুক্ত! কতকটা যেন শান্তি পেলাম। এই শান্তিতে আমি পরিব্রাজক জীবনের পূর্ব্বাস্বাদ অনুভব করলাম; আমি যেমন দস্যুদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'য়ে ছিলাম, তাঁরাও তেমনি পার্থিব সকল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; আমার মত এঁরাও পার্থিব কোন বস্তুকে না করেন ভয়, না করেন সেই হ'তে কোন আশা পোষণ; তাঁরা অর্জ্জন করেছেন চিরপ্রশান্তি।

পূর্ব্ব সূর্য্যোদয়েও আমি বাণিজ্যপর্য্যটনে ভীত; পথের কষ্ট, ভোজনের কৃচ্ছ্রতা আমায় সঙ্কুচিত ক'রে তুলেছিল। আর চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমি স্বেচ্ছায় বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করতে চাই; তখন যানবাহনের ভরসা ছিল, এখন নির্ভর শুধু পদদ্বয়! পায়ে হেঁটে চলতে চাই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত; ভাগ্যে যা জুটবে তাই নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

আঙিনা ও উদ্যানের মধ্যে একটা চালাঘর ছিল; এখানেই সকল প্রকারের যন্ত্রপাতি রাখা হত। ধীরে ধীরে এর মধ্যে প্রবেশ করলাম। একখানা পাচনবাড়ির মাথাটা কেটে ফেললাম, পরিব্রাজকের দণ্ড হ'ল; মালী ও কৃষাণদের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি অলাবুপাত্র ছিল; একটা তুলে ঘাড়ে ঝোলালাম।

আঙিনার কূপ হ'তে জল তুলে পাত্রটা ভরে নিলাম। এই সব দেখে ভাণ্ডারিক এগিয়ে এল।

"প্রভু, অঙ্গুলিমাল বা তার দল আসবে না, কী বলেন?"

"না কোলিত, তারা আর আসবে না।"

"তা হ'লেও আপনি এরই মধ্যে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন যে?"

"হাঁ, কোলিত, ঠিকই বলেছ; তবে বাইরে নয়, বিদেশে যাচ্ছি। এ সম্বন্ধে তোমায় কয়েকটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, লোকে যাকে মহত্তম পন্থীর পথ বলে, আমি এখন সেই পথের যাত্রী হ'তে চলেছি; এ পথের অধ্যবসায়ী যাত্রীরা এ জগতে আর ফিরে আসে না, ইহজীবনে নশ্বর বাড়িটুকুতে তো নয়ই। আমিও আর ফিরব না। আজীবন তুমি আমার বিশ্বাসী, আমার স্বার্থে তুমি প্রাণ দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়েছিলে, তাই তোমারই হাতে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি এ গৃহের দায়িত্ব। আমার পুত্র সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত সৌধ ও সম্পত্তির রক্ষণ ও পরিচালন তুমিই করবে। আমার স্ত্রীদের আমার ভালবাসা জানিও, আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করো পিতৃদেবকে—বিদায়।

কোলিত এতক্ষণ আমার হাত দুটিকে অশ্রু ও চুম্বনে পূর্ণ করছিল; হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তোরণের দিকে চললাম। তোরণ দেখেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, "অঙ্গুলিমালের সঙ্গে সে মূর্ত্তির সাদৃশ্য যদি স্বপ্ন হয়, তা হ'লে আমি সঠিকভাবে স্বপ্নের মর্ম্মোপলব্ধি করেছি।"

আর পিছনে ফিরে চাইলাম না, দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম; শীঘ্রই নগরোপকণ্ঠ ও উদ্যানগুলি পশ্চাতে পড়ে রইল। সম্মুখে স্নিগ্ধ ঊষার আলোক, পদতলে ধূলিময় গ্রাম্য পথ—পথের দিকে চোখ পড়ল—এ চলেছে—চলেছে অনন্তকাল ধরে অনন্তের অভিমুখে এগিয়ে গেছে। কোথায় এর যাত্রা শেষ?

হে শ্রদ্ধাস্পদ, এমনি করে একদিন আমি গৃহহীন হ'য়েছি।

কুম্ভকার-কক্ষে

এই বলে পরিব্রাজক কামনীত বৃত্তান্ত শেষ করলেন; সকল কথা যেন তাঁর শেষ হ'য়ে গেছে, চিন্তামগ্নভাবে নিসর্গশোভা দেখতে লাগলেন।

ভগবান্ বুদ্ধও চিন্তারত; তাঁরও দৃষ্টি প্রকৃতির বৈচিত্র্যে নিবদ্ধ।

উন্নত বৃক্ষরাজি—কেউ দূরে কেউ নিকটে; এক এক-স্থানে কতকগুলি মিলিত হ'য়ে ছায়াঘন কুঞ্জ সৃষ্টি করেছে, আবার কতকগুলি দূরে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে দণ্ডায়মান, ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'য়ে কুয়াসার কোলে মিলিয়ে গেছে।

চাঁদ তখন ঠিক অলিন্দের উপরিভাগে; বহিঃকক্ষের মেঝেয় জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে। সামনের প্রাঙ্গণ তিনটী আলোকক্ষেত্রে বিভক্ত হ'য়ে গেছে; অলিন্দের স্তম্ভগুলি মায়া রৌপ্যের মত দেখায়।

কোথায় একটা মহিষ দাঁতে ক'রে ঘাস ছিঁড়ছে, শব্দ আসে।

প্রভু চিন্তা করেন:—"বশিটুঠির সম্বন্ধে যা কিছু জানি এঁকে বলব কি? সে এঁর প্রতি শেষ পর্য্যন্ত কেমন নিষ্ঠাবতী আছে, কেমন ক'রে নির্দ্দোষী হ'য়েও সে শতগিরের ষড়যন্ত্রে পড়ে বিবাহ করতে বাধ্য হ'য়েছে; অঙ্গুলিমাল কেন উজ্জেনী গিয়েছিল; কেমন ক'রে তার এই গমনের ফলে কামনীত স্বয়ং আজ বিলাসজীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হ'য়েছে? বশিটুঠি আজ যে পথের পরিব্রাজিকা, সে পথ এর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করব কি?"

স্থির করলেন—বলবেন না; জানাবার সময় এখনও আসে নি, এ সব জানালে পরিব্রাজকের প্রচেষ্টায় সহায়তা করা হবে না।

প্রভু এই জন্য বাক্যোচ্চারণ ক'রে বললেন—"যে বস্তু আমরা ভালবাসি, তার সহিত মিলিত হ'তে না পারা দুঃখ, যে বস্তু আমরা ভালবাসি না, তার সহিত মিলিত হওয়াও দুঃখ—আপনার সদৃশ অভিজ্ঞতা হ'তেই এ উক্তির সৃষ্টি।"

"অত্যন্ত সত্য।" কামনীত চীৎকার করে ওঠেন, "সম্পূর্ণরূপে অতি গভীরভাবে সত্য। হে অভ্যাগত এ বাণী কার?"

"সে সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করবেন না, পরিব্রাজক। আপনি যদি এর অভ্যন্তরের সত্য স্বীকার ও অনুভব করেন, তা হ'লেই যথেষ্ট—যেই বলুক না কেন।"

"এ উক্তির সত্য স্বীকার না করে কি পারি? এতে মাত্র কয়েকটী শব্দে আমার সমগ্র জীবনের দুঃখ যে বিবৃত। ইতিমধ্যেই এক জনকে গুরুপদে বৃত না করলে, এই উক্তির স্রষ্টাকে গুরুপদে বরণ করতাম।"

"তা হ'লে, আপনার একজন গুরু আছেন, বলুন, তাঁরই উপদেশে এখন চলছেন?"

"প্রকৃত প্রস্তাবে হে মহাত্মন্, কোন গুরুর উদ্দেশ্যে আমি গৃহত্যাগ করি নি; সঙ্কল্প ছিল, স্বীয় শক্তিতেই লক্ষ্যে পৌঁছাব। দিবাকালে কোন গ্রামপ্রান্তে, কি কোন নদীতটে বা কোন বৃক্ষতলে বিশ্রামকালে গভীর চিন্তায় মগ্ন হতাম। "আত্মা কী? সংসার কী? পৃথিবী কি চিরস্থায়ী? আত্মা কি অমর? এ জগৎ কি ক্ষণস্থায়ী? আত্মা কি ক্ষণস্থায়ী? বা আত্মা অবিনাশী কিন্তু জগত ধ্বংসশীল? জগত অবিনাশী আর আত্মা মরণশীল? অথবা, পরম ব্রহ্ম এ বিশ্বকে তাঁর স্ব হ'তে বিশ্লিষ্ট করেছেন! আর পরম-ব্রহ্মের স্বরূপ যদি পূর্ণানন্দ হয়, তা' হলে তাঁরই সৃষ্ট এই জগত এমন অসম্পূর্ণ ও দুঃখমণ্ডিত কেন?"—এই ধরণের চিন্তা করতাম।

"এই তত্ত্বচিন্তার মধ্যে দিয়ে কোন সত্যে আমি উপনীত হ'তে পারি নি। বরং অবিরত নানারূপ সন্দেহের উৎপত্তি হ'তে লাগল; যে লক্ষ্যের জন্য মহাত্মারা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগী, মনে হ'য় তার দিকে এক পা-ও অগ্রসর হ'তে পারি নি।"

"হাঁ পরিব্রাজক, এ যেন দিকচক্রবালের অনুসরণ: 'আজ কি কাল যেন আমি দৃষ্টিরোধকারী ঐ রেখায় পৌঁছাতে পারতাম'; জীবনলক্ষ্যও এমনিভাবে প্রতিদিন পিছিয়ে যায়।"

চিন্তাচ্ছন্ন কামনীত মাথা নেড়ে সমর্থন করেন; বলে চলেন—"একদিন, বৃক্ষচ্ছায়া তখন দীর্ঘায়ত হ'চ্ছে, অরণ্য মধ্যে এক আশ্রমে উপস্থিত হ'লাম। কতকগুলি যুবক দুগ্ধ দোহন করছে, কেউ কাষ্ঠবিস্ফারণে, কেউ নদীতে তৈজস প্রক্ষালনে রত। তাঁদের পরিচ্ছদ শ্বেত। আশ্রমের সম্মুখস্থ কক্ষে একজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট; সম্ভবতঃ এঁরই নিকট যুবকগণ শ্লোক ও বাক্য শিক্ষা করে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বললেন, পরবর্ত্তী গ্রামে পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশী লাগবে না, তবু তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে রাত্রির মত আমি যেন তাঁর আশ্রমেই বিশ্রাম ও অন্নগ্রহণ করি। যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর অনুরোধ স্বীকার করলাম। নিদ্রার পূর্ব্বে বহু সৎ ও মহান্ উক্তি কর্ণগোচর হল।

পরদিন আমি যাবার জন্য প্রস্তুত, ব্রাহ্মণ সম্বোধন করে বললেন, "হে পরিব্রাজক, আপনার গুরু কে?" আপনাকে এখনি যা বললাম, তাঁকেও তাই জানিয়েছিলাম।

"শুনে ব্রাহ্মণ বললেন,'হে পরিব্রাজক, জ্ঞানী হস্তীর মত যূথভক্ত ও অভিজ্ঞের নেতৃত্বে অগ্রসর না হ'য়ে গণ্ডারের মত একাকী ভ্রমণ করলে কেমন করে লক্ষ্যে পৌঁছবেন।"

"যূথ শব্দটি উচ্চারণ করবার সময় তিনি সস্নেহে তাঁর

চতুর্দ্দিকস্থ যুবক দলের দিকে চাইলেন, 'অভিজ্ঞ-নেতৃত্ব' কথা দুটি বলবার সময় তাঁর মুখমণ্ডল অন্তরের তৃপ্তিতে যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

"তিনি বলে চললেন, 'কারণ, এ পথ অতি উচ্চ, অতি গভীর, গুরু বিহনে এ পথ পাথর চাপা থেকে যায়। আবার এদিকে বেদের শ্বেতকেতুভাষ্য বলছেন, "হে কল্যাণীয়, গান্ধারের এই দেশ হতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ-চক্ষু অবস্থায় নিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে ছেড়ে দিলে এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করতে বললে, সে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে বা উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে এ'গয়েই চলবে, কারণ সেখানে সে নীত হয়েছে বদ্ধ-চক্ষু অবস্থায় এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই একে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার চক্ষুবন্ধন উন্মোচন করে যদি বলে দেন যে, ঐ দেখ ঐ দিকে গান্ধারের অধিবাসীরা বাস করেন, ওদিকে যাও, তা হলে সে গ্রামে গ্রামে পথ জিজ্ঞাসা করে স্বস্থানে উপস্থিত হবে—শুধু উপস্থিত হবে নয়, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়ও তার মন পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হবে—ঠিক সেইরূপ, যে ব্যক্তি উপযুক্ত গুরু পেয়েছে এবং অন্তরের জাগ্রত জ্ঞানকে এই ভাবে প্রকাশ করে যে, 'ইহলোকে আমি আমার কৃত্য ও কর্ম্মফল ভোগ করব এবং গুরু-নির্দ্দেশে পথ অতিবাহিত করে একদিন আমার স্ব-লোকে স্থান পাব'।"

স্পষ্ট বুঝলাম ব্রাহ্মণ আমায় শিষ্যরূপে পেতে ইচ্ছুক। তাঁর এই কামনাই তাঁর প্রতি আমায় বিশেষ বিমুখ ক'রে তুলল, যদি বা কিছু আস্থা ছিল, এখন তাও বিলীন হ'য়ে গেল। অপর দিকে বেদের উক্তি হ'তে আমি বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছিলাম, উক্তিটা মুখস্থ রাখবার জন্য পথে চলতে চলতে বার বার আবৃত্তি করলাম। আবৃত্তি করতে করতে পূর্ব্বশ্রুত বাণী মনে পড়ে গেল—

"গুরু শিষ্যের সন্ধান করেন না, শিষ্যই গুরুর সন্ধান করে। এই আরণ্য ব্রাহ্মণ আর সেই শ্রেণীর গুরুর মধ্যে কত পার্থক্য। হে পূজ্য, এই শ্রেণীর কামনার ঊর্দ্ধে অবস্থিত গুরু পাবার জন্য আমার হৃদয় কামনা-চঞ্চল হ'য়ে উঠল।"

"কে সেই গুরু—যাঁর এত প্রশংসা আপনি শুনেছেন? নাম কী তাঁর?"

"হে ভদন্ত, তিনি শাক্যকুলের সম্পদত্যাগী, শাক্যপুত্র সন্ন্যাসী গৌতম। এই গুরু গৌতম সর্ব্বত্র 'পূর্ণ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্বজ্ঞ, দেবতা ও মানুষের প্রভু জ্ঞানালোকদীপ্ত বুদ্ধ' নামে প্রশংসিত। সেই পূর্ণমানবের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে এবং তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করবার জন্যই এখন আমি ভ্রমণ করছি।"

"কিন্তু সেই পূর্ণমানব জ্ঞানালোকদীপ্ত মহাপুরুষ এখন কোথায় অবস্থান করছেন?"

"হে ভদন্ত, দূর উত্তরে কোশলরাজ্য আছে, তার মধ্যে শ্রাবস্তী নগরী অবস্থিত। এই নগরের উপকণ্ঠে সুমহান বৃক্ষশোভিত জেতবন নামক উদ্যান আছে, এর গভীর ছায়ায় সকল শব্দ হ'তে দূরে অবস্থান ক'রে মানবগণ ধ্যানময় হ'তে পারে। এর স্ফটিকস্বচ্ছ দীর্ঘিকাগুলি হ'তে শীতলতা প্রবাহিত হয়, এর উদ্যানস্থ বহুবর্ণের পুষ্পরাজি স্থানটীকে সুবাসে আমোদিত করে রাখে। বহু বর্ষ পূর্ব্বে বণিক্ অনাথপিণ্ডদ রাজা জেতের নিকট এই উদ্যান ক্রয় করেন, এর মূল্যস্বরূপ যে অর্থ প্রদত্ত হয়েছিল, সে অর্থ দিয়ে এ উদ্যান আবৃত করা যেত; অনাথপিণ্ডদ সেই মহামূল্যবান উদ্যান বুদ্ধকে উপহার দিয়েছেন। এই বহু জ্ঞানিজন-অধ্যুষিত জেতবনে এখন প্রভু জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধ অবস্থান করছেন। আশা করি আর চারি সপ্তাহ সমশক্তিতে পথ চলতে পারলেই আমি প্রভুর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করব।"

"হে পরিব্রাজক, আপনি সে পুণ্যাত্মাকে দেখেছেন কি? তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন?"

"না ভদন্ত, এখন পর্য্যন্ত তাঁর দর্শনলাভ হয় নি এবং এখন দর্শন পেলেও চিনতে পারব না।"

প্রভু চিন্তা করলেন, আমারই জন্য এ পরিব্রাজক পথ চলেছেন, আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন। আমার মতবাদ এঁর কাছে প্রকাশ করলে কেমন হয়?"

[ক্রমশঃ

খেয়া [ফটো—অনিল বিশ্বাস

পুণ্যাত্মা পুরুষ সচ্চিদানন্দ

যদি দেখা যাইত যে, পাশ্চাত্ত্যগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বসাধারণের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অথবা শিক্ষার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে কোনো আপত্তি হইতে পারিত না। কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের দুঃখই দূরীভূত হইতেছে না, তখন যুক্তিসঙ্গতভাবে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

জন্ম—৭ই কার্ত্তিক, ১২৯৬

মৃত্যু—৭ই ফাল্গুন, ১৩৫১

পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ থাকিলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না এবং একতাও সাধিত হয় না। কাজেই ব্যাসদেবের মতে একতা সাধনই মানুষের স্বীয় ইষ্টলাভ করিবার অন্যতম উপায়।

*

ভারতবাসী ঘুমাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বহু সহস্র বৎসর হইতে তাহার জমিগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবাসী তাহা বুঝিতে পারে নাই। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবাসীর মোট প্রয়োজনীয় শস্যের প্রায় দ্বিগুণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। আজ যে জমির প্রতি বিঘায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ তিন মণ ফসল ফলিতেছে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেও ঐ জমি হইতে গড়ে ৭ মণের উপর ফসল পাওয়া যাইত এবং ১০ বৎসর আগে উহা গড়ে ১২ মণ ফসল উৎপাদন করিত। গভর্ণমেণ্টের বিবরণ সমূহ হইতেই এই উক্তি প্রমাণিত হইবে। গত তিন বৎসর হইতে প্রতি বিঘায় ফসলের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন উদ্বৃত্ত হওয়া দূরের কথা, ভারতবর্ষে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় শস্যও উৎপন্ন হইতেছে না। তাই এখন আর বৈদেশিক কোন জাতির ভারতীয় বাণিজ্য লাভজনক হইতেছে না।—(১৩৪৩)

*

যুগপৎভাবে শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আরাম, মনের স্থিরতা ও শান্তি, বুদ্ধির ধীরতা ও বিচারশক্তি রক্ষিত হইলে মনের যে অবস্থার উদ্ভব হয়—সেই অবস্থার নাম 'তৃপ্তি'। মানুষের যখন জ্ঞানাভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়; মানুষের জ্ঞানগত দারিদ্র্যের উদ্ভব হইলে মানুষ তাহার শরীর অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির যে কোন একটির আরাম হইলে তৃপ্ত বোধ করিয়া থাকেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই চারিটি অংশের যুগপৎভাবে আরাম না হইয়া কোন একটি অংশের আরাম হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থা তৃপ্তির অবস্থা নহে, উহা উত্তেজনার অবস্থা।

*

মানুষের স্বীয় ইষ্ট সাধন করিতে হইলে যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন, সেইরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবেও তাহার কার্য্য করিতে হয়। মানুষের স্বীয় ইষ্ট সাধন করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার প্রয়োজন হয় বলিয়াই ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, প্রসাদ লাভ করিবার অন্যতম উপায় দ্বেষবিযুক্ত হওয়া।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ গীতা

*

আত্মা-যন্ত্রটি যে কার্য্যের পরিচালক, সে কার্য্যের সংখ্যা বড় বিরল। আত্মার পরিচালিত কার্য্যের ফলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূল নিদান এবং নিদানের নিদান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানা যায়। সে জানা শুধু কথার কল্পিত জানা অথবা কবির সুরের ঝঙ্কার নহে। আত্মা-যন্ত্রের পরিচালনায় সক্ষম মানুষ দুনিয়ায় একজন থাকিলে মানুষে মানুষে ভেদ, বিভিন্নতা ও মারামারি এত উৎকট হয় না। যৌবন এত ক্ষণস্থায়ী এবং জীবনের দৈর্ঘ্য এত অল্প হয় না; বর্ত্তমান জগতের বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হয়, আত্মা-যন্ত্রের পরিচালনার

সক্ষমতার কথা যেন ভারতীয় ঋষিগণের কল্পনামাত্র। কাজেই, আমরা আত্মার কার্য্যকে এবং আত্মার কার্য্যে সক্ষম মানুষকে কোন শ্রেণীবদ্ধ করি নাই।...যে কার্য্যের পরিচালক আত্মা', তাহার নাম 'আধ্যাত্মিক' কার্য্য এবং যে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক কার্য্য বেশী, তাহার নাম 'আধ্যাত্মিক' মানুষ বলা হইবে।—এই সমস্তই মানুষের কার্য্যের কথা এবং তাহার কার্য্যের যন্ত্রের কথা।

যদি ভগবানের ভগবত্তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ্য এবং সৃষ্টি শৃঙ্খলাময়; বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা কোথাও নাই। যেখানে আপাতঃদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা, সেইখানেই আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। মানুষের কার্য্যের বিষয় এবং রকম অনুসারে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ পরিবর্ত্তিত শক্তি-সম্পন্ন হয়। যেখানে মানুষের শক্তির অভাব, সেইখানেই বুঝিতে হইবে মানুষের কার্য্যের বিষয়ে এবং রকমে মানুষ কোন-না-কোন ভুল করিয়াছে। মানুষকে সর্ব্বদা বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, সে তাহার কার্য্যের বিষয় ও রকম বাছিয়া লইতে শিখিলে নিজেকে অসীম শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে। কোথায় তাহার শক্তির অভাব, তাহার কার্য্যের পরিণতি দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। চেষ্টা করিলে নিজের শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, এই হিসাবে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে, কিন্তু কখনও যেন কোথায় শক্তির অভাব তদ্বিষয়ে মানুষ অন্ধ না হইয়া পড়ে।

•

সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে সুখ শান্তিতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে ও জীবন যাপন করিতে পারে, তদনুরূপ সমাজ-গঠনের ও সমাজ-পরিচালনার দায়িত্ব যেরূপ অসাধারণ মানুষগুলির স্কন্ধে স্বভাবতঃ নিহিত, সেইরূপ আবার যাহাতে ঐ অসাধারণ মানুষগুলি শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির সর্ব্বতোভাবের পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহার সহায়তা করাও সমাজের প্রত্যেকের অন্যতম দায়িত্ব।

পুণ্যাত্মা সচ্চিদানন্দের এমনি ধারা অজস্র বাণী ছড়াইয়া আছে বিগত পঞ্চদশবর্ষের বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠায়। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনার ধন ছিল বঙ্গশ্রী। তিনি জানিতেন বঙ্গের শ্রী ফিরাইয়া আনিতে হইলে চাই সমষ্টিগত মানব-সমাজের শ্রীসাধন। অর্থনৈতিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত বাঙালীর জীবন। তাই তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন অর্থকরী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজে—যার মাধ্যমে এই অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে অন্ততঃ জনসাধারণের একটা খণ্ড অংশও সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে পারে। তাঁহার সেই সাধন-কার্য্যে তিনি জয়ী হইয়াছেন। তিনি বিজয়ীপুরুষ। দুঃখের কঠিন তাপকে তিনি জানিতেন বলিয়াই দুঃখজয়ের অমর মন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার প্রতিটি কাজে। ভাবময় ও কর্ম্মময় জীবনের একাত্ম সংবেশ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে। কর্ম্মে যাহা তিনি রূপ দিতেন, ভাষায় তাহাই তিনি ব্যক্ত করিতেন। সে ভাষা কঠিন সংস্কৃতের জালে আবদ্ধ নয়, সে ভাষা সর্ব্বযুগের সর্ব্বকালের জনসাধারণের ভাষা। মানুষের জৈবিকস্থিতির উপরেও যে একটা মনন-প্রধান জগৎ আছে—সে জগৎ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন বলিয়াই ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন দেশবাসীর জন্য। বর্ত্তমান বাংলার সংস্কৃতি তথা সংস্কৃত প্রসারের পথপ্রদর্শক স্বরূপ ছিলেন তিনি। তাঁহার স্মৃতিতীর্থের পথে পথে তাই শত শত সংস্কৃতিবানের শ্রদ্ধা গিয়া পৌছায়। ব্যাসদেবের অমর বাণীকে যিনি গুরুবাক্যের মতো মনের সমস্ত চেতনা দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি মানুষের সৎ ও শুভচিন্তার আধার স্বরূপ, যিনি সম্প্রীতির আনন্দে সকলের সঙ্গে একত্রে যুক্ত থাকিয়া মহৎ কর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন সহস্রজনের মধ্যে—তিনিই তো সত্যি সত্যি সচ্চিদানন্দ। কি শিল্পে, কি দর্শনে, কি সাহিত্যে, কি ঐতিহাসিক তত্ত্বে, কি বুনিয়াদি সংগঠনে, কি বাগ্মিতায়—সর্ব্বত্র সমদক্ষতার এমন উজ্জ্বল প্রতিভা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ৭ই ফাল্গুন এই পুণ্যাত্মাপুরুষ সচ্চিদানন্দের তিরোধান দিবস। আমরা তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

'জনগণ-মন-অধিনায়ক' কে?

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের জনগণ-মন-অধিনায়ক গানটির উদ্দিষ্ট পাত্র কে—তা নিয়ে দেশে এত বেশি মতবিরোধ চ'লছে যে, সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত হয়ে ঐকান্তিক ভাবে তথ্যনিষ্ঠার আশ্রয় না নিলে সত্যনিরূপণের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এস্থলে ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রসঙ্গমাত্র না তুলে শুধু কতকগুলি তথ্যের বিবরণ দিয়ে যাব। আশা করি তার থেকেই সত্য স্বতঃপ্রকাশিত হবে।

এই গানটি রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন (তারিখ ২০।১১।৩৭)—

"রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্তে আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণ-মন-অধিনায়ক গানে সেই ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানব-ভাগ্যরথ-চালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।"

—বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ, পৃঃ ৭০৯

এই সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ আরেকখানি পত্রে (তারিখ ২৯।৩।৩৯) বলেছেন—

"শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।"

—পূর্বাশা, ১৩৫৬ ফাল্গুন,

এই দুটি অংশের সার মর্ম এই যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো রাজা বা সম্রাটকে লক্ষ্য করে এই গান রচনা করেন নি এবং তাঁর রাজভক্ত বন্ধুও এটিকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি অর্থাৎ এটি রাজপ্রশস্তিরূপে ব্যবহৃতও হয় নি। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উক্তিকে সত্য বলে স্বীকার করা যায় কি না, বস্তুত তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

একথা আজ সুবিদিত যে, গানটি প্রথম গাওয়া হয় ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (২৭ ডিসেম্বর, বুধবার), আর তৎকালে কংগ্রেস ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মডারেট নেতাদের প্রভাবাধীন। তার মাত্র একপক্ষ কাল পূর্বে (১২ ডিসেম্বর) দিল্লির দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ তৎকালীন বঙ্গ বিভাগের অবসান ঘোষণা করেন। ওই ঘোষণায় মডারেটদের মধ্যে প্রবল রাজভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং কংগ্রেসমঞ্চ থেকেও রাজানুগত্য প্রকাশের ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এহেন কংগ্রেসে গীত হয়েছিল বলেও গানটির সম্বোধনপাত্র সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একটু নিবিষ্টভাবেই, বরং একটু সন্দিগ্ধচিত্ত নিয়েই, তথ্যসন্ধান করা প্রয়োজন।

১৯১১ সালের কলকাতা কংগ্রেসে তিন দিনে গীত চারটি গানেরই পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। প্রথম দিনের উদ্বোধন হয় বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে; তার পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতির অভিভাষণ পাঠান্তে সে দিনের কার্য সমাপ্ত হয়। অতঃপর শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্রাদি পাঠের পরে রাজ-দম্পতিকে আনুগত্য ও স্বাগত জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গ্রহণান্তে রাজ-দম্পতিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানোর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত একটি হিন্দি গানও গাওয়া হয়। তার পরে আরও দশটি প্রস্তাব গ্রহণ করে সেদিনের কার্য সমাপ্ত হয়। তৃতীয় দিনের উদ্বোধন হয় বিখ্যাত 'অতীত গৌরব-বাহিনি মম বাণি'

গানটি দিয়ে। গানের পরে সবসুদ্ধ বাইশটি প্রস্তাব গ্রহণান্তে অধিবেশন শেষ হয়। চারটি গানই সরলা দেবীর নেতৃত্বে বালক ও বালিকাদের মিলিত কণ্ঠে গীত হয়। এই গানগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ প্রাচীনতম। 'নমো হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত সরলা দেবীর 'অতীত গৌরব-বাহিনি' গানটিও অর্বাচীন নয়; ১৯০১ সালের কলকাতা কংগ্রেসেই সেটি প্রথম গীত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জনগণ-মন-অধিনায়ক গানটি এবং হিন্দি স্বাগত সংগীতটি নূতন, কংগ্রেস-অধিবেশনের অল্প পূর্বে রচিত। হিন্দি গানটি নাকি সরলা দেবীর স্বামী পাঞ্জাবের রামভুজ দত্তচৌধুরীর রচনা। বন্দে মাতরম্ এবং নমো হিন্দুস্থান যে জাতীয় সংগীত অর্থাৎ দেশভক্তির গান—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর হিন্দি স্বাগত সংগীতটি তো স্পষ্টতই রাজভক্তির গান বলে স্বীকৃত। জনগণ-মন-অধিনায়ক গানটি কোন্ পর্যায়ে পড়বে, দেশভক্তির না রাজভক্তির? সেইটেই বিচার্য।

তখনকার দিনের মামুলি প্রথা অনুসারে কংগ্রেসের প্রত্যেক দিনেরই উদ্‌বোধন হত একটি জাতীয় সংগীত দিয়ে। সে হিসাবে এই গানটি বন্দে মাতরম্ ও নমো হিন্দুস্থানের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ দেশভক্তির গান বলেই স্বীকৃত হতে পারে। পক্ষান্তরে এটিকে হিন্দি রাজভক্তির গানটির পর্য্যায়ভুক্ত বলেও তর্ক করা যায়। কেননা ওই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যে রাজানুগত্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার পূর্ব্বে 'জনগণ-মন অধিনায়ক' এবং তার পরে হিন্দি গানটি গীত হয়। অর্থাৎ প্রথমটিকে রাজানুগত্য প্রস্তাবের ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টিকে তার পরিণতি বলে বর্ণনা করবার অবকাশ রয়েছে। এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে হলে তৎকালীন সংবাদপত্রাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আমরা এস্থলে সে সব কথা যথাসম্ভব বিশদ ভাবেই উপস্থাপিত করছি—

১। কংগ্রেসের ষড়বিংশ অধিবেশনের সরকারি রিপোর্টে আছে—

"The proceedings commenced with *a patriotic song* composed by Babu Rabindranath Tagore."

তার পরে র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ কংগ্রেস্ বন্ধুদের পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ এবং সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণের বর্ণনা আছে। অতঃপর আছে—

"After that *a song of welcome* to Their Imperial Majesties composed for the occasion was sung by the choir."

দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস-রিপোর্ট অনুসারে জনগণ-মন-অধিনায়ক দেশভক্তিরই গান, রাজভক্তির নয়।

২। অমৃতবাজার পত্রিকায় (তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) আছে—"The proceedings began with the singing of a Bengali *song of benediction*....This (রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ) was followed by another *song in honour* of Their Imprial Majesties' visit to India".

এখানেও দুটি গানের প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। Song of benediction মানে কি সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। হাতের কাছে চ্যাম্বার্স ইংরেজি অভিধানে দেখছি—

"A solemn *invocation of the divine blessing* on men or things"। Benediction মানে পরে আরও স্পষ্ট হবে।

৩। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মডারেট নেতাদের অগ্রণী এবং ১৯১১ সালের কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজে স্বভাবতই বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। ওই কাগজ থেকে তিন দিনেরই (২৭-২৯ ডিসেম্বর, ১৯১১) প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি।—

প্রথম দিন:—The proceedings commenced with the *famous Banede- Mataram* song sung in chorus by a number of girls and boys led by Mrs. Sarala Devi.

দ্বিতীয় দিন:—The proceedings commenced with a *patriotic song* composed by Babu Rabindranath Tagore, the leading poet of Bengal (*jana-gana-mana-adhinayaka*), of which we give an English translation.—

King of the heart of nations, Lord of our country's fate ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতিকর্তৃক উত্থাপিত রাজানুগত্যের প্রস্তাব-গ্রহণান্তে—A Hindi *song paying heartfelt homage* to their Imperial Majesties was sung by the Bengali boys and girls in chorus.

তৃতীয় দিন :—The twenty-sixth session of the Indian National congress resumed its proceedings on Thursday...with the singing of the *famous song* of Mrs. Sarala Davi (Atita-gauraba-bahini etc.), an English translation of which is given below.

এই সব বিবরণই কংগ্রেস রিপোর্টের সমর্থক। ২ জানুআরী ১৯১২ তারিখের 'বেঙ্গলী'তে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের গঙ্গাবক্ষে ষ্টিমারভ্রমণের একটি বিবরণ আছে। তাতে জানা যায়—সরলা দেবী প্রতিনিধিদের কয়েকটি গান শোনান। এইগুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গেও দেখি দেশভক্তি এবং রাজভক্তির গানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

৪। এবার ইঙ্গভারতীয় কাগজের বিবরণ উদ্ধৃত করছি। প্রথমেই তৎকালীন ইংলিশম্যানের (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) বিবৃতি দেওয়া যাক।—

The proceedings opend with a *song of welcome* to the King Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore......

This (রাজানুগত্যের প্রস্তাবগ্রহণ) was follcwed by another *song in Hindi welcoming* Their Imperial Majesties. The choir in both songs was led by Mrs Rambhuj Dutt Chaudhuri.

এই বিবরণ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানটিও রাজোদ্দেশ্যে রচিত স্বাগতসংগীত। এই বর্ণনা কংগ্রেস-রিপোর্ট তথা অমৃতবাজার ও বেঙ্গলী পত্রিকার বিবরণের বিরোধী। এটাই হচ্ছে জনগণমন-অধিনায়ক গানটি সম্বন্ধে বহুঘোষিত অপবাদের উৎসস্থল।

৫। অতঃপর ষ্টেট্স্ম্যান (২৮।১২।১১)

The proceedings commenced shortly before 12 O' clock with a Bengali song...

The choir of girls led by Sarala Devi (Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhuri) *then* রাজানুগত্য-প্রস্তাব গ্রহণের পর) sang *a hymn of welcome* to the King specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore, the Bengali poet.

এই বর্ণনায় বাংলা উদ্বোধনগীতটি কার রচিত তার উল্লেখ নেই। তবে এটি যে রাজভক্তির গান নয় তা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে; কেননা এটি রাজভক্তির গান হলে তার বিশেষ উল্লেখ না থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। দ্বিতীয় গানটি বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত, এই উক্তিতে বোঝা যায়, এই গানটিও বাংলা বলেই ষ্টেট্সম্যানের ধারণা। যাহোক, এই বিবরণ শুধু যে কংগ্রেসরিপোর্ট প্রভৃতি দেশী বর্ণনার বিরোধী তা নয়, ইংলিশম্যানেরও বিরোধী। তবে এক জায়গায় অবশ্য ইংলিশম্যান ও ষ্টেট্স্ম্যানের মিল আছে। সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ রাজোদ্দেশ্যে একটি স্বাগত সংগীত রচনা করছেন, এই সংবাদপ্রচার।

৬। এবার রয়টার। বিলাতের ইণ্ডিয়া নামে সাপ্তাহিক কাগজে (২৯।১২।১১) রয়টার প্রেরিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল এভাবে—

When the Indian National Congress resumed its session on Wednesday, Dec. 27, *a Bengali song, specially composed in honour of* the Royal visit, was sung and a resolution welcoming the King Emperor and Queen Empress was adopted unanimously.

ষ্টেট্সম্যানের সঙ্গে এই বর্ণনার সামঞ্জস্য নেই, তবে ইংলিশম্যানের সঙ্গে আছে।

দেখা যাচ্ছে, বিলাতি সংবাদপরিবেষকরা রাজভক্তির সংবাদপ্রচারে যত আগ্রহান্বিত ছিলেন, সংবাদের যাথাযথ্য নির্ণয়ে ততটা সতর্ক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ এসব বর্ণনার প্রতিবাদ করেছিলেন—এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ তৎকালেও তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতির মূঢ়তার প্রতিবাদ করাকে আত্মাবমাননা বলেই মনে করতেন। এসব স্থলে মনে রাখা উচিত যে, কোনো মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ না হলেই তা সত্য হয় না। তা ছাড়া তিনি যেমন ইংলিশম্যানের প্রতিবাদ করেননি তেমনি বেঙ্গলীরও প্রতিবাদ করেন নি। পরস্পর-বিরোধী দুই বিবৃতিই সত্য হতে পারে না। কোন্‌টা সত্য তা নির্ণয় করতে হলে আরও তথ্য চাই। এসম্বন্ধে আরও যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাই এখানে যথাক্রমে বিবৃত করছি।

কংগ্রেস-অধিবেশন হয় পৌষ মাসের মাঝামাঝি।

তার পরের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ) জনগণ মন-অধিনায়ক গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে গানের নাম দেওয়া হয় 'ভারত-বিধাতা' এবং তার নীচেই এটির পরিচয় হিসাবে লেখা ছিল 'ব্রহ্মসংগীত'। তাতে বোঝা যাচ্ছে স্বয়ং পরব্রহ্মই ভারতবিধাতা, কোনো রাজা বা সম্রাট নন, একথা প্রকাশ করাই ছিল রচয়িতার অভিপ্রায়। এই বর্ণনাকেই ইংলিশম্যান প্রভৃতির পরোক্ষ প্রতিবাদ বলে গ্রহণ করা চলে।

এই মাঘ মাসেই ভারতী পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি গানের একটি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং সরলা দেবীর জননী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুতরাং অন্তত জনগণ-মন-অধিনায়ক এবং নমো হিন্দুস্থান গান দুটি সম্বন্ধে এই পত্রিকার অভিমতের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেস অধিবেশনের অত্যল্প কাল পরেই বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং সমকালীনতার বিচারেও এটির মূল্য খুব বেশী। ভারতীতে এই বর্ণনার রচয়িতার নাম নেই। সুতরাং এটি সম্ভবতঃ সম্পাদকীয় বলেই স্বীকার্য্য। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, একথা কংগ্রেস-রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। স্বর্ণকুমারী উপস্থিত ছিলেন কি না জানি না। কিন্তু ভারতীর বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায় তার রচয়িতা অধিবেশনের তিনদিনই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাতেও লেখাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছে। যা হোক, আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি।

"গত ২৬, ২৭, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিদিনই জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা গীত হইত। প্রথমদিন ভারতবর্ষের সুজলা শ্যামলা মাতৃমূর্ত্তির, দ্বিতীয় দিন মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা যিনি

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায়

যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন, সেই ত্রিলোকনাথের, এবং তৃতীয় দিন অতীত গৌরবস্মৃতি-ঐশ্বর্য্যের খনি হিন্দুস্থানের বন্দনাগান হইয়াছিল। সুমধুর বালিকাকণ্ঠের সহিত যুবকদের সুগম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তবগান সকল ধ্বনিত হইত, তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপধূনা যেমন মনকে পূজার অনুকূল অবস্থা দান করে, এই সকল বন্দনাগান তরুণ যুবক ও বালিকাদের কণ্ঠে গীত হইয়া অন্তরে সেই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।"

—ভারতী, ১৩১৮ মাঘ, পৃ-৯৯৬-৯৭

এই বর্ণনা অনুসারে জনগণ-মন-অধিনায়ক গানটি হচ্ছে যুগপৎ 'জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা' এবং 'মানব জাতির অদৃষ্টবিধাতা ত্রিলোকনাথের বন্দনাগান'। শুধু তাই নয়, লেখকের মতে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে পার্থ-সারথি বলেছিলেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে', তিনিই ভারত-ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগধাবিত যাত্রীদের চিরসারথি। লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত কাগজেও তাঁর জামাতা রামভুজ দত্ত চৌধুরীর হিন্দি রাজপ্রশস্তিটি উল্লেখযোগ্য বলেও বিবেচিত হয় নি। কেননা এটিকে কোনো ক্রমেই 'জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা' বলে স্বীকার করা যায় না।

গানটির রচয়িতা এবং শ্রোতার অভিমত জানা গেল। সৌভাগ্যবশত তার প্রধান গায়িকা সরলা দেবীর অভিমতও জানা গিয়েছে। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের দু' সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি দিল্লিতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের অভিষেক দরবারেও উপস্থিত ছিলেন। সেই দরবারের একটি সুন্দর বর্ণনা তিনি প্রকাশ করেন উক্ত মাঘসংখ্যা ভারতীতেই। এই বর্ণনা পড়লে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, তখন লেখিকার মনে দেশভক্তি এবং রাজভক্তির আশ্চর্য্য মিশ্রণ ঘটেছিল। তাই তিনি কংগ্রেসেও বন্দেমাতরম্, নমো হিন্দুস্থান প্রভৃতি গানের সঙ্গে হিন্দি রাজপ্রশস্তিটিও অতি সহজ-ভাবেই গাইতে পেরেছিলেন। যা হোক, দিল্লী দরবারের বর্ণনায় দেখি God save the king গানটি তিনি মুগ্ধচিত্তেই শুনছেন। শুধু তাই নয়, এটিকে তিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপেও নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এবার তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা যাক—

"এই God save the king আজ কত বৎসর ধরে

ভারতবর্ষীয় প্রজারা শুনে আসছে।...কিন্তু আজ সেটা কত সরস হয়ে উঠেছে, কত সজীব, কত প্রাণময়। আজ তার বাক্যে বাক্যে পদে পদে সার্থকতা আছে। ব্যাণ্ড-বাজনা God save our gracious king, আমাদের মনে প্রতিধ্বনি হল—

হে ঈশ্বর, হে ভারতের ভাগ্যবিধাতা, এ দয়াবান্ প্রজারঞ্জক রাজাকে রক্ষা কর।"

—ভারতী, ১৩১৮ মাঘ, পৃঃ ১০২৮

মনে রাখা উচিত যে, কংগ্রেসে জনগণমন-অধিনায়ক এবং হিন্দি রাজপ্রশস্তিটি গাওয়ার অল্পকাল পরেই তিনি এই বর্ণনাটি লেখেন। দেখা যাচ্ছে—তাঁর মতেও ঈশ্বরই ভারতভাগ্যবিধাতা, কোনো রাজা বা সম্রাট নন। কি মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন, তাও স্পষ্ট বোঝা গেল।

অতঃপর সেই মাঘ মাসেরই এগারো তারিখে কলকাতায় মহর্ষি-ভবনে মাঘোৎসব সভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জনগণ-মন-অধিনায়ক গান করেন। তখন সম্রাট ভারতবর্ষে ছিলেন না এবং তাঁর প্রশস্তির কোনো উপ-লক্ষ্যও ছিল না। সুতরাং এই গানের লক্ষ্য যে স্বয়ং ভগবান্, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, তাতে সন্দেহ থাকে না। শুধু তাই নয়, সেই মাঘোৎসব সভাতেই সন্ধ্যাকালে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের নবযুগ' নামে যে ভাষণ দেন তার শেষাংশ এই—

"আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়-যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগ দিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানব ভাগ্যবিধাতা।"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৩ ফাল্গুন, পৃঃ ২৭২ ;
এবং ভারতী, ১৩১৮ ফাল্গুন, পৃঃ ১০৮৯

আমরা দেখেছি, এই ভাষণের কিছু পূর্বেই ভারতী পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্ণনা প্রসঙ্গে জনগণমন-অধিনায়ক গানের উদ্দিষ্ট পাত্রকে 'মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের যে দুটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেও ওই পাত্রকে যথাক্রমে 'মানব-ভাগ্য-রথচালক' এবং 'শাশ্বত মানব-ইতিহাসের চিরসারথি' বলেই অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং মানবভাগ্য নিয়ন্তাই যে এই গানের উদ্দিষ্ট ভারতবিধাতা তাতে সন্দেহ করা চলে না।

বস্তুত এই সন্দেহ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে আধুনিক কালেই। তৎকালে দেশের শিক্ষিত তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনে কোনো সন্দেহ যে ছিল না, তারও প্রমাণ আছে। ১৯১৭ সালের কলকাতা কংগ্রেসের কথা স্মরণ করা যাক। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস তখন আর মডারেট নেতাদের আয়ত্ত নয়। জাতীয়তাবাদী নেতারাই তখন কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করেছেন। এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসের তিন দিনের চারটি গান এবং India's Prayer নামে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ইংরেজী কবিতাটির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রথম দিনের (২৬ ডিসেম্বর) যথারীতি উদ্‌বোধন হয় শ্রীমতী অমলা দাশের পরিচালনায় 'বন্দে মাতরম্' গান দিয়ে। তা ছাড়া সেদিন আরও কয়েকটি গান হয়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। এই সম্বন্ধে বেঙ্গলী পত্রিকায় (২৭।১২।১৭) আছে—

A number of other songs were also in the musical programme including Sir Rabindranath's *latest patriotic song, 'Desa desa nandita kari.'*

যা হোক, প্রথম দিনের কার্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর India's Prayer কবিতাটি পাঠ করেন। এটিরও একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ওই দিনের বেঙ্গলীতেই (২৭।১২।১৭) আছে—

"Then Sir Rabindranath rose to *offer his benedictions* in a melodious and inspiring verse specially composed for the occasion."

এই সম্বন্ধে কংগ্রেসের সরকারী রিপোর্টে (পৃ ১) আছে—

"The chairman of the Reception Committee then called upon Sir Rabindranath Tagore to read out his *opening invocation.* Sir Rabindra, who

received a tremendous ovation, then recited the following verses in a voice, which, reaching the farthest corner of the Pandal, hushed the vast audience with its music and heartfelt eloquence."

জন-গণ-মন-অধিনায়ক, দেশ-দেশ-নন্দিত-করি এবং India's Prayer, এই তিনটির মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান সে বিষয় অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ১৯১১ সালে জনগণ-মন-অধিনায়ক গানটিকে বলা হয়েছিল a song of benedictions, আর ১৯১৭ সালে India's prayerকেও benedictions বা invocation বলেই বর্ণনা করা হল। বস্তুত দুটিই এক পর্যায়ভুক্ত। দুটিই ভগবৎ সমীপে ভারতবর্ষের অন্তরের প্রার্থনা।

দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হয় সরলা দেবীর 'নমো হিন্দুস্থান'। এই গান ও জনগণ-মন-অধিনায়ক গানের আদর্শগত ঐক্যের বিষয়ও অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় দিনে গাওয়া হয় জনগণ-মন-অধিনায়ক। এই গানটি সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রাদিতে কি বলা হয়েছিল, তার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।—

১। বেঙ্গলী পত্রিকার (৩০।১২।১৭) বিবরণ এই—

The Congress chorus then chanted the *magnificent song* of Sir Rabindranath Tagore, '*Jana-gana-mana*', Maharaja Bahadur of Nattore himself joining in aid of the instrumental music.

২। অমৃতবাজার পত্রিকায় (৩১।১২।১৭) আছে—

The Indian National Congress sat at 11-30 A.M., the proceedings commencing with *an inspiring patriotic song* of Rabindranath sung as usual in chorus, the Maharaja of Natore joining in the instrumental music. ....

৩। অতঃপর ষ্টেট্‌স্‌ম্যান (৩০।১২।১৭)—

A national song composed by Sir Rabindranath Tagore having been sung, the following resolution was moved.

১৯১১ সালে ইংলিশম্যান ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের মতে যা ছিল রাজভক্তির গান, ১৯১৭ সালে তাই দেশভক্তির গান বলে স্বীকৃত হল! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

যা হোক, ওই দিনের অধিবেশনে কংগ্রেসমঞ্চ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই গানটির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের সরকারি রিপোর্টে তৃতীয় দিনের বিবরণপ্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের যে বক্তৃতা দেওয়া আছে (পৃঃ ১০৮), তারই একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

Brother delegates, at the very outset I desire to refer to the song to which you have just listened. It is a *song of the glory and victory of India.* We stand here to day on this platform for the glory and victory of India. (cheers).

এই প্রসঙ্গেই 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় (৩০।১২।১৭) বলা হয়েছে—

"Mr. C. R. Das.....desired to refer to the song which they had just listened to. It was the *song of the victory of India* (hear, hear). They stood there that day on that platform for the glory and victory of India (hear, hear)."

অমৃতবাজার পত্রিকাতেও (৩১।১২।১৭) অবিকল এই কথাগুলিই আছে।

এর উপরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, চিত্তরঞ্জনের মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্রও এই গানটির একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং কাজিন্‌স্ এটিকে "The Morning song of India" বলে বর্ণনা করেছেন। এই অপবাদমুক্ত জয়গাথাটি নবোদিত সূর্যের মতোই পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত ভারতবর্ষকে নবগৌরবে উদ্ভাসিত করে তুলবে; এই আশা কি অন্যায়?

জন্ম—৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩] শরৎচন্দ্র [মৃত্যু—২রা মাঘ, ১৩৪৪

পূর্ব্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আ[illegible] সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।—শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়'

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

আমরা ১৪৯ পৃষ্ঠা হইতে পাতা উল্টাইয়া ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠায় আসিলাম।

অনেকগুলি দিন গেছে।

রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে: "ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন।" • "এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ-ইচ্ছা সবিতা করেন না" কিন্তু তার না-আসার দার্শনিক দিকটা সবিতা খুব বিজ্ঞভাবে চিন্তা করেন—"বিস্মিত হইয়া ভাবেন, নিষেধ করা মাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল! নিরবচ্ছিন্ন একত্র বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল।"! সবিতার এইখানে একটা নিঃশ্বাস পড়িল কি না তাহা বলা হয় নাই।

ভাল ভাল কথা পর পর জোয়ারের বেগে মনে আসিতে থাকিলে তাহা লিখিয়া ফেলিবার সময় যাদের সঙ্গতিবোধ থাকে না, শরৎচন্দ্র ত' সে-শ্রেণীর লেখক নন

"হয় ত, এমনিই জগৎ"!—সবিতা ভাবিতেছে। কিন্তু জাগতিক নিয়মকে দু'পায়ে মাড়াইয়া তারপর জগৎকে ধিক্কৃত করা আমরা অনুমোদন করি না।

তারপর সবিতার মনে হইল। "জগৎ এম্‌নিই—কিন্তু এখানে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি"?

এত কাণ্ড, হুলস্থূল, খেদানো-তাড়ানো, অপমান-"অগ্নিকাণ্ডের" পর রমণী আর না আসার দরুণ সবিতার এই দুঃখবোধ কেমন সামঞ্জস্যহীন বিসদৃশ মনে হইতেছে। "পান দোক্তা মুখে ফেলিয়া গাল ফুলানো, খারাপ খারাপ রসিকতায় মনোরঞ্জনের প্রয়াস, লালসালিপ্ত ঘোলাটে চাহনি, একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা, অর্থাৎ রমণীর চেহারায় আর সর্ব্বাচরণব্যাপী কদর্য্যতা; সর্ব্বোপরি, "কামার্ত্ত অতি প্রৌঢ়—ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে গিয়া" রাত্রি যাপনের মূর্চ্ছাজনক অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ—সবই ত' তার ১২ বৎসরের অসহ্য ব্যাপার! এমন অবাঞ্ছনীয় ঘৃণ্য ব্যক্তি আসা বন্ধ করিতেই একটা অপচয়ের কথা মনে হইয়া জগৎটাকেই দোষী করা যেন কেমন দেখায়।

বলা যাইতে পারে, মানুষ পাখী কি বিড়াল পুষিলেও তার প্রতি মমতা জন্মে, উড়িয়া গেলে কি মরিয়া গেলে ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এখানে তা' ত' নয়! সবিতা পুনঃ পুনঃ গম্ভীরভাবে এবং অকপটে কহিয়াছে যে, রমণীকে একটি দিনের তরেও সে ভালবাসে নাই। "নিরবচ্ছিন্ন একত্র বাসের বারোটা বৎসর" সে কোনোরূপ অনুরাগই অনুভব করে নাই। তবে রমণী না আসায় জগতের অপচয়াত্মক গতি আর গতিকের প্রতি সবিতার এ সখেদ প্রশ্ন কেন?

কিন্তু এ-সত্যও নির্ঘাত যে, "চলাচলম্ ইদং সর্ব্বম্"। রমণীবাবু আর আসেন না, কারণ, কারণ এই চঞ্চল নির্ম্মল জগতের সবই অচিরস্থায়ী—জগতের প্রধান কাজই হইতেছে ছিনাইয়া লওয়া। "তবে কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? * কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে"।

আমরা পরে দেখাইব যে, বাসা বাহিরের কোন হাত বাঁধিয়া দেয় নাই, সারদা নিজের হাতেই বাঁধিয়া লইয়াছে।

সারদা সাহসপূর্ব্বক নিকটে আসিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে বাসা বাঁধিয়াছে—

এবং "আরও একজন আসিয়াছেন, তিনি বিমলবাবু"।

Nature abhors vacuum—কাজেই বিমলবাবু আসিয়াছেন—রমণীবাবু আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। সবিতা তাঁহাকে রক্তে নেশা-লাগানো হাসির দ্বারা অভ্যর্থনা এবং সম্ভবতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধই করিয়াছে। কিন্তু ইনিও জগতেই ভয়ঙ্কর দুর্ব্যবহারের আর একটি দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিবেন কি না কে জানে!

বিমলবাবু "মৃদুভাষী ধীর প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই—দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁর বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্য্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করেন। ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে-দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে-চোখে আছে আর্ত্তের মিনতি, নাই উন্মাদের ব্যভিচার—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে"।

বিমলবাবুকে সবিতা মনে মনে তারিফ করিতেছে—তাঁর গুণাবলী স্মরণ করিতেছে; তিনি মৃদুভাষী, ইত্যাদি বহু কথা সবিতার মনে উদিত হইয়াছে। প্রশংসনীয় বিশিষ্টতার মধ্যে এটাও একটা: বিমলবাবুর "চোখে আছে আর্ত্তের মিনতি—নাই উন্মাদের ব্যভিচার"।

কিন্তু দুঃসাহসপূর্ব্বক সবিতার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াইয়া গেছি বলিয়া আমাদের বক্তব্য ইহাই যে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং কাজ ও তাহার ফলাফলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গেলে মনে হইবে, বিমলবাবুর চোখের দৃষ্টিতে উন্মত্ততা দেখা দিবার এখন কারণই নাই। বর্ত্তমানে "আর্ত্তের মিনতি"ই যথেষ্ট। মন কি চায় তাহা জানানো হইয়া গেছে—এখন ইচ্ছা সার্থক করিবার জন্য মিনতিই করিতে হইবে। রক্তে নেশা-লাগানো দৃষ্টির অতর্কিত আঘাতে বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া বিমলবাবু সেদিন বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন—পরিপূর্ণ মদিরাপাত্র সম্মুখে দেখিলে তৃষ্ণার্ত্ত কোনো মদ্যপের দৃষ্টি অবিকৃত সহজ থাকিতে পারে না। বিমল বাবু যখনই দেখা দিবেন তখনই ঐরূপ ঘটিবে কেন? রমণীবাবুই কি চব্বিশ ঘণ্টাই যখন-তখন "অত্যুগ্র অধীরতা" লইয়া তার খাটে বসিয়া কি শুইয়া থাকিতেন? বিমলবাবুর চোখে এখন "আর্ত্তের মিনতি" ফুটিয়া আছে, আর তামাসা এই যে, ঐ "আর্ত্তের মিনতি" কটু মনে না হইয়া উল্টা সবিতার এত ভাল লাগিতেছে যে, তার মনে হইতেছে: "শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।" এ ত' অতি-প্রৌঢ়ের অত্যুগ্র অধীর আহ্বান নয়, মিনতি-ভরা এ-ইঙ্গিত এমন একটি পুরুষের যার দেহ "স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ।"

আর দেখুন, সবিতা লক্ষ্য করিয়াছে যে, "নিয়ম ও সংযমের

শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্য্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। ঐ "মর্য্যাদা" দেখিয়া সবিতা খুশী হইয়াছে—তার মনে হয় নাই, চোখের দৃষ্টিতে 'আর্ত্তের মিনতি', অর্থাৎ পরস্ত্রীর আসঙ্গলিপ্সা ফুটিলে তাহা হয় চরম দৃষ্টিকটু ব্যাপার, তাহা মর্য্যাদার হানিকর—নারী ও পুরুষ উভয়েরই, আর হয় নিয়ম ও সংযমের শাসন অমান্য করার অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

উভয়ে স্থিতিশীল হইয়া কথাবার্ত্তা কহেন। উভয়েরই হৃদয়-সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে আলোড়িত হইয়া এখন ক্ষুদ্রবীচিবিক্ষুব্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; মনের যে প্রচণ্ড উত্তাল delirium-এর সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে—পরস্পরের ধাতে সহিতেছে। তবে, দেখা যাইতেছে, সবিতার মনেই উত্তাপ এখনও যেন একটু বেশী সতেজ।

বিমলবাবুর চোখের সেই "আর্ত্তের মিনতি", যার কাছে অতর্কিত পরাভবের আশঙ্কা সবিতা করিয়াছে, তাহা হাউইয়ের মতো উঁচুতে দেখা দিয়া কোন্ অন্ধকারে কেন মিলাইয়া গেল? কোন্ মন্ত্র-শক্তি সহিতে না পারিয়া খল সর্প মাথা তুলিয়া আবার বিবরে লুকাইল?" "আর্ত্তের মিনতি" বোধ হয় ও-পক্ষে আর্ত্তির লক্ষণ কি আর্দ্রতা, অর্থাৎ স্বাগত আহ্বানলিপি, দেখিতে পায় নাই। পরে দেখা যাইবে মূল কারণটা কি।

রমণীবাবুকে টাকা দিয়া বিমলবাবু এই বাড়ীটা ক্রয় করিয়া সবিতাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন—কেন তাহা করিয়াছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বিমলবাবু সবিতার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়া ফেলিলেন—"এই বাড়ীটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার" বলিয়া বিমলবাবু সমুদয় ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া দিলেন; তখন "সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন।"

কিন্তু নীরব হইবার পূর্ব্বে এবং পরেও 'কথা' হইয়াছে ঢের; যথা:

সবিতা। "এত জেনেও আমাকে ভালবাসলেন কি ক'রে বলুন ত?"

এ-ভালবাসা কিন্তু রূপ-যৌবনের প্রতি ভালবাসা।

বিমলবাবু। "ভালবাসি এ-কথা ত' আজও বলিনি নতুন-বৌ।"

—'না, বলেননি বলেই ত এ-কথা এমন সত্যি করে জানতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু মনে ভাবি, সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালবাসে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই—বাকি যেটুকু আছে তা'ও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালবাসতে পারলে মানুষ কি ভেবে?"

বিমলবাবু মুখ ফুটিয়া ভালবাসার কথা বলেন নাই; কিন্তু তিনি তা' বলেন নাই বলিয়াই সবিতা তা' সত্য করিয়া জানিতে পারিয়াছে, অর্থাৎ অভ্রান্ত ইঙ্গিত সে পাইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সে-ইঙ্গিত ফুটিয়া নয়নগোচর হইয়াছে "আর্ত্তের মিনতি" আকারে, বিমলবাবুর চক্ষুতে। কিন্তু হৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষা আর চোখে "আর্ত্তের মিনতি" কখনই এক জিনিস নয়—প্রকাশে, মর্য্যাদায়, নির্ম্মলতায় এবং সম্ভোগের অভিজাত্যে এ-দুটি এমনই স্বতন্ত্র যে, একটাকে আর একটা বলিয়া ভুল করা চলে না—অত্যন্ত স্থূলচিত্ত বিলাসী বিলাসিনী ছাড়া। আর্ত্তের মিনতিকে, অর্থাৎ দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে, প্রাণের ভালবাসা আখ্যা দিয়া তৃপ্ত এবং নিঃসন্দেহ আর কেহ মনে মনেও হইতে পারে না, আকুল অন্তর বাড়াইয়া গ্রহণ করা ত' ঢের দূরের কথা।

সবিতা বড়-রকমের এ ভুলটা কি কারণে করিতে পারিল, বুঝিলাম না—তার "মর্য্যাদা"বোধ ত' কাহারো চাইতে কম নয়। খাঁটি কথা ইহাই যে, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সবিতাকে বাহিরে একটি মর্য্যাদার স্বচ্ছ এবং তুচ্ছ আচ্ছাদন এবং ভিতরে গণিকার চিত্ত দিয়া আমাদের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই আচ্ছাদনকে শোভন এবং হৃষ্ট আর পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমদানী করিয়াছেন দু'টি ব্যক্তিকে; ঐ দু'টি ব্যক্তি রাখাল এবং সারদা। তাহারা সবিতার প্রতি কত কৃতজ্ঞ তাহা বলিয়া শেষ করিবার ক্ষমতাই তাদের নাই। তাহারা প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কেবলি 'মা' 'মা' করিতেছে, পদধূলি লইয়া মাথায় রাখিতেছে, আর, সবিতার অপরূপ অনির্ব্বচনীয়তা সবিতাকেই চলিতে ফিরিতে কত সুতায় যে কত শুনাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায়, ঐ দু'জনের ঠেক্‌না দিয়া তিনি সবিতাকে উঁচু করিয়া রাখিয়াছেন।

"বিমলবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালবেসেই যদি থাকি নতুন-বউ, সে হয়ত সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চল্‌লে হয়ত পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপযৌবনের লোভে নয় এ-কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

বিমলবাবু ত' নিজের সাফাই গাহিবেনই; কিন্তু সবিতা মাথা নাড়িয়া সায় দেয় কোন্ হিসাবে? সে ত' দেখিয়াছে কেবল পরিপূর্ণ মদিরাপাত্রের দিকে তৃষ্ণার্ত্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির মতো বিকৃত একটা দৃষ্টি, যার "ভাবা স্বতন্ত্র", এবং যার "নিগূঢ় অর্থ"

সবিতার চক্ষে গোপন রহে নাই। তারপর দেখিয়াছে "আর্ত্তের মিনতি"—এবারেও বিমলবাবুর চক্ষেই তা' দেখিয়াছে—তারপর আসিয়াছে অনিচ্ছার সঙ্গে গৃহীত উদার ধনী বন্ধুর উদারতম উপহার। পাছে সবিতা অন্য কোথাও চলিয়া যায় এইজন্যই এই বাড়ী-দান।

বিমলবাবু বলিয়াছেন, তাঁর এই ভালবাসা রূপ-যৌবনের লোভে নয়—

"সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—এ-কথা আমি সত্যিই বুঝেচি"......

প্রতিদানে কেবল অনাবিল অকুণ্ঠিত যৌনসম্পর্কহীন ভালবাসা পাইবার লোভে এবং আনন্দেই বিমলবাবুর ভালবাসার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সবিতা যদি জানে তবে পরবর্ত্তী প্রশ্নটা সে করিল কেন?

* * "কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?"

এই প্রশ্নের (এবং অতঃপর সবিতা কয়েকটি যে নির্ব্বাচিত উক্তি করিবে তাহার) দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, সবিতা স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্কটা এক-মুহূর্ত্তও আড়ালে রাখিতে পারে না।

সবিতার উপরি-উদ্ধৃত প্রশ্নের উত্তরে বিমল বাবু বলিতে পারিলেন না যে, আপনাকে নিয়ে আমরা পুতুলনাচের পার্টি করব। তিনি উত্তরই দিলেন না—"শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল। সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমার?

—জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি, আপনাকে আমি পাব না—পাবার পথ নেই আমার।

—কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?"

সবিতার এই প্রশ্নের উপর রাজী-গররাজীর একটা মন্তব্য করা চলে, কিন্তু তা' থাক্। এইবার শুনুন বিমলবাবুর আগেকার নৈতিক ইতিহাস, অর্থাৎ যৌন-ইতিকর্ত্তব্যতার কাহিনী।

বিমলবাবু বলিলেন, "বুঝেছি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্য্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট ক'রে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিল তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে যে ভেসে গেছে আজ খবরও জানিনে।"

এখন হরির লুঠের বাতাসার মতো অজস্র মেয়ের কথা আর কোথাও শুনি নাই—বিমলবাবু কাতর স্বরে তাহা আজ শুনাইয়া দিলেন। আমরা যদি অধিকতর কাতরস্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া বলি, "তারা আর নেই—কোথায় কে যে ভেসে গেছে আজ খবরও জানিনে"—তবে আমাদের সেই প্রতিধ্বনি কি অতিশয় দুষ্ট বিদ্রূপের মতো শুনাইবে?

বিমলবাবু "একটু থামিয়া বলিলেন—"তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।"

সবিতাও ঐ রকমই। ব্রজবাবু তাঁর ভালবাসা পায় নাই; রমণীবাবুকে তিনি কোনোদিন ভুলিয়াও ভালবাসেন নাই; তথাপি তিনি শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"শুধুই ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালবাসেননি?

বিমলবাবু বলিলেন—বেসেছিলুম বই কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল; কিন্তু খেলা ভাঙলো, তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে। কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকি নেই, ভালবাসার ধনকে ছোট করে রাখা যায় না—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত' এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিলেন—"এই কি আপনার ভয়?"

এতক্ষণে এতক্ষণকার সমুদয় রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচিত হইয়া গেল। চিরদিন বিমলবাবু ঠোকরাইয়া বেড়াইয়াছেন—একটিকে ছাড়িয়া আর একটিকে পাকড়াও করিয়াছেন—কেবল টাকা দেখাইয়া যাদের হস্তগত করা যায় সেই রকম অনুৎকৃষ্ট রুচির মেয়েদের সঙ্গে তিনি পুনঃ পুনঃ আত্মীয়তা করিয়া তাদের লইয়া কামতৃষ্ণা মিটাইয়াছেন। সেই প্রকৃতি এবং অভ্যাসবশতঃই তিনি প্রথম দিন সবিতাকে দেখিতে অনাহূতই দৌড়াইয়াছিলেন, কারণ, সে একজনের রক্ষিতা, "ঐশ্বর্য্যের জোরে" যার দেহ লভ্য। সেই জন্যই তাঁর চোখে হামেশাই দেখা দিত "আর্ত্তের মিনতি।" "ঐশ্বর্য্যের জোরে"ই বাড়ীটা তাহাকে কিনিয়া দিলেন।

কিন্তু তিনি একটি ঘর-পোড়া গরু—মনে বিশেষ ভয় আছে। সবিতার মতোই একজন "গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল"—কিন্তু তাকে রাখিতে পারা গেল না, অর্থাৎ সে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অন্যের আশ্রয়ে চলিয়া গেল। পূর্ব্বেরগুলি ছিল temporary; কিন্তু permanent settlement যার সঙ্গে করিতে চাহিয়াছিলেন সে বেশীদিন দাঁড়াইল না—দাগা দিয়া চলিয়া গেল।

বিমলবাবু যতই গভীরভাবে প্রেমের রূপ আর প্রেমের নিবিড় তাৎপর্য্য গ্রহণ এবং তার ব্যাখ্যা করুন না, কেন তিনি স্পষ্টতঃ ভণ্ড এবং লম্পট। দাগা খাইয়া তাঁর যে-চৈতন্যের উদয় হইয়াছে

তাহার নাম দিয়াছেন তিনি "ব্রত"। তার উপর সেদিন রমণী বাবুকেও এম্নি হাবাইতে দেখিয়া তাঁর দাগা খাওয়ার ভয় আরো বাড়িয়া গেছে

সুচতুরা সবিতা ভিতরের ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিয়াছে—সে প্রশ্ন করিল : "এই কি আপনার ভয় ?" অর্থাৎ আমি আর আপনি যদি যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করি তবে শীঘ্রই হউক বিলম্বে হউক, একদিন তাহা তথুজ হইবেই অর্থাৎ একদিন তাহা আর ভালো না লাগিবার সম্ভাবনা আছে ?

"বিমলবাবু বলিলেন—ভয় নয়, নতুন বৌ—এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা"।

বিমলবাবুর "সাধনা"—

অর্থাৎ তিনি বলিতে চান, যত মেয়েই যত কাছে ঘেঁষিয়া আসুক না কেন তিনি আর আমল দিবেন না—পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিবেন। বিমলবাবুর সাম্প্রতিক "সাধনা" জিতেন্দ্রিয়ের মতো ঐ প্রত্যাখ্যান করায়। কিন্তু কি "ব্রত" কোন পথ দিয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে এবং বিমলবাবুর মত প্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে ? সেটা কোন "ব্রত" যাহাতে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত প্রাণপণ করিতে তিনি কোমর বাঁধিয়া দাড়াইয়া গেছেন ?—তিনি ত কেবল মাত্র এই সত্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, "ভালবাসার ধনকে ছোট করে রাখা যায় না, তাকে হারাতেই হয়।" নীতিগত মত-প্রকাশ আর ব্রতগ্রহণ কেমন করিয়া এক জিনিব হইতে পারে জানি না।

"ব্রত" "বিচ্যুত" "সাধনা" প্রভৃতি শব্দগুলি সাধু-শব্দের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত,—ভণ্ডামি, ভাঁওতা, আর ফন্দি।

কিন্তু সবিতার দৃষ্টি ভারি ধারালো। নিজেকে সে চেনে, বিমলবাবুকেও সে চিনিয়া ফেলিয়াছে—"ব্রত" "বিচ্যুত" "সাধন" প্রভৃতি শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাহাকে ঠকাইতে না পারে সে-দিকে সে সতর্ক। "আর্তের মিনতি" দেখিয়া তাহার ভ্রম হইয়াছিল, উহাই পাছে অতর্কিতে তাঁহার পরাভবের কারণ হয়।

আমরা না বলিয়া পারিলাম না যে, এই স্থানে মানুষের পরাভব ঘটে, অর্থাৎ মানুষ নিজের পরাভব ঘটিতে দেয়, অনেক আন্দোলনের পর, নিজেকে সামলাইবার কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া ভূমিকম্পের মতো আসিয়া এই কারণটা মানুষকে ধূলিসাৎ করে না।

"আর্তের মিনতি" শব্দ দু'টিকে আমরা ভুলিতে পারিতেছি না। ঐ "আর্তের মিনতি"ই চিনাইয়া দিয়াছিল বিমলবাবুকে—

সুতরাং বিমলবাবু যখন বলিলেন :—

... .. "জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিনও নিতে পারবো না, আবার তার চেয়ে বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাইতো বলেছিলুম নতুন-বৌ, দিন্ আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু হলে। এই বাড়ীটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়"—তখন সবিতা তাঁর কথা বিশ্বাসই করিল না—সে "নতমুখে নীরবে" বসিয়া রহিল; কত কথাই যে তার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই; শেষে মুখ তুলিয়া বলিল "এ-বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমলবাবু ? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন ? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে ?"

"ব্রত" "সাধনা" প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শব্দ, ভালবাসার ধনকে ছোট করিয়া রাখা যায় না, অভিজ্ঞতালব্ধ এই পবিত্র সুদৃঢ় বিশ্বাস, সবিতাকে তিনি কোনদিন ছোট করিয়া লইতে পারিবেন না, মানসিক এই অত্যগ্রভ উন্নত অবস্থা এবং অকৃত্রিম বন্ধুত্ব প্রার্থনা, সবই যেন নিষ্ফল হইয়া গেল; সবিতা বলিয়া বসিল : "এ মিথ্যের আবরণ টিকিবে কেন ?"—অর্থাৎ নিজেকে আর আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমার মতে যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রবলতম।

দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ হইলে ঐ এক কথাতেই বোধ হয় হাল ছাড়িয়া দিত; কিন্তু বিমলবাবুর অসাধারণত্ব এদিকেও বেশ। অসাধারণ সাফল্য এবং তৎপরতার সহিত তিনি "অনেক মেয়েকেই" নিরুদ্দেশ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই—"তখন এ-খেলায় নামতে" তাঁহার বাধে নাই, "কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।" এখন তিনি ভারিক্কা চালে' কামগন্ধহীন অমৃততুল্য অমর প্রেম, অথবা অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কাঙাল...।

কিন্তু সবিতা অত শত বুঝিল না—নিজের মনের নিভৃত ভাবটাই প্রকাশ করিয়া দিল; "এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন ? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে ?"

আমরা পরে দেখিব, বিমলবাবু বন্ধুত্বকে দুষ্করতর মনে করিয়া সবিতাকে "পরিপূর্ণ" ভাবে পাইবার আশা করিতেছেন; কিন্তু এখন তিনি নর-নারীর মূল সম্বন্ধে নামিবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার

হিসাবে হাতের কাছেই হাজির আছেন। তিনি নিজে ত' থামিয়া থাকিবেনই, সবিতার বে-আদাব দেখিলে তাহাকেও থামাইয়া দিবেন—সবিতার দ্বিধা ও সন্দেহনিরসনের জন্ত এ প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।

"বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন বউ"...

এই সাহস দিয়া বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন: "আপনার অপেক্ষা করে থাকব, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান্। আমার মতো ছ'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদ্‌লায়, কাছে আমাকে ডাক্‌বেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।"

পাগড়ীর মতো কি বস্তার মতো কি নির্মাল্যের মতো তিনি সবিতাকে শিরে গ্রহণ করিবেন তাহা জানি না; কিন্তু ব্যাপারটা ভক্তিমূলক হইবে।

"সবিতার চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; কহিলেন আপন পরিচয় পেতে আর বাকি নেই বিমলবাবু; চোখের এ দৃষ্টি আর ইহ-জীবনে বদ্‌লাবে না। শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেছি তা' যেন সইতে পারি"। অর্থাৎ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া সে অবিবেচনার কাজ করে নাই। কিন্তু স্বামী তাহার চক্ষে কি জিনিস্, প্রার্থনীয় কিনা, তাহা আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব।

উভয়েই সাম্প্রতিক দাবি-দাওয়া কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া রফায় উপনীত হইলেন; এবং ভবিষ্যতে অবলম্বনীয় একটা পন্থা নির্দ্ধারণ করিলেন।

অনিশ্চিত পথে পা দিয়া সবিতা আর ঝুঁকি লইতে চাহে না—রমণীবাবু তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন। বিমলবাবু অধুনা তাঁর পূর্ব্ব-রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন—পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণের জন্ত আর তিনি টাকার তোড়া লইয়া ডানা আছ্‌ড়াইতে চান্ না। ঘা খাইয়া এবং পদে পদে বাধে বলিয়া, তিনি এখন একজন জীবনসঙ্গিনী সহ নিশ্চিন্ত অনুত্তেজিত চিত্তে একটা স্থানে নিজেকে চিরদিনের জন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া রস, প্রেম ও আনন্দ উপভোগ করিতে চান্। কিন্তু রমণীবাবু তাঁহাকেও যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন—ভয়ঙ্কর ভয় ধরাইয়া দিয়াছেন। উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ; কাজেই আপোসে পৌঁছিতে বাধিল না।

শেষ কথার মর্ম্মার্থ এইরূপ: বিমলবাবু জানাইলেন: যদি কোনোদিন তাঁর মর্ম্মের শুভ আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিয়া সবিতা তাঁহাকে নিরন্তর-গতি নিরঙ্কুশ শান্ত প্রেম-পরিবেশের অভ্যন্তরে আহ্বান করেন তবে তিনি ধন্য হইয়া সবিতাকে মাথায় তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিবেন—তাঁর দেহোপভোগের জন্ত নয়, প্রেমোপভোগের জন্ত।

সবিতা তাহাতে উৎসাহ দেখাইল না; বলিল—জীবনের প্রতি যে-দৃষ্টি তার এখন বদ্ধমূল হইয়া গেছে তাহার দিক্‌পরিবর্ত্তন আর সম্ভব নয়—অতএব ও-সব কথা বাদ দিয়া "শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা' যেন সইতে পারি।"

এই কথার পর, পরস্পরের নিকট প্রকারান্তরে বিদায় গ্রহণের পর, সভাভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িবার কথা; কিন্তু ওঁরা বসিয়াই রহিলেন।

মনের একেবারে গভীরতম কথাটা এখনও ঠিক এমনভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই যার ভুল অর্থ করা একেবারে অসম্ভব। পূজ্যচরণ ব্রজবাবু চিরদিনই পূজ্য-চরণ; গৌরবের বিষয়; কিন্তু তিনি যে প্রাণবল্লভ নন্ ইহাও বিমলবাবুকে জানানো যেন দরকার। তাই সবিতার মনটা বোধ হয় খুঁত্‌খুঁত্ করিতেছিল। বিমলবাবু যে তাহার হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়াছেন তাহাও বিমলবাবুকে জানানো দরকার—এই দরকারটা দুর্নিবার এই জন্ত যে, নতুবা নিজেরই কাছে যেন নিজেরই অন্তরের ইতিহাস অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যাইবে। উহা Tragic; এই একটি অনুচ্চারিত স্বীকৃতিই জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া আনিবার পক্ষে যথেষ্ট। বিমলবাবুকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বটে, কিন্তু তা ভালবাসার অভাববশতঃ নহে, অর্থাৎ সে হৃদয়হীন বলিয়া নহে; ব্যথা দিতেও নহে, ফল অপ্রীতিকর হইতে পারে এই ভয়ে—একবারকার অপ্রীতিকরতার দাহ এখনও অত্যন্ত সতেজ···

বিমলবাবুর প্রতি তার অনুরাগ কত গভীর তাহা ক্ষুদ্র এই প্রশ্নটিতে সুন্দর প্রাঞ্জল আর চিত্তাকর্ষক হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। সবিতা বলিল,— "কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, বাপের বাড়ীতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত" ?

"বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। * *

সবিতার এ-প্রশ্নও রক্তে নেশা লাগানো; কিন্তু বোধ হয় একঘেয়ে হইবে আশঙ্কা করিয়া লাগানো হয় নাই।

মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যাহার সঙ্গে চিরবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ের অধীশ্বর হিসাবে যাহাকে বরণ করা যায় নাই বলিয়া অনুতাপ আসিতেছে সবিতা তাহাকে প্রত্যক্ষতঃ কত উচ্চে স্থান দিয়াছে তাহা একবার ভাবুন। উহা ঘটিলে আজ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে নিঃশঙ্কায় পরম কুতূহলে আর তৃপ্তির সহিত দাম্পত্য-জীবন যাপন

করা নিশ্চয়ই যাইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্রজবাবু আগেই আসিয়া টোপর মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই সঙ্গে সাতটি পাক ঘুরিয়া গেছে। অদৃষ্টের লিখন ছিল তাই।

সবিতার রুচি আর আক্কেল দেখুন—

"আর্তের মিনতি" বিমলবাবুর চক্ষে দেখিয়া এবং "ঐশ্বর্য্যের জোরে" উপর্যুপরি অনেকগুলি মেয়েকে দখল করার, এবং একটি লইয়া চম্পট দিবার গল্প বিমলবাবুর মুখেই শুনিয়া সবিতার মনে হয় নাই যে, কাজগুলি জঘন্য; আর মনে হয় নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাহ হইলেও বিমলবাবু যদি ঐ কাণ্ডই করিতেন! করিলে বাধা দিতে পারিত কে এবং কিরূপে? বিমলবাবু ত' জানান্ নাই, তাঁর স্ত্রী রূপে, স্বভাবে একেবারে বিশ্রী, অসহনীয়া; তাই তিনি বাহিরে বাহিরে শান্তি অর্থাৎ মেয়ে খুঁজিয়া বেড়ান্। সবিতা তাঁহার স্ত্রী হইলে তিনি অতুলনীয়া হৃদয়হারিণী স্ত্রী পাইতেন, তাঁর চরিত্রদোষ ঘটিত না!

কথাটা বলিবার পূর্ব্বে সবিতার ঐ মোটা কথাটা ভাবা উচিত ছিল; ভাবা উচিত ছিল যে, বিমলবাবু প্রকৃতিগত ভাবেই চরিত্রহীন লোক।

দ্বিতীয়তঃ, বিমলবাবুকে স্বামীরূপে লাভ করিতে না পারার যে-ক্ষোভ আর যে-ক্ষতিবোধ ঐ প্রশ্নে প্রকাশ পাইয়াছে অন্য দিক্ দিয়া তাহা আরও মারাত্মক; সবিতার চরিত্রই ধূলিসাৎ হইয়া গেছে একেবারে সমূলে।

ঐ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ভাবটায় কি ব্রজবাবুর প্রতি যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নাই! এই প্রশ্নের পর আমরা অবিসম্বাদিত ভাবে ধরিয়া লইতে পারি, স্বামীর সম্বন্ধে সবিতার যাবতীয় উক্তি একেবারে মিথ্যা। স্বামীর বিষয়ে সবিতার মুখের কথা এবং মনের কথা যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পুণ্যতোয়া উদ্বেল ভাগীরথীর মতো শেষের পরিচয়ের ১ম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সমস্ত গ্লানি ধৌত করিয়া গদগদনাদে প্রবাহিত হইতেছে।

তার মধ্যে হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন? লেখকের তাল কাটিয়া গেছে; অথবা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সবিতার যৌন-চিন্তাই সকল চিন্তার উপরে!

আমরা সবিতা ও বিমলবাবুকে আপাততঃ অবসর দিলাম; কারণ, তাঁরা পরস্ত্রী ও পরপুরুষের মধ্যে ভালবাসার মতো স্বর্গীয় জিনিষকে হিংস্র জগতের মলিন ধূলায় আনিতে নারাজ হইয়া জগতের বিবেচনা ও সৃষ্টির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ এবং পরস্পরের সীমা না পাইয়াও পরস্পরের তাত্ত্বিক করিতে বসিয়া গেছেন, এবং ঘন ঘনই বিস্মিত ও বিগলিত হইতেছেন। সবিতা বহু বহু প্রশ্ন করিয়া বহু তত্ত্বের আর বহু সত্যের সন্ধান পাইতেছেন, আর, বিমলবাবু সিঙ্গাপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যকে চুলোয় পাঠাইয়া এখানে ব্যাখ্যার সাহায্যে নিজেকে বিশদ করিতে পাইয়া চরিতার্থ হইতেছেন। কিন্তু "স্বভাব যায় না মলে"—পরম বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আবহাওয়ায় উঠিয়া এবং পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটি হইবার পরও, "পরিপূর্ণ" করিয়া পাওয়ার প্রত্যাশাও না দেখা দিতেছে এমন নয়।

বিমলবাবু বলিতেছেন..."যে-কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্ব্বলতা নেই, তাকে নামঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বউ।

সবিতা কহিলেন, আমি যাই কেন করি না দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত' ছলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হলো?

বিমলবাবু কহিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বউ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েছি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা' মানি; কিন্তু নিজের যে-বিশ্বাসকে আমি আজও দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা বশে দুর্ব্বলতা বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।"

বিমলবাবুর ঐ উক্তি সাধু-ভাষার ব্যক্ত কুযুক্তি এবং নৈতিকতা, ইহা মনে হইয়া সবিতার মন আহত হইয়া ছি ছি করিয়া উঠিল না—সে নীরবে চাহিয়া রহিল; তার মনে হইল: "যা' অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন তাহা সম্ভব হইবে? দয়াময়ের কাছে নীচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কই?"

বিমলবাবুর কাছে দেহখানা লইয়া হাজির হইতে সবিতা গররাজী নয়—"স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ" পাইলেই সোজা যাইয়া উপনীত হইবে। তখন দেখা যাইবে, অসম্ভবকে সম্ভব করার অগ্নিমন্ত্র তাহাদেরই প্রাণে দাউ দাউ করিতেছিল।

এখন সারদার প্রসঙ্গে আসা যাক্। উপাখ্যানের শিল্পগত কোনো উন্নতি তাহার দ্বারা সাধিত হয় নাই, অর্থাৎ সে লেখকের নূতন সৃষ্টি নহে। কুলত্যাগিনীর ছড়াছড়ির মধ্যে সে একজন। সবিতা ১নং। বিবাহে অনিচ্ছুক বিমলবাবুর সেই শিকার ২নং। ৩নং সারদা। ১১বছরে বিধবা হইবার পর উপযুক্ত সময়ে সে

কুলত্যাগ করিয়াছিল। নারীত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে কিসে, এবং প্রণম্য হইয়া উঠে কিরূপ উৎকর্ষে পৌঁছলে, এই প্রশ্নের একটি উত্তর সবিতা, দ্বিতীয় উত্তর সারদা। উভয়েই মহিমময়ী—রাখালই প্রধানতঃ ইহাদের ব্যাখ্যাতা এবং গুণগ্রাহী।

সারদা সুন্দরী এবং কল্যাণময়ী। মানুষের মনঃপীড়া আর শারীরিক কষ্ট সে মোটে বরদাস্ত করিতে পারে না; আদর করিতে, পেট ভরিয়া ভোজন করাইতে, সেবা ও শুশ্রূষা এবং তোয়াজ করিতে, স্নেহের অনুযোগ করিতে আর ভক্তিপ্রদর্শন করিতে সে এমন সুষ্ঠুভাবে পারে যে, রাখাল মুগ্ধ হইয়া যায়, সবিতা তাহাকে কোলের দিকে টানিয়া লয়। কেবল এইটুকু দেখাইলেই সারদা পরম রমণীয়ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত; ১১বছরে বিধবা হইবার পর সে উপযুক্ত সময়ে কুলত্যাগ করিয়াছিল—ইহা মনে রাখিলেই আমাদের 'শেষের পরিচয়' পড়া সার্থক হইত; কিন্তু লেখক তিনের ভক্ত বেজায়। রবাবুর তিন বিয়ে; সবিতার স্বামী, রমণীবাবু ও বিমলবাবু—তিনজন; সারদার স্বামী, জীবন ও রাখাল—তিনজন। তৃতীয় ব্যক্তি বিমলবাবু সবিতার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়া একদিন "পরিপূর্ণ" ভাবে পাইবার আশায় রহিয়াছেন; আর সারদার সংস্রবে আসিয়া রাখাল শিহরণ অনুভব করিতেছে; আর রাখালের সংস্রবে আসায় সারদার প্রাণে যাহাকে বলে প্রকৃত প্রেম তাহারই ক্রিয়া শুরু হইয়া গেছে।

আর-একটা মহৎ কাজ সারদা প্রাণ ঢালিয়া দিয়া অবিরাম করিতেছে: সবিতার সে সেবা করিতেছে, মেয়ে যেমন মায়ের করে; চোখের জল মুছিয়া দিতে যথাসময়ে হাত তুলিতেছে, মা মা বলিয়া ডাকিয়া সবিতার বুক জুড়াইয়া দিতেছে; আর, সবিতার গুণের, দয়ার, মাতৃভাবের, দুঃখ-কষ্টের, কাতরতার, বিপাকের, বিড়ম্বনার অন্ত পাইতেছে না। সে উহা না পাইলেও ক্ষতি কিছু হইত না; তাহার ব্যাখ্যা ব্যতীতই আমরা সবিতাকে অবিকল এইভাবেই পাইতাম।

কিন্তু তার যৌন-চেতনা প্রত্যাশিতভাবেই আছে। উপপতির সঙ্গে সে পলায়ন করিয়াছে; মেয়ে ও মায়ে, অর্থাৎ সারদা ও সবিতায় মিল এখানে বেশ দেখা যাইতেছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর পাঠকবর্গকে চিনিতেন; তাহাদের তুষ্ট করিতেই তিনি সারদার সৃষ্টি করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব নিরীহ ব্রজবাবু যতই ভক্ত ধৈর্যশীল পুরুষ হউন, একটু বোকা আর বেহায়াও বটেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আনিলেন সবিতাকে; সবিতা মেয়ে ফেলিয়া পলায়ন করিলে, তার ভালবাসায় সন্দিহান হইয়াও আবার একটা পক্ষ করিলেন। বুড়ো মানুষের এ কী কাণ্ড। কিন্তু তাঁর এই বিয়ের বার্তিক পাঠককে পুলক দিতেছে না। গল্পের যখন শুরু তখন সবিতার বয়স ৩৫।৩৬—বলা চলে। সে প্রৌঢ়া। রমণী ত' "অতি-প্রৌঢ়"। এই প্রৌঢ় এবং লোল প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার যৌন-আকর্ষণের বেগ পাঠকের মনে তেমন তীব্রতা জাগাইতে পারে না—সুতরাং একটি যুবক এবং একটি যুবতী চাই। পাঠককে স্পৃহাযুক্ত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সেই যুবক-যুবতী হইতেছে রাখাল আর সারদা।

উপপতি পরিত্যাগ করিয়া গেলে সারদা বিপদে পড়িয়া বিপদমুক্ত হইবার জন্য বিষপান করিয়াছিল। রাখাল তাহাকে অনেক চেষ্টায় বাঁচায়। সারদা প্রথমে রাগই করিয়াছিল, কেন তাহাকে মরিতে দেওয়া হইল না? তারপর সবিতাকে মা বলিয়া ডাকিতে পাইয়া, তার সেবা করিতে পাইয়া, তার স্নেহ পাইয়া এবং তার অলৌকিকত্ব আবিষ্কারের আনন্দে কৃতার্থ হইয়া সে, রাগ-দুঃখ-ক্লেশ সবই ভুলিল, তার পর জীবনদাতা-সহৃদয় 'দেবতা' অর্থাৎ রাখালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে এত পূর্ণ হইয়া গেল যে, তার হৃদয়-সোনার-তরীতে আর স্থানই রহিল না। সে একদিন রাখালের সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াই ফেলিল যে, রাখাল তাহাকে পুনর্জন্ম দান করায় তার এই দেহ দাবি করিবার হকদার অপর কেহ হইতেই পারে না।

সারদা মহীয়সী সবিতার বিষয় সবই জানে; কিন্তু তিন বছরের শিশু-কন্যাকে অদৃষ্টের হাতে অর্পণ করিয়া আসার নির্মমতার কথা জানে কি না তাহা প্রকাশ নাই—রেণুর সঙ্গে দেখাশুনা হইবার পরও তাহার মুখে কিংবা গোচরে রেণুর কোনো উল্লেখ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, রমণী সবিতাকে সত্য মিথ্যা অনেক অজুহাতেই অনেক খোঁটা দিয়াছেন; কিন্তু জননী নারীর বাৎসল্যের অভাবের খোঁটা কখনও দেন নাই। বিমলবাবু মেয়েটির কথা জানেন, তার বয়স কত তা' জানেন রমণীর সঙ্গে সবিতা কতদিন আছে তাহাও জানেন; একটা হিসাব করিতেও জানেন, কিন্তু তিনি অতবড় ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেন নাই। কাজটার হৃদয়হীনতা কি তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই? মনে হয়, শরৎচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক শিশু রেণুকে রমণী, বিমল, আর, সারদার সমক্ষে আনেন নাই, তার কথা উত্থাপনই করেন নাই—তাহাকে কাব্যে উপেক্ষিতার দলে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন, কারণ, তার ভিতর সবিতাকে নারীত্বের শ্রেষ্ঠতায় মহামহিমান্বিতা করিয়া তুলিবার অর্থাৎ ওকালতী বক্তৃতার, উপাদান নাই।—রাখালের ভাষায়: "কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বই। তার মধ্যে নতুন-মা নেই।

কারণ, ঐ যে একটি বাকি রইলেন তিনিই উনি"। আমরাও তা' স্বীকার করি—"তিনিই উনি"। ন'শ নিরানব্বইয়ের একজন হইলে অত যৌন তৃষ্ণা তার থাকিত না এবং "উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য"-এর কুদ্রতা আর ক্ষ্যাপামি তার থাকিত।

সে যাহাই হউক, সারদা যেন আপন পেটের সত্যিকারের মেয়ে এমনি তার প্রতি সবিতার টান।

টান থাকা নিন্দার কথা নয়, কিন্তু কে জানে, তাহারই টানে টানে, অর্থাৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, সারদা রাখালের দিকে নেকনজর দিতে সুরু করিয়াছে কি না। কথায় বলে: "রায় বার তিনবার"। সবিতা তার অদ্বিতীয়া অকৃত্রিম মা। ভক্তিভরে সে মাতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারে বই কি।

রাখাল মূলতঃ সচ্চরিত্র। অনেক মেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করিয়াছে; কিন্তু লুব্ধ হয় নাই, বরং তাহাদের লঘুতা তাহাকে প্রতিহত করিয়াছে। এখানেও দেখা যায়, সারদাই যেন রাখালকে আত্মসাৎ করিতে চায়। ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া একটা ভাবপ্রকাশের যে ইঙ্গিত-কৌশল আছে, সারদায় তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। শরৎচন্দ্র ঐ ইঙ্গিত-কৌশলের মাষ্টার আর্টিষ্ট। কিন্তু সারদার যৌবন ও রূপ সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিয়া তার অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো সঙ্কেতময় ভাষার আহ্বানে, এবং গতিভঙ্গী আর বাক্যরীতির উদ্দীপনায় রাখালের চোখে কখনও "আর্তের মিনতি" প্রভৃতি দেখা দেয় নাই—দেহে শিহরণ জাগিয়াছে, আর, মনে যৎ-কিঞ্চিৎ ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। উহা ক্ষমণীয়, কারণ, উহা সহনীয়। তাহার দেহের সংবিৎ বৃদ্ধ ঋষির সংবিৎ নহে—উত্তাপ লাগিলে তার বিচলন ঘটিবেই।

কিন্তু রাখালের চরিত্র বিচার করিতে আমরা লেখনী ধারণ করি নাই; আমরা দেখাইতে চাই, এই পুস্তকের অন্তর্গত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া ইহাদের যৌন-চেতনানন্দ সংক্রমণশীল কিরূপ ধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

"সারদা বলিল, অকাজ নয় তো কি। হ'ল ঋণ, তা-ও চাকতে হ'লো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি"?

রাখাল বলিল,—"কাজে লাগবে না? তুমি বল কি সারদা?"

সারদা বলিল, এই বলছি যে এ-সব কিছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে, আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি; এখনও বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। এক হরফও আর আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না ত' আমার ধার শোধ দেবে কি কোরে?

ধার শোধ দেবো না, ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো; কিন্তু সাহস করিল না।"

আমরা পরে দেখিতে পাইব, রাখালের এই সাহসের অভাব এবং সুযোগ ত্যাগ সারদাকে কত ক্ষুণ্ণ হতাশ করিয়াছে। সারদা আকাঙ্ক্ষা করে, রাখাল তাহাকে তার দেহটাকে, কাছে টানিয়া লয়। যুবক-যুবতীর এই "মূল সম্বন্ধে" পৌঁছিবার সম্ভাবনা এবং তা' কার্য্যে পরিণত না হওয়া পাঠকের পক্ষে কত যে উদ্দীপক, আর, আনন্দপ্রদভাবে আপশোসজনক লেখকের তা' জানা আছে।

রাখাল জ্বরের সময় খবর করে নাই, সারদার অনুযোগ ইহাই। অনুযোগ করিতে করিতে সারদা কথার পর কথা বলিতেই লাগিল...

"দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতে বলিতে পারিত না; কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল —নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অজন— —আর বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর তাই অস্ফুট ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত বাহির হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী-শাসন ভ্রুক্ষেপ করিল না—বলিতে লাগিল —জানেন দেবতা, জানি আমি, কেন আপনি আজও বিয়ে করেন নি। আসলে মেয়েদের উপর আপনার ভারি ঘৃণা। কিন্তু এও জানবেন, যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতের নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে!"

রাখাল মনে মনে স্বীকার করিল কিনা জানি না যে, "জগতে অন্য মেয়েও আছে"—নতুন-মা আছেন; তিনি হাজারের মধ্যে একজন; এবং তুমিও আছ—হাজারের মধ্যে আর একজন।

হইতেছে জ্বরের সময় কেন ডাকা হয় নাই সেই কথা; সেই দুঃখের কথাকে শ্রবণযোগ্য কি প্রাণস্পর্শী কি অব্যর্থ কি ফলপ্রদ করিবার জন্ম উপরি উদ্ধৃত আবহাওয়ার আনুকূল্যের কোনোই প্রয়োজন ছিল না। "নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অজন" এই মনোরম পরিবেশে দুঃখী নর-নারীর সাক্ষাৎ অভিসার আর প্রেমিক-প্রেমিকার কথাই যেন মনে করাইয়া দেয়। "নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তর" না পাইলেও দুঃখের কথা না জন্মিবার কারণ নাই; লেখকের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। "শুধু সে আর অজন"—মিলনবিহ্বলা-নারীর সুখানুভূতিই এই ভাষায় ব্যক্ত হইলে মানায়। সরোষে এবং সখেদে মনোবেদনার কথা বলিতে যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তার অনুভূতি ব্যক্ত করিবার স্থান অত কোমল কবিত্বপূর্ণ না হইলেও ক্ষতি ছিল না।

[আগামীবারে সমাপ্য

G. A.

আর্থিক উৎপাদন ও

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন,

অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট্ ও কো-অপারেটিভ ইন্‌চার্জ্জ।

ভারতে শতকরা ৭৭ জনেরও অধিক লোক কৃষি-ব্যবসায়ী এবং তাহাদের কৃষি-ব্যবসায়ের দরুণ তাহারা মহাজনের নিকট অতিরিক্ত সুদে কর্জ্জ করিতে বাধ্য ও তাহাদের বাড়ী-ঘর, জমি-জমা মহাজনের নিকটই সাধারণতঃ দায়াবদ্ধ থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাহারা মহাজনেরই ক্রীতদাস।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ বিষয়ক আইন পাশ করিয়া কৃষক ও শ্রমজীবিদিগকে মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করার জন্ত চেষ্টা হয়। ১৯০৬ সালে বঙ্গবিভাগ হয় ও বঙ্গে কি প্রকারে এই আইনের অপব্যবহার করা হয় তাহা জানিলে সাধারণে বুঝিতে পারিবে যে কেন ১৯৪৬-৪৭ সনে রেজিষ্ট্রার Mr. I. A. Ali, I. C. S. ইহার অকৃতকার্য্যতা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। "Co-operativa Credit Society has hitherto been a dismal failure + +. (Vide planning A Co-operative Bengal). বহু বৎসর পূর্ব্বেই ইহা স্বীকার করা যাইত এবং ইহা না করার ফলে হাজার হাজার আমানতকারীর যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে—তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। এখনও গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে টাকা জমা দিতে সকলকে উৎসাহ দিতেছেন। সম্প্রতি পত্রিকার এই মর্ম্মে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিবেন কি যে, কোন্ কোন্ কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে টাকা জমা রাখিলে ঐ টাকার জন্ত গবর্ণমেণ্ট দায়ী হইবেন ? নতুবা সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হইতে পারে।

প্রধানতঃ কৃষক ও শ্রমজীবিকুলই দেশের অর্থ উৎপাদন করে। আবহমান কাল হইতে তাহাদের মহাজনগণ শোষণ করিয়া আসিতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি আইন পাশ করেন ও গ্রামে গ্রামে ১০ জন বা তদতিরিক্ত লোককে একত্র করিয়া মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ১৯০৮ সালে বাঙ্গলাদেশে আমরা ৫ জন অবৈতনিক Organiser ছিলাম এবং প্রকৃতপক্ষে তদবধিই বঙ্গদেশে Credit বা লগ্নী সমিতি সুরু হয়। ইহার পূর্ব্বে ২।৪টি সমিতি রেজিষ্ট্রার সাহেব নিজেই স্থাপন করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, ফরিদপুর জেলার কমলাপুর ও বজেশ্বরদি গ্রামে এবম্বিধ সমিতি আরম্ভ করা হইয়াছিল। ফরিদপুর District Board Officeএ এক ক্লাস খুলিয়া Organiserদের ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত আইন, উপবিধি ও খাতাপত্র রেজিষ্ট্রার সাহেব আলোচনা করেন। তাঁহার অফিসের কোনও কোনও কেরাণীকে পর্য্যন্ত লগ্নী (Credit) সমিতি Organise ও পরিদর্শন করিতে গ্রামে গ্রামে পাঠান হয়। যদিও আমি একজন অবৈতনিক Organiser ছিলাম, তথাপি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর Sub-Divisionএ ২০০০০৲ (বিশ হাজার) টাকা দিয়া কতকগুলি এবম্বিধ সমিতি খোলার দায়ীত্ব দেওয়া হয়। Co-operative বিভাগ তখন Board of Revenueএর অধীনে ছিল। প্রায় ৬ মাস চেষ্টার পর সেরপুরের জমিদারগণের সাহায্যে খাসমহল ও অন্যান্ত এলাকায় ঐ টাকা দাদন করা হয়।

ঐ সময় দেওয়ানগঞ্জ থানায় মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষককুল ক্ষেপিয়া উঠে এবং ইহা দমন করে ক্রেডিট্ সমিতি গ্রামে গ্রামে খোলা সাব্যস্ত হয়। আমার স্মরণ

আছে যে Mr. Gomlay, Mr. K. C. De রেজিষ্টার দ্বয় ও জামালপুরের Subdivisional officer late Mr. White প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নিজেরাই গ্রাম্য ক্রেডিট সমিতির organize করে দেওয়ানগঞ্জ ডাকবাঙলায় উপস্থিত হন্। তিন দিন বারিন্দায় হাজার হাজার টাকার থলিয়া টেবিলের উপর রাখেন এবং Gomlay ও K. C. De সাহেব ঘর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহাও শুনা যাইত যে, অনেক মুসলমান ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে তাহাদিগকে পান্তাভাত (জলভাত) দিয়াও আপ্যায়িত করিতে চাহিয়াছিল। তথাপি তাহাদের অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট ক্রেডিট সমিতি স্থাপন করিতে বাধ্য করাইতে পারেন নাই।

একদিন হাটের সময় কয়েক জন ব্যক্তিকে এক-প্রকার জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া টাকা দেওয়ার ফলে ডাকবাঙলায় হাটের বহু লোক আসিয়া জমা হয়, ইহারা দেখিতে পায় যে, টাকা নিতে কোনও নিয়মের কড়াকড়ি নাই। জমি-জমা রেহান দিয়া সকলের সাকুল্য পুরাতন ঋণ পরিশোধ করার নিয়ম ছিল। যমুনা নদীর চড়ের অনাবাদী ব নদীর সিকস্তি জমিগুলিও রেহান রাখিয়া হাজার হাজার টাকা দাদন করা হয়। এমন কি রবিবার দিন Sub-Registrar সাহেবকে দলিল রেজিষ্টি করিতেও বাধ্য করা হয়। চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল যে প্রজার মঙ্গলার্থে টাকা বিলি করা হইতেছে। ইহার সুদ নাই বা ফেরৎ দিতেও হইবে না। দলিল পত্রাদি কেবল সরকারী কাগজ পত্র রাখার মামুলী নিয়ম মাত্র। পরে আদায়ের ভার সেরপুরের নব-যুক্ত একজন জমিদার ডেপুটি বাবুর উপর দেওয়া যায়। তিনি সকলের সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন ও এ দিন চেষ্টা করিয়াও ১০৲ টাকার বেশী আদায় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পরে পুলিসের উপর সাহায্যের আদেশ হয় ও কিছু টাকা আদায় করা যায়। ঐ সময় ময়মনসিংহের পরিদর্শক কর্ম্মচারী হিসাবে যখনই আমি পরিদর্শন করিতে গিয়াছি, তখনই সংবাদ পাইয়া "হায় টাকা, হায় টাকা" করিতে করিতে বাড়ী ঘর হারা ও পাগলপ্রায় ব্যক্তিগণ দরখাস্ত হাতে করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং অনেক টাকা নিজ দায়িত্বেও রেহাই দিয়া জমি-জমাহীন বলিয়া রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি। সরিষাবাড়ী থানায়ও এই প্রথায় পুরাতন দেনা শোধ করা যায়। সেখানে রাণী দিনমণি চৌধুরাণীর কাছারীতে বসিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় টাকা বিলি করায় কাছারীর দ্বারা জমি ও জমার কাগজ দেখা হইত ও টাকা দেওয়ানগঞ্জের ন্যায় লুট হয় নাই। এই প্রকারে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কো-অপারেটিভ আইন প্রকৃত আর্থিক উন্নতির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে পুরাতন ঋণ শোধের প্রথা বদলাইয়া যায় ও অল্প অল্প টাকা সমিতিকে দেওয়া হয়। ময়মনসিংহের পিয়ারপুরের অন্তর্গত চরবাসস্থা গ্রামবাসী আফছার খাঁ নামে একব্যক্তি ১২০০৲ টাকা আনিয়া জমা করায় তাহার গ্রামে একটি সমিতি স্থাপন করি ও আরও ১২০০৲ টাকা তিন বৎসর পূর্ব্বে ১০ কিস্তিতে দেওয়ার মিয়াদে গবর্ণমেণ্ট হইতে শতকরা ৬।০ টাকা সুদে ঋণ দেওয়া হয়। ঐ ৩ বৎসর কোনও আসল বা সুদ ধরা হয় নাই। পরে জানা যায় যে অতিরিক্ত সুদে কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ১২০০৲ টাকা মাত্র শতকরা ৬।০ টাকা সুদে নেওয়াই ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ৪৪ বৎসর বহু চেষ্টা করিয়াও অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণী বা শিক্ষিত সহরবাসীদের মধ্যে কো-অপারেটিভ প্রথা প্রচলন হয় নাই বলিয়া যে Registrar সাহেব উপরোক্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা মোটেই অত্যুক্তি নহে। আমরা কোনও হাটে বা বাজারে প্রচার করে উপস্থিত হইলে আমাদের কোনও স্থানে প্রতারক বলিয়াছে, অথবা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত কো-অপারেটিভ সালসার কর্ম্মচারী বলিয়া আখ্যা দিয়াছে।

উপরোক্ত প্রকারে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কো-অপারেটিভ আইনের অপব্যবহার না করিয়া যদি একটি থানায় একটিও প্রকৃত Co-Operative Credit Society স্থাপন করা হইত, তাহার উদাহরণ দেখিয়া

বহু সমিতি ঠিক পথে কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু রাজনীতি উদ্দেশ্য সাধন করে বিপথে কর্জ্জ দাদন করার ফলে আজ ৪৪ বৎসর পরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গবর্ণমেন্ট এখন ক্রেডিট্ সমিতির পরিবর্ত্তে Multipurpose Society খুলিতে অগ্রিহাম্বিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি যে প্রত্যেক ৫ বৎসরান্তে ইহাদের কার্য্যাদি পরীক্ষা করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইতেছে তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করা উচিত হইবে। এবং আবশ্যক হইলে এই পন্থা পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতি বিষয়ে অন্য পন্থা গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। অর্দ্ধ শতাব্দী একই প্রণালীতে কাজ করা কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা করিলে পুনরায় যে গবর্ণমেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হইতে পারে তাহা পূর্ব্বোক্ত ক্রেডিট্ সোসাইটি স্থাপনের বিবরণ হইতে আমরা শিক্ষা করিতে পারি। বিশেষতঃ ক্রেডিট-সোসাইটি অপেক্ষা বহুবিধ সংস্কার (multipurpose Society) সমিতিতে ঋণের অপপ্রয়োগ অধিক সম্ভব।

ভোট সংগ্রহ করা বা দুষ্ট প্রকৃতির লোককে অর্থ দাদন করিয়া বশ করা বা ধর্ম্ম বা শ্রেণীগত স্বার্থ সাধন করাই অপব্যবহার। পূর্ব্বে যাহাই হউক না কেন বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতে আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, নিম্নলিখিত মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ম্মিবৃন্দকে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে শিক্ষা দিবেন? উদ্দেশ্যটি এই: The object of the movement is nothing short of economic regeneration of the country wrought by the Co-Operative movement which knows nothing of castes, sects, and policies. Committee on Co-Operation ১৯৪১ সালে বিস্তারিত তদন্তের ফলে গভর্ণমেন্ট সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে—"We wish clearly to express our opinion that it is to true Co-Operation alone, that is to a Co-Operation which recognizes the moral aspect of the question, that Government must look for the amelioration of the masses, and not to a pseodo Co-Operation edifice, however Imposing, which is built in ignorance of Co-Operative principles."

ক্ষমা কর

রঘুনাথ ঘোষ

কথা কয়ে ঠ'কে ঠ'কে
অবশেষে বোবা হয়ে গেছি।
ক্ষমা কর
ক্ষমা কর পৃথিবী আমায়॥
পরচর্চ্চা পরনিন্দা
সর্ব্বনাশ ষড়যন্ত্র তোষামোদ শুনে
স্ব-ইচ্ছায় কালা হয়ে গেছি।
ক্ষমা কর
ক্ষমা কর পৃথিবী আমায়॥

শঠতা ছলনা আর কুটীলতা দেখে,
দেখে দেখে সর্ব্বোচ্চত প্রবল অন্যায়
একেবারে পঙ্গু আর কানা হয়ে গেছি।
ক্ষমা কর
ক্ষমা কর পৃথিবী আমায়॥
বোবা কালা কানা হয়ে
বেশ আছি—বেঁচে গেছি বেশ।
ক্ষমা কর
ক্ষমা কর পৃথিবী আমায়॥

রূপলোক

বাংলা চিত্রনাটকে হাস্যরসঃ ‘মন্ত্রমুগ্ধ’

বাংলা সংস্কৃতির উৎসক্ষেত্র হইলেও হাস্য-কৌতুকের অবকাশ এখানে কম। এই কারণেই পাশ্চাত্যের ‘Wit and Humour’-এর মতো এদেশে আজ অবধিও একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হয় নাই। অথচ আমাদের গ্রাম-পঞ্চায়েতে, তাস ও দাবার আসরে, বৃদ্ধদের গড়্গড়া-সভায় প্রচুর হাস্য-কৌতুকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সত্যিকারের রস-সাহিত্যের ভোজে তাহা পাংক্তেয় হইতে পারে নাই। এই অপাংক্তেয় দোষ সাহিত্যের পাতা হইতে নাট্যমঞ্চে এবং তথা হইতে চিত্রের পর্দ্দা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। মঞ্চে ও পর্দ্দায় বীর-রস ও করুণ-রসের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, হাস্যরস মাঝে মাঝে মাত্র ‘Peeping element’ হইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘রজত জয়ন্তী’ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পথ ভুলে’ চিত্র দুইখানি বিভিন্ন সময়ে হাস্য-কৌতুকের ভ্রান্ত বিলাস লইয়া পর্দ্দায় আবির্ভূত হয়। চিত্র দুইখানি যে হাসির উদ্রেক করে, তাহা কাষ্ঠ-হাসি, কৌতুকোদ্দীপ্ত হাসি নয়। সেই তুলনায় বরং তুলসী লাহিড়ী-অভিণীত ‘হাল বাঙ্‌লা’ অনেক সার্থক চিত্র। সামাজিক সমস্যাগুলি হাসির শ্লেষ লইয়া পর্দ্দায় রূপায়িত হইয়াছে—যাহাতে শ্রীমতী মলিনার মতো সিরিয়াস্ এ্যাক্‌ট্রেসও অভিনয়-চরিত্রের গুণে যথেষ্টতর হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে আর-একখানি চিত্রের কথাও উল্লেখ করা যায়,—দেবকী কুমার বসু পরিচালিত ‘সোনার সংসার’ এবং উহার হিন্দি-সংস্করণ ‘স্যার শঙ্করনাথ’। বিশেষভাবে উহার ‘প্যারাডাইস্ সোপ ফ্যাক্টরী’র দৃশ্যটি যথেষ্টতর রসোত্তীর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হয়। শ্রীঅহিন্দ্র চৌধুরী, শ্রীতুলসী লাহিড়ী ও শ্রীসত্য মুখার্জ্জির (অধুনা মৃত) বিশেষ ভূমিকা তিনটিই এই চিত্রের প্রধান লক্ষ্য বস্তু।

বাংলা চিত্রে উক্ত ‘হাল বাঙ্‌লা’ ও ‘সোনার সংসার’-এর অভিনয় দেখিয়া বাংলা চিত্র-জগতে সামগ্রিক হাস্য-রসাত্মক কাহিনী ও অভিনয়ের ভাবী-সম্ভাবনায় একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গত কিছুকালের মধ্যে Comic Drama-র আর বড় একটা প্রচলন দেখিলাম না। একসময় মঞ্চে ও চিত্রে রীতিমত নাটক’-এর অভিনয় করিয়া শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী শিক্ষিত সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ‘You fountain Pen’ versionটি কিম্বা নাটকের প্রারম্ভিক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশটি এখনও আমাদের মনে জাগে। স্বল্প রীলের নাটকের মধ্যে বহু পূর্ব্বে অভিনীত ‘মনি-কাঞ্চন’, ‘রাতকানা’, ‘আবুহোসেন’, ‘সার্ব্বজনীন বিবাহোৎসব’ প্রভৃতি এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ‘চিরকুমার সভা’, রবীন মৈত্রের ‘মানময়ী গার্লস্ স্কুল,’ ‘রেশমী রুমাল’ প্রভৃতিরও এই সূত্রে উল্লেখ

পুরোভাগে বামে রমা নেহেরু, মধ্যে মীরা সরকার, দক্ষিণে পারুল কর

করা যায়। কিন্তু সবগুলি নাটকই যে সুঅভিনীত কিম্বা সুসম্পাদিত ও পরিচালিত—একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। মিকি-মাউসের চিত্রাবলী দেখিলে মনে যেমন স্বতঃই আনন্দ সঞ্চার হয়, অনুরূপ কোনো টেক্‌নিক্যাল ছবি এদেশে আশা করা বাহুল্য। তৎসত্ত্বেও মাদ্দার ফিল্ম্‌স্‌-এর প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সম্প্রসারণ আমাদের লক্ষ্যে পড়ে নাই। 'Man in Curtun'-এর কথা আমরা এখনও কল্পনা করিতে পারি না। একথা ছাড়িয়া দিলেও 'Man in Farce'-এর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক নিউ থিয়েটার্স পরিবেশিত ও শ্রীযুক্ত বিমল রায় পরিচালিত বনফুলের 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টেক্‌নিকাল নভেলিষ্ট বনফুলের একটি বিশেষ হাস্যরসাত্মক রচনা 'মন্ত্রমুগ্ধ'।

শুভঙ্করী নাম্নী একটী অশিক্ষিতা মহিলাকে বুঝানো হয় যে, সে তাহার সন্দেহভাজন স্বামী হারাধনকে মন্ত্র-বলে কুকুর করিতে পারে এবং পুনরায় মন্ত্রের গুণে মানুষ হইয়া শুভঙ্করীর একান্ত বাধ্য স্বামীতে পরিণত হইতে পারে। ইহার পিছনে অবশ্য স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচলা-ভক্তি চাই। এ কথা বুঝানো হয় হারানাধনেরই

উপবিষ্ট কালী সরকার, দণ্ডায়মান জওহর রায় ও সুনীল দাশগুপ্ত

শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ঝানু মল্লিকের দ্বারা। ঝানু মল্লিকের আড্ডাখানায় রিহার্সাল চলে থিয়েটারের, হারাধন গিয়া সেখানে মাঝে মাঝে বসে এবং অনুরক্ত হয় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে। এইভাবে ক্রমেই হারাধনের ঘরে ফিরিতে অধিক রাত্রি হয়। একদিন ঝানু মল্লিকের আড্ডার ঘরে তাহার ব্রাণ্ডির বোতলের ছিপি খুলিয়া তাহাকে ব্রাণ্ডি দিতে গিয়া খানিকটা গড়াইয়া হারাধনের গায়ের চাদরের একাংশ ভিজিয়া যায়—যাহার ফলে স্ত্রীর সন্দেহ ক্রমে দানা বাঁধিয়া ওঠে। ঝানু মল্লিক আদপেই ঝানু লোক, সে ইহা হইতে একটা 'ক্লু' আবিষ্কার করিয়া শুভঙ্করীর কাছে হারাধনকে দিয়া মিথ্যা মন্ত্রপায়ী চরিত্রে অভিনয় করাইতে লাগিয়া গেল এবং নিজে সাধু-বাবার ভূমিকা লইয়া শুভঙ্করীকে উক্ত মন্ত্রের গুণ বিশ্লেষণ করিয়া আড়ালে আড়ালে পুতুল-নাচের রাশ টানিতে সুরু করিল। যে অভিনয়ের রিহার্সাল তাহার নিজের আড্ডায় সুরু হইয়াছিল, ক্রমে তাহার মঞ্চাভিব্যক্তি ঘটিল হারাধন ও শুভঙ্করীরই সংসার-গৃহের দরজায়।—ইহারই পাশে শান্ত প্রদীপ-শিখার মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে কলেজের মেয়ে চুমকী ও তাহার প্রণয়মুগ্ধ মোহনলালের প্রেম-আলেখ্য।

এক জাতীয় ছেলে আছে—যাহারা স্বভাবে নরম, মজ্জাগত ভীরু, বেগের চাইতে আবেগ যাহাদের বেশী, অথচ মেয়েদের সাম্‌নে নিজেদের বীরপুরুষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রায়ই ইহারা সিভ্যালরীর পরিচয় দিয়া থাকে। এই ধরনের চরিত্রই হইল মোহনলাল। বিশেষ অভিনয় দক্ষতায় শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত এই ভূমিকাটি প্রাঞ্জল ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বিক্ষিপ্ত চলনভঙ্গী, চোখ ও মুখের চরিত্রগত স্বাভাবিকতা এবং ডন্‌ জুয়ান জাতীয় হাস্যের বলিষ্ঠ প্রকাশ—প্রত্যেকটি ভঙ্গীই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। মনে হয়, ইহার চাইতে বেশী কম হইলেই স্বল্পতা বা হাস্যাগী দোষ ঘটিত। নতুন শিল্পী হিসাবে এই সার্থকতার স্বাক্ষর ভবিষ্যতের পক্ষে কমবড় প্রতিশ্রুতি নয়। ইতিপূর্ব্বে মঞ্চে সৌখীন অভিনয়ে 'সিরাজদ্দৌলা'র সিরাজ ও 'নতুন প্রভাতে'র রহিম এবং চিত্রে 'অঞ্জনগড়ে' কৈলাসের ভূমিকায় শ্রীসুনীল দাশগুপ্তের যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি, এবারে তাহার হাস্য-রসাত্মক দিকের পরিচয়ে একটি নতুন গুণ লক্ষ্য করিলাম।

এই দিক হইতে শ্রীকালী সরকারের ইন্‌স্‌পেক্টারের ভূমিকাটিও বিশেষ সার্থক। বাহিরে যাহারা আইনের

কথা বলে, চোর ডাকাত ধরিয়া হাজতে আটকায়, বন্দুক আর রিভলভার ছোড়ে, তাহাদের মধ্যেও যে একটি প্রণয়মুখর হৃদয় আছে—ইন্‌স্পেক্টার ও ইন্‌স্পেক্টারগৃহিণীর দাম্পত্যালোচনায় তাহা স্পষ্টতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অঞ্জনগড়ে'র দুলাল মাহাতোর কালী সরকারের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার কালী সরকারের আকাশ পাতাল পার্থক্য।

হারাধনের ভূমিকায় শ্রীজীবেন বসু তাঁহার অভিনেতা-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। শুভঙ্করীর নিকটে হারাধনের মাতালের অভিনয়-দৃশ্যটি জীবেন বাবুর প্রসাদগুণে বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে—যদিও পোড়ো বাড়ীতে হারাধনের অজ্ঞাত-বাস-কালে তাহার সঙ্গীত-ভঙ্গীটি জীবেন বাবুর 'untuned' কণ্ঠস্বরের জন্য বিকৃত বলিয়া মনে হইল। বাসু মল্লিকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন তরুণ শিল্পী শ্রীশক্তি ভাদুড়ী। তাঁহারও সাধারণ বাচনভঙ্গী ও নির্ভিক অভিনয় প্রশংসনীয়। নাটকের পরিণতিতে সাধুবাবার সজ্জায় তাহার হাঁটুভাঙা দৌড়টি দর্শক-সাধারণের বিশেষ হাসির উদ্রেক করে। স্ত্রী ভূমিকার মধ্যে শ্রীমীরা সরকারের চুমকির অভিনয় মনোজ্ঞ হইলেও তাহার প্রেমিক মোহনলালের পাশে ম্লান বলিয়াই মনে হয়। এতৎসত্ত্বেও নতুন অভিনেত্রী হিসাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রচুর। এই দিক হইতে সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার পরিচয় দিয়াছেন শুভঙ্করীর ভূমিকায় অবতীর্ণা নবীনা অভিনেত্রীটি। বিশেষতঃ তাহার কল্পিত স্বামীরূপে কুকুরকে খাওয়ানো, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার মধ্যে নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত একাধিক ক্ষেত্রেই তিনি নতুন অবতীর্ণা হইয়াও সুঅভিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সর্ব্বশেষে অভিনন্দন জানাইতে হয় পরিচালক শ্রীযুক্ত বিমল রায়কে। 'উদয়ের পথের' মধ্য দিয়া যাঁহার প্রথম আবির্ভাব, 'মন্ত্রমুগ্ধে'র মধ্যে তাঁহার চমৎকার সাম্প্রতিক পরিণতি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। পরিচালক হিসাবে সিরিয়াস নাটক ও কমিক নাটক—উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার সমান দক্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুকীর্তিত। নাটক হিসাবে 'মন্ত্রমুগ্ধ'-কে প্রথম শ্রেণীর বই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিচালকের সুপরিচালনায় ও শিল্পীদের মনোজ্ঞ অভিনয়ে চিত্র নাটকখানি বর্ত্তমান বাংলার নাট্যজগতে যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

নাট্যানুষ্ঠান

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ক্যালকাটা মিউজিক কলেজের সাহায্যকল্পে কলেজের অভিনয়বিভাগ ও জনশ্রী সংঘ 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' ও 'সাজাহান' নাটক দুইটির মঞ্চাভিনয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। পরিচালকমণ্ডলীর অধ্যক্ষরূপে সঙ্গীতাচার্য্য তারাপদ চক্রবর্ত্তী অভিনয়ের দর্শকবৃন্দকে অভিনন্দন জানাইবেন; প্রযোজনা করিবেন চিত্ততোষ চট্টোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে যাঁহারা বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রযোজকদ্বয়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, সুশীল দাশগুপ্ত ও মায়া বসু প্রধান। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। আমরা অনুষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।—রূ

পুস্তক ও আলোচনা

মন্দার পর্ব্বত : উপন্যাস। শ্রীমতিলাল দাস প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৲ টাকা মাত্র।

'বিসর্পিত প্রান্তরের মাঝে ধূসরদেহ মন্দার-পর্ব্বত যুগ-যুগান্তরের প্রহরী। ১৩৪৭ সালের ১৫ই আশ্বিন মুগ্ধ-পথিক চাহিয়া দেখিল দিক্‌চক্রবালে সুস্পষ্ট-মূর্ত্তি শৈলচূড়া। পথিক বাঙালী, শ্যামাবাংলার সমতল ভূমির অধিবাসী। মন্দার হিমালয়ের মত বিরাট নয়, তার মাহাত্ম্য জগজ্জয়ী নয়, সে আপন বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে প্রান্তর-সুষমাকে স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। সুমুখ দিয়া উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া পথ চলিয়াছে—এক দিকে তার গঙ্গা, অপর দিকে দুমকা।'

—এই জাতীয় সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্য দিয়া 'মন্দার-পর্ব্বত'-এর কাহিনী সুরু। গ্রন্থের আবহ চরিত্র-সৃষ্টির তুলনায় প্রাকৃতিক বর্ণনাচাতুর্য্য ঊর্দ্ধস্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের মূল চরিত্রের মধ্যে সুরেশ, শশিপদ বাবু, জ্যোৎস্না ও সুহাসিনীই প্রধান। প্রত্যেকেই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখিয়াও পূর্ণ মানবিকতায় দাঁড়াইতে পারে নাই। চরিত্রসৃজনে লেখকের এই অক্ষমতা সত্ত্বেও মূল গ্রন্থখানি একটি সুন্দর শিল্পানুগ পরিবেশের উপর স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া আছে। ঐতিহাসিক সংবেশই এখানে প্রধান। যেমন: 'মন্দার-পর্ব্বতের প্রথম তলে উঠিলে তাহারা (সুরেশ প্রভৃতি) সৌভাগ্য-কুণ্ড দেখিল। সৌভাগ্যকুণ্ডের পার্শ্বে যে দেবমন্দির ছিল, তাহার ভগ্ন খণ্ডগুলি ধূলায় লুটাইতেছে। যে-সব শিল্পিরা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সুনিপুণ তক্ষণ ইহাদের বিস্মিত করিল।'......

এইরূপ বর্ণনার মধ্যে পাঠকের প্রাকৃতিক অনুসন্ধিৎসু মন রসাস্বাদন করে। সেই দিক হইতেই মন্দার-পর্ব্বতের বিশেষ সার্থকতা।

চৌকো চোয়াল : শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া প্রণীত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। কলিকাতা ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সী : ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

আমরা এ পর্য্যন্ত ডিটেকটিভ বা রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাস বলিতে যে শ্রেণীর সাহিত্যের সাথে পরিচিত হইয়া আসিয়াছি, আলোচ্য গ্রন্থটি ঠিক সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। 'চৌকো-চোয়াল' প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রধান বই; 'এক্সপ্যানশন অব ইনটেলিজেন্‌শিয়া'র উপর মূল কাহিনীর ভিত্তি—যাহা শ্রীকান্ত বাবু, মিঃ সোম, তরুণ, মিঃ পূরণ সিং, শান্তি বাবু প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া অলৌকিক ও রসজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটি ধারাবাহিকভাবে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ হইবার কালেই পাঠক-বৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করে। আমরা এতদিনে গ্রন্থখানি হাতে পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম।

রক্তাভ বুদ্ধ : মণিলাল অধিকারী প্রণীত রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাস। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির : ১০৯-এ, লেক রোড, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র।

'তিব্বতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রক্তাভ-বুদ্ধ। অভিশপ্ত রক্তাভ-বুদ্ধ। এর মূল্য কত হওয়া উচিৎ, আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষ তা কল্পনা করতে পারেনি। অতি প্রাচীন-কালে কোন এক তিব্বতীয় রাজপুরুষ প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এক বিশিষ্ট শিল্পীকে দিয়ে একটিমাত্র প্রকাণ্ড রুবি খোদাই ক'রে রক্তাভ বুদ্ধের সৃষ্টি করেন। কিছুদিন পরে সেই রাজপুরুষের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। এর পর চলে একটির পর একটি হত্যালীলা। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাভ বুদ্ধও হস্তান্তর হ'তে থাকে। শেষে একটি জটিল গুহা মন্দিরে গুপ্তকক্ষে রক্তাভ-বুদ্ধ স্থান লাভ করে। গুহামন্দির এক দস্যুদলের। রক্তাভ বুদ্ধের জন্যে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি হ'য়ে দস্যুদলের সবাই মৃত্যুকে বরণ করে। সেই থেকে রক্তাভ-বুদ্ধ গুহামন্দিরের গুপ্তকক্ষে র'য়ে যায়।'

মূলতঃ এই ঘটনার ভিত্তিতেই গ্রন্থের কাহিনী সংস্থাপিত। একাধিক ক্ষেত্রে অত্যধিক ইংরেজি কথনের চাপে বক্তব্য ভারী হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থের গ্রন্থনে শিক্ষার ইঙ্গিত থাকিলে রচনা আরও উৎকর্ষতা লাভ করে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কিশোর-মনকে আনন্দ দিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।—স্ব

সম্পাদকীয়

"জনগণ-মন-অধিনায়ক"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় "জনগণ-মন" সম্বন্ধে এই সংখ্যায় যে একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় কোন কোন বিষয়ে আমাদের মত-পার্থক্য হইলেও সানন্দে স্বীকার করিতেই হইবে, তিনি বিষয়টি প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং সত্যানুসন্ধানে তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বস্তুতঃই প্রশংসার্হ।

১৯১১ সালের জাতীয় কংগ্রেসেই যে সঙ্গীতটি প্রথম গীত হয়, তাহা এখন সর্ববাদীসম্মত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তখন মডারেট কংগ্রেসে রাজভক্তির উচ্ছ্বাস ও রাজানুগত্য প্রকাশের প্রবল ব্যাকুলতার মধ্যেই গানটী রচিত বলিয়া প্রবোধবাবুও একটু সন্দিহচিত্ত লইয়াই প্রসঙ্গটি আলোচনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া আলোচনা করায় তাঁহার রচনাটি সুচিন্তিত এবং সুপাঠ্য হইয়াছে।

আজ রাজসম্পর্ক আপত্তিকর এবং রোষণীয় হইলেও তখন তাহা ছিল না। তাই তখন লোকের যে মনোভাব ছিল, তাহা অপ্রশংসনীয় না হইলেও, লোকে আজ তাহা প্রশংসা করিতে পারে না। তাই প্রবোধবাবু যদি নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিতে পারেন, জগৎবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ গানটি ধর্ম্মসঙ্গীত অথবা স্বদেশী সঙ্গীত হিসাবেই রচনা করিয়াছিলেন—রাজপ্রশস্তি হিসাবে নয়, তবে তাঁহার এবং দেশের অনেক লোকের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। প্রবোধবাবুর এইরূপ প্রচেষ্টা খুবই শ্লাঘনীয়, এবং এই আলোচনায় তাঁহার বিবরবস্তুটি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি প্রকৃত ঘটনাও বিকৃত করেন নাই বা একদেশদর্শিতাও দেখান নাই। ইহাতেই আমরা আরও আনন্দিত। যাহা হউক, গানের রচনার পঁচিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, "গানটী পঞ্চম জর্জ্জের উদ্দেশে রচিত নয়।" ইহাই বড় যুক্তি, কারণ রবীন্দ্রনাথের কথা বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, গানটি ভগবানের উদ্দেশেও রচিত ধরা যায়। এবং পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা অবস্থান পরিবর্ত্তনে এখন অনেকের নিকট হাস্যজনক মনে হওয়াও বিচিত্র নয়—মনে হয় যেন মাভৈঃদেশে হওয়া কি সম্ভবপর ছিল? তবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জনগণ সম্বন্ধে যখন বিবৃতি দেন, তখন তিনি ষড়সপ্ততিবর্ষবয়স্ক। স্মৃতি সহায় না হইতেও পারে এবং তাহাতে কখনও দোষ দেওয়া যায় না। তাই মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক অবস্থাও বলিয়া থাকিতে পারেন, আবার স্মৃতি বিভ্রম হইলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

অপর দিকে আবার গানটী রাজপ্রশস্তি হিসাবেও ধরা যায়। "বেঙ্গলি" গানটীকে patriotic বলিলেও রাজপ্রশস্তি হওয়ার বিপক্ষে বলে নাই, এবং বলাও যায় না, কারণ বঙ্গভঙ্গ রহিতকারী রাজার জয়গানই ছিল তখন স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা, আর ১৯১১ সালের জাতীয় কংগ্রেসের একসুরই ছিল সম্রাটের যশোগান। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাজভক্তিকে স্বদেশভক্তির পরিপন্থী মনে করিতেন না। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি জনকয়েক নেতা ব্যতীত প্রায় সকলেই রাজভক্তি, স্বদেশভক্তিরই নামান্তর মনে করিতেন। এমন যে স্বদেশনেত্রী, বীরাষ্টমী-ব্রত-প্রবর্ত্তিকা সুহৃদ সমিতি প্রতিষ্ঠাত্রী "নমো হিন্দুস্থান" সঙ্গীত রচয়িত্রী সরলা দেবী, তাঁহার মনেও তখন দেশভক্তি ও রাজভক্তির আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ সংঘটিত হয় এবং তিনি যেরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে "বন্দেমাতরম" ও 'নমো হিন্দুস্থান' গাহিয়াছিলেন, সেইরূপ গদগদভাবেই 'জনগণ-মন' ও 'বাদশা হামারা' ও গাহিয়াছিলেন। আর 'বাদশা হামারা' রচয়িতা সরলা দেবীর স্বামী পণ্ডিত রামভূজই কি কম পেট্রিয়ট ছিলেন? মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ যখন কংগ্রেস ছাড়িয়া মন্ত্রী

হইবার আশাপ্রতীক্ষায় ছিলেন, পণ্ডিতজী কংগ্রেস সংশ্রব তো পরিত্যাগ করেনই নাই, পরন্তু পাঞ্জাবের গোলযোগে বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। যে 'বেঙ্গলী' পত্র গান্‌টীকে 'পেট্রিয়টীক' বলিয়াছেন, তাহার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস-বিবরণীতেও ঐরূপই যে বলিবেন তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু পেট্রিয়টীজম ও রাজভক্তি যে সুরেন্দ্রনাথের কাছে একই জিনিষ, তাহার পরিচয় ২৮শে ডিসেম্বরের 'বেঙ্গলীতে' প্রদত্ত গানের বঙ্গানুবাদেও পাওয়া যাইবে। অন্যান্য কলি সম্বন্ধে বলিব না, যেটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগযুগ ধাবিত যাত্রী, হে রথসারথী তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি" তাহারই অনুবাদ "বেঙ্গলী" করিতেছে—

Uneven is the Road of life (starred with)
Rise and fall down it, tnrough the long
Process of yea s, have trod the s ns of men;
On this road thou art the charri teer, o Lord
The Sound of thy charriot wheels feels it day
And night and thy trumpet rings loud in hours of gloom and peril,
Guide, path finder of natio:s, we salute thee
Hail, all hail to thy name."

গানটী সার্থক বটে। ভগবানের দিকেও নেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু 'patriotic' আখ্যা দিয়াও বেঙ্গলী যে ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছে, তাহা হইতে কেহ কি বলিতে পারে যে, উহা রাজোদ্দেশে রচিত ধরা যায় না? শব্দবিন্যাসে অপূর্ব্ব শক্তিশালী রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে যদি গানটী রচনা করিতেন যে, গানটী রাজার দিকে কিছুতেই নেওয়া যায় না—(যেমন মানব-ভাগ্যবিধাতা কখনও পঞ্চম জর্জ্জ হইতে পারেন না, ভারত ভাগ্য বিধাতা হইতে পারেন।) তবেই নিঃসন্দেহে বলা যাইত, গানটি রাজোদ্দেশে রচিত নয়। কিন্তু এখনও সেই সন্দেহ অনেকাংশেই বিদূরীত হয় নাই।

তবে এরূপও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে রবীন্দ্রনাথ গানটি পূর্ব্বে ভগবানের উদ্দেশেই রচনা করিয়াছিলেন, (যাহা ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে), কিন্তু আমাদের মডারেট নেতৃবৃন্দ তৎকালে উহাকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। আবার গানটির অধুনাতন পূর্ণাঙ্গতার দিক দিয়া প্রথম রচনার একমাস পরে নূতন কিছু সংযোজিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা তাহাও দেখিবার বিষয়।

সুতরাং বেঙ্গলীর patrioti: কথায় ধাঁধা লাগেনা। অমৃতবাজার একটী "Song of benediction"-এর কথা বলিয়াছে, কিন্তু কাহার রচিত তাহা বলে নাই। Englishman এবং Statesman খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছে, রাজোদ্দেশে স্বাগত সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথ বিরচিত। Statesman আরেকটি গানের কথা বলায় একটু গোল হয় বটে। অমৃতবাজারের প্রদত্ত গানটিও হইতে পারে, এটিও হইতে পারে অথবা গোল পাকাইয়াছেও বলা যায়। তবে 'রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রাজোদ্দেশে রচিত' কথাটির মিল আছে। 'ইণ্ডিয়া' কাগজেও প্রায় সেইরূপই আছে। লণ্ডনের কাগজ বলিয়া তাহা উপেক্ষণীয় নয়, কারণ উহা কংগ্রেসেরই মুখপত্র। আর লণ্ডনের র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডেরই সেই বৎসর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হওয়ার কথা ছিল।

১৯১৭ সালের কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তৃতীয়দিন এই গানটিতে জয় সূচিত হইবে বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে প্রস্তাবটিই দেশবন্ধু সমর্থন করিয়াছিলেন। উহা ইংরাজ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে এবং রাজার অনুমোদন সাপেক্ষ। তখনও কংগ্রেসে স্বাধীনতার কথা নামেও আসে নাই। এমন কি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরেও মহাত্মাজী অমৃতসর কংগ্রেসে ১৯১৯ খৃঃ সহযোগিতার প্রস্তাব আনেন, কিন্তু এই শেষ। ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজা সম্বন্ধে কোন উক্তি বা প্রশস্তি নাই।

অতঃপরে,১৯২৯ সালের কংগ্রেসে খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ সংস্রব ত্যাগের প্রস্তাব হয়। এখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি ; রাজা বা সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক নাই। তাই একসময়ে রাজোদ্দেশে রচিত বলিয়া যাহা সকলে না হইলেও অনেকে মনে করিতে পারেন, তাহা উদ্বোধন সঙ্গীত না হইয়া অনুষ্ঠানের শেষে ভগবানের দিকেও ধরা যায় বলিয়া ভগবদ্ সঙ্গীতরূপে ব্যবহার করা যায়।

মহাত্মাজী ও নেতাজী

এখানে আমরা উপরোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের চরিত্র বা শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক আলোচনা করিতে বসি নাই। ইংরেজি পঞ্জিকানুসারে বৎসরের প্রথম মাসটি ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয়। দুইজন মহাশয়ক মুখ্যতঃ যাঁহাদের 'আত্মোৎসর্গে'র ফলে ভারতবর্ষ দুইশত বৎসর পরে আজ নূতন পরিচয়ে পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির পঙ্‌ক্তিভুক্ত হইয়াছে, এই জানুয়ারী মাস অত্যন্ত বিপরীত ভাবে সেই দুইজন মহা-নায়কের স্মৃতিদিবস পালন করে। একজনের আবির্ভাবের, আর একজনের—হত্যাকাণ্ডের। ভারতবাসী তাঁহাদের জাতীয়-জীবনের এই প্রধানতম ভাগ্য-ভাস্কর-দুইজনের স্মৃতি কি ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে, উপস্থিত আলোচনায় সেই সম্বন্ধেই দুটি কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য।

আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর ও অলঙ্কার-নিনাদিত বক্তৃতা যদি জাতীয় নায়কদের স্মরণ রাখিবার মাপকাঠি হয়, তবে আমাদের বলিতেই হইবে যে, ভারতবাসী মহাত্মাজী ও নেতাজীকে কেবল মনেই রাখে নাই, রামায়ণোক্ত শ্রীহনুমানের কাহিনীর মত তাঁহাদের রীতিমত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঝাণ্ডা ওড়ানো, সামরিক কায়দায় শোভাযাত্রা, দীপমালা আর বক্তৃতাবলী মহাত্মাজীকে এবং নেতাজীকে মনে রাখিবার পক্ষে—এসবের মূল্য কতটুকু ? আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, আড়ম্বরের মধ্যে প্রাণের পরিচয় নাই, আছে ভুয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনের প্রয়াস—আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। মহাত্মাজী ও নেতাজীর স্মৃতিতর্পণ করিতে আমরা সেই বীতশ্রদ্ধ আত্মবিজ্ঞাপনের খুব ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছি কি ?

মহাত্মাজী এবং নেতাজী উভয়েই সারা জীবন ধরিয়া এক নূতন ভারতবর্ষ গড়িবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল যে, তাঁহাদের পরিকল্পিত ভারতে শোষণ থাকিবে না, অশিক্ষা থাকিবে না, অনটন থাকিবে না—আত্মকলহ বিদূরিত হইবে; অপরকে বঞ্চিত করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আপামর ভারতবাসী আত্ম-প্রকাশের সকল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে। এ স্বপ্ন যে অবাস্তব আকাশ-কুসুম ছিল না, তাহার প্রমাণ ভারতের নবলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মহাত্মাজী ও নেতাজী বলিয়াছিলেন যে, উক্ত স্বপ্ন সফল করিতে হইলে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—ইহা শুধু উপায় মাত্র, চরম উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উপায়কে তো আমরা পাইয়াছি, তাঁহাদের সেই স্বপ্ন সফল করিবার মত প্রচেষ্টা আমাদের কোথায় ? সে প্রচেষ্টার পথে পা না বাড়াইলে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের নামোচ্চারণ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত আমাদের নাই।

কলিকাতার হাঙ্গামা

দিনকয়েক ধরিয়া কলিকাতার নাগরিক জীবন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী নহি, কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ যেসব সংবাদ এই আলোড়ন সম্পর্কে আমরা পাই, তাহাতে শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা কিছুতেই বছর তিন পূর্ব্বেকার এই ধরণের ঘটনাগুলিকে স্মরণ না করিয়া পারি নাই। সেই বিক্ষোভ মিছিল, সেই ট্রামজ্বালানো, পুলিশের সেই লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস এবং সেই গুলি চালানো আর অকারণ কয়েকটা জীবন নাশ।

যতদূর জানা গেল, তাহাতে প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিতজী যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কিছু বাস্তহারা নর-নারী নাকি ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা সমবেত ভাবে ব্যক্ত করিবার অভিলাষে কলিকাতার কোনও এক রাজপথ ধরিয়া মিছিল করিয়া আসিতেছিল। কলিকাতায় তখন ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল, মিছিলকারীরা সেই আইনের ধারা ভঙ্গ করায় পুলিশ বাধা দেয়। উক্ত হাঙ্গামা নাকি

সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই সংঘটিত হয়। কলিকাতায় ছাত্রসমাজের এক অংশ পুলিসের এই কার্য্যের প্রতিবাদে পুনরায় মিছিল করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং পুনরায় আমাদের কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ বাহিনীও আইনের সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রদের সেই অপচেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিল। মোটামুটি ভাবে সমস্ত ঘটনাটা এইটুকুই মাত্র।

তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হয় না, একটুখানি বিবেচনা নিয়া চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, ব্যাপারটা আগাগোড়াই অত্যন্ত অহেতুক রকমের, রীতিমত বালসুলভ অপকাণ্ডের মত। দেশের সর্ব্ববিধ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের, সেইহেতু সে পক্ষের কথাটাই সর্ব্বাগ্রে বলি। ন্যায় বা অন্যায় যেমনই হোক, কোনও কারণে জনগণের একাংশ সরকারের আচরণের জন্য বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এবং সেই বিক্ষোভ জানাইবার জন্য শুধু মাত্র রাজপথে জমায়েত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র ঘটনার জন্য পুলিশের ধৈর্য্যচ্যুতি যে কি করিয়া এত চরমরূপ ধারণ করিতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তাহাছাড়া বর্ত্তমান সরকার আমাদেরই স্বকীয় জাতীয় সরকার। মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই আমাদের পরীক্ষিত নেতৃস্থানীয়। জনগণের কোনো অংশ, বিশেষতঃ চপলমতি এবং আবেগপ্রবণ ছাত্র-সমাজের কোনো অংশ যদি দুরভিসন্ধিপরায়ণ কাহারও ষড়যন্ত্রে বিপথে চালিত হয়, তবে ছাত্রবৃন্দকে সেই বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব সেইসব মন্ত্রীপদাসীন নেতৃবৃন্দেরই। কিন্তু নেতারা সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করিয়াছেন কি? পূর্ব্বতন বৃটীশ প্রভুদের দ্বারা যথেচ্ছচারে ব্যবহৃত হওয়ায় দরুণ লাঠি, গ্যাস ও গুলি প্রভৃতি শাসনের হাতিয়ারগুলি মাত্রেই আমাদের জনগণের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য—এবং এগুলকে এভাবে ঘৃণা করিবার শিক্ষা ভারতীয় জনগণ তাহাদের নেতাদের কাছেই পাইয়াছিল। আজ যদি অতি সাধারণ কারণেরই জন্য জনগণ তাহাদের সেই নেতাদের কার্য্য-কলাপের মধ্যে সেইসব ঘৃণ্য হাতিয়ারগুলির আস্ফালন দেখিতে পায়, তবে নেতৃবৃন্দের প্রতি তাহাদের আনুগত্য কেমন করিয়া অটুট থাকিবে?

ছাত্রদের সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। জগতেতি-হাসের অতি দুর্য্যোগপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ নবজীবন লাভের সুযোগ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দুইটি পরাক্রমশীল রাষ্ট্র বিশ্ববিজয়ের লোভে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে; বস্তুতঃ সমগ্র মানবজাতি আজ এক মহা প্রলয়ের সম্মুখীন। এখন হইতে ভারতবর্ষ যদি নিজেকে সর্ব্ববিধ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া না রাখে, তবে ভবিষ্যতের সেই প্রলয়ের মধ্যে সে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। তাই ভারতবর্ষের পক্ষে এক্ষণে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই অপরিহার্য্য, অমূল্য। কিন্তু এই অমূল্য ও অপরিহার্য্য মুহূর্ত্তগুলি যদি ছাত্রসমাজ, জাতীয় জীবন গঠনের দায়িত্ব যাহাদের প্রধানতম, তাহারাই যদি এক একটি নিরর্থক উত্তেজনার মধ্যে ক্রমাগত নষ্ট করিতে থাকে, তবে আর ভারতবর্ষের বাঁচিবার আশা কোথায়? মিছিল বা বিক্ষোভের মধ্যে সত্যকার গঠনমূলক কিছু নাই, এই অনুষ্ঠান আঘাতের, সুতরাং ভাঙিবার। কিন্তু গত দুইশত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রায় সবকিছুই ভাঙিয়া রহিয়াছে। ভারতের শুভই যদি ছাত্রসমাজের কাজ হয়, তবে তাহাদের উচিত সেই ভাঙা সমাজ-দেহকে জোড়া দেওয়া।

এশিয়া সম্মেলন ঃ

(হায় বক্তৃতা, তুমি শুধু বক্তৃতা)

বিশ্বাসঘাতক ডাচ সাম্রাজ্যবাদ কর্ত্তৃক শান্তিকামী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ইন্দোনেশিয়া আক্রান্ত হওয়ার প্রতিবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-আহূত এশিয়া সম্মেলন দিন কয়েক আগে দিল্লীতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গে গতমাসের আলোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম যে, এসব সভা সম্মেলনের উপরে আমাদের আস্থা খুব বেশী নয়। কারণ পূর্ব্বতন অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি যে, এই জাতীয় সভা সম্মেলনে

প্রকৃত কাজের কাজ হওয়ার চেয়ে হয় বেশী বক্তৃতা, প্রস্তাব আর সদস্যবৃন্দকর্তৃক পরস্পরের প্রশস্তিবাচন। সাম্রাজ্যবাদ আক্রান্ত ইন্দোনেশিয়া আজ আমাদের সমগ্র এশিয়ার মানুষকে এক চরম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সামনে ঠেলিয়া দিয়াছে—সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী পুনরাগমনকে প্রতিহত করিয়া এশিয়ার মানুষ সর্ব্বতোভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বায়ত্ত হইবে কিনা, উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই সেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কাজেই সেই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এশিয়ার জয়লাভের একমাত্র পথ সমবেতভাবে সক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে, শব্দাঢ্য প্রস্তাবের মধ্যে নয়। কিন্তু আমাদের আশঙ্কাই দেখিলাম শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইল—দিল্লীর এশিয়া সম্মেলন শুধু বক্তৃতাতেই শেষ হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনায় নিম্নলিখিত বিষয় দুটি খুব স্পষ্ট :

(১) আপোষে সকল সমস্যার মীমাংসার জন্য ইন্দোনেশিয়ানরা বারবার অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বারবারই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিপক্ষ আপোষের সকল সম্ভাবনাকে 'স্যাবোটাজ' করিয়াছে। বারবার ইন্দোনেশিয়ানরা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সততার উপর আস্থা রাখিয়াছে, কিন্তু বারবারই ইঙ্গ-আমেরিকার ষড়যন্ত্রে তাহারা প্রতারিত হইয়াছে। অতএব শেষ পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়া বুঝিয়াছে যে, আত্মরক্ষার জন্য নিরপেক্ষ প্রতিরোধ ব্যতীত তাহার আর পথ নাই। ইন্দোনেশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র-কবল হইতে বাঁচাইতে হইলে সকল স্বাধীনতাকামী এশিয়াবাসীরও একমাত্র পথ ইন্দোনেশিয়াকে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রদান।

(২) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত যে ডাচ সাম্রাজ্যবাদ, তাহা আমেরিকারই অর্থপুষ্ট। মার্শাল প্ল্যানের সূত্র ধরিয়া ইন্দোনেশিয়াকে আঘাত করিবার সকল অস্ত্র আমেরিকা হইতেই হল্যাণ্ডের ঘাঁটিতে আসিয়া জমা হইয়াছে।

কিন্তু দিল্লী সম্মেলনে এই বিষয়দুটি সম্বন্ধে এতটুকু উচ্চবাচ্য হয় নাই, বরঞ্চ ঢাকা দিবারই প্রয়াস দেখা গিয়াছে। সম্মেলনে সর্ব্বসমেত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি ইতিপূর্ব্বে সিকিউরিটি কাউন্সিলে গৃহীত মার্কিন প্রস্তাবেরই অনুরূপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের বিষয় ছিল সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি নিয়া একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মতো তৈয়ারী করা—প্রত্যক্ষ কোনো সক্রিয় পরিকল্পনার জন্য নয়, শুধু পরস্পরের মধ্যে সময় ও অবস্থা বিশেষে মতামত আদান-প্রদানের জন্য।

কিন্তু এই প্রস্তাব দুটিকেও কার্য্যকরী রূপ দিবার প্রয়াস অতি অল্পই হইয়াছিল। প্রস্তাব ক'টির একটি অনুলিপি ইউ, এন্, ও-র কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হইয়াছে এবং অনুরোধ করা হইয়াছে যে, উনো যেন অনতিবিলম্বে এই প্রস্তাবানুযায়ী কর্ম্মপন্থার অনুসরণে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যার সমাধানে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত উনো যদি এই অনুরোধে কর্ণপাত না করে, তবে এশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ সে সমাধানের জন্য কোন্ পথ গ্রহণ করিবে, দিল্লী সম্মেলনে সে-কথার কোনো আলোচনা হয় নাই।

ডাচরা পুনর্ব্বার ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করিবার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী বজ্রনিনাদিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—'এশিয়া অতঃপর আর কখনো স্বদেশে বিদেশের হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না।'—পণ্ডিতজীর সেই সাবধানবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা সকলেই ভাবিয়াছিলাম যে, পণ্ডিতজী আবার বুঝি তাঁহার পুরাতন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং খাঁটি গণতন্ত্রীর স্বকীয় সত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাই আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, এবারকার সম্মেলনে সত্য-সত্যই ফলপ্রদ একটা কিছু ঘটিবেই। আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এমনটা কেন ঘটিল, পণ্ডিতজী আবার কেন সেই সাম্রাজ্যবাদ-চালিত পুত্তলিকারই অভিনয় করিলেন?—এই দুর্ব্বোধ্য কারণটা আমরা এখনও উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ২৯শে জানুয়ারিতে নিউ ইয়র্ক শাখা হইতে Free Press of India সংবাদ দেন :

"According to the London correspondent of the New York Times, Mr. Loy Henderson, U. S.

Ambassador to India, is playing a significant role in the Asian Conference at Delhi. He is said to be advising Pandit Nehru that America and Britain 'hope' that the final resolution of the conference would be moderate and workable."

দিল্লীর অধিবেশন শুধুমাত্র বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হওয়ার মূলকারণ প্রকৃত পক্ষে কি ইহাই ?

ডার্ব্বান-হত্যাকাণ্ড

ডার্ব্বানের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে শ্বেত ষড়যন্ত্রের পুরাতন স্বরূপটা হঠাৎ আবার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে।

ডার্ব্বান্ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের একটা বড় বসতি, এখানকার অশ্বেত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের প্রাধান্য আছে। তবু স্থানীয় আদিবাসী আফ্রিকাদের সহিত ভারতীয়দের কোনো দিন কোন বিবাদ ছিল, একথা ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই। বরঞ্চ ক্রমশঃ সচেতনশীল আফ্রিকানরা কিছুদিন হইতে এই কথাই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, শ্বেতজাতির অনাচার হইতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায় একমাত্র ভারতীয়রাই সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সগোত্র এবং সহযোগী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সামান্য তুচ্ছ একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, তাহা একদিকে যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমন অন্যদিকে অভাবনীয় রূপে আকস্মিক।

হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় ১৩ই জানুয়ারি। কোনও একটি বাজার-দ্রব্যের দরকষাকষি নিয়াই সম্ভবতঃ একটি আফ্রিকান বালকের সহিত জনৈক ভারতীয় দোকানদারের কিছু বচসা হয় এবং সেই বচসা চরমে ওঠার পর শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ায় উক্ত ভারতীয় দোকানদার কর্ত্তৃক আফ্রিকান বালকটি প্রহৃত হয়। প্রহারের আঘাত ছিল খুবই সামান্য—কিন্তু তবু এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ফলে অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই সারা ডার্ব্বান সহরে রটিয়া যায় যে একজন নিরীহ আফ্রিকান বালক কতিপয় ভারতীয় বণিকদের হাতে নিহত হইয়াছে। তারপরই হঠাৎ অতর্কিত অগ্ন্যুৎপাতের মত আফ্রিকানরা দলে দলে সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মত ভারতীয় পল্লীতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বার বার হানা দিতে সুরু করে। পুরা চারদিন ধরিয়া এই আক্রমণ চলে। অত্যন্ত নারকীয় সেই আক্রমণের স্বরূপ—স্ত্রী-বৃদ্ধ-শিশু নির্ব্বিশেষে শত-শত ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়—হাজারে-হাজারে আহত হয়—গৃহের পর গৃহ জ্বলিতে থাকে; চল্লিশ হাজার ভারতীয় নর নারী নাকি এই হাঙ্গামার ফলে গৃহহীন হইয়াছে।

পুরা চারদিন ধরিয়া অপ্রতিহতভাবে এই নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর আক্রমণকারীরা শেষপর্য্যন্ত সম্ভবতঃ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এবং এই হত্যাকাণ্ড প্রশমিত হয়। মালান্ সরকার অবশ্য দাবী করিয়াছে যে, তাহাদের পুলিশ বাহিনীর তৎপরতার ফলেই এত শীঘ্র হাঙ্গামার অবসান হয়, নতুবা ইহা আরও শোচনীয়, আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করিত। কিন্তু সেকথা থাক্। এখন সভ্যজগতের জিজ্ঞাস্য, ডারবানে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল কি ভাবে ? এপ্রশ্নের ছোট্ট একটি উত্তর দিয়াছেন সাউথ আফ্রিকারই ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড্ মার্শাল স্মাট্‌স্ স্বয়ং। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান সরকারের জাতিগত বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক অব্যবস্থারই প্রথম ফল ডার্ব্বানের হাঙ্গামায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

স্মাট্‌স-এর উক্তিতে আসল কারণটার কিছু আভাস সূচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরা ব্যাপারটা ক্রমশঃ জানা যাইতেছে দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় দুটীরই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখেই। ডার্ব্বানের হাঙ্গামা শ্বেতষড়যন্ত্রেরই আরেক পর্ব্বের অভিনয়। ইংরেজ আমলে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে কারণে ও যে ভাবে দাঙ্গা বাধিত, প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদির মধ্যে যে কারণে ও যে উপায়ে সংঘর্ষ হইতেছে—ডার্ব্বানে আফ্রিকানগণ কর্ত্তৃক ভারতীয়দের আক্রান্ত হওয়ার পিছনেও সেই একই কারণ রহিয়াছে। মুষ্টিমেয় শ্বেতঅধিবাসীরা ওদুটি সম্প্রদায়ের অগণন অশ্বেতবাসীকে পদানত রাখিতে চায় বলিয়াই সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে চায়। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিভাব জিয়াইয়া রাখিতে চায়। সামান্য আহত বালকের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনার পিছনে, আক্রমণ-

স্বামীদের বারবারই সুশৃঙ্খল ভাবে হানা দেওয়ার পিছনে এবং হানাদার আফ্রিকানদের অধিকাংশই শ্বেতবণিকদের নিযুক্ত শ্রমিক বাহিনী হওয়ার পিছনে—এই ষড়যন্ত্রের সত্যটাই স্পষ্টোচ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে।

ডার্বানের দাঙ্গায় মালান সরকারের ভূমিকা অপ্রধান নয়। ভারত ও পাকিস্তানকে মালান সরকারের এই দানবীয় অপকাণ্ডের প্রত্যুত্তর দিতেই হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনায় সিদ্ধান্ত করিয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সতেরোজন সদস্যদ্বারা গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পেশ করিয়াছেন। অনতিবিলম্বেই উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে, এরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

একাধিক মহল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ হইয়াছে দেখিলাম। প্রতিবাদ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই অভিযোগ, সরকার নাকি অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া এই পরিকল্পনাটি আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র প্রদেশের মধ্যে অতিশয় ব্যাপক, আর তাহার সমস্যাও একাধিক—সুতরাং এইরূপ সমস্যাকীর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে সরকারের উচিত ছিল প্রদেশের সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষেরই মতামত গ্রহণ করা। প্রতিবাদকারীদের অনেকেই এক-একজন পরীক্ষিত শিক্ষাব্রতী, কাজেই তাঁহাদের প্রতিবাদের যুক্তিটি এক তুড়িতেই খণ্ডনীয়, একথা বলিবার মত সাহস আমাদের নাই। তথাচ বিষয়টি পক্ষপাতশূন্য যুক্তি দিয়া একটু তলাইয়া বিচার করিলে আমাদের মনে হয় উক্ত প্রতিবাদটা খুব বেশী সমর্থনযোগ্য নয়। জাতির শিক্ষাদানের সকল দায়িত্ব জাতীয় সরকারের—এই ধরণের দাবী আমরা আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের কালে বহুবার উচ্চারণ করিয়াছি, বহুবার বহু বহু সঙ্কল্প এসম্বন্ধে গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের নবলব্ধ জাতীয় সরকার জাতির সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দাবীকেই পূরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই মোটামুটিভাবে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তাড়াহুড়ার ব্যাপারই বা কি করিয়া বলা চলে, আর সেজন্য প্রকৃতপক্ষে ক্ষুব্ধ হইবারই বা কি আছে; আর শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় গত ৮।১০ বৎসর হইতে বিষয়টিকে যে চিন্তা করিতেছেন, তাহা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে হাজরা পার্কে যে শিক্ষা সম্মেলন হয়, তাহাতে তাঁহার অভিভাষণ হইতেই জানা যায়।

কিন্তু পরিকল্পনার মূল স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ সমর্থন থাকিলেও পরিকল্পনাটির গঠনতন্ত্রের কয়েকটি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে সেকয়টী নিম্নে একে একে আমরা বিবৃত করিতেছি:

(১) উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী স্থির হইয়াছে যে ৪২ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সাধারণ বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমুদয় সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইবে। সদস্যদের অধিকাংশ অর্থাৎ ৪২ জন মধ্যে ২৪ জন বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে গৃহীত হইতেছেন—এতন্মধ্যে চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সদস্য যথাক্রমে প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন, ৭ জন সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, ৩ জন বিদ্যালয় সমূহের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্য হইতে, ৩ জন প্রাদেশিক পরিষদ হইতে, এবং অবশিষ্ট ৩ জন যথাক্রমে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হইতে, টেকনিকাল শিক্ষা বোর্ড হইতে এবং বিশ্বভারতী সংসদ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন; বাকী ২ জন হইবেন সংস্কৃত ও ফারসি বিভাগের বিশেষজ্ঞ। বাকি ১৮ জন সদস্য সরকার কর্ত্তৃক শাসনবিভাগের বিভিন্ন শাখা হইতে মনোনীত হইবেন।

উপরোক্ত সদস্যসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশই বেসরকারী হওয়ায় আর এ অভিযোগ করা চলিবে না যে সরকার বোর্ডকে আমলাতন্ত্রের কবলিত করিয়াছেন। কিন্তু তবু আমাদের বিশ্বাস যে, বোর্ডের এই গঠনতন্ত্রকে আরও কিছু অদল বদল করিলে উহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ভাবে গণতান্ত্রিক সংসদ রূপে গঠন করা সম্ভব। সর্ব্বপ্রথমে উদাহরণ স্বরূপ বোর্ডের সভাপতির মনোনয়ন প্রসঙ্গটাই উল্লেখ করা চলে। আমাদের মনে হয় সরাসরি সরকারী নিয়োগের পথে না গিয়া এই পদটি যদি সরকার মনোনীত ৩ জন প্রার্থীর মধ্য হইতে বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে সে ব্যবস্থার ফলে সরকারের অভীষ্ট প্রার্থীও উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে গণতন্ত্রের মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

(২) স্বপদ অধিকারের বলে (Ex-Officio) জনশিক্ষা বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরগণ বোর্ডে নিযুক্ত হইতেছেন। এমতাবস্থায়, আমাদের মনে হয় বোর্ডে উক্ত

বিভাগ কটির অন্য কোন অফিসারকে গ্রহণ না করাই সঙ্গত। টেকনিক্যাল শিক্ষা বিভাগ হইতে যখন একজন নির্ব্বাচিত সদস্যকেই গ্রহণ করা হইতেছে, তখন আবার উক্ত বিভাগেরই প্রধান ইন্‌স্পেক্টরকে মনোনীত করা কী প্রয়োজন। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ বশতঃ যদি উক্ত সকল কর্ম্মচারীকেই বোর্ডে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের মতে বোর্ডের বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা সমানুপাতে আরও কিছু বৃদ্ধি করা বিধেয়।

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্নশাখার বিশেষ অভিজ্ঞতাযুক্ত ৬ জন শিক্ষাব্রতীকে সরকার স্বনিযুক্ত কর্ম্মচারী হিসাবে বোর্ডে গ্রহণ করিবেন বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। এই সুপারিশের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো বক্তব্য নাই, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবেই সমর্থন করি। তথাচ একটি বিষয়ে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিতেছি না—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ৬ জনকেও যেন বেসরকারী ক্ষেত্র হইতেই মনোনীত করেন। অবশ্য আমাদের নিজেদের তরফ হইতে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি না, সরকারী কর্ম্মচারীদের যোগ্যতার প্রতি আমরা অশ্রদ্ধ নহি। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ইংরেজ শাসকদের কল্যাণে ‘সরকারী’ এই আভধারই উপরে আমাদের শিক্ষিত সাধারণ জনগণ এত বেশী বীতশ্রদ্ধ হইয়া আছেন যে, খুব বেশী সরকারী উপাদান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে গৃহীত হইলে সম্ভবতঃ তাহারা সরকারের মূল পরিকল্পনাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকিবেন। জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে এইরূপ সংশয়পূর্ণ পথে অগ্রসর না হওয়াই আমাদের মতে সঙ্গত।

(৪) বেসরকারী স্কুলসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সংসদগুলি হইতে মাত্র তিনজন সদস্যকে বোর্ডে গ্রহণ করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। সরকারের এই সুপারিশটিকে আমরা কিন্তু খুব সুপরিকল্পনাসম্মত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। সমগ্র বঙ্গদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচারের জন্য এতাবৎ যত চেষ্টা হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক হিসাব নিলে আমরা দেখিব যে, সে চেষ্টারই মূলে আছে উক্ত স্কুল সমূহের পরিচালক মণ্ডলীরই নিঃস্বার্থ অবদান। নিছক আদর্শের দিক দিয়া অবশ্য মনে হয় যে, বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব বুঝি প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদেরই। কিন্তু বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে, অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীই এখনও পর্য্যন্ত সাধারণ বৈতানিক মনোভাবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। দেশের শিক্ষার প্রচার ও উন্নয়নের জন্য এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। এই কারণেই আমরা প্রস্তাব করি যে, বোর্ডে স্কুল সমূহের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্যদের সংখ্যা প্রধান শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদেরই সংখ্যার অনুরূপ করা হোক্।

(৫) অতঃপর বোর্ডের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি এবং স্বীকৃতিদান কমিটি (Recognition committe) এই দুইটির গণতন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি মোট ১৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। ইহাদের অর্দ্ধেক সংখ্যাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের, এবং উক্ত কমিটির উর্দ্ধতন পদগুলিও প্রায় সবকটিই থাকিবে সরকার-নিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারে। এ ব্যবস্থায় উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ জনসাধারণের তরফ হইতে সন্দেহ করা হইবে। জনপ্রিয় শাসক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে এই সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। উক্ত কমিটি হইতে দুইজন সরকারী কর্ম্মচারীকে কমাইয়া কমিটির সভাপতিকে যদি আমাদের প্রস্তাবমত নির্ব্বাচন দ্বারা মনোনীত করা হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস, জনগনের উক্ত সন্দেহের কতকাংশে নিরসন হইবে।

রিকগ্‌নিশান কমিটির গঠন সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিরই অনুরূপ। ৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত এই কমিটিতে বেসরকারী সদস্য আছেন মাত্র তিন জন এখানেও সরকার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বেসরকারি শিক্ষাব্রতীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের কাছে আমাদের নিবেদন যে,আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাব কটি যেন বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদ বলিয়া বিবেচিত না হয়। গণতান্ত্রিক সরকারের নূতন পরিকল্পনাটির মধ্যে যাহা ভাল মন্দ আছে, আমরা সাধারণের হিতার্থেই তাহা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিতে চাই।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কে. ভি. আপ্পারাও

STUDENTS' S.G.A. COMMON-ROOM

গণতন্ত্র ও গণ-স্বাধীনতা (প্রবন্ধ)	...	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	২৮১
একদা এমনি রাতে (কবিতা)	...	লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস	২৮৭
বিপ্লবী (গল্প)	...	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৮৮
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় (প্রবন্ধ)	...	শ্রীননীমাধব চৌধুরী	২৯৬
আত্মসাৎ (গল্প)	...	শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ	৩০১
ঠিকানা (কবিতা)	...	সত্য দাস	৩০৪
ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গান্ধার পদ্ধতি (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	৩০৫
ত্রাতা (কবিতা)	...	শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩১২
দিদিরাণীর ঘাট (উপন্যাস)	...	শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	৩১৩
পদাবলী সাহিত্য ও লীলাতত্ত্ব (প্রবন্ধ)	...	শ্রীকালিদাস রায়	৩১৭
শবাচ্ছাদন (গল্প)	...	মুন্সী প্রেম চন্দ	
	...	অনুবাদ : পারুল ঘোষ	৩২২
বসন্ত-বরণ (কবিতা)	...	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৩২৬
কারেণ-বিদ্রোহের ইতিহাস (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৩২৭
ম'ন (Mon) জাতির উপকথা (কাহিনী)	...	শ্রীভুপেন্দ্রনাথ দাস	৩৩০
প্রেম আসে (কবিতা)	...	বিভূতি মণ্ডল	৩৩২
জংলা মাঠের ফসল (উপন্যাস)	...	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৩৩৩
স্বর্গ হইতে অবতরণ (কবিতা)	...	শ্রীজনরঞ্জন রায়	৩৩৯
ব্যাপক বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রস্তাব (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	সন্তোষকুমার দে	৩৪০
শরৎচন্দ্রের "শেষের পরিচয়" (সাহিত্যালোচনা)	...	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৩৪৪
প্রথম পরশ (কবিতা)	...	শ্রীমন্মথনাথ সরকার	৩৫২
আনাক্সাগোরাস (প্রবন্ধ)	...	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৩৫৩
ত্যাগ (গল্প)	...	এ্যাণ্টন চেকভ	
	...	অনুবাদ : শ্রীমৃগাঙ্ক রায়	৩৫৫
নূতন স্বর্গ (কবিতা)	...	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৩৫৬

পরিব্রাজক কামনীত (অনুবাদ উপন্যাস)…কার্ল গিয়েলারপ্

… অনুবাদ : শুদ্ধোধন সেন ৩৫৭

ভারত-মহীয়সী সরোজিনী নাইডু

(সচিত্র জীবনী) … ৩৬৩

সম্পাদকীয়— ৩৬৫

মুক্তি-যজ্ঞের প্রধান হোত্রী সরোজিনী নাইডু ; দমদম-রাহাজানির শিক্ষা ; বিপদমুক্ত ভারতীয় রেল ; রেলওয়ে বাজেট ; কেন্দ্রীয় বাজেট ; ক্ষমতা-প্রাপ্ত কংগ্রেস ও আচার্য্য কৃপালনী ; 'আজাদ-কাশ্মীর'-এর অভ্যন্তরে ; পরলোকে কিরণশঙ্কর রায় ; ব্রহ্মদেশ কোন্ পথে ? শ্যামদেশের হাল-চাল ; সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরে পরিবর্ত্তন ; যশোহরে মাইকেল-জন্মোৎসব ; পরলোকে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

চিত্র-সূচী

একবর্ণ—

গুরুমশাই ফটো—ডাঃ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধান্তর্গত—

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গান্ধার পদ্ধতি— ৩০৫

'বারানসী' বুদ্ধ ; 'মথুরা' বুদ্ধ ; 'গান্ধার' বুদ্ধ।

কারেণ-বিদ্রোহের ইতিহাস— ৩২৭

নৃত্যের পূর্ব্বে সুসজ্জিতা কারেণ রমণী ; সুসজ্জিত কারেণ যুবক।

ব্যাপক বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রস্তাব— ৩৪০

দশ খানি চিত্র।

ইম্পিরিয়াল টি কোং

৪, রাজা উড্‌মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ

খুচরা ও পাইকারী খরিদ্দারগনের

একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গশ্রী

ষোড়শ বর্ষ — চৈত্র—১৩৫৫ — ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

গণতন্ত্র ও গণ-স্বাধীনতা*

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী,

শিক্ষিত সজাগ ও কল্যাণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন নাগরিকই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি, একথা বলাই বাহুল্য। আজ আমরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি, আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক—আজ যদি আমরা পৌর-চেতনা-সম্পন্ন না হই, তাহা হইলে আমাদের স্বতন্ত্রতার কোন অর্থই থাকে না।

গণতন্ত্রের শিক্ষাই পৌরধর্ম্মের শিক্ষা। কিন্তু যে রাষ্ট্রে গণ-চিত্ত-বিকাশের ব্যবস্থা নাই, যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাহাদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অচেতন, পৌর-বিজ্ঞানে যাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া চলে না।

প্রাচীন গ্রীসে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পেরিক্লিসের সময়ে এথেন্সে পৌর-বিজ্ঞান শিক্ষার যে সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা ছিল, কোনও আধুনিক গণতন্ত্রে সে প্রকার কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই। গ্রেট বৃটেন সম্প্রতি এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে স্থাপিত 'পৌরবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'ই ইহার পরিচয়।† প্রাচীন গ্রীসের ছোট ছোট ষ্টেটগুলিতে শিক্ষার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার পক্ষে হয়তো বিশেষ কোন বাধা ছিল না। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের আকার ও

* গণতন্ত্র ও গণ-স্বাধীনতা শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম পর্ব্ব বঙ্গশ্রীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

† পাশ্চাত্যের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Sir R chard Livingstone তাঁহার 'Education for world Adrift' গ্রন্থে একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, গ্রেটবৃটেনের মত রাষ্ট্রেও পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই: "There is a plenty of bad citizenship in Britain, and if we ware asked what training in citizenship Britain gives, we might hesitate to *answer*. In the last century, if the idea occurred to anyone, it interested very few. The foundation of the Associatien for education in Citizenship in 1935 is perhaps the first sigh of recognition."

প্রকার ভেদে হয়তো এইরূপ ব্যাপক আয়োজন সম্ভবপর নয়—এ তর্ক অনেকে তুলিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সংবাদপত্র ও রেডিয়োর যুগে এইরূপ উক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। পেরিক্লিসের সময়ে এথেন্সের গণতন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। আজিও আদর্শ গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করিতে গেলে আগেকার সেই প্রাচীন যুগের এথেন্সের দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। ম্যাথু আরনল্ড (Matthew Arnold) বলেন যে, কালের পরিমাপে কোন যুগকে প্রাচীন বা আধুনিক আখ্যা দেওয়া চলে না। নানা দিক দিয়া বিচার করিলে পেরিক্লিসের যুগকে আধুনিক না বলিয়া উপায় নাই। ব্যষ্টি জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে এমন সুন্দর ও সহজ সংযোগ আর কোন কালে দেখা যায় না। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সার্ব্বিক-ঐক্য-চেতনাই এথেন্সের গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। পেরিক্লিস গর্ব্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"His countrymen attend both to public and private duties and do not allow absorption in their own business to interfere with the knowledge of state's affairs."

কিন্তু আজ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গর্ব্ব করিয়া এ কথা বলিতে পারে না।

আজ ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ এত প্রবল যে, গণ-সমাজ কখনও রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মবোধসম্পন্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ বহুবিধ: তাহার মধ্যে প্রধান অর্থ-নৈতিক অসামঞ্জস্য ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা। গণতন্ত্র পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দিয়া ধনবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্যকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, কালক্রমে এই বৈষম্যই গণতন্ত্রের মহৎ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য শুধু তো নাগরিকগণকে ভোটাধিকার ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতাদান নহে। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য জনসমাজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাষ্ট্রগত ঐক্যবুদ্ধি জাগরিত করা। ধনবৈষম্যকে নির্ম্মূল করা গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য না হইলেও সেই ধনবৈষম্যকে প্রশ্রয় দিয়া সামাজিক জীবনে ঐশ্বর্য্যের শক্তিকে স্বীকার করিয়া সমাজের অপর অংশকে পঙ্গু করিয়া রাখাই আজ গণতন্ত্রের চরম দুর্ব্বলতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যান্য বিষয়গুলি বাদ দিয়া ধনতান্ত্রিক বৈষম্যকে দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে যদি আমরা প্রশংসার চক্ষে দেখি, তবে রাশিয়া যে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বলা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না।*

দ্বিতীয়তঃ আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা: যতই দেশ বিজ্ঞান ও শিল্পাভিমুখী হইতে থাকিবে, ততই আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ব্যাপক হইতে থাকিবে। প্রাচীন কৃষি যুগে জীবনযাত্রা অনেক সহজ ছিল, কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে জীবনযাত্রা নানাপ্রকারে জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হইয়াছে। সেই জটিলতার জন্যই শাসন-ব্যবস্থাও জটিল ও আমলাতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে। বিখ্যাত লেখক E. N. Forster বলেন—

"Bureaucracy, in a technical age like ours, is inevitable. The advance of science means the growth of bureaucracy and the reign of the expert."

আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুণেই রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। রাষ্ট্র বলিতে সাধারণতঃ জনসমাজ আমলাতন্ত্রকেই বুঝিয়া থাকে। কারণ এই আমলাতন্ত্রের মর্জ্জির উপরই জনগণের সুখ-সুবিধা সমস্ত নির্ভর করিয়া থাকে। আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি ও শক্তির অপব্যবহারে জনচিত্ত ক্রমাগত

---

* C. M. Allen তাহার বিখ্যাত Democracy and the Individual গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "I imagine that most Russians would assent to it (the statement that Russia being based on a one-party government cannot be considered democratic). Some Russians, however, might say that since 1936 Russia has had a constitution, which in form atleast, comprises most of the ordinary democratic arrangements, and that she has gone much further towards true democracy (according to one interpretation of it) than any other modern country by having established a real or supposed classless society."

ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে, গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে নাগরিকগণ বিচ্যুত হয়। আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে সুবিধাবাদী ধনী সম্প্রদায় সকল প্রকার সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারেন, ধনহীন সম্প্রদায় সেই পরিমাণে সকল সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে থাকেন। বর্ত্তমান রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রই সমাজ-জীবনের নিয়ামক হইয়া ওঠায় ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ প্রতিপদে ব্যাহত হইতেছে। বিশেষতঃ যদি রাষ্ট্রের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী-অনুমোদিত আমলাতন্ত্র হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। গণ-তান্ত্রিক আদর্শ এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর চাপে পড়িয়া ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। বর্ত্তমান যুগে আমরা এই আমলাতান্ত্রিক শাসনের কবলে রাষ্ট্র-শক্তির অপব্যবহার কি পদে পদে অনুভব করিতেছি না?

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিই হইতেছে চেতনা-সম্পন্ন জনশক্তি। এই গণশক্তির সম্পূর্ণ জাগৃতি ব্যতীত রাষ্ট্র কয়েকটি শক্তিকামী সুবিধাবাদীর হাতের ক্রীড়নক হইয়া ওঠে। অজ্ঞ জন-সমাজকে ধোঁকা দিয়া শ্রেণী-প্রভুত্বের জোরে প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদের আসন কায়েম করিয়া লইতে পারেন, আবার তাহাদের প্রতিরোধও করিতে পারে সুষ্ঠু ও সবল জনমত। শক্তিশালী জনমতই গণতন্ত্রের সাফল্যের হেতু। যে রাষ্ট্রে জনমত বলিয়া কিছু নাই, শাসনতন্ত্রের চাপে যেখানে জনমত নিষ্পিষ্ট, সে রাষ্ট্র স্বাধীন হইলেও জনগণ সেখানে পরাধীন ছাড়া কিছুই নহে স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতা হইতে জনগণের মুক্তি। যতক্ষণ না জনগণ আর্থিক পরাধীনতা হইতে মুক্ত হয়, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা তাহাদের কাছে একান্ত মূল্যহীন। তাহাদের স্বাধীন মত বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তিও তাহাদের থাকে না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোই এই অবস্থার জন্য দায়ী! এই জন্যই জনগণের শুধু উদরান্নের ব্যবস্থা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সর্ব্বপ্রকার মালিকানাস্বত্ব বর্জ্জিত ও রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জনগণ কখনও স্বাধীন মত গঠন করিতে পারে না। আমেরিকার বিখ্যাত লেখক Herbert Agar এবিষয়ে একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন—

"If the state provides all the jobs, the state will in the end provide all the ideas. In a truly Communist or Socialist State, the *state has power over all men's support, and therefore over all men's wills.* All the absolutions of to day, like those of the past testify to the wisdom of Lord Acton's sentence,—"*all power corrupts and absolute power corrupts absolutely.*"

প্রকৃত কম্যুনিষ্ট বা সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্রে জনমত বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সেই জন্য উক্ত লেখকের মতে জনশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়।—

"A man can only be free politically if he has property rights in a job or in some form of control over part of the means of production. Any political system, claiming to create freedom which ignores the fact is based on false pretentes If will, either collapse in efficiency or it will move inexorably towards a system of slavery."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জন-সমাজকে একমাত্র মুক্তিদান করিতে পারে আদর্শ গণতন্ত্র। কিন্তু কোথাও বর্ত্তমান গণতন্ত্র জনমুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত নয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই গণতন্ত্রের এই দুর্ব্বলতার অবকাশে সর্ব্বদেশেই কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট সম্প্রদায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছে। আজ গণতন্ত্রকে বাঁচাইতে হইলে জনমুক্তির আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। বিগত মহাযুদ্ধের নিদারুণ আঘাতেও গণতন্ত্র টিকিয়া আছে, ইহাই গণতন্ত্রের শেষ কথা নয়। গণতন্ত্রের শেষ কথা সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতা হইতে জনগণের মুক্তি। শুধু গণতন্ত্রের গালভরা বুলি আওড়াইয়া জনগণকে উদার আশ্বাস দিয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। হয় আমাদের গণতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা কম্যুনিষ্ট বা সোস্যালিষ্টদের জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় পন্থা নাই।

এখন প্রশ্ন, কি করিয়া গণতন্ত্রকে প্রকৃত আদর্শানুগ ও উন্নীত করিয়া তোলা যায়। প্রথমতঃ রাষ্ট্র কি এবং কি প্রকার উন্নতির জন্য আমরা চেষ্টা করিব, তাহা আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। রাজনীতির দুইটি দিক আছে, প্রথমতঃ জনমত গঠন, দ্বিতীয়তঃ সেই জনমতকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা। সুগঠিত জনমতই প্রকারান্তরে জাতীয় নীতি। জনমত-নিরপেক্ষ জাতীয় নীতি জনমত-বিরোধী ছাড়া কিছুই নহে। যদি কোন রাষ্ট্রনীতি একক ব্যক্তি ও তদীয় উপদেষ্টা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, তবে তাহাকে প্রকৃত পথে গণতান্ত্রিক নীতি বলা চলে না। ইহা একনায়কত্বেরই নামান্তর। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা এইটুকুই বুঝি যে, রাষ্ট্রশক্তির অপপ্রয়োগ নহে বা ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থসাধনের অস্ত্রও নহে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বলিতে আমরা প্রকৃত অর্থের বিপরীত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকি। অধ্যাপক Carl Freiderich রাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"It is a set of activities organised by and operated on behalf of the people, but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which goes with such governance is not abused by those who are called upon to do governing."

ইহাই গণতন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। যাহারা শাসনতন্ত্রের রশ্মি ধরিয়া অটল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা দানের জন্য কতকগুলি বাধানিষেধের প্রয়োজন। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Who will watch the watchman ?" কিন্তু কাহারা চৌকীদারের উপর চৌকীদারী করিবে ? গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া কমন্সসভা চৌকীদারী করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রকার চৌকীদারী গণ-স্বাধীনতার পরিপোষক নহে। বিশেষতঃ আধুনিক কালে বৃটিশ পার্লামেন্টকে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকেই নারাজ।

কী গ্রেট বৃটেন, কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কোথাও গণ-প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সুষ্ঠু পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় না। কারণ দলীয় চক্রান্তের ফলেই জনগণের হাত হইতে সেই ক্ষমতা বিশেষ শ্রেণীর হাতেই আসিয়া বর্ত্তায়। অধ্যাপক Henry J. Ford যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিয়াছেন যে—

"Whatever assigns to the people power, they are unable to weild, takes it away from them."

তাহা হইলে জনমুক্তি কি সুদূরপরাহত ? জনমুক্তির নামে দলীয় চক্রান্ত ও স্বার্থসিদ্ধির কূটচক্র ব্যাহত করিবার কি কোন উপায় নাই ?

উপায় নিশ্চয়ই আছে। যতক্ষণ না আমরা রাজনীতিকে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের কবল হইতে ছিনাইয়া আনিতে পারিতেছি, যতক্ষণ না আমরা রাজনীতিকে প্রকৃত মানব-নীতির মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র আমাদের পরাধীনতার চরম কলঙ্ক বহন করিতে থাকিবে। মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

এ কথা সত্য যে, স্বাধীনতা কখনও নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা হাত ধরাধরি করিয়াই চলে; কিন্তু এই দুইয়ের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান আজিও হয় নাই। তাই কোন রাষ্ট্রকেই আমরা সুসমঞ্জস বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তাই যখন আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোকে বৃটেন ও আমেরিকার আদর্শে গড়িতে চাহেন বলিয়া আশ্বাস দেন, তখন কি তাঁহারা একবারও মনে ভাবিয়া থাকেন যে, বৃটিশ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বিফলতা ও দুর্ব্বলতাটুকু বাদ দিয়া যাহা কিছু কল্যাণপ্রদ ও মানবধর্ম্মানুমোদিত, শুধু সেইটুকুই গ্রহণ করিবেন। অনুকরণ মাত্রই ব্যর্থ—যদি না সেই অনুকরণ আপন মৌলিকতার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। ভারতবর্ষে কখনও গণতন্ত্র ছিল কিনা তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। ভারতের প্রাণধর্ম্ম জনকল্যাণ ও জনমুক্তির মধ্যেই নিহিত।

STUDENTS D.G.A.

ভারতের রাজতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কোন রাজতন্ত্র জনকল্যাণের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা জাতীয় পতাকায় 'ধর্মচক্র' গ্রহণ করিয়াছি, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বুদ্ধের গণ-মুক্তির আদর্শকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। বুদ্ধের জীবন কি তদানীন্তন গণ-বিরোধী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়? রাজ-প্রাধান্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে কি মানবধর্ম-প্রণোদিত প্রচণ্ড বিপ্লব নয়? আজ আমাদের রাষ্ট্রগঠনে সেই জনকল্যাণের মহান আদর্শকেই গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারলেই গণ-তন্ত্রের সার্থকতা। মানবাত্মার মহিমার ভিতর দিয়া বিশ্বসংহতির আশা সুদূরপরাহত নহে। আজ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলি যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ব-সংহতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তবেই হয়তো বিশ্বশান্তি সম্ভব হইয়া উঠিবে। বর্তমানের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এই কথারই উক্তি করিয়াছেন :—

"We can build a politics consonant with man's dignity, and we may even hope in time to unite the world in the name of that dignity."

আমাদের ভারতীয় সমাজ কাহাকেও কোনদিন ঘৃণা করে নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম সত্ত্বেও আমাদের সমাজ এমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীরই এক একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ছিল। শুধু বৃত্তি দ্বারা নহে, মানুষের মনুষ্যত্বব্যাপক মর্য্যাদা দান ভারতীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কালক্রমে নানা আঘাতে সংঘাতে আমাদের সমাজের সেই সুদূরপ্রসারী উদারতা সংকীর্ণতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে মানুষের মর্য্যাদাবোধ জাগরিত হইয়াছে, আমাদের দেশে মানুষের মর্য্যাদাবোধের ভিত্তি তদপেক্ষা গভীরতর। একদা ধর্মবোধের চেতনায় মানুষে মানুষে ঐক্যের সেতু রচিত হইয়াছিল, আবার সেই ধর্ম্মবোধের বিকৃতিতে সেই মর্য্যাদাবোধ একান্তভাবে ব্যাহত ও খণ্ডিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি মানুষের ধর্ম বা নৈতিক চেতনাকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু ধর্ম্মের বিকৃতি যখন রাষ্ট্রকে হনন করিতে চাহিয়াছে, তখনই রাষ্ট্র ধর্ম্মান্ধতাকে খণ্ডিত করিয়া স্বয়ংক্রিয় হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে। তাই আজ কোন বিশেষ ধর্ম রাষ্ট্রপরিচালনার অঙ্গ নহে। কোন বিশেষ ধর্ম রাষ্ট্রের অঙ্গ না হইলেও বৃহত্তর মানবধর্ম্মের উপরই সকল রাষ্ট্রের ভিত্তি। আজ এই মানবধর্ম অর্থাৎ বৃহত্তর নৈতিক চেতনা পদে পদে খণ্ডিত হইতেছে বলিয়াই রাষ্ট্রও পদে পদে ব্যর্থ হইয়া চলিয়াছে। আজ মনুষ্যত্বের মহিমা কতিপয় স্বার্থান্ধ শক্তিকামী সুবিধাবাদীর চক্রান্তে ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। আজ সর্ব্বদেশেই রাষ্ট্রের মধ্যে একদল কুচক্রী রহিয়াছে, যাহারা গণ-কল্যাণের মুখোস পরিয়া মানুষকে মুখের অন্ন হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। এই সব পুঁজিপতি শিল্পপতি দালালেরাই আবার রাষ্ট্রের নিয়ামক। ইহাদের চক্রান্তেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আজ বিচ্ছেদ, রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমাজের বিভেদ। অথচ রাষ্ট্র ইহাদের বাদ দিয়া চলিতে পারে না—ইহারাই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধারণ করিয়া আছে। ইহাদেরই চক্রান্তে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়, যুদ্ধ সংঘটিত হয়, রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যে বিরোধ বাধে। ইহারাই প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের শত্রু। অথচ ইহাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রবল বিপ্লবের প্রয়োজন, তাহার জন্য কোন রাষ্ট্রই প্রস্তুত নয়। তাহার কারণ জনশক্তি উদ্বুদ্ধ নয়। সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য জনমত ইহাদের নিকট বিক্রীত হইয়া আছে। সুতরাং সকল রাষ্ট্রেই সমস্যার উপর শুধু সংস্কারের পলস্তারা লাগাইয়া সমাধানের পাঁয়তারা ভাঁজিয়া জন-সমাজের প্রকৃত দাবীকে দাবাইয়া রাখা হইতেছে।

সমাজের ও রাষ্ট্রের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও অসামঞ্জস্যের জন্যই দ্বিতীয় মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। আজ সমরাবসানেও সমাজে ও রাষ্ট্রে কি সেই বিকৃত অবস্থার পরিচয় আমরা পাইতেছি না? পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলি স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যুদ্ধজয়ের পরেও কি তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত

বিকৃতিগুলিকে তাহারা প্রশ্রয় দিয়া চলিতেছে না ?* তাহা না হইলে গণতন্ত্রগুলির মধ্যে জনমতের সঙ্গে রাষ্ট্রের সামঞ্জস্য হয় না কেন ? কেন দেশে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য, কেন মুদ্রাস্ফীতি, কেন দারিদ্র্যের অসহায় দুর্ব্বলতা, কেন বণ্টনের অনৈক্য ? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? যে দুর্গত জনসমাজ দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই মারাত্মক প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সুযোগ কই ? আইনের নাগপাশে কিংবা স্তোকবাক্যে তাহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ।

দেশের মধ্যে সুগঠিত জনমত নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাজনীতির প্রকৃত ধারণা জনসমাজে নাই, পৌরবিজ্ঞানে দীক্ষা নাই, সুতরাং রাষ্ট্র-চেতনারও অভাব। যে জনসমাজের ভোটের জোরে তাহাদের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র-সভায় আসন গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই জনসমাজের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পান না। অথচ জাতীয় নীতির প্রবর্ত্তক তাঁহারাই।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমাজের অন্তরের যোগ নাই বলিয়াই জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি হৃদ্যতার ভাব পোষণ করে না। অথচ রাষ্ট্রের সাফল্যের জন্যই হৃদ্যতাপূর্ণ যোগাযোগ একান্ত আবশ্যক। আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকের সঙ্গে সেই রাষ্ট্রের কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত সেই বিষয়ে পাশ্চাত্যের এক চিন্তানায়ক কি বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"The ideal state is one where every citizen is determined to be part of the community, to share its burdens, to put its interest before his own, to sacrifice, if need be, his own wishes, convenience, time and money to it."

(Sir Rechard Livingstone)

রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সর্ব্বস্বত্যাগ— নাগরিকের এই সমস্ত গুণগুলি যে আদর্শ রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য যেমন জনগণকে সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা করা ও দায়িত্ব-সম্পন্ন করিয়া তোলা, জনগণের কর্ত্তব্যও তেমনি রাষ্ট্রের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করা। যখন এই দ্বৈত শুভ-বুদ্ধির সংযোগ ঘটে, তখনই আমরা প্রকৃত কল্যাণের আশা করিতে পারি।

কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্রের গঠনই এইরূপ যে নাগরিকেরা তাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগই পায় না। সুতরাং তাহাদের চিন্তার ভার গুটিকয়েক রাজনীতি-ব্যবসায়ীর হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই জন-সাধারণের মধ্যে শৈথিল্য ও নৈরাশ্যবাদ আসিয়া দেখা দেয়। সুতরাং এই নজিরেই আমরা বলিতে পারি যে, রাষ্ট্রকাঠামোর জটিলতার জন্যই নাগরিকগণের রাষ্ট্রচেতনা ক্রমাগত ব্যাহত হইতে থাকে। অবশেষে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছে, রাজনীতি শুধু সুবিধাবাদীর হাতে ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। এই অবস্থার জন্য দায়ী শুধু জনসমাজ নয়, দায়ী দেশের রাষ্ট্রও। রাষ্ট্র যদি তারস্বরে কেবলই ঘোষণা করিতে থাকে যে, জন-সাধারণের কিছুমাত্র ভাবিবার প্রয়োজন নাই, জন-সাধারণের সমস্ত চিন্তার ভার রাষ্ট্রের উপর, রাষ্ট্রই তাহার ভাবনা ভাবিয়া দিবে, তাহা হইলে সে রাষ্ট্র যে শুধু জনসমাজকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে তাহা নয়, গণ-চেতনার মূলেও কুঠারাঘাত করে।

গণতন্ত্রের অস্তিত্ব শুধু জনসাধারণের দাবী-স্বীকারে নয়, জনগণকে সক্রিয় ও জাগ্রত করিয়া তোলায়। আধুনিককালের মনীষিগণ সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন।—

'Democracy, to be healthy, must offer not only rewards, but *tasks*.' (C. M. Allen). 'The catch-word that "state was made for man, not man for the state", legitimate as a protest against the tyranny of totalitarianism, must not be used to cover a denial of social obligation. (E. H. Carr.)

নাগরিক হইবার শক্তি সকলেরই আছে। কিন্তু তাই বলিয়া জন্মের দাবীতেই কেহ ভালো নাগরিক হইয়া উঠিতে পারে না। ইংরাজীতে একটি কথা আছে : "Citizens are made, not born." জনসমাজকে

* প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-ঘোষিত চারদফা স্বাধীনতা কার্য্যকরী হইতেছে না,—জনগণ আজ এই প্রশ্ন তুলিতে পারে। ইউ, এন, ও তাঁহার কি জবাব দিবেন ?

নাগরিক করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার রাষ্ট্রের। সেই জন্যই পৌরবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন এত অধিক, তাহে দেখা দিয়াছে। ভালো নাগরিক হইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন নাই। যে শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত না করিয়া বিশ্বতোমুখী করে, যে শিক্ষা মানুষের জনসমাজকে একজন বলিয়া ভাবিতে প্রেরণা দেয়; যে শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল করিয়া তোলে, সেই শিক্ষাই আমাদের প্রয়োজন।

"Education is a trinity, and one of members is training in citizenship."—(Sir Richard Livingstone). গণতন্ত্রই মানুষের স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র। গণতন্ত্রই শিক্ষাকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে। "Education must be *free intellectually*, for there is no bondage of mind or spirit more ruinons than the inspired indoctrination of the young which is now practised by totalitarian systems."—(C. M Allen).

"শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ অনুশীলনের দ্বারা যে রাষ্ট্র জনসমাজকে যতখানি দায়িত্বশীল ও রাষ্ট্রচেতনাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিবে, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহার সাফল্য। উনিশ শতকের ব্যক্তি-প্রভুত্ববাদ আজ আমাদের আদর্শ নয়। ব্যক্তি-প্রভুত্ববাদকে প্রশ্রয় দিয়া উনিশ শতকীয় মনোভাব সমাজ-সংহতির মূলে যে কঠিন আঘাত হানিয়াছিল, তাহা আজ দূর করিতে হইলে সার্বিক গণচেতনা উদ্বোধনের প্রয়োজন। গণতন্ত্র ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্র হইলেও ব্যক্তি-প্রভুত্বপদের ক্ষেত্র নয়। সমষ্টির কাছে ব্যষ্টির ত্যাগ আজ বরণীয়। সমাজ সংহতির জন্য ব্যক্তি-স্বার্থ আজ মূল্যহীন। গণতন্ত্রের বিভীষিকাই এই ব্যক্তি-প্রভুত্ববাদ। এই বিভীষিকা দূর না হইলে ধনবৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্য কিছুতেই দূর হইতে পারে না। সুতরাং যে আগামী সমাজের কল্পনা আমরা করিতেছি তাহা ব্যক্তি-প্রভুত্ববাদে কলঙ্কিত নয়, উদার মানবিকতার উপর তাহার ভিত্তি; সে রাষ্ট্র জনসমাজের আছে দায়িত্বশীল আর সার্বিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজও সে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল। ইহাই নবযুগের নতুন রাষ্ট্রপরিকল্পনা।

"Popular authority as much as popular liberty will be Key-note of the New Faith." (E. H. Carr

---

একদা এমনি রাতে

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

নীরব নিশীথে ঘুমায়ে পড়েছে সবে,
কোন সাড়া নাই : নীরব নিথর গ্রাম,
বেণুবনতলে ঝিল্লীর কলরবে
আমি একা শুধু কান পেতে রহিলাম।

মনে হোল মোর একদা এমনি রাতে
কালো ছায়া মাখা সে এক দূরের গাঁয়
একখানি হাত এসেছিল এই হাতে
নীরব নিশীথে বকুল বনের ছায়।

অনেক বছর তারপরে গেছে চলে,
সে গাঁয়ের পথে যাওয়া-আসা আর নাই।
সে রাতের কথা গিয়েছিনু বুঝি ভুলে,
আজি মনে পড়ে স্মরণের সীমানায়।

ভুলের খাতায় যে কথা হয়েছে লেখা :
একদা নিশীথে বিদায় নিল যে ক্ষণ,
নীরবে নিশীথে বসিয়া আজিকে একা
সেই কথা কেন মনে হোল অকারণ?

বিপ্লবী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ঘরখানিও যে বেশীদিন টিঁকবে, তা মনে হয় না। সনাতন মাঝে মাঝে জীর্ণ চালাখানার পানে তাকান, মাঝে মাঝে নড়বড়ে বাঁশের খুঁটিগুলা পরীক্ষা করেন, এবার বর্ষায় যে এ ঘর টিকবে সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ হয়।

বারান্দায় বসে তামাক খেতে খেতে তিনি উদাস চোখে তাকান। চালায় খড় নাই, অনেক জায়গা ফাঁক হয়ে গেছে, বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। সেদিনকার আচম্বিত কালবৈশাখীর ঝড়ে ওদিককার চালাখানা ভেঙে পড়েছে, বৃষ্টির জলধারায় সমস্ত ঘর ভেসে গেছে।

সেদিন মাত্র মোহিতের খবর পাওয়া গেছে, একখানা পত্র বহুকাল পরে এসেছে, তাতে সে জানিয়েছে যে শীঘ্রই আসবে, সাতদিনের ছুটি পেয়েছে সে।

খবরটা সনাতন সকলকেই জানিয়ে দিয়েছেন। এত বড় আনন্দের কথা তিনি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারেন নি।

মোহিত আসছে—

আঙুল গুণে গুণে হিসাব করেন তিনি—কত দিন সে গেছে। রমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন—"আজ বছর তিনেক মোহিত বাড়ী ছেড়ে গেছে,—না রমা—?"

রমা পিতামহের কথায় হাসে—"কি যে বল দাদু, বছর তিনেক কই গো, বছর দেড়েক হল কি হয়নি। সেই যে সেদিন—একটা পৌষমাসের বিষ্যুদবার দাদা চলে যাবে, তুমি বলেছিলে পৌষমাস বিষ্যুদবারে বাড়ী ছেড়ে যেতে নেই। দাদা হেসেছিল—তোমায় যে ও কি বলেছিল মনে নেই? তার পর মাঝে গেছে এই পৌষমাস, আর এই তো সবে জ্যৈষ্ঠমাস যাচ্ছে।"

দাদু সচকিত হয়ে ওঠেন—তাই তো, তাঁরই ভুল হয়ে গেছে বটে।

কিন্তু দেড়টা বছর—তাই বা কি কম? মোহিত বলে গেছে চাকরীর সন্ধানে যাচ্ছে, এর মধ্যে মাঝে মাঝে সে টাকাও পাঠিয়েছে, এক জায়গায় নাকি তার কাজ নয়, তাকে আজ এখানে কাল ওখানে করে ঘুরতে হয়, তাই কখনও করাচী, কখনও বম্বে, কখনও পুণা, কখনও জব্বলপুর, যোধপুর হতে তার প্রেরিত টাকা আসে।

দাদু রাগ করেন,—"কি এমন চাকরী বাপু, একটা মাস কোথাও টিঁকে থাকতে পারে না। আর এমনই বা কি চাকরী যাতে দুদিনের জন্যেও বাড়ী আসা যায় না? এই তো কত লোক চাকরী করে, সবাই তো বাড়ী আসতে পায়—আর মোহিতের এমন চাকরী যে চাকরীতে লাগা পর্য্যন্ত একটা দিনের জন্যে বাড়ী আসতে পারলে না?"

তারপর পরম দুঃখে বলেন, "ও কি কখনও এত কষ্ট সয়েছে রে রমা? কতকাল নিজের হাতে ভাত মেখে খাইয়েছি,—খিদের সময় যে খেতে না পেলে বিশ্ব রসাতলে দিতো, সে এখন কোথায় খাচ্ছে, কি করছে, খেতে পাচ্ছে-কি পাচ্ছে-না, কেই-বা জানবে বল। এই তো দেশের কাছে কলকাতা যেখানে লাখো লাখো লোক কাজ করছে, সেখানে যে একটা চাকরী পেলে না?"

কথাটা ঠিক,—এখান হতে ঘণ্টা দুইয়ের পথ কলকাতা, হাজার হাজার লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছে,—তারা বাড়ী আসছে প্রতিদিন, আর তাঁর নাতি—সে কি না চাকরীর জন্য গেল কোন সুদূরে।

সময় সময় বিরক্ত হয়ে বলেন, "তুই বরং লিখে দে-রমা, টাকার আমার দরকার নেই, সে দেশে ফিরে আসুক বাপু, যা হয় করে দিন চলবে।"

এই দুইটি নাতি-নাতনীই বৃদ্ধের জীবনের সম্বল। কতদিন বারান্দায় ঠেস দিয়ে বসে সনাতন দেখেন সেই দূর অতীতের স্বপ্ন। সোনার সংসার, চাঁদের হাটবাজার। আশা করেছিলেন শেষ বয়সে পুত্রের মাথায় সংসার চাপিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজন কাশীবাসী হবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

একদিন যেন ঘুম ভেঙে উঠে সনাতন আশ্চর্য্য-চোখে দেখলেন তাঁর সবই গেছে। স্ত্রী আগেই গেছেন, তারপর পুত্র, পুত্রবধূ, আর সব নাতি-নাতনী;—গেল জমী-জমা, বাগান-পুকুর, কে যে কোনদিক দিয়ে এ সব গ্রাস করলে তত্ত্বাবধানের অভাবে—তাঁর শোক ও

বার্দ্ধক্যের সুযোগ নিয়ে, তা তিনি কিছুই জানতে পারেন নি।

জ্ঞান ফিরে এলো মোহিত ও রমার আহ্বানে, ছোট দুইটী ছেলে মেয়েকে উপলক্ষ্য করেই আবার তিনি গড়ে তুললেন তাঁর ক্ষুদ্র সংসার।

দেনার দায়ে বাড়ী ছেড়ে আসতে হল এই পর্ণকুটীরে —তবু সান্ত্বনা রইলো তাঁর পৌত্র পৌত্রী দুটি। জগদীশের শেষ দান।

কাঁদতে যান তিনি, কে যেন গলা টিপে ধরে। দেখলেন তাঁকে নির্ভর করে আছে দুটী শিশু, তাদের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য ফুরোয় নি, সংসার তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে।

বৃদ্ধ সনাতন ঝিমিয়ে স্বপ্ন দেখেন,—অদ্ভুত স্বপ্ন, জগদীশ অফিস হতে বাড়ী এসেছে। সনাতন শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন, "বউ মা, পা ধোওয়ার জল আর গামছাখানা দাও মা—সংসারের কাজ এখন থাক।"

রমার খিল খিল হাসিতে তিনি সচকিত হয়ে উঠেন।

"দাগো মা, তুমি দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখছো দাদু, কাকে ডেকে ফরমাস করছো শুনি?"

সনাতন লজ্জিত মুখে কেশবিরল মাথায় হাত বুলান, রমার দিকে চাইতে পারেন না।

আচমকা এসে পড়লো একটা খবর—একেবারে অপ্রত্যাশিত খবর—রমার স্বামী সুন্দর আই. সি. এস হয়ে এসেছে এবং এই জেলায় সে কাজ পেয়েছে।

আজকের দিনের রায় বাহাদুর অঘোরনাথ মুখার্জ্জি কয়েক বৎসর আগে ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ লোক, যেদিন তাঁর পুত্র সুন্দরের সঙ্গে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জগদীশের শ্যামলা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধে নি।

গভর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টির ফলে অঘোরনাথ সামান্য হেড কনষ্টেবল হতে উন্নীত হয়ে বর্ত্তমানে পুলিসের একজন নাম করা অফিসার, এবং তাঁহার পুত্র সুন্দর আজ একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট।

সনাতনের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—"শুনছিস রমা, সুন্দর বিলেত হতে ফিরেই এই জেলায় হাকিমের কাজ পেয়েছে?"

রমার মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে, সে আস্তে আস্তে সরে যায়।

ধনান্ধ রায়বাহাদুরকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পরে না, সুন্দরকে পর্য্যন্ত নয়। একদিন ছিল যেদিন রমা কলকাতায় যাওয়ার জন্য উৎসুক ছিল, কিন্তু এখন সে দিন নাই। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝেছে—সে কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্তা হয়েছিল—ভগবানকে ধন্যবাদ, সেখানকার অন্ন সে দাঁতে কাটে নি।

সে জানে তার ও সুন্দরের মাঝে জাগছে অনন্ত ব্যবধান; সে ব্যবধান অর্থের, সে ব্যবধান সৌন্দর্য্যের, সে ব্যবধান পদমর্য্যাদার।

সনাতন নিজে পত্র লিখতে পারেন না, পৌত্রীকে অনুনয় করেন, "একখানা পত্র দে, পত্র পেলে সে নিজেই একবার আসবে।"

কঠিন মুখে রমা মাথা নাড়ে,—"না—"

সনাতন যেন আকাশ হতে মাটিতে পড়ে যান; হাঁপিয়ে উঠে তিনি কতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করেন, "কিন্তু কেন—কেন লিখবি নে?"

আর্দ্র কণ্ঠে রমা উত্তর দেয়—"টাকাকেই যারা অনেক উপরে স্থান দিয়েছে দাদু, মানুষকে যারা চেনে না, আমার ভাইদের জেলে দিয়েছে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে যারা আজ খেতাব পেয়েছে, তারা আজ কি আমাদের চিনতে পারবে দাদু?"

দাদু কথাগুলো বুঝতে পারেন না, নির্ব্বাক বিস্ফারিত চোখে পৌত্রীর পানে তাকিয়ে থাকেন।

রমা বলে চলে, "আমরা গরীব, তারা ধনী, লক্ষপতি আমায় তারা গ্রহণ করতে পারবে কি? যারা বিয়ের পর আর কোন খবর নিলে না, আমি কোন্ মুখে তাদের পত্র লিখব দাদু?

স্নেহময় দাদু হাঁফান—

যাদের হাতে করে মানুষ করেছেন, তারা এতখানি কাছে থেকেও যেন কতখানি সরে গেছে।

মোহিত যখন বাড়ী ছিল, তার কত বন্ধু-বান্ধব

আসতো, কি সব কথা-বার্ত্তা তারা বলতো, জিজ্ঞাসা করলে মোহিত হেসে উড়িয়ে দিতো—"তুমি সেকেলে লোক, এ সব কিছু বুঝবে না দাদু।

রমাও ঠিক সেই কথাই বলে।

সেকেলে লোকই বটে। সনাতন মাথা চুলকান। বর্ত্তমান সময়ে সেকাল বাতিল হয়ে গেছে, সেকালকে আজ কেউ স্থান দিতে চায় না।

আর এই ধনী গরীবের পার্থক্য।

আজ অঘোরনাথ ধনী, অঘোরনাথ রায়বাহাদুর, আজ সুন্দর জেলার শাসনকর্ত্তা, আর তিনি? তিনি যেখানে ছিলেন, সেখান হতে গড়িয়ে পড়েছেন আরও নীচে, আরও তলায়—ঘনতম অন্ধকারের মধ্যে, সনাতনের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

ফিরেছে মোহিত—

রাত্রের অন্ধকারে বৃষ্টিধারার মধ্যে সে এসে দাঁড়ালো ঘরের দরজায়, কম্পিত হস্তে দরজায় আঘাত করে ডাকে, "দাদু,—রমা—"

"শোন শোন রমা—কে ডাকে, আমার মোহিতের গলা না—?"

ঘুম ভেঙ্গে বৃদ্ধ সনাতন বিছানায় উঠে বসেন, রমারও ঘুম ভাঙ্গে, প্রদীপ জ্বালতে জ্বালতে সে জিজ্ঞাসা করে—"কে?"

বাহির হ'তে মোহিত উত্তর দেয়—"আমি, আমি মোহিত—"

"দাদা—"

রমা দরজা খুলতেই মোহিত ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ করে দেয়।

সনাতন ম্লান আলোয় তার পানে তাকান, মোহিত তাকে প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন—

"হ্যারে, এখন এলি? দিনের বেলা বুঝি ট্রেণ নেই,—একেবারে এই রাত্রে? রমা চট করে দুটো ভাত বসিয়ে দে, কে জানে কয়দিন খায়নি—কত দূর দেশ হতে আসছে—"

মোহিত হাসে, বলে, "কোন দরকার নেই দাদু, আমি কলকাতায় এসে স্নান করে খেয়ে বার হয়েছি। আজকাল যুদ্ধের হিড়িকে ট্রেনের যা গোলমাল তাই এসে পৌঁছালো এই রাত-দুপুরে, তারপর হেঁটে এই চার মাইল পথ আসা—যেমন অন্ধকার তেমনই বৃষ্টি। আমার জন্যে কিছু ব্যস্ত হতে হবে না।"

হাতের ছোট ব্যাগটা সে খুলে ফেলে—এক গোছা নোট বার করে দাদুর হাতে দিয়ে বললে, "এতে অনেক টাকা আছে দাদু,—কোনরকমে কিছুদিন এ দিয়ে তোমাদের চলে যাবে। হাজারখানেক টাকা তো, নিশ্চিন্তভাবে এখন থাকো, কি বল?"

সে আবার হাসে—

রমা শঙ্কিত হয়ে ওঠে তার হাসি দেখে—

দাদুও শঙ্কিত হলেন। পৌত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, "একেবারে এত টাকা দিচ্ছিস যে,—কেন, তুই কি কোথাও যাবি নাকি?"

মোহিত হাসি মুখেই জবাব দেয়, "হ্যাঁ, আজ শেষ রাত্রেই আমার রওনা হতে হবে কি না, সকালে কলকাতায় পৌঁছেই যেতে হবে দেরাদুনে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে, টাকা ঠিক মত পাঠাতে পারব কিনা তাও জানিনে, সেই জন্যেই বেশী করে টাকা দিয়ে গেলুম—"

সনাতনের চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বাঁধে, হাঁপিয়ে উঠে তিনি বলেন, "কিন্তু তুই যে বলেছিলি কয়টা দিনের ছুটি নিচ্ছিস, সে কয়টা দিন তুই এখানে থাকবি?"

দাদুর পায়ে হাতখানা রেখে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিতে দিতে মোহিত বললে, "তা আর হল না দাদু, সাহেব, মোটে ছুটি দিলে না; বললে, এখন এত বড় যুদ্ধ চলছে, এ সময় কাউকে ছুটি দেওয়া হবে না। তাই তো বলছি—দেব একদিন লালমুখোদের জব্দ করে, একেবারে সমুদ্রের ওপারে রেখে আসব—"

শশব্যস্তে দাদু বাধা দেন, "চুপ চুপ, কেউ শুনতে পাবে। যা আজকাল দিন চলেছে, ওদের সম্বন্ধে একটা কথা কেউ বললেই হাতে হাতকড়ি পড়বে। আর

দরকারই বা কি বল? ওরা রাজার জাত, যা খুসি তাই করতে পারে, আমরা কোনদিন তাতে একটা কথা বলিনি—"

মোহিত বাধা দেয়—"হ্যাঁ, বলিনি, বলেই আজ ওরা যা খুসি তাই করে যাচ্ছে দাদু। এই যে আগষ্ট-বিপ্লব সুরু হয়েছে, এ কি বড় কম অত্যাচারের ফল? তুমি মনে কর সেই নীলকরদের সময়কার কথা,—তার পর দিনের পর দিন কি না করছে ওরা,—আরও কি সইতে পারে মানুষে? মানুষ আজ ক্ষেপে গেছে, অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে তারাও দাঁড়িয়েছে, তারা এদের—"

সনাতন অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন, "চুপ কর, তুই চুপ কর মোহিত, আর ও সব কথা বলিসনে। আমরা চিরদিন রাজভক্ত-জাত, আমরা চিরদিন—"

বিকৃত হাসি হাসে মোহিত—"চিরদিন ওদের পায়ের তলায় পড়ে লাথি সইব,—দাদু, আমরা চিরদিন বলব—তুমি মারো, তোমার পায়ে যেন লাগে না—"

রমার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সনাতন হিসাব করেন—ঘরখানা সারাতে কত খরচ পড়বে!

রমা অন্যমনস্ক ভাবে রান্নার ব্যবস্থা করে।

শেষ রাত্রেই মোহিত চলে গেছে। তখনও আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে বৃষ্টি-ধারা নেমে আসছিল।—পথ ছিল জনশূন্য, এমন কি শৃগাল-কুকুর অবধি এ রাত্রে বার হয়নি।

রমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে সে বলেছিল, "দাদু কিছু না জানলেও, তুই তো সবই জানিস রমা—আমি রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী, আমায় ধরবার জন্য পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমি একটাদিন কোথাও থাকতে পাইনে, সুস্থিরভাবে খেতে ঘুমাতে পাইনে—তবু—"

"দেশসেবার জন্য এ রকম অনেক বেদনা দুঃখই সইতে হয় দাদা—"

রমার কথা শেষ হয় না, উৎফুল্ল মোহিত তার হাত দু'খানা চেপে ধরে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, "তা হলে তুই এ জন্যে তোর দাদাকে ভালো বল্‌লি রমা?"

রমা ম্লান হাসি হাসে, বলে, "দেশসেবার পুরস্কার এই পরাধীন দেশে এ-ই দাদা, তাকে শিয়াল-কুকুরের অধম হয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে, সে খেতে পাবে না, সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতেও পাবে না। তবু এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও দেশসেবক তার ব্রত ভুলে যায় না, তার মন্ত্র হারায় না। এই দৃঢ়তা নিয়েই সে চলেছে, বেত খাচ্ছে, পদাঘাত সইছে, তা ছাড়াও কত আছে পৈশাচিক নির্য্যাতন—যা মুখ বুজে সে সইছে, কত সময় চরমদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে, তবু সে অচঞ্চল, তবু সে মায়ের বন্দনাগান গাইছে। ভারতের মুক্তি তার সাধনা—এ সাধনা ব্যর্থ হবে না দাদা, যদি ভারত কোনদিন স্বাধীন হয়, সে স্বাধীনতা আসবে তোমাদের এই আত্মদানে।"

মোহিত দৃপ্তকণ্ঠে বলে, "আসবে রমা, ভারতের মুক্তির দিন অবশ্য আসবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, সে দিনের বিলম্ব নেই। এই কোটি কোটি নির্য্যাতিত ভারতবাসীর একাগ্র সাধনায় নিদ্রিত নারায়ণকে জাগতেই হবে,—এদের একাগ্র কামনায় ফলেই এ অন্ধকার দূর হবে, পুব আকাশে আমরা নূতন সূর্য্য দেখতে পাব। কেউ এ মুক্তি ঠেকাতে পারবে না—শত অত্যাচার সহস্র নির্য্যাতন কিছুতেই এই জাগ্রত মানুষকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না; এ তুই দেখে নিস। যদি বেঁচে থাকি, যদি আবার ফিরতে পাই, সেদিনকার মুক্তি-উৎসবে আমিও যোগ দেব রমা। কিন্তু যদি—"

বলতে বলতে সে থেমে যায়, রমার মুখের পানে তাকায়।

"কিন্তু যদি না ফিরতে পারো—যদি না বাঁচতে পাও—"

রমা উৎসুক চোখে দাদার পানে তাকায়।

একটু হেসে রমার মাথায় হাতখানা রেখে মোহিত বললে, "হ্যাঁ, কিন্তু তাতেই বা দুঃখ কি, মায়ের বেদীমূলে আমরা শহীদ হব, এই তো আমাদের কাম্য রমা।"

মানুষ মরণশীল, তবু আমরা মরব না, আমাদের এই মরণশীল নশ্বর দেহটা ধ্বংস হ'লেও আমরা বেঁচে থাকব তোদের মনে, আমরা বেঁচে থাকব ভারতের আকাশে বাতাসে, প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে। যদিই চলে যাই, তুই ডাক দিস রমা, আমার সাড়া পাবি। আমি তো কোথাও যাব না বোন, এই ভারতের মাটি ছেড়ে আমি স্বর্গে যাওয়ার কামনাও তো কোনদিন করিনি ভাই।"

রমার চোখ ছাপিয়ে জল উপচে পড়তে চায়, অতি কষ্টে সেই জল সামলাতে সামলাতে সে বলে, "দাদা, ভোরের বাতাস বইছে।"

চমকে ওঠে মোহিত—

ভোরের বাতাস বইছে, অন্ধকার এখনই ফিকে হয়ে যাবে। কে জানে এই অন্ধকারের মধ্যেও কোথায় দাঁড়িয়ে আছে পুলিস, লাফ দিয়ে তার উপরে পড়বে।

ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন দাদু, তাঁকে ডাকা হল না।

সন্ত্রস্তভাবে মোহিত বলে, "আমি চললুম রমা। এই ম্যাপ আর কাগজপত্রগুলো তোর কাছে দিতে এসেছি। কোনদিন প্রদ্যোৎ নামে একটী ছেলে আসবে, তার হাতে এগুলো দিবি। এর মধ্যে যদি খোঁজ পেয়ে পুলিস সার্চ করতে আসে,—দেখিস রমা—আমাদের অনেক পরিশ্রমলব্ধ ফল,—আমাদের এ-সব যেন পুলিসের হাতে না পড়ে, তার চেয়ে যদি নেহাৎ না রাখতে পারিস, পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিস। মনে রাখিস, এগুলো যদি পুলিস হাতে পায়, কেবল একা তোর দাদা নয়, তোর অনেকগুলি ভাইকে হারাবি।"

রমা নিঃশব্দে তার হাত হতে কাগজপত্র নিলে।

তারপর—তার মাথায় হাতখানা রেখে অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারণ করে মোহিত নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

এলো পুলিস—

একজন আধজন নয়, দল বেঁধে এলো, লালপাগড়ীতে সমস্ত গ্রাম ভরে গেল, নিরীহ গ্রামবাসী ভয়ে কাঁপতে লাগলো,—

তারা ধরতে এসেছে মোহিতকে; তারা সন্ধান পেয়েছে বিপ্লবী মোহিত বাড়ী এসেছে।

বিপ্লবী—বিপ্লবী মোহিত, রাজদ্রোহী সে—?

দাদুর পা দুখানা থর থর করে কাঁপে—তিনি দাঁড়াতে পারেন না, কাঁপতে কাঁপতে একবার আর্ত্তকণ্ঠে ডাকেন—"দিদি,—রমা—"

অকুণ্ঠ পদে রমা এসে দাঁড়ায় তাঁর পাশে, তাঁর মাথায় হাতখানা রাখে, সান্ত্বনার সুরে বললে, "হ্যাঁ দাদু, মিছে কথা নয়, সত্য কথা। কিন্তু এ জন্যে কেন তুমি ভয় পাচ্ছো দাদু? রাজদ্রোহিতাকে আজ অপরাধ বলা চলে না, কারণ সেই সত্যধর্ম্মপালক রাজা তো আজ নেই। যে বিদেশী ছলে বলে কৌশলে আমাদের দেশ জয় করেছে, সে কোনদিন আমাদের উপর ভালো ব্যবহার করেছে কি? তুমি তো অনেক পড়েছো, অনেক জানো দাদু, সেই পুরাতন দিন হতে আজ পর্য্যন্ত তুমি দেখ,—কি আছে আমাদের, কি রেখেছে ওরা? আমাদের ঘরে আজ অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই, হাতে একটি পয়সা নাই, সকলের চেয়ে বড়—নাই আমাদের স্বাস্থ্য। আমাদের দেশে বছরের হিসাব দেখ কত লোক জন্মেছে আর কত লোক মরেছে। দাদু, এমনই করে দিনে দিনে তিলে তিলে মরণের চেয়ে একেবারে মরণ ভালো, সে কথাটা মনে করো।"

সনাতন বিস্মিত চোখে তার দৃপ্ত মুখখানার পানে তাকিয়ে থাকেন। এই মুহূর্ত্তে হঠাৎ যেন তাঁর সত্য জ্ঞান জাগে,—এক নিমেষে সত্যের শো সাতার হতে বর্ত্তমান বৎসরের চিত্র তাঁর চোখের সামনে জেগে ওঠে।

পুলিশ ঢুকে পড়ে বাড়ীর মধ্যে—

নিষ্ঠুর ভাবে অনুসন্ধান চলে,—ঘরের সমস্ত জায়গা তারা দেখে, সমস্ত তচ্-নচ্ ক'রে ফেলে,—এমন কি রান্নাঘরের হাঁড়ি, কড়া, কৌটা সব তারা দেখে, সব উঠানে গড়াগড়ি যায়।

গরীব গৃহস্থের বড় কম ক্ষতি হয় না,—

রমা দাঁতের উপর দাঁত রেখে দৃপ্ত চোখে কেবল তাকিয়ে থাকে, বৃদ্ধ সনাতন শুষ্ক হাতে তাঁর হাতখানা কেবল ধরে রাখেন, যেন রমাকে কেউ তাঁর হাত হতে ছিনিয়ে না নিতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমনামা, ম্যাজিষ্ট্রেট—এস-মুখার্জির স্বাক্ষর—

রমা স্বাক্ষরটার পানে কেবল তাকায়; তার চোখে আগুন জ্বলে।

সুন্দর আজ হুকুম দিয়েছে, তার স্ত্রী এখানে আছে তা সে জানে। রমার স্বামী সুন্দর, সে আজ এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, হুকুম করবার ক্ষমতা তার আছে।

অফিসার প্রশ্ন করেন—"মোহিত কাল রাত্রে এসেছিল, শেষ রাত্রে সে চলে গেছে?"

রমা উত্তর দেয়, "আমি জানি নে।"

অফিসার কিছুতেই তার মুখ হতে কোন উত্তর আদায় করতে পারলেন না; সনাতনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে রমা দেয় না, সে নিজেই উত্তর দেয়।

ব্যর্থ হয়ে পুলিস চলে গেল,—

যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেল—যেমন করেই হোক তারা মোহিতকে গ্রেপ্তার করবেই, সেদিন তারা এদের দেখে নেবে।

পুলিস চলে যায়—

কাঁপতে কাঁপতে সনাতন শুয়ে পড়েন, নিঃশব্দে রমা তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলাতে থাকে। জিনিসপত্র যেমন বিশৃঙ্খল ভাবে পুলিস ছড়িয়ে গেছে, তেমনই পড়ে থাকে।

খবর পাওয়া গেল মোহিত ধরা পড়েছে।

বিচারে যা ফল হবে তা রমা জানে—বিচারে হবে তাঁর প্রাণদণ্ড,—মোহিতের হবে ফাঁসি, মোহিত দোলা খাবে ফাঁসির দড়িতে।

রমা স্তব্ধ হয়ে থাকে—

সনাতনের কাছে এক সময় সে গিয়ে দাঁড়ায়—"আমি আজ একবার সহরে যাব দাদু, রাত্রের মধ্যে আবার ফিরে আসব; এইটুকু সময় তোমায় একাই থাকতে হবে—কেমন?"

"সহরে যাবি—সহরে—"

বৃদ্ধের দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, রমার হাত দু'খানা তিনি কম্পিত হাতে চেপে ধরেন—রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুই যাবি রমা?—একটীবার সুন্দরের কাছে যাবি, যদি সে কোনরকমে মোহিতকে ছেড়ে দিতে পারে—?"

রমা শুষ্ক হাসি হাসলো, বললে, "তার কি ক্ষমতা আছে দাদু? তবু তুমি যখন বলছো—আমি যাব।"

প্রতিবেশী নটবরকে সঙ্গী করে রমা যাত্রা করলে সহরের দিকে।—

দেখা করতে চায় সে মোহিতের সঙ্গে, যদিও সে জানে না দেখা হবে কি না।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর সামনে দাঁড়ালো গ্রামের মেয়ে রমা—সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী—?

দারোয়ান হাঁকিয়ে দেয়—"দেখা হবে না।"

বিচারক মুখার্জি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, নিজের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সাবধান।

রমা দৃঢ় কণ্ঠে জানায়—তুমি সাহেবকে জানাও, আর আমার নাম লিখে দিচ্ছি—এটা নিয়ে গিয়ে দাও; যদি তিনি নিজে আমায় চলে যেতে বলেন আমি যাব।"

নিজের নাম সে পাঠিয়ে দেয়।

ভিতর হতে আদেশ আসে—এখন দেখা হবে না। অপমানিতা রমা,—মুখখানা তার লাল হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে সে ফিরে আসে। মোহিতের সঙ্গে তার দেখা হল না, তার কাগজপত্র কেউ নিয়ে যায় নি, তা জানানো হল না।

সনাতনের কাছে এসে সে দাঁড়াল—

সাগ্রহে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "সুন্দরের কাছে গিয়েছিলি রমা, সে মোহিতকে ছাড়বার কথা কিছু বললে?"

রমা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ,—দেখা করেছি, বললে যত শীগগির পারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

বৃদ্ধ সনাতন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—"ওই দেখ, ভাগ্যে গিয়েছিলি; যদি না যেতিস্—কিছুই হতো না। হাজার হোক একটা জেলার হাকিম, তার ক্ষমতা কত, তার হাঁক-ডাক কত। একটু চেষ্টা করলেই সে মোহিতকে মুক্তি দিতে পারবে—"

বৃদ্ধ স্বপ্ন দেখেন—

এবার অতীতের স্বপ্ন নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন—সোনার,—মোহিত এসেছে, সুন্দর এসেছে,—তাঁর রমা রাজরাণী

হয়েছে। গ্রামের লোক ভেঙে এসেছে দেখতে, কত আশীর্ব্বাদই না তারা করছে।

ভগবান, এ স্বপ্ন যেন সত্য হয়—যেন সত্য হয়।

দিনের পর দিন যায়—

বিচার চলছে, বিচারের ফল যা হবে তা জানা যায়, তবু রমা উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

দাদুকে ভুলিয়ে রাখার সকল চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল একদিন—

কে এসে খবর দিয়ে গেল—মোহিতের ফাঁসির হুকুম হয়েছে—

"রমা—"

একটা চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন।

দুদিন সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থায় থেকে তৃতীয় দিন নিঃশব্দে সনাতন চোখ মুদলেন।

রমা উজ্জ্বল চোখে শুধু চেয়ে রইলো দাদুর মুখখানার পানে, কাঁদতে সে পারলে না—।

এক সঙ্গেই সে হারালো তার দাদু ও দাদাকে—জগতে যে দুজন তার আশ্রয়স্থল ছিলেন, দুজনই বিদায় নিলেন জগৎ হতে,—রমার স্থান কোথায়? রমা কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

আবার তাকে উঠতে হবে, আবার কাজ করতে হবে—কিন্তু তাই কি সম্ভব?

রমার অন্তর হতে একটী মাত্র শব্দ ওঠে—"দাদু, দাদা—"

কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে তার দেরী হল না।

কয়টা দিন অনাহারে অনিদ্রায় ঘরের মধ্যে কাটিয়ে যে রমা সেদিন সকালে বাইরে এসে দাঁড়াল, সে রমাকে দেখে কেউ যেন চিনতে পারে না।

হাত তার শূন্য, সাথির সিঁদুর সে মুছে ফেলেছে, শাড়ী ছেড়ে দাদুর থান পরেছে।

অকম্পিত পদে রমা সামনের পথ ধরলো। অচেনা পথ হোক, এই পথই হয়ে যাবে পরিচিত, যারা আছে আজ অপরিচিত, তাদের সঙ্গেই হবে তার পরিচয়। রমা পথে চলে—

রাত দুপুরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে যায়—ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মুখার্জ্জি বেড-সুইচ হাতড়ান, কম্পিত হাতখানা বৃথাই হাতড়ে মরে, সুইচ খুঁজে পান না।

ঘরে কে প্রবেশ করেছে, স্পষ্ট তার পায়ের শব্দ শোনা গেছে, এখনও তার চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে—

"কে, কে ঘরে ঢুকেছো—"

সঙ্গে সঙ্গে বেড সুইচ টিপতেই দপ করে আলোটা জ্বলে ওঠে—।

ধড়পড় করে উঠতে যান মিঃ মুখার্জ্জি—

কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"উঠো না, চুপ করে শুয়ে থাকো বলছি, নড়লেই গুলি করব—"

নারী-কণ্ঠস্বর—

তুচ্ছ করা যেত, কিন্তু চোখ মেলতেই দেখা যায় কপালের সামনে উদ্যত রিভলভার—মিঃ মুখার্জ্জি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান, নড়বার পর্য্যন্ত সাহস হয় না।

জিজ্ঞাসা করেন, "কে তুমি—কে—?"

একটা মিষ্ট হাসির শব্দ ভেসে আসে—"চিনতে পারলে না; আমার পরিচয় আমি দিচ্ছি—আমি এক নির্য্যাতিতা বাংলার মেয়ে, তোমার অত্যাচারে আমি সব হারিয়েছি, আমার দাদু, আমার ভাই, এমনকি নিজেকেও। অন্ততঃ পক্ষে নিজেকে ফিরে পাবার আশা আমি করছি, সেই জন্যে"

"তুমি—তুমি—রমা—"

মিঃ মুখার্জ্জি উঠবার চেষ্টা করেন, রমা গর্জ্জন করে ওঠে—"চুপ, যেমন রয়েছো তেমনই থাকো, নচেৎ এখনই গুলি করবো।"

হতাশ কণ্ঠে মুখার্জ্জী বললেন, "তুমি আমায় খুন করবে রমা—আমি তোমার স্বামী, স্বামীকে হত্যা করতে এসেছো—চমৎকার, জগতে একটা দৃষ্টান্ত থেকে যাবে। লোকে সতী সীতা সাবিত্রীর গল্প শোনে, আর তুমি—"

রমা ধমক দেয়—"চুপ, ও-সব নাম মুখে এনো না,

আর ও-কথা বলে আমায় ভুলাবার চেষ্টা করো না। তুমি স্বামী আমি স্ত্রী নই—আমি জানি আমি বিধবা—আমার স্বামী বহুদিন আগে মরে গেছে—তাই আমি থান পরেছি, সিঁদুর তুলে ফেলেছি, আজ তুমি আমি কেউ নই—তাই দেশের শত্রু, দেশের শত্রুকে পথ হতে সরানোর ভার পেয়ে আমিই এসেছি।"

দুর্জয় মুখার্জ্জী নড়তে পারেন না, একান্ত অসহায়ভাবে কেবল চেয়ে থাকেন।

রমা বলে যেতে লাগলো—"আজ হতে এক বছর আগে যখন আমার ভাইয়ের বিচারের ভার প্রথম তোমার হাতে আসে, তখন ভিখারিণীর মত তোমারই করুণা-প্রার্থিনী হয়ে তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম, তুমি আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত কর নি—সে-কথা মনে পড়ে কি? তারও আগে তোমার হুকুম নিয়ে পুলিস আমাদের বাড়ী গিয়ে সার্চ করতে আমাদের কত ক্ষতি করে এসেছিল, আমাদের কি অপমান করেছিল—সে-সবই মনে আছে। বিপ্লবী আমার ভাই ফাঁসিতে প্রাণ দিলে, আর আমার বাবা সেই খবর পেয়ে মারা গেলেন। তারপর—তারপর আমি নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করে নিলুম,—বিপ্লবী দলে আমিও যোগ দিয়েছি। হাঁ, তোমায় হত্যা করবার ভার আমার উপর পড়েছে, আমি তোমায় হত্যা করতে তাই আজ এসেছি—।"

একটা অস্ফুট চীৎকার করে ওঠেন মুখার্জ্জী—"পারবে—পারবে রমা?"

একটু হেসে রমা উত্তর দেয়, "কেন পারব না—দেশের কাজে নেমে দেশের শত্রুকে সরিয়ে দিতে আমার এতটুকু ভয় হবে না, সঙ্কোচও জাগবে না। তোমার কাছে যে সব প্রমাণ এসেছে আমার আরও ভাইদের সম্বন্ধে, সে-সব আমি তোমার ড্রয়ার হতে সংগ্রহ করেছি, এখন শুধু—"

আর্ত্তকণ্ঠে মুখার্জ্জী চীৎকার করে ওঠেন, "না না, আমায় মেরো না রমা, অমনভাবে আমায় হত্যা করো না। আমি কথা দিচ্ছি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি কাজ ছেড়ে দেব, আমি তোমায় নিয়ে তোমার কথামত যে কোন জায়গায়—"

রমা বাধা দেয়, ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলে, "থাক, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে। প্রস্তুত হও, তোমার ভগবানকে স্মরণ কর—আর নয়—"

"এক, দুই, তিন—" চললো, অকম্পিত হস্তে রমা রিভলভার ছোড়ে, অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি মিঃ মুখার্জ্জীর বক্ষ ভেদ করে গেল—

"ওঃ!"

একটা চীৎকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মুখার্জ্জী ছটফট করতে থাকেন, তার পর আস্তে আস্তে তিনি নিশ্চল হয়ে পড়েন—

ললাটের ঘাম মুছে রমা ফিরে দাঁড়ায়।

রমা ধরা পড়েছে—

স্বেচ্ছায় সে ধরা দিয়েছে—

মিঃ মুখার্জ্জীকে হত্যা করেছে—স্বীকার সে করেছে। মিথ্যা কথা সে বলেনি, মিঃ মুখার্জ্জীর আরদালী সে প্রমাণ দিয়েছে।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে রমা—
আদালত তার পরিচয় চায়—
রমা নির্ব্বাক থাকে, পরিচয় সে দেয় না।

মুখ ফুটেই সে বলে, "পরিচয়ের কোন দরকার নেই; আমি মিঃ মুখার্জ্জিকে খুন করেছি, সে কথা যখন স্পষ্টই স্বীকার করছি, আর এই বিচার প্রহসনের লাভ কি? আমার ফাঁসির হুকুম দিন—আর কিছু আমি চাই নে।"

কিন্তু তবু চলে বিচার—এক দিন নয়, দুদিন নয়, চললো কতদিন।

অবশেষে এই বিপ্লবী মেয়েটীর প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হল।

প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, রমা হাসলো।

অন্ধকার কারাগৃহে হিসাব করে রমা—জীবনে লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখে সে।

ভগবানকে ধন্যবাদ—একটী কথা সে বলেনি, তার পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেছে। কেউ জানতে পারবে না—কত বড় জিঘাংসাবৃত্তি নিয়ে সে স্বামীকে হত্যা করেছে।

সতী মেয়েরা তাকে ঘৃণা করবে—তাতে রমার এতটুকু আসবে যাবে না। সে দেশের শত্রুকে হত্যা করেছে, একটী প্রাণ নিয়ে সে বহু প্রাণ রক্ষা করেছে, অনেক মা-বোন, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, স্বামীকে বাঁচিয়েছে।

এই মুহূর্ত্তে রমা মাথা নত করে—একটী প্রণাম—তার শেষ প্রণাম সে পাঠায় ভগবানের উদ্দেশে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

[দক্ষিণভারতের ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী]

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ডগোষ্ঠীর জাতিগুলিকে কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্যালী-মেডিটারেনীয়ান ও মেডিটারেনীয়ান এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণ-ভারতের লম্বামুণ্ডগোষ্ঠীকে এই নাম ছাড়া আরও কয়েকটি নাম দেওয়া হইয়াছে। একটি নাম basic dolichocephalic বা আদি লম্বামুণ্ডগোষ্ঠী। ইহাদের দ্রাবিড় নামটি সকলের পরিচিত। জার্ম্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেড ইহাদের এক অংশকে মেলানিড (Melanid) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যান্য অংশের নাম দিয়াছেন (Indid)। কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ইহাদিগকে নিষাদ বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার জন্য এই গোষ্ঠীকে দক্ষিণভারতীয় ভূমধ্যসাগরীয় জাতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ ভারতীয় মেডিটারেনীয়ান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-সকল মত প্রচলিত, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তর মিশরের প্রি-ডাইন্যাষ্টিক আমলের বাদারিয়ান বা প্রোটো-ইজিপ্সিয়ান টাইপের সহিত ইহাদের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এই জাতির বিস্তৃতির কথা উঠিয়াছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী রিপলের মতে ইহা Oriental expansion of the Mediterranean race প্রমাণ করে। পঞ্চানন মিত্র এই জাতির নামকরণ করিয়াছেন ইন্দো-ইরিথ্রিয়ান জাতি। সে যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অনেক গলদ দেখা যায়। এই ত্রুটি ক্রমে চোখে পড়িবে।

দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নিষাদ বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠি হইতে ইহারা উদ্ভূত হইয়াছে। এই মতবাদ Dravidian theoryর সঙ্গে যুক্ত। এই মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে মেসোপটেমিয়া, এলাম, আনাউ-তে যে জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহারা মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু এই গোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পরে নিষাদ গোষ্ঠীর সহিত রক্তের মিশ্রণের ফলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠী আদৌ বাহির হইতে আসে নাই, অন্যান্য গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফলে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে নিষাদ গোষ্ঠীর কতক অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত দলের পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিলে মেডিটারেনীয়ান নামটির ব্যবহার অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। এই মতের সহিত Dravidian theoryর সম্পর্কের কথা পরে বলা হইবে।

ইটালীয়ান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Giuffrida Ruggeriর মত অন্যরূপ। তিনিও Dravidian theory-তে বিশ্বাসী। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের এই গোষ্ঠীর সম্পর্ক দেখা যায় ইথিওপিয়ার অধিবাসীদিগের সহিত। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন Homo Indo-africanus Dravidius। জার্ম্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আইকষ্টেডের মতে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীর বৃহৎ অংশ মেলানিড গোষ্ঠীভুক্ত। মেলানিড শব্দ আইকষ্টেডের তৈয়ারী, ইহার অর্থ মেলানেশিয়ান-নেগ্রিড, অর্থাৎ উভয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতি। তাঁহার মতে এই মেলানিড গোষ্ঠী নিগ্রোগোষ্ঠীর পূর্ব্বশাখা (Indo-Negrid or eastern branch of the great Negro Race)। তামিল জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। দাক্ষিণাত্যের "কোলারীয়ান" জাতিগুলিও এই গোষ্ঠীভুক্ত। তামিলগণ দ্রাবিড় জাতি বলিয়া ভারতীয় ইতিহাসে পরিচিত কিন্তু আইকষ্টেডের মতে তামিল জাতি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাভাষি জাতিগুলি হইতে পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত।

এই মত কোন-কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তামিল জাতিকে নিগ্রো লক্ষণযুক্ত বলায় যাঁহারা আপত্তি করেন তাঁহাদের মধ্যে অদেশীয় একজন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্যালীটারেনীয়ান-গোষ্ঠীকে কতকগুলি নিগ্রো লক্ষণযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (Guha, Racial Elements in the Population of India p. 18)। হেডন ও রিচার্ডসের মতে দক্ষিণ ভারতের এই জাতি ও আদিম মেডিটারেনীয়ান জাতি এক গোষ্ঠীর। এই আদি মেডিটারেনীয়ান ও প্যালী-মেডিটারেনীয়ান এক বস্তু।

দক্ষিণ ভারতের মেডিটারেনীয়ান জাতির উৎপত্তির প্রশ্নে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের অভিমত ইহার অধিক আলোকপাত করে না।

মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর সহিত এই দক্ষিণ ভারতীয় জাতির সম্পর্ক প্রমাণ করিবার জন্য মেগালিথিক মনুমেন্টের প্রশ্ন উঠান হইয়াছে। ডাঃ গুহ বলিতেছেন যে, প্যালী-মেডিটারেনীয়ান কোন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইহারা নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে মেগালিথিক কৃষ্টি বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনেভেলী জেলার আদিত্যনাল্লুরে প্রাপ্ত মনুষ্য দেহের নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, এই টাইপ প্যালী-মেডিটারেনীয়ান টাইপ বটে। তাঁহার মতে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে যে-সকল স্থানে মেগালিথিক মনুমেন্ট দেখা যায়, সেখানে কোন মনুষ্যদেহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু de Terra দেখাইয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই সকল মনুমেন্ট নিওলিথিক আমলের। সুতরাং করোটি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা তাঁহার মত সমর্থিত না হইলেও তিনি অনুমান করিয়াছেন এ-গুলি প্যালী-মেডিটারেনীয়ানদিগের কীর্ত্তি। এই সকল যুক্তির সাহায্যে ডাঃ গুহ সম্ভবতঃ বলিতে চাহেন যে, এই গোষ্ঠী নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু জানা যায় যে, য়ুরোপে মেগালিথিক কৃষ্টির প্রভাব মেডিটারেনীয়ান ও আর্মেনীয়ান টাইপের সংমিশ্রণে উদ্ভূত আর্মেনয়েড বা প্রসপেক্টর জাতির কীর্ত্তি বলিয়া মনে করা হয়। আর আদিত্যনাল্লুরের যে জাতিকে তিনি প্যালী-মেডিটারেনীয়ান বলিতে চাহেন, তাহা অন্য কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আর্মানয়েড বলিয়া মনে করেন। সুতরাং মেগালিথিক কৃষ্টির কথা তুলিয়া এই দক্ষিণ ভারতীয় জাতির সহিত কোন সম্পর্ক প্রমাণ করা হয় না, তাহাদের বাহির হইতে আগমনের সময় সম্বন্ধেও কোন ধারণা করা যায় না। একজন দক্ষিণ ভারতীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই জাতি (তাঁহার প্রদত্ত নাম Indio) আট হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মধ্য এসিয়া হইতে দ্রাবিড় ভাষা বহন করিয়া এদেশে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহা সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ নিরপেক্ষ অনুমান মাত্র।

উপরে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের অভিমতের আলোচনা হইতে দক্ষিণ ভারতের যে গোষ্ঠীকে প্যালী-মেডিটারেনীয়ান বা Dravidian বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা গেল না। এখন এই দক্ষিণ ভারতীয় জাতির বিভিন্ন অংশের কথায় আসা যাউক।

প্রথমে ভাষার কথা বলা হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশপ ক্যাল্ডওয়েল প্রথমে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিকে একগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন এবং এই গোষ্ঠীর নাম দেন দ্রাবিড়। এখন এই ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭ কোটির কিছু বেশী। এই ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি আদিবাসী উপজাতির ভাষা ধরা হয়। কুরুখ, মাল্টো, গোঁদি, কুই বা কাঁধি, কোলামি প্রভৃতি আদিবাসীদিগের ব্যবহৃত ভাষা পণ্ডিতগণের মতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত, অষ্ট্রো এশিয়াটিক বা মুণ্ডা ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত নহে। ওঁরাওদিগের ভাষার নাম কুরুখ। ইহাদিগের প্রধান বাসভূমি বিহার ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি। ওঁরাওদিগের মধ্যে হিন্দু ও খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। ইহারা অনেকে হিন্দী বা উড়িয়া ভাষা ব্যবহার করে। মাল্টো বা মালের ভাষা প্রায় ৭০ হাজার আদিবাসী ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান আড্ডা সাঁওতাল পরগণা। কাঁধি বা কুই ভাষা

প্রায় ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার আদিবাসী ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান আড্ডা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী। মধ্য-প্রদেশের প্রায় ২৯ হাজার আদিবাসী কোলামি ভাষা ব্যবহার করে। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মধ্য ভারতের এজেন্সী এলাকা ও হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রায় ১৮ লক্ষ আদিবাসী গোঁদি ভাষা ব্যবহার করে। গোঁদি ভাষার অনেকগুলি শাখা আছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে কুরুখ ভাষার কানাড়ী ভাষার সঙ্গে ও মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং গোঁদি ভাষার তেলেগুর সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলা হয়।

আদিবাসীদিগের ব্যবহৃত এই সকল ভাষা ছাড়া অল্প সংখ্যক টোডা ও কোটা উপজাতির ভাষাকে দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে ধরা হয়। অন্ধ্র দেশের তেলেগু ও উহার শাখা ভাষাগুলিকে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে intermediate বা মধ্যবর্তী গ্রুপ বলিয়া পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। প্রায় ২ কোটি ৬৪ লক্ষ লোক অন্ধ্র ভাষা ব্যবহার করে। সাক্ষাৎ ভাবে দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয় তামিল, মলয়ালী, কানাড়ী, কোদাগু বা কুর্গী ও তুলু। তামিল ভাষা প্রায় ২ কোটি, মলয়ালী প্রায় ৯১ লক্ষ ২ হাজার, কানাড়ী ১ কোটি, কোদাগু প্রায় ৪৫ হাজার ও তুলু প্রায় ৬ লক্ষ লোক ব্যবহার করে। ইহার মধ্যে কানাড়ী ও কুর্গী এবং মলয়ালী ও তুলু সম্পর্কিত। তুলু দক্ষিণ ও উত্তর কানাড়া জেলায় ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ কানাড়ার প্রাচীন নাম তুলব ও উত্তর কানাড়ার নাম অহিক্ষেত্র। তুলব, হবিগ (উত্তর কানাড়ার কানাড়ী নাম) ও কেরলের ভাষা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

উপরে দেখা গিয়াছে যে 'দ্রাবিড়গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা' যে সকল আদিবাসী উপজাতি ব্যবহার করে, তাহারা সাঁওতাল পরগণা হইতে ছোটনাগপুরের মালভূমি ও তাহার সহিত সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য ভারতের পার্বত্য অঞ্চল হইয়া দক্ষিণে হায়দারাবাদ ও মাদ্রাজের পার্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই আদিবাসীদিগের প্রধান এলাকা। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা যাহারা ব্যবহার করে তাহাদের বাসভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় পশ্চিম উপকূলের কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণে দক্ষিণ মারাঠা দেশ। তাহার দক্ষিণে উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া। এই দুই জেলার পূর্ব্ব সীমানায় মহীশূর। কানাড়ার দক্ষিণে কেরল ও মহীশূরের উত্তরে বেলারী জেলায় কানাড়ী ও তেলেগু ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় সমান। বেলারী হইতে পূর্ব্ব উপকূল ধরিয়া গঞ্জাম পর্য্যন্ত অন্ধ্র ভাষাভাষীর অঞ্চল। দক্ষিণে তিনেভলী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে বিজগাপট্টম পর্য্যন্ত তামিলভাষাভাষীর অঞ্চল। যেমন বেলারী জেলায় কানাড়ী ও তেলেগু মিশিয়াছে সেইরূপ উত্তর আর্কট জেলায় তামিল ও তেলেগু মিলিয়াছে।

এইগুলি ব্যতীত ২ লক্ষ ৭ হাজার ব্রাহুই জাতি (বেলুচীস্থানের) দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলিয়া থাকেন।

এখন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ উপরের এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যাউক। এই আলোচনার প্রধান বিষয় দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানমতে এক গোষ্ঠীভুক্ত কি না তাহা অবগত হওয়া। দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিবাসীর কথা বলা হইয়াছে।

ভাষা হিসাবে পশ্চিম উপকূলের তুলু ও মলয়ালী, মালভূমির দক্ষিণ ভাগের কানাড়ী ও কুর্গী, উপদ্বীপ ভাগের ও পূর্ব্ব উপকূলের দক্ষিণ অঞ্চলের তামিল ও উত্তর অঞ্চলের তেলেগু ভাষাভাষীদিগকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক দলের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্যালী মেডিটারেনীয়ান নাম দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী বাদে এই চারিটি দলের লোকের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে ("the dominant type among Dravidian-speaking people")

প্যালী মেডিভিটারেনীয়ান টাইপের যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, রিজলের পরের দ্রাবিড়িয়ান থিওরীতে বিশ্বাসী নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত প্যালী-মেডিটারেনীয়ান টাইপের লক্ষণের বিশেষ পার্থক্য নাই। এই টাইপের লক্ষণের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে; লম্বা মুণ্ড,

মাঝারি দৈর্ঘ্য, কৃষ্ণবর্ণ, হালকা গড়ন, ছোট, মাংসল, চওড়া নাক, (disharmonious), মুখে ও দেহে চুল অল্প।

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীদিগের সঙ্গে যাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন এই বর্ণনা মিলে কি না। মলয়ালীভাষী নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের মত লোমশ মানুষ এদেশে আর আছে কি না সন্দেহ; সুতরাং মুখ ও দেহে অল্প চুল এই লক্ষণ এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায়। অবশ্য নম্বুদ্রিরা উত্তর ভারতীয় একথা অনেকে বলেন। কিন্তু দেখা যাইবে যে, ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যায়। সে যাহা হউক, প্যালী-মেডিটারেনীয়ান টাইপের মস্তকের ও নাসিকার মাপ (cephlic ও nasal index) দেওয়া হয় নাই। সাধারণ দ্রাবিড় জাতির বৈশিষ্ট্য লম্বা মুণ্ড ও মধ্যমাকৃতি (mesorrhine) নাসিকা এইরূপ বলা হয়। উপরে প্যালী-মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর লক্ষণের বর্ণনা হইতে মনে করা যাইতে পারে, এই দুইটি লক্ষণ এই গোষ্ঠীরও বৈশিষ্ট্য বটে।

এই দুইটি লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে কানাড়ী, কুর্গী বা কোদাগু তামিল, তেলেগু, মলয়ালী ও তুলু ভাষাভাষী-দের সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় দেখা যাউক।

প্রথমেই প্যালী মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর তালিকা হইতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোদাগু ভাষাভাষীদিগকে বাদ দিতে হইবে, কারণ ইহারা গোলমুণ্ড টাইপের। তারপর বাদ দিতে হইবে কানাড়ী ভাষাভাষীকে, কারণ ইহারাও সাধারণতঃ গোলমুণ্ড টাইপের। তামিলদিগের মধ্যে এক অংশকে বাদ দিতে হইবে, এই অংশ গোলমুণ্ড। তেলেগুদিগের এক অংশের মস্তকের আকৃতি মধ্যবর্তী শ্রেণীর (mesocephalic)। মলয়ালীদল সাধারণতঃ লম্বামুণ্ড। নাসিকার আকৃতি ধরিলে বলা যায় যে মলয়ালী গ্রুপের নায়ার ও নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, কানাড়ী ব্রাহ্মণ ও আরও কেহ কেহ তালিকা হইতে বাদ পড়িবে। Thurston প্রদত্ত তথ্য পরীক্ষা করিয়া এই ফল পাওয়া যায়। ডাঃ গুহ তাঁহার সংগৃহীত তথ্য হইতে বহু পরিশ্রম করিয়া co-efficient of racial affinities অথবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জাতিগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের ১ খণ্ড ৩য় ভাগে ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার গবেষণার ফল হইতে দেখা যায়, মলয়ালী গ্রুপের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা বেশী তেলেগু গ্রুপের সঙ্গে, তারপর যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণ ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে। তামিল ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালী কায়স্থ ও পোদদিগের সঙ্গেও সম্পর্ক দেখা যায়। কানাড়ীদিগের গুজরাটি, বাঙ্গালী, তামিল, মারাঠিদিগের সঙ্গে সম্পর্কে দেখা যায়। তেলেগু গ্রুপের মলয়ালী, মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী, তামিল, মারাঠি এবং যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায়।

বলা বাহুল্য, এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন মূল্য আছে স্বীকার করিলে উপরের প্যালী-মেডিটারেনীয়ান বা দ্রাবিড়িয়ান থিওরী মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। হেতু যাহাই হউক ও যেভাবে ঘটিয়া থাকুক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে racial affinityর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, দ্রাবিড় ভাষাভাষী দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলিকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে ও এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে প্যালী-মেডিটারেনীয়ান তাহা কিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখা। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মতে এক-গোষ্ঠীত্ব প্রমাণ ভাষার সাহায্যে হয় না, জাতি-লক্ষণের সাহায্যে হয়। দেখা যাইতেছে যে, জাতি-লক্ষণ হইতে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদিগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা যায় না।

তাহাদিগকে যদি এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা না যায়, তবে কিসের ভিত্তিতে তাহাদিগকে উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড জাতিসমূহ হইতে পৃথক বলা হইয়াছে পরে বিস্তারিত দেখা যাইবে। এখানে এই একগোষ্ঠীত্ব অপ্রমাণ করে এইরূপ আরও দুই একটি মতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

Thurston-এর সংগৃহীত তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মত এই যে, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে কানাড়ী, তুলু ও তেলেগু ভাষাভাষীদিগের মধ্যে লম্বা-

মুণ্ডের প্রাধান্য দেখা যায় না, এই প্রাধান্য দেখা যায় দক্ষিণাংশে তামিল ও মলয়ালীদিগের মধ্যে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী হাটনের মতে তেলেগু বা অন্ধ্র ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রকৃত মেডিটারেনীয়ান টাইপ দেখা যায় ("The Telegu is perhaps the purest Mediterranean stock in India".) লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান ও গোলমুণ্ড আর্মেনয়েড টাইপের সংমিশ্রণ দেখা যায় তামিলদিগের মধ্যে। তামিল অঞ্চলের তিনেভেলী জেলায় শানার ও পরর এবং উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় পারিয়ান নামে পরিচিত যে জাতিগুলিকে দেখা যায় তাহারা ডাঃ হেডন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহারা গোলমুণ্ড। হেডন ইহাদিগকে দক্ষিণী গোলমুণ্ড (Southern brachycephals) বলিয়াছেন, ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলিকে মস্তকের আকৃতি হইতে এক গোষ্ঠীভুক্ত করিবার পক্ষে এইভাবে বহু অসুবিধা দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের মত অবশেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, নাসিকার ইনডেক্সই তাহাদের একগোষ্ঠীয়তার প্রমাণ। Thurston-এর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে মলয়ালী, তেলেগু, কানাড়ী গ্রুপের কতকগুলি জাতি বাদ পড়িবে। আরও দেখা যায় যে নাসিকার ইনডেক্স উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের মধ্যে বেশী। এই নিম্নবর্ণের জাতিগুলির অনেকে নিষাদ গোষ্ঠীর, অর্থাৎ যাহাদিগকে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বলা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষীদিগকে প্যালীও-মেডিটারেনীয়ান বা দ্রাবিড় নাম দিয়া একগোষ্ঠীভুক্ত করিবার পক্ষে আর একটি বাধার উল্লেখ করা হইতেছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী নহেন এরূপ অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, উত্তর ভারতীয়গণ, বিশেষতঃ উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ (ইহাদিগকে দ্রাবিড় জাতি হইতে পৃথক করিবার জন্য "আর্য" নাম দেওয়া হইয়া থাকে) দক্ষিণ ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন এবং তাহাদের ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস ও কিম্বদন্তী একথা অনেকটা সমর্থন করে।

প্রাচীন কেরলী কিম্বদন্তী মতে কেরল, তুলব ও হৈগো বা হবিক অর্থাৎ পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত অঞ্চল পরশুরাম সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। উত্তরে হবিকের প্রাচীন নাম করাদ বা কর্ণাট। অহিক্ষেত্র নামেও ইহা পরিচিত। ইহার দক্ষিণে তুলব, তুলবের দক্ষিণে কেরল। তুলবের শিবালী, কোটা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাতিকে কদম্ববংশের ময়ূরবর্ম উত্তর অঞ্চল হইতে আনিয়াছিলেন প্রবাদ আছে। কোঙ্কানী ও সারস্বত ব্রাহ্মণ ত্রিহুত হইতে আসিয়াছিলেন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। অহিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বাস করিয়াছিলেন পরশুরাম। হিরদগল্লী ও অন্যান্য পল্লব অনুশাসন হইতে উত্তর অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা জানিতে পারা যায়। মালাবারের নম্বুদ্রিগণ উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। মালাবারের প্রচলিত সম্বন্ধনম প্রথা, শিবাল্লী, নাগর, মঠী ও মন্তি ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তির প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে রক্তমিশ্রণের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। নায়ারদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত আছে তাহাতেও এই মিশ্রণের কথা সমর্থিত হয়।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সোজাসুজি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, লম্বামুণ্ড নিষাদ গোষ্ঠী ও পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানার লম্বামুণ্ড জাতিগুলি বাদে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সকল লম্বামুণ্ড জাতি একগোষ্ঠীয়। মেডিটারেনীয়ান নামটি ব্যবহার না করিয়া তাঁহারা এই গোষ্ঠীকে Brown race or Indic race নাম দিতে চাহেন।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উত্তর ভারতীয় লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে দক্ষিণ ভারতের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠী হইতে কি কারণে কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পৃথক মনে করেন তাহার আলোচনা করা হইবে।

দ্রাবিডিয়ান থিওরী বা স্বতন্ত্র দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ কি প্রকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পরে এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইবে।

আত্মসাৎ

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

খাড়ির সুমুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল আলতা। বিঘার পর বিঘা ধানী জমিগুলো সব একত্র হয়ে গেছে। আলের চিহ্ন নেই মোটেই। শুধু সবুজ ধান—যেন প্লাবন এসেছে, সবুজ ঢেউয়ের চলছে মাতন।

ভাদ্রের ভার এখনও কাটে নি, বইছে ভিজা মরসুমী হাওয়া। দলে দলে পড়ছে আকাশের কালো হাল্কা নীচু মেঘ যেন চুমো খেতে চায় ধানের ঢেউয়ের মুখে—পারে না, তাই কাঁদে, ঝরে পড়ে ধীরে ধীরে বর্ষা হয়ে।

ধানী জমির পরেই দুরন্ত নদী ইলসা, তারপর কালাবদর—খানিক ভাটির দিকে দক্ষিণে এগোলে হয়ত কালপানি, শুধু জলের রাজ্য—এখানে বসেও শোনা যায় তার মাতন হুংকার শোঁবানি।...

একটা শাদা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে একখানা ডিঙি নাও। এ সময় ঠিক নদী পাড়ি দেওয়া যায় না, উচিতও নয়, কিন্তু কেমন করে যেন পারের রেত ছাড়িয়ে একটু মাঝ রেন্তের দিকে চলে গেছে নৌকাখানা

শাদা বিন্দুটা ক্রমে ক্রমে একটা পাখীর আকার ধারণ করল। যেন একটা শাদা বক পড়েছে বিষম ঝড়ে—বাতাসের ঝাপটা না খেয়ে, ঝাপটা খাচ্ছে ঘোলা জলের।

বিপন্ন নৌকাখানার দিকে চেয়ে আলতা একটা গালাগালি দিল আহাম্মক যাত্রীকে।...

আলতা এক নমঃশূদ্রের মেয়ে।

বাপ মারা যায় তার তের বছরে। মরার সময় সে রেখে যায় কতগুলো মামলা। সেই মামলাকে সে ঘষে ঘষে বদ্‌লতে গেলে একটা মহালে পরিণত করেছে। প্রজা-পাইকের মহল নয়, মহল ধানের। মাঘের শেষে সোনার দানায় ভরে যায় তার গোলা।

তের বছরের মেয়ে সে ধীরে ধীরে তেইশ বছরে পা দিয়েছে।

তেইশ গড়িয়ে গড়িয়ে তেত্রিশের কোঠায় এসে পৌঁছেছে।

তারপর এই ঘটনার সূচনা।

এখনও তার অপূর্ব্ব সামর্থ্য আছে। কাজইয়া-বিবাদ হলে সে এখনও ল্যাজা নিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে—খুন সে করতে পারে অক্লেশে। রুধির দেখে সে থর থর করে কাঁপে না।

'আলতামণি একটা জিনিষ রাখবা ?'

'কি জিনিষ সখা ?'

সখানাথ খুব কাছে এসে ধীরে ধীরে একটা পোঁটলা খোলে। পাঁচটা সোনার করমলা। মালটা ডাকাতির, তাই সে চারদিক একটু ভাল করে দেখে নেয়।

কত দিতে হবে এবং বন্ধকী বস্তু ছাড়িয়ে নেওয়ার মেয়াদ কতদিন তা জিজ্ঞাসা করে আলতা। সে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে না, কারণ এ সব জিনিস রাখার মহাজন এ গেরদে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

'দুই হপ্তা।' দিতে হবে পাঁচ টাকা মাত্র।

'না। মেয়াদ সাতদিন—টাকা ঐ পাঁচটাই।' আলতা টাকার চেয়েও এসব ব্যাপারে মুনাফা করে সময় কমিয়ে।

সখানাথ আপত্তি করতে যায়, 'কও কি ? মেয়াদ মাত্তর একহপ্তা ?'

'আচ্ছা সে সব পরের কথা'—আগে দেখত একখান নাও ডুবল যেন গাঙে।'

সখানাথ মোটেই বিচলিত হলোনা। যারা দিনরাত মানুষ খুন করে তাদের কাছে এ আর একটা এমন কড়া সংবাদ কি ? কড়া তো তাদের হৃদপিণ্ডেই দড় পাকিয়ে গেছে।

'কই গেলে না ?'

'যাই—কিন্তু—'

নদীর কোঁকানি এখানে বসেই দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে পড়ছে খাড়ি পাড় ভেঙে। আলতা ঘরে ঢুকে কয়েকটা টাকা বের করল মেঝের মাটি খুঁড়ে। টোকা দিয়ে দেখল কোথায় রয়েছে আলগা ভেটে হাড়ি, তারপর চালিয়ে দিল শাবল। ওপরের হাড়িতে চাল, তার নীচে টাকার হাড়ি।- সোনা রেখে টাকা বের করল আলতা।

আলতা সোনাও কম জমায়নি। কমসে কম প্রায় দুশো ভরি তো হবেই। কত সুন্দরী বৌর নাকের সোনা,

পায়ের গয়না। হার বাজু বিয়ের মেয়ের। কত অন্নপ্রাশনের এবং বৌভাতেরও নিদর্শন রয়েছে তার ঘরে। আছে অনেক কুমারী মেয়ের মাকড়ী, মালা, করমজা কামরাঙা।

রূপোরও কি তার ঘরে অভাব! না হলেও আছে পাঁচদশ সের। হাঁহুলি, পৈছি, রেট, ঝুমঝুমি, মল। সমস্ত স্ত্রীলোকের সব কিছু আত্মসাৎ করে যেন ওর আত্মপ্রসাদ। ও জমিয়ে যাচ্ছে, কেন জমাচ্ছে তা কিন্তু ও জানে না। এ প্রশ্নও ওর মনে কোনদিন জাগেনি-কতলোকের যে চোখের জল ও হা হুতাশ জড়িয়ে আছে ঐ সোনা রূপোর গয়নায়।

ধানের টাকাও ওর বিস্তর জমেছে নানাস্থানে। হাড়ি হাড়িতে নানা গাছের শিকরের তলে রেখেছে বেশীর ভাগ—অল্প আছে ঘরে।

একটা বছর আটেকের ছেলেকে নিয়ে এসে ঘরের দাওয়ায় ঠাস করে সখানাথ ফেলল। কোন কিছু আর উচ্চবাচ্য না করে হাত পেতে টাকা পাঁচটা নিয়েই চলে গেল।

'একি?' বিরক্ত হলো আলতা। তার ফিটফাট ঘরে একটা মৃৎপিণ্ড! দাওয়াটা যে আবার লিপতে হবে। এতটুকুও মালিন্য সে যে পছন্দ করে না। পয়-পরিষ্কার যে তার সব কিছু।

'ও সখা, ও সখা'···আলতা ডাকল গলা ছেড়ে। কেউ জবাব দিল না। ইতিমধ্যে সখা তিন তিনটা ছোটখাল পেরিয়ে গেছে লাঠির ওপর ভর করে লাফিয়ে। যাবে বুঝি চৌদ্দরসি কিছু মাদক দ্রব্য আনতে।

ছেলেটাও তো নড়ে না। মরা নাকি? মরা জাগলে আবার খুনের দায়ে না পড়ে আলতা।

ছেলেটার কাছে গিয়ে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে কোলে তুলল আলতা; এ হলো কি? এমন তার বুক কাঁপাচ্ছে কেন?

এ যে ননীর পুতুল!

জীবন ভরে সে শুধু দাংগা হাংগামা করেছে। মনুষ্য বর্জিত এই চরে গড়ে তুলেছে টাকার পাহাড়-ইচ্ছা ও অভিলাসপূর্ণ করেছে তার মৃত পিতার। ননী কোমল শিশু-অংগ সে তো কোন দিন স্পর্শ করে দেখেনি।

সে ছেলেটাকে কোলে তুলেছিল, এখন বুকে জড়িয়ে ধরল। ও বাঁচবে তো? আলতার বুকটা আবার ঢিব-ঢিব করতে লাগল। কোত্থেকে এলো তার শুকণা প্রাণে এই সুসংগল ধারা? সরস হয়ে উঠল যেন বহুদিনের পতিত মৃত্তিকা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

এবার আশংকার বদলে দুর্নিবার আশায় আলতা ওর মুখের দিকে চাইল। কি সুন্দর নাক, কি সুন্দর চোখ, কেমন নরম গাল দুটি!

আলতা অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে থেকে ওকে একটা দুঃসাহসী ডাকুর মত বুকে জড়িয়ে চুমো খেল।

ছেলেটা চোখ মেলল। 'মা!'

'কি বাবা?'

ছেলেটা ওর গলা শক্ত করে আকড়ে ধরল দুহাতে।

আহা মানুষ তো নয়, একটা গরম মাংসপিণ্ড।

সে রাত্রে আলতা না হলেও সহস্র বার চুমো খেল ছেলেটাকে। তার শিরা উপশিরার চাঞ্চল্য কমে না, সে করবেই বা কি!

আলতা ছেলেটার নাম রাখল মাণিক। মাণিক, মাণিক বই কি? ওর তুল্য মূল্যবান কোন বস্তুই এখন আর নেই আলতার কাছে। তের বছর বয়সেই স্বভাবত রমণী এ মণির অধিকারিণী হতে পারে, কিন্তু আলতা পেল তেত্রিশে। তার রক্ত-মাংসের নয়, তবু ঈর্ষার, লিপ্সার এবং আনন্দের উৎস।

আশ্চর্য্যের বিষয় এতদিন আলতা বিয়ে করেনি। সখা অনেক বার প্রস্তাব করেছে—সে তা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর কাজের নেশায় মসগুল হয়ে রয়েছে মৌমাছির মত। মামলা মকর্দ্দমা হটহুজ্জত যারা কোনদিন না করেছে, তারা ধারণা করতে পারবে না আলতার জীবনের রোমাঞ্চ।

আলতা মাণিককে পালন করে পরম যত্নে। সে যখন তাকে রাত্রে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে, তখন ওর উস-

খুসানি দেখলে ওর সমস্ত দেহের গ্রন্থি দিয়ে মমতা যেন ঝরে পড়ে। নির্ঝরের ধারাস্রাব হতে চায় স্তনের সহস্র সূক্ষ্ম শিরা ভেদ করে। বুকে জাগে অপূর্ব স্পন্দন।

মাণিক ওকে মা করেছে।

মানিক ঘুমায়, আলতা ঘুমাতে পারে না। সর্ব্ব শরীরে একটা জ্বালা বোধ করে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে চেয়ে থাকে নদীর দিকে। তখন হয়ত জ্যোৎস্না উঠেছে, ঢেউ নেই, শান্ত গাঙ, ঘুমন্ত বনবন। অনেকক্ষণ ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে ফের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে।

মাণিককে আলতা সাঁতার শিখায়। জলের দেশে ঐটাইতো প্রধান কর্ত্তব্য মায়ের। ছেলেটা ক্রমে বড় হচ্ছে।

উলংগ মাণিককে একটু দূরে ঠেলে দেয়—দিয়েই আবার ধরে আলতা।

মাণিক একদিন একটা মাছরাঙা সাপ দেখে চেঁচিয়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। আলতার হাতে ছিল একটা ধারাল মাছ-কাটা বটী, ঐটা হাতে নিয়েই সে এগিয়ে গেল এবং এক কোপে কেটে ফেলল সাপটা। মাণিক একটু যেন ভয় পেল রক্ত দেখে,কিন্তু আলতা হলো সন্তুষ্ট।

এবার আলতা মাণিককে শেখাল নৌকা বাওয়া।

ছোট্ট নৌকায় খাটো একটু বৈঠা—আলতার কোলে মাণিক। প্রথম প্রথম হিঃ হিঃ হাসল, পারল না। শেষে ওস্তাদ হয়ে দাঁড়াল মাণিক। এখন আলতার ভয় কখন আবার ও না বলে চলে যায় নদীর ভিতর সোঁতাখাল ছাড়িয়ে। আলতা দৃষ্টি রাখে প্রখর। কারণ একবার গিলতে গিলতে নিস্কৃতি দিয়েছে রাক্ষসী।

মধ্যে মাঝে সখা আসে। মিটির মিটির হাসে মা ও ছেলের মিতালী দেখে।

'হুঁঃ, এখন আর বইতেও কও না মানুষ দেখলে।'

আলতা বেশী আমল দেয় না সখাকে। মাণিক বড় হচ্ছে—দুষ্ট নষ্টের পাল্লায় আবার না পড়ে ছেলেটা।

'বাজে কথা বলার আমার সময় নাই সখা—মাণিক আয়, আমরা গরু আনতে যাই।'

মাণিক যার সঙ্গে ছোটে।

সখা বসে বসে তামাক সাজে, জল ঢালে, আবার সাজে তামাক, কল্কীটা কাটার জোগাড় হলে হুকো রেখে উঠে পড়ে। নেপথ্যে বলে, "তবে যাইগো আলতা মণি।"

নেপথ্যেই জবাব আসে—"আচ্ছা"।

আর আপ্যায়ন করে না আলতা—বরঞ্চ বিদায় দিয়েই সে যেন আশ্বস্ত হয় বেশী।

দেখতে দেখতে বারটা বছর কেটে গেল।

মাণিকের বয়স কুড়ি এখন। সে জুড়ি হয়েছে আলতার। যেমন সামর্থ্যে তেমনি রূপে। আলতা দু হাত বাড়িয়ে এখনও ওকে কাছে টেনে আনে, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও বুকে জড়িয়ে ধরে না। ওর কি যে আনন্দ হয়! ও যেন একটু একটু করে গড়েছে এই পুরুষের দেহ। রূপ ও বীর্য্যের ব্যঞ্জনা দিয়েছে হিসাবী ভাস্করের মত। এতটুকু ভুল করেনি তুলি টানতে। লেঠেল মামলাবাজ আলতা সময় সময় তন্ময় হয়ে থাকে ওর দিকে চেয়ে। ওর ভোগের না শুধু চেয়ে থাকার সামগ্রী, কিছু বুঝতে পারে না।

ক্রমে আলতার বয়সও ছাড়াল বুঝি তেতাল্লিশের কোঠা।

একদিন কয়েকজন লোক এসে বলল, "ছেলের বিয়ে দাও আলতা—ছেলে বড় হয়েছে।"

"তেমন সুন্দর মেয়ে কোথায়?"

"আছে খালের ওপার মুন্সীবাড়ী।" মেয়ের ভাইটি নাকি বেশ শিক্ষিত।

প্রস্তাব করতে যা দেরী, মেয়ের বাপের দেরী হয় না মত দিতে। এতো তার সৌভাগ্য।

সখা শুনে মিটির মিটির হাসে।

কিন্তু ক্ষেপে বসে মাণিক। সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। না, না কিছুতেই না! সে ছুটে যায় জলে ঝাঁপ দিতে।

অনেক বোঝায় আলতা; এবার সে কাঁদে। শত হলেও তো মা ছাড়া সে কেউকে জানে না।

মাণিক অনেক সাধ্য সাধনার পর রাজী হয়। কিন্তু সে মার কাছে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করল যে, কিছুতেই সে শোবে না বৌর ঘরে—থাকবে আলতার কাছে।

আলতা হেসে বলল, 'বেশ তাই হবে'।

বিয়ে হলো—বৌ এলো ঘরে। দিব্যি বড় সড়ো বৌ। ঘোমটা তুলে মুখখানা দেখে আলতার বুকটা ছ্যাক করে উঠল। তবে সে কিছু প্রকাশ করল না। হাজার হলেও সে বুদ্ধিমতী।

বাজী পুড়ল, বাজনা বাজল, লোকজন খেয়ে দেয়ে বিদায় হলো একে একে। কেমন করে কি ভাবে যেন কটা দিন কেটে গেল হৈ চৈ হট্টগোলে। কোথায় মাণিক, কোথায় তার বৌ সেদিকে সে একটি বার নজর দেবে, তা পারিল না আলতা। একা মানুষ, কাজ একশ' রকম।

রাত্রে একটু সুস্থ হয়ে সে খোঁজ নিল মাণিকের। তার সাগর সেঁচা ধন।

কোন উত্তর দিল না কেউ।

যে অভিমানী ছেলে। গেল কোথায়? আলতার মনে পড়ল প্রতিজ্ঞার কথা। সে আগে ছুটে গেল নদীর পারে। খরস্রোতা নদীতট নির্জন। জ্যোৎস্নায় শুধু ভেসে যাচ্ছে দিগদিগন্ত।

সে ঘরে ফিরে এলো। কি জানি তার কানে গেল, কি জানি সে দেখল। তাই আবার বাইরে বেরিয়ে এলো নিঃশব্দে।

বৌ বলছে, 'চুপ চুপ কথা কয় না—চুপ'।

* * *

কিছুক্ষণ বাদে শোনা গেল আলতা বলছে, 'সখা আমি তীর্থে যাব'।

'কবে'?

'কবে আবার? আজই, এক্ষণই। তুমি সাথে যাবা'।

সখা জবাব দেয়। 'চলো আলতামণি চলো. কই নাই এখনও আমাগো বয়স আছে'।

'চুপ করো বইচ্‌লাবী—মাণিক আমার শোনবে'।

ঠিকানা

সত্য দাস

পরিক্রমা-পথচ্যুত নক্ষত্রের বেগে
পার হয়ে অনেক যোজন
আমরা চলেছি ধেয়ে
যেন এক আশ্চর্য্য দেশের খোঁজে
ঠোঁটে লয়ে জীবনের লাল নীল অপরূপ খড়—
আশা আছে সেখানেই বেঁধে নেবো ঘর।

সে এক আশ্চর্য্য দেশ:
লাখো লাখো সৈনিকের কচি কচি বর
শত্রুকীর্ণ সংগ্রামের তপ্ত রাজবর্ত্মে,
'এতদিনে এ-পৃথিবী হ'ল তো সবার'—
জ্বলে ওঠা অসংখ্য চিতার
বহ্নিমাঝে জেগে ওঠে শহীদের লুপ্ত কণ্ঠস্বর—
আশা আছে সেখানেই বেঁধে নেবো ঘর।

সে এক আশ্চর্য্য দেশ:
শ্রেণীহীন…
শোষণ বিহীন
সেদেশের মানুষের জীবনের গতি।
অনেক অনেক আলো
নিরাপদ জীবনের পথ।
বাধাহীন জীবনের সতেজ স্বাক্ষর—
আশা আছে সেখানেই বেঁধে নেবো ঘর।

সে এক আশ্চর্য্য দেশ:
সমাজ-প্রগতি
বাধাহীন জীবনের যাত্রাপথে নেই কোনো যতি।
সেদেশের কথা ভেবে
যাযাবরী এ-হৃদয়ে
মাঝে মাঝে ওঠে যেন আবেগের ঝড়—
আশা আছে সেখানেই বেঁধে নেব ঘর।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গান্ধার পদ্ধতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

মুসলমান প্রধান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, উহা এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানমতের প্রধান অভিনয়ভূমি ছিল, ভারতের ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। এই অসংখ্য ঐসলামিক উপজাতি অধ্যুষিত পর্ব্বতাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশের বক্ষে বৌদ্ধ প্রাধান্যের পরিচায়ক অগণিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেএই অঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। পৌরাণিকী কাহিনী বা প্রাচীন ইতিহাসে যে গান্ধার নামক রাজ্যের কথা আছে উহাকে আফগানিস্থানের কিয়দংশ এবং পেশোয়ার উপত্যকার সমন্বয় বলা যায়।মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হইবার সময়ে গান্ধার ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গণ্য ছিল। কুরুরাজ্যাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

'বারানসী' বুদ্ধ (বুদ্ধ কর্ত্তৃক যার নামে সর্ব্বপ্রথম উপদেশ দান)
বারানসী বুদ্ধের মধ্যে আমরা ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাস্কর্য্য শিল্প পদ্ধতি দেখিতে পাইতেছি।

পরে এই গান্ধার অঞ্চলে বহু বৈদেশিক সম্প্রদায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এই অংশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এইরূপ যে, পশ্চিম বা [illegible]র হইতে জয়াকাঙ্ক্ষী জাতিদিগের আগমন আদৌ [illegible] নহে। বৈদেশিকদের মধ্যে গান্ধারে পারসিক, মাসিদোনীয়, বক্ত্রিয়-গ্রীক, সিদীয় বা শক, পার্থীয় এবং কুশান নামক সম্প্রদায়ের শাসন ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌর্য্যবংশীয় নৃপগণের প্রাধান্য মগধ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত এক সময় প্রসারিত থাকার কথা ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে। বৈদেশিকদিগের মধ্যে মাসিদোনীয় আধিপত্য অতি অল্পকাল মাত্র ছিল বলিয়া ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি বা শিল্পকলায় বিশেষ কোন প্রভাব সঞ্চারিত করিতে পারে নাই। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি তাহাদের প্রাধান্যের নিদর্শন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংস্কৃতি ও শিল্পের ভিতর স্বল্পবিস্তর রাখিয়া গিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। তবে এ-বিষয়ে সংশয় নাই যে কুশানরাই সর্ব্বাধিক প্রভাব প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কুশান সম্প্রদায় উত্তর-পশ্চিম চীনের অধিবাসী উইয়ে চি নামক উপজাতি হইতে উদ্ভূত। উত্তর-পশ্চিম চীনস্থ আদিবাসস্থল হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা প্রথমে সিদীয় নামক যাযাবর জাতির রাজ্য জয় করে এবং তদনন্তর তাহারা বক্ত্রিয়া নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র করগত করিতে সমর্থ হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতক সমাপ্ত না হইতেই এই দুর্দ্দমনীয় সম্প্রদায় পার্ব্বত্য প্লাবনের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া সমগ্র গান্ধার রাজ্য এবং পঞ্জাবের তক্ষশীলা পর্য্যন্ত

আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়। কুশানবংশীয় শাসক কাদফিসেস (৯০ হইতে ১১০ খৃষ্টাব্দ) এবং প্রসিদ্ধনামা কনীষ্ক (১২০ হইতে ১৬০ খৃষ্টাব্দ) মথুরা নগরী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কনীষ্কের সাম্রাজ্য বারানসী পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকার কোন কোন নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পুরুষপুরী বা পেশোয়ার নগর এই শক্তিশালী সম্রাটের শাসনকেন্দ্র ছিল।

কনীষ্ক সম্রাট অশোকের ন্যায় অত্যন্ত আগ্রহশীল ও অনুরাগী বৌদ্ধ ছিলেন। পার্থক্যের ভিতর অশোক হীনযান মত এবং কনীষ্ক মহাযান মত মানিতেন। যেমন হীনযান মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্টপোষক সম্রাট অশোক, সেইরূপ কুশান বংশীয় সম্রাট কনীষ্ককে মহাযান মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক বলা যায়। বিজয়ী কুশানগণ বক্ত্রিয়ায় অবস্থান কালে বক্ত্রিয় বা প্রাচ্য গ্রীক ভাবধারা তাহাদের ভিতর কতক পরিমাণে সঞ্চারিত হয় সন্দেহ নাই। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত গ্রীক্ ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটে বলা যায়। এই সংমিশ্রণের ফলে শুধু এক প্রকার সংস্কৃতির নয়, এক শ্রেণীর শিল্প প্রণালীর, বিশেষ ভাস্কর্য্যকলার উদ্ভব ঘটে। এই ভাস্কর্য্য কলাকে "ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গান্ধারপদ্ধতি" আখ্যায় অভিহিত করা যায়। এই গান্ধারপদ্ধতিতে কতখানি গ্রীক প্রভাব এবং কি পরিমাণ ভারতীয় বা স্বদেশীয় ভাব রহিয়াছে তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিল্পসমালোচক গান্ধার পদ্ধতির ভিতর প্রাচ্য গ্রীক ভাব বা প্রভাব দেখিয়া সমগ্র ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ভিতর প্রতীচ্য প্রাচীন (ক্লাসিক) গ্রীক শিল্পের প্রভাব আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা পৌরাণিক বা ক্লাসিক গ্রীক প্রভাব ভারতীয় ভাস্কর্য্যের মূলে দেখিতে পাইয়াছেন। সকল সমালোচক ইঁহাদের সহিত একমত না হওয়ার জন্য এই বিষয় লইয়া বিতর্ক চলিয়াছে। পৌরাণিক গ্রীক শিল্পকলা বিশেষ ভাস্কর্য্যশিল্পের প্রভাব ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করা সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। আমাদিগের বিশ্বাস, গান্ধার পদ্ধতিতে গ্রীক প্রভাব দেখিয়া যাঁহারা সমগ্র ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ভিতর গ্রীক প্রভাবের বিদ্যমানতার কথা বলেন, তাঁহারা ভুল করেন। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গান্ধারপদ্ধতির মধ্যেই গ্রীক ভাব বা প্রভাব বিদ্যমান আছে। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান মতের সহিত গ্রীক ভাবধারার সংমিশ্রণে গান্ধার পদ্ধতির উদ্ভব, তখন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গান্ধার-পদ্ধতির ভিতর ভারতের নিজস্ব ভাবধারা বা প্রভাব কতখানি, তাহাও আমাদের ভাবিবার বিষয় বটে।

ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ মৌর্য্যযুগ হইতে। মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে শিল্পানুশীলন ভারতে ছিলনা, তাহা নহে, কিন্তু প্রাক মৌর্য যুগের শিল্পের সহিত আমাদের পরিচয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া উহাদের সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক আলোচনা সম্ভব নহে। অশোকপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাস্কর্য্য আমরা ভারতবর্ষের ভিতর পাই না বলিলেই হয়। ভারতীয় ভাস্কর্য্য অশোকের সময় হইতে একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে বলা যায়। ভারতীয় ভাস্কর্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট অশেষরূপে ঋণী, ইহাতেও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রভাব সমগ্র এশিয়া ব্যাপিয়া প্রসারিত হয়।

সম্রাট অশোকের সময়ের শিল্পের ভিতর পশ্চিম এশিয়ার কিয়ৎপরিমাণ প্রভাবের কথা কোন কোন শিল্প সমালোচক করিয়াছেন। পশ্চিম এশিয়ার দেশ সমূহের সহিত অশোকের সময়ে ভারতবর্ষের আদান-প্রদান চলিত, সুতরাং তথাকার কিঞ্চিৎ ভাব বা প্রভাব ভারতীয় শিল্পে সংক্রামিত হওয়া অবশ্য অসম্ভব নহে। পাশ্চাত্য সমালোচকরা যাহাকে "কোর্ট আর্ট অফ অশোক" "অশোকের দরবারী শিল্প" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন উহারই ভিতরে পশ্চিম এশিয়ার শিল্পকলার কোন কোন উপাদানের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দরবারী শিল্পের পাশাপাশি আর এক প্রকার শিল্পকে আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব আখ্যায় অভিহিত করা যায়। অশোকের দরবারী শিল্পের ভিতর যে ক্রমাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা না থাকিলেও অশোকীয়

ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্প পদ্ধতির ভিতর বলিষ্ঠ প্রাণবান পরিকল্পনার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

মথুরায় একপ্রকার ভাস্কর্য্য-শিল্প-প্রণালীর নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই, যাহাকে প্রাক্-কুশান যুগের বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই প্রাক্-কুশান শিল্পের ভিত্তি ভারতের নিজস্ব শিল্পপদ্ধতি, আমরা এইরূপ বিশ্বাসও পোষণ করিয়া থাকি। কুশানযুগে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ভিতর একপ্রকার অভিনব পরিকল্পনার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের বহুবিধ বিচিত্র মূর্ত্তি যাহা আমরা ভারতে এবং ভারতের বাহিরে দেখিতে পাই উহা কুশানযুগের পূর্ব্বে ছিল না। দুইএকটি বুদ্ধমূর্ত্তি ক্বচিৎ কোথাও থাকিলেও বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা কুশান যুগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রাক্-কুশান যুগে বুদ্ধের প্রতীকরূপে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক প্রকার চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা মথুরায় যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতেছি—তাহা প্রাককুশান যুগের কিরূপে হইবে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কুশানশাসন এককালে মথুরা, এমন কি বারানসী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি কুশানযুগের, বিশেষ কনীষ্কের সময়ের হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভব। প্রাক্-কুশানযুগেই বৌদ্ধ প্রভাব মথুরায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি কুশান-শাসন সময়ে প্রচারিত গান্ধার পদ্ধতির প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোন কোন শিল্পসমালোচক 'মথুরা পদ্ধতি' নামধেয় আর একটি স্বতন্ত্র ভাস্কর্য্য-শিল্পপ্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে, বিশেষ বুদ্ধ মূর্ত্তি রচনায় এই মথুরা পদ্ধতি গান্ধার পদ্ধতির অনুকরণ ছাড়া অন্য কিছু নহে, বলিয়া অনেকে মনে করেন। আমরা মথুরা পদ্ধতিকে ভারতের নিজস্ব পদ্ধতি ও গান্ধার পদ্ধতির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মনে করি।

বুদ্ধের প্রতীকরূপে মনুষ্যমূর্ত্তি উৎকীর্ণ বা নির্ম্মাণ করিবার প্রথা ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গ্রীক প্রভাব প্রবেশ করিবার পর প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। অর্থাৎ গান্ধার পদ্ধতিই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রথা প্রবর্ত্তন করে। পরে গান্ধারপদ্ধতির অনুকরণে অন্যান্য ভাস্কর্য্য প্রণালীও বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিতে আরম্ভ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্রাট অশোক হীনযান মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। অশোকের সময়ে ঐ মতই বিদ্যমান ছিল। ঐ মতে বুদ্ধের প্রতীকরূপে মনুষ্য মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কতিপয় চিহ্ন উৎকীর্ণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। আমরা যে অগণিত বুদ্ধবিগ্রহ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত এশিয়া ব্যাপিয়া দেখিতেছি, তাহারা মহাযান

'মথুরা' বুদ্ধ (মথুরায় প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি)
মথুরা পদ্ধতিকে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্পপ্রণালী ও হিন্দ-গ্রীক বা গান্ধার পদ্ধতির মধ্যবর্ত্তী বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে গান্ধার পদ্ধতির বুদ্ধের মধ্যেও আমরা গ্রীক অপেক্ষা ভারতীয় ভাব বা প্রভাবের আধিক্যই দেখিতে পাইব।

মতের প্রভাবের পরিচায়ক। পরে মহাযান মতের প্রভাব হীনযান মতেও কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। হীনযানমতের লীলাস্থলী সিংহলের বুদ্ধবিগ্রহগুলি মহাযান প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই। গান্ধার পদ্ধতির মূলে মহাযান মতের প্রবল প্রেরণা বিদ্যমান, ইহাও সংশয়াতীত। আমরা এই ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি যে, যে মহাযানমতের প্রধান প্রচারক বাঙ্গালী দীপঙ্কর বা শ্রীজ্ঞান অতীশ, যাহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দুর্ভেদ্য দুর্গ বলা যায়, সেই তিব্বতে বৌদ্ধ মহাযানমত ইনিই প্রচার করেন। যাঁহারা মহাযানমতের পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পান, তাঁহারা তিব্বতে তাহা দেখিতে পাইবেন।

ইহাতে সংশয় নাই যে, গান্ধারশিল্পপদ্ধতির পূর্ব্ব পরিণতি কুশান-সম্রাট কনীষ্কের শাসনসময়ে সঙ্ঘটিত হইলেও ইহার উদ্ভব আফগানিস্থানে এবং পঞ্জাবে গ্রীক শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময় হইতে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সহিত প্রাচ্য গ্রীক ভাস্কর্য্যের প্রভাব সম্মিলিত হইয়া গান্ধারপদ্ধতি উদ্ভূত করিয়াছে। মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিবার প্রণালীর মধ্যেই গ্রীক প্রভাবের পরিচয় আছে। পরিকল্পনা, ভাব বা বিষয় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। গান্ধারপদ্ধতিতে প্রস্তুত বুদ্ধবিগ্রহগুলির মুখমণ্ডল দেখিলে গান্ধারপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু গঠন-প্রণালী গ্রীকপ্রভাবের পরিচায়ক হইলেও ভারতের নিজস্ব ভাবধারা অন্যান্য বিষয়ে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত বলা চলে। ইহাই স্বাভাবিক। শুধু ভাব নহে, ভঙ্গীও ভারতীয়। গান্ধারপদ্ধতিতে উৎকীর্ণ বুদ্ধ মূর্ত্তিকে কোন গ্রীক দেব মূর্ত্তি বলিয়া ভুল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে যোগীর যেরূপ ভাব-ভঙ্গীর কথা আছে, আমরা গান্ধারপদ্ধতির বুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাই। ভারতের নিজস্ব পরিকল্পনাই কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রণালীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। আসন ও মুদ্রা সমস্ত সম্পূর্ণ ভারতীয়। যে অভয় ও ধ্যানের ভাব গান্ধার প্রণালীতে উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির মধ্যে আমরা পাইতেছি, উহা সম্পূর্ণরূপে ভারতের যোগশাস্ত্রসম্মত। ভগবদ্গীতায় এবং 'দিঘ্-ঘনিকায়' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের 'সমন্নফল সুত্ত' নামক অংশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট যোগীর যে আলেখ্য অঙ্কিত আছে, গান্ধারপদ্ধতির বুদ্ধের মধ্যে সেই পবিত্র পরিকল্পনার প্রকাশই আমরা দর্শন করিতেছি। গ্রীক প্রভাববিশিষ্ট গান্ধারপদ্ধতির বুদ্ধমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া সুবিখ্যাত শিল্প-সমালোচক কুমারস্বামী কহিয়াছেন—ভাস্কর (গ্রীক দেবতা) এপোলোকে বুদ্ধে পরিণত করেন নাই, বুদ্ধকেই এপোলোতে পরিণত করিয়াছেন বলা যায়। আমরা যেমন চীনা শিল্পী-লিখিত চৈনিক বুদ্ধ মূর্ত্তিসমূহের মুখমণ্ডলে চৈনিক আকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, তেমনই গ্রীক ভাস্কর বা গ্রীক ভাস্কর্য্যের আদর্শ অনুসরণকারী শিল্পী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করিলে বুদ্ধের মুখাকৃতি কতকটা গ্রীকসুলভ বা গ্রীক দেবতাসুলভ হওয়া স্বাভাবিক। গঠন-প্রণালীর ভিতর বিদেশীয় আদর্শ যতখানিই থাকুক, ভাব, ভঙ্গী, আসন, মুদ্রা সমস্তই ভারতের নিজস্ব যোগশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

গান্ধার রাজ্যে (অর্থাৎ বর্ত্তমান আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে হিন্দু প্রভাব ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রসারিত থাকার বহু নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। একসময় বক্ত্রীয় গ্রীক (প্রাচ্য গ্রীক) নৃপতিদের শাসন এই অঞ্চলে স্থাপিত ছিল। বক্ত্রীয় গ্রীক নৃপতিদের কেহ কেহ হিন্দু দেব-দেবী মানিতেন, এই সত্যের বহু প্রমাণ আমরা শুধু পাঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশে নয়, আফগানিস্থানের মধ্যেও পাইয়াছি। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরাও এককালে হিন্দুই ছিল। পরে কুশান শাসন সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব প্রসারিত হইয়া পড়ে। বক্ত্রীয় গ্রীক নৃপতি তক্ষশীলাধিপতি এন্টিয়ালকিদাস হেলিওদোরাস নামক গ্রীক যুবককে, দূতরূপে বিদিশাধিপতি ভগভদ্রের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। তৎকালে তক্ষশীলা ও বিদিশা দুইটিই ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল। বিদিশার নিকটে একটি গরুড়স্তম্ভ আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্তম্ভটি খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ

১২৬ শতকের। স্তম্ভগাত্রে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহার মর্ম্ম—"পরম দেবতা বিষ্ণুকে সম্মান প্রদর্শনার্থ গ্রীক হেলিওদোরাস কর্তৃক এই স্তম্ভ স্থাপিত হইল"। হেলিওদোরাস আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিদিশাধিপতির কন্যা মালবিকার সহিত হেলিওদোরাসের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

এই ব্যাপার হইতে বক্ত্রীয় গ্রীকগণের মধ্যে হিন্দু-প্রভাব সঞ্চারিত হওয়ার কথা আমরা বুঝিতে পারি। খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ২০০ হইতে আমরা শুধু বক্ত্রীয় গ্রীক নহে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিদীয় নৃপগণের মুদ্রাসমূহের গাত্রে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্নসমূহ উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। গ্রীক ও শক নৃপগণের মুদ্রায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া আমরা স্বতঃই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশে একসময় হিন্দুধর্ম্ম অবশ্যই প্রচারিত ছিল। অনেক সময় দেখা যায়, যেনগরে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, সেই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেব বা দেবীর মূর্ত্তি মুদ্রা গাত্রে উৎকীর্ণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

কপিশা নগরীতে নির্ম্মিত মুদ্রাসমূহে দেবতার প্রতীক রূপে হস্তীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। ঐরাবত হস্তী ইন্দ্রদেবের বাহন সুতরাং হস্তীমূর্ত্তির দ্বারা ইন্দ্রদেবকে স্মরণ বা সম্মান করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পুষ্কলাবতী নগরীর মুদ্রার শিব-বাহন বৃষমূর্ত্তি ক্ষোদিত করা হইয়াছে। কুশান নৃপগণের মুদ্রাতেও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতীক বা প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ইণ্ডো-সিদীয় শাসনকর্ত্তা গণ্ডোফারেস এবং কুশানশাসক দ্বিতীয় কাদফিসেস উভয়ের মুদ্রাতেই হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। কনীষ্কের কোন কোন মুদ্রায় বুদ্ধের প্রতীক এবং কোন কোন মুদ্রায় চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

গান্ধারপদ্ধতি এবং মথুরাপদ্ধতি উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর, তাহা যে নিঃসংশয়িতরূপে স্থির হইয়াছে, ইহা বলা চলে না। একই উৎস হইতে উভয়ে উদ্ভূত বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। কারণ গান্ধারপদ্ধতির বুদ্ধ এবং মথুরাপদ্ধতির বুদ্ধ উভয়ে অনেকটা সাদৃশ্য সম্পন্ন; গান্ধার শিল্পের যে সকল নিদর্শন আমরা পাইয়া থাকি, তাহার মধ্যে কোনটিতেই নির্ম্মিত বা স্থাপিত হইবার সময় লিখিত নাই। সুতরাং সময় নির্দ্ধারণ সহজ নহে। তবে পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে

'গান্ধার' বুদ্ধ
গান্ধার বা হিন্দ-গ্রীক পদ্ধতির বুদ্ধ মূর্ত্তির মুখমণ্ডল।
(খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের)

আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে, গান্ধার পদ্ধতির জন্ম খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। কনীষ্কের শাসন সময়ে ইহা পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় তাহা বলা হইয়াছে। ঐ সময় এই ভাস্কর্য্য প্রণালীর উৎকর্ষ ও প্রসার সর্ব্বাধিক হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতকে ইহার অবদানের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পরে ক্রমশঃ গান্ধারপদ্ধতির সৃষ্টিগুলিতে গ্রীক প্রভাব অল্পতর এবং ভারতীয় প্রভাব অধিকতর হইয়া পড়ার প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি।

জালালাবাদ, আফগানিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হাদ্দা ও

বামিয়ান, সোয়াৎ উপত্যকা (প্রাচীন উদয়ন), তক্ষশীলা ও উহার পারিপার্শ্বিক এবং পেশোয়ার উপত্যকা, এই অঞ্চলগুলিতে গান্ধারপদ্ধতির ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। জালালাবাদের খায়েস্তা স্তূপের নিম্নাংশটির ভাস্কর্য্য ঐশ্বর্য্য গান্ধারপদ্ধতির উৎকর্ষের বার্ত্তাই আমাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করে। নানা প্রকার মূর্ত্তিতে মণ্ডিত এই অংশটি অত্যন্ত মনোরম। হাদ্দার টাপ্‌পা কালান মঠও উল্লেখযোগ্য। আফগানিস্থানের হাদ্দা অঞ্চলের টাপ্‌পা কালান নামক স্থানে এই বৌদ্ধ মঠের অবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গান্ধার আদর্শের বহু ভাস্কর্য্য এখানেও আছে বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অধিবাসী মুসলমানেরা অধিকাংশ ভাস্কর্য্য সৃষ্টিগুলিকে বিকৃত বা অঙ্গহীন করিয়া দিয়াছে। এই ধরণের ধ্বংসকার্য্যে মুসলমানদের ন্যায় আগ্রহ অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী প্রদর্শন করে নাই। কোন কোন স্থানের প্রায় প্রত্যেক ভাস্কর্য্য সৃষ্টিটিকেই তাহারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মানিকিয়ালার ভেনচুরা স্তূপ বৌদ্ধযুগের এক গুরুত্বপূর্ণ অবশেষ।

আফগানিস্থানের বামিয়ান অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ মঠ, গুহাগৃহ এবং বিশালকায় বুদ্ধবিগ্রহসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বুদ্ধবিগ্রহের একটি প্রকাণ্ড কুলুঙ্গির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। এই কুলুঙ্গিটির বক্ষে নানাপ্রকার চিত্রও অঙ্কিত আছে। এই চিত্রগুলির ভিতর ভারতীয় প্রণালীর চিত্রের অভাব না থাকিলেও, মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতির চিত্রের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে মধ্য এশিয়ার সহিত এই অঞ্চলের সম্পর্কের কথা উপলব্ধ হয়। কুশান শাসন সময়ে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ এই সমস্ত অঞ্চলেই কুশান শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত থাকায় পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয় নাই। বৌদ্ধ ভারতের প্রভাব মধ্য এশিয়ায় বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার অসংখ্য প্রমাণ আমরা চৈনিক তুর্কীস্থানের প্রাচীন শহরসমূহের ধ্বংসাবশেষের বক্ষে প্রাপ্ত হইয়াছি। বামিয়ানে প্রাপ্ত এই সকল ভাস্কর্য্যকলা ও চিত্রশিল্পের নিদর্শন প্রাক্ কনীষ্ক যুগের হওয়া সম্ভব নহে।

তথ্‌ত-ই-বাহিকে গান্ধার প্রদেশের এবং উসুফ জাইদের দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলা যায়। তথ্‌ত-ই-বাহিতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ মঠের বক্ষে গান্ধার পদ্ধতিতে প্রস্তুত এই ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি বাহির হইয়াছে। পেশোয়ার শহরের সন্নিকটে যে বৌদ্ধ স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাকে কনীষ্ক যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কীর্ত্তি বলা চলে। এই স্তূপের একটি কক্ষে কনীষ্কের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বুদ্ধাস্থি বিশিষ্ট একটি বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক পাত্র বা আধার পাওয়া যায়। এই মনোজ্ঞ মঞ্জুষাটির উচ্চতা ৭৳ ইঞ্চি। ইহা তামার খাদে প্রস্তুত এবং গিল্‌টি করা। কৌটার ঢাকনিটির গাত্রে উপবিষ্ট বুদ্ধ ও (দুইটি) বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পাত্রটির প্রান্তদেশে হংসশ্রেণী উড়িয়া যাইবার দৃশ্য ক্ষোদিত আছে। পাত্রের গাত্রে সম্রাট কনীষ্কের মূর্ত্তি, কতিপয় বুদ্ধমূর্ত্তি এবং সৌর ও চান্দ্র দেবতার মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। পাত্রটিতে কনীষ্কের এবং পাত্র নির্ম্মাতার নাম (অজিসাল) উৎকীর্ণ আছে। এই শিল্পীকে কেহ কেহ গ্রীক, কেহ কেহ ইউরোশিয়ান বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

আমরা যে পুষ্কলাবতীর নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি উহা কোথায়, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। পেশোয়ার উপত্যকার বক্ষে সোয়াৎ এবং কাবুল নদের সঙ্গমস্থলে মীরজিয়ারাৎ বা রেলা হিসার নামক যে স্থানটি রহিয়াছে উহাকেই প্রাচীন পুষ্কলাবতী নগরীর অবস্থান-স্থান বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মনে করেন। মীর জীয়ারাৎ এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে গান্ধার পদ্ধতিতে প্রস্তুত কতিপয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাস্কর্য্য নিদর্শন খননের ফলে বাহির হইয়াছে। এই সকল ভাস্কর্য্যের ভিতর একটি শিবমূর্ত্তিও রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, গান্ধার শিল্পের ভিতর যে ভারতীয় প্রভাব রহিয়াছে, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মমূলক বলা যায় না, উহাতে হিন্দু দেব-বাদের প্রভাবও রহিয়াছে।

মীরজিয়ারাতের এই শিবমূর্ত্তিটি বিচিত্র। ইহা ত্রি-শীর্ষ, ত্রি-নেত্র ও ত্রি-বাহু। এই শিবমূর্ত্তি নন্দী বৃষের সম্মুখে ত্রিশূল, ডমরু ও কমণ্ডলু লইয়া দণ্ডায়মান

রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটিকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের ভারতীয় ভাবাপন্ন বা হিন্দু দেব-বাদের প্রভাববিশিষ্ট গান্ধার পদ্ধতির সৃষ্টি বলা যায়। তক্ষশীলার ধ্বংস বশেষের ভিতরেও বহু সংখ্যক গান্ধার ভাস্কর্য্য পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত গান্ধারপদ্ধতির ভাস্কর্য্য কলার নিদর্শনগুলি যাঁহারা দেখিতে চান তাঁহারা পেশোয়ারের সংগ্রহ শালার এবং লাহোর ও কলিকাতার যাদুঘরে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

গান্ধারপদ্ধতির অনুবর্ত্তী ভাস্করগণ একপ্রকার 'শিষ্ট' জাতীয় সেরবর্ণ প্রস্তরকে ভাস্কর্য্য সৃষ্টির 'মাধ্যম' বা অবলম্বনরূপে সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়াছেন। সোয়াৎ উপত্যকায় এই শ্রেণীর প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চূণ বালি এবং পোড়া মাটিতে ইহাদের দ্বারা মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলিকে সোনার পাতে বা স্বর্ণবর্ণ প্রলেপ বা বার্ণিসে মণ্ডিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তক্ষশীলায় প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতিরেকে চুণবালি ও পোড়া মাটির উপর কারুকার্য্য করা যে সকল ভাস্কর্য্য খননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায়ই অবিকৃত রহিয়াছে বলা যায়। তক্ষশীলায় খননকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে অনুমিত হইত, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পর গান্ধারপদ্ধতির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল তক্ষশীলায় আবিষ্কৃত ভাস্কর্য্যগুলি এই অনুমানকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে। তৃতীয় শতকের পরবর্ত্তী সময়ের প্রশংসাযোগ্য প্রস্তর মূর্ত্তি আমরা না পাইলেও তক্ষশীলায় প্রাপ্য চূণ বালি ও পোড়া মাটির ভাস্কর্য্য কীর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী যুগের গান্ধার শিল্পীদের রচনা-নৈপুণ্যের কথাই আমাদিগকে জানাইতেছে। এই নিদর্শনগুলির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে উৎপন্ন গান্ধার-পদ্ধতি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক ও পঞ্চম শতকের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তক্ষশীলার প্রাপ্ত চূণ বালির এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্য্য সৃষ্টিগুলি প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের মতই শক্তিশালী ও প্রাণবান।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পরবর্ত্তী যুগে গান্ধার পদ্ধতির ভিতর গ্রীক প্রভাব অন্তর হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে বকৃত্রীয় গ্রীক প্রভাব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় মিনান্দার নামক নৃপতির সময়ে। ইনি ১৫৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে শুধু গান্ধারে নয়, বকৃত্রীয়া হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করেন। পরে ভারতের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত (বিপুলবাহিনীসহ) আগমনের কথা গ্রীক গ্রন্থে নয়, বৌদ্ধ পুস্তকে উল্লিখিত রহিয়াছে। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম বরণ করেন এবং বৌদ্ধ জগতে মিলিন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। "মিলিন্দ পঞহো" বা "মিলিন্দ প্রশ্ন" একখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ। মিলিন্দই শেষ ইণ্ডো-গ্রীক বা হিন্দ-গ্রীক সম্রাট। ইহার পর গান্ধারে ইণ্ডো সিদীয় ও পার্থীয় সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গণ্ডোফার্ণেস সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ইণ্ডো-সিদীয় সম্রাট। গণ্ডো ফার্ণেসের নামাঙ্কিত মুদ্রা এখনও পর্য্যন্ত আফ-গানিস্থানের ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া থাকে।

ইণ্ডো-সিদীয়দের পর কুশান সম্প্রদায় কাদফিসেস নামক নৃপতির নেতৃত্বে গান্ধার অধিকার করে। কাদফিসেসের সময়ে ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্য বিনিময় প্রবর্ত্তিত হয়। কাদফিসেস রোম সম্রাট ট্রাজানের সভায় দূত প্রেরণ করেন।

ভীম কাদফিসেস নামক নৃপতির নাম গান্ধারে প্রাপ্ত কতিপয় মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখা যায়। খরোষ্ঠি বর্ণমালায় নামগুলি লিখিত। খরোষ্ঠিই প্রাচীনকালে গান্ধার বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত ভাষা। কাদফিসেস হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুদ্রায় ত্রিশূল চিহ্ন ক্ষোদিত দেখিয়া বুঝা যায়। কাদফিসেস আপনার নামের পূর্ব্বে 'মহেশ্বর' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি আপনাকে শিবাবতার বলিয়া মনে করিতেন, এইরূপ কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের ধারণা।

গান্ধারে যাঁহার প্রভাব সর্ব্বাধিক এবং যাঁহার সময়ে গান্ধারপদ্ধতি পূর্ণ বিকাশ বা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সেই সম্রাট কনীষ্ক তাঁহার মুদ্রা সমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাত সম্পূজিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া যে সাম্য ও সমন্বয়ের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন তাহা সম্রাট কনীষ্কের সম্রাটোচিত উদারতার পরিচয় দিতেছে সন্দেহ নাই। হবিশান সাম্রাজ্যের সকলকেই তিনি সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কনীষ্ক নিজে অত্যন্ত

অনুরাগী বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মুদ্রায় বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। হিন্দু শিব, গ্রীক হেলিয়স (সৌর দেবতা), পারসিক বা ইরাণীয় প্রধর্ম্মো মূর্ত্তিও তাঁহার মুদ্রায় আমরা দেখিতে পাই। বর্ত্তমান পাকিস্থানী সরকারের ব্যবহারের সহিত সম্রাট কনীষ্কের ব্যবহারের কি প্রকাণ্ড পার্থক্য।

গ্রীক ও ভারতীয় ভাবের সমন্বয়ে গান্ধার পদ্ধতির উদ্ভব বটে, কিন্তু সত্যকার সমন্বয় সম্ভব হয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। গ্রীক আদর্শ এবং ভারতীয় আদর্শ উভয়েই আছে, এক নহে। জাতির বৈশিষ্ট্য শিল্পেও সঞ্চারিত হয় সন্দেহ নাই। গ্রীকদের নিকট মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক ক্ষমতাই সর্ব্বস্ব। ঐ দুইটিই গ্রীক শিল্পীর আদর্শ। অন্যদিকে ভারতের শিল্পীরা শরীর ও মনের উপরে যে আত্মা ও অধ্যাত্মজগৎ তাহাদেরই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই শিল্পানুশীলনে প্রযত্ন করিয়াছেন। যাহা মৃত্যুশীল, তাহা কোনদিনই ভারতবর্ষের কাম্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষ শরীরকে উপেক্ষা করিয়াছেন ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিত আছেন যাঁহারা ভারতবর্ষে কোন সুগঠিত বা সামঞ্জস্যশালী সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মুখগুলা দেবমূর্ত্তি বা বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলে তাহার মূলে গ্রীক প্রভাব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত কোনারকের সূর্য্য মূর্ত্তিতেও গ্রীক প্রভাবের বিদ্যমানতার কথা কহিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইঁহাদের বিশ্বাস অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেই ভারতীয় শিল্পীরা অধিক অভ্যস্ত।

ইঁহারা একান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভারতীয় শিল্পীরা দেব দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে শারীরিক সৌন্দর্য্যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহাতে দেহাতীত, অপার্থিব একপ্রকার ভাবও সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। গ্রীক শিল্পীরা মূর্ত্তিকে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" যাঁহারা এই বাক্য বলিয়াছেন তাঁহারা শরীরকে অবহেলা করেন নাই। নরবপু যাঁহার স্বরূপ ইহাই যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা মানুষের শরীরকে উপেক্ষা করিবেন কিরূপে? তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষ সুন্দরের উপাসনায় গ্রীসের অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইয়াছে। ইহাও উপলব্ধ হইবে, ভারতবর্ষ গ্রীসের শিষ্য নহে, গ্রীসই ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা শিক্ষা করিয়াছিল।

প্রাভা

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রভাত অরুণ তুমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরের আবেগ,
হে তরুণ বৈশাখের মেঘ।
চিন্তার পিঙ্গল জটা, দিগন্তের সীমারেখা ছাপি,
যৌবনের রুদ্ধ দ্বারে বারি বার উঠিতেছে কাঁপি,
ঝাঁপায়ে পড়িতে বিশ্বে জনতার অবরুদ্ধ প্রাণে,
হোক আজ তা'র অভিষেক,
হে সুন্দর বৈশাখের মেঘ।

এখন প্রভাত শুধু মেঘ মুক্ত নহে আজো রবি,
হে উদ্দাম, তব স্পর্শ লভি,
ছিন্ন হোক মেঘমালা শাণিত সত্যের নগ্ন অসি
জঞ্জাল করুক দূর—অন্যায়ের বাঁধ যাক্ ধ্বসি',
সেই শুভদিন লাগি স্বদেশের সাথে এক কোণে
উৎকণ্ঠায় চেয়ে আছে কবি,
মেঘমুক্ত বহে আজো রবি,

কার পদধ্বনি শুনি ঐ বুঝি উঠে এলো ঝড়,
ভেসে আসে কার কণ্ঠস্বর।
তোমার পশ্চাতে দেখ অজস্র জীবন স্পন্দমান,
হে তরুণ বলদর্পী—কণ্ঠে তব রুদ্রের আহ্বান,
আমার ভাষায় আজ তোমার বিজয়-যাত্রা হোক,
চাহিয়া দেখুক চরাচর,
জাগুক তোমার কণ্ঠস্বর।

P. G. A.
CON -ROOM

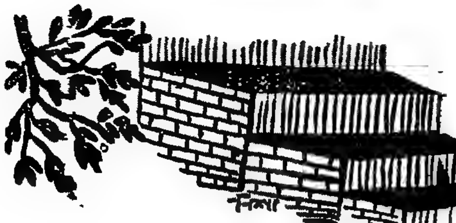

দিদিরাণীর ঘাট

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

রোগের ৮ম দিন। আশা আর বিশেষ কিছু নেই, ডাক্তার বা দাদার মুখে স্পষ্ট সে-কথা না শুনলেও বুঝতে কি পারি না। তবুও মনে আশা যায় না—হয়ত সবই যাবে কেটে। সেই আশাটুকু আছে বলেই বোধ হয় এখনও দাঁড়িয়ে আছি—প্রয়োজনে কথাও বলি, ঘুরেও বেড়াই।

প্রাণে একটা দারুণ আতঙ্ক হয়েছে, ডাঃ রায়ের পাশ ছেড়ে নড়তে পারি না। চোখের আড়াল করতে বুক যেন কেঁপে ওঠে—কি জানি আমার চোখের আড়াল হয়ত সইবে না। হয়ত সেই অবসরটুকুর জন্যই আর একজন রোগশয্যার পার্শ্বে পরপারে আছে দাঁড়িয়ে—। নেহাত একটু আধটু ঘর ছেড়ে যেতে হলেও বরুণকুমারকে পাশে বসিয়ে রেখে যাই, বলি—পিসেমশাইকে ছুঁয়ে বসে থাকিস্, একটুও যেন ছেড়ে দিস্ না। সে কি বোঝে জানি না—একভাবে ছুঁয়ে থাকে বসে, একটুও নড়ে না।

বেলা তখন বোধ হয় তিনটে। ডাঃ রায়ের জ্বর আবার বাড়তে সুরু হয়েছে—১০৩-এর নীচে আর দু'দিন ধরে নামছেই না। এমন সময় অজিত ছুটে এল ঘরে। চাপা গলায় আমার কাণের কাছে বলল, "দাদু এসেছেন"।

চমকে উঠে দাঁড়ালাম। "কৈ?"

বললে, "দোতালা পর্য্যন্ত উঠে সিঁড়িতে বসে পড়েছেন—একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। যাই, আবার ধরে আস্তে আস্তে তুলে আনতে হবে ত'।"

চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলাম। একটু ইতস্ততঃ করে শুধাল, "একেবারে কি এ-ঘরে—নিয়ে আসা ঠিক হবে?"

গলা দিয়ে কথা বেরুল না, ইসারায় পাশের ঘর দেখিয়ে দিলাম।

উনি যে এখনও শয্যা ছেড়ে ওঠা বারণ—ওঁকে আসতে হ'ল আমারই বাড়ীতে নিজের সন্তানকে দেখতে। এ কি আমার জয় না পরাজয়?

অজিত নিষেধ করেছিল কি না জানি না—বৃদ্ধ কিন্তু সটান চলে এলেন এ-ঘরেই কিন্তু একেবারে নিঃশব্দে। এসে দাঁড়ালেন ডাঃ রায়ের শিওরের কাছে এমন ভাবে যে, ডাঃ রায় চোখ চাইলেই দেখতে না পান। ঈষৎ মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আমি সরে গিয়ে দাঁড়ালাম ঘরের এক কোণে—বৃদ্ধের পিছনে।

বৃদ্ধের কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, একদৃষ্টে চেয়ে আছেন পুত্রেরই মুখের পানে—স্তব্ধ গম্ভীর চাহনি। কিছুক্ষণ এইভাবে গেল—হঠাৎ ডাঃ রায় চোখ চাইলেন। কাতরোক্তি করে এ দিক ও-দিক চাইতে লাগলেন—বোধ হয় আমারই সন্ধানে। চোখ পড়ল পিতার মুখের উপরে—একদৃষ্টে খানিকক্ষণ রইলেন চেয়ে—চোখ বুজে গেল। ডাঃ রায় চোখ চাইতেই আমি দু'পা এগিয়ে গিয়েছিলাম। লক্ষ্য করলাম—চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের কোণ দিয়ে অশ্রুজল বেয়ে পড়তে লাগল। বৃদ্ধ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন—মুখের ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।

আরও কিছুক্ষণ এইভাবে গেল। হঠাৎ বৃদ্ধের কি মনে হ'ল জানি না—ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন…অজিতও গেল সঙ্গে। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলাম রুগ্নশয্যার পার্শ্বে—কি না জানি ডাঃ রায় বলতে চেয়েছিলেন আমাকে। প্রাণভরা আবেগ ঢেলে দিয়ে হাতখানা রাখলাম ডাঃ রায়ের গায়ের উপরে।

মনে হল বৃদ্ধ পাশের ঘরে বসলেন—আমার হাতের স্পর্শে ডাঃ রায় আবার চোখ চাইলেন। চোখ এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

শুধালাম, "কি দেখছ?"

চোখে তখনও জল; একটু ম্লান হেসে বললেন, "স্বপ্ন দেখেছি।"

শুধালাম, "কি স্বপ্ন দেখেছ?"

বললেন, "বাবা—"

সত্য কথা বলব কিনা বুঝতে পারলাম না—হয়ত সে আবেগ সইতে পারবেন না। চুপ করেই রইলাম।

একটু পরে আবার বললেন, "কেমন আছেন—বাবা?"

বললাম, "বেশ ভাল আছেন—আমি রোজ খবর নিচ্ছি।"

বললেন, "জানেন—আমার অসুখ?"

বললাম, "নিশ্চয়ই জানেন—অজিত রোজ দু'বেলা খবর দেয়।"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, "ছটফট করছেন—আসতে ত পারেন না—তাই স্বপ্নে দেখা দিলেন।"

চোখ বুজে গেল। আকুলভাবে মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। আবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কেন?

সত্যিই কি এবার স্বপ্ন দেখছেন—

* *

একটু পরেই অজিত এসে আমার কানে কানে বলল, "দাদু ডাকছেন।"

চমকে উঠলাম। ইসারায় শুধালাম, "আমাকে?"

অজিত মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে 'হ্যাঁ'।

উঠলাম। বরুণকুমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম—ডাঃ রায়কে ছুঁয়ে বসে থাকতে।

বসন সংযত করে, ধীর কম্পিত পদে ওঘরে গেলাম। প্রণাম করলাম—বৃদ্ধের পায়ের কাছে। কি একটা বলে আশীর্বাদ করলেন—কথা জড়িয়ে গেল, বোঝা গেল না। তবে 'সাবিত্রী' কথাটা কানে এল। সাবিত্রীই ত প্রাণশক্তির জোরে স্বামীকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল।

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে রইলেন চেয়ে। পরে ইসারায় পাশে বসতে বললেন। যন্ত্রচালিতের মত বসলাম।

কম্পিত হস্তে সোনাবাঁধান একজোড়া শাঁখা পকেট থেকে বার করলেন। কম্পিত হস্তে আমার একখানি হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে—নিজের হাতেই শাঁখা পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অসমর্থ আঙুলগুলি পেরে উঠল না। তখন আমি নিজেই শাঁখা জোড়া দু'হাতে পরে পায়ের ধুলা নিলাম।

একটু চুপ করে থেকে, যেন নিজেকে সংযত করে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, "এই শাঁখা জোড়া অজয়ের মায়ের হাতে ছিল—অজয়ের স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। এতদিন সে অনুরোধ রাখিনি—"

আবার একটু চুপ করে থেকে একটু অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বরে বললেন, "এই শাঁখা জোড়ার মান যেন তোমার হাতে বজায় থাকে।"

আমার কি হল জানি না—নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লাম—নিজের বুকেই নুয়ে পড়ল নিজের মুখ। বৃদ্ধ কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

বৃদ্ধ বললেন, "আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি—এই কথাটা অজয়কে জানিয়ে দিও।"

*

ভেবেছিলাম বৃদ্ধকে অনুরোধ করব—এই অবস্থায় আপনি চলে যাবেন না; দয়া করে এই বাড়ীতেই থাকুন—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কোনও কথাই বেরুল না। তাই বোধ হয় অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, দাদার সঙ্গে কথা বলার জন্য এঘরে একবার এলে দাদা যখন বললেন যে, উনি পাশের ঘরে শুয়ে আছেন—ফিরে যাওয়ার শক্তি আর নাই—তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ডাঃ রায় যদি মহাযাত্রাই করেন যাত্রা-মুহূর্ত্তে এতটুকু ত্রুটী যেন কোন দিক দিয়ে না থাকে

রুগ্নশয্যার পাশে বসেই টের পেয়েছিলাম দাদা এসেছেন। দাদার সঙ্গে বুদ্ধের ২।৪টে কথাবার্ত্তা চাপা গলায় ওঘরে হয়েছিল তাও জানি। কি কথা হয়েছিল জানি না—দাদা-কিন্তু একলাই এ ঘরে এসে রোগীকে দেখে গেলেন, বুদ্ধকে সঙ্গে আনেন নি।

কথায় কথায় দাদা বললেন "ওঁকে এখন রোগীর সামনে না নিয়ে আসাই ভাল। বুদ্ধিমান লোক ত। সে কথা বলতেই বুঝতে পারলেন। ডাক্তার এলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।"

একবার এসেছিলেন, দাদা তা জানেন কি না—এ সব কথা নিয়ে কথা কইবার ইচ্ছা আদৌ হল না। শুধু শুধালাম "ডাক্তার কখন আসবেন?"

বললেন "এখুনিই ত এসে পড়বার কথা।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম "ওঁর খাওয়া দাওয়ার"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাদা বললেন "তুই সে সব নিয়ে কিছু ভাবিস না। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করছি।"

দাদাই ব্যবস্থা করেছিলেন বোধ হয়—বিকেলে দুজন ডাক্তার এলেন। অনেকক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা করে পাশের ঘরে গিয়ে দাদা ও ডাঃ রায়ের পিতার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হল জানি না। ডাক্তাররা চলে গেলে, যখন বুঝলাম—দাদা ও ঘরে একলাই আছেন—একবার গেলাম ও ঘরে।

আমাকে দেখেই দাদা বললেন "একই ভাবে আছেন, ভালর দিকেও যায়নি, তবে খারাপও কিছু হয়নি।"

শুধালাম "উনি কোথায়?"

বললেন "উনি পাশের ঘরেই আছেন, অজিত আছে ওঁর কাছে।"

একটু চুপ করে থেকে দাদা বললেন "ডাঃ রায় বড্ডই অসুখের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকুন না—জ্ঞান ত বেশ জানাই আছে। তাই ডাক্তাররা আজকের দিনটা ওঁকে রোগীর সামনে যেতে বারণই করলেন। কাল সকালে জ্বর কমে যাবে আশা করি, তখন দেখে যা হয় করা যাবে।"

আগ্রহভরে শুধালাম "কাল সকালে জ্বরটা কমে যাবে?"

বললেন—"ডাক্তার ত তাই আশা করেন। যে কোনও দিন সকাল থেকেই ভালর দিকে যেতে পারে। হার্টের অবস্থা ত এখনও ভাল।"

প্রাণটা যেন আনন্দে হঠাৎ নেচে উঠল।

*

গভীর রাত্রি। হঠাৎ ডাঃ রায় চোখ চাইলেন। ব্যস্ত ভাবে ডাকলেন "বুলা! বুলা!"

'এই যে আমি।'—মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লাম।

বললেন—"বাক্সটা, সেই বাক্সটা?"

বললাম—"খাটের নীচেই আছে।"

ব্যগ্রভাবে বললেন—"দাও, আমাকে দাও।"

কোনও কথা না বলে খাটের নীচে থেকে বাক্সটা বার করে রাখলাম খাটের উপরে ওঁর পাশে।

ওঁর কম্পিত হস্ত ইতিমধ্যে বালিশের নীচে চাবি খোঁজার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি চাবিটা নিয়ে ওঁর হাতে দিয়ে শুধালাম "খুলবে বাক্স?"

বললেন—"হ্যাঁ—খোল।"

আমারও হাত কাঁপছে। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলে ফেললাম।

শুধালেন—"ওর মধ্যে একখানা মোটা খাতা আছে না?"

খুঁজে বার করলাম।

বললাম—"হ্যাঁ"।

"পড়ে দেখ—শুধু তুমি—দাদামশাই দিয়েছেন—কেউ জানে না।"

আর যেন কথা বলতে পারলেন না—ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়লেন।

স্তম্ভিত হয়ে খাতাখানা খুললাম। চমকে উঠলাম—প্রথম পাতায়ই লেখা—"সুশান্ত সা।"

(আত্ম-জীবনী)

*

পরের দিন সকাল বেলা জ্বর কিন্তু কমল না। বরং এমন একটা আচ্ছন্ন ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন যে, বাহ্য

জ্ঞান যেন কিছুই নেই। অনেকক্ষণ ডাকলে এক একবার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। ডাক্তার এলেন—অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে সকলের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হল জানি না—সেদিকে কাণ দেওয়ার ইচ্ছা হল না। চোখে যেন সব ঝাঁপসা দেখছি, কাণে কারও কোনও কথাই ভাল আসছে না। স্তম্ভিত হয়ে রোগীর খাটে রোগীকে ছুঁয়ে বসে আছি, এমন কি, পরিচর্য্যার জন্য নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকুও যেন ক্রমে লোপ পাচ্ছে। তাই বোধহয় অজিত যখন আমার কাছে এসে একটা টেলিগ্রাম দেখিয়ে চাপাগলায় বললে "দিদি লক্ষ্ণৌ থেকে জরুরী তার পাঠিয়েছে—উত্তর পেলেই রওনা হবে"—কথাগুলো যদিও কাণে গেল প্রাণের মধ্যে গিয়ে একেবারেই পৌঁছল না।

ডাক্তার চলে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ রায়ের পিতা ঘরের মধ্যে এলেন, বসলেন রোগীর খাটে, হাত রাখলেন রোগীর গায়ে অনেকক্ষণ বসে। আমি তাঁর মুখের দিকে একবারও তাকাই নি কিন্তু আমি খাট থেকে উঠে যাই নি, ঘোমটা টেনে সরেও দাঁড়াই নি।

দ্বিপ্রহর কেটে গেল, একই ভাবে বসে আছি। কিছুক্ষণ আগে ডাঃ রায়ের পিতাকে অজিত ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেছে। ক্রমে দাদা ঘরে এসে বসলেন আমার পাশে।

চপা গলায় বললেন—"তুই যা—মাথাটা ধুয়ে ছুটো খেয়ে আয়। আমি আছি এখানে।

দাদার কথা অমান্য করার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই কিন্তু উঠে যাওয়ার শক্তি যেন আর নাই।

দাদা আর কিছু না বলে কিছুক্ষণ বসে উঠে চলে গেলেন। কতক্ষণ পরে জানি না, দাদা আবার এলেন ফিরে; সঙ্গে এলেন—এ কি বৌদি! হঠাৎ সমস্ত শরীর দারুণ কম্পনে উঠল কেঁপে। পরম স্নেহভরে বৌদি খাটে আমার গা ঘেঁষে বসে হাত রাখলেন আমার পিঠে। বৌদির সে স্পর্শ কিন্তু সইতে পারলাম না। সমস্ত দেহ একেবারে এলিয়ে ভেঙ্গে পড়ল। লুটিয়ে পড়লাম বৌদির কোলে।

বৌদিও আজ এসেছেন আমার বাড়ী, আমার জন্যের কোনও দিক দিয়ে কি কোনও ত্রুটী রেখে যাবেন না।

*

রাত্রি তিনটের সময় আমার জীবনের অঘটন ঘটল। মুদ্রিতনেত্রে বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন শিওরে, আমি লুটিয়ে প্রণাম করলাম পায়ের তলায়। প্রাণ ঢেলে বললাম, "পরলোকে তাকে নিয়ে সুখী হয়ো, আজ শুধু এই কামনাই করি। শুধু পায়ের তলায় রেখে দিও আমার এই প্রণাম—আর কিছু চাই না।"

প্রণাম করতে গিয়ে মাথায় ঠেকল—সোনাবাঁধান শাঁখা। বলা ত' হ'ল না—

*

দেখতে দেখতে সাত দিন গেল কেটে—কাল মুহূর্ত্তের তরেও দাঁড়ায় না, সেইটেই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

বৌদি এ-ক'দিন এ-বাড়ীতেই ছিলেন—আজ সকালে ও-বাড়ী গেছেন চলে। আজ বিকেলে দাদার গাড়ী নিয়ে আসার কথা, আমি বরুণকুমারকে নিয়ে যাব ফিরে। এখন দ্বিপ্রহর।

দাদা এ-ক'দিন দিনের বেলাটা এ-বাড়ী ও-বাড়ী ক'রে সন্ধ্যাবেলা ও-বাড়ীই ফিরে যেতেন…মেয়েরা আছে সেখানে। আজ বিকেলে আমি ফিরে যাব—কাল এসে দাদা সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবেন—এই রকম ব্যবস্থা। কাল এ-বাসা যাবে ভেঙ্গে—

এখন দ্বিপ্রহর, মাঝের ঘরে একটা মাদুর পেতে আমি শুয়ে আছি। রাত্রেও এইভাবেই শুই—ও-ঘরে যাই না। ও ঘর যেন এখন অপরের, আর আমার প্রবেশেরও অধিকার নেই।

শুয়ে শুয়ে সুলাক্ষণা'র নিজের হাতে লেখা আত্ম-জীবনী পড়ছি—দু'তিন দিন হ'ল আরম্ভ করেছি বইখানা পড়তে। দু'তিন দিন থেকে বৌদি দিনের বেলায়ও কিছুক্ষণের জন্য ও-বাড়ী যেতেন—সেই হ'ল সুযোগ।

অন্তিম আশীর্ব্বাদ তাঁর—বইখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এই আশীর্ব্বাদই এখন আমার একমাত্র সম্বল—একান্ত সান্ত্বনা। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে উঠি—নিজেকেও খানিকক্ষণের জন্য যাই ভুলে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—অপরাহ্নে ঘুম গেল ভেঙ্গে। চারিদিকেই যেন একটা বিষাদের ছায়া—সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। স্তব্ধ হয়ে রইলাম বসে। হঠাৎ মনে পড়ল—

"সাবিত্রী এল, চলে গেল। মটিবৌঠান এল, জন্মের মত ছেড়ে গেল। জীবন আবার নূতন করে হবে সুরু—তাই এখন আমার চারিদিকে সবই চুপচাপ নিস্তব্ধ—।"

বরুণকুমার কোথায় ছিল জানি না—হঠাৎ ছুটে এসে পিছন থেকে আমার গলা জড়িয়ে মাথার উপর মুখ রেখে বললে, "গাড়ী এসেছে নীলমাজী—"

(প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত)

পদাবলী সাহিত্য ও লীলাতত্ত্ব

শ্রীকালিদাস রায়

লৌকিকতা—পদাবলীর কবিত্বরস পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে লীলাতত্ত্বেরও জ্ঞান থাকা চাই। পদাবলীকে সাধারণ নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের কবিতা মনে করিয়া উপভোগ যে করা যায় না তাহা নহে। নরনারীর প্রেমজীবনের বীজনিহিত ভ্রূণাঙ্কুর হইতে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত সমস্ত বৈচিত্র্যের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিলাস, জগতের কোন প্রেমসাহিত্যে এমনভাবে পুষ্পিত রূপায়ণ লাভ করে নাই। পদাবলী সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের প্রেমিক প্রেমিকার মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশের সকল অনুভূতিকে ভাষা দিয়াছে। প্রেমের এমন গভীর আর্ত্তি, আকুলতা, আকূতি, আত্মবিস্মরণ ও আত্মবিসর্জ্জন কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আবেদনের যে সার্ব্বজনীনতা ও অভিব্যক্তির চিরন্তনতা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—পদাবলীতে তাহার অভাব নাই সাহিত্য রসিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

আধ্যাত্মিকতা—পদাবলী সাধারণ প্রেম কবিতা মাত্র নয়, ইহার একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে এই সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলে পদাবলীর সাহিত্যরসোপলব্ধি সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে। তাহাতে ইহ উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্তরে আরো একগ্রাম উপরে উঠিয়া যাইবে। পদাবলীর রচনার অঙ্গে সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও নাই। ইহা থাকিলে সাধক কবিদের মতে রসাভাস ঘটিত। আধ্যাত্মিক সার্থকতা পদাবলীর অঙ্গীভূত নয়—ইহা লীলাতত্ত্ব হইতে আরোপিত অথবা লীলাতত্ত্বজ্ঞ পাঠকের মন হইতে সঞ্চারিত। ভক্তজ্ঞ পাঠকের কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা তরুণতরুণীর প্রেমবিলাস মাত্র নয়—সচ্চিদানন্দেরই লীলা-বিলাস।

কীর্ত্তন সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত—পদাবলী সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দিয়া গিয়াছেন শ্রীচৈতন্য দেব কীর্ত্তন সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। নামকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যের আগেও ছিল। রসকীর্ত্তন বা পদাবলীকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাহার সহযোগিগণ। এই কীর্ত্তনসঙ্গীতের অভিনব দেশকালাতীত সুর ও করুণ আকুতি পদাবলীকে যে লোকোত্তর ব্যঞ্জনা দান করে—তাহা আমাদের চিত্তকে এই লৌকিকজগৎ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে। কীর্ত্তনসঙ্গীতের মধ্য দিয়া আমরা যদি পদাবলী উপভোগ করি তাহা হইলে আমরা যে কবিত্বের আস্বাদ লাভ করি—তাহা সাধারণ Romantic কবিতায় পাই না। ইহা ছাড়া, কীর্ত্তনসঙ্গীতের আবেষ্টন, লক্ষ্য-উপলক্ষ্য ও গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা প্রারম্ভ সমস্ত মিলিয়া আমাদের চিত্তে একটা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। তাহাই পদাবলীতে সঞ্চারিত হইয়া তাহার আস্বাদমানতা লোকাতীত করিয়া তুলে।

কীর্ত্তনসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আমাদের মত অভক্ত লোকদেরও দেহে ও মনে যে সাত্ত্বিক রসের সঞ্চার হয়—তাহা ব্রহ্মাস্বাদসহোদরের উন্মেষজনিত। বাচ্যাতীত সাহিত্যরসের ইঙ্গিত ছাড়া ব্রজলীলার কোনপদের কোন অংশে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার কোন ইঙ্গিত নাই তাহাও সত্য নয়। অবশ্য রসাভাস বাঁচাইয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকুই কোন কোন পদে আছে। অনেক সময় রচনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু থাকিলে পাঠকের মনকে সাধারণতঃ বাচ্যাতীত অর্থের দিকে লইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে; সোনার তরী—ঘনবর্ষা—পাকা ধান—সোনার ধানে সোনার তরী বোঝাই—ঠাঁই নাই, ঠাঁই ছোট সে তরী—সোণার তরীর নিরুদ্দেশ প্রয়াণ শূন্য নদীর কূলে ধানের অধিকারী পরিত্যক্ত। এই সকলের মধ্যে যে একটা অস্বাভাবিকতার অনুক্রম রহিয়াছে—তাহাতে পাঠকের মন বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া যাইতে বাধ্য। কবি অবশ্য ইহাতেই নিশ্চিন্ত হ'ন নাই। তিনি তরীটিকে কাঠের তরী না করিয়া সোনার তরী বানাইয়াছেন। গোড়াতেই কবি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—মনে থাকে যেন ইহা সোনার তরী—তাহাই মনে

রাখিয়া ইহার অর্থ সন্ধান করিও। পদাবলীর মধ্যে আমরা অভিসারের পদগুলিতে এইরূপ অস্বাভাবিকতার আভাস পাই—অভিসারের পথকে বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তির সমন্বয়ে এমনি অস্বাভাবিক রূপ দুর্গম করিয়া তোলা হইয়াছে যে ঐ পদগুলিকে নায়কের উদ্দেশে নায়িকার চিরপ্রচলিত অভিসারের বর্ণনা মাত্র মনে করিয়া আমাদের চিত্ত বিশ্রাম করিতে পারে না।

এখানে নায়ককে অসীম, অনন্ত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পূর্ণ, নিত্য এমনই একটা কিছু মনে হইলেই কবির অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে। লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলেও প্রত্যেক কাব্যরসিক চিত্ত লোকাতীত ব্যঞ্জনা লাভ করিয়া পদের কবিত্বরস উপভোগ করিতে আগ্রহান্বিত হইবে।

ভণিতায় ইঙ্গিত—পদাবলীর ভণিতাগুলিতে সংক্ষিপ্ত ২।৪টী কথায় পদকর্ত্তারা স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন—তাঁহারা কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনাসক্ত বা উদাসীন বর্ণনাকারী শিল্পী মাত্র নহেন, ঐ লীলা নিজেরা উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা লীলাসহচর বা লীলা-সহচরী। তবে এ কোন লীলা যে লীলায় সাধকভক্ত কবি লীলাসঙ্গীর অভিনয় করিতেছেন? ভণিতায় আভাসিত পদকর্ত্তাদের সখীভাবই সমস্ত পদটিকে প্রাকৃত ও লৌকিক স্তর হইতে লোকাতীত স্তরে উদ্বর্ত্তিত করিতেছে।

আবেষ্টনীর ইঙ্গিত—রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব আমরা বুঝি আর না বুঝি—লীলাক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, বনও নয়, সাধারণ লোকালয়ও নয়। গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র নয়—মায়াকলিত বিগ্রহ, বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ রাখালিয়া বাঁশীর গান মাত্র নয়—এ কথা মনে না আসিয়া পারে না।

যেভাব স্বপ্নের আবেষ্টনের মধ্যে এই বৃন্দাবনী লীলা, তাহার মধ্যে মানবহৃদয় ছাড়া বাস্তব কিছু নাই, রক্ত-মাংসের একটা মানুষ নাই, সবই যেন মায়াবিগ্রহ। পদাবলী পাঠকের চিত্তে এ সব কথা স্বতঃই আবির্ভূত হয়।

রসের ইঙ্গিত—পদাবলী সাহিত্য প্রধানতঃ আদিরসের রচনা, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা অলৌকিক কারুণ্যধারা প্রবাহিত। যে ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচিত সে ধাম ত কালিদাসের অলকাপুরীর মত আনন্দধাম। সেখানে প্রাকৃত দুঃখের রেখাটিও নাই। তবে এ কারুণ্য কিসের জন্য?

শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিতে যে সুবল-শ্রীদামের চোখে জল আসে, গোপালের গায়ে হাত দিলে যশোদার চোখে যে জল আসে—ইহা কোন কারুণ্য? বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীদের মন যে কোন অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে, ইহা কোন বেদনা? যে কারুণ্যে রাধাশ্যাম দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে, নিমিখে মানয়ে যুগ ক্রোরে দূর মানি—সে কারুণ্য কিসের? ভাব সম্মেলনের উল্লাসও গভীর কারুণ্যের নামান্তর। মাথুরের হাহাকার কি যমুনার এপার-ওপার ব্যবধানটুকুর জন্য? জনম অবধি রূপ দেখিয়াও যে নয়ন তৃপ্ত হয় না, লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়াও যে হৃদয় জুড়ায় না—তাহা কোন অতৃপ্তির বাণী? এ সকল প্রশ্ন পাঠকের মনে আসা স্বাভাবিক। মনে আসিলেই স্বতঃই মানবজীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, সসীমতা, অসহায়তা, অস্বস্তি ও অশক্তির বেদনার সুরই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা শুনিতে পাই। মানবাত্মার এই Tragedyই মাথুর।

হৃদয়ে যে কোন মধুর বৃত্তি গভীর গাঢ় ও অন্তর্গূঢ় হইলেই আমরা পূর্ণের সান্নিধ্য লাভ করি—তখনই আমরা নিজেদের অপূর্ণতাও উপলব্ধি করি—সেই উপলব্ধি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করে, ব্রজের কারুণ্যও কি তাহাই নয়?

রূপানুরাগের ইঙ্গিত—বৈষ্ণব কবির রূপানুরাগ প্রাকৃত প্রেমের রূপানুরাগের মত নয়। যে রূপ দেখিয়া রাধা মুগ্ধ সে রূপ কামনাময় দেহকেই আশ্রয় করে নাই—তাহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রূপ আকাশে, মেঘমালায়, বনের তমাল-শ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের চিক্কণতায় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ শ্যামরূপ Pantheistic Manifestation বহু কবিতাতেই দেখা যায়। রাধা বলেন—দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।

এই রূপদর্শনের অনুরাগ প্রাকৃত অনুরাগের মত নয়।

এই অনুরাগের বিভাবও স্বতন্ত্র। এই অনুরাগের যে বেদনা তাহা প্রেমার্তি মাত্র নয়। প্রেমার্ত্তির বর্ণনা আমরা সংস্কৃত কাব্যে যথেষ্টই পড়িয়াছি। ইহার সঙ্গে সে-সবের মিল হয় না। এ বেদনার কবি কালিদাস নহেন, চণ্ডীদাস। এই যে অনুরাগ ইহা একের প্রতি অনুরাগ—কিন্তু সমগ্র জগতের প্রতি—নিজের দেহের প্রতি—নিজের জীবনের প্রতিও বিরাগ, রাধা তাই যোগিনী-বৈরাগিণী। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে পদাবলী আদি শৃঙ্গার করুণ রসেরই কাব্য নয়—শান্তরসের কাব্য, বৈরাগ্যেরই কাব্য। বৈরাগ্যের কাব্য বলিয়াই ইহার আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। বৈরাগ্যের কাব্য বলিয়াই বৈরাগীদের দ্বারা রচিত হইয়া বৈরাগীদের উপভোগ্য হইয়া আছে।

অর্থের ইঙ্গিত—পদাবলীর কোন পদের অর্থবোধ বা উপভোগ একদিনে সমাপ্ত হয় না। জীবনের দশা, প্রকৃতি ও গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক একটি পদের নব নব সার্থকতা আবিষ্কার করিতে পারিবেন। ঘষিতে ঘষিতে যেমন চন্দনের গন্ধের বিস্তার হয় তেমনি প্রত্যেক উৎকৃষ্ট পদ ধীরে ধীরে পাঠকের মনে নব নব অর্থের বিস্তার করিবে। জীবনের অপরাহ্নে যখন জীবন ও ভুবন গেরুয়া রঙে রঞ্জিত হয়—তখন সকল পাঠকের মনেই 'শেষ অর্ধখানি যে দিকে যাওয়ার' কথা সেই দিকেই যাত্রা করে।

আধ্যাত্মিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার উপর একটি কবিতা লেখেন—তাহার প্রথম পংক্তি শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? প্রশ্নচ্ছলে তিনি আধ্যাত্মিকতাকেই বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য উপজীব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই একথা বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত প্রেমের লীলা-বিলাস রূপে ইহার গৌণ সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের দুইটী পংক্তি পদাবলীর রসব্যাখ্যায় মূল সূত্র স্বরূপ হয়া যাইতে পারে।

১। প্রিয়েরে দেবতা করি দেবতারে প্রিয়—

২। যারে ব'লে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।

তিনি বলিয়াছেন ইহা 'বড় শক্ত বুঝা'। বড় শক্ত বুঝা বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত অর্থ আধুনিক পাঠক বুঝিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে সে তত্ত্ব অতি অল্প কথায় যাহা বুঝাইয়াছেন—তাহা কোন বৈষ্ণব গোস্বামী বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম এবং আকাশই। সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্য। ব্রজের কৃষ্ণরূপও রাধা-রূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—রস সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রাকৃত প্রেমের বিভিন্ন স্তরের অভিব্যক্তি মনে করিলেও সাহিত্য রস উপভোগ করা যে যায় না তাহা নয়—তবে তাহা অসম্যকরূপে চর্ব্ব্যমান হওয়ায় পরিপূর্ণ রসদান করে না। রসজ্ঞ পাঠকের মন তাহাতেই বিশ্রান্ত হইতে পারে না। সকল পদের না হউক কোন কোন পদের সুর (যেমন চণ্ডীদাসের প্রধান প্রধান পদের) বাচ্যার্থ ছাড়িয়া দেশকাল উত্তরণ করিয়া উঠিয়াছে। বহুপদের ভণিতাতেও লোকোত্তর ইঙ্গিত আছে—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার উপর আছে লীলায়াবিষ্ট কবিমানসের সৃষ্ট অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের আবেষ্টনী। কাজেই পাঠকের চিত্ত সহজেই বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া উঠে। এজন্য কোন পাঠক ব্রজলীলাকে রূপক, কোন পাঠক Symbol, কোন পাঠক অপূর্ণের পূর্ণতা লাভের আকুল আগ্রহ (yearning for something afar from the sphere of our sorrow) প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় অভিব্যক্ত মনে করেন। আবার কেহ কেহ কবিগুরুর মত বলিবেন—"অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,—সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।" এই সত্যই পদাবলীতে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। পাঠক

যাহাই মনে করুন—তিনি এইগুলিতে একটা লোকোত্তর ব্যঞ্জনা না খুঁজিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। সাহিত্য রসবোধের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ইঁহাদের অনেকের মতে পদাবলী Transcendental কাব্য সাহিত্য। এই ধরণের সুর ধ্বনিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত চরণগুলিতে—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনো যে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে,
এখনো প্রেমের খেলা সারাদিন সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।

লীলাতত্ত্ব ও তাহার দ্বারা আরোপিত আধ্যাত্মিকতা—আরো নিঃশেষ করিয়া রস সম্ভোগ করিতে হইলে অর্থাৎ উহাকে Mystic কাব্য হিসাবে উপভোগ করিতে হইলে লীলারসের রসিক হইতে হইবে। আমাদের চিত্ত এমনি সংস্কারাচ্ছন্ন, আমাদের চেতোদর্পণ এমনই অমার্জ্জিত যে, সহজে সে উজ্জ্বল রসের উজ্জ্বলতা তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। এজন্য প্রথমে ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থের বাণীকে আপ্তবাক্য স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে—বৈষ্ণবভক্তগণের উপলব্ধ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে ব্রহ্মের সৃষ্টি (Creation), অভিব্যক্তি (Manifestation), বা বিবর্ত্তন (Evolution) নয়, ইহা যে তাঁহার লীলা-মাত্র,-এ সত্য উপলব্ধি করা সহজ নয়, এজন্য আপ্তবাক্য বা আর্ষবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। সাধারণ পাঠক যদি Transcendental কবিতা হিসাবে পদাবলীর রস উপভোগ করেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে আপ্তবাক্যনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করা ভুল। বৈষ্ণবভক্তদের মধ্যেই অনেকে উজ্জ্বল রসের অন্তর্নিহিত সার্থকতা উপলব্ধি করেন না, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেন। মানুষ ভালবাসে, জ্ঞান লাভ করে, কাজ করে আর খেলায় মাতে। জ্ঞান, কর্ম্ম আর প্রেম এই তিনটি বৃত্তি লইয়া তাহার সত্তা। কর্ম্মের মূলে আছে অভাব, প্রয়োজন ও দুঃখ, যে ভগবানের এসব কিছুই নাই কর্ম্মমার্গে তাঁহার সন্ধান বৃথা। জ্ঞানের পথে তাঁহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু জ্ঞান সকল মানুষের অধিগম্য নয়। তাই জ্ঞানপথে তাঁহার সন্ধান সার্ব্বজনীন নয়। প্রেমই সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের সর্ব্বস্তরের মানুষের সাধারণ জীবন ধর্ম্ম। প্রেমই মানুষকে জ্ঞানপথ হইতে আহ্বান করিয়া কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম দিয়া লীলায় মাতাইতে পারে।

লীলাই মানুষের অহৈতুকী আত্মাভিব্যক্তি। ভগবানকে তাই ভক্তিপথের সাধকগণ প্রেমময় ও লীলাময় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, প্রেমের বিবিধলীলার মধ্য দিয়াই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ ঘটিতে পারে। বৈষ্ণবভক্ত ও কবিগণ তাই প্রেমলীলার রস উপভোগ করাই ভজন সাধন মনে করিয়াছেন।

এই বিশ্ব লীলাময় ভগবানের লীলাবিলাস। কিন্তু লীলার রস পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করার জন্য তিনি সসীমকে আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। হইতে পারেন তিনি বিশ্বেশ্বর, হইতে পারেন তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি যখন একবার লীলায় নামিয়াছেন এবং আমাদের লীলায় ডাক দিয়াছেন—তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা ভগবত্তা কেন স্বীকার করিব? তাঁহাকে ভয়ই বা করিব কেন? পাছে অপরাধ হয়, এই ভাবিয়া কুণ্ঠাই বা প্রকাশ করিব কেন? তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সঙ্কোচই বা কি? খেলার সাথী যেই হউক তাহার সঙ্গে আমাদের যে আচরণ তাহাই তাঁহার প্রাপ্য। তিনি ইহাতে রাগ করিতে পারেন না—তাহা হইলে তিনি লীলাময় নহেন—ছলনাময়। নিজের ভগবত্তা তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।

বৈষ্ণব ভক্তগণ বলেন, বৃন্দাবনলীলায় তিনি সেই ভগবত্তা ভুলিয়াছিলেন—তাঁহার সেই ভগবত্তা ভোলা আর লীলায় মাতার গানই পদাবলী।

রবীন্দ্রনাথ ও লীলাতত্ত্ব—

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

১। আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাইত আমি এসেছি এই ভবে।

২। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু, আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

৩। দয়া ক'রে ইচ্ছা ক'রে
আপনি ছোট হয়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্যে সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা
জলে স্থলে দাও হে দেখা কতই আকারে।
বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হ'য়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে॥

এই সকল গানে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে লীলাময় রূপেই কল্পনা করিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণব রসতত্ত্বসম্মত, কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন—

আমিও কি আপন হ'তে করব ছোট বিশ্বনাথে,
জানাব আর জানব তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে?

এই উক্তি লীলাতত্ত্বের সহিত সমঞ্জস হয় না। লীলাময়ের সঙ্গে শান্ত বা দাস্যভাবে পরিচয় উচ্চাঙ্গের ভক্তির কথা নয়। বৈষ্ণব সাধক বলিবেন তিনি যদি লীলার জন্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—তবে তাঁহার লীলাসঙ্গী বা সঙ্গিনী হওয়াই ত তাঁহার পক্ষে পরম প্রীতিকর। লীলায় যোগ না দিলে তাঁহার সঙ্গে সংযোগ কি করিয়া সম্ভব?

তিনি আসলেন খেলা খেলিতে, আমি কি তাঁহার খেলায় যোগ না দিয়া ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতে থাকিব, অথবা জোড় হাতে দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্তব করিব? তাঁহার লীলায় যোগ দেওয়া এবং সেই লীলা উপভোগ করা ছাড়া আমার করিবার কি আছে? আমাকেও ভুলিতে হইবে তিনি ত্রিভুবনেশ্বর—লীলার রঙ্গভূমে আবার ছোট বড় কি? এই ব্যবধানটা জয় করাই উচ্চতর বৈষ্ণবসাধনা। পদকর্ত্তারা সকলেই লীলাসঙ্গী। তাঁহারা তাঁহাদের পদাবলীর রসসঙ্কেতের দ্বারা আমাদিগকেও লীলাসঙ্গী হইতে আহ্বান করিয়াছেন

রবীন্দ্রনাথ আর একটি গানে বলিয়াছেন—
"সুরের ঘোরে আপনারে যাই ভুলে
বন্ধু বলি ডাকি মোর প্রভুকে।"

সুরের ঘোর কাটিয়া গেলেই বন্ধু আমার প্রভু হইয়া যান, কবি হইয়া পড়েন দাস। বৈষ্ণবকবিদের এই সুরের ঘোর একেবারেই কোনদিন কাটে না; তাই তাঁহাদের প্রভু চিরদিনই সখাই থাকিয়া যান।

রবীন্দ্রনাথ লীলাময়ের লীলায় ভক্তের দাস্য ভাবের কথাই বলিয়াছেন। এই দাস্য ভাবই আমাদের সংস্কারগত ভাব। এই ভাবকে ত্যাগ করা কঠিন। সেজন্য বৈষ্ণব সাধকগণ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্যেও এই দাস্য ভাব নিগূহিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার সেবাপরিচর্য্যা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। ব্রজের সখারা কাঁধেও চড়িয়াছেন আবার দাসত্বও করিয়াছেন। সখীরা বস্তু পয়োনাতি তিরস্কারও করিয়াছেন আবার সেবাও করিয়াছেন। পদকর্ত্তারা সখীস্থানীয় হইয়াও অনেক ভণিতায় দাস্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিজেদের নামের সঙ্গে দাস শব্দ যোগ করিয়াও দাস্যভাবকে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে যবে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান।
চৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীরাধা যখন অনুতপ্তা হইয়াছেন, উপেক্ষিতা হইয়াছেন, বিরহাতুরা হইয়াছেন, শরণাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রেম-মাধুর্য্যের নিম্নতলহ দাসীভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও শ্রীমতীর প্রতি দাস্যভাব নিবেদন করিয়া বলিতেছেন—

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ এই—

অন্যাভিলাষশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।
"চতুর্বর্গ লভ্য হয় বেদাচারে ক্রমে
রসময় সেবা ছাড়া মিলে না পঞ্চমে।"

শবাচ্ছাদন

মুন্সী প্রেম চন্দ
অনুবাদক—পারুল ঘোষ

একদিন শীতের রাত্রে নিষ্প্রভ নির্বাণোন্মুখ অগ্নিকুণ্ড সামনে নিয়ে এক বৃদ্ধ এবং তার ছেলে নীরবে বসে আছে। ভেতরে তরুণী বধূ বুধিয়া সন্তান সম্ভাবনায় যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। মাঝে মাঝে সে এমনি করুণ আর্তকণ্ঠে ককিয়ে উঠছে যে পিতাপুত্রের নিঃশ্বাস যেন তাতে বন্ধ হয়ে আসে। সারা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে আছে, প্রকৃতি স্তব্ধ স্থির, জেগে আছে শুধু এই তিনটি প্রাণী।

হঠাৎ ঘিসু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললো, মনে হচ্ছে হতভাগী আর টিঁকবে না। তবু যা, একবার দেখে আয়।

চড়া গলায় মাধব জবাব দিলে, মরেই যদি তো এখনি মরুক, গিয়ে আর কি করবো!

কি পাষণ্ড তুই, বৃদ্ধ বাপ বললো, একটা বছর তুই না ওর সঙ্গে স্ফূর্তিতে ঘর করেছিলি?

ছেলে বললো, মানুষের এত যন্ত্রণা আমি দেখতে পারছি না।

ঘিসু আর মাধব জাতে চামার। গ্রামে তারা কাজ ফাঁকি দিতে ওস্তাদরূপে প্রসিদ্ধ। ঘিসু একদিন কাজ করবে তো তিনদিন ঘুমোবে। মাধব আধঘণ্টা কাজ করবে তো বাকী সময় তামাক খেয়ে কাটাবে। এই বিশেষ গুণের জন্যেই ওদের বাপ-বেটাকে গ্রামের লোক কোনদিন কাজ দিতে চায় না। ঘরে যতদিন একমুঠো খাবার থাকে, ততদিন রোজগারের জন্যে ওদের কোনও মাথা ব্যথা দেখা যায় না। তারপর পুঁজি যখন ফুরোয়, তিন চার পাঁচদিন কাটে অনাহারে, তখন ঘিসু বেরোয় একখানি কুড়াল হাতে করে—কিছু কাঠ কুটো যোগাড় করে, মাধব সেগুলো নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে আসে। গ্রামে কাজের অভাব নেই, খাটিয়ে লোক পঞ্চাশ রকম কাজ পেতে পারে। কিন্তু করে কে? নিতান্ত যখন দায়ে ঠেকে, তখনই চাষীরা ওদের বাপ-বেটাকে ডাকে।

যদি ওরা সন্ন্যাসী হতো, তা হলে এই আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-সংযম ওদের আদর্শ বলেই গণ্য হতো। ধন-সম্পদ বলতে ওদের আছে গোটা কয়েক মেটে হাঁড়ি-কুড়ি, আর খান কয়েক ছেঁড়া-ছুটো কাঁথা। দেনায় ওরা আকণ্ঠ ডুবে আছে, তবু ওদের না আছে ভাবনা, না আছে চিন্তা। অপমান আর আঘাত, এ যেন ওদের গায়েই লাগে না। কিন্তু মুখ-চোখের ভাব ওদের এমনই সরল, এতই অমায়িকতাপূর্ণ যে, কোন জন্মে শোধ হবে না জেনেও চাষীরা ওদের টাকা ধার দেয়। ঘিসু আর মাধব পাড়া প্রতিবেশীর ক্ষেত থেকে মটর আলু আখ হরদম চুরি করে, এই হলো ওদের খাবার প্রধান পদ্ধতি।

বাপের প্রায় ষাট বছরের জীবনটা মোটামুটি এই করেই গেছে। ছেলে চলেছে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আলস্যের প্রতিযোগিতায় বাবাকে বরং ছাড়িয়েই গেছে সে। ঘিসুর বৌ অনেকদিন মারা গেছে—এক বছর হলো মাধবের বিয়ে হয়েছে। মাধবের বৌটি লক্ষ্মী—সংসারে সে শৃঙ্খলা এবং শ্রম দুয়েরই পত্তন করেছে। উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম করে সে বরাবর নিজের ও স্বামী এবং শ্বশুরের ভাত জুটিয়েছে। তাতে ফল হয়েছে এই যে, অকর্মণ্য পিতাপুত্র হয়েছে অধিকতর অকর্মণ্য। নিজেদের অকর্মণ্যতা নিয়ে ওদের কিছুমাত্র লজ্জা নেই, বরং আছে অহঙ্কার, বৌটিকে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটাতে নেই কিছুমাত্র কুণ্ঠা। ওরা মনে করে, এটাই ওদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য। এমন যে বৌ, এত যে মেহনত করেছে তাদের জন্যে সেই আজ প্রসব-যন্ত্রণায় মরতে বসেছে—তাতে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই, বোধ হয় ওরা ভাবছে, শীগ্রী শীগ্রী মরে তো বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে শান্তি পাই।

নির্বাণোন্মুখ অগ্নিকুণ্ডটি সামনে নিয়ে ওরা বসে আছে, আর ঐ অল্প আঁচে আলু পোড়াচ্ছে। আগুন থেকে ঝলসানো আলু গোটা কয়েক টেনে নিয়ে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ঘিসু মাধবকে আর একবার বললে, ঘরে ঢুকে বৌ-এর তল্লাস নিতে। সে বললে, বৌকে বোধ হয় ভূতে ধরেছে, ভূত ছাড়াতে ওঝা তো কম করেও একটা টাকাও অন্ততঃ চাইবে। একটা কিছু ব্যবস্থা মাধব যা হয় করুক।

মাধবের কিন্তু ধারণা, সে চোখের আড়াল হলেই তার

বাবা বেশির ভাগ আলু সাবাড় করে দেবে। তাই সে ছুতো করে বললো, ঘরে ঢুকতে আমার ভয় করে।

ভয়, মুখ ভেঙচে যিনু বললে, ভয়টা কিসের? আমি এখানে রয়েছি না?

টিটকারী কেটে মাধব বললে, তবে তুমিই যাও না একবার?

যিনু জবাব দিলে, তোর মা যখন মরে, তিনদিন সমানে আমি তার বিছানার ধারে বসে ছিলাম। তোর বৌ-এর দিকে কোনদিন আমি চোখ তুলে চাইনি—এখন আমি কাছে গিয়ে বসলে সে অস্বস্তি বোধ করবে। তা ছাড়া তার এখন-অবস্থাটা কি তা-ও ভাব।

মাধব বললো, যদি ছেলে-পুলে কিছু হয়, তা হলে কি হবে সে-ও তো এক ভাবনা। ঘরে না আছে একটু আদা, না গুড়, না তেল।

নির্লিপ্তভাবে যিনু জবাব দিলে, দরকার হলে ভগবানই দেবেন। তাতে বিশ্বাস রাখ। আরে, আজ যারা একটি পয়সা দিতে চায় না, দেখিস দরকার হলে কাল তারা যেচে পয়সা দেবে, নেবার জন্যে সাধাসাধি করবে। ন' ন'টা ছেলে হয়েছে আমার—কই আটকে তো যায়নি কোন কিছুর জন্যে? দরকার হলে এবারও ভগবানই চালিয়ে দেবেন।

যিনুর এই দার্শনিক উক্তি একেবারে মিথ্যাও নয়। তার পাড়াপ্রতিবেশী ও স্বজাত স্বঘরদের তুলনায় তার অবস্থা বেশী তো খারাপ নয়—একই ভাবে সেও এতদিন তাদের মতোই ঠেলে-ঠুলে চালিয়ে এসেছে। বরং গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকের চেয়ে বুদ্ধির ধার তার বেশী। যারা বড় লোকের বাড়ী সর্বদা ধর্ণা দিতে অভ্যস্ত, সে আড্ডা দিয়েছে বরাবর তাদেরই সঙ্গে, কিন্তু তাদের নীতি এবং আদব কায়দা আয়ত্ত না থাকায় এই আড্ডা-বাজী থেকে সে বিশেষ কিছু লাভ কামাতে পারেনি। এ নিয়ে গাঁয়ের লোক বরাবরই তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু করলে হবে কি? ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সে কি গায়ে মাখে? খুব বেশি লাঞ্ছিত ও নাজেহাল হলে, সে ঝুপ করে ডুব দেয় আলস্যের অতলে—তখন আর কারুরই সাধ্য নেই সেখান থেকে তাকে টেনে বার ক'রে তার দারিদ্র্য ও বোকামীতে ঘা দেয়।

যিনু আর মাধব রাক্ষুসে ক্ষিপ্রতায় আলু পোড়া খেতে সুরু করলো। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে পরিমাণে অন্যকে হারিয়ে দিতে। সদ্য আগুন থেকে টেনে বার করা পোড়া আলু গপ গপ করছে, গলা এবং জিভ পুড়ছে, চোখ দিয়ে নামছে দর দর করে জলধারা—কিন্তু কে তাতে দৃকপাত করছে? গব্ গব্ করে আলু খেয়ে পাকস্থলী বোঝাই করা—এর চেয়ে বড়ো কাজ আর কি আছে? যিনু খাচ্ছে আর বসে বসে বলছে, কি রকম ফলারটাই সে খেয়েছিলো একবার বিশ বছর আগে গাঁয়ের জমিদার বাবুদের বিয়ে বাড়ীতে—লুচি, মণ্ডা, তরি-তরকারী, দই, এতোই খেয়েছিলো যে শেষ পর্য্যন্ত উঠে দাঁড়াবার এবং হেঁটে আসবার শক্তিটুকুও তার ছিলো না। হ্যাঁ, খাওয়া বলতে হয়তো একেই, প্রাণ ভরে খাওয়া। যিনুর কাহিনী শুনতে শুনতে মাধবের জিভে জল গড়াতে লাগলো। সে বললে, আজ কাল লোকে আর এ রকম ভোজ দেয় না কেন?

যিনু বললে, সময় বদলেছে বাবা, আজ কাল বড় লোকেরা বিয়ে পৈতেতে খরচ কম করার কথাটাই বলে, কিন্তু গরীবের খাজনা কমাবার কথা ওরা ভুলেও বলে না।

মাধব বললো, তুমি নিশ্চয়ই সেই ভোজে অন্ততঃ কুড়িখানা পিঠে খেয়েছ?

—না, তার চেয়ে বেশী।

—আমি যদি থাকতাম অন্ততঃ পঞ্চাশখানা খেতাম।

—ঠিক আমার মনে নেই, তবে পঞ্চাশখানার কম আমিও খেয়েছি মনে হচ্ছে না। আজ কাল তোদের যা শরীর, তার হিসেবে তখন আমার শরীর ছিলো ঢের জোয়ান।

আলু খাওয়া শেষ হতে ওরা অগ্নিকুণ্ডটিকে বেষ্টন করে কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এ দিকে সারারাত্রি থেকে থেকে বুধিয়ার আর্ত্ত কণ্ঠ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাইরের আকাশে ব্যাপ্ত হতে লাগলো।

সকালবেলা মাধব ঘরে ঢুকে দেখলো তার স্ত্রী মরে পড়ে আছে—তার দেহ হিমশীতল, নিষ্পলক দু'টি চোখ উন্মুক্ত ঊর্দ্ধে প্রসারিত, সারাদেহ রক্তাপ্লুত। রাত্রেই সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে নিজে তার অনুগমন করেছে। সে দৌড়ে গেলো ঘিসুর কাছে। দুজনে তারপর সুরু করলো কাঁদতে—যেমন কান্না তেমনি বুক চাপড়ানো। ওদের কান্না শুনে পাড়ার লোক ছুটে এলো সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু কান্না থেমে গেলো অল্পক্ষণেই, দুঃখের চেয়ে শব-সৎকারের ভাবনাটা যে অনেক বেশী। চিলের বাসায় যেমন মাংসের নাম-গন্ধও থাকে না, ওদের সংসার তেমনি পয়সার গন্ধশূন্য। কাজেই, পিতাপুত্রে উভয়ে দৌড়ুলো জমিদার বাড়ী। জমিদার বাবু আবার ওদের ওপর হাড়ে চটা। চুরি ও ছ্যাঁচড়ামোর জন্যে অতীতে অনেকবার তিনি ওদের দণ্ড দিয়েছেন। কিন্তু কি আর উপায় আছে ওদের? ওদের দুজনকে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন, কি রে ঘিসু, কাঁদছিস্ কেন? হয়েছে কি? অনেক দিন যে তোদের দেখিনি, তোরা কি গাঁয়ে থাকতে চাস, না চাস না?

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে বললো, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু, মাধবের পরিবার মারা গেছে কাল রাত্রে। সারা রাত্রি মায়ের আমার কি যন্ত্রণা আর কান্না। আমাদের যেমন ক্ষমতা, প্রাণপণ করেছি তবু বাঁচাতে পারলাম না। আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেলো বাবু, দু'টো ভাত রেঁধে দিতে কেউ রইলো না। আমি আপনার কেনা গোলাম বাবু, আপনার চরণে তাই এসেছি—কি দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা হবে, আপনিই তা করে দেন বাবু।

জমিদার বাবু দয়ালু লোক। কিন্তু ঘিসুকে দয়া করা, সে তো কালো কম্বল রাঙানো। প্রথমটা তাঁর মনে হলো দূর করে তাড়িয়ে দেন তাকে. কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন, এ রকম একটা ঘটনায় রাগা বা গাল দেওয়া ঠিক নয়। তাই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেই গেঁজে থেকে দু'টো টাকা বের করে তিনি ঘিসুর বরাবর ছুঁড়ে দিলেন। ঘিসুর দিকে তিনি একবার সদয় দৃষ্টিতে তাকালেনও না, একটা সান্ত্বনার কথাও বললেন না। অল্পে অল্পে আপদ বিদায় হলো দেখে তিনি একটু খুসীই হলেন বরং।

জমিদার বাবুর অনুগ্রহ কুড়িয়ে ঘিসু তারপর নজর দিলো পাড়াপ্রতিবেশীর ওপর এবং তাদের ঘাড় ভেঙে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে গোটা পাঁচেক টাকা তুলে ফেললো। এ ছাড়া কেউ তাকে দিলো জ্বালানি কাঠ, কেউ দিলো চাল ডাল। এদিকে মাধব আর ঘিসু গেলো শবাচ্ছাদনের কাপড় কিনতে, ও'দিকে পাড়ার কয়েকজন লেগে গেলো বাঁশ কেটে খাটুলী বাঁধতে। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা আর কিছু করলো না, শুধু হতভাগিনী বৌটার জন্যে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেই যে যার কাজে চলে গেলো।

বাজারে ঘিসুর সঙ্গে যখন মাধবের দেখা হলো, ঘিসু জিজ্ঞেস করলো, কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে যোগাড় হয়েছে কি না।

মাধব বললো, হাঁ, এখন শুধু কাফন বস্ত্রটি কিনতে বাকী।

—আয়, খুব সস্তা দামের একটা কাপড় কিনি।

—হাঁ, হাঁ, সস্তা ছাড়া আবার কি। শ্মশানে নিয়ে যেতে যেতে তো অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন আর কে দেখছে আমরা কি কাপড় দিয়েছি না দিয়েছি।

ঘিসু প্রাজ্ঞতা সহকারে মন্তব্য করলো, কি বিচ্ছিরি ব্যবস্থা দেশের। হতভাগী ছুঁড়ি বেঁচে থাকতে লজ্জা নিবারণের একটুকরো তেনা পেলো না, মরার পরে তার ওপর চাপাতে হবে একখানা নতুন কাপড়।

মাধব ফোড়ন কেটে বললো, তা'ছাড়া কাপড়টা তো আগুনে পুড়বে।

ঘিসু বললো, বৌ বেঁচে থাকতে এই পাঁচটা টাকা যদি আমরা পেতাম, তা'হলে তাই দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারতাম।

দু'জনে ওরা যেন দু'জনের মুখের কথা কেড়ে বলতে লাগলো, দোকানের পর দোকান ঘুরতে ঘুরতে এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেলো, অনেক রকম সুতী ও রেশমী কাপড় দেখা হলো, কোনটাই ঠিক মনের মতো হলো না।

ইতিমধ্যে তারা দেখলো সামনে একটা শুঁড়িখানা—যেন কপালগুণেই ওটার দেখা মিললো। দু'এক মিনিট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘিসু সোজা ভেতরে গিয়ে ঢুকলো এবং একটি বোতল কিনে ফেললো। কিছু মাছভাজা এবং এটা সেটা খাওয়ার জিনিব কিনে নিয়ে তারপর বাপ-বেটায় বসে গেলো বারান্দায় মনের আনন্দে পান-ভোজন করতে।

কয়েক চুমুকের পরেই নেশা জমে উঠলো। ঘিসু আর একবার বললো, কাপড় তো নষ্টই হবে।

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন দেবতাদের সাক্ষী রেখে বলতে লাগলো, পোড়া দুনিয়ার কি ব্যবস্থা। বামুন বোষ্টোদের লোকে হাজার হাজার টাকা দেয়, যেন ঐ টাকা মড়াদের সঙ্গে যাবে।

ঘিসু বললে, বড়লোকদের অনেক আছে, করুক তারা এই ভাবেই নষ্ট করুক, আমাদের কিছু নেই, কিছু নেই।

কিন্তু লোকেরা যখন বলবে, মড়ার কাপড় কই, তখন কি বলে তাদের থামাবে?

ঘিসু উচ্চ হাস্য করে বললো, বলবো ট্যাঁক থেকে টাকা কোথায় পড়ে গেছে—পাতি পাতি করে খুঁজেও কোথাও পেলাম না। অবিশ্যি তারা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তাতে কি? একটু পরে তারাই আবার পয়সা দেবে।

মাধব হাসিতে যোগ দিলো, তার নেশা হতে লাগলো, হয়তো আর এক কিস্তি বরাত খুলে যাবে, সে বললো, সত্যিই বৌটা লক্ষ্মী ছিলো। আমাদের সেবা করতে করতেই প্রাণটা দিয়েছে বেচারী।

যখন আধা-আধি বোতল শেষ হলো, ঘিসু তখন ফরমাস করলো, আর দু'সের রুটী তরকারী আর মিঠাই কিনে আনার। মাধব একদৌড়ে এনে হাজির করলো সব, দুটী শালপাতার ঠোঙায়—দেড় টাকা খরচ হলো এতে, হাতে রইলো আর সামান্যই। যেমন করে বাঘ তার শিকারের ওপর পড়ে, তেমনি করে তারপর বাপ-বেটায় পড়লো এগুলির ওপর। গম্ভীর রহস্যময় মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে লোকে যা বলার বলুক তাদের, কি তাতে তাদের যায় আসে? দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির এলাকা ছাড়িয়ে ওরা তখন চলে গেছে দূরে বহুদূরে।

ঘিসু দার্শনিক ভাবায় বললো, আমরা খুসী হয়েছি—এই খুসীর হাওয়ায় কল্যাণ হবেই হবে তার আত্মার।

অকপট ভক্তিতে মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে মাধব তার সিদ্ধান্ত সমর্থন করলো। গদগদ কণ্ঠে সে বললো, হে ভগবান, মানুষের কার মনে কি আছে তা' তুমিই ভালো জানো, ওকে তুমি একটু ঠাঁই দিও স্বর্গে, দিও এই আমাদের মিনতি ঠাকুর। কোন জন্মে কখনো এমন ভালো খাইনি—দিতেই হবে তোমাকে একটু ঠাঁই।

হঠাৎ কি যেন মনে হলো তার। সে বললো, বাবা, একদিন আমাদেরও তো যেতে হবে ওখানে।

ঘিসু কোন জবাব দিলো না। জীবনান্তে কি হবে, তাই ভেবে জীবনের এই বর্তমান আনন্দময় মুহূর্তটাকে মাটি করতে সে রাজী নয়।

মাধব বললো, স্বর্গে দেখা হলে সে যখন জিজ্ঞাসা করবে, কেন আমরা তার মৃতদেহে নূতন কাপড় দেইনি?

উদাসীন কণ্ঠে ঘিসু বললো, যদি করেই, কি আর বলবো?

—সে কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেই, ছাড়বে না।

এবার ঘিসু চটে উঠলো। বললো, মড়ার কাপড় যে আমরা যোগাড় করবো না, এ তোকে কে বলেছে? আমি কি তেমনই একটা বোকা? ষাট বছর কি পৃথিবীতে আমি এমনি এমনি থেকেছি। দেখ, আগে আমি কি করি।

অবস্ত কণ্ঠে মাধব বললো, কিন্তু দেবে কে? যা হাতে ছিলো, সব তো তুমি ফুঁকে দিলে। আমিই তার সিঁথের সিঁদুর পরিয়েছিলাম—আমাকে সে ছাড়বে না, জিজ্ঞাসা করবেই। বিষম চটে ঘিসু বললো, হবে হবে, কাপড় হবে।

মাধবও চটে বললো, দেবে কে? কেন বলছো না আমাকে তা?

ঘিসু বললো, যারা আগে দিয়েছে তারাই পরে দেবে—শুধু এখন দেবে না, এই যা।

অন্ধকার যত ঘন হ'তে লাগলো, আকাশে একের পর এক তারা ফুটতে লাগলো, শুঁড়িখানায় হৈ হল্লোড়ও তাই বেড়ে উঠতে লাগলো। কেউ স্ফূর্ত্তিতে গান ধরলো, কেউ আত্মকাহিনী বলা সুরু করলো, কেউ বা করতে লাগলো হুড়োহুড়ি, জড়াজড়ি, গ্লাস ছোঁড়াছুঁড়ি। আবহাওয়া উত্তেজনায় গম্ গম্ করতে লাগলো, বাতাস যেন মাতাল মদের গন্ধে, কি কোলাহলের গন্ধে কে জানে, মত্ততাই যেন অধিকতর মত্ততার সৃষ্টি করতে লাগলো। মত্তপেরা সেখানে এসেছে, দুঃখ ভুলতে, যন্ত্রণা ভুলতে, ক্ষণিক উত্তেজনার তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে। তারা বেঁচে আছে, কি মরেছে সে জ্ঞানই যেন নেই তাদের।

ওরা পিতা পুত্রে তখনও গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। সকলেরই নজর পড়ল ওদের দিকে। সামনে খোলা বোতল, পাশে খাবারের ঠোঙা—প্রভৃত ভঙ্গী রঙ্গী করে ওরা পান ভোজন করছে, দরজা থেকে একটি ভিখারী অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে খাবারের দিকে তাকাচ্ছিল—পেট যখন ভরে গেল, মাধব বাকী খাবারগুলি দিলো তাকে, জীবনে এই প্রথম সে হাতে করে দেবার আনন্দ অনুভব করলো। বিমু ভিক্ষুককে বললো, খা খা, পেট ভরে খা। সত্যিকার দেনেওয়ালা যে তার আত্মার কল্যাণ হোক।

মাধব আবার আকাশের দিকে তাকালো, বললো, বাবা সে নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে। শুধু যাবেই না, সেখানকার রাণী হবে।

স্ফূর্ত্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ঘিসু বললো, হ্যাঁ, বাপ যাবেই তো। যতদিন বেঁচেছিলো, সে কারুকে দুঃখ দেয়নি। এমন কি এই যে মরেছে, এতেও আমরা কত সুখ পেলাম—কত খেলাম, কত আনন্দ করলাম। সে যদি স্বর্গে না যায়, তবে কি মনে করিস যারা গরীবের রক্ত শুষে পেট মোটা করে, আর গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপ খণ্ডালো মনে করে,—তারা যাবে? কিন্তু এই আশা ও আনন্দের তাল কেটে গিয়ে কোথা থেকে যেন একটা বেসুরো বাধা বেজে উঠলো। মাধব বললো, বাবা, সারা জীবন বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছে। কি কষ্ট সে! সব চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছে মৃত্যুর সময়। আহা! বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

ঘিসু তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো এই বলে যে সংসারে কর্ম্মচক্র থেকে এতো অল্পে সে মুক্তি পেয়েছে, এতে তার কাঁদা উচিত নয়, হাসা উচিত।

হঠাৎ পিতাপুত্রে এক সঙ্গে গলা ছেড়ে গান ধরলো—

বল বল হে রূপসী কোন মায়া জানো?
কেন হেন বারে বারে বাঁকা আঁখি হানো!

তার পর মদের ঝোঁকে দুজনে নাচতে সুরু করলো, নাচতে নাচতে মুখ থুবড়ে দুজনে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

বসন্ত-বরণ

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

ফাল্গুন-ফুলবন অঙ্গনে আজ
পথ ভুলে এলে কি হে বসন্তরাজ!
কোয়েলীর কুহুস্বরে,
ভ্রমরের গুঞ্জরে,
দিকে দিকে মর্ম্মরে বন্দনা-গান,
উচ্ছলি পৃথ্বীর তন্দ্রিল প্রাণ।

হর্ষের উচ্ছ্বাসে নীল নদী-নীর
থেকে থেকে অন্তরে কম্প্র অধীর,
রক্তিম পঙ্কজে
ছেয়ে গেছে অঙ্গ যে,
মনোমণি-মন্দির মূর্চ্ছিত তায়,
বাসনা ব্যাকুলি ওঠে বক্ষ সীমায়।

নির্মেঘ নিঃসীম সুনীলিমাকাশ
বুক-ভরা মধুরিম মুক্তার হাস;
চঞ্চল চিত্তের
বিহ্বল স্বপ্নের
আবছা আভাস নামি' জ্যোৎস্নাধারায়
সঙ্গীতে সঞ্চরে দক্ষিণা বায়।

বনে ও বনান্তরে পুষ্পবিলাস,
চিত্র বিচিত্রিত বর্ণ-সুবাস;
ঋতুরাজ এলো আজ
মিছে দুখ, মিছে লাজ,
কয় সবে—মিথ্যা এ গৃহবন্ধন,
বসন্তরাজ এলো কীর্ত্তি-নাশন।

কারেণ-বিদ্রোহের ইতিহাস

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সম্প্রতি ব্রহ্ম-সরকারের বিরুদ্ধে কারেণদের আক্রমণ ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। উভয় পক্ষের সঙ্ঘর্ষ যেরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহার আকস্মিক নিবৃত্তি সম্পর্কে কোনরূপ নিশ্চয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। গোবিন গিয়াউক, ইন্সিনের টিলা-ক্ষেত্র, মিকটিলা, মান্দালয় প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহী কারেণদের একচ্ছত্র আধিপত্য দখলিস্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মিকটিলার পতন ঘটায় বিদ্রোহীরা রাজধানীর সহিত যোগাযোগকারী আনুমানিক দুই শত মাইল রাস্তা ও রেলপথের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিল। ইতিপূর্ব্বে পিউ ও টঙ্গু তাহাদের হাতে আসে। পি-টি-আই-আর'-এর একটি বিশ্বস্ত রিপোর্টে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহের গোড়ায়ই ব্রহ্ম হইতে কারেণ গেরিলাদের কয়েকটি ছোট ছোট দল উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শ্যামের কয়েকটি স্থানে প্রবেশ করিয়াছে।

নৃত্যের পূর্ব্বে সুসজ্জিতা কারেণ রমণী

এই সঙ্ঘর্ষের পিছনে রহিয়াছে কারেণদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী। ১৯৪৭ সালে ব্রহ্মের গণপরিষদ নির্ব্বাচিত হয়; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই কারেণরা তাহাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী উত্থাপন করে। গণপরিষদের নির্ব্বাচনে কারেণ যুবসঙ্ঘ যোগ দেয়; কিন্তু কারেণ ন্যাশনাল ইউনিয়ন দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের দাবী ছিল যে, তাহারাই সমগ্র কারেণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। উপস্থিত মতো তাহাদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় কারেণ ন্যাশনাল ইউনিয়ন নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে গণপরিষদের যে নির্ব্বাচন হয়, তাহাতে ফ্যাসি-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা সঙ্ঘের ২১০ জন, কম্যুনিষ্ট ৭ জন, এ্যাংলো বর্ম্মী ৪ জন, স্বতন্ত্র ২ জন এবং কারেণ যুবসঙ্ঘ হইতে ২৪ জন সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন।

বিগত আগষ্টে ব্রহ্ম সরকারের খসড়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। ইহাতে ব্রহ্ম-ইউনিয়নে কারেণ, কাচিন এবং শান ষ্টেট সম্পর্কে কয়েকটি বিধান উপস্থিত হয়। উল্লেখ করা হয় যে—কারেণ ষ্টেট্, শালাউইন জেলা এবং কারেণ অধ্যুষিত নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ যদি পৃথক রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে একমত হয়, তবে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইবে; তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত শালাউইন জেলা এবং নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি একটি বিশেষ অঞ্চলরূপে একজন মন্ত্রী-কর্ত্তৃক শাসিত হইবে। কারেণদের জন্য গঠিত একটি পরিষদ ঐ মন্ত্রীকে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবে। ইতিমধ্যে অবিলম্বে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ কারেণ ষ্টেট্ গঠনের দাবী করিয়া পাঁচজন কারেণ সদস্য পরিষদের সিদ্ধান্তকালে ভোটদানে বিরত থাকে।

স্বাধীন-ব্রহ্মের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে কারেণদের সাম্প্রতিক এই সঙ্ঘর্ষমূলক তৎপরতা উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে কম্যুনিষ্ট-যোগাযোগের ঘটনাও প্রচ্ছন্ন নয়। চীনে যে অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহার জয়যুক্ততার সঙ্গে ব্রহ্মদেশের মাটিকে যোগ করিয়া আকিয়াবের পথে ভারত-পাকিস্থানকে জড়িত করিতে পারিলেই সাম্যবাদের বৈজয়ন্তী। ভারতীয় জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের 'নেশন'-এর কাছে পরিবেশিত নিউ দিল্লীর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর খবরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা—

Communists are reported to have reached Akyab and also to have infiltrated into East Bengal. Even from Newspaper reports it is obvious that Burma's present government is fast losing ground.—It is stated about the half Country is already in Communist and Karen hands who seem to have arrived at an agreement on the question of Karen self-determination.—A Communist Burma would not only bring Communism right at India's door but would lead to the formation of a Red Asian Bloc stretching from korea to Burma and Perhaps Indonesia.

সে যাহা হউক, গত জানুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহের শেষের দিকে কারেণ ন্যাশনাল ইউনিয়নের সভাপতি বা, হউ, গাই'এর নেতৃত্বে কারেণ প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সরকারী মহলের সংবাদে বলা হয় যে, কারেণ-নেতৃবৃন্দ একটি পঞ্চদফা দাবী উত্থাপন করিয়াছে, যথা: (১) পৃথক কারেণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, (২) একজন সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে কারেণ দেশরক্ষী বাহিনীকে ব্রহ্ম-সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, (৩) কারেণ কম্যুনিষ্ট ও গণসঙ্ঘের 'হোয়াইট ব্যাণ্ড' দলের সদস্যসহ সমস্ত বিদ্রোহীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, (৪) কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট গঠন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা; (৫) অক্সিলিয়ারী পুলিশবাহিনীকে সৈন্যদলের সর্বাধিনায়কের খাস পরিচালনাধীনে আনার ব্যবস্থা। এ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন রয়টার। গত ২১শে জানুয়ারী গভর্ণমেন্ট বর্মী ও কারেণদের মধ্যে 'শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা'-কল্পে যুদ্ধ-কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ৩১শে জানুয়ারীর একটি সমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও ব্রহ্ম-বিমানবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল স্মিথ ডান পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ইনি একজন কারেণ। কারেণদিগকে অস্ত্র সমর্পণ করিতে বলা হইলে তাহারা তাহাতে অসম্মত হয় এবং ফলে সংঘর্ষ তীব্র হইয়া ওঠে। ইরাবতীর ব-দ্বীপে অবস্থিত চাউলের বন্দর বেসিনে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়। কারেণরা এই বন্দর দখল করিয়াছিল, পুনরায় উহা সরকারী বাহিনীর হাতে আসে।

গত ফেব্রুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহের গোড়ার দিকে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কমিশনের অন্তর্বর্তী সুপারিশ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মের প্রধান বিচারপতি স্যার বা উ উক্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ব্রহ্ম ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র কারেণ প্রদেশ গঠনের জন্য কমিশনের সকল সদস্য এখন সম্মত হইয়াছেন। কারেণী রাজ্য কারেণ প্রদেশের সহিত যোগদান করুক অথবা নাই করুক, স্বতন্ত্র কারেণ দেশ গঠনের নীতি সকল সদস্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তজ্জন্য কমিশন গভর্ণমেণ্টকে কারেণ প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কারেণী রাজ্য ইহার সহিত যোগদান করিবে কি না, তাহা কারেণী রাজ্যের অধিবাসীরাই স্থির করিবেন। যদি কারেণী রাজ্য কারেণ দেশের সহিত সংযুক্ত হইতে চায়, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের ১৮০ ধারা অনুযায়ী ইহা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে। অন্যথায় ২০০ ধারা অনুযায়ী কারেণ প্রদেশকে সংহত করিতে হইবে।

যদিও থাকিন্ নু'র গভর্ণমেণ্ট নানা ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘর্ষকে সম্প্রতি অনেকখানি সংহত করিয়া আনিয়াছেন, তথাপি ইহাতেই উল্লসিত হইবার কারণ নাই। বিদ্রোহের ক্ষেত্র বিস্তৃত; উক্ত অঞ্চলগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনর্প্রতিষ্ঠা করা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। যদি বলা যায় যে, কারেণদের মধ্যে অসন্তোষ ও তিক্ততার সূত্রপাত ঘটে ব্রহ্মে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির ফলে, তাহা হইলে খুব বেশী বলা হয় না। ভারতের জাতীয় জীবনে এই ভেদ-নীতির চূড়ান্ত বন্যা বহিয়া

গিয়াছে—যাহার ফলে হিন্দু-মুসলীম সাম্প্রদায়িক বিষাক্ততা প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে এবং ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। নতুন করিয়া সেই সৃষ্টির উন্মেষ দেখা দিয়াছে ব্রহ্মে থাকিন নু'র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও কারেণদের মধ্যে। ব্রহ্মে হিন্দু-মুসলীম সমস্যাসৃষ্টির সুযোগ ছিল না; তাই সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি সেখানে একটা নতুন ভেদ-পন্থার আকার লইয়া মাথা তুলিল। এবং তাহা হইতেছে ব্রহ্মবাসী ও ব্রহ্ম উপজাতিদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির সক্রিয় প্রয়াস। সাম্প্রতিক এই কারেণী আক্রমণের পিছনে সরকারী ভাবে বৃটিশের কারসাজি না থাকিলেও বেসরকারী ভাবে তাঁহারা যে একটা বড় রকমের ইন্ধন জোগাইতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ইতিপূর্ব্বে একটি সংবাদের প্রতি আমাদের লক্ষ্য পড়ে; সংবাদটি এই :

'কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারত গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা থেকে একজন বৃটিশ অফিসারকে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি গোপনে কারেণদের বিদ্রোহাত্মক প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন। ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের এ অভিযোগ আজও একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।'

স্বসজ্জিত কারেন-যুবক

থাকিন নু যদিও নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম-জাতীয়-গভর্ণমেণ্টকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন, তবু ব্রহ্মের মাটি হইতে চার্চ্চিলী ষড়যন্ত্রের নিপাত হইয়াছে—এ কথা বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় না। এখনও কারেণদের পক্ষে কিছুসংখ্যক শ্বেত সৈন্য বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে এবং তাহারা যে বৃটিশ রক্ষণশীল চার্চ্চিল-পুষ্ট তথা চার্চ্চিল-অনুগামী, এ কথা বলায় কিছুমাত্র বাধা নাই। ভারত শেষ পর্য্যন্ত কমনওয়েলথের আওতায়ই রহিয়া গেল বটে, কিন্তু স্বাধীন ব্রহ্ম রিপাব্লিকরূপে একেবারেই বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা চার্চ্চিলপন্থী রক্ষণশীল ইংরেজদের সহনশীলতার বাহিরে।

মনে রাখা আবশ্যক যে, থাকিন নু কারেণদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব মানিয়া নিয়াছেন; কিন্তু এই মানিয়া লইবার পিছনে বড় কথাটি হইল এই যে, কারেণদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাহারা ব্রহ্ম ইউনিয়নের বাহিরে যাইতে পারিবে না। কিন্তু ইহাতে কারেণরা রাজি নয় এবং এই অরাজী হইতেই বিদ্রোহের পথে তাহাদের ক্রমধাবমানতা। কারেণ উপজাতির ইতিহাস সংক্ষেপতঃ এইরূপ :

প্রধানতঃ পূর্ব্ব-ব্রহ্মের শান ষ্টেট্ ও শ্যামের মাঝামাঝি অঞ্চলে কারেণদের বাস। ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলেও ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। ইহারা তাই-চীন শাখার অন্তর্ভুক্ত। পো এবং সাগ—এই দুইটি প্রধান শাখায় কারেণরা বিভক্ত। এক শ্রেণীকে লাল কারেণ এবং অপর শ্রেণীকে শ্বেত কারেণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। পো কারেণগণ প্রধানতঃ টেনাসেরিমের অধিবাসী। ইহারা বহুলাংশে মন-জাতির সহিত মিশ্রিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কারেণী রাষ্ট্রসমূহে এবং ইরাবতীর ব-দ্বীপে যে-সব কারেণকে দেখা যায়, তাহারাই সাগ-কারেণ। কান্তারাবাদী, কারেণী এবং বালেক—এই তিনটি ষ্টেট্ লইয়া কারেণ অঞ্চল গঠিত। ইহাদের শাখাগুলির মধ্যে পাদাউঙ্গ, পালাউঙ্গ, আখা, লিশ, লাহু এবং কাচিনদের নাম উল্লেখযোগ্য। 'অনেকের ধারণা যে, কারেণরা চীনাদের বংশধর; শান জাতিসমূহের চাপে পড়িয়া তাহারা দক্ষিণে পলাইয়া আসে এবং পরে আবার বিরুদ্ধশক্তির চাপে পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারেণদের নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত

আছে। লাল কারেণদের পৃষ্ঠদেশে উদ্ভিন্নারা নবোদিত সূর্য্য অঙ্কিত থাকে। ইহাদের পাদাউঙ্গী শাখার নারীরা গলায় অনেকগুলি করিয়া বালার ন্যায় একপ্রকার কণ্ঠভূষণ ধারণ করে। এই বালা তাহাদের কণ্ঠ হইতে কখনই খুলিয়া লওয়া হয় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বালার চাপে পাদাউঙ্গ মহিলার কণ্ঠও মোরগের গলার ন্যায় লম্বা হইতে থাকে। যে নারীর কণ্ঠে যত বেশী বালা থাকে, তাহাকে ততই প্রশংসার চক্ষে দেখা হয়। ইহারা বিভিন্ন বর্ণের সাজসজ্জা করিয়া থাকে।' কারেণী অঞ্চলের মধ্য দিয়া নাম্পন এবং শালউইন নদী দুইটী বহিয়া গিয়াছে। জানা যায়—'নাম্পনের বিস্তার প্রায় একশত গজ, কিন্তু নদীর মধ্যস্থল প্রস্তরসমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে নৌকা চলাচল হয় না। কারেণদের অধ্যুষিত অঞ্চল দুইটি ভাগে বিভক্ত: পূর্ব্বকারেণী অঞ্চল ও পশ্চিম কারেণী অঞ্চল। কান্ত্রাবাদী ষ্টেট্ লইয়া পূর্ব্বকারেণী অঞ্চল গঠিত; ইহার আয়তন হইতেছে তিন হাজার বর্গ মাইল। কারেগী (আয়তন সাত শত বর্গমাইল), বালেক (আয়তন পাঁচ শত বর্গ মাইল), নাবেকন (আয়তন পঞ্চাশ বর্গমাইল) এবং নাঙ্গেল (আয়তন ত্রিশ বর্গ মাইল)—এই চারিটি ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া কারেণী ষ্টেট গঠিত। পূর্ব্বকারেণীদের দলপতি সলাপউ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করায় ১৮৮৯ সালে জেনারেল কোলেট সলাপউকে গদীচ্যুত করিয়া সলাউইকে গদীতে বসান এবং শানরাজ্যের দলপতিদের ন্যায় তাহাকে একটি সনদ দেন। ১৮৭৫ সালে রাজা মিন্দনের সহিত এক চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম কারেণী ষ্টেট-গুলির স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে ১৮৯২ সালে তাহাদের করদরাজ্যরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং ঐ বৎসর ২০শে জানুয়ারী তাহাদের সনদ দেওয়া হয়। কান্ত্রাবাদী ষ্টেট বাৎসরিক পাঁচ হাজার পঁচিশ টাকা, বালেক ষ্টেট বাৎসরিক দুই শত পঁচিশ টাকা এবং কায়েবগী ষ্টেট বাৎসরিক একশত টাকা নজর দিত। কারেণ রাজ্যগুলি এতদিন ব্রহ্মের করদরাজ্য ছিল। কারেণ রাজ্যগুলি উত্তরে শান রাজ্য, পূর্ব্বে শ্যাম দেশ, দক্ষিণে ব্রহ্মের শালউইন জিলা এবং পশ্চিমে তর ও অন্যান্য উপজাতির দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত।'

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ব্রহ্ম পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য দিল্লীতে গভর্ণমেণ্ট হাউসের মন্ত্রণা-কক্ষে কমন্‌ওয়েল্‌থএর অন্তর্গত চারিটী দেশের প্রতিনিধি-গণ এক ঘরোয়া সম্মেলনে মিলিত হন। বৈঠকে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যুক্তভাবে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর নিকট তথায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের কতকগুলি প্রস্তাবসম্বলিত এক পত্র প্রেরণ করা হইবে। ইতিমধ্যে হইয়াও থাকিবে হয়ত। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের শান্তি ও শৃঙ্খলার এখনও পর্য্যন্ত বৃহত্তর কিছু কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। রেঙ্গুনের ৭ই মার্চ্চের সংবাদে দেখা যায়—রেঙ্গুনের প্রায় তিন শত মাইল উত্তরে প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন থাজিতে কারেণবৃন্দ ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। ইহাতে সরকারী পক্ষ হইতে নিশ্চিন্ত হইবার কথা নয়।

ব্রহ্মেও শেষ পর্য্যন্ত একটি দ্বিতীয় কাশ্মীরী অভিনয় সুরু হয় কি না—এই আশঙ্কা লইয়াই আপাততঃ আমরা এই সন্ধবর্ষের পরিণতির অপেক্ষায় রহিলাম।*
[২৪. ১১. '৫৫]

*এই প্রবন্ধে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদ ও সাহিত্যপত্র হইতেও যথাযথ বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।
—লেখক

ম'ন (Mon) জাতির উপকথা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

[Mon জাতি প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ Mon-khemr জাতির ব্রহ্মদেশীয় প্রধান শাখা। ব্রহ্মদেশে ইহারা Tibets-Burman বা Burmese জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহারা থেট্‌ন, মৌলমিন্ প্রভৃতি টেনিসেরিম বিভাগের জেলাসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে মাদ্রাজ, তেলিঙ্গানা প্রদেশ হইতে আগত ভারতীয়দের সহিত ইহাদের অনেকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের সন্ততিবর্গ এবং পরে প্রায় সমগ্র Mon জাতি তেলেঙ্গ (Talaing) নামে পরিচিত হয়।

এই Mon বা Talaing জাতি সভ্যতা ও কৃষ্টির উচ্চ-

STUDENTS' P. G. A. COMMON ROOM

শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস গৌরবময়। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল এবং সমগ্র নিম্নব্রহ্ম উহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের কালে রেঙ্গুন সহরের নাম ছিল রামপুরা। পরে উহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। রেঙ্গুনের জগদ্বিখ্যাত শ্রীত্রিকোণ-স্তূপ (Shwe-dagon Pagoda) উহারাই নির্ম্মাণ করে। পরে উত্তরব্রহ্মের বিজয়ী বীর আলাউঙ্ পায়া (Alaung paya) উহাদিগকে পরাজিত করিয়া উহাদের স্বাধীনতা হরণ করে।

বর্ত্তমানে যদিও দেখিতে ইহারা অনেকটা বর্ম্মীদের মত, তথাপি উহাদের দেহবর্ণ বিশুদ্ধ বর্ম্মীজাতি অপেক্ষা মলিন। নিম্নব্রহ্মে বর্ম্মীদের অনেকেরই তেলেঙ্-রক্তের মিশ্রণ আছে। তজ্জন্য নিম্নবর্ণের বর্ম্মীদের দেহবর্ণও উত্তরব্রহ্মের বর্ম্মীদের বর্ণ অপেক্ষা হীন।

ব্রহ্মদেশে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা (Census) জাপানীদের বর্ম্মা আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে Monদের সংখ্যা টেনিসেরিম বা মৌলমিন্ বিভাগে ৩,০০,০০০ তিন লক্ষের উপর, Hanthawaddy বা পেগু বিভাগে ২০,০০০ বিশ হাজারের উপর এবং বেসিন বা ইরাবতী বিভাগে ২০০০ দুই হাজারের উপর। মোট লোকসংখ্যা ৩,৩৬,৭২৮। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদের সংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী, কারণ বর্ত্তমান-কালে Mon-জাতির অনেকে বর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দেয়—এমন কি অনেকে নিজেদের ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করে না।

বিগত ৩১শে আগষ্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর উহারা কারেন্ (Karen) জাতির সহযোগে থেটন ও মৌলমিন্ এই দুইটী সহর ও জেলা দখল করিয়া নিয়াছে এবং ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের নিকট Karen-দের ন্যায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবী করিতেছে।]

পুরাকালে একগ্রামে ফোডেব নামক একজন দুর্দ্দান্ত লোক বাস করিত। সে গ্রামের মধ্যে কাহাকেও সমীহ বা ভয় করিত না। সর্ব্বদা নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকিত। এজন্য গ্রামের সকলেই উহাকে ভয় করিত। এক রাত্রিতে, যখন গ্রামের নরনারী গভীর নিদ্রায় [illegible] তখন গরু চুরি করিবার অভিপ্রায়ে সে [illegible] এক গৃহস্থের গোশালায় প্রবেশ করিল। সেই সময় এক বৃহদাকার ব্যাঘ্রও হৃষ্টপুষ্ট নরম মাংসযুক্ত গরুর অনুসন্ধানে সেই গোশালায় প্রবেশ করিয়া গরুগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। ফোডেবও একটী মূল্যবান গরু বা বলদের অনুসন্ধান করিতেছিল।

অন্ধকারে একের পর এক গরু হাতড়াইয়া দেখিতে-ছিল। কোনটা রুগ্ন, কোনটা কৃশ কঙ্কালসার, কোনটার গলদেশে অথবা শরীরে ক্ষত। অবশেষে সে ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিল। তখন সে মনে ভাবিল, এই গরুটী বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান্ এবং ইহার চর্ম্মও মসৃণ। ওইটীই আমি নিব। এই ভাবিয়া লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ব্যাঘ্রও ভয় পাইয়া গোশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহাকে পৃষ্ঠে নিয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল পরে ফোডেব নক্ষত্রালোকে চিনিতে পারিল, যে জন্তুর উপর সে আরোহণ করিয়াছে, সে গরু নহে, ব্যাঘ্র। অত্যন্ত ভয় পাইয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া একটা বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া সে বৃক্ষে আরোহণ করিল। ব্যাঘ্রের ভয় তখনও বিদূরিত হয় নাই। সে তাহার আবাসস্থল গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্রকে এইরূপে দৌড়াইতে দেখিয়া একটী বানর উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধো! ব্যাঘ্ররাজ! কিসের ভয়ে তুমি সন্ত্রস্ত হইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে?

ব্যাঘ্র। আমি বাঘ। আমার পৃষ্ঠে একটী মানুষ চড়িয়া বসাতে আমি ভয় পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছি।

বানর। ওঃ, তাই নাকি? মানুষটী এখন কোথায়?

ব্যাঘ্র। আমার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া সে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে।

বানর। সেই বৃক্ষটী কোথায়?

ব্যাঘ্র। এস, আমি বৃক্ষটী দেখাইয়া দিতেছি। এই মানুষটী কিরূপ দুঃসাহসী দেখিবে এস।

বানর। বাপ্পা:! তোমার সহিত আমার যাইতে

সাহস হয় না। শেষে যদি তুমি আমাকে সেই মানুষের সম্মুখে ফেলিয়া নিজে পলায়ন কর!

ব্যাঘ্র। বন্ধো! অকারণ ভয় করিতেছ। আমি আগে আগে যাইব। বিশ্বাস না হয় আমার লাঙ্গুলের সহিত তোমার লাঙ্গুল বাঁধিয়া অগ্রসর হইব।

তদনন্তর ব্যাঘ্র ও বানর একে অন্যের লাঙ্গুলে আবদ্ধ হইয়া যে বৃক্ষে ফোডেব আরোহণ করিয়াছিল, তাহার নিম্নে উপস্থিত হইল। ফোডেব ভাবিল—ব্যাঘ্র উহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। সে তখন বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় আরোহণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দারুণ ভয়ে তাহার জানুদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল এবং পড়্বি তো পড়, ঠিক বাঘের পিঠের উপর পড়িয়া গেল।

ব্যাঘ্র চমকিত ও অত্যন্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায়! হায়! আবার বুঝি আমার পিঠে চাড়িয়া বসিল" বলিয়া ঘন ঘন সবেগে পুচ্ছ আন্দোলন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের লাঙ্গুলের সহিত আবদ্ধ বানরের দেহ পুচ্ছ ও আন্দোলনের ফলে সবেগে কঠিন মৃত্তিকায় আহত হইতে লাগিল। আঘাতের ফলে উহার দাঁত বাহির হইয়া পড়িল এবং অবশেষে রক্তাপ্লুত দেহে পঞ্চত্ব পাইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বানর ভাবিল কেন সে দুর্ব্বল হইয়া মহাবল ব্যাঘ্রের পুচ্ছের সহিত পুচ্ছ বদ্ধ করিতে গিয়াছিল?

দৌড়াইতে দৌড়াইতে পরিশ্রান্ত হইয়া ব্যাঘ্র পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—বানরের দন্তসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তখন ব্যাঘ্র সখেদে বলিল, "আমি দৌড়াইয়া মরিতেছি, আর তুমি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছ? বন্ধো! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।"

ব্রহ্মভাষায়ও এরূপ একটী গল্প আছে এবং সেই গল্প হইতে নিম্নলিখিত প্রবচনটীর উৎপত্তি হইয়াছে—

"যন্ত্রণায় আমার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, আর তোমরা ভাব আমি হাস্‌ছি!"*

* "প উ" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পের মর্ম্মানুবাদ।

প্রেম আসে

বিভূতি মণ্ডল

প্রেম আসে মাঝে মাঝে জীবনের কিনারে কিনারে,
নরম ঢেউ-এর মতো—যে নরম ঢেউ
দখিনা বাতাস পেয়ে
কূলের মাটিরে ভাঙে দিন রাত ধ'রে।
কোনোদিন মাঝ রাতে
পৃথিবী নিশুতি হোলে
অশান্ত ঝড়ের মতো কল্লোলে গর্জ্জনে
প্রেম আসে আপনার বেগে—
আমার হৃদয় ভেঙে হয় খান্ খান্।
তরংগে তরংগে

আছাড়িয়া পড়ে কূলে, উপাড়িয়া নেয়
তীরতরু যত থাকে দু'টি তীর থেকে।
নিষ্ফল আক্রোশে কাঁদি, রুদ্ধ বেগে উঠি ফুলে ফুলে,
সান্ত্বনার থাকে নাকো ভাষা,—
সেদিন আমার প্রেম সর্ব্বগ্রাসী বুঝি সর্ব্বনাশা।
আর কোনোদিন

আমার এ প্রেম যেন স্তিমিত জোয়ার,
নির্ব্বাত নিষ্কম্প নদী উচ্ছ্বাস বিহীন
বাতাসের দোলা নেই, তরংগের নেই কলরব।
তীরে ভাঙে নাকো মাটি। শান্ত সমাহিত
ব'সে থাকি দুই আঁখি দিগন্তে মেলিয়া—
আমার প্রাণের বধূ দেহের বেদীতে
যেন কার সাথে মিলে এক হোয়ে গ্যাছে
কপোলে কপোল রাখি। মিলনের দিগন্ত সীমায়
আলো আর অন্ধকারে যেমন মিলন
পূর্ণিমা রাতের শেষে রবিকরে আর চন্দ্রালোকে,
দেখি সেই মিলনের পরিপূর্ণ সুখে
আমি আছি স্তব্ধ হোয়ে।

পার্শ্বে মোর ধরি মোর হাত—
নতবৃন্ত মুখখানি আমার এ বুকে,—
বুঝি মোর চিরন্তনী, বুঝি মোর প্রাণের প্রেয়সী
আমার এ দু'টি চোখে রাখি চোখ শান্ত হোয়ে বসি—
পর্ব্বত-দুহিতা উমা ভরে দেয় আমার অন্তর,
আজন্ম ভিখারী আমি—আমি তার অনাদি শংকর।

গুরুমশাই [ফটো—ডাঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জংলা মাঠের ফসল

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বেচা-কিনা যেটুকু ছিল অতি অল্পকালের ভিতরেই শেষ হইয়া গেল ময়নালের।

আজ হাটে হোগলার বড় আমদানী। নানাস্থান হইতে আসিয়াছে পাইকার; তাহারা হোগলা কিনিয়া চাপানী নৌকায় ভরিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে ময়নাল।

হঠাৎ ময়নালের চোখ পড়িয়া গেল রামশরণ সাহার উপরে। সেও হাটে আসিয়াছে সুপারীর সন্ধানে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুপারী কিনিতেছে।

লোকটাকে দেখিয়াই কেমন ময়নালের মাথায় খুন চাপিয়া যায়। ময়নাল আড়ালে আড়ালে ঘোরে তাহার পিছে পিছে। ঘোরে আর ভাবে, হাতে যদি থাকিত একটা ছোরা—একটু দূরে একটু অন্ধকারে যদি পাওয়া যাইত লোকটাকে—আমূল বসাইয়া দিত ছোরাটা এই লোকটার ঠিক কলজেটার কাছে। রামশরণ ঘোরে—দূরে দূরে, আড়ালে আড়ালে ঘোরে ময়নাল—কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া ওঠে পিষ্ট ফণীর হিংস্রতায়।

হঠাৎ রামশরণের একেবারে মুখোমুখী হইয়া পড়ে ময়নাল। রামশরণ ভ্রূ কুঁচকাইয়া দাঁড়াইল, খানিকক্ষণ ময়নালের দিকে তাকাইয়া বলিল, সেই জয়নালের ছেলে ময়নাল ছোঁড়াটা না? ছোঁড়া কবে আবার ছাড়া পেল?

একসঙ্গে চারিপাশের লোকের দৃষ্টি পড়িল ময়নালের দিকে। ঘৃণায় ময়নাল মাথা নীচু করিয়া মুখটা ফিরাইয়া লয়। এত অপমান একহাট লোকের ভিতরে?

পাশ কাটাইয়া দূরে সরে ময়নাল। কেমন যেন একটা অবসাদ আসে। একা একা গিয়া বসিয়া থাকে নদীর পারে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, সে যদি একটা কুকুর হইতে পারিত তবে ঘেউ ঘেউ করিয়া কামড়াইয়া দিয়া আসিত রামশরণকে, ছুঁচলো দুইটা দাঁত বসাইয়া দিত তাহার পায়ের থলথলে মাংসের ভিতরে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, বাড়িতে ফিরিতে উৎসাহ পায় না ময়নাল। একা একা নদীর কূলে বসিয়া ভাবে কত কথা।

না, এ-দেশে আর থাকা হইবে না, নতুন দূর দেশে আবার কোথায়ও চলিয়া যাইবে সে। রক্তে আছে তাহার যাযাবরের ছন্দ, সেই রক্ত উষ্ণ হইয়া ওঠে শিরায় শিরায়।

ক্ষতিই বা কি তাহাতে? কি আছে তাহার বন্ধন এই ঝাপুরঘাটে? মা নাই—বাপ নাই—কোন আত্মীয়-স্বজন নাই—বলিতে গেলে এখন ঘরবাড়ি জমা জমিও নাই কিছুই তবে? কিসের তাহার মোহ?

কিন্তু তবু যেন মনে কোথায় টান লাগে। কেন? বানুর জন্য? তাহার ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তবে? পলাইবে? বানুকে লইয়া এদেশ হইতে পলাইবে? তাহাও কি সম্ভব হয়? এখন আর তাহা হয় না। বানুই বা আসিবে কেন?

কিন্তু আসিতেও পারে। ময়নালের মনে হইতেছে, বানু আসিতেও পারে। ঘাটে একদিন নাও লাগাইয়া অন্ধকারে

ডাক দিলেই হয়ত আসিতে পারে। তারপরে ভাসিয়া পড়িবে এই ঝাপুর নদীতে।

শৈশবের স্মৃতি মনে পড়িয়া যায় ময়নালের; সেই নদীর পাড়ে ভুতুরদিয়ার চরের বাড়ি—এমনই একদিন সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসিয়াছিল তাহার বাজানের সঙ্গে সে; পাশে বসিয়া বেতের শিকা বুনাইতেছিল তাহার মা। নদীর জলে জোয়ারের ঢেউ লাগিয়াছে, এখান হইতে সেখান হইতে মাঝে মাঝে আসিতেছে পাড় ভাঙিয়া পড়িবার ঝুপ-ঝাপ্ শব্দ। মাঠে সারাদিন কাজ করিবার পর শ্রান্তদেহ দাওয়ার খামের সঙ্গে এলাইয়া দিয়াছে জয়নাল; গুড়-গুড় করিয়া আস্তে আস্তে তামাক টানিতেছে আর বলিতেছে তাহার গত জীবনের সব ইতিহাস। সেই প্রথমে কোথায় ছিল—কি করিয়া নদী তাহার পিছনে লাগিয়া আছে, কি করিয়া সে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে ভুতুরদিয়ার চরে। এখনকার বাড়ি যদি আবার ভাঙিয়া যায়, তবে অনেক দূরে চলিয়া যাইবে আবার নূতন চরে। ময়নাল ভাবে আর তাকায় ঝাপুরের নদীর দিকে। আজও নদীতে উত্তাল তরঙ্গ, জলের স্রোতে আর বাতাসের প্রবাহে সংঘর্ষ লাগিয়া নদী কেবলই গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। নদীর বুকে যত লাগে দোলা ময়নালের ধমনীতে তত লাগে রক্তের দোলা। যাযাবরের চঞ্চল রক্ত।

নদী তাহাকে ডাকে—আবিল ক্রূরতা, হিংস্র মত্ততা লইয়াই ডাকে—তাহার সর্ব্বাঙ্গের নিরন্তর চলমানতা লইয়া ডাকে। ময়নালের দেহ-মনেও জাগে মত্ততা—ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় নদীর তরঙ্গের ভিতরে। সেই মত্ততার ভিতরেই জাগে বাসুর মুখখানি, সে মুখের কিরণ ঝকমক্ করিতে থাকে তাহার রক্তের দোলার ভিতরে—যেমন করিয়া ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে আকাশের চন্দ্রের কিরণ ঝাপুর নদীর পঙ্কিল ঢেউয়ের উপরে। না—একা নয়, বাসুকে লইয়াই যাইবে।

পরক্ষণে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়—ময়নাল ভাবে তাহার যদি শিকারী কুকুরের মতন দুইটা ছুঁচলো দাঁত থাকিত!

হঠাৎ একটা কোলাহল ভাসিয়া আসে ময়নালের কাণে। তাকাইয়া দেখে অদূরে লোকের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে নদীর পাড়ে, সকলেই হাত দিয়া কি দেখাইতেছে নদীর ভিতরে। নদীর দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেই সে দেখে ডুবিয়া যাইতেছে একখানি ছইওয়ালা ডিঙি—বাতাসে উল্টাইয়া ফেলিয়াছে বোধ হয়, মাঝি সাঁতার কাটিয়া কূলে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নৌকার ভদ্র আরোহী ভাল সাঁতার জানে না, ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাবুডুবু খাইতেছে।

ভিড়ের কাছে দৌড়াইয়া আগাইল ময়নাল, শুনিল ডুবিয়া মরিতেছে তিলেরচরের রামশরণ সাহা। একহাট লোক কূলে বসিয়া কোলাহল করিতেছে—হায় হায় করিতেছে, কিন্তু নদীর জলে অসম্ভব স্রোত—পা দিলে কুমীরের মত স্রোৎ করিয়া টানিয়া লইতে চায়—তারপরে আবার উজান বাতাসের ঢেউ; কে টানিয়া আনিবে রামশরণকে? সবাই চ্যাচামেচি করে—নদীতে নামে না কেউ।

রামশরণ ডুবিয়া মরিতেছে শুনিবামাত্র ময়নাল বলিল, বেশ হইছে।

কিন্তু এতগুলি লোক শুধু কূলে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছে—প্রাণের ভয়ে কেহ জলে পা দিতেছে না? কত দূরে হইবে রামশরণ?—কূল হইতে বড় জোর দু'শ হাত? ঐখানে একটা লোক ডুবিয়া মরিবে এতগুলি লোকের সামনে? সমস্ত দেহমনে জাগে প্রতিবাদ—প্রবৃত্তিবশেই মাথায় গামছা বাঁধিয়া কাপড় আঁটিয়া জলে ঝাঁপ দেয় ময়নাল। মুহূর্ত্তে থামিয়া যায় কূলের সব কোলাহল। সকলের চোখ নিবদ্ধ হয় ময়নালের প্রতি আর হাবুডুবু খাওয়া রামশরণের প্রতি। কাহারও মুখে কোন মন্তব্য নাই—নিরুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করিতেছে কি হয়।

অসুরের বল এই ছেলেটার দেহে, বিস্মিত হয় পাড়ের সব লোক। ছলাৎ ছলাৎ করিয়া দুই হাতে কাটে সে ঘোলা জলের ঢেউ—ঢেউয়ের ধাক্কাকে সমানে দেয় ধাক্কা—যতটা আঘাত খায় ঢেউয়ের নিকট হইতে, সমানে ততটা আঘাত দিতে চায় ঢেউগুলিকে।

কিন্তু আশ্চর্য্য ডানার বল ছেলেটার। সত্যই সে আগাইয়া গিয়াছে,—সত্যই খপ্ করিয়া ধরিয়াছে রামশরণের একখানি হাত—তারপরে আবার ফিরিয়া চলিল কূলের দিকে।

এইবারে সবার মুখ ফুটিয়াছে; ঘন ঘন বাহবা দিতে আরম্ভ করিয়াছে কূলের লোক—দু' চারজনে ইতিমধ্যে গামছা পরিয়া কিছু দূরে আগাইয়াও গিয়াছে জলের ভিতরে খানিকটা।

ময়নাল কূলে আসিয়া রামশরণকে ছাড়িয়া দিল, তাহাকে পাড়ে টানিয়া তুলিল কূলে যাহারা আগাইয়াছিল তাহারা; ময়নাল কোনও রকমে কাদামাটির ভিতরে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল; পাড়ের লোক তাহাকে উপরে তুলিতে গেলে সে হাত নাড়িয়া বারণ করিল।

রামশরণ বাঁচিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু জল খাইয়া ভুস্ হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ে উঠিয়া সে মরার মতন পড়িয়া রহিল। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল তাহার নিজেকে সামলাইয়া একটু উঠিয়া

বসিতে। উঠিয়া বসিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল ময়নালের কথা। ময়নাল তখনও কাদার ভিতরে বসিয়া আছে, এখনও তাহার দম স্বাভাবিক হইয়া আসে নাই।

রামশরণ আস্তে আস্তে নাভির কাছে গুজিয়া রাখা কাপড়ের কোঁচাটি খুলিল—তাহার সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে পাঁচ টাকার দশখানি নোট। সে নোটগুলি বাহির করিয়া আগাইয়া ধরিল পাশের লোকদের সামনে, ইঙ্গিত করিল সেগুলি ময়নালকে দিতে। রামশরণের ধর্ম্মবুদ্ধির তারিফ করিয়া একটি বৃদ্ধ আগাইয়া গিয়া নোটগুলি হাতে লইল এবং ময়নালের কাছে লইয়া গিয়া ধরিল।

ময়নাল জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি এ?

বৃদ্ধটি বলিল, বাবু দিলেন, বক্‌শিশ্।

আবার খুন চাপিয়া যায় ময়নালের মাথায়—মাতালের মতন সে উঠিয়া দাঁড়ায়—নোটগুলি বৃদ্ধের হাত হইতে টান দিয়া লইয়া আগাইয়া যায় রামশরণের দিকে, তারপরে নোটগুলি ছুঁড়িয়া মারে রামশরণের গায়ে—সাপের মতন তীব্র হিংস্রতায় সে কাঁপিতে থাকে—তারপরে হন্ হন্ করিয়া ভিড় ঠেলিয়া চলে বাড়ির মুখে।

সমবেত জনতা কিছুই বলিল না, শুধু তাকাইয়া দেখিতে লাগিল ছোঁড়াটার চলিয়া যাইবার ঢঙটা।

হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ ময়নাল থামিয়া দাঁড়ায়, কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসে। সকলের দৃষ্টি পড়ে আবার ময়নালের উপরে। ময়নাল রামশরণের কাছে গিয়া টাকার নোটগুলি আবার কুড়াইয়া লইল; বলিল,—সেই গোরু বেচা পঞ্চাশটা টাকা—মনে আছে? সেই টাকা আবার নিলাম।

বলিয়াই ময়নাল আবার দ্রুতপদে চলিয়া গেল, সবাই তেমনই আবার তাকাইয়া রহিল।

সরিকদের হাটে আজ তিনদিন ধরিয়া চলিতেছে জারিগান। ওস্তাদ বয়েতির দল। পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচ সাত গাঁয়ের হিন্দুমুসলমান বাসিন্দাগণ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

প্রথম দিন আকাশটা বেশ ভালই গিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দিনের প্রভাত হইতে কালোকালো মেঘগুলি নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে যেন পাল্লা দিয়া গান ধরিয়াছে।

কিন্তু হইলে হইবে কি? এ মুল্লুকে বৎসরে এই তিনদিন গান, আর হয়ত কচিৎ-ভবিষ্যৎ কালে-ভদ্রে। অতএব এই অঝোর ধারা মাথায় করিয়াই দলে দলে শ্রোতা আসিয়া গান আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্বেই সভামণ্ডপ একেবারে ভরিয়া রাখিয়াছে।

হাটের পশ্চিম পাশে একটা খোলা জায়গার উপরে ঢালু করিয়া মস্ত বড় একটা টিনের ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভিতরে আর ক'জন লোক ধরে? অতএব শ্রোতার ভিড় প্রায় সবটাই ছাউনির বাহিরে চারিদিকের চাতালগুলিতে। নিরন্তর মানুষের পাড়ায় পাড়ায় চারিদিকেই এক হাঁটু কাদার স্রোত বহিতেছে। উপরে জল—নীচে জল, তবু গান শুনিবার সখ মেটে না।

আজ তৃতীয় দিবস। গানও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি যখন খুব জোরে নামে তখন সবাই দৌড়াইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী দোকানঘরগুলিতে ওঠে,—আবার একটু বৃষ্টির জোর কমিয়া আসিলেই ছাউনির বাহিরে দেখিতে না দেখিতে শ্রোতার ভিড় জমিয়া ওঠে।

ময়নাল আসিয়াছে গান শুনিতে। তাহার ঠাঁই মেলে নাই ছাউনির বাহিরেও, সে তাই প্রথমেই আসিয়া ঠাঁই করিয়া লইয়াছে নিকটবর্ত্তী একটা ত্রিভঙ্গ কাঁটাল গাছের উপরে। কোথা হইতে মস্ত বড় গোটা কয়েক মানকচুর পাতা যোগাড় করিয়া লইয়াছে, জোরে বৃষ্টি নামিলে তাহাই মাথায় দেয়।

কিন্তু মাথা বাঁচাইলে কি হইবে, টিনের ছাউনির উপরে বৃষ্টির শব্দ ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্—গানের কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ এমনি বসিয়া বসিয়া ময়নালের মন উসখুস করিতেছে। তবু বাড়ি ফিরিতে মন সরিতেছে না।

আবার বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে কেমন একটা দমকা হাওয়া। টিনের সমস্তটা ছাউনি এক সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ করিয়া নড়িয়া উঠিল, ভয়ে সভাশুদ্ধ লোক বাহিরে দৌড়াইয়া আসিল, ময়নাল দেখিল ভিতরে কালুসর্দ্দার আর মৈনদ্দি। কালুসর্দ্দার এই কয় বছরে আরও বুড়াইয়া গিয়াছে, এখন লাঠি ভর করিয়াছে। রূপান্তর নাই কিছু মৈনদ্দির—সেই যেমনটা ঠিক তেমনটা।

খানিকক্ষণ চলিল এমনই গোলমাল আর কোলাহল। আবার থামে বাতাসের বেগ, থামিয়া আসে বৃষ্টি—গুরগুর সুর-সুর করিয়া আবার সকলে ঢোকে সভামণ্ডপে,—আবার আরম্ভ হয় গান।

না, গান আর জমিতেছে না। মানপাতা গড়াইয়াও জল পড়ে টুপটাপ, ময়নাল এতক্ষণে ভিজিয়া উঠিয়াছে। আস্তে আস্তে সে গাছ হইতে নামে, খানিকক্ষণ দাঁড়ায় গাছের গোড়ায়, তার পরে তাকায় আকাশের দিকে, না, আকাশের অবস্থাও ভাল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া ময়নাল বাড়ি ফেরে।

বাড়ি যাইবার পথে আকাশের অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হইয়া উঠিতেছে; মেঘের অন্ধকার আর সন্ধ্যার অন্ধকার একত্রে মেশামিশি করিয়া পথ মাঠ ঘাট ছাইয়া ফেলিতেছে। মাঝে

মাঝে ঝলসিয়া ওঠে বিদ্যুৎ—গাছের মাথাগুলি অন্ধকারে ঝাঁকি দিয়া নড়িয়া ওঠে দমকা বাতাসে। বৎসরের ভিতরে যে দু'একটা দুর্য্যোগের দিন দেখা দেয় মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বাভাসের মতন, আজ-কারের দিনটাও তাদের মধ্যে।

আগরপুরের খেয়াঘাটে আসিয়া ময়নাল দেখে, ঘাটে কোথায়ও নৌকা নাই। চীৎকার করিয়া ডাকে সে ঘাটমাঝিকে, কোন সাড়া পায় না। খালের পাড়ে এদিক ওদিক হাটিয়া দেখে নৌকা ভাসিয়া আসিয়াছে ঘাট হইতে অনেক দূর, ঢুকিয়াছে হোগলা বনে।

আপনি নৌকা ঠেলিয়া খাল পার হইয়া যায় ময়নাল, আবার চলে একা একা অন্ধকারে পিছল পথে। হাঁটিতে হাঁটিতে ময়নালের মনে হয় এই দুর্য্যোগময়ী পৃথিবীটার বুকে আজ সে একাই আছে, আর কেহই নাই। হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, বানু আছে। সেও আজ একা আছে—ঐ ত দক্ষিণপূব কোণের একখানা কুঁড়ে ঘরের ভিতরে সেও নিশ্চয় একা আছে। কালু সর্দ্দার আর মৈনদ্দি যে পর্য্যন্ত বাড়ী না ফিরিবে, সে পর্য্যন্ত হয়ত বানু একা। হোচনের কাছে সে শুনিয়াছে, ঘরে বানুর আর কেহ নাই।

ময়নাল হাঁটে আর তাকায় ভুতুরদিয়ার চরের দিকে, তাকায় মৈনদ্দির বাড়ির দিকে। ময়নাল দেখে তাহার অজ্ঞাতে তাহার পা দুটি চঞ্চল হইয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছে। সে কি দৌড়াইতেছে? পিছনে কে দৌড়ায়? শয়তান? হাঁ, ময়নাল ঠিক বুঝিতেছে তাহার পিছনে ফিরিতেছে শয়তান—সে পিছন ছাড়ে নাই, নিরন্তর ঘোরাফেরা করিতেছে, এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের ভিতরে সে আবার হিংস্র মূর্ত্তিতে ধাওয়া করিতেছে ময়নালকে। ময়নাল বুঝিতেছে তাহাকে শয়তানে ধাওয়া করিতেছে, কিন্তু থামিবার সামর্থ্য নাই—সে দৌড়াইতেছে।

মৈনদ্দির বাড়ি পর্য্যন্ত ময়নাল একটা ঝোঁকের মাথায়ই দৌড়াইয়া আসিয়াছে; কিন্তু বাড়ির দরজায় আসিয়া সহসা থামিয়া গেল, গা টা কেমন ছমছম করিতেছে, কাছেই ঘাটে বাঁধা ছইওয়ালা একখানা ডিঙি, বোধ হয় দোকানদারীর নৌকা। তবে শয়তান কি ময়নালের জন্য সবই যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে? সাহস ফিরিয়া আসে তাহার প্রাণে। এই নৌকায় বানুকে লইয়া ভাসিয়া পড়িলে হয় না? এই ত মাইলখানেক খাল—দুই খোঁচে লগি ঠেলিয়া গেলেই নদী; একবার নদীতে পড়িতে পারিলে কে পাইবে তাহাকে? যতক্ষণে বাড়ি ফিরিবে কালু সর্দ্দার আর মৈনদ্দি, ততক্ষণে সে গিয়া নদীতে পড়িতে পারিবে না?

সাহস আসে ময়নালের গায়ে। কিন্তু ঘরে কি বানু একা? যদি আরও কেহ থাকে? চুপ চুপ পা টিপিয়া চোরের মতন আগায় সে। ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ, ঘরের ভিতরে মাটির পিদিমের ম্লান আলো, চোরের মতন চুপি চুপি দুয়ারের উপরে টোকার ঘা মারে ময়নাল—টক্ টক্ টক্।

কোন সাড়া নাই।

আবার টক্ টক্ টক্—

ভিতর হইতে বানু জিজ্ঞাসা করে—কে?

বাহিরে কোন জবাব নাই, আবার শুধু টক্ টক্ টক্—ভয় পায় বানু—গলা তাহার কাঁপিয়া যায়—কাঁপা গলায়ই আবার জিজ্ঞাসা করে—কে?

ময়নাল ঠিক বোঝে ঘরে আর কেহ নাই, শুধু বানু। সাহসে বুক ভরিয়া ওঠে, ময়নাল বলে—ভয় নাই বানু, আমি ময়নাল।

—ময়নাল?

—হ ময়নাল, দুয়ার খোল বানু।

বানু বিস্মিত হইয়া দুয়ার খোলে, ময়নালের মুখের দিকে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া যায়। ময়নালের এ কি রূপ! জলে ভিজিয়া কালো দেহ যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে। ময়নাল হাঁপাইতেছে, পাগলের মত সে বলে, বানু যাবি আমার সঙ্গে?

—তোমার সঙ্গে—ময়নাল?

—হ বানু, আমার সঙ্গে, যাবি বানু যাবি?

উন্মত্ত আকুতি ময়নালের নাকে মুখে চোখে।

বানু বলে—কোথায় ময়নাল?

অনেক দূরে—সেই মেঘনার চরে। যাবি বানু যাবি? ঘাটে নাও বাঁধা আছে, যাবি বানু যাবি?

বানুর মুখে কথা ফোটে না।

খপ্ করিয়া বানুর হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া মিনতির সুরে ময়নাল বলে—যাবি বানু, যাবি?

বানু বলিল—আমার ঘর?

—ঘর পাব মেঘনার চরে—যাবি বানু, যাবি—হাত ধরিয়া ঝাঁকি দেয় ময়নাল।

বানুর মনে হইল, ময়নালের সমস্ত দেহ-ভরা আজ আগুন—তাহার হাতের ভিতর দিয়া সে আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে বানুর সকল দেহে—বানুর দেহ তপ্ত হইয়া উঠিতেছে—সে কাঁপিতেছে।

আবার হাত ধরিয়া ঝাঁকি দেয় আর টান দেয় ময়নাল—যাবি বান্নু—যাবি—?

যে অন্ধ নিয়তির দুর্ব্বার আবেগ লক্ষ লক্ষ শ্যামা পোকাকে ক্রূর হাসি হাসিয়া ঠেলিয়া দেয় জ্বলন্ত আগুনে দীপালির রজনীতে সেই আবেগ জাগিয়া উঠিল বান্নুর সমগ্র দেহ মনে, সে বলে—চল ময়নাল চল—

দুয়ার তেম্‌নি খোলা রহিল, মাটির পিদিমটি তেমনই মিটমিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল, ময়নালের কাঁধে ভর করিয়া বান্নু দৌড়িয়া গিয়া ঘাটের নায়ে বসিল।

সরিকল হাটের গান আজ আর কিছুতেই জমিল না। জলে ভিজিয়া ভিজিয়া এতক্ষণে সকলের উৎসাহ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তারপরে ঝড়ের আশঙ্কা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কিছু লোক ভাগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত বসিয়াছিল ছাউনির নীচের লোক, বাতাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জলের ছাট আসিয়া তাহাদিগকেও ভিজাইয়া দিতে লাগিল। তাহারাও একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলে দারুণ গণ্ডগোলের ভিতরে গান ভাঙিয়া গেল।

আকাশের দিকে তাকাইয়া কালু সর্দ্দার সরিকলে আর অপেক্ষা করা উচিত মনে করিল না। শীঘ্রও ঝড় থামিবার কোন লক্ষণ নাই, বরঞ্চ তাহাদের অভিজ্ঞতায় তাহারা দেখিয়াছে, এই রকমের দুর্য্যোগের সন্ধ্যা রাত্রির অন্ধকারে আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে। কালু সর্দ্দার তাই মৈনদ্দিকে লইয়া সেই ঝড়ের ভিতরেই বাহির হইয়া পড়িল।

মৈনদ্দিকে বাড়ির কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া কালু সর্দ্দার বারান্দায় বসিয়া বদনার জলে পায়ের কাদা ছাড়াইতেছিল, এখনও ভিজা কাপড় ছাড়ে নাই। এমন সময়ে মৈনদ্দি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া হাঁপাইয়া পড়িল, বলিল, সর্দ্দার বান্নু এ বাড়ি?

—না—

—তবে—কোথায়?

—কেন, ঘরে নাই?

—না—

—বলস্ কি?

—ঘরের দুয়ার একেবারে খোলা—

—বলস্ কি মৈনদ্দি—?

উত্তেজিত হইয়া সটান দাঁড়ায় কালু সর্দ্দার, তাহার স্ত্রী দৌড়াইয়া বারান্দায় নামিয়াছে।

—ঘাটের নাও ত ঘাটে নাই সর্দ্দার—।

এঁ্যা, ঘাটের নাও-ও ঘাটে নাই, বান্নুও ঘরে নাই—দুয়ারও হাঁ করা খোলা—? দাঁড়া মৈনদ্দি দাঁড়া—

ক্ষিপ্তের মতন কালু সর্দ্দার ঘরের ভিতরে ঢুকিল, মরিচাপড়া লেজা দুইটাকে দুই হাতে লইয়া একটা লাফ দিয়া ঘরের বাহিরে পড়িল; একটা লেজা মৈনদ্দির হাতে দিয়া বলিল,—চল মৈনদ্দি চল, ময়নাল চোরা ছাড়া পাইছে—

চিৎকার করিয়া কালুর স্ত্রী বলে,—মেঞা ব্যাপার কি—?

অন্ধকারের ভিতরে জবাব আসে—ময়নাল চোরা ছাড়া পাইছে—ময়নাল চোরা—।

খালপাড় ধরিয়া সোজা ঝাপুর নদীর দিকে যত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে কালু সর্দ্দার ও মৈনদ্দি, বাতাস তাহাদিগকে তত ঠেলিয়া পিছনে হটাইয়া দিতেছে। পিছল পথ, কোথাও এক কোমড় জল, কোথাও এক হাঁটু কাদা, চলিতে গিয়া কেবলই আছাড় খায়, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ দেয় চোখ ঝল্‌সাইয়া। তবু চলে কালু সর্দ্দার, একটা হিংস্র আগুনের তাপ তাহার চোখ দুইটাকে কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছিল।

যতদূর তাহারা আগাইয়া যাইতেছে কোথাও কোন নৌকা নাই।

তবু দৌড়াইয়া চলে কালু সর্দ্দার, পিছে পড়ে মৈনদ্দি। এতক্ষণে তাহারা ঘোষকাঠীর বড় খালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চুকুর—চুকুর—। বৈঠার শব্দ কানে আসিতেছে যেন। লেজা ঝাকিয়া দাঁড়ায় কালু সর্দ্দার। বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখে ছইওয়ালা একখানা ডিঙি,—চিৎকার করিয়া ওঠে,—কে?

—আমরা যাব পিপ্‌লাকাঠী। ভীত কণ্ঠে জবাব দেয় মাঝি।

—এলে কোথাথন?

—মুলাদিথন।

—আর নাও আছে খালে?

—আছে একখানা—অনেক দূরে—।

—যায় না আসে?

—যায়।

—কত দূর?

—এখন প্রায় নদী ধরাধর।

আবার দৌড়াইয়া ছোটে কালু সর্দ্দার, অনেক পিছনে পড়িয়াছে মৈনদ্দি। বড় খাল—দু'পাশে রাস্তা নাই, শুধু জলে

ডোবা মাঠ—তাহার ভিতর দিয়াই প্রায় সাঁতার কাটিয়া চলে কালু সর্দ্দার।

এতক্ষণে কালু পৌঁছিয়াছে নদীর কূলে খালের মুখে। না,—নৌকা নাই ইহার ভিতরে। তবে পালাইয়াছে। কালু দাঁড়াইল খালের মুখে—মাতালের মতন দেহ তাহার টলিতেছে, লেজাটি মাটিতে কুপিয়া তাহাকে ভর করিয়াই দাঁড়াইল।

মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকায়, নদীটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চায়, দেখিতে পারে নাই, চোখে এখন আর দৃষ্টি নাই, মাথা ঘুরিতেছে।

ঐ দেখা যায় নাকি একখানি ডিঙি নৌকা? শুধু টাল খাইতেছে অতি অসহায়ের মতন, প্রাণপনে সামলাইতে চাহিতেছে ময়নাল? ঝলকে ঝলকে জল ওঠে নাকি? বাতাসে উল্টাইয়া গেল নাকি!

কালু তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, বাস্থ—বাস্থ—

ছই ধরিয়া বাহিরে মুখ বাড়ায় নাকি বাস্থ? ঝিলিক শুধু চোখ ধাঁধায়—ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না।

কালু সর্দ্দার আবার ডাকে,—বাস্থ—বাস্থ—

অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা অসহায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠের যেন জবাব আসিল,—বাজান—দোয়া রাখ্য—দোয়া।

তুফান ঠেলিয়া ছোট্ট ডিঙি চালাইতেছে ময়নাল। নদীতে পড়িয়া প্রাণপণ নৌকা ঠেলিয়াছে সে অনেকক্ষণ, কিন্তু আগাইতে পারে নাই বেশীদূর। বৈঠার একটানে যেটুকু আগায়, বাতাসের ঝাপটায় এবং জলের ঝাপটায় আবার পিছোয় প্রায় ততখানি।

প্রায় প্রহরখানেক ধরিয়া এমনি চলিয়াছে, বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে থামিয়া আসিতেছে, নদীর ঢেউও আস্তে আস্তে পড়িয়া আসিতেছে। ছইয়ের ভিতরে বসা বাস্থ, কোন কথা নাই, নড়েও না,—কি ভাবিতেছে?

ময়নালও কথা বলে না, শুধু বৈঠা টানে। এমনই চলে আরও কতক্ষণ।

হঠাৎ বাস্থ ছইর ভিতর হইতে ডাকিল,—ময়নাল—

—কি বাস্থ?

—নাও ফিরাও—আমাকে ফিরাও—

—কোথায়?

—ঝাপুরঘাটে।

ময়নাল দেখে, বাস্থর কণ্ঠস্বর ক্রমেই কাঁপিয়া যাইতেছে। বিস্ময়ে ময়নাল বলে, ক্যান্?

—আমি যাব না।

—ক্যান্? গর্জ্জিয়া ওঠে ময়নাল।

বাস্থর আর কথা সরে না।

প্রকৃতির দুর্য্যোগের সঙ্গে মানুষের মনের দুর্য্যোগের একটা গভীর মিল থাকে। বৎসরের নিয়মচালিত শান্তশিষ্ট দিনগুলি মাঝে মাঝে যেমন হঠাৎ কেমন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ক্ষেপিয়া ওঠে, তাহার সঙ্গে মানুষের মনও হটাৎ কেমন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ক্ষেপিয়া ওঠে। বাহিরের ঝড় থামিয়া গেলেই মনটাও কেমন শান্ত হইয়া থিতাইয়া পড়িতে চায়।

বাতাসের ধাক্কা থামিয়া গিয়া নদীর ঢেউ যত শান্ত হইয়া আসিতেছে, বাস্থর রক্তের ঢেউও তত শান্ত হইয়া আসিতেছে, মনটা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। শিথিল মনে আবার আসিয়া ভিড় করিতেছে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাওয়া জীবনটা, মনে পড়িয়া যাইতেছে ভুতুরদিয়ার সেই ছোট্ট বাড়িখানি—সেই পাটখড়ির বেড়া দেওয়া ছনের ঘরখানি, সে আবার পিছনে টানে। বাস্থ ছইর বাহিরে আসিল, মিনতির সুরে বলে, ময়নাল, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ফিরাও।

—খুন করব, তারপরে নদীতে ভাসাব—চেনস্? অসম্ভব ক্ষেপিয়া ওঠে ময়নাল, জলে আড় বাধাইয়া জোরে বৈঠা টান দেয় ময়নাল, ঝাকিয়া ওঠে নৌকাশুদ্ধ বাস্থর সকল শরীর।

ভয়ে জড়সড় হইয়া যায় বাস্থ, ভিতরে যায় না, দৃঢ়ভাবে ছই ধরিয়া বসিয়া থাকে।

—যাবি না ত আস্‌লি ক্যান্? আবার গর্জ্জিয়া ওঠে ময়নাল।

বাস্থর মুখে রা ফোটে না। তেমনিই ঠায় বসিয়া থাকে।

খুন চাপিয়া যায় ময়নালের মাথায়, কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ একটানে নৌকার মোর ফিরাইয়া দেয় ময়নাল, ফিরিয়া চলে ভুতুরদিয়ার মুখে, বাতাস আপনা হইতেই নৌকা ঠেলিয়া লইয়া চলে, তার সঙ্গে টান দেয় ময়নাল জোরে জোরে।

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে বাস্থ, মুখে কথা কোটে না।

খানিকদূর পিছাইয়া ডিঙিখানি কূলে ভিরাইয়া দেয় ময়নাল, কাদামাটির ভিতরে বৈঠাখানা গাড়িয়া শক্ত করিয়া নৌকা ধরিয়া বলে,—যা, ওঠ—যা এইবারে—

ভয়ে বাস্থ আরও আড়ষ্ট হইয়া যায়, নড়ে না।

খেপিয়া যায় ময়নাল, বলে, বৈঠা দিয়া দেব নাকি মাথায় এক বাড়ি?

বায়ু সত্যই ভয় পাইয়া যায়, পা বাড়াইয়া আগাছায় ভর করিয়া পাড়ে নামে।

একটানে বৈঠা তুলিয়া পাড়ে ধাক্কা দিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায় ময়নাল, দ্বিগুণ জোরে টান দেয় বৈঠায়—পিছনে ফেরে না একবারও—শুধু সামনে আগাইয়া যায়। পাড়ে জমাটবাঁধা অন্ধকারের ভিতরে মিলাইয়া যায় বায়ু।

জোরে জোরে জলে টান দেয়, আর দ্বিগুণ বল অনুভব করে ময়নাল তাহার দুই হাতে। জোরে ঠেলা দিতে গিয়া নৌকা হঠাৎ ঘুরিয়া গিয়া পাক খায়—ময়নালের রক্তে আসে দুর্নিবার আবর্ত্ত—শুধু সামনে টানে ডিঙি। ঐ ত আগে কালাবদর—তারপর ইলসা—তারপরে মেঘনা—জলের ঘূর্ণি মাতাল করিয়া তোলে ময়নালের দেহমন—ঘূর্ণি জাগে যাযাবরের চিরবহমান রক্তে,—পুরাণো এখানে আর নয়—অন্য জায়গায়—দূরে—অনেক দূরে—।

আর বায়ু?

সমাপ্ত

স্বর্গ হইতে অবতরণ

(বৈজ্ঞানিকী)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

হে মোর স্বর্গের প্রেয়সী,
সকল কামনা নিয়া সেথা
যবে গিয়া ধরিলাম আকুল আবেগে
তোমার ও স্নিগ্ধ বক্ষখানি মোহময়ী,
তব বিহ্বল পরশ সুখ
আত্মহারা ক'রে দিল দেহ-বল্লরীরে।
মনে পড়ে যেন সেই দিন
কণ্ঠে মোর রুদ্ধ হয়ে গেল বায়ু শ্বাস
আবেগের কলোচ্ছ্বাসে।
তারপর কী সে সঞ্জীবতা নব,
তুমি দিলে এঁকে তোমার ওষ্ঠের রক্তরেখা
আমার যুগল গণ্ডে।
নব রক্তধারা প্রবাহিত হ'ল শত উৎসে
শিরা হ'তে শিরাতে আমার।
সঞ্জীবিত হ'ল দেহযন্ত্র
নব-নব রসের প্লাবন-হিল্লোলে,
উৎসব উঠিল মনোবিশ্বে!
তারপর?—ভাবি আজ সে কি স্বপ্নকথা?

তারপর এনু যবে নেমে, মর্ত্তালোকে
সমতটে—আমার অঙ্গনভূমে,
এ কী অনুভূতি...যেন অভিনব!
শ্যামলা প্রেয়সী মোরে করে আলিঙ্গন;
...নাহি কোন ব্যতিক্রম, নাহি উত্তেজনা
তার এই সহজ চুম্বনে।
মিলাইয়া গেল ক্রমে আমার গণ্ডের রক্তিমতা,
নিঃশ্বাস বহিল অনায়াস, স্বচ্ছন্দ বিক্ষোভহীন
স্বাভাবিক যেন এ জীবন।

কেবা তুমি শিখরবাসিনী?
রূপ দিলে, বল দিলে, স্পর্দ্ধা দিলে লঙ্ঘিবারে গিরি
জাগালে বিস্ময় প্রাণে!
ওগো অতুলনা···কেবা ভাল তব তুলনায়!
ভাল নয় তবে এই শান্ত শ্যামলিনী সমতটে?
যাহার পরশখানি বাস্তবের দেয় পরিচয়—
ভরে' দেয় জীবনেরে তৃপ্তিময় সুখে-দুঃখে?

ব্যাপক বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রস্তাব

সন্তোষকুমার দে

ব্যবসায়ের পক্ষে বিজ্ঞাপন—যেমন ট্রেনের পক্ষে এঞ্জিন। নিজে জড় পদার্থ, তবু সে সচল হয়ে যোজন যোজন পথ ভ্রমণ করে, মণ মণ মাল বহন করে—প্রচার করে, প্রদক্ষিণ করে, পরিবেশন করে।

আর ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হলে নানা মাধ্যমের সহায়তা নিতে হয়। আমাদের দেশে ভাষার ভিন্নতায়, অক্ষরপরিচয়-দীনতায় সংবাদপত্রের বহুল ও ব্যাপক প্রচার অসম্ভব, তাই সংবাদপত্র মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপন অংশত কার্য্যকরী হলেও অন্যান্য মাধ্যমের বিষয়েও ব্যবসায়ীকে উদ্যোগী হতে হয়।

দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ও বহুজনদৃষ্ট উপায়—ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপন (Outdoor Advertising)। এক বোতলওয়ালা তার অফিস বাড়ীটাই বোতলের আকৃতি ক'রে তার ব্যবসায়ের চমৎকার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই ভাবটি অনুসরণ করেছিলেন ন্যাশনাল টোবাকো গত নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে তাদের ষ্টল সজ্জায়,—গোটা বাড়ীটার আকৃতিই করেছিলেন একটা বৃহদাকার সিগারেটের টিনের। চায়ের রেষ্টুরেন্টের

১নং চিত্র

সুমুখে বিরাট কেতলির নল থেকে সর্বদা ধোঁয়া উড়িয়ে গরম চায়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বিলাতের একটি দোকান। ফাউনটেনপেন মেরামতির দোকানের সুমুখে বৃহদাকার ফাউনটেনের ছড়াছড়ি এদেশেও দেখা যায়। ওই থেকে কমিয়ে সাধারণ ছোট দোকানের সুমুখের সাইনবোর্ডটি পর্যন্ত ঘরের বাইরের বিজ্ঞাপনের পর্যায়ে পড়ে।

কিছুদিন হল ন্যু-ইয়র্ক-এর একটি বড় দোকানের ছাদে ৬০ ফুট উঁচু ৬০ টন ওজনের এক বিশাল পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি বসানো হয়েছে—উদ্দেশ্য মেয়েদের পোষাকের

২নং চিত্র

বিজ্ঞাপন দেওয়া। মূর্তিটিকে নিওন আলোকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। নিওন আলোকে ইংলণ্ড আমেরিকায় বিজ্ঞাপনে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সে-দিক দিয়ে আমাদের দেশেও কিছু কিছু কাজ হ'য়েছে। অবশ্য তা কলকাতা-বোম্বাই-এর মতো বড় বড় সহরেই সীমাবদ্ধ। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় এই সব চটকদার ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপনের কথা নয়, কোটেশন-কণ্টকিত বিলাতি বিজ্ঞাপনের ফিরিস্তিও নয়। একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হ'তে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে ব্যাপক বিজ্ঞাপন—বিশেষ করে ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপন পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ছোটবড় সহর ও গ্রাম ঘুরে এসে আমরা যা দেখেছি জেনেছি,সেই কথারই আলোচনা করব।

বড় সহরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট সহরের জনবহুল স্থানে যদি ভালো চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকা বোর্ড বসানো যায়, তবে তার স্থানীয় প্রভাব খুবই কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা। যে খরচে যত লোকের কাছে এই পণ্য-বার্তা পৌছানো যায় তার হিসাব ক'স্‌লে সত্যই প্রীত হওয়ার কারণ আছে।

বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী কোন বোর্ড বা হোর্ডিং-এর কার্যকালীন খরচ ক'স্‌বার নিয়ম নিম্ন রূপ :

কতলোকে বোর্ডটি দেখে তার আনুমানিক হিসাব করা সম্ভব। ১৯৪৫ সালের ১৪ই হতে ২৮শে জুন নূতন হাওড়ার পুলের উপর দিয়ে রোজ কত লোক যাতায়াত করে তার হিসাব করা হ'য়েছিল, করেছিলেন

৩নং চিত্র

৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক। আমেরিকায় Trafic Audit Bureau (T. A. B.) হ'তে এই রকম হিসাব সব বড় সহর এবং দরকারি রাস্তাগুলির পর্যন্ত করা হয়। এ দেশে রেলকর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে মোট যাত্রীর সংখ্যা ঘোষণা করেন। ট্রাম ও বাসের টিকিট গণে যাত্রীর আনুমাণিক হিসাব পাওয়া যায়। যে পথে বোর্ডটি আছে, সে পথ দিয়ে যতলোক যায় তার হিসাব পাওয়া গেলে বোর্ডটি যদি একমুখী হয় তবে উক্ত হিসাবের অর্ধ পরিমাণ হবে। যদি বোর্ডটির ভাড়া মাসিক ৭৫৲ হয়, তবে দৈনিক হয় ২॥০, যদি বোর্ডটি ১০,০০০ লোকও

৪নং চিত্র

দৈনিক দেখে তবে প্রত্যহ ১০০০ লোককে বোর্ডটি দেখাতে খরচ মাত্র ।০ আনা!

বোর্ড বা হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপন নিয়ে আমাদের দেশে ৫- কিছু উদ্যোগ-আয়োজন হয়েছে, কিন্তু যতটা হওয়া দরকার তা হয় নি। এখনও এ ক্ষেত্রে প্রচুর প্রসারের

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

৫নং চিত্র

অবকাশ আছে। রেল ষ্টেশন, বাজার, কাছারি, ডাকঘর—সিনেমার কাছাকাছি বা বড় রাস্তার পাশে হোর্ডিং দিলে কার্যকরী হয়। এই সাথে কয়েকটি ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখানো হয়েছে। এতদ্বিষয়ক জটিল তত্ত্বমূলক আলোচনা না করে নমুনাগুলির পরিচয় দিয়ে আমাদের প্রস্তাবটির মধ্যে ফিরে যাবো।

৬নং চিত্র

১নং চিত্র—কোন বোর্ড-এর ছবি নয়। বোর্ড-এ আঁকবার আগে যে নক্সা (Design) আঁকা হয়, এটি তারই আলোকচিত্র। বোর্ড ভর্তি করে মূলের সমধর্মী

ছবি আঁকলে বোর্ডটিও-যে আকর্ষনীয় হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

২নং চিত্র—উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় সিনেমা "উত্তরা"-র নিকটবর্তী বোর্ড—'চিত্রা' প্রসাধনীর বিজ্ঞাপন। বোর্ডটি রাত্রে আলোকিত রাখা হয়।

৩নং চিত্র—কলকাতায় শ্যামবাজারের মোড়ের হোর্ডিং। লক্ষ্মীবিলাসের হোর্ডিং-এর পাশে একটা ফাঁকা হোর্ডিং এর কাঠামোটি লক্ষ্য করবার বিষয়। শ্যাম-বাজারের জনবহুল মোড়ে 'লক্ষ্মীবিলাস' ও 'সানলাইট' হোর্ডিং দুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪নং চিত্র—বোম্বাইএর একতলা ট্রামে টেনর সিগারেটের বিজ্ঞাপন।

৭নং চিত্র

৫নং চিত্র—ঢাকায় সরকারি প্রচার-বিভাগের হোর্ডিং। অবিভক্ত ব্যাংলার কুখ্যাত মন্বন্তরের (১৩৫০) সম-সাময়িক এই বিজ্ঞাপনটি এখনও চমৎকার মনে হয়।

৬নং চিত্র—জামসেদপুরের সাকচি বাজারের কাছে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের বিজ্ঞাপন। দোতালায় ছাদের পরে রক্ষিত—আর অনেকগুলি রাস্তার কাছাকাছি বলে বিজ্ঞাপনটি অনেক লোকের নজরে পড়ে। হোর্ডিংএর আকৃতি ২০ ফুট×১২ ফুট।

৭নং চিত্র—শিল্পী ধীরেন বল অঙ্কিত হিমকল্যাণের বিখ্যাত ছবির হোর্ডিং-আকৃতি ১৬ ফুট×১০ ফুট। স্থান রাজসাহী বাজার।

৮নং চিত্র—উপরোক্ত একই বোর্ড দিনাজপুরের একটি বড় তিন রাস্তার মোড়ে।

৯নং চিত্র—টেনর সিগারেটের বিজ্ঞাপন—স্থান জব্বলপুর, পাঁচ রাস্তার মোড়। আকৃতি ২৪ ফুট×১২ ফুট।

১০নং চিত্র—কলকাতার নিউমার্কেটের নিকট লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের একটি হোর্ডিং কার্লটন ষ্টেট ভার্জিনিয়া সিগারেটের বিজ্ঞাপন। এ বোর্ডটিতে তিনটি 'কাট আউট' (Cut out) মূর্তি আছে। এক, মহিলাটির আবক্ষ মূর্ত্তি। দুই, সিগারেটের প্যাকেটের বিরাট 'ডামি'। তিন, সিগারেটের টিনের বিরাট 'ডামি' (Dummy)। ছোট জিনিষের বিশাল আকারের 'ডামি' দেখলে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, বিষয়টি মনেও থাকে। এ বোর্ডটি রাত্রে আলোকিত করবার ব্যবস্থা আছে।

বোর্ড ও হোর্ডিংএ বিজ্ঞাপনের অনেকগুলি সুবিধা আছে। অক্ষরপরিচয়হীন লোককেও এ বিজ্ঞাপন তার

৮নং চিত্র

পণ্যবার্ত্তা বলতে থাকে। একই স্থানে অনুক্ষণ একই ভাবে উপস্থিত থাকার দরুণ বহুলোকের নজর আসে এবং দর্শকের অবচেতন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সব বিজ্ঞাপনের ভাষা অতি সরল, সহজ বোধ্য ও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করতে হয় যাতে একবার দৃষ্টি দেওয়া মাত্রই সবটা নজরে আসে ও অনায়াসে অবিলম্বে পড়ে ফেলা যায়। ফলে বর্ত্তমানের ব্যস্ত জীবনের পক্ষে এই মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপন অধিকতর কার্য্যকরী হওয়ার দাবী রাখে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, শিলং, পাণ্ডু, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে হোর্ডিং বিজ্ঞাপন জনপ্রিয় হয়েছে। শ্রীহট্ট শিলচর প্রভৃতি ছোট ছোট সহরেও বিজ্ঞাপনের বোর্ড আছে। দরকার—ভাল ভাল পল্লেও অধিকতর ব্যাপক আকারে বোর্ড ও হোর্ডিংএ বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা। এবিষয়ে দেশীয় বিজ্ঞাপন দাতাদের মধ্যে 'কুমারেশ' এবং

বিদেশীয়দের মধ্যে 'সানলাইট' 'লাক্স' প্রভৃতি সাবানের কথা উল্লেখযোগ্য। মফঃস্বল অঞ্চলেও তাদের অনেক বোর্ড আছে, 'এনামেল সাইন' আছে। অবশ্য সমগ্র দেশে সিগারেটের বোর্ডও কম নয়।

'কাট্ আউট ফিগার' দিয়ে বোর্ডের একটি নমুনা নিয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। ইন্দোরে একটি ওষুধের বিজ্ঞাপনের বোর্ডে দৈনিক তারিখ, মাস, দিন, বর্ষ লেখবার ব্যবস্থা করে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা দেখে এসেছি। অনুরূপ অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপন আর কোথাও নজরে

৯নং চিত্র

পড়ে নি। বোর্ডের সাথে ঘড়ির ব্যবস্থা বা ঘড়ির বোর্ড রাখা অবশ্য একটা খুব জনপ্রিয় পন্থা, অনেক যায়গাতেই আছে। কলকাতায় পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে অধুনালুপ্ত "Time for Wills Gold flake" নামক সচল ঘড়ি সহ 'নিওন' সজ্জিত হোর্ডিং-টির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বছর দশেক আগে এইরূপ একটি হোর্ডিং কর্ণওয়ালিস মার্কেটের ছাদের উপরে ছিল।

আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সব উজ্জ্বল ও মনোরম রং বেশীদিন টেকে না। তাই দেখা যায়—ডানলপ, ক্যালটেক্স, লাইফ বয়, সানলাইট প্রভৃতি কোম্পানী এনামেল বোর্ড দেন। এনামেল বোর্ড মফঃস্বলের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী। এতে প্রাথমিক খরচ কিছু বেশী হলেও দীর্ঘস্থায়ী বলে পুষিয়ে যায়।

বর্ত্তমানের মন্দাবাজারে বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়বরাদ্দ হ্রাসের চেষ্টা চলছে। এই সময়ে যাতে অল্প খরচেও বিজ্ঞাপনের প্রসার অব্যাহত রাখা যায়, তার জন্য ঘরের বাইরে বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা অনুধাবনযোগ্য। মফঃস্বলের ছোট বড় সহরের লোকসংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায়

১০নং চিত্র

বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশবিভাগজনিত স্থান পরিবর্ত্তনে নবদ্বীপের মত ছোট সহরেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। সমগ্র দেশের জন-সংখ্যার মধ্যেই একটা ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটেছে। অল্প অনুসন্ধানেই এই ওলট পালটের ধারা নির্ণয় করা যায়। যে যে স্থানে জনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইখানেই মুক্ত হয়েছে সহজ প্রচারের পথ। কেবল সংবাদপত্র বা সিনেমা স্লাইডের উপর নির্ভর না করে বোর্ড ও হোর্ডিং-এর সহায়তা গ্রহণ করবার সময়ও সমুপস্থিত। তার জন্য উদ্যোগী অভিজ্ঞ প্রচার-ব্যবসায়ীদেরও এদিকে অগ্রসর হওয়া দরকার।

গুপ্ত পত্রাবলী

দুইটী প্রাণীর গোপনীয় পত্রাবলী। ৫০খানি পত্রে প্রেম ও প্রণয়ের দুর্লভ সংগ্রহ। অল্প কয়েকখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আজই অর্ডার দিন, মূল্য ২৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। **প্রেম চক্কর, অমৃতসর।**

শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়'

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

আসল কথা এই যে, যৌবনঘন আর রূপে অতুল দেহের আবেদন ব্যর্থ, এবং দানোন্মুখতা প্রত্যাখ্যান হইতেছে বলিয়াই জ্বরের সময় ডাকা হয় নাই এই ছুতায় সারদার এই কল্যাণী মূর্ত্তি ধারণ এবং ক্রোধের প্রকাশ। আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন অবিলম্বেই পাইব। আচরণ ঘৃণামূলক মনে হইলে তাহা সহ্য করা নিশ্চয়ই কঠিন।

সমুদয় ভদ্র-ঘরের তুচ্ছ মেয়েদের তুলনায় সে-ই যে উৎকৃষ্টতম সারদা অবাধ কণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিল, রাখাল তা' শুনিল; এবং "জগতে অন্য মেয়েও আছে," সারদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে এই বার্ত্তা জানাইবার পর সে "হাসিয়া ফেলিল; জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার হলো কি বলো ত?

—সত্যিই আজ আমার ভারী রাগ হয়েছে।

—কেন?

—কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন।

—দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য মেয়ে নেই—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

—তোমার স্বামী বলতেন কি—যখন ফিরে এসে শুনতেন এ-কথা?

—ফিরে তিনি আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি। আপনি বলবেন, তুমি জানলে কি কোরে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না তো সংসারে জানবে কে?—এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ-ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ-বাড়ীতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন! এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন—যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?"

"নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে" যখন "শুধু সে আর অন্যজন" তখন সারদার মুখে রাখাল ঐ কথা শুনিল। শুনিয়া রাখালের মনে হইল, "এ কি তামাসা"।

তামাসা মানে ক্রীড়া, খেলা, বাজি, কৌতুক, মজা, রহস্য, পরিহাস। কিন্তু অভিধানের অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া 'তামাসা' করিতে সারদার কি দায় পড়িয়াছে!

সারদা যে তার দেহ-পসরাই রাখালের হৃদয়পুটে স্থাপন করিতে চায়, এবং তাহাই তার এখনকারও অন্তরের তৃষ্ণাখিন্ন গভীরতম কথা তাহা রাখাল হৃদয়ঙ্গম করিল।

সারদা সদম্ভে বলিয়াছিল,—"যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে জাতের নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।" সেই অন্য মেয়ে কেমন তাহাও রাখাল উপলব্ধি করিল...

—"এমন কথা কোনো মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে-লজ্জা বাড়িবে বই কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোন মতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল,—একলা পেয়ে আমাকে ত' অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত' দরকার হতো না। কিন্তু আজ এলে তাঁকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে-সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো, সে কত যে সয়েছে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান্; যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে-সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ-সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার পরে আর কারো দাবী নেই।"

অর্থাৎ রাখালকে সে জানাইতে চায়, তার দেহ গ্রহণ করিলে বিনানুমতিতে পরস্বগ্রহণের অপরাধ রাখালের হইবে না, এবং তারও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে না।

কিন্তু "রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।"

এই বৈঠকেই কথাবার্ত্তা চলিতে চলিতে রাখাল অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে একটা কথা বলিয়া ফেলিল তাহা বৃহত্তর অক্ষরে লিখিয়া রাখার মতো। জীবন চক্রবর্ত্তী সারদার স্বামী নয়, উপপতি, এবং সে বিধবা, এই কথা শুনিয়া তার প্রতি ঘৃণা জন্মিল কি না জানিতে চাওয়ায় "রাখাল কহিল, না, সারদা, আমি অত অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধ করেছিলেন

নতুন-মা; আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি"...(১১০ পৃষ্ঠা)।—বলিয়াই রাখাল অপ্রতিভের মতো অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে দাঁতে জিব কাটিল।

... "সারদা বলিল, যত টাকারই দরকার হোক্ আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা' পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নিচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে তো ভিক্ষা নেওয়া।

সারদাও হাসিল; বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা' জানবে না—মুখ দিয়ে লোকে বলে না— আমার লজ্জা কিসের?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধিল—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল"—অর্থাৎ "নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তর" সুযোগ দিল, কিন্তু রাখাল কাপুরুষ বলিয়া তাহা প্রয়োজনে লাগিয়া কৃতার্থ হইল না—ভুজযুগে বাঁধিয়া "শাস্তি" দিতে রাখাল পারিল না।

"ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

—মা'র আহ্নিক কি শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ, হয়েছে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে?

রাখাল কহিল, তুমি যাও, আমি পরে যাবো।

—পরে কেন? চলুন না দু'জনে একসঙ্গে যাই বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

"নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অক্তজন" ইহাই আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতাম, এবং তাহাই লইয়া মাথা ঘামাইয়াছি; কিন্তু সারদা চলিয়া যাইবার সময় জানিলাম দুয়ার বন্ধ করা ছিল। রাখালকে ঘরে বসাইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়াছিল সারদা নিশ্চয়ই।

সারদা "দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান" করিবার পর "রাখাল চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। মনে হইল, ঘরখানি যেন স্নেহে মাধুর্য্যে নিবিড় হইয়া উঠিল, সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে—কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহে-মনে আজ এ কিসের আকুলতা. কিসের স্পন্দন!— * — * — * এই একটি মাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে বিস্ময় আজ মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রেমের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে-অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়-গানের অন্ত নাই, এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন্ বৃহত্তরের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক প্রলেপে সে মলিন"।

রাখাল আমাদের প্রচুর অভিনন্দন লাভ করিল। "নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে"—বন্ধদুয়ার কক্ষে রাখালকে আর কিছু করিতে হইত না, নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া দিলেই যৌবন-ভারে আর রূপৈশ্বর্য্যে অনুপমা কে-নারী "আপনি কাছে আসিয়া" দাঁড়াইয়াছে সে দুই বাহু দ'রা তার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত; কিন্তু রাখাল হাত বাড়াইল না, কারণ "সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক প্রলেপে সে মলিন।"

বিমলবাবু কিন্তু তা' কিছুই মনে করেন নাই—তাঁর চোখে দেখা দিয়াছিল "আর্ত্তের মিনতি"।

রাখালের এই পরম নির্ব্বুদ্ধিতা আর নির্লোভিতা দেখিয়া পাঠক যেমন হতবুদ্ধি হইয়া আর যেন নিজের ইচ্ছারই প্রতিবাদে হায় হায় করিতে থাকিবে, সারদা নিজেও কাজে কথায় কতকটা যেন তাহাই প্রতিফলিত করিল...

সে নাছোড়বান্দা—একদিন সে "ভারি অনুরোধ করিয়া বলিল, "আমার বড় ইচ্ছে, আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেবতা?

—খাবো বই কি। যেদিন বলবে।

—তবে পরশু। এমনি সময়ে চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন; চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপ চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত' খাওয়ার মধ্যে নেই দেবতা, দোষ আছে চুপি চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর-কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনে।

—সত্যি পারো না, না, বলতে হয় তাই বলছো?

—অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবো না। বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা (?) শিহরিয়া উঠিল, বলিল বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল"।

অত্যন্ত পছন্দসই উপভোগ্য আবহাওয়ার অভ্যন্তরে পাঠককে আনয়ন করা হইল। রূপ-যৌবনসম্পন্না নারী যুবককে চুপি চুপি তার ঘরে আসিতে বলিতেছে, আর স্বীকার করিতেছে "দোষ আছে চুপি চুপি খাওয়ানোর মধ্যে"। কি জন্ত তা' দোষের তা; নাবালকেও বুঝিতে পারে—দোষের কারণ, খাওয়ানো ছাড়াও যৌবনসুলভ আর-কি ঘটিতে পারে তাহারই অর্থাৎ মূলসম্বন্ধের সম্ভবপরতা। "নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তর" কাজ করিয়াছে মাত্র মনোরম পৃষ্ঠপটের—মনকে বাধাবন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারী করিয়া আনিবার পক্ষে সুবিধাজনক; কিন্তু আমন্ত্রণপূর্ব্বক ঘরে ঢুকাইয়া চুপি চুপি খাওয়ানোর মধ্যে আছে অধিকতর তেজস্কর আবেদন ও উপাদান, কারণ, তাহা দোষাবহ বলিয়া স্বীকার করাই হইয়াছে—মেয়েটি করিয়াছে, যেন চরম আর চূড়ান্ত একটা ঘটনার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিতেই পুরুষটিকে বলা হইয়াছে। ফলে আমাদের, অর্থাৎ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের, অন্তরাত্মা উহাদের মিলনের গতি-প্রকৃতিও ফলাফলের একটা সুচারু কল্পনা লইয়া ভারি রোমহর্ষক উৎকণ্ঠার আনন্দ লাভ করিতেছে...

'পরশু' তারিখে রাখাল আসিয়াছে। আহারের আয়োজন মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই দেখিয়া সে বড় সন্তোষ প্রকাশ করিল; তারপর গল্প করিতে করিতে জীবন চক্রবর্ত্তীর কথাটা উঠিয়া পড়িল। রাখাল বলিল,—

..."ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলে না"?

মানুষকে দুর্নিরীক্ষ্য উচ্চ স্থানে ঠেলিয়া তুলিয়া দিবার ঐ একটা কৌশল শরৎচন্দ্রের আছে। সবিতাকেও কেহ প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই—এই আপশোসে রাখাল, ব্রজবাবু, এবং বিমলবাবু প্রভৃতি হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ সারা হইয়া যাইতেছেন, সবিতারও বিশ্বাস, সারদাকেও কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু যে প্রকৃষ্ট চেনাচিনির আর সারবত্তা উপলব্ধির ফলে মানুষ পরস্পরের অত্যাজ্য আর নমস্ত হইয়া ওঠে সারদাতে রাখাল আজই তাহা কি দেখিয়াছে? সারদা মন-মজানো কথা বলিয়াছে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে; প্রকারান্তরে, অর্থাৎ লীলাচ্ছলে, নিজের দেহটাকে অর্ঘ্যের মতো অর্পণ করতে চাহিয়াছে; জ্বরের সময় খবর দেওয়া হয় নাই বলিয়া "নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে", রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে, ভারি অনুযোগ করিয়াছে, আর, এখন চুপি চুপি খাওয়াইতেছে। জীবনের সম্বন্ধেও যদি সারদা এই রকমই আদর-আপ্যায়ন প্রীতি আর দরদের কাজগুলি করিয়া থাকে তবে সেটা এমন কি দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল যে, জীবন চক্রবর্ত্তী বুঝিতেই পারে নাই—তার বুদ্ধিতেই কুলোয় নাই। সেবা-যত্ন দরদের মর্ম্ম পশুতেও বোঝে, অন্তরের মাধুর্য্য পাগলেও অনুভব করে—ব্যারিষ্টারী বুদ্ধির দরকার তাহাতে হয় না।

জীবনকে নির্ব্বোধ না ঠাওরাইয়া রাখালের চিন্তা করা উচিত ছিল, জীবন চক্রবর্ত্তীকে সারদা কি উপায়ে আপন করিয়া লইয়াছিল। তার ভালবাসায় যৌন-আকুলতার সঙ্গে ব্যবসাদারি ছিল কি না। তার বেলাতেও সারদা সেই উপায়েরই পুনরাবৃত্তি, এবং সেই পদ্ধতিরই পুনরভিনয় করিতেছে কি না। তাহা না করিয়া সে করিল উল্টা বিচার—জীবন চক্রবর্ত্তীকে ক্ষুদ্রতায় পূর্ণ করিয়া দিয়া অপার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিল সারদাকে। ভোজনানন্দই সকল আনন্দের বড় আনন্দ—অনেক কিছুই ভুলাইয়া দেয়। জীবনের জীবন কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল পয়সার অভাবে—পয়সা উপার্জ্জনের ভার সারদা লইতে পারে—সে-অনুমান সে করিতে পারে নাই।

সারদা কিন্তু এই অবসরে রাখালকেও একটু খোঁচা দিল—

বলিল; "না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেবতা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে কেউ চিনতেই পারে না।"

এখানে আমাদের মনে পড়িয়া গেল, ৩৮৪ পৃষ্ঠায় সারদা সবিতাকে বলিতেছে: "আমি বিধবা হয়েছিলাম মা এগারো বছর বয়সে।" তখনই স্বামী তাহাকে চিনিতে পারে নাই বলিয়া সারদার বুকে নিঃশ্বাস জমিয়া আছে দেখিতেছি।

এই সূত্রেই রাখালেরও অবাক্ হওয়ার একটা কারণ ঘটিল—সে সারদাকে চিনিতে পারে নাই কি রকম? সে সারদাকে

চিনিতে পারিয়াছে বলিয়াই ত' ধরিতে পারিয়াছে যে, জীবন চক্রবর্ত্তী সারদাকে চিনিতে পারে নাই। রাখাল প্রতিবাদ করিলেই সারদাকে নিরুত্তর থাকিতে হইত। কিন্তু রাখাল প্রতিবাদ করিল না, কারণ, মনের অগোচর পাপ নাই, অর্থাৎ সারদাকে চিনিতে পারিয়াও সে সাড়া দেয় নাই। রাখাল সারদাকে চিনিতে পারে নাই, অর্থাৎ সারদার অনুযোগ সত্য, কেবল এই হিসাবে যে, তাহার দেহ গ্রহণ করিলে এবং পুনর্জ্জন্ম-দাতা হিসাবে অধিকার করিয়া থাকিলে রাখালের ঠকা হইত না।—চিনিতে না-পারার অভিযোগের মূলে আছে ঐ বক্র স্থূল কথাটা—তাই গায়ের জ্বালায় রাখালকে সে একবার বলিতেছে নির্ব্বোধ, একবার বলিতেছে "ভীতু"।

নিজের যৌবন আর সৌন্দর্য্যের দিকে একটি চক্ষু মেলিয়া এবং রাখালের দিকে অন্য চক্ষুর দৃষ্টি হানিয়া হানিয়া সারদা বোধ হয় হতাশ হইয়া গিয়াছিল, তাই তার বিবাহের কথাটা তুলিল; এবং রাখাল দারিদ্র্যের ওজরে বিবাহ করিতে চাহে না দেখিয়া, নিজে পরীক্ষা করিয়া যে মর্ম্মান্তিক সত্যটা সে উপলব্ধি করিয়াছে তাহাই সে বলিল—বলিল, "আসলে আপনি ভীতু লোক—কিচ্ছু সাহস নেই।"

রাখালের সাহস নাই এবং সেই কারণে সারদার কষ্ট কত তাহা সারদা রাখালকে বুঝিতে দিল—

"খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল—ও-কি?

সারদা সলজ্জে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কিছু না তো!"

অনেকক্ষণ হইল এই রাত্রিবেলায় রাখাল চুপি চুপি আসিয়া ঘরে বসিয়া আছে; তাহাকে নোটিশ দেওয়া আছে, এই চুপি চুপি খাওয়ানো দোষের; তথাচ রাখালের চোখে না আছে "আর্ত্তের মিনতি", না আছে প্রজ্বলিত লুব্ধতা—

"ঘন নিঃশ্বাস" পড়িবে বই কি; এবং ধরা দিতে চাহিয়া ধরা পড়িলে "সলজ্জ মৃদু হাসিয়া" সে বলিবে বই কি: "কিছু না তো!"

ঈর্ষ্যার উদ্রেক করা প্রেমতন্ত্রের মস্ত একটা আর্টসম্মত অঙ্গ। সারদা তা' জানে—রাখালকে শুনাইয়া তারকের সে প্রশংসা করিল খুব; বলিল,—"বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেবতা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়; যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর। বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারী বোঝা; যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেন না দেবতা।

রাখাল স্বীকার করিল: না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্ব্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেননি। তারকবাবু বলছিলেন চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।" (২০৫ পৃঃ)

ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাইব, রাখালের পাষাণত্বে ২২৩ পৃষ্ঠায় স্বয়ং লেখকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে।

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধুলো ত পড়লো, এবার উঠি?

এতই তাড়া? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না?

সে দুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা। তুমি বলবে, দেবতা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেছেন; কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকি বাড়ীভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারবো না। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্ব্বে আরো একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চটপট করো, আমার বেশী সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারি মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরণো হয় না—ঠিক না দেবতা?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শোনায়, আমি অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে?

হাঁ।

তারপর খেয়ে শুতে হবে ?

হাঁ।

তারপর চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পরে সারারাত ছটফট করতে হবে—না, দেবতা ?

এ তোমাকে কে বললে ?

ইঙ্গিতের এই অপমান সত্যই বিশ্রী লাগে। অতএব সারদা বড়াই করিয়া বলিল,—"কে বললে জানেন ? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই—সেই।

রাখাল বলিল, তা' হলে সে-সারদাও তাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোনো অপরাধ করিনে যে-দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছট্ফট্ করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমুই। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

এই রূপ-যৌবনসমন্বিত অনবদ্য দেহের কথা ভাবিয়া, এবং সেই দেহ পাশে থাকিলে এই নিশীথশয্যা কত উপভোগ্য আনন্দের হইত তাহা কল্পনা করিয়া এবং উত্তাপ সৃষ্টি হইয়া রাখালের ঘুমের ব্যাঘাত হয় না—ইহাও সারদাকে শুনিতে হইল।

সারদা কহিল, "বেশ, আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো; কিন্তু আমিই বা কোন্ অপরাধ করেছি যার জন্যে ঘুমুতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই ?"

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না ?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

এই পরমাশ্চর্য্যজনক কথাটা রাখাল অবাধে বলিয়া ফেলিল—একেবারে চোখ বুজিয়া সে সারদাকে অসংখ্য নরনারীপূর্ণ পৃথিবীর ভিতর চালিয়া দিয়া মিশাইয়া দিল। অথচ তার স্বাতন্ত্র্যের আর অনন্যসুলভ মাধুর্য্যের নিভৃত যোগ্যতার কত তারিফ সে করিয়াছে তার ইয়ত্তাই নাই।

—"সময় নেই—না ? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—আচ্ছা দেবতা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন ? কেন বলচেন না, সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয়, তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত" ?

আমল পাইতেছে না বুঝিয়াও সারদা রাখালের ভয় ভাঙিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

"ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেছো যাবে; খামোকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্যে ?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই তো সব চেয়ে বড় কারণ দেবতা।

—না, কোন একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক্ খেয়াল, সে-ই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা, হরিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল,—না, অন্যায় অধিকার আমি কারো 'পরেই খাটাই নে।

—রাগ করে বলছেন না,ত ?

—না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়, কোনমতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেবতা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, আমার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেবতা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবো না। সে-অধিকার আমার নেই"।

সারদার এবার ক্রোধ জন্মিল—কত সয় আর!—বলিল,—"ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে-মেনে আজ হুকুম করবার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের 'পরে। যে-লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষিণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন"।

সবিস্তার সঙ্গে সারদার হরিণপুরে যাওয়ার ব্যাপারে অন্যের আয়োজনে ও ইচ্ছায় অনাবশ্যকভাবে বাধা দিতে রাখাল অস্বীকার করিতেছে কেবল এই কারণে যে, তার অধিকার নেই। অধিকার হয় তো আছে, যখন সারদা নিজেই বলিতেছে, বারণ করিবার অধিকার তার আছে। কিন্তু রাখালের জিদ্, সে-অধিকার সে খাটাইবে না—তাহা হইবে খেয়ালের হুকুম চালানো। ইহা তার একগুঁয়েমি কিম্বা অবুঝপনা কিম্বা বোকামি হইতে পারে; কিন্তু ভয়ের লক্ষণ ত' সে এখানে দেখায় নাই! সে ভয় পাইয়াছে

আহ্বান সত্ত্বেও সারদার অঙ্গস্পর্শ করিতে। তবের উক্তখে এই গঞ্জনা কি সেই কারণে।

বেআইনী; অধিকার-জাহির শাস্ত্র, সমাজ এবং আইনও অনুমোদন করে না ইহা রাখাল বলিল না; দাবী করিতেও তার ভয় নাই যদি দাবী করিবার ন্যায্য কারণ থাকে, ইহাও সে বলিল না; বলিল,—"এ তুমি কাকে বলচো? আমাকে"?

—হাঁ, আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয় ত এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল,—স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছা করে না?

—জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয় ত কিছুই হবে না। হয় ত আমারও সময় এসেছে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেবতা, অকারণে নির্মম হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়"।

* * * সারদার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ রাগারাগি করিয়া রাখাল উঠিল; এবং তার বড় অনুতাপ জন্মিল ফিরিবার সময় পথেই—তার মনে হইতে লাগিল, "সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী; সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না"। * * সারদা তাহাকে যাহা জানাইয়াছে, "হয় ত সে ভালবাসা"; কিন্তু "রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল। বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে সে আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই ত' কাঙাল-বৃত্তি নিতে পারি নে। অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে' মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ যে অসম্ভব।

সারদার আত্মদানের এত দীর্ঘ এবং প্রচুর এবং স্থানে স্থানে নির্লজ্জ প্রয়াসের পর রাখালের মন সংশয়ে দুলিয়া উঠিল—"হয় তো সে ভালবাসা"। রাখালকে যত "মূঢ়" মনে করা হইয়াছিল তত মূঢ় সে নয়—সে চরিত্রবান্। বিমলবাবুর মতো সে উচ্ছিষ্টলোলুপ নয়।

কিন্তু সে অবিচার আর অত্যুক্তিও করিয়া বসিল এই সারদাকেই একটা স্থানে অযৌক্তিক প্রাধান্য দিয়া। রাখালের মনে হইল, "যে-মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে"?

যে-পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে রাখাল অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছে সে-পরিবেষ্টনীর ভিতর সারদাকে সে পায় নাই—ও-দুটোতে মোটেই মিল নাই। সারদার সেই দলে মিশিবার সুযোগ যদি থাকিত তবে সে সেই রকমেরই একজন হইয়া উঠিত কি না বলা যায় না। কেমনধারা বেচালের জন্য সে-মেয়েদের কত খারাপ বলিয়া রাখাল বুঝিয়াছে তাহা ঠিক পরিষ্কার নয়। ভাগ্যের যে-বিপর্য্যয়ের জন্য বা নিজের যে কর্ম্মের ফলে সারদাকে কাঙালিনী সাজিতে হইয়াছে, আর, পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, সেই অন্যান্য মেয়েরা স্বপ্নেও তার আভাস কোনোদিন পায় নাই; আর, সেই মেয়েদের কেহ তাহার গুণে মুগ্ধ হওয়ার পর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আসিলে কিরূপ আচরণ করিত তাহাই বা কে জানে। সারদা এমন কি অতুলনীয় আর অপরের অসাধ্য কাজ অনায়াসে সমাধা করিয়াছে? মৃত্যুর হাত হইতে তাহাকে যে ত্রাণ করিয়াছে সেই ত্রাণকর্ত্তার প্রতি অত্যন্ত চিত্তহারী ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে; সুমধুর স্তুতিবাক্যে তাহার মনোরঞ্জন করিতে চাহিয়াছে; বহুভক্তি পূর্ব্বক রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়াইয়াছে; অনেক মনের কথা বলিয়াছে; রাখালের সঙ্গে সমস্বরে সবিতাকে 'মা' 'মা' করিয়াছে। উহা এমনই কি পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের মতো কঠিন কাজ যে আর কোনো মেয়ের দ্বারা তা' সাধিত হওয়া সম্ভব নয়—অথবা যার দ্বারা তা' সম্ভব সে স্পর্শমণির মতো এমন দুর্লভ যে নাই বলিলেও চলে।

তারপর "অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা"—উহাও "কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে"?

কোনো ব্যাপক সুমহান্ মঙ্গলের জন্য অপরিসীম ত্যাগস্বীকারে কি তপস্বিনীর মতো কোনো কষ্টসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ সারদা করে নাই—আপনার চরিত্রবলে এবং সংকল্পের দৃঢ়তায় জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও সে আসে নাই। তার অভিজ্ঞতা আর কষ্ট কেবল ইহাই যে, সে ১১ বছরে

বিধবা হইবার পূর্ব্বে স্বামী তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এবং উপপতি জীবন তাহাকে চিনিতে না পারিয়া ফেলিয়া পালাইয়াছে। যা' সে করিয়াছে তাহা আগেই বলিয়াছি। কৃতজ্ঞতা নিবেদন-পূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের অকপট সেবা করা, আর, সেই পথে আরো অগ্রসর হইয়া দেহ-প্রাণ সেই ব্যক্তিবিশেষকে সমর্পণ করিতে চাওয়া কি নারীত্বের এমনই মহিমা যে, দুনিয়ায় অমনটি আর নাই মনে করিয়া তাহারই বাহাদুরির স্তব গাহিতে গাহিতে মানুষের দম ফুরাইয়া যাইবে।

বিমলবাবুকে আর একবার স্মরণ না করিয়া পারা গেল না। হঠাৎ আবির্ভাবের পর তিনি অতি উচ্চ একটি আসন অধিকার করিয়া বসিয়া গেছেন; সিঙ্গাপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তাঁর মনে নাই; এবং সবিতা, রাখাল, সারদা, তারক, ব্রজবাবু, রেণু প্রভৃতিকে লইয়া একটি পারিবারিক আসর বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন; এবং এ-বয়সে বিবাহ না করিয়াও তিনি বিবাহ-সংস্কারের যে-ব্যাখ্যা সুরঞ্জিত করিয়া ব্রজবাবুকে শুনাইয়াছেন তাহা যে-কোনো বিবাহার্থী ব্যক্তিকে সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ করিয়া দিবে।

"ব্রজবাবু বৈকালে উত্তরদিকের বারান্দায় একখানি ডেক্-চেয়ারে শুইয়াছিলেন। পাশের চৌকিতে বিমলবাবু খবরের কাগজ হাতে বসিয়া। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল জগৎব্যাপী ট্রেড্ ডিপ্রেশন বা ব্যবসায়ের দুরবস্থা লইয়া"।

"ব্যবসায়ের দুরবস্থা লইয়া" কথা হইতে হইতে জগৎব্যাপী দুরবস্থা হইতে অন্তরব্যাপী দুরবস্থার কথা আসিয়া পড়িল।

ব্রজবাবুর ভাবটা খুব উদাস—

"দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন; আমার সমস্ত কাহিনী একদিন বলবো আপনাকে। আপনি অন্যের মুখে কতদূর কি শুনেছেন তা' জানিনে; তবে আমার মুখে সেদিন যেটুকু শুনেছিলেন তা' কিন্তু সমস্ত নয়। নিজের কথা বল্‌বার আগে আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—বলুন, কি জানতে চান্?

—আপনার যা আর্থিক অবস্থা, তা'তে আপনাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র বলা চলে। আপনি সবল, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ; ভাগ্যদেবী সকল দিক্ দিয়েই আপনার প্রতি প্রসন্না; অথচ এত বয়স পর্য্যন্ত সংসারে প্রবেশ করেন নি, এ-র যথার্থ কারণটা জান্‌তে পারি কি? অবশ্য বল্‌তে আপনার যদি বাধা না থাকে"।

বিমলবাবু এখানে অবাধে সত্য গোপন করিলেন—

বলিলেন, "বল্‌তে কিছুমাত্র বাধা নেই। কারণটা নেহাৎ সোজা। প্রথমতঃ সময় ও সুযোগের অভাব; দ্বিতীয়তঃ, বিবাহে অনিচ্ছা।

—প্রথমটা হয় তো একদিন সত্য ছিল, কিন্তু আজ তো আর তা' নয়। তখন ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টায় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সংসার পাতার ভাবনা ভাববার অবকাশ ছিল না। কিন্তু তার পরে—

—বল্লুম তো এইমাত্র, রুচি হয় নি।

—রুচি অরুচির কথা উঠ্‌লে আর কোনো প্রশ্নই চলে না, বিমলবাবু। তবু আমার আর একটি জিজ্ঞাসার জবাব দিন্। এখন কি সংসারী হবার কোনও বাধা আছে আপনার?

ব্রজবাবুর প্রশ্নে বিমলবাবু বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন যতখানি, তারও বেশী করিতেছিলেন কৌতুকবোধ। চাপা হাসিতে তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন, বাধা কোনোদিনই ছিল না ব্রজবাবু, আজও নেই। হয় তো বা আমার বিবাহের পথ এত অবাধ বলেই স্বয়ং প্রজাপতি পথ আগ্‌লে বসে রইলেন। নববধূর আর শুভাগমন হোলো না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আপনার কথা ঠিক্ বুঝতে পারলাম না।

—দেখুন, আমাদের দেশে একটা মেয়েলী প্রবাদ হয় তো শুনেছেন:

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর।
অতিবড় সুন্দরী না পায় বর॥

আমারও হয়েচে তাই। বিবাহের পাত্র হিসাবে নাকি আমি সকল দিক্ দিয়েই উপযুক্ত, এ-কথা অনেকেই বলেছেন, অন্ততঃ ঘটক-সম্প্রদায় ত' বলেনই। তবুও যার সারা যৌবনে বিয়ের ফুল ফুটলো না, সেস্থলে প্রজাপতির বাধা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন?

—কিন্তু এতদিন ফোটে নি বলেই যে কোনও দিনই ফুটবে না—এ-ও তো নয়।

—সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে দাদা। অকালে কি আর ফুল ফোটে? জোর করলে তার বিকৃতি ঘটানো হয় মাত্র। বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা মরসুমী ফুলের মতো। ঠিক নিজের ঋতুতে আপনি ফোটে। মরশুম চলে গেলে আর ফোটে না, তখন সে দুর্লভ।

ব্রজবাবু একটু চিন্তা করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ভাল মালী চেষ্টা করলে অসময়েও ফুল ফোটাতে পারে। কিন্তু সে-কথা

থাক্, বিবাহটা যে ঠিক্ মরশুমী ফুল, আমি মানতে পারলাম না। বিয়ের ফুল ফোটে বলে একটা কথা এদেশে আছে; কিন্তু কোনো দেশেই ওটা যে ফুলের চাষের নিয়ম মেনে চলে এমন-প্রমাণ বোধ হয় নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, না না, তা' নয়। আমি বলতে চাইছি, জীবনে বিবাহের একটা শুভ লগ্ন আছে। সে-লগ্নটি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আর বিবাহ হয় না। যাঁরা তারপরেও বিবাহ করেন, সে ঠিক বিবাহ নয়।

সেটা তা'হলে কি?

সেটা শুধু স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসবাস মাত্র। কোনও ক্ষেত্রে বংশরক্ষার প্রয়োজনে, কিংবা সুখ সুবিধা ও আরামের প্রয়োজনে, কোনও ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হৃদয়মনের বিলাসিতা চরিতার্থের জন্য।

বিস্মিত কৌতূহলে ব্রজবাবু প্রশ্ন করিলেন,—ঐ সকল বাদ দিয়ে বিবাহকে আর অন্য কি বস্তু বলতে চান আপনি?

সেটা ঠিক্ বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। সংসারে দেখা যায় সমাজ-অনুমোদিত পুরুষ ও নারীর মিলনকে বিবাহ বলা হয় কিন্তু আমি তা' মনে করি না। মানুষের জীবনে এমন একটি বসন্ত-ঋতু আসে, এমন একটা আনন্দকাল আসে, যে পরমক্ষণে নর-নারীর ঈপ্সিত মিলন দেহে মনে অপূর্ব্ব রসে ও রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। দুটি প্রাণের, দুটি দেহ-মনের সেই যে রসমধুর বর্ণরাগ, তাকেই বলি, বিবাহ। সূর্য্যাস্তের পরমুহূর্ত্তেই, যখন সন্ধ্যা নয় অথচ দিন অবসান হয়েছে, সেই সুন্দর সান্ধ্যলগ্ন সে-টুকুর আয়ু অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। তাকে আমরা গোধূলি-ক্ষণ বলি। সেই রমণীয় সময়টুকুর মধ্যে পশ্চিমের আকাশে জেগে ওঠে অপরূপ আলোর লীলা আর অফুরন্ত রঙের বৈচিত্র্য—, যা' সমস্ত দিবারাত্রির দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনক্রমে কোনো মুহূর্ত্তেই ধরা যায় না। সে ঐ বিশেষ ক্ষণটুকুর সামগ্রী। মানুষের জীবনে বিবাহও ঠিক তাই।

বস্, ইহাতেই আমাদের হইবে—জানিয়া বাধিত হইলাম যে, বিবাহ বিশেষ একটা ক্ষণের সামগ্রী—"কল্পনার কাব্যের পাতায়" বিবাহের সমুদয় রহস্য লেখা পড়িয়া গেল।

কিন্তু ব্রজবাবুকে এত না বকাইয়া এবং নিজেও এত না বকিয়া বিবাহের কথার সূত্রপাতেই, ব্রজবাবুর বিবাহ না করার কারণটা জানিতে চাওয়ার উত্তরে, বিমলবাবু বলিতে পারিতেন, "কারণটা নেহাৎ সোজা। প্রথমতঃ, সময় ও সুযোগের অভাব; দ্বিতীয়তঃ, বিবাহে অনিচ্ছা"—তৃতীয়তঃ, বিবাহে অনিচ্ছার কারণ: When milk is cheap in the market what is the necessity of buying a cow?" অর্থাৎ বাজে ওজর না দেখাইয়া সত্য কারণটাই বলিলে ত' চমৎকার স্বচ্ছন্দতার সহিত অতি সহজে ব্যাপার চুকিয়া যাইত। বিমলবাবু বলিতে পারিতেন, যেমন সবিতার কাছে বলিয়াছিলেন (১৭৮ পৃঃ), আমি নিষ্কলঙ্ক নই, মেজকর্ত্তা। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি আনিয়েছিলাম। সেদিন ঐশ্বর্য্যের জোরে ওদের ছোট করিয়া আনিয়াছিলাম। "তারা আর নেই—কোথায় কে যে ভেসে গেল আজ খবরও রাখিনে।" একজন, সবিতারই মতো, গৃহ ছাড়িয়া কাছে আসিয়াছিল—কিন্তু খেলা ভাঙিল—তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। ঐ জন্যই "সারা যৌবনে বিয়ের ফুল" ফোটে নাই।

রেণুর জন্য মনোনীত পাত্র কল্যাণীয় বিমলবাবুর মুখে ঐ কথা শুনিলে ব্রজবাবুর অন্তরস্থ আশা কাঁপিতে কাঁপিতে অন্তরাত্মায় বিলীন হইয়া যাইত—বিমলবাবুর কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক "বুঝিয়ে বলা"র দরকার হইত না।

রেণুর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবের পর তিনি ভাবিবার জন্য সময় লইলেন, সরাসরি অস্বীকার করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁর মনে অন্তঃস্রোতে যে কথা ছুটিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল তাহা আমরা জানি—তাহা এই: রেণুকে বিবাহ করিব কেমন করিয়া, মহাশয়? আমি রেণুর গর্ভধারিণীর, আপনার স্ত্রী সবিতা দেবীর, হৃদয়সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নকিব ও ভাটের কাজ করিতেছি; এবং আশা করিতেছি, একদিন ব্যবধান ঘুচিয়া তাহাকে পরিপূর্ণভাবে পাইব। কারণ, সবিতার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথা হইয়া আছে:

'সবিতা বলিতে লাগিলেন,…সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম, পথের বাঁকে তোমার গাড়ী হ'লো অদৃশ্য; চোখের কাজ শেষ হ'লো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিক নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম,—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সেদিন পর্য্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো—হঠাৎ একসময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, যৌবন গেছে, রূপ ত' আর নেই। তবুও যদি উনি ভালবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করে না"…

এই চিন্তার ফলেই রেণুকে তিনি দত্তককন্যারূপে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন।

কিন্তু গ্রন্থের রাধারাণী দেবী বেচারীকে কলেরার যন্ত্রণা দিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিলেন—গোল মিটিল।

বিমলবাবু প্রভৃতির তিনটি উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব :

১। সবিতার রাখালের মতো ভক্ত সারদাকে বলিতেছে : "তোমার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা"... অথচ সারদাকে সে পথের উচ্ছিষ্টতুল্য মনে করে।

২। নিজের সম্বন্ধে সবিতা বিমলবাবুকে বলিতেছে : "স্বেচ্ছায় স্বামী-ত্যাগ করে যে মেয়ে অকূলে ভেসেছে, স্বামীর প্রতি আজও তার মনোভাব কেমনতরো, জান্‌তে বুঝি কৌতূহল হয় ?" (৩৫১ পৃঃ)।

৩। ৩৫২ পৃষ্ঠায় বিমলবাবু বলিতেছেন : "জীবনের উপর এত বড় অভিমান আর যে-কেউ করে করুক, তোমাকে করতে দেবো না। মানুষের যা কিছু মর্য্যাদা জীবনের একটা কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায় না।"

আগাগোড়া কার কথা ঠিক, অর্থাৎ কে আবোল-তাবোল বকিতেছে না, সে ধাঁধার উত্তর আপনারা দিউন।

সমাপ্ত

প্রথম পরশ

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

প্রলয় সৃজন মাঝখানে যত গোপন কাগুন দোলে থরে থরে
প্রিয়ার পরশ বিতান হিয়ায় নেমেছে সেসব নব রাগ ভরে
সুখের সাগর নাচে চারি ভিতে
আমি কি একেলা পারি তা বহিতে
পারি কি কখনো সব ফেলে দিয়ে উদাস পরাণে দূরে যেতে সরে।
দেখে দেখে ওই আকাশের চাঁদ
আমার হৃদয়ে জেগেছে যে সাধ
চাঁদের আকাশ রচি' তাই সেথা বসানু প্রিয়ারে চির চাঁদ করে'।
ক্ষণে ক্ষণে যত অগণিত রূপে
নিরখি নিখিল রাজি
সব এক সাথে প্রিয়া-মুখ-শ্রমে
আহা রাঙাইনু আজি
জুড়িয়া অতীত ভাবী কাল সনে
সমুখে আনি' তা প্রীতি-আবাহনে
গড়িনু প্রিয়ার পরম প্রতিমা কামনা-অশেষ শিহ'র শিহরে।

আনাক্সাগোরাস

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে যবনদেশে ক্লাসোমিন নগরে আনাক্সাগোরাস এক সম্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পেরিক্লিসের বন্ধু ছিলেন। ত্রিশ বৎসর এথেন্সে বাস করিয়াছিলেন এবং এথেন্সে সভ্যতার উন্নতির জন্য পেরিক্লিসের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই কার্য্যে সহায়তার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি আনাক্সাগোরাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যে সংস্কৃতিতে মানুষ অভ্যস্ত, তাহা অপেক্ষা উন্নততর সংস্কৃতির প্রবর্ত্তনে তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে। এথেন্সেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পেরিক্লিসের বৃদ্ধবয়সে তাঁহার শত্রুগণ নানা দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। যে ফিদিয়াসকে তিনি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শত্রুগণ বলিতে লাগিল—তিনি মূর্ত্তিনির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত স্বর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন। যাহারা পারমার্থিক বিষয়ে নূতন মত প্রচার করিত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত না তাহাদিগকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার জন্য পেরিক্লিসের শত্রুগণের চেষ্টায় আইন বিধিবদ্ধ হইল। সূর্য্য উজ্জ্বল প্রস্তর খণ্ড এবং চন্দ্রের দেহ মৃত্তিকানির্ম্মিত বলিয়া প্রচার করিতেছেন বলিয়া তাহারা আনাক্সাগোরাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারের ফল কি হইয়াছিল, জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ পেরিক্লিসের সাহায্যে আনাক্সাগোরাস কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি যবন দেশে ফিরিয়া গিয়া তথায় একটি চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন।

আনাক্সাগোরাস দার্শনিক হিসাবে খুব বড় না হইলেও দর্শনের ইতিহাসে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথমে এথেন্সবাসীদিগকে দর্শনের সহিত পরিচিত করেন। "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার দার্শনিক মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সক্রেতিসের সময়ে সে গ্রন্থের বহুল প্রচার ছিল। তাঁহার দর্শনের বিশেষত্ব দুইটী: (১) Homoiomeriae-বাদ ও (২) nous (প্রজ্ঞা) বাদ।

(১) এমপিডক্লিস যাবতীয় দ্রব্যকে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আনাক্সাগোরাসের মতে ইহারা মৌলিক দ্রব্য নহে, মৌলিক দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত যৌগিক দ্রব্য। জগতের মূল উপাদান অতি সূক্ষ্ম, বহুবিধ ও সংখ্যায় অগণ্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, অস্থি প্রভৃতি যত দ্রব্য জগতে আছে, সমস্তই সেই মূল উপাদানগুলির সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেক দ্রব্যেই সকল জাতীয় উপাদান আছে, তাহার প্রত্যেক অংশেই তাহারা বর্ত্তমান। যে-দ্রব্যে যে-জাতীয় উপাদানের সংখ্যার আধিক্য, তাহা সেইরূপ প্রতিভাত হয়। এই মূল উপাদানের নাম Homoiomeriae। যে-দ্রব্যে তাপের homoiomeriaeর সংখ্যা অধিক, তাহাই অগ্নি; যাহাতে অধিকসংখ্যক শৈত্যের homoiomeriae আছে, তাহা বায়ু। আদিতে জগতের সমস্ত homoiomeriae একত্রিত ছিল। ইহারা সমস্ত দ্রব্যের বীজ; জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান, নিশ্চল, লক্ষ্যহীন। এই মতানুসারে জাগতিক প্রত্যেক দ্রব্যই এক একটী ক্ষুদ্র জগৎ; কেন না প্রত্যেক জাতীয় homoiomeriaeই তাহাতে বর্ত্তমান। প্রত্যেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরে পরিণত হয়; আত্যন্তিক ভেদ কোথাও নাই।

কোনও স্থান যে শূন্য নহে, শূন্য দেশ বলিয়া কিছু নাই, এ বিষয়ে এমপিডক্লিসের সহিত আনাক্সাগোরাস একমত।

(২) দর্শনের ইতিহাসে আনাক্সাগোরাসের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাঁহার প্রজ্ঞাবাদই তাহার কারণ। নিশ্চল Homoiomeriae-তে গতি সঞ্চারের জন্য বহিঃস্থ কারণের প্রয়োজন। এই কারণ আনাক্সাগোরাস আবিষ্কার করিয়াছেন প্রজ্ঞায় (Reason); এবং ইহার নাম দিয়াছেন "Nous"। জগতের নিশ্চল

উপাদানের মধ্যে গতি সৃষ্টিই nousএর কার্য্য। আবর্ত্তের (vortex) আকারে এই গতি উদ্ভূত হইয়া চিরস্থায়ী হইয়া আছে। ইহার ফলে সমজাতীয় homoiomeriae-গণ বিমিশ্রপুঞ্জ হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে বিবিধ দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রধানতঃ একজাতীয় homoiomeriae দ্বারা গঠিত হইলেও প্রত্যেক দ্রব্যেই সর্ব্বজাতীয় homoiomeriae অল্পাধিক পরিমাণে আছে। বিভিন্ন দ্রব্যের সমবায়ে "nous" কর্ত্তৃক এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশাল জগতের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড অংশসকল সুশৃঙ্খলভাবে চালিত করা বুদ্ধি ব্যতীত সম্ভব হয় না। উদ্দেশ্যসাধনে প্রযুক্ত বুদ্ধির পক্ষেই কেবল ইহা সাধ্য। আনাক্সাগোরাসের "nous" জগতের অন্যান্য উপাদানের মত আকারবিশিষ্ট হইলেও, তাহার আকার এতই সূক্ষ্ম যে, তাহাকে চিন্তার (thought) সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট বলা চলে। অন্য দ্রব্যের সহিত ইহার কেবল পরিমাণগত ভেদ নয়, স্বরূপগত ভেদও আছে। nousই একমাত্র স্বয়ংচালিত দ্রব্য, যাহার গতি অন্য কিছুরই অপেক্ষা করে না, এবং যাহা স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য দ্রব্যের পরিচালনায় সমর্থ।

A. B. D. Alexander বলেন, "এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, জগতের ব্যাখ্যায় এই ভাবে প্রজ্ঞার প্রবর্ত্তনের ফলে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে জগতের উপাদানরাজি সংখ্যায় অগণিত; অন্যদিকে nous, একমাত্র স্বয়ংচালিত দ্রব্য, অন্যান্য পদার্থ হইতে একান্ত ভিন্ন। nousএর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আনাক্সাগোরাস তাহাতে জড়ীয় গুণের আরোপ করিয়াছেন, এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই।" আনাক্সাগোরাসের 'nous' জগতের বহিঃস্থ শক্তি; জগতে অনুস্যূত (immanent) নহে; সেই জন্য জগতের ব্যাখ্যায় 'nous'-র উপস্থাপন কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। গ্রীক নাটকে কোনও সঙ্গীন অবস্থা হইবে নায়ক কিংবা নায়িকার উদ্ধার প্রাপ্তের স্বাভাবিক উপায় যখন পাওয়া যায় না, তখন কোনও দেবতাকে রঙ্গক্ষেত্রে নামাইয়া আনিয়া তাহার দ্বারা তাহার উদ্ধারসাধন করা হয়। এই দেবতাকে Deux-ex-machina বলে। প্লেটো ও আরিষ্টটল উভয়েই বলিয়াছেন যে, আনাক্সাগোরাস nous-কে Deux-ex-machina রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। nous-এর সঙ্গে তাঁহার দর্শনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নাই।

Bertrand Russel বলেন, আনাক্সাগোরাসের দর্শনে বিধাতা (Providence) কেহ নাই। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। সম্ভবতঃ তিনি নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে আলেক্‌জান্দার বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আনাক্সাগোরাসের বিশেষত্ব এই যে, তিনি একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ স্রষ্টার কথা প্রচার করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক দ্রব্যের সম্বন্ধে সমস্ত কথাই অবগত আছেন; যাঁহার কোনও প্রভু নাই এবং প্রাণবান্ যাবতীয় পদার্থ যাঁহার শাসনের অধীন। বিশ্বের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার (Peleological Explanation) আরম্ভ তাহা হইতে হইয়াছে। দর্শনে তিনি এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করেন; পদার্থের আদি অপেক্ষা অন্তের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ। "উৎপত্তি কিরূপে হইল," তাহা অপেক্ষা "উদ্দেশ্য কি"—ইহাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য। বিশ্বে শৃঙ্খলা স্থাপক এক বুদ্ধিতত্ত্বের অস্তিত্বে যে-সমস্ত দার্শনিক বিশ্বাস করেন, তিনি তাহাদিগের মধ্যে প্রথম।

আনাক্সাগোরাসের দর্শনেই প্রথমে আমরা জড় ও চৈতন্যের ভেদ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। জড় হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্যের ধারণা তিনি করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্য দ্বারাই যে যাবতীয় দ্রব্য চালিত হয়, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। 'nous'-এর ধারণা অবশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না; কিন্তু অতীতের সেই অন্ধকারময় যুগে জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা কম কথা নয়।

ত্যাগ

এ্যাণ্টন চেকভ

স্বামী স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়া তখন শেষ হয়েছে। বেশ একটা আরামদায়ক অনুভূতি জাগছে পেটের মধ্যে, চোখের পাতা ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে মৃদুমধুর ঘুমের আভাসে।

কৌচের ওপর শুয়ে পড়ে স্বামী একটি সিগারেট ধরাল। স্ত্রী তার পাশেই বসে আছে। বেশ তৃপ্তিভরা দিন কাটছে তাদের।

একটা হাই তুলতে-তুলতে স্বামী বলল, "কৈ থামলে কেন, কিছু বল একটা।

—বলব—কি বলব?…ও, সোফি ওকারফোতা যে সেই লোকটা সেই কি যে-নাম ভন ট্রম্বকে বিয়ে করেছে জান? কী কেলেঙ্কারী বলতো।

—কেন, কেলেঙ্কারী কি হল?

—কেলেঙ্কারী নয়? ট্রম্বের মত একটা পাজী বদমাসকে বিয়ে করেছে সোফি। একটা চাকরকে। জান, ট্রম্ব এককালে কোন এক জমিদারের চাকর ছিল? সেখানে থাকতেই কিছু টাকা পয়সা জমায়, এখন এসে রেল কোম্পানীতে চাকরী নিয়েছে। এখন দু'হাতে চুরি করে, এমন কি নিজের বোনের টাকা পয়সা পর্য্যন্ত চুরি করেছে ও। আর সোফি কিনা সেই ট্রম্বকেই বিয়ে করেছে। সারাটা জীবন কি না ওরই সঙ্গে কাটাতে হবে সোফিকে। তাও কি না ওর মত মেয়েকে, যার চরিত্রে এতটুকু দাগ নেই। আমি তো মরে গেলেও এমন লোককে বিয়ে করতুম না, সে যদি কোটিপতিও হ'তো। কিম্বা খুব—খুব সুন্দরও হ'তো তবু না। উঃ! এরকম একটা বদমাস আমার স্বামী—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

অনুবাদক—শ্রীমৃগাঙ্ক রায়

কৌচ থেকে উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারি করে বেরাতে লাগল শ্রীমতী। রাগে চোখ দু'টো যেন জলছে বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা তার মনে আঘাত হেনেছে

—উঃ! বোকা না হ'লে আর লোকে এমন বিয়ে করে? একটা আস্তো গাধা সোফি।

—ও…হাঁ…আচ্ছা তোমার স্বামীটিও যদি ঠিক সেই রকমই হয়; ট্রম্বের মতই চোর বা তার চেয়েও বেশি, তা হলে কি করবে তুমি?

—আমি? আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। তৎক্ষণাৎ। এক সেকেণ্ডও থাকব না এখানে। যদি ট্রম্বের মাত্র একশো ভাগের এক ভাগও করে থাক, তবুও থাকব না তোমার সঙ্গে। না।

—হুঁ বুঝেছি, তুমি যে এত সৎ তাতো জানা ছিল না আমার। আচ্ছা, একেবারে নিঃসঙ্কোচে এতগুলো মিথ্যে কথা বলতে পারলে তুমি?

—মিথ্যে কথা! আমি কখ্খনো মিথ্যে কথা বলিনে। একবার করেই দেখ না, দেখবে তখন—

—আরে, করব আবার কি? তুমি তো সবই জান। ট্রম্ব তো একটা পকেটমারও নয় আমার তুলনায়! বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, আমার মাইনে কত?

—বছরে তিন হাজার।

—আচ্ছা, সেদিন তোমাকে যে নেক্‌লেসটা কিনে দিয়েছি তার দাম কত? দু' হাজার। গতকাল যে পোষাক কিনে দিয়েছি তার দাম—পাঁচ শ'। গ্রামে যে বাড়িটা কিনেছি—দু' হাজার। গতকাল তোমার বাবা নিয়ে গেছেন—এক হাজার……

—কিন্তু মাইনে ছাড়া খাজনাও তো পাও তুমি।

—পাই। কিন্তু ঘোড়াগুলো? মাইনে-করা ডাক্তার? দর্জ্জি? আর পরশু যে তুমি তাস খেলে একশো রুবেল হেরে এলে?

স্বামী উঠে বসল। নিজের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিবৃতি দিয়ে গেল। টেবিল থেকে দলিল পত্র এনে স্ত্রীকে দেখাল। তার কথা মিথ্যে নয়।

—দেখলে তো? আমার তুলনায় একটা নগণ্য পকেটমারও নয়, তোমার ঐ ভন্ ট্রম্ব, বুঝলে? আচ্ছা …এবার তুমি যেতে পার…বিদায়—ভবিষ্যতে যেন আর কাউকে নিন্দে করতে যেও না।

এখানেই আমার গল্পের শেষ। আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, সে কি সত্যিই তার স্বামীকে ছেড়ে গেল?

হ্যাঁ। তাই। সে চলে গেল। পাশের ঘরে।

নূতন স্বর্গ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বর্গাধিকার

মনে কর যাহা হল না সফল বাস্তব এ জীবনে;
সেই সে কাম্য-সার্থকতার সাধনা শুভক্ষণে
বৈরাগে বসি মহা সমাধিতে অতি অভাব্য রূপে
অতি অচিন্ত্য দার্শনিকের ভেদাভেদ রসকূপে
টুটি মায়াবাদ চার্ব্বাকবাদ ক্ষণিক বাদের মোহে
অনন্ত ক্ষণ লভি সেই ক্ষণ দোঁহাতে ডুবিয়া দোঁহে।

জ্বলে বিদ্যুৎ গরজে অশনি দ্বন্দ্ব নাহিক মনে,
আপনারে পর পরমাত্মীয় ভাবিলাম পরজনে,
তুমি বান্ধবী হ'লে ভৈরবী গৈরিক কলেবর,
আমি মেখে ছাই ধুনী জ্বেলে তাই বেপথু মহেশ্বর।
সাধনার বলে বোধিদ্রুম তলে লভিলাম প্রজ্ঞান,
দূরে গেল দূর নিকট মধুর তুমি আমি এক প্রাণ।

মনে কর এই মহা সমাধিতে পৃথিবীর প্রচ্ছায়
শ্যামল ব্রততী তরু বল্লরী সজল বাদল বায়—
ডুবে গেছে দিক ভেবে দেখ ঠিক তেমনি মধুর ক্ষণে
দোঁহে ডুবে যাওয়া নির্ব্বাণ পাওয়া নিবিড় আলিঙ্গনে
হেলায় ঢলিয়া পড়ে দেহখানি মহা সিদ্ধির মোহে
ঢুলিয়া নয়ন ভুলিয়া চেতন দোঁহারে নেহারি দোঁহে।

মনে কর তারপরে পরিজন জটিলা কুটিলা যথা
তিক্ত করিয়া তুলে সঞ্চারি বিষাক্ত কুটিলতা,
সেই দুখে পিয়া মিলনের বিষ তোমারে বক্ষে নিয়া
মীন কেতনের মকরধ্বজে উঠিনু স্বর্গে গিয়া—
পুণ্যের শেষে পুরাণো ইন্দ্র ছেড়ে দিল রাজধানী,
আমি হইলাম নবাভিষিক্ত তুমি হলে ইন্দ্রাণী।

স্বর্গাধিকার দিবস প্রথিত হইল পৃথিবী তলে,
ধন্য হইল এই আলাদীন ভাঙা প্রদীপের বলে।

স্বর্গ হইতে বিদায়

স্বর্গ যদি ভ্রষ্ট হলেম তোমার তরে প্রিয়ে
নূতন স্বর্গ পেলেম হেথায় তোমায় বক্ষে নিয়ে।
কে চায় ফিরে স্বর্গ সভা,
ঐ অধরের রক্ত জবা
চূর্ণালকে আঁধার-ঝরা ঝর্ণাধারা পিয়ে
চম্পকে ও অলক্তকে বর্ণ বিনাইয়ে।

স্বর্গে থাকুন দেবতারাই স্বর্গ নিয়ে সুখে,
মর্ত্ত্যে মোরা স্বর্গসুখে রইব হাসিমুখে।
অমরত্বে আমার কি কাজ?
চির-অমর হয়েছি আজ,
মৃত্যু যদি আসেই তবে আবার জনমিয়ে
আবার জানি তোমায় পাবো প্রীতি পুণ্য দিয়ে।

কতই স্নেহ অঞ্চলেরি প্রান্তে পড়ে ঝরি;
খিন্ন হৃদয় খিন্ন ললাট জুড়াও মরি মরি!
ঝিনি সুতার বন্ধন ডোর
স্বীকার করি অমাত্য মোর
নিত্য গৃহ-রণাঙ্গনে শঙ্খধ্বনি করি
কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজের বল্গা ধরি ধরি।

স্বর্গ যদি ভ্রষ্ট হলেম স্বর্গেরি তো ক্ষতি,
তোমায় নিয়ে ধন্য হলেম অহং মহামতি;
জ্ঞানের গাছে যে রাঙা ফল
আস্বাদিলাম আমরা কেবল,
দেব দেবীরা সত্য-যুগের মিথ্যা মায়া করে,
অমর হয়ে একঘেয়ে সুর ঐকতানে ধরে।
তাহার চেয়ে মৃত্যু ভালো,
জন্মে জন্মে বাসি ভালো,
ঘুরে ফিরে তোমায় আমায় এক মরণে মরে।

পরিব্রাজক কাম'নীত্ত

লেখক—কাল গিয়েলারপ

গুরুদেব

তখন ভগবান বুদ্ধ বললেন, "ভাই সেই পূর্ণমানব, পূর্ণালোকিত সত্তা বারাণসীর অবতারগিরির পার্শ্বস্থ হরিণ-কুঞ্জে ধর্মচক্র প্রথম আবর্তিত করেন। এর গতির বিরুদ্ধে কোন মানব, কোন সন্ন্যাসী, কোন পুরোহিত অথবা দেব বা দানব বা জগতের যে কোন সত্তা দাঁড়াতে সক্ষম নয়।

সে তত্ত্ব হচ্ছে পবিত্র চতুঃসত্যের আবরণ-উন্মোচন, আবিঃ। কোন চতুঃসত্য? দুঃখ সম্বন্ধীয় পবিত্র সত্য, দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পবিত্র সত্য, দুঃখের অন্ত সম্বন্ধীয় পবিত্র সত্য, দুঃখের অন্তে নীয়মান মার্গসম্বন্ধীয় সত্য।

কিন্তু ভাই দুঃখসম্বন্ধীয় পবিত্র সত্য কী? জন্ম দুঃখ, বয়স দুঃখ, রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, দুশ্চিন্তা, দৈন্য, যন্ত্রণা, শোক, হতাশা—এ সবই দুঃখ, প্রিয়পাত্রের বিরহ দুঃখ, অপ্রিয়ের মিলন দুঃখ, যে বস্তু পাবার কামনা করি, তার অপ্রাপ্যতা দুঃখ, সংক্ষেপে সর্বপ্রকারের হৃদয়-বৃত্তির পরিণতি দুঃখ। তাই এই তথ্যের নাম দুঃখসম্বন্ধীয় সত্য।

কিন্তু, ভাই, দুঃখের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় সত্য কী? জন্ম হ'তে জন্মান্তরে, বহু জীবনের মধ্যে দিয়ে মানবাত্মাকে টেনে নিয়ে যায় তৃষ্ণা, এর সঙ্গে থাকে কামনা, বাসনা, ভোগ, সম্ভোগ—কখন এ জীবনে কখনও বা পরবর্তী জীবন—কখন বা পার্থিব আনন্দের উন্মাদনা, কখন স্বর্গীয় সুখের জন্য অতৃপ্ত তৃষ্ণা, আবার পরম মৃত্যুর তৃষ্ণাও থাকে। তাই, এই তথ্যের নাম দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় সত্য।

তারপর। ভাই, সর্ব দুঃখের অন্ত সম্বন্ধীয় সত কী? এই তৃষ্ণার পূর্ণ সম্পূর্ণ অন্ত, তৃষ্ণা ত্যাগ, তৃষ্ণা হ'তে বিচ্ছিন্নতা, তৃষ্ণা হ'তে মুক্তি, এর হ'তে নিজেকে রক্ষা—এই তথ্যের নাম দুঃখের অন্ত সম্বন্ধীয় সত্য।

এখন দুঃখের অন্তে নীয়মান মার্গসম্বন্ধীয় সত্য কী? এ হচ্ছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা—সৎ অনুভূতি, সৎসঙ্কল্প, সৎ-বাক্য, সৎ-ব্যবহার, সৎ-জীবন, সৎ-ব্যায়াম, সৎ-চিন্তা ও সৎ-ধ্যান। তাই এই তথ্যের নাম 'দুঃখের অন্তে নীয়মান মার্গসম্বন্ধীয় সত্য'।

এই প্রভু উপদেশের চারিটী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ক'রে, তাঁর প্রস্তুত শিষ্যের চিন্তা ও অনুভূতির বাসোপযোগী তথ্য-সৌধ নির্মাণে উদ্যোগী হলেন। তার পর প্রত্যেকটী বাক্যকে তিনি এক একটী পৃথক খোদিত উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ডের মত দৃষ্টান্তস্বরূপ করলেন, ভিত্তির সঙ্গে যৌক্তিক সম্বন্ধ রেখে সযত্ন-নির্বাচিত উপযুক্ত প্রস্তর-খণ্ডের মত বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। দুঃখতথ্যের স্তম্ভটীর পার্শ্বে স্থাপন করলেন সর্ববস্তুর অস্থায়িত্ব ও প্রবহমাণত্ব-তথ্যের স্তম্ভ, এদের নির্ভরশীল খিলানের মত শরদল হ'ল সর্ববস্তুর অসৎ-ভাবতথ্যের। পরিণাম-বাদের অপূর্ব সোপানশ্রেণী অবলম্বন করে এবং প্রতি-পদক্ষেপে নূতন সোপান নির্মাণ করে তিনি শিষ্যসহ এই বিরাট সৌধে আরোহণ করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিপদক্ষেপে পূর্ব পদ দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত ও নূতন উত্তর পদের উৎপত্তি হচ্ছে।

আবার যোগ্য স্থপতি যেমন যোগ্য স্থানে অলঙ্করণ ও ভারবহন বা ধারণের জন্য তাৎপর্যের সুন্দর নিদর্শন স্থাপন করেন, প্রভু তেমনি উচ্চতর তথ্যগুলিকে পরিস্ফুট করার জন্য মধ্যে মধ্যে রসাত্মক কিন্তু জ্ঞানপূর্ণ গাথার অবতারণা করলেন।

অবশেষে, সৌধের উপরিভাগে বহুদূর হ'তে দর্শনীয় উজ্জ্বল গম্বুজের ন্যায় সমগ্র তথ্যের সার-সম্মেলন করলেন—হে পরিব্রাজক, অস্তিত্বের প্রতি আসক্তিতা হ'তেই অস্তিত্বের উৎপত্তি, আশ্লেষের অভাবে অস্তিত্বেরও অভাব।

অনুবাদক—শুদ্ধোধন সেন

সর্বপ্রকারের হৃদ্-বৃত্তি হ'তে মুক্ত ভিক্ষুর মেঘমুক্ত প্রফুল্লতার আলোকপূর্ণ চিত্তাকাশে এই অনুভূতির উৎপত্তি হয়—"তার নির্বাণ সুনিশ্চিত; এই তার শেষ জন্ম, এর পর তার আর কোন নূতন অস্তিত্ব হবে না।"

এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর ভিক্ষু এই পরম জ্ঞানের

আনন্দ দ্বারা পুরস্কৃত। "সর্ব্ব দুঃখের শেষ হয়েছে" এইটে জানাই তা, হে পরিব্রাজক, পরম পবিত্রতম জ্ঞান। এই সত্য যার কাছে উদ্‌ঘাটিত, সে অভেদ্য সত্যের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যা কিছু অস্থির ও অনর্থক, হে পরিব্রাজক, তাই অসৎ, আর যে বস্তু সৎ, শাশ্বত এবং সর্ব্বমায়ার অতীত, সেই 'বস্তুই' সত্য।

যে প্রথমাবধি প্রকৃতির অবাঞ্ছিত বিধিতে জন্ম-জরা ও মৃত্যুর প্রজা ছিল, সমান দৃষ্টি দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে সে যে নিরাপত্তা লাভ করেছে; তার মধ্যে জন্ম-জরা ও মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নাই। যে ছিল রোগ, অপবিত্রতা ও পাপের অধীন, সে এখন অপরিবর্ত্তনীয়তা, অবিমিশ্র ও পবিত্র সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছে—

"আমি রক্ষা পেয়েছি, আমার নির্ব্বাণ আমারই মধ্যে; আমার জীবন শেষ হয়েছে, আমার কর্ম্ম সমাপ্ত, আমার পক্ষে এ দৃশ্যজগতের আর অস্তিত্ব নাই।"

হে পরিব্রাজক, এইরূপে সর্ব্বদুঃখের সমাপনকারীকে "অন্তকারী" বলা হয়।

এবং যে 'আমি' ও 'আমার' এই মায়াকে অবলুপ্ত করতে পেরেছে, তাকে বলা হয় লুপ্তক।

হে পরিব্রাজক, যে ব্যক্তি এই জন্ম-জরা-মৃত্যুময় জীবনকে এমনভাবে উন্মূলিত করেছে যে আর জন্মের অঙ্কুর উদ্ভূত হবে না; সে ব্যক্তিকে উন্মূলকারী বলা হয়।

সে ব্যক্তি যতদিন নরদেহ ধারণ করে থাকেন, তত দিন তিনি দেবতা ও মানবগণের দর্শনীয় কিন্তু মৃত্যুতে তার দেহ বিলীন হ'য়ে গেলে, তিনি আর দেবতা বা মানবগণের দৃষ্ট থাকেন না। এমন কি সর্ব্বদ্রষ্টা প্রকৃতিরও তিনি দর্শনাতীত। তিনি প্রকৃতির চক্ষুকে অন্ধ ক'রে দিয়েছেন, দুর্ব্বলসত্তা হতে নিরাপত্তা লাভ করেছেন। অস্তিত্বের নদী উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জরা-মৃত্যুর অতীত একমাত্র দ্বীপ 'নির্ব্বাণে' উপস্থিত হ'য়েছেন।

যুক্তি হীন শিশু

ভগবান বুদ্ধের আলোচনা শেষ হল। পরিব্রাজক কামনীত বহুক্ষণ নিস্পন্দ নিঃশব্দ বসে রইলেন; তাঁর মনে তখন স্ববিরোধী নাস্তিক্যের আলোড়ন চলছে। শেষে বললেন, "ভিক্ষু কী ভাবে ইহ জীবনে দুঃখের অবসান করবে, সে সম্বন্ধে আপনি আমার প্রচুর কথা বলেছেন, কিন্তু তার মৃত্যুর পর মানব, দেব বা দানব এমন কি প্রকৃতিও তাকে দেখতে পাবে না, এ ছাড়া দেহ পঞ্চভূতে মেশবার পর তার কী হবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বললেন না। পরম সুখদ, স্বর্গীয় শান্তিপূর্ণ অনন্ত জীবন সম্বন্ধে কিছুই শুনলাম না। এসব বিষয়ে প্রভু কি কিছুই বলেন নি?"

"ঠিক বলেছেন, ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন, এ বিষয়ে প্রভু কিছুই বলেন নি।"

অতৃপ্তভাবে কামনীত উত্তর দেন, "বা অন্য কথায় ভগবান বুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টী সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী নন।"

"আপনার কি তাই মনে হয়? শ্রবণ করুন তাহ'লে পরিব্রাজক। কোশাম্বির যে শিংসপাকুঞ্জে আপনি এবং আপনার বশিষ্ঠটি একদিন আকাশগঙ্গার পবিত্র নাম নিয়ে চিরস্থায়ী নিষ্ঠায় ও পশ্চিমস্বর্গে মিলিত হবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেস্থানে এক সময় ভগবান বুদ্ধও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। একদিন একগুচ্ছ শিংসপা-পত্র হতে বেরিয়ে এসে শিষ্যদের বললেন, "কী মনে হয় তোমাদের, আমার হস্তস্থিত পত্রের সংখ্যা বৃক্ষের পত্র-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক কি? একটুও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উত্তর দিলেন, 'প্রভু আপনার হস্তস্থিত পত্র তো সামান্য কয়েকটি, ওদিকে বৃক্ষস্থিত পত্রসংখ্যা অনেক অধিক।' ভগবান বুদ্ধ বললেন, "ঠিক সেইরূপ যে তথ্য আমি তোমাদের উপদেশ করিনি বা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিনি তারই পরিমাণ প্রকাশিত ও উপদিষ্ট শিক্ষা অপেক্ষা অনেক অধিক। হে শিষ্যগণ, কেন আগে প্রকাশ করিনি, বলিতে পার কি? কারণ সে তথ্য কাম্য নয়, প্রাচীন সন্ন্যাস-বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য-হীন, সে তথ্যের সাহায্যে পার্থিব বস্তু হ'তে দূরে যাওয়া যায় না, সে হতে কামনার অবসান হয় না; পরিবর্ত্তনশীল সকল কিছুর অন্ত-করণে-ও সাহায্য করে না, পূর্ণ-জ্ঞান পাওয়া যায় না, নির্ব্বাণ লাভ হয় না।

কামনীত উত্তর করেন, "কোশাম্বির শিংসপাকুঞ্জে প্রভু এমন কথা বলে থাকলে বুঝতে হবে বিষয়টা

সঠিক গুরুত্বপূর্ণ। বুঝতে পারছি, শিষ্যরা যাতে নিরুৎসাহ না হয় বা ভয় না পায়, সে উদ্দেশ্যে তিনি এ বিষয়ে নির্ব্বাক থেকেছেন। শেষ পরিণতি অর্থাৎ চরমধ্বংসসংবাদ তাদের কাছে প্রকাশ করলে তারা নিশ্চয় নিরুৎসাহ হয়ে যেত। আপনি এতক্ষণ ধরে এত পরিষ্কার করে বিবৃত করলেন, আমার মনে হয় এটা তার স্বাভাবিক পরিণতি—কারণ আর যাই হ'ক পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনঃস্বীকৃত বস্তনিচয়কে পরিবর্ত্তনশীল ও অবাস্তব বললে, এমন কোন শক্তিই থাকে না যার সাহায্যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করা যায়। তা হ'লেই হে মহাত্মন, বুঝতে পারছি আপনি এতক্ষণ ধরে যে তথ্যের ভাষ্য করলেন, তার সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে ভিক্ষু নিজেকে সকল প্রকারের অপবিত্রতা হ'তে মুক্ত করেছে, মৃত্যুর পর সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, দেহের ন্যায় আত্মারও অবশেষ কিছু থাকে না।"

তখন ভগবান বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "পরিব্রাজক, বললেন না, আর এক মাসের মধ্যেই আপনি জেতবনে প্রভুর চরণ দর্শনে সমর্থ হবেন?"

"হে শ্রদ্ধার্হ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইরূপ, কিন্তু একথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"তখন হে বন্ধু, তাঁর চরণপ্রান্তে বসে, আপনি তাঁর কোন মূর্ত্তি দর্শন করবেন বলে আপনার মনে হয়? যে বস্তুগত মূর্ত্তি আপনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করতে পারবেন? সেই দেহই কি আপনার অভীপ্সিত পূর্ণ মানব?"

"হে পূজ্য, আমার বিশ্বাস সেরূপ নয়।"

"তাহ'লে, বন্ধু, আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময় প্রভুর যে মন কার্য্যকরী, তারই বোধশক্তি, অনুভূতি ও ভাবধারাই সেই পূর্ণমানব—তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি এইরূপ?"

"হে মহাত্মন, আমার ধারণা সেরূপ নয়।"

"তবে বন্ধু, তাঁর দেহ ও মন মিলিতভাবে কি সেই পূর্ণমানবের স্বরূপ?"

"হে মহান, তাঁর দেহ মনকে আমি এই অর্থে গ্রহণ করি না।"

"তবে কি আপনার মনে হয় যে, সেই পূর্ণমানব দেহাতীত হ'য়ে বা মানসাতীত হয়ে বা উভয়েরই উর্দ্ধে অবস্থান করছেন? বন্ধু, এই কি আপনার মত?"

"তিনি এ সব হতে এই অর্থে বিচ্ছিন্ন যে; তাঁর পূর্ণ সত্তাকে ধারণ করবার ক্ষমতা এই ভৌতিক বা মানসিক দেহের নাই।"

"বেশ। এমন কোন ভূত বা সত্তার পরিচয় পেয়েছেন বা এই সর্ব্বগুণাত্মক দেহ—যার সঙ্গে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পরিচিত বা এই ভাব-অনুভূতি-ও-চৈতন্য-সমন্বিত মনের উর্দ্ধে অবস্থিত? কোন্ সে শক্তি যার দ্বারা আপনি এতাবৎকাল পূর্ণাত্মার অনুপলব্ধ সত্তা উপলব্ধি করতে চান?"

"হে পূজনীয়, আমি স্বীকার করতে বাধ্য এমন কোন শক্তি আমার নাই—"

"তাহ'লে, বন্ধু কামনীত, এখানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতে সেই পূর্ণাত্মা'কে তাঁর প্রকৃত স্বরূপে এবং সত্য ভাবে আপনি উপলব্ধি করতে পারেন না। তাহ'লে একথা বলবার আপনার অধিকার আছে কি যে সেই পূর্ণাত্মা বা সেই ভিক্ষু যিনি সর্ব্ব অপূততা হ'তে নিজেকে মুক্ত করেছেন, মৃত্যুর পর তিনি চরম ধ্বংসলাভে বাধ্য, যে মৃত্যুর পর তার কেবল অস্তিত্বই নাই? আর এও কি সত্য যে,তাঁর প্রকৃত স্বরূপে এবং সত্যভাবে তাঁকে উপলব্ধি করবার শক্তির অভাবেই তাঁর চরম ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী?"

এইভাবে পৃষ্ট হ'য়ে কামনীত কিছুক্ষণ নতদেহে নতমস্তকে এবং নিশ্চল হ'য়ে উপবিষ্ট রহিলেন। অবশেষে তিনি বললেন—

"সে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অধিকার আমার না থাকলেও, পূর্ণাত্মার মৌনতা হ'তেই এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। আনন্দপূর্ণ এবং আশাপ্রদ কোন তথ্য জানাবার থাকলে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই মৌন থাকতেন না। সর্ব্বদুঃখজয়ী ভিক্ষুর জন্য চরমধ্বংস না থেকে অনন্ত স্বর্গসুখ থাকলে, তিনি সে কথা জানাতে অবশ্যই বিরত হ'তেন না। আশাপ্রদ ভবিষ্যতের সংবাদ তিনি দিতে পারলে তাঁর শিষ্যদের তাতে উৎসাহ বর্দ্ধিত হত, সেটা তাদের সৎ-চেষ্টার সহায়ক হত।"

"বন্ধু আমার, এই কি আপনার ধারণা? পূর্ণাত্মা

দুঃখান্তকেই জীবনের লক্ষ্য বলে নির্দ্দেশ না করে, দুঃখ নিয়ে প্রথমেই তিনি নিজে যেমন আরম্ভ করেছিলেন, পরলোকে একটা নিখুঁৎ সুখের চিত্র অঙ্কন করতেন, তাহ'লে ফল কী হ'ত? তাঁর বহু শিষ্য নিশ্চয়ই এই তথ্যে উল্লসিত হ'য়ে উঠত, আজীবন এ তথ্যকে দৃঢ়পণে অবলম্বন করে থাকত, হৃদয়ে দুর্ব্বার কামনা নিয়ে উক্ত লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করত। অদম্য কামনা প্রফুল্লতা ও চিন্তার প্রশান্তির বিনাশক, এ হতে কি তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই জীবনের অতি দৃঢ় আশা-জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ত না? সেই জীবনাতীত অবলম্বন ক'রে থাকবার সময় তারা ইহ জীবন হতেই সুখের বর্ণ-সমারোহ গ্রাস করত; এ হ'তে যতই তারা জীবনাতীতকে অনুসরণ করত ততই বদ্ধ হ'য়ে পড়ত 'ইহ'-তে। এই না?

"ঠিক প্রহরা-নিযুক্ত কুকুর যেমন কীলকাবদ্ধ থেকে কীলকবন্ধন হতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সম্মুখে ধাবিত হয়, ফলে তাকে বার বার সেই কীলকেরই চতুর্দ্দিকে ঘুরতে হয়; তেমনি বিশেষ যোগ্য শিষ্যও এই জীবনের প্রতি নিদারুণ বৈরাগ্যবশতঃই এজীবন হতে দূরে পলায়নের চেষ্টায় বার বার এই জীবনের চতুর্দ্দিকেই আবর্ত্তিত হত।"

কামনীত উত্তর করেন, "এ বিপদ স্বীকার করতে আমি বাধ্য হলেও, একথা বলতে আমি বাধ্য যে, মৌনতা বিপজ্জনক, কারণ এর ফলে প্রারম্ভে উৎসাহ পঙ্গু হ'য়ে যেতে পারে। অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হ'তে মানুষ পারে না। ভবিষ্যৎটা স্বর্গের শাশ্বত সুখ না অনস্তিত্ব সেটা সঠিকভাবে না জেনে শিষ্য কেমন করে দুঃখ-জয়ের জন্য তার সর্ব্বশক্তি, বিশ্বাস ও সাহস প্রয়োগ করবে?"

"আচ্ছা বন্ধু, এরূপ ক্ষেত্রে কোনটা স্বাভাবিক বলে আপনার মনে হয়? ধরা যাক একটা বাড়ি পুড়ছে, তখন ভৃত্য প্রভুকে জাগাবার জন্য ছুটল; আজ্ঞে উঠুন উঠুন, ছুটে পালান, বাড়িতে আগুন লেগেছে, বরগায় আগুন লেগেছে; এখনই ছাত ধ্বসে পড়বে। তখন কি প্রভুর পক্ষে এ'কথা বলা সম্ভব, "বাছা বাইরেটা আগে দেখে এস, ঝড় বৃষ্টি চলছে না সুন্দর জ্যোৎস্নালোকিত রজনী শোভা পাচ্ছে। জ্যোৎস্না-হ'য়ে থাকলে আমরা বাইরে যেতে পারি।"

"কিন্তু হে শ্রদ্ধার্হ, সে প্রভু এমন উত্তর কেন দেবেন? কারণ তাঁকে ডেকেছে তো ভয়ার্ত্ত ভৃত্য, 'মশায় পালান, বাড়িতে আগুন লেগেছে, বরগায় ইতিমধ্যেই আগুন ছেয়ে গেছে, ছাদ ধ্বসবার আশঙ্কা আছে।"

"নিশ্চয়। ভৃত্য তো তাঁকে ডেকেছেই। তবু যদি সে প্রভু বলেন, "যাও, বাছা, আগে বাইরেটা দেখ, ঝড়বৃষ্টি চলছে, না জ্যোৎস্নালোকিত রজনী শোভা পাচ্ছে। জ্যোৎস্না হয়ে থাকলে আমরা বাইরে যেতে পারি।' তাহ'লে আপনার ধারণা হবে না যে, প্রভু ভৃত্যের সংবাদ সঠিক ভাবে শ্রবণ করেন নি, যে মারাত্মক বিপদ তাঁর মাথার ওপর ঝুলছে এ কথা ঘুমের ঘোরে তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন নি।"

"কোন মানুষ এমন নির্ব্বোধ উত্তর দিতে পারে এ যখন অকল্পনীয় তখন হে পূজ্য, আমি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই বাধ্য।"

"ঠিক বলেছেন পরিব্রাজক। অতএব আপনিও এমনভাবে চলুন, যেন আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে— অগ্নি যেন আপনাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। কোন গৃহ? জগৎ! কোন অগ্নিতে দহন চলছে? কামনার শিখায়, বিরাগের শিখায়, মায়ার শিখায়। সমগ্র জগতে আগুন লেগেছে, সমগ্র জগত ধূমাচ্ছন্ন, সমগ্র জগত আতিত্তি কম্পমান।"

জীবনে প্রথম সিংহগর্জ্জন শুনে মহিষ যেমন কাঁপে, পরিব্রাজক কামনীতও উক্ত ভাষণ শুনে তেমনি কাঁপতে লাগলেন। তিনি তখন সামনে ঝুঁকে পড়েছেন, তাঁর মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, মুখমণ্ডল অঙ্গারের মত জলন্ত বর্ণে সমাচ্ছন্ন, মুখে কথা নাই, দেহ নিশ্চল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

তার পর কতকটা কম্প্রকণ্ঠে, কতকটা কর্কশভাবে তিনি বললেন—

"যাই হ'ক এতে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না, পরম সুখকর অবস্থার সংবাদ দিতে পারলেই তাঁর পক্ষে সব চেয়ে ভাল হ'ত; আর সে সংবাদ যদি মহ.ভ্রান্তিক নয়, বা অদ্ভুতার

অন্নই যদি প্রভু এ বিষয়ে মৌন থাকেন, তাহ'লেও তো সন্তুষ্ট হ'তে পারছি না। প্রকৃতির অমোঘবিধিতেই মানুষ সুখ ও আনন্দ-অভিমুখী, এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আমি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আমার এই উক্তির সমর্থনে বলতে শুনেছি—

"ধরা যাক এমন এক যুবকের কথা যে, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, জ্ঞানার্জ্জনে আগ্রহশীল, নিপুণতম, বিশেষ শক্তিশালী, অন্যান্য যুবক অপেক্ষা বলবান—ধনরত্নপূর্ণা বসুন্ধরা তার অধিকারভুক্ত হ'ল। এটা হ'ল মানুষের একটা আনন্দ, মানুষের শত আনন্দে স্বর্গীয় সত্তার এক আনন্দ, স্বর্গীয় সত্তার শত আনন্দে দেবতাদের এক আনন্দ, দেবতাদের শত আনন্দের সমান ইন্দ্রের এক আনন্দ, ইন্দ্রের শত আনন্দে প্রজাপতির এক আনন্দ, আর প্রজাপতির শত আনন্দের সমষ্টি সমান ব্রহ্মের এক আনন্দ। এরই নাম পরমানন্দ, এই হ'ল পরমানন্দ লাভের পন্থা।"

"হ্যাঁ পরিব্রাজক! আচ্ছা ধরা যাক একটী অনভিজ্ঞ অবুঝ বালকের কথা। তার দন্তমূলে জ্বালা সূচ ফোটানর মত যন্ত্রণা আছে, সে কোন বিখ্যাত সুপণ্ডিত চিকিৎসকের কাছে নিজের কষ্টের কথা জানালে "সম্মানীয় মহাশয় আপনার বিদ্যাপ্রভাবে আমার এই বেদনা আরোগ্য করে, আমায় পুনরায় আরামের আনন্দ দান করুন।" চিকিৎসক বললেন, "আমার বিদ্যা বেদনাই দূর করতে পারে।" নষ্ট বালক কাঁদে, "বহুক্ষণ হ'তে আমি দাঁতে আগুনে পোড়া, হুল ফোটানর মত বেদনা অনুভব করছি, এর পরিবর্ত্তে পরম আনন্দ পাব এইটেই তো যৌক্তিক। আমি শুনেছি এমন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন যাঁরা বেদনার পরিবর্ত্তে অশেষ আনন্দ দান করতে পারেন, আমার ধারণা ছিল আপনি তাঁদের অন্যতম।" তখন বুদ্ধিহীন বালক একজন সরলাত্মা, তুক-তাক-আশ্রয়ী সত্তার কিঞ্চিৎ-করা, বৈদ্যের কাছে উপস্থিত হ'ল। এ ভদ্রলোকের আদি নিবাস গান্ধারে; এ দেশে এসেই ঢাক ও শঙ্খ বাজিয়ে নগরে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, 'স্বাস্থ্যই পরম সম্পদ, মানব জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাস্থ্য। ক্রম প্রবর্দ্ধমান স্বাস্থ্য, দেহের প্রতি অংশে, প্রতি শিরা প্রশিরায় প্রতিটী তন্তুতে দেবতাদের মত পূর্ণানন্দ লাভ করতে অতি ক্লান্ত আমার বিদ্যাপ্রভাবে সুলভ। পারিশ্রমিক অতি সামান্য'। এই তুক-তাকবাগীশের কাছেই বালক উপস্থিত হয়ে বললে: আমার অনুরোধ, হে সম্মানীয়, আপনার বিদ্যাপ্রভাবে আমায় আমার যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে অসীম আনন্দ দান করুন।

তুক-তাকবাগীশ বললেন, 'বাছা আমি ঠিক এই অবস্থাই মানুষকে দান করতে পারি।' এই বলে তিনি বালকপ্রদত্ত অর্থ হস্তগত করে নিয়ে বালকের দন্ত স্পর্শ করলেন, যাদুবিদ্যাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বেদনার পরিবর্ত্তে বালক অসীম আনন্দ অনুভব করলে। বুদ্ধিহীন বালক মহানন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আনন্দ কমতে লাগল, যন্ত্রণা পূর্ব্ববৎ আপনার স্থান অধিকার করতে লাগল। কেন? কারণ যন্ত্রণার কারণ দূর করা হয় নি।

আচ্ছা পরিব্রাজক, এবার একটা যৌক্তিক মানুষের কথা ধরা যাক, এরও দাঁতে তেমনি জ্বালা ও হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা। সে পূর্ব্বোক্ত সুপণ্ডিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, 'মাননীয় মহাশয়, আপনার বিদ্যাপ্রভাবে আমার যন্ত্রণা দূর করে দিন।'

চিকিৎসক বললেন, 'এর বেশী যদি আপনি চান, তাহ'লে নিরাপদে আমার নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করতে পারেন।'

বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন লোকটি বলে, 'এর বেশী আর কি চাইব?'

চিকিৎসক তখন রোগ পরীক্ষা করে বুঝলেন, দন্তমূলের পেশী ফুলেছে। বললেন, 'বাড়ি যান, গিয়ে এই স্থানে এক জোঁক বসিয়ে দিন, প্রাণ পূর্ণ হ'লেই জোঁক খসে পড়বে, তখন ক্ষতস্থানে এই মূলগুলি বেঁটে লাগিয়ে দেবেন'। এই প্রকারে কুরক্ত ও পুঁজ দূর হবে আপনিও আরাম পাবেন। বিকেলে লোকটি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসকের নির্দ্দেশ মত চললেন; বেদনাও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়ে গেল আর তার পুনরাবৃত্তি হল না। কেন হ'ল না? কারণ অসুখের কারণ দূরীভূত হয়েছিল।"

গল্প শেষ করে প্রভু থামলেন, আর কথা বললেন না। কামনীত তখন নির্বাক হ'তে বাধ্য হ'য়েছেন, তাঁর দেহ

আনত, বদন বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, মুখমণ্ডল রক্ত-রাঙা, মুখ বাক্যহারা, সর্ব্বাঙ্গে অন্তর্ব্বেদনার স্বেদবিন্দু ঝরছে। মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি বুঝছিলেন শ্রদ্ধেয় এই শিক্ষক তাঁকে নির্ব্বোধ বালকের সঙ্গেই তুলনা করেছেন, এবং সম্ভবত নির্ব্বোধ বলেই ধরেছেন, কিন্তু শত চেষ্টা করে-ও তিনি যোগ্য উত্তর খুঁজে পেলেন না; ক্ষোভে ব্যর্থতায় তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে পড়েন।

শেষ পর্য্যন্ত, কথা কইবার শক্তি হ'লে অস্ফুটস্বরে বললেন, "হে শ্রদ্ধার্হ, এ সকল কথাই কি আপনি প্রভু পূর্ণাত্মা বুদ্ধদেবের মুখ হতে শুনেছেন?"

পূর্ণাত্মারা কদাচিৎ হাসেন। এক্ষেত্রে কিন্তু প্রভুর অধরে হাসি খেলে গেল। বললেন—"না, ভাই, শুনেছি এমন তো বলতে পারিনে।"

এই উত্তর শুনে পরিব্রাজক কামনীত দেহে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন, মেরুদণ্ড সবল হ'ল, মুখে স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে এল; অতি উৎসাহে বলে উঠলেন—

"ঠিক ধরেছি আমি। আমি স্থির জানি, এ প্রভুর উপদেশ হতেই পারে না; এ সব আপনার নিজস্ব যন্ত্রণাময় ভাষ্য, ভুল বুঝে মনগড়া ভাষ্য করেছেন। শোনেননি কি যে, বুদ্ধের বাণী আদিতে আনন্দস্বরূপ মধ্যে আনন্দস্বরূপ, অন্তে আনন্দস্বরূপ। প্রভুর ধর্ম্মোপদেশ অসীমআনন্দের সংবাদ না দিলে, তার মতবাদকে আনন্দময় বলে লোকে কখনও বর্ণনা করে? যাহ'ক আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি, শিশু যেমন মাতৃবক্ষ হ'তে সুধা আহরণ করে, তেমনি তাঁর চরণ তলে বসে তাঁর শ্রীমুখ হতে অসীম আনন্দময় মোক্ষের বাণী শুনব। আপনিও সেখানে উপস্থিত থাকলে সত্য-শিক্ষা লাভ করবেন; তাহলে আপনার এই ভ্রমাত্মক ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক মতবাদের অবসান হবে। এদিকে, জ্যোৎস্না যে চতুষ্কাষ্ঠ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেছে, বোধ হয় অনেক রাত্রি হয়েছে। এখন তাহলে ঘুমোন যাক কী বলুন।" করুণাস্নিগ্ধস্বরে প্রভু বললেন, "যেমন আপনার অভিরুচি।" বলে বেশ সংযত করে নিয়ে সিংহের ভঙ্গীতে আসনে শয়ন করলেন, ঊর্দ্ধদেহ রইল দক্ষিণ বাহুর উপর, বামপদ দক্ষিণ পদের উপর।

জাগরণের ক্ষণটী মনে ক'রে নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

●

আগামী বৈশাখ সংখ্যায়

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ **'সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন'**। এতদ্ব্যতীত কথাসাহিত্যিক শ্রীসুবোধ বসুর নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস **'ঊর্দ্ধমুখী'** ও শ্রীযতীশ বেদজ্ঞ অনূদিত আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস **'অয়েল'**। তৎসঙ্গে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার সেন, ওঙ্কারনাথ গুপ্ত প্রভৃতির মনোজ্ঞ গল্প, কবিতা, ভারতীয় ও বৈদেশিক আলোচনা, নানা সচিত্র কাহিনী এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন তথ্য ও ভাষণে সংখ্যাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইবে।

ভারত-মহীয়সী সরোজিনী নাইডু

S... P. G. A. COMMON-RO...

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পিতা ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি নিজামের সাহায্যে হায়দ্রাবাদে 'নিজাম কলেজ' স্থাপন করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ উহার অধ্যক্ষতা করেন। হায়দ্রাবাদই ছিল তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থল। এইখানেই ১৮৭৯ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারী সরোজিনীর জন্ম হয়। তাঁহাদের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার ব্রাহ্মণ-গাঁও গ্রামে। সরোজিনী দেবীর মাতা বরদাসুন্দরী দেবী বিশেষ কাব্য-প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। পিতার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবত্তা ও মাতার কাব্য-ধারা একত্রে সংযুক্ত-ক্রিয়া ঘটাইয়াছিল মেয়ের মধ্যে। শুধু সরোজিনীই ন'ন, তাঁহার অন্যান্য ভাইবোনদের মধ্যেও পিতা-মাতার প্রভাব একই ভাবে বিস্তার লাভ করে। বোনদের মধ্যে শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী কেম্ব্রিজে শিক্ষা লাভ করেন এবং শ্রীযুক্তা সুনলিনী দেবী একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী; ভাইদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী সংগঠন ও ধীশক্তির জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাতিমান, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবি ও শিল্পী হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, এবং তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শিশুকাল হইতেই সরোজিনী অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্না ছিলেন। অত্যন্ত অল্প বয়সেই নিজের কাব্যস্ফুরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এগার বৎসর বয়সে আমি বীজ-গণিতে একটি অঙ্ক কষিবার সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিলাম; কিন্তু সমস্যাসমাধানে অক্ষম হইলেও আমার কলমের আঁচড় হইতে অকস্মাৎ একটি কবিতার জন্ম হইল।'—এই ভাবেই সরোজিনীর প্রথম কাব্যবিকাশ। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিলাতে পাঠানো হয়। যথাক্রমে তিনি লণ্ডনের কিংস্ কলেজ এবং পরে কেম্ব্রিজের গার্টন কলেজে যোগ দেন। ১৬ হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিলাতে অধ্যয়ন করেন। কেম্ব্রিজে তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ছাত্রী। ঐ বয়সেই বিলাতে তাঁহার কবিখ্যাতি ঘটে। তাঁহার 'গোল্ডেন থ্রেসহোল্ড' ও 'বার্ড অব ফেম' গ্রন্থ দুইখানি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তাঁহার আর একখানি কাব্যগ্রন্থ 'দি ব্রোকেন উইং' রচিত হয় ১৯১৭ সালে। তৎপূর্ব্বে ১৯১৪ সালে তিনি 'রয়াল সোসাইটি অব লিটারেচার'-এর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সরোজিনীকে বলা হইত ভারতের বুলবুল বা 'নাইটিঙ্গেল অব ইণ্ডিয়া।' কিন্তু এখন হইতেই তিনি কাব্যজীবন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্ত্তে।

সরোজিনী নাইডু

ডাঃ গোবিন্দ বরদারাজুল নাইডুর সঙ্গে ১৯ বৎসর বয়সে সরোজিনী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ডাঃ নাইডু মদ্রদেশীয় এবং অব্রাহ্মণ। তিনি হায়দ্রাবাদ গভর্ণমেন্টের চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তা এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক। সরোজিনীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা: জয়সূর্য্য, পদ্মজা, রণধীর ও নীলমনি। দেশবন্ধুর জীবনে যেমন দেখিতে পাই—তাঁহার কাব্যসাধনাই একসময় উদ্বোধিত করিল তাঁহাকে জাতীয় চেতনায়, সরোজিনীর জীবনও তেম্‌নি। তাঁহার কবিজীবন ক্রমে রাজনৈতিক জীবনে রূপান্তরিত হইল। ভারতবাসীর দৈন্য দুঃখ হাহাকারে শাসক ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রথম পদক্ষেপেই শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত-প্রবর্ত্তিত হোমরুল আন্দোলনে তিনি যোগদান করিলেন। ১৯১৯ সালে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ডেলিগেট হিসাবে অধিবেশনে যোগদান করিতে দেখি; উক্ত অধিবেশনেই তিনি স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পুরুষের ন্যায় নারীকেও যে স্বরাজ-সংগ্রামে সমভাবেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, ভারতীয় নারী-সমাজের মধ্যে সেই চেতনার উদ্বোধন করেন সরোজিনী নাইডুই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আচার আচরণ দ্বারা মুসলমান সমাজেরও বিশেষ আস্থাভাজন হন। সরোজিনীর ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর নারীর পরিচয় তদানিন্তন কালে বড়বেশী দেখা যায় না। তাঁহার সম্পর্কে মৌলানা সৌকত আলীর মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: 'শ্রীমতী নাইডুর উপর মুসলমানদের যেরূপ অগাধ বিশ্বাস, এরূপ আর কাহারও উপর নয়।'

নারী-শক্তি যে জাতির শ্রেষ্ঠ শক্তি, এ কথা নিজের জীবন দিয়া তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন দেশবাসীর কাছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ নারীরূপে আজ তিনি সম্মানিত ও অভিনন্দিত এবং কংগ্রেস-ভারতের কাছে মাতারূপে তিনি পূজিত।

১৯২৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া ভারতবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার কথা সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করেন এবং সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া ২৯সালের জুলাই মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৎসরই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মাজী ও আব্বাস তায়েবজী পুলিশের হাতে ধৃত হইলে সরোজিনীর উপরই কার্য্যপরিচালনার দায়িত্ব পড়ে, কিন্তু যে মাসে দর্শনায় লবণগোলায় অভিযান কালে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘ ৯ মাস তিনি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পর ১৯৩২ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ভারতের নারীসমাজের প্রতিনিধিরূপে সরোজিনী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দান করেন। ভারতে প্রত্যাগমনের পর ১৯৪০ সালে তাঁহাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়, কিন্তু আকস্মিক স্বাস্থ্যহানীর জন্য দশ দিন পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। আগষ্ট আন্দোলনের আগে পর্য্যন্ত সরোজিনীর জীবনের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। অতঃপর ইতিহাসখ্যাত কংগ্রেসের আগষ্ট আন্দোলন। ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট। কিন্তু এবারও শারীরিক অসুস্থতার দরুন ১৯৪৩ সালের ২১ শে মার্চ্চ তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস বৃটিশ কেবিনেট মিশনের সহিত কংগ্রেসের আলোচনা, কংগ্রেসের গণপরিষদ গঠন, ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ইতিহাস। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন-দিবসে সরোজিনীর তেজোদৃপ্ত ভাষণ ভারতবাসী মাত্রেরই চিরদিন স্মৃতিপটে জাগরিত থাকিবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীযুক্তা নাইডু যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে নারী-জীবনের এই সম্মানসূচক পদলাভ সম্ভবতঃ এই প্রথম দৃষ্ট হইল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ৭০ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে দেশবাসী তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করে এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক তিনি 'ডক্টর অব ল' উপাধীতে ভূষিত হন। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পরিচালক মণ্ডলীর তিনি অন্যতম সদস্যা ও সভানেত্রী ছিলেন।

এই অসমান্যা মাতৃসমা মহীয়সী মহিলা গত ২রা মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ গভর্ণর-প্যালেসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র জাতি যে কতখানি শোকসাগরে নিমজ্জিত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত।

সম্পাদকীয়

মুক্তি-যজ্ঞের প্রধান হোত্রী সরোজিনী নাইডু

বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবনদের আরেকটির অবসান ঘটিল। গত ২রা মার্চ্চ রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকায় স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা গভর্ণর সরোজিনী নাইডুর হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর।

সরোজিনী বাংলার মেয়ে। গত ত্রিশ বৎসর হইতে ভারতের রাজনীতি যে-আদর্শ পূরণের জন্ত বিপুল বিপর্য্যয়ের মধ্যে অরত্তিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে যে আদর্শ অংশত পূরিত হইয়াছে—সরোজিনী দেবী ছিলেন আমাদের সেই সংগ্রামশীল আদর্শের একজন প্রধান ঋত্বিক। আমাদের গত ত্রিশ বৎসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি ভারতীয় নারীর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন—তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় সেই প্রতিটি আন্দোলনই বৃহত্তর বিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয়া সরোজিনীর কিন্তু ইহার চেয়ে বড় পরিচয় ছিল—তিনি ছিলেন প্রভূত প্রতিভাশালিনী কবি। যে যে দেশে ইংরাজি সাহিত্য সমাদৃত, সেই সেই দেশেরই কৃষ্টিমণ্ডল সরোজিনী দেবীকে জানেন গীতি-কবিতার একজন অদ্ভুত সংবেদনশীল শিল্পী হিসাবে। ষোল বৎসর বয়সে সরোজিনী ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষালাভের জন্ত গিয়াছিলেন—ইংলণ্ডের পাঠক-গোষ্ঠী তখন হইতে সরোজিনীর এই শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবাসীরা তাঁহার এই সংবেদনশীল কবি-মনের পরিচয় পাইয়াছে—তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সকল ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন প্রচেষ্টায় এমন কি তাঁহার দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের আলাপ-আলোচনার প্রতিটি ক্ষেত্রেও। রাজ-নীতির শুষ্ক তত্ত্বকে কবি-মনের রূপায়নে তিনি জীবনের সহিত সম্পৃক্ত করিবার সন্ধান দিয়াছিলেন।

বাগ্মিতার প্রতিভাও শ্রদ্ধেয়া সরোজিনীর ছিল অতুলনীয়। তিনি ভাষণ করিতেন তথাকথিত ভারিক্কী রাজনীতিবিদদের তত্ত্বভারাক্রান্ত বক্তৃতার মত নয়, সহজ সহৃদয়ভঙ্গীতে। তিনি তাঁহার সমস্ত অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়টিকেই যেন তাঁহার শ্রোতাদের অনুভূতির কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেন—শ্রোতারা সেই সহৃদয়তার সংস্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত যেন আকুল সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে তাঁহার শোকোদ্বেল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বাণীটি এখনও আমাদের কাণে গুঞ্জরিত হইতেছে—

"The time is over for private sorrows. The time is over for beating of breasts and the tearing of hair. The time is here and now to stand up and say: 'WE TAKE UP THE CHALLENGE WITH THOSE WHO DEFIED MAHATMA GANDHI.' * * My father, do not rest, do not rest. Keep us to our pledge, Give us the strength to fulfil our promise, your heirs, your descendants, your students, guardians of your dreams, fulfillers of India's destiny."

জাতির পিতার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্তে বীরাঙ্গনা সরোজিনী যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমরাও বীরাঙ্গণার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্তে সেই কথাই পুনরুচ্চারণ করিয়া বলি—"শান্ত হইয়ো না, শান্ত হইয়ো না হে মহীয়সী—'আমাদের প্রতিজ্ঞা পালনের জন্ত তোমার স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্ত, ভারতের ভাগ্য পূর্ণ করিবার জন্ত আমাদের তুমি শক্তি দাও, আমাদের অবিচল রাখো।"

দমদম রাহাজানির শিক্ষা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দমদম হইতে বসিরহাট পর্য্যন্ত এই ৩৫মাইল ব্যাপী অঞ্চলে একদল অবিমৃষ্যকারী যুবক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে গোলাগুলি, এবং খুন জখমের রাহাজানিটা করিল—ভারতের উপস্থিত রাজনীতির সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকেই সেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনাটি হইতে অনেক কিছু বিষয়েরই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমেই পরিচ্ছন্ন বাস্তবানুগ দৃষ্টি দিয়া ঘটনাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে ভারতের সাধারণ অধিবাসীকে। কিসের জন্য, কাহাদের স্বার্থে এই বিপথচালিত যুবকের দল এই শোচনীয় হঠকারিতায় আশ্রয় লইল? প্রকাশ যে, এই দিনের দুর্ঘটনায় বহুলোক গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে, তিন জন মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি কোন আদর্শেরই পরিপোষক? কেবল বিবেচনাহীন ও বর্ব্বরোচিত রক্তোন্মত্ততা ব্যতীত এ প্রশ্নের তো আমরা আর কোনো সন্তোষজনক উত্তরই পাইতেছি না। কোনো সংবাদপত্রের পাঠকদের দ্বারা লিখিত পত্রে অস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা মন্তব্য করার চেষ্টা হইয়াছে যে, ইহা আদর্শচ্যুত কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের একাংশের বিক্ষোভোচ্ছ্বাস। আলোচনার খাতিরে সপ্রতিবাদে কথাটি না হয় স্বীকার করিয়া নেওয়া গেল। কিন্তু আদর্শচ্যুতকে আদর্শনিষ্ঠ করিবার ইহাই কি পন্থা? ভারতের পক্ষে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল সক্রিয়তা। কিন্তু দানবীয় উশৃঙ্খলতা দিয়া স্বাধীন জীবনাদর্শের শৃঙ্খলাকে লাভ করা গিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠায় ইহার সাক্ষ্য আছে? পক্ষান্তরে জগতেতিহাস এই কথাই বার বার প্রমাণ করিয়াছে যে, একটা নীতির পুনর্গঠনের প্রস্তুতির সময় এই জাতীয় বিবেচনাহীন উশৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়াতেই সকল স্বাধীনতাবিরোধী ও যথেচ্ছচারী একনায়কত্বেরই আত্মপ্রকাশ ঘটে—প্রমাণ ফরাসী বিপ্লবোত্তর নেপোলিয়ন, প্রমাণ প্রথম যুদ্ধোত্তর জার্ম্মানীর হিটলার। দমদম রাহাজানির মত অবিমৃষ্যকারিতা ভারতে অধিক ঘটিতে থাকিলে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং কৃষক মজুর প্রজারাজের জন্য আমরা ভারতীয় জনসাধারণ উদগ্রীব হইয়া আছি, সেই স্বাধীনতা সেই সাম্যসমাজ লাভ করিবার পথ বহুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে, ভারতের কৃষক মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একথা জানিয়া রাখিতে হইবে। দমদম রাহাজানির অনুষ্ঠাতা যাহারা, তাহারা ভারতীয় গণসমাজের বন্ধু নয়, তাহারা গণস্বার্থের আততায়ী।

এই রাহাজানি হইতে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেন্টের পক্ষেও একাধিক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। গভর্ণমেন্ট এ ব্যাপারটিকে শুধু কমিউনিষ্ট চক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত করিয়াই এবং দেশে দৃঢ়তর নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়াই যেন সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা অবশ্য ইহাতে কিছু আছে। কিন্তু মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে যে-ভারতবর্ষে, আমরা দেখিয়াছি; আপামর জনসাধারণই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ বিরোধিতায় সতত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে, সেই ভারতবর্ষেই আজ কেন কমিউনিষ্টদের প্রভাব এতখানি ব্যাপক? জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্য যদি উপশমিত না হয়, তবে যত বিভ্রান্তকরই হোক না কেন, কমিউনিষ্টদের নীতিদ্বারা জনসাধারণ প্রভাবান্বিত হইবেই।—জলহীন মরুভূমিতে মরীচিকার লোভে পথভ্রান্ত হওয়া প্রকৃতিরই নিয়ম। ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে এই মরীচিকার দ্বারা বিপথচালিত হইবার সম্ভাবনা যদি দেখা দিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে জনসাধারণ মরুক্লিষ্ট হইয়াছে—মরীচিকার আত্মহত্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে তৃষানিবৃত্তির উপাদান জোগাইতে হইবে। কেবলই মরীচিকাকে অভিযুক্ত করিলে চলিবে না।

বিপদমুক্ত ভারতীয় রেল

গত কয়েক মাস হইতে ভারতের দশ লক্ষ রেল-কর্ম্মচারী নিজেদের অপূর্ণ অভাব অভিযোগ মিটাইবার দাবীতে যে ভারত, ব্যাপী ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতে-

ছিলেন, সেই ধর্ম্মঘটকে একাধিক সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আপাতত কিছুকালের জন্য প্রতিহত করা সম্ভব হইয়াছে। এই সুযোগকে প্রত্যাহৃত করিবার মূলে ... চেয়ে বড় ভূমিকা রহিয়াছে—সম্ভাবিত ধর্ম্মঘটের প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিল যে রেলকর্ম্মচারীদের প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান, সেই রেলওয়ে মেন্‌স্ ফেডারেশনই। ইতিপূর্ব্বে ষ্ট্রাইক ব্যালট দ্বারা প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী চরম বিবেচনার সময় ফেডারেশনের কাউন্সিল সকল দিক বিচার করিয়া পূর্ব্বগৃহীত সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কমিউনিষ্টদের প্রভাবযুক্ত কয়েকটি ইউনিয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়াই গত ৯ই মার্চ্চ আংশিক ধর্ম্মঘটের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল ধর্ম্মঘট পালনই এই ইউনিয়নকয়টির উদ্দেশ্য ছিল না, ইহারা ভারতের একটি রাজনৈতিক দলের গূঢ় রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের অপচেষ্টাতেই প্ররোচিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই ভারতসরকার কর্ত্তৃক যথোচিত সাবধানতা অবলম্বিত হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের সে অপচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে।

আমরা রেলকর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের সমর্থক ছিলাম না। কিন্তু তাই বলিয়া একথাও আমরা আবার বলিনা যে রেলকর্ম্মচারীদের অসন্তোষের মূল কারণটিই ভিত্তিহীন বা অন্যায়জনক ছিল। একদিকে আয় ও টাকার ক্রয়ক্ষমতা এবং অন্যদিকে প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যমানের যে নিদারুণ অসঙ্গতি বর্ত্তমান ভারতের গোটা অর্থনীতিকেই বিপর্য্যয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতের শতকরা নব্বইজন অধিবাসীর মত রেলকর্ম্মচারীরাও সেই বিপর্য্যয় হইতে কিছুমাত্র মুক্ত নয়। তথাপি আমরা তাহাদের ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে পারি নাই এই কারণে যে, এই ধর্ম্মঘটের দ্বারা বর্ত্তমান ভারতের আর্থনীতিক বিপর্য্যয়ের সমাধানের নিকটতম সম্ভাবনা তো ছিলই না, অধিকন্তু এতদ্বারা ভারতে অনপনেয় আর্থনীতিক অরাজকতা সৃষ্টি হইবারই সম্ভাবনা ছিল। ভারতের স্বদেশজাত এবং বিদেশ হইতে আগত সমুদয় পণ্যেরই বণ্টনের বাহন একমাত্র এই রেলওয়ে; প্রয়োজনানুযায়ী না হইলেও যেটুকু আহার্য্য এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র এক্ষণে আমরা পাইতেছি, সেটুকুও আমাদের হাতের মধ্যে আসিয়া পৌছাইতে পারিতেছে রেলওয়ে চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকার জন্যই। সেই রেলওয়েতে ধর্ম্মঘট হইলে ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে যখন প্রতিদিনের এই অপর্য্যাপ্ত প্রাপ্যবস্তুটুকু লাভ করাও অসম্ভব হইত, তখন ভারতব্যাপী অনশনকে রোধ করা যাইত কোন্ উপায়ে? তাহাছাড়া পণ্যদ্রব্যের যে মূল্যমানের সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ তাহাদের বেতনের এবং মাগ্‌গি ভাতার বর্দ্ধিতহারের দাবীতে ধর্ম্মঘটের আশ্রয় লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদের বেতনের অথবা মাগ্‌গী ভাতার সেই হার বর্দ্ধিত হইলেই কি শেষ পর্য্যন্ত প্রার্থিত মূল্যমানের সমতা রক্ষিত হইত? অর্থনীতির প্রাথমিক শিক্ষানবিশীও এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই দিবেন। ভারতে টাকার ক্রয়ক্ষমতার সহিত পণ্যমূল্যের যে অসমতা, তাহার একমাত্র কারণ পণ্যেরই স্বল্পতা—এই স্বল্পতাই বর্ত্তমান ভারতীয় অর্থনীতির মূল ব্যাধি। এই ব্যাধির উপশম না করিলে, গৌণ উপসর্গগুলিকে চাপা দিয়া কয়দিন ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে?

রেলওয়ে বাজেট

ভারতীয় রেলওয়ে পরিচালনার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিবার ন্যায়তঃ অধিকার কাহারও যদি থাকে তো সে অধিকার আমাদের—আমরা যাহারা ভারতের মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং বিত্তহীন শ্রেণী,—যাহারা প্রত্যহ চাকুরিস্থলে যাইবার জন্য, দূরের নিজগ্রামস্থ স্বজন-পরিবারবর্গের কাছে যাইবার জন্য প্রতিনিয়তই তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করি, এবং নরকসদৃশ তৃতীয় শ্রেণীতেও ঠাঁই না হইলে ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া যাই। কথাটি মনে হইতেছে, সেদিন ভারতীয় পার্লামেন্টে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার স্বাধীন ভারতের তৃতীয় রেলওয়ে বাজেটরূপে রেলওয়ে পরিচালনার আয়

ব্যয়ের যে তালিকাটি পেশ করিয়াছেন, সেটি আদ্যন্ত পাঠ করিবার পর। এবারকার রেলওয়ে বাজেটে নাকি ১৫'৮৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

রেলওয়ে বাজেটের এই বিপুল উদ্বৃত্তের পরিমাণ দেখিয়া মনে হয় উচ্চতম সরকারী মহলের সকলেই বেশ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু গত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল হইতে দেশবাসী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কাছে রেলের তৃতীয় শ্রেণীগুলির অবস্থা উন্নয়নের যে দাবী শুনিয়া আসিতেছে —উক্ত উদ্বৃত্ত বাজেটে দেশবাসী সেই দাবীপূরণের প্রতিশ্রুতি পাইল কই? তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যে জান্তব পরিবেশের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং; সেই প্রতিবাদকে সতত স্বপ্রকাশ রাখিবার জন্যই মৃত্যুর আগের ভ্রমণটি পর্য্যন্ত সেই মহাঋষি ভারতীয় রেলের তৃতীয় শ্রেণীতেই যাতায়াত করিয়াছিলেন। অধুনা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উক্ত জান্তব পরিবেশের আরো অবনতি হইয়াছে; কেবল তাই নয়, অর্থের বিনিময়েও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্থানাভাবে যে ফুটবোর্ডে আশ্রয় লইতে হইতেছে সেটা তো রীতিমত আত্মহত্যারই নামান্তর।... কিন্তু অনন্যগতি হইয়া আমাদের সেই আত্মহত্যার নিশ্চিত পথকেও অগ্রাহ্য করিতে হয়। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর সেই আত্মহত্যার পথ বন্ধ করিবেন কবে?

বিবৃতি-সর্ব্বস্ব পরিকল্পনার দিক হইতে অবশ্য রেল-কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত তৃতীয়শ্রেণীর দুরবস্থা নিরসনের সরকারী প্রচেষ্টা বহু করিতেছেন। "ভ্রমণ কমান", "হাল্কা হইয়া যাতায়াত করুন", "ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া জীবন বিপন্ন করিবেন না"—প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের বাহুল্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এবং যেকোনো রেলওয়ে ষ্টেশনেই তারস্বরে আত্মপ্রচার করিবে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের এই নির্দ্দেশই ফলপ্রসূ করিবার চেষ্টা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ স্বয়ং কতখানি করেন? যাত্রীদিগকে উপযুক্ত বসিবার স্থানের অধিক টিকিট যথেষ্টভাবে দেওয়া হয় বলিয়াই তো তাহারা স্থান না পাইয়া অবশেষে ফুটবোর্ডের আশ্রয় লয়। এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় চলাচলের জন্য ভারতের মৃত্যুসংখ্যাও অল্প নয়। প্রায়ই সংবাদপত্রে এই জাতীয় মৃত্যুর শোচনীয় সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রকারান্তরে কর্ত্তৃপক্ষই কি স্বয়ং এই মৃত্যুর জন্য দায়ী নহেন? তৃতীয় শ্রেণীতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, জলপান ও স্নানাদির ব্যবস্থা এবং রাত্রের জন্য নিদ্রা-কামরার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া জল্পনা-কল্পনা তো সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমল হইতেই শুনিতেছি। কিন্তু কবে এই জল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে?

বাজেট প্রস্তাবে দেখিলাম যে, ভারতীয় রেলওয়েকে বিস্তৃততর ভাবে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য অনতিবিলম্বেই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে দুই শতাধিক এঞ্জিন আনয়নের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে; এঞ্জিনগুলি আসিয়া পড়িলে শীঘ্রই অনেকগুলি অচল বগি আবার সচল হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই সচলতার পরিকল্পনা কি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘব করিবার জন্য না রেল-ওয়ে বাজেটে স্ফীততর উদ্বৃত্ত লাভের জন্য?

কেন্দ্রীয় বাজেট

১৯৪৮-৪৯ সালের আয়-ব্যয়ের জন্য ভারতের অর্থ-সচীব ডাঃ জন মাথাই ভারতীয় পার্লামেন্টে যে বাজেটটি পেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সকল উল্লেখ-যোগ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যরাই। বৃটীশ আমলে কংগ্রেসী সদস্যরা ভারতীয় বাজেটের যে-ভাষায় সমালোচনা করিতেন, শুনিতে আশ্চর্য্য লাগিলেও অবিকল প্রায় সেই ভাষাতেই তাঁহারা এবারকার বাজেটেরও আলোচনা করিয়াছেন; এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহারা এই বাজেটের নাম দিয়াছেন richmen's budget। বিশেষণটি অনুপযুক্ত হয় নাই; ধনীসমাজ ডাঃ মাথাইয়ের বাজেটে অবিমিশ্র সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাজেট প্রস্তাবটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে উক্ত প্রতিবাদকারীদের যুক্তিকে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়াই মনে হয়। মূল বাজেটানুসারে গতবৎসরে চলতিবৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ণয়ের কালে অনুমান করা হইয়া-ছিল যে, বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ রাজস্বখাতে আয়

হইবে ২৫৫ কোটি টাকা এবং দেশের সর্ববিধ প্রয়োজনে ব্যয় হইবে ২৫৭ কোটি; কিন্তু কার্য্যতঃ এ বৎসরে রাজস্বখাতে আয়ের পরিমাণ ৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও হিসাবে কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত আকাঙ্খিত উদ্বৃত্তটি ঘটিতে পারে নাই, প্রায় অঙ্কের এক কারণেই ব্যয়ের পরিমাণও ৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থসচীব মহাশয় বলিয়াছেন যে, দেশ বিভাগজনিত বিপর্য্যয় হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য এবং শিশুরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই এই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তাঁহার যুক্তির মর্ম্মার্থটি হইল অনেকটা এইরূপ যে, দেশবাসীকে উপযুক্ত অন্নবস্ত্র দানের ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত রাখা চলে, কিন্তু বিপন্ন শিশুরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থায় একদণ্ড বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ। এই হেতুই মূল আয়ের প্রায় অর্দ্ধেকটাই তিনি সামরিক ব্যয়ের খাতে ধার্য্য করিয়াছেন; এবং বাকি অর্দ্ধেকের বড় ভাগটাই বরাদ্দ করিয়াছেন বেসামরিক শাসন বিভাগের কর্ম্মপরিচালনার জন্য। এবং বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৃটীশ আমলে বেসামরিক শাসন বিভাগের জন্য যত ব্যয় হইত, স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই খাতেই অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইবে। বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবাসী কিসের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল?

কেবলমাত্র ১৯৪৯-৫০ আর্থিক বৎসরেরই মূল আয়ের তুলনায় ১৪.৭৯ কোটি টাকা ঘাটতির হিসাব ছিল, কিন্তু অর্থসচীব মহাশয়ের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের ফলে বিভিন্ন পরোক্ষ কর প্রবর্ত্তনের দরুণ শেষপর্য্যন্ত সেই আশঙ্কিত ঘাটতিই পূরিত হইয়া উপরন্তু ৪৫ লক্ষ টাকার মত উদ্বৃত্তই হইবে। অবশ্য এই পরোক্ষ করপ্রথার সমস্ত ভারই গিয়া পড়িবে দেশের সাধারণ ছাপোষা অধিবাসীদেরই স্কন্ধে—(খাম ও পোষ্টকার্ডের দর বৃদ্ধির দরুণ, বস্ত্রের উপরে উৎপাদন কর দরুণ, চিনি ও সুপারির উপরে নূতন শুল্ক ধার্য্য করার খাতে)। কিন্তু তাহাতে কি? দেশের সর্ববিধ মঙ্গলামঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব তো সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ছাপোষা দেশবাসীরই, কাজেই সেই দেশরক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিবারও দায়িত্ব তাহাদেরই ভগ্নপ্রায় স্কন্ধ ব্যতীত আর কিসের উপরে আরোপিত হইতে পারে? পক্ষান্তরে ভারতের ধনী সম্প্রদায় অতি-মুষ্টিমেয়, দেশের ভালমন্দ দেখিবার দায়িত্বও তাহাদের অল্প; এই কারণে ডাঃ মাথাই এবারে যতগুলি কর লাঘব করিয়াছেন সেগুলি ধনী সমাজেরই করিয়াছেন। ধনীর ঘৃণ্য অর্থে তিনি দরিদ্র ভারতের পালনকার্য্য গ্রহণ করিবেন, এমন অবিচার কি তিনি সহ্য করিতে পারেন?

ধনীসমাজ বলিতেও কিন্তু অত্যুচ্চ বিত্তের অধিকারী কতিপয় বৃহৎ পুঁজিদারদেরই বুঝিতে হইবে; ডাঃ মাথাই কৃত এ বৎসরের বাজেট শুধু এই অঙ্গুলিমেয় বৃহত্তদেরই প্রীত করিতে পারিয়াছে। ইহারা ব্যতীত ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সাধারণ লৌকিক ভাষায় 'বড় লোক' নামে যে বৃহত্তর শ্রেণী রহিয়াছেন—যাঁহারা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসাদার, উচ্চ চাকুরিজীবি—এই শ্রেণীটিও কিন্তু এ বৎসরের বাজেটে তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ব্যবসায়ী শ্রেণী ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন অতিরিক্ত পরোক্ষ করভার ও শুল্ক প্রবর্ত্তনের ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুণ বাজার-পণ্যের বেচা-কেনারও পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া; তাছাড়া capital gain tax প্রভৃতি যে সব কর লাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, উক্ত শ্রেণী সেই সব ব্যাপারেও তেমন কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত হন নাই। চাকুরিজীবী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দশাও এইরূপ—পরোক্ষ করবৃদ্ধির ফলে তাঁহাদেরও কেবল ব্যয়বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ভারতের এই মাঝারি ধনী শ্রেণী অসন্তুষ্ট হওয়ায় ভারতসরকারকে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশের পুনর্গঠন মূলক পরিকল্পনাগুলির জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ এই মাঝারি ধনীরাই 'সরকারী ঋণের' সূত্রে জোগান দেন, কিন্তু অপ্রীত এই শ্রেণীর কাছে সেই ঋণ এ বছরে তেমন পাওয়া যাইবে না। ফলে ভারত সরকার যে সব পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি হাতে নিয়াছিলেন, সেগুলি বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে অসম্পূর্ণই থাকিবে।

ডাঃ মাথাই তাঁহার স্বকৃত প্রস্তাবের সমর্থনে বহুবিধ যুক্তি পেশ করিয়া প্রতিবাদীদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার এই বাজেট ভারতের মুদ্রাস্ফীতিকে যাস্তেল

করিবার জন্তই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠায় একাধিকবার আমরা বলিয়াছি যে, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের একমাত্র উপায় দেশের যাবতীয় উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। ইহা ব্যতীত অন্তসব ব্যবস্থাই ঘটিতে করিয়া বন্যার জল নিষ্কাষণের প্রচেষ্টার মত পণ্ডশ্রম।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেস ও আচার্য্য কৃপালনি

এ বৎসরের বাজেট-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন যিনি, তিনি কোনো উগ্র-মস্তিষ্ক বামপন্থী নেতা নন, তিনি আচার্য্য জে. বি. কৃপালনি। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী জ্যেষ্ঠদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কতখানি তাহা খুলিয়া বলিতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই চরম বাহুল্য দোষে অভিযুক্ত হইব। কৃপালনিজীর বাজেট সম্পর্কিত পার্লামেন্টীয় ভাষণটি নানাদিক হইতেই উল্লেখনীয় এবং প্রণিধানযোগ্য। দেশ শাসনের ক্ষমতা লাভ করিয়া কংগ্রেসের কর্ম্মনীতি আজ কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কৃপালনিজীর বিবৃতির মধ্যে সেই কথাটিই সব চেয়ে স্পষ্টরেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই উক্ত ভাষণটির কিয়দংশ আমরা আমাদের পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আচার্য্য কৃপালনি মুখ্যতঃ বলিয়াছেন :

'ডাঃ মাথাই যে-বাজেটটি আমাদের উপহার দিয়াছেন তজ্জন্ম মাথাই সাহেবের প্রতি কোনো দোষারোপ করা অসমীচীন; বর্ত্তমানে আমরা যে-পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাতে ডাঃ মাথাইয়ের পক্ষে অন্তরূপ বাজেট করা সম্ভব কোথায়? সম্প্রতি আমাদের জাতীয় সরকার তাঁহাদের বিভিন্ন মুখপাত্রের দ্বারা স্পষ্টাস্পষ্টিই ঘোষণা করিয়াছেন যে, স্বাধীন ভারতে কোনো ক্রমেই পুঁজিপতিদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান ভাগ্য-বিধাতা যাঁহারা, তাঁহারা একদিন ঠিক এমনি করিয়াই সাধারণ ভারতবাসীকেও আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু জনগণের প্রতি তাঁহাদের এই আশ্বাস বৃদ্ধ পুরাতন, ১৯ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে এই আশ্বাস উচ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের নূতন জাতীয় সরকার সেই সব পুরাতন বিষয় লইয়া এক্ষণে মাথা ঘামাইবেন কেমন করিয়া? নূতন ভাবে যাহাদের নূতন আশ্বাস তাঁহারা দিয়াছেন, আমাদের মন্ত্রীবর্গ এক্ষণে সেই আশ্বাস পালনেই ব্যস্ত আছেন। ডাঃ মাথাইয়ের বাজেটে সেই নূতন প্রতিশ্রুতি পালনেরই নির্দ্দেশ আছে।

'স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতেই মন্ত্রীরা দেশের সর্ব্বাধিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা করিতেছেন, অবশ্য যদিও সে সব পরিকল্পনা বক্তৃতার পরিধি ছাড়াইয়া অধিকদূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

'আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক্ষণে আমাদের কত সম্মান! আমরা স্বরাজ লাভ করিয়াছি এই আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রেই, স্বদেশে ঠিক নয়। বহির্বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই আমাদের রাষ্ট্রদূতেরা নিয়োজিত হইয়াছেন। শুনিতে পাই—সে দূতাবাসগুলি চালাইবার জন্য ভারতের যে পরিমাণ ব্যয় হয়, ভারতীয় করদাতাদের পক্ষে ততখানি অর্থ দেওয়া সুসাধ্য নয়। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়—রাষ্ট্রদূতদের প্রেষ্টিজ রক্ষা না করিতে পারিলে আমরা বিশ্বশান্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইব কিরূপে? জনগণ চুলায় যাক, রাষ্ট্রদূতদের প্রেষ্টিজ রাখিতে পারিয়াছি বলিয়াই না আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের এত কদর! তা ছাড়া ইউ. এন. ও'র সম্মানও আমরা কতভাবে বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিতেছি। কাশ্মীরে আমরা যাহা করিয়াছি তাহা নিতান্তই ঘরোয়া পুলিশ-ব্যবস্থা। কারণ কাশ্মীরের জনতা এবং শাসনকর্ত্তা উভয়েই আইনতঃ ভারতের আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তবু উনোর প্রতি বোধ হয় যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনের জন্যই এই ঘরের ব্যাপারটিকেই আমরা পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

'বৃটীশ শাসকরা ভারত শাসনের জন্য 'ষ্টীল ফ্রেম' রচনা করিয়াছিল। আমাদের জাতীয় শাসকরাও সেই বৃটীশসৃষ্ট 'ষ্টীল ফ্রেমেরই' শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ষ্টীল ফ্রেমের ষ্টীলটুকুতে ইতিমধ্যে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। এক্ষণে শাসন বিভাগের সর্ব্বত্রই শুধু অনাচার আর দুর্নীতি। হাটে-বাজারে যেখানেই কান পাতি, সেখানেই

STUDENTS' COMMON-ROOM P. G. A.

শুনিতে পাই কেবল এই দুর্নীতিপরায়ণতার কথা। এ সব লোকনিন্দা অবশ্য মন্ত্রীদের স্বকর্ণে শুনিবার কথা নয়; দেশশাসনের গুরু দায়িত্বে তাঁহারা রুদ্ধশ্বাস, দেশের লোকের দুর্দ্দশার কথা দেশের লোকের মুখ হইতে শুনিবার সময় কোথায় তাহাদের ?

'সংক্ষেপে ইহাই হইল আমাদের জাতীয় সরকারের স্বরূপ। এই সরকার দেশকে ভালোভাবে শাসন করিবার ব্যাপারেই অপারগ, অথচ এই সরকারের কাছেই আমরা জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া বসিয়াছি। হ্যাঁ, মন্ত্রিগণ আর্থিক উন্নতি দেশবাসীর জন্য করিতেছেন বই কি, কিন্তু সে সব দেশবাসীর অধিকাংশই তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বজন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজনের চাকুরির জন্য পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের নির্দ্দেশও পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করা হইতেছে।

'সুতরাং দেশের যদি আমাদের উন্নয়ন করিতেই হয় তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদের শাসন-বিভাগীয় এই নোংরা আস্তাবলটি ভালো করিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইবে।'

ছিদ্রান্বেষী যাঁহারা তাঁহারা অবশ্য কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, আচার্য্য কৃপালনির এই উক্তিতে জনসাধারণের পক্ষে উল্লসিত হইবার কারণ নাই; আচার্য্যজীর challenge নাকি 'challenge of job.' আমরা কিন্তু কৃপালনিজীর কথায় আন্তরিকতারই স্পর্শ পাই।

'আজাদ কাশ্মীরে'র অভ্যন্তরে

শেখ আবদুল্লার নেতৃত্ব-চালিত গণতন্ত্রী কাশ্মীরীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিপন্ন ইসলামের জিগির তুলিয়া যে তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' সৃষ্টি করিয়াছিল, বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের পাকিস্তানস্থ গোপন সংবাদদাতার প্রচেষ্টায় সেই 'আজাদ কাশ্মীরে'র আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া গিয়াছে খবরটি পাকিস্তানের রাজনৈতিক আদর্শের কিছু গৌরবের সূচনা করে না।

জঙ্গী 'আজাদ্ কাশ্মীরী'রা যে আসলে পাকিস্তানেরই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর লোক ছিল, এ কথা সে বহু পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কাশ্মীরবাসীদের চোখে ধূলা দিবার জন্য কয়েকজন কর্মচারী কাশ্মীরীদের নিয়া পাকিস্তানকে একটি বেসামরিক শাসন বিভাগেরও অভিনয় করিতে হইয়াছিল; সর্দ্দার ইব্রাহিম ছিল এই অভিনেতা শাসন দপ্তরের প্রধান। আজাদির ধোঁকায় বিভ্রান্ত কাশ্মীরীরা এই ইব্রাহিম এণ্ড কোম্পানীর কাছে কিরূপ ব্যবহার পাইতেছে এবং ক্রমেই আসল ব্যাপারটি সম্বন্ধে কাশ্মীরবাসীদের চক্ষুর্ন্মিলন হইতেছে উক্ত বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিকে সেই সংবাদেরই আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইলেও কাশ্মীরকে দৈনন্দিন অন্ন বস্ত্র এবং ঔষধ পথ্যাদির জন্য বাহিরের কাছে হাত পাতিতে হয়—'আজাদ' কাশ্মীরের এই দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার ভার স্বভাবতই পাকিস্তানকেই লইতে হইয়াছে। পাকিস্তান জিনিষপত্র কিছু কিছু পাঠাইত বটে—কিন্তু সর্দ্দার ইব্রাহিম এণ্ড কোম্পানী নাকি সে সব জিনিষই পিছনের দরজা দিয়া কালো বাজারে প্রেরণ করিতেছে। ফলে আজাদ কাশ্মীরের মুদ্রাস্ফীতি নাকি এখন অবিশ্বাস্য রকমের। কাশ্মীরবাসীরা সম্প্রতি এই অনাচারের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ফলে তাহাদের দুর্গততর অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে; বিগতমোহ আজাদী কাশ্মীরীরা পাছে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্যার্থে শেখ আবদুল্লার দলে যোগ দিয়া বসে, এই আশঙ্কায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চলে এক নিদারুণ 'পারমিট' ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া বসিয়াছেন—এই 'পারমিটে'র অধিকারী হওয়া ব্যতীত এক্ষণে কোনো পাকিস্তানি কাশ্মীরবাসীরই এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবারও স্বাধীনতা নাই।

কিন্তু এত করিয়াও নাকি কাশ্মীরীদের বশে রাখা পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। দিন কয়েক আগে আগামী গণভোটের প্রচার উদ্দেশ্যে নাকি পাকিস্তানের প্রধান উজীর লিয়াকৎ আলি খাঁ সাহেব পুঞ্চে গিয়াছিলেন। কিন্তু পুঞ্চবাসীরা নাকি উজীর

সাহেবকে এমনই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল যে, খাঁ সাহেবকে শেষ পর্য্যন্ত কোনো রকমে জান্ লইয়া করাচীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে মুজাফ্‌ফারাবাদে সীমান্ত প্রদেশের প্রধান উজীর কুয়াইয়ুম্ খাঁ সাহেবের কপালে নাকি প্রায় একই রূপ গণ-অভ্যর্থনা জুটিয়াছিল।

বাহুল্য হইলেও প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভালো যে, পাকিস্তানের উৎঘোষিত প্রচার অনুযায়ী পুঞ্চ্ ও মুজাফ্‌ফারাবাদ হইল আজাদ্ কাশ্মীরের দুইটি সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি।

পরলোকে কিরণশঙ্কর রায়

বাংলার রাজনৈতিক গগন হইতেও একটি প্রধান জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে। কিরণশঙ্কর রায়ের অকাল মৃত্যুতে পুনর্জ্জায়মান বাঙ্গালী জাতি বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

কিরণশঙ্করের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠসূত্রে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ অসহযোগ আন্দোলনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, সরকারী কলেজের অধ্যাপকের সম্মানিত পদ ত্যাগ করিয়া কিরণশঙ্কর বাংলা ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে আসিয়া এই পরাধীন দেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সেই সময়ই আমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলাম। সেই ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র হইতেই আমরা জানিয়াছিলাম যে, কিরণশঙ্করের মত বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি, কর্ম্মোদ্যমের ধৈর্য্য এবং উদ্দেশ্যের স্থিতি—বাংলার রাজনীতিতে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র ব্যতীত অতি অল্প মানুষেরই ছিল। আরও একটি বড় জিনিষ তাঁহার ছিল—নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা। বাংলার কংগ্রেসে বহুবার ভাঙ্গা-জোড়া হইয়াছে, আভ্যন্তরীন রাজনীতিগত বহু ওলট পালট হইয়াছে—কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ তিনি কখনও লঙ্ঘণ করেন নাই, এক এক সময় ব্যাপক লোকমতের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইলেও কংগ্রেসের নেতৃত্বকেই তিনি চরম বলিয়া মানিয়াছেন। কোন স্বার্থচিন্তা তাঁহার চিত্ত কখনও মলিন করিতে পারে নাই। জমিদার এবং অভিজাত বংশোদ্ভূত হইলেও কোনরূপ দেমাক বা অহঙ্কার তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই বা অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার অতি বড় শত্রুও তাঁহার কোনরূপ নিন্দা করিতে পারে নাই।

কিরণশঙ্কর মূলতঃ পূর্ববঙ্গের সন্তান; ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে তাই তিনি পাকিস্তানে থাকিয়া পূর্ববঙ্গবাসীদের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানে সত্যই তাঁহার করিবার কিছু ছিল না বলিয়াই সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সেবায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। এবং ইহাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিশেষ পুষ্ট ও শক্তিশালীই হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি পাণ্ডিত্য ও কৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যিক প্রতিভাও কিরণশঙ্করের উল্লেখনীয় ছিল। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে' তাঁহার লেখা কয়েকটি গল্পে তদানীন্তন সমালোচকগোষ্ঠি একজন শক্তিশালী নূতন সৃজনী-প্রতিভার আভাষ পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার পাঠককুলের দুর্ভাগ্য, দেশমাতৃকার প্রবলতর আহ্বানে কিরণশঙ্করকে নিরুপায় হইয়াই বাণীদেবীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে 'সপ্তপর্ণ' গল্প-গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ বয়সে মৃত্যুর পূর্ব্বেও তিনি মাসিক 'বর্ত্তমান' পত্রিকায় পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। 'বর্ত্তমান লিমিটেডের' তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ন্যায় এরূপ নিষ্ঠা বড় বিরল।

বরাবর তাঁহার বন্ধু বাৎসল্য ছিল। পুরাতন বন্ধুদেরও কোনরূপ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারতপক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় নাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা বিশেষরূপে বন্ধুবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। একাধারে বন্ধুবৎসল ও নিরহঙ্কারী দেশসেবক তাঁহার ন্যায় খুব কম ছিল।

মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৭ বৎসর। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, এখনও তাঁহার বৃদ্ধা মাতা জীবিতা আছেন। তাহার স্ত্রী, পুত্র এবং তিন কন্যা বর্ত্তমান।

ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত তেওথার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে কিরণশঙ্করের জন্ম। শৈশবে তিনি গ্রামের ইস্কুলেই শিক্ষালাভ করেন, পরে কলিকাতায় হিন্দু স্কুল হইতে এন্ট্রান্স্ পাশ করেন এবং মাত্র ১৭ বৎসর বয়সেই সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চ শিক্ষার আশায় অতঃপর তিনি বিলাত যাত্রা করেন ও ইতিহাসে অক্স্ফোর্ড বিশ্বালয়ের গ্রাজুয়েট হন। ইংরেজি প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে ব্লু রিবন দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

ভারতে ফিরিয়া আসিয়া কিরণশঙ্কর প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত রাউলট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এক তীব্র মন্তব্য করিয়া বক্তৃতা করেন। সরকারী চাকুরীয়া হইয়া রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় গভর্ণমেন্ট তাঁহার জবাবদিহি চাহেন। প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত রায় পদত্যাগ করেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯২৯ সালে তথা হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ফিরিবার পথে জাহাজে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) তাঁহার সহযাত্রী হন। এবং দেশে ফিরিয়া তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই সময় কলিকাতা বিদ্যাপীঠ নামে একটি ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হয়। যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র উহার প্রিন্সিপাল ও কিরণশঙ্কর ভাইস প্রিন্সিপাল হন। পরে তিনি গৌরীয় সর্ব্ববিদ্যায়তন নামক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহ্বানে কিরণশঙ্কর দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্র সহ অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন, এবং ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। সুভাষচন্দ্রের ন্যায় কিরণশঙ্করও আজীবন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামী ছিলেন। গয়া কংগ্রেসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়; শ্রীযুক্ত রায় উক্ত পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে তিনি উহার সেক্রেটারী এবং বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তৎপর কংগ্রেস আইনসভা বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্ত করে।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইলে শ্রীযুক্ত রায়কে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুই

কিরণশঙ্কর রায়

বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২২ সাল হইতে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য পদ অলঙ্কৃত করেন এবং পার্লমেণ্টারী প্রতিষ্ঠান ও উহার বাহিরের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।—১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসীদলের একজন বিশিষ্ট সদস্যরূপে পরিচিত হন। যুদ্ধকালীন কয়েক বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে তিনি বিরোধীয় দলের নেতৃত্ব করেন। দেশ বিভাগের পর শ্রীযুক্ত রায় কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসদলের নেতা

ছিলেন। পরে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। '৪৮ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তিনি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

আমরা তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান কল্যাণ শঙ্কর, মাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

ব্রহ্মদেশ কোন পথে?

ব্রহ্মদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উদ্বেগজনক ক্রম পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-বিদদের কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, ওদেশের অবস্থাও কি শেষ অবধি চীনেরই মত হইয়া উঠিল! সন্দেহটি সম্ভবতঃ একেবারে অহেতুক নয়—অন্ততঃ কিছুদিন পূর্ব্বে ওদেশের খোদ প্রধান মন্ত্রীই যে-স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত সন্দেহটাই বলবৎ হইয়া ওঠে। প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু বলিয়াছেন, কারেন বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে এই কয়দিনেই ৩০ সহস্রের অধিক ব্রহ্মবাসী প্রাণ হারাইয়াছে, ২৫ কোটি টাকার উপরে রাজস্ব হিসাবে গভর্ণমেন্টের ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রহ্মবাসীর সত্যকার নেতা ছিলেন জেনারেল আউঙ্ সাঙ। আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যুর পরেই ব্রহ্মের ভাগ্যতরী কর্ণধারহীন হইয়াছে। কিন্তু আউঙ সাঙের চেলা চামুণ্ডারা বিশ্ববাসীকে সেকথা জানিতে দেন নাই, তাঁহার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আউঙ সাঙ না থাকিলেও তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী থাকিন নু আছেন, তিনিই ব্রহ্মের টলায়মান ভাগ্যতরীটি নিশ্চিৎ লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবেন। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘোষণার কেবল ব্যতিক্রমেরই খবর গিয়াছে—ব্রহ্মের জাতীয় সমস্যার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই প্রায় থাকিন নু সরকার কেবল পরিকল্পনাহীন গোঁয়ারতুমি করিয়াছেন। ইহার অনিবার্য্য ফলও শেষ পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। থাকিন নু সরকারের একণে একযোগে তিনটি প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাড়াইতে হইয়াছে—যথা: (১) স্বয়ং ব্রহ্ম সরকারেরই সবচেয়ে বড় সমর্থক 'পি, ভি, ও'-র একটি বড় শাখা (২) কমিউনিষ্ট (৩) স্বভাবজঙ্গী কারেন জাতি। প্রধানত শেষোক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণের ফলেই ব্রহ্মের আজ এই শোচনীয় অবস্থা।

ব্রহ্মের 'কারেন'রা ভারতের গুর্খা সম্প্রদায়ের মত—ইহারাও প্রধানতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী, অতিরিক্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং রণ-নিপুণ; রাজনৈতিক চেতনার দিক হইতে কারেনরাও ভারতীয় গুর্খাদেরই মত অনগ্রসর। কেবল একটি ব্যাপারে গুর্খাদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য এই যে কারেনরা সাতিশয় স্বাধীনতা-প্রিয়। মূল ব্রহ্মবাসীর সহিত তাহাদের কিছু জাতিগত বৈষম্য থাকায় তাহাদের নেতারা বহুদিন হইতে স্বায়ত্বশাসন দাবী করিতেছিল, সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মবাসীর অধীনে থাকিতে তাহারা রাজি নয়। কিন্তু থাকিন্ নু সরকার কারেনদের এই দাবী-জনিত সাধারণ সমস্যাটিরও কোনো সমাধান করিতে পারেন নাই। ফলে কারেনরা সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ব্রহ্ম-রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, কারেন-বর্ম্মীদের এই বিবাদটা হয় তো কিছু বিলম্বিত হইলেও শেষপর্য্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা মিটাইয়া ফেলা যাইত, কিন্তু কমিউনিষ্টরা কারেনদের ক্রমাগত উস্কানি দিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে বলিয়াই বর্ম্মী-কারেন সংঘর্ষ এরূপ চরম হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের কিন্তু কেমন যেন মনে হয় যে, এটা ব্রহ্মের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতিটির আসল স্বরূপ চাপা দিবার প্রয়াস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে একটা ব্যাপার ঔপনিবেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—যেখানে যেমন ধরনের রাজনৈতিক গণ্ডগোলই বাধুক না, তাহার জন্য সর্ব্বক্ষেত্রে সকল সময়ই কমিউনিষ্ট-দের দায়ী করা হয়। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, শাসক-সম্প্রদায়-বিরোধী যে-কোনো আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাই কমিউনিষ্টদের দলীয় নীতির নির্দ্দেশ। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইল এই যে, বিরোধের হেতুই যদি না থাকে তবে বিরোধ বাধে কিরূপে? জনসাধারণের এক-একটি বৃহৎ অংশ কেন প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্ত্তৃপক্ষের

বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে অধুনা কমিউনিষ্টরা যে ক্রমশঃই প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন রাজনীতি অর্থনীতির দুর্নীতিমূলক দুরবস্থা। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগেই কমিউনিষ্টরা জনসাধারণকে স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টেরই বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেছে। থাকিন নু সরকার চালিত ব্রহ্মদেশেও সম্ভবতঃ এই অর্থনৈতিক দুর্নীতি প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান। এই কারণেই কারেনদের সহিত তাহাদের মৈত্রী ঘটিতেছে না; ব্রহ্মের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সেনাবাহিনী 'পি-ভি-ও'র এক অংশও এই কারণেই থাকিন্ নু সরকারের বিরোধী হইয়াছেন। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করিতে না পারিলে ব্রহ্মে থাকিন নু সরকার স্থায়ী শান্তি আনিতে পারিবেন না।

শ্যামদেশের হালচাল

শ্যামদেশ ব্রহ্মের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র। সেখানকার সাম্প্রতিক অবস্থাও প্রায় ব্রহ্মেরই মত। সেখানেও প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক বিভাগের একাংশ সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং সেখানেও উক্ত বিদ্রোহকে কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্ররূপে আখ্যাত করা হইয়াছে।

শ্যামের এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ হইয়াছে বৃটেন। শ্যামের ঠিক গায়েই বৃটেনের প্রত্যক্ষশাসিত উপনিবেশ মালয়; মাত্র এই সে-দিন সেখানে বহু গোলাবারুদ ব্যয় করিয়া বৃটীশকর্ত্তৃপক্ষ সেখানকার স্বাধীনতাকামী অধিবাসীদের জাতীয় আন্দোলনকে পর্য্যদুস্ত করিয়াছে। শ্যামের আদর্শে পাছে আবার মালয়ের দমিত বিদ্রোহ না মাথাঝাড়া দিয়া ওঠে—বৃটেন সম্ভবতঃ শ্যামের বিপর্য্যয়ে এই কারণেই সবিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই বৃটেন তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া দূর-প্রাচ্যস্থ বৃটীশ স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যর নীল্ রীচিকে শ্যামে প্রেরণ করিয়াছে, এবং শ্যামের ডিক্টেটর জেনারেল বিপুল সংগ্রামকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র মালয়ের সম্ভাবিত বিদ্রোহই কি শ্যামের প্রতি বৃটেনের এতখানি দরদের কারণ? আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিকদের একাংশের কিন্তু এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সন্দেহের কারণ শ্যামের সহিত বৃটেনের বহুবিধ বাণিজ্যচুক্তি। শ্যামের বাড়তি চালের প্রায় সবটাই এখন নাকি শুধু বৃটেনেরই ভাগে পড়িতেছে এবং শ্যামেও আজকাল নাকি বৃটীশ পণ্যের কাটতি খুব বেশী, মাসে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার বৃটীশ মাল শ্যামে আজকাল বিক্রয় হয়।

শ্যামের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্বন্ধে বহির্বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা খুব বেশী ওয়াকিবহাল বলিয়া মনে হয় না; এইকারণেই এখনও ঠিক জানা যায় নাই যে, শ্যামের সাম্প্রতিক গোলযোগের আসল কারণ কি এবং বিদ্রোহীরাই বা কোন্ আদর্শের অনুসারী। তবে একটি বিষয়ে কিছুটা অনুমান করা যায় যে—শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সহিত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের উক্ত অতি ঘনিষ্ঠতাই উপস্থিত বিপর্য্যয়ের অন্যতম কারণ।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রদপ্তরে পরিবর্ত্তন

বহুদিন পরে ইয়োরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে একটি উষ্ণ সংবাদ আসিয়াছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচীব মলোটভকে অপসৃত করিয়া তদস্থলে সহ-পররাষ্ট্র সচীব ভিশিন্স্কিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং ভিশিন্স্কির সহকারীরূপে নিয়োজিত হইয়াছেন উনোর অন্যতম সোভিয়েট প্রতিনিধি গ্রমিকো। অন্যদেশের ব্যাপার হইলে এই জাতীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংক্রান্ত পরিবর্ত্তনের কোন না কোন একটি কারণ প্রকাশ পাইতই; কিন্তু সোভিয়েট বিচিত্র দেশ, মস্কো রেডিওতে এবং সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলিতে এই পরিবর্ত্তনের খবরটুকু ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদটিকে আমরা উষ্ণ কিন্তু ঠিক এই কারণেই বলি নাই।

সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শান নাই বলিয়াই বোধ হয় অন্যান্য ইয়োরোপীয় বৃহৎ শক্তি-নিচয় এই

পরিবর্ত্তনের আকস্মিকতাটায় ঘাবড়াইয়া পড়িয়াছেন খুব বেশী। লণ্ডনের, ওয়াশিংটনের, প্যারিসের সংবাদপত্র-গুলিতে এই নিয়া নাকি মাতামাতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—নানা বিশেষজ্ঞ নানারূপ অনুমান করিতেছেন, নানা সমরবিশারদ নানারূপ জল্পনা প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন যে, এই পরিবর্ত্তনের ফলে এবারে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতিতেও অনাকাঙ্খিত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইবে; সোভিয়েট রাশিয়া এবারে ইঙ্গ-আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব লাভের ভাণ করিবে। আরেকদল বলিতেছেন,—ইহার ঠিক উল্টা ব্যাপারটি হইবে; ইঙ্গ-আমেরিকা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলিকে জপাইয়া যে নূতন 'আটল্যান্টিক মৈত্রী'র আয়োজন করিতেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রীয় বিভাগের পরিবর্ত্তন তাহারই উত্তর—সোভিয়েট এবারে আরো জোরে কোমর বাঁধিবে। মধ্যবর্তীরাই সম্ভবতঃ আসল ব্যাপারটি কিছুটা আঁচ করিতে পারিয়াছেন; তাহাদের ধারণা এই যে—আত্মপ্রস্তুতির জন্ত রাশিয়াকে এখন কিছুদিন আভ্যন্তরীন শাসনের সংস্কারে প্রযত্ন থাকিতে হইবে, কাজেই সেকাজে ষ্টালিন মলোটভকে সর্ব্বসময়ের জন্ত সহযোগীরূপে পাইতে চান বলিয়াই পররাষ্ট্রদপ্তর হইতে সরাইয়া লইলেন।

কিন্তু যে যাই বলুক, ব্যাপারটির ফলে একটি কথা কিন্তু বেশ যেন পরিস্কার হইয়া গেল, সোভিয়েট রাশিয়াকে ইঙ্গ-আমেরিকা প্রতি ব্যাপারের জন্যই সন্দেহ করে যেমন, ভয়ও করে তেমনি। সংবাদটিকে এই কারণেই আমরা উক্ত বলিয়াছিল।

যশোহরে মাইকেল-জন্মোৎসব

গত ২৫শে জানুয়ারী যশোহর সাহিত্যসঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় সিনেমা হলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১২৫ তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া মাইকেলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীতা রহিয়াছে—বিশেষতঃ পাকিস্তানে। বাংলা সংস্কৃতির ধারক মাইকেল সম্বন্ধে ইদানিং বড় একটা আলোচনা দেখা যায় না; অথচ বাংলাসাহিত্য আজ যাঁহাদের দানে এত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, মাইকেল তাঁহাদেরই অন্যতম। এমন একটি অনুষ্ঠানের জন্ত সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরলোকে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

গত ২রা ফাল্গুন 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রণেতা ও বঙ্গশ্রীর অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রের মাতা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁহার কলিকাতাস্থ ২নং কালী লেনে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করেন। শ্রীমতী রাধারাণী বঙ্গভাষায় মহাভারতের অনুবাদিকা। তিনি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদাস সিংহের কন্যা। রাধারাণী দেবী বিশেষ দানশীলা ও ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। আমরা তাঁহার এই আকস্মিক পরলোক গমনে সুধীর বাবুকে ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি ও পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মেট্রো পলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কে. ভি. আপ্পারাও

সূচীপত্র

STUDENTS' COMMON-ROOM P.G.A.

সুন্দরবন (প্রবন্ধ) ... শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ৩৭৭

অবশেষে (কবিতা) ... অনিমা মুখোপাধ্যায় ৩৮৩

দুরবগাহ (গল্প) ... শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৪

সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন (প্রবন্ধ) ... শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩৯৩

প্রত্যাশা (কবিতা) ... অরবিন্দ গুহ ৪০০

খতিয়ান (গল্প) ... শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৪০১

ইউরেনিয়াম (প্রবন্ধ) ... শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল ৪০৮

দ্বীপ (কবিতা) ... চিত্তরঞ্জন সরকার ৪১০

ঊর্দ্ধগামী (উপন্যাস) ... শ্রীসুবোধ বসু ৪১১

কতদূর (কবিতা) ... নির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী ৪১৮

রূপক নাটক ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'
(সচিত্র প্রবন্ধ) ... শ্রীসুনিতকুমার শেঠ ৪১৯

আক্রমণ (অনুবাদ গল্প) ... জন্ ষ্টেনবেক্
...অনুবাদ : শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী ৪২৩

ঝুলি-ঝাড়া উপাখ্যান (প্রবন্ধ) ... শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৪২৯

বিষকুম্ভ (কবিতা) ... দিলীপ দাশগুপ্ত ৪৩১

জোচ্চোর (গল্প) ... শ্রীরমাপতি দাস ৪৩২

জিজ্ঞাসা (কবিতা) ... পরিমল মুখোপাধ্যায় ৪৩৭

কুয়োমিনটাঙ আর কমিউনিষ্ট কারা ?
(প্রবন্ধ) ... ওঙ্কারনাথ গুপ্ত ৪৩৮

ফল্গু (গল্প) ... শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা ৪৪৫

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ (সচিত্র আলেখ্য) ৪৫০

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন (সংক্ষিপ্ত ভাষণাবলী) ৪৫১

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি (সচিত্র প্রবন্ধ) ... শ্রীরণজিৎকুমার সেন ৪৫৭

রূপলোক ... ৪৬১
রামকৃষ্ণ (কবিতা) ... শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী ৪৬৪
সম্পাদকীয়— ৪৬৫
মানভূম সত্যাগ্রহ; স্বাধীন ভারতের কারাগার; বিদেশী মূলধন ও ভারতবর্ষ; কাশ্মীর; পাকিস্তান ও আফগানিস্তান; উত্তর আটলান্টিক চুক্তি।

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ শ্রীযতীশ বেদজ্ঞ অনূদিত আপ্টন সিন্‌ক্লেয়ারের উপন্যাস 'অয়েল'-এর প্রকাশ সম্প্রতি বন্ধ রহিল।—বঃ সঃ

চিত্র-সূচী

একবর্ণ—
বনানী ফটো—শান্তি সেন

প্রবন্ধান্তর্গত—
রূপক নাটক ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ৪১৮
রবীন্দ্রনাথ।
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ৪৫০
অবনীন্দ্রনাথ।
উত্তর আটলান্টিক চুক্তি ৪৫৭
আটলান্টিকের মানচিত্র।
রূপলোক ৪৬১
'বহুব্রীহি' চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য।

ইম্পিরিয়াল টি কোং
৪, রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ
খুচরা ও পাইকারী খরিদ্দারগনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গশ্রী

ষোড়শ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৫৬ | ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

সুন্দরবন

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

সুন্দরবন বলতেই মনে ভেসে ওঠে নদী নালা ঘেরা, বাঘ কুমীর আর সাপে ভরা এক জংলা দেশের ছবি। কিছুকাল ধরে এর অনেকাংশ মানুষ তার বাসোপযোগী করে তোলবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। সরকারী দপ্তরখানায় এই বনভূমির নানা উন্নয়ন পরিকল্পনাও রচিত হচ্ছে। এর ভবিষ্যৎ হয়তো একদিন নানাভাবে গরীয়ান হয়ে উঠবে, কিন্তু এর অতীত কাহিনী উদ্ধারের জন্য যদি যথেষ্ট শ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে আত্মনিয়োগ করা যায়, তবে এমন বহু নোতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে—যা বাংলার লুপ্ত ইতিহাসের বহু অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের রুদ্ধদ্বার আমাদের সামনে খুলে দেবে। সুন্দরবনের সর্ব্বত্র, বিশেষ ক'রে এর পশ্চিমাংশে যে সব তাম্রপট্ট, মূর্ত্তি, মন্দির, অট্টালিকা, জলাশয়, পুরাতন পথঘাটের চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে, সেগুলি দিন দিন নব নব উপাদান রূপে বাংলার ইতিহাসকে পরিপুষ্ট করছে। গুপ্ত, পাল, সেন প্রভৃতি রাজাদের কতো রোমাঞ্চকর অভিনয় এই প্রদেশের অতীত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে, কতো জৈন ও বৌদ্ধ ভাবধারা এদেশের মানুষের মনকে উর্ব্বর করেছে, কতো আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার সংঘাত এর সমাজ-জীবনকে আলোড়িত করেছে। ধারাবাহিক তথ্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস আমার নেই, আমি মোটামুটিভাবে এর একটা চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

সুন্দরবন জনপদ প্রাচীন হলেও এর নামটি বোধ হয় প্রাচীন নয়। সপ্তদশ শতকের আগে কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বহু পূর্ব্বে এই প্রদেশ সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরবর্ত্তীকালে ইহা 'বাটি' বা 'ভাটি' নামে অভিহিত হতো। সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সুন্দর বৃক্ষের প্রাচুর্য্যহেতু

এই প্রদেশের নাম 'সুন্দরবন' হয়েছে। আজ সুন্দরবনের সর্ব্বত্র সুন্দর বৃক্ষ না জন্মালেও একদা যে এর সর্ব্বত্রই ভালো সুন্দর গাছ উৎপন্ন হতো, তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে পুষ্করিণী আদি খনন-কালে সর্ব্বত্রই সুন্দরবৃক্ষের গুঁড়ি বা সম্পূর্ণ সুন্দর গাছ দেখা যায়। কারও কারও মতে 'চন্দ্রবন' থেকে সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে। বাখরগঞ্জ অঞ্চল এক সময় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের বনাংশকে চন্দ্রদ্বীপবন বা চন্দ্রবন বলা হতো। পূর্ব্বকালে সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে তাম্র, সুবর্ণ, চন্দ্র প্রভৃতি দিয়ে নাম রাখার একটা ঝোঁক দেখা যায়। পুরাতন মানচিত্রগুলিতে সুন্দরবন নামের বিবর্ত্তন দেখলে এই মতের সমর্থনই মেলে (Tchunderban—Tschunderban—Sunderban)। আবার কেহ কেহ সমুদ্রবন থেকে সুন্দরবন নামকরণের হেতু নির্দ্দেশ করেন।

সুন্দরবনের পূর্ব্বে মেঘনা ও পশ্চিমে ভাগীরথী। এর দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১৮০ মাইল, প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে স্থান বিশেষে ৬০ থেকে ৮০ মাইল। ২৪পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চল নিয়েই এই প্রদেশ গঠিত। ভাগীরথী থেকে কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত ২৪পরগণা, কালিন্দী থেকে মধুমতী নদী পর্য্যন্ত খুলনা জেলা ও মধুমতী থেকে মেঘনার মোহনা পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ জেলা। উনবিংশ শতকে পার্জিটার সাহেব সুন্দরবনের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করেছেন এই ভাবে —দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে হরিণঘাটা নদী, পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী এবং উত্তরে চুলিয়াপুর, খাড়িঘাট ও চংড়িখালি গ্রাম, ঢাকিখাল, সর্ব্বতলা ও কাচনাগ্রাম, কালিন্দা, যমুনা, কবদক, মার্জ্জতা, পাদোর, দাউদখালি, ও বলেশ্বর নদী। বাংলাকে যদি বলা যায় নদীমাতৃক, সুন্দরবন সেই মায়ের কোলের শিশু। এই খেয়ালী জননী তার কোলের শিশুকে নিয়ে যথেচ্ছ খেলা করেছে। নদীমেখলা, বনকুন্তলা এই প্রদেশ তাই বার বার তার রূপ বদল করেছে।

সুন্দরবনে এ পর্য্যন্ত যে সব পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, জয়নগর থানার কাশীপুর গ্রামে প্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রস্তরের সূর্য্যমূর্ত্তিই তার মধ্যে প্রাচীনতম। এর নির্ম্মাণকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক। মূর্ত্তিটির মাথায় রত্নমুকুট, কানে কুণ্ডল, গলায় রত্নহার, দুই হাতে দুটি কমলস্তবক, কটিদেশে তরবারি ও মাথার পিছনে জ্যোতির্ম্মণ্ডল। দুজনার সামনে কশা ও রশ্মি হাতে সারথি অরুণের আবক্ষ মূর্ত্তি। তার নিচে রথের চাকা ও সাতটি ঘোড়া। শেষোক্ত মূর্ত্তির দুই পাশে দুটি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, মনে হয় এ দুটি উষা ও প্রত্যুষার মূর্ত্তি ছিল। মূর্ত্তিটির মুখের গাম্ভীর্য্য, দেহের পেলবতা, অশ্বগুলির সঞ্চরমান ভঙ্গী উচ্চ শিল্পের নিদর্শন। মূর্ত্তিটি এখন কলিকাতা আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

বোড়াল গ্রামে যে বালুকা প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নির্ম্মাণকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতক। মূর্ত্তিটির দৈর্ঘ্যের তুলনায় আয়তন কিছু বৃহৎ। এর মাথায় বন্ধনী, বাদামী আকারের চোখ, গভীর রেখায় দু'একটি বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরিধেয়ের ভাঁজ মূর্ত্তিটির আদিম ধর্ম্মীয় রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরণের আরও দু'একটি ফলক আবিষ্কৃত হওয়ায় স্বতঃই মনে হয়, এ-অঞ্চলে এই জাতীয় একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতির প্রচলন ছিল। এই মূর্ত্তিটিও আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত।

সপ্তম শতকে জয়নাগের একটি পট্টোলিও মল্লসারুল নামক গ্রামে পাওয়া গেছে। এই পট্টোলিতে সামন্ত নারায়ণভদ্রের রাজত্বকালে 'ঔদম্বরিকবিষয়ে' (বর্ত্তমান রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত) ভূমিদানের বিষয় উল্লেখ আছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঔদম্বরপরগণার কথা বর্ণিত হয়েছে।

আনুমানিক নবম দশম শতকের দু'একটি বিভিন্ন মূর্ত্তি সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে ঘাটেশ্বরার একটি মূর্ত্তিশিল্প, যশোরেশ্বরী মন্দিরে রক্ষিত গঙ্গামূর্ত্তি, পাথর প্রতিমার বুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধমূর্ত্তিটি ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট। এটি মিশ্রধাতুতে গড়া ও উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। ঘাটেশ্বরার মূর্ত্তিটী বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উচ্চতায়

তেরো ইঞ্চি। মূর্তিটার বলিষ্ঠ ভঙ্গী লক্ষণীয়। গঙ্গা-মূর্তিটি এক্ষণে অন্নপূর্ণা দেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু মকরবাহিনী এই মূর্তিটিকে গঙ্গা বলে চিনতে আদৌ কষ্ট হয় না। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপ থেকে এই মূর্তিটিকে স্থানান্তরিত করেন।

আনুমানিক দশম একাদশ শতকের যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে নেতড়ার উমামহেশ্বর, ঘাটেশ্বরা ও রায়দীঘির জৈন মূর্তিদ্বয়, ময়দার নৃত্যপর গণেশ, নলগোড়ার হারিতী মূর্তিদ্বয়, কাঁজিরডাঙার চক্র-মধ্যস্থ গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাঁজিরডাঙার বিষ্ণু ভারতীয় মূর্তিশিল্পে অদ্বিতীয় ও একক। ভারতবর্ষের দেবমূর্তি-পরিকল্পনায় নটরাজ শিব ও নৃত্যপর গণেশের স্থান থাকলেও এইরূপ নটনারায়ণ মূর্তি আর কোথাও দেখা যায় নি। পদ্মের মত একটি চক্রের মধ্যে গরুড়ের কাঁধের উপর চতুর্ভুজ বিষ্ণু দুটি হাত মাথায় তুলে নৃত্য করছেন। মূর্তিটি আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত। ঘাটেশ্বরা ও রায়দীঘির জৈন মূর্তিদ্বয় যথাক্রমে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ ও ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। দুটিই দিগম্বর মূর্তি। রায়দীঘির মূর্তিটির মাথার উপর সর্পলাঞ্ছিত ছত্র আছে। উপরের দুই পাশে বাদ্যযন্ত্র হাতে দুটি অপ্সরা মূর্তি ও নিচের দুই পার্শ্বে পদ্মের উপর চামরধারী দুটি পুরুষমূর্তি। মূল মূর্তির দুই হাতের কাছে দুটি সাপ এবং পাদপীঠেও দুটি সর্প খোদিত আছে। আদিনাথ মূর্তিটির দুই পাশে পদ্মের উপর দুটি পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান। উপরের দুই পাশে বিভিন্ন সারিতে বারোটা করে চব্বিশটা তীর্থঙ্কর অঙ্কিত। পাদপীঠে একটি বলদও খোদিত আছে। এই মূর্তিটিও আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত। নেতড়ার উমামহেশ্বরের মূর্তিটি উচ্চতায় দু'ফুট—প্রস্থে একফুট তিন ইঞ্চি। মহেশ্বরের বাম উরুর উপর উমা উপবিষ্টা। মহেশ্বরের চারটি হাতের দুটি হাত উমাকে বেষ্টন করেছে। আর দুটি হাতের একটিতে ত্রিশূল ও অপরটিতে নীলোৎপল। উমার ডানহাত মহেশ্বরকে আশ্রয় করেছে; আর বাঁহাতে তাঁর একটি দর্পণ। ভারতীয় মূর্তিশিল্পে উমামহেশ্বর প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। হারিতী মূর্তিদ্বয় যেমন মাতৃমূর্তি-পরিকল্পনায় তেমনি শিল্প চাতুর্যে অপূর্ব।

যাঁরা সুন্দরবনে ১১৬নং লাটে গিয়েছেন, সেখানে একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়া তাঁদের চোখে পড়ে থাকবে। ঐ মন্দিরের নাম জটার দেউল। এর উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। মন্দিরটি আটকোণা ও পূর্ব-দুয়ারী। এর গর্ভগৃহ ৬ ফুট নিচে অবস্থিত। মন্দিরটির আকৃতি ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। এ অঞ্চলে এটি হিন্দুমন্দির নামে প্রখ্যাত, কিন্তু হাণ্টার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এটিকে বৌদ্ধমঠ বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। একটি তাম্রফলক থেকে জানা যায় ৯৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জয়ন্তচন্দ্রের বিশেষ বিবরণ আমরা ইতিহাসে পাই না।

একাদশ দ্বাদশ শতকের তিনটি পট্টোলি, লিপি-উৎকীর্ণ শীলমোহর ও বহু দেবদেবীর মূর্তি সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলির মধ্যে কুলুদিয়ার সূর্যমূর্তি, ছত্রভোগের কুবের, সরিষাদহের নৃসিংহ, জলঘাটার গরুড়, গোবিন্দপুরের নটরাজ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নটরাজমূর্তিটি উচ্চতায় তিনফুট দু'ইঞ্চি। দশহাতে নানা প্রহরণ ও মুদ্রা। মূর্তির দুই পাশে শিবের নানা অনুচরের মধ্যে দুজন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্য করছে। বাঁদিকের উপরে এক গণেশ-মূর্তি। শিবের বাহন বৃষভও নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রভুর দিকে মুখ তুলে রয়েছে। গরুড় মূর্তিটি মূর্তিশিল্পের এক সুন্দর নিদর্শন। তিনফুট উচ্চ একটি পাথর কেটে পিঠেপিঠি একই রকমের দুটি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর মূর্তি দুইটি উপবিষ্ট। এর মস্তক ফণিমণ্ডিত, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ এবং মূর্তিটি পক্ষযুক্ত। কলিকাতা ভারতীয় যাদুঘরে এটি সংরক্ষিত। কুলুদিয়ার সূর্যমূর্তিটি উচ্চতায় ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি। মূর্তিটির দুইহাতে দুটি পদ্ম। দুইপায়ের নিচে সারথি অরুণ আসীন। দুপাশে দুটি অনুচর তরবারি ও দোয়াত কলম হাতে দণ্ডায়মান। পাদদেশে সাতটি অশ্ব, তাদের দু'পাশে দুটি ধানুকী কন্যা শরাঘাতে অন্ধকার দূর করছে। ছত্রভোগের কুবের ও সরিষাদহের নৃসিংহমূর্তিদ্বয়ও কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত।

দ্বাদশ শতকে ডোম্মনপালের একটি ও লক্ষ্মণসেনের দুটি পট্টোলি পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণসেনের পট্টোলি দুটির একটি গোবিন্দপুরে ও অপরটি বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত। বকুলতলা পট্টোলি থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত খাড়িমণ্ডলের মণ্ডলগ্রামের তিনদ্রোণভূমি জনৈক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে দান করছেন। উক্ত ভূমির রাজস্বের পরিমাণ পঞ্চাশ পুরাণ ছিল। পট্টোলির দক্ষিণসীমার 'চিতাড্ডিখাত' বর্ত্তমানে 'চিতাড়িখাল' নামে পরিচিত। চিতাড়িখাল গোবিন্দপুর পট্টোলি থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণসেন বর্দ্ধমান-ভুক্তির বেতড্ড চতুরকের বিড্ডারশাসন গ্রামখানি জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করছেন। বিড্ডারশাসন বর্ত্তমান 'শাসন' গ্রাম। বেতড্ড বর্ত্তমান 'বেতোড়'। দ্বাদশশতকে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূভাগ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির এবং পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চল সমূহ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। ডোম্মনপালের পট্টোলিটি রাক্ষসখালি দ্বীপে পাওয়া গেছে। এই পট্টোলি থেকে জানা যায়, অযোধ্যাগত ডোম্মনপাল সুন্দরবনের পূর্ব্বখাটিকার অধিকার অর্জন করেছিলেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি পূর্ব্বখাড়িতে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন। ঐ দ্বীপেই একাদশ শতকের বহু মাটীর শীলমোহর পাওয়া গেছে।

এতদ্ব্যতীত জয়নগরের বিষ্ণু, বাড়িভাঙ্গার বিষ্ণু ও দশভুজা, রায়দীঘির বুদ্ধ, কাঞ্চনদীঘির বিষ্ণু ও নবগ্রহফলক, নলগোড়ার বিষ্ণু ও উমামহেশ্বর, মনিরটাটের অষ্টধাতু নির্ম্মিত জগদ্ধাত্রী, মাধবপুরের জগদ্ধাত্রী ও দশভুজা, ভরতগড়ের বুদ্ধ, বাইশহাটার মহিষমর্দ্দিনী, সরিষাদহের বিষ্ণু, দক্ষিণ বারাসতের বিষ্ণু ও নৃসিংহ, বহড়ুর সূর্য্য, মথুরাপুরের সূর্য্য ও বুদ্ধ, জলঘাটার বিষ্ণু ও দশভুজা, ছত্রভোগের দশভুজা, বিষ্ণু ও ব্রোঞ্জের নৃসিংহ ও গণেশ বড়াশির ব্রোঞ্জের লক্ষ্মী, মাদপুরার বিষ্ণু দৌলতপুরের (২৪ পরগণা) বিষ্ণু, কাটাবেনের বিষ্ণু ও জৈনমূর্ত্তি, সাগরদ্বীপের রাম, হনুমান ও জৈনমূর্ত্তি, পাথর প্রতিমার জৈনমূর্ত্তি (শ্বেতাম্বর); কপিলমুনির বুদ্ধ প্রভৃতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত বেশি বিষ্ণু মূর্ত্তি পাওয়া গেছে যে সুন্দরবন অঞ্চলে একটা বৈষ্ণব ভাবধারা প্রবাহিত ছিল, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। জৈন ও বুদ্ধ মূর্ত্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে, বুদ্ধমূর্ত্তির তুলনায় জৈনমূর্ত্তির সংখ্যাই বেশি। গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই পাওয়া গেছে।

ত্রয়োদশ শতকের পরে কোন্ অজ্ঞাত কারণে সুন্দরবন জনপদের সমৃদ্ধি হ্রাস পায়। সেটা রাজনৈতিক কারণও হতে পারে, প্রাকৃতিক কারণও হতে পারে। কেহ কেহ বলেন, সুন্দরবন অঞ্চলে ভূমির উত্থানপতনই এর জন্যে দায়ী। রায়মঙ্গল ও মালঞ্চ নদীর মোহানার দক্ষিণে ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার খানিকটা নিচেই সমুদ্রের গভীরতা পঞ্চাশ ষাট ফুট থেকে হঠাৎ একেবারে শতেরো শ' আঠারো শ' ফুট নেমে গিয়ে এক অতলস্পর্শের সৃষ্টি করেছে। বঙ্গোপসাগরে পতিত সমস্ত নদীর মুখ এই অতলস্পর্শের দিকে। বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতের ফলে এখানে কোন মাটী জমতে পায় না। সুন্দরবনের নিচের নরম মাটী ধীরে ধীরে ক্ষরিত হয়ে উপরিভাগের মৃত্তিকাস্তরের চাপে কোথাও কোথাও বসে যায় ও সহজেই জলপ্লাবিত হয়। পরে পলি পড়ে আবার ঐ সমস্ত জমি উঁচু হয়ে ওঠে। যাই হোক, পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে সুন্দরবন একেবারে জনমানবশূন্য হয়নি। পঞ্চদশ শতকে দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা সুন্দরবনের বাসুদেবপুর গ্রামে পাওয়া গেছে। বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়,' কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি সমসাময়িক গ্রন্থেও পশ্চিম সুন্দরবনের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত ভাগীরথী পথে সিংহল যাত্রাকালে ত্রিপুরাসুন্দরী ও নীলমাধবের পূজা করেন। চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচল গমনপথে ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ শিবদর্শনও অম্বুলিঙ্গঘাটে স্নান করেন। ষোড়শ শতকে ডি-ব্যারোর মানচিত্রে দক্ষিণ বঙ্গের পাঁচটি বড় বড় শহরের চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। ঐ সময় খান জাহান আলি, সৈয়দ হোসেন শা প্রভৃতি মুসলিম অধিকারীবর্গ সুন্দরবনের কিছু কিছু অংশ আবাদ করিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের শেষে প্রতাপাদিত্য যশোরের—সুন্দর-বনের রাজা হন। তাঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত

STUDENTS' P.G.A. CORNWALLIS ROAD

আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য যদুনাথ কর্তৃক 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়বী' আবিষ্কৃত হবার পর তাঁর সম্বন্ধে অনেক নোতুন কথা জানা গেছে। যাই হোক, যশোর, ধুমঘাট, সাগরদ্বীপ, জাহাজঘাটা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার দুর্গ ও নৌকেন্দ্র ছিল।

এর পর প্রাকৃতিক নানা বিপর্য্যয় এবং মগ ও পর্ত্তুগীজ জল দস্যুদের অমানুষিক পীড়নে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যায়। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যায় সমগ্র চন্দ্রদ্বীপ অর্থাৎ বাক্‌লা রাজ্য জলময় হ'য়ে যায় এবং প্রায় দু লক্ষ লোক মারা পড়ে। এই বন্যায় খুলনার দক্ষিণাংশেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তারপর ১৬৮৮ সালের প্রবল ঝড় ও বন্যায় সাগরদ্বীপের প্রায় ষাট হাজার লোক মারা পড়ে এবং সমস্ত ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৭৩৭ সালে এক ভূকম্পের সঙ্গে প্রবল ঝড়ে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়ে সমস্ত সুন্দরবন প্লাবিত করে। তাতে প্রায় ৩০ হাজার লোকের জীবনহানি ঘটে। ১৮৪২ সালের ভূকম্পে বরিশালের কোন কোন অংশের মাটী ভীষণ শব্দের সঙ্গে উঁচু হয়ে ওঠে। এইরূপ বহু ঝড়, বন্যা ও ভূমিকম্প সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

এই সঙ্গে শুরু হয় মগ পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার। বার্ণিয়ার, সিহাবুদ্দিন মহম্মদ তালিশ প্রভৃতির বিবরণী থেকে জানা যায়, এই দস্যুরা ছোট ছোট দ্রুতগামী ছিপ নিয়ে সমুদ্রপথে দ্বীপপুঞ্জের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো অথবা নদী নালা বেয়ে শত মাইল পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করতো। সামনে যা কিছু পেতো তাই লুণ্ঠন করতো। পুরুষদের নিয়ে গিয়ে তারা জাহাজের খালাসি করতো, দস্যুতার কাজে লাগাতো, নয়তো গোয়া, সিংহল, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বিক্রি করে দিতো, মেয়েদের নিয়ে গিয়ে দাসী নিযুক্ত করতো। তারা বন্দীদের হাতের তালুর মধ্য দিয়ে সরু বেত চালিয়ে হালসী গেঁথে জাহাজের পাটাতনে ফেলে রাখতো। পায়রাকে যেমন খুদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদেরও তেমনি অসিদ্ধ তণ্ডুল ছড়িয়ে খেতে দেওয়া হতো। কেবল সুন্দরী মেয়েদের এই শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া হতো। তাদের তারা রক্ষিতা রাখতো অথবা বেশি দামে বিক্রি ক'রে দিতো। সপ্তদশ শতকে পাদ্রী ম্যানরিক আরাকানরাজকে লেখেন, সকলেই জানে পর্ত্তুগীজরা প্রতিবছর বাকলা, সলিমাবাদ, যশোহর, হিজলী প্রভৃতি আক্রমণ ক'রে আপনার রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করে। পাঁচ বৎসরে তারা আঠারো হাজার লোক আপনাকে উপহার দিয়েছে। বস্তুতঃ বহু খ্রীষ্টান পাদ্রী দশ বৎসরে যতো না খ্রীষ্টান করতে পারতো, তারা এক বছরেই তার থেকে ঢের বেশী খ্রীষ্টান করে ফেলতো। ছেলে ধরার কাহিনীও আদৌ মিথ্যা নয়। পর্ত্তুগীজরা ছোট ছোট ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করতো। সাগর দ্বীপ, তাড়া, হিজলী প্রভৃতিতে তাদের প্রধান আড্ডা ছিল। সুন্দরবনের হরিণঘাটার মোহানায় সমুদ্রতীরে আজও বহু মগ ও ফিরিঙ্গী পল্লী এই অত্যাচারের দুঃখজনক স্মৃতি বহন করছে।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে সুন্দরবনের কিছু কিছু লৌকিক সাহিত্যও গড়ে ওঠে, তন্মধ্যে কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নোতুন জিনিষ বলে আমরা এর গল্পাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"বড়দহের সদাগর দেবদত্ত তুরঙ্গ শহরে বাণিজ্য যাত্রা করেছে। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি যেমন কমলে কামিনী দেখেছিল, দেবদত্তও তেমনি রাজদহে দেখলো সাগরে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি। তুরঙ্গ শহরে পৌঁছে দেবদত্ত এ কথা রাজা সুরথকে বলে, কিন্তু এ দৃশ্য তাঁকে দেখাতে না পেরে কারারুদ্ধ হয়। বহুদিন পরে দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার খোঁজে তুরঙ্গ শহরে যাবার জন্য নৌকা গড়ার উদ্দেশ্যে রতাই বাউল্যাকে কাঠ কেটে আনতে আদেশ দিল। রতাই যে বনে কাঠ কাটছিল সেই বনে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের একটি গাছ ছিল। সেই গাছ কাটায় দক্ষিণ রায়ের অনুচরেরা তাঁকে খবর দিল। তিনি ছটা বাঘ পাঠিয়ে রতাইয়ের ছ' ভাইকে মেরে ফেল্‌লেন। ভ্রাতৃশোকে রতাই আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি দৈববাণী দিলেন—

পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে।

দৈববাণী শুনে রতাই সেইখানেই পুত্র বলি দিয়ে দক্ষিণ রায়ের পূজা দিল। অমনি দক্ষিণ রায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে রতাইএর পুত্র ও ছ' ভাইকে বাঁচিয়ে দিলেন। তারপর হনুমান ও বিশ্বকর্ম্মা ডিঙা গড়ে দিল। পুষ্পদত্ত পিতার অন্বেষণে ডিঙা ভাসালো। খনিয়া নামে এক স্থানে এসে দেখলো, কতকগুলো ফকির একটা মাটীর ঢিপি ও একখানি মুণ্ডমাত্র পূজা করছে। পুষ্পদত্ত এর হেতু জিজ্ঞাসা করলে মাঝি বললো—

ধনপতি নামে এক সদাগর এখানে দক্ষিণ রায়ের পূজা দিয়েছিলো, কিন্তু বড়খান গাজির পূজা দেয়নি। ফকিররা তাকে গাজির পূজা দেবার উপদেশ দিলে সে তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। একথা গাজির গোচর হলে গাজি রেগে গিয়ে বাঘ ও ফকির পাঠিয়ে দক্ষিণ রায়ের মূর্ত্তি ও ঘর ভেঙে দেন। এই খবর পেয়ে দক্ষিণ রায় গাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। উভয়েরই সৈন্তদল বাঘ। গাজির সৈন্তদল হেরে যায় দেখে গাজি ক্রুদ্ধ হয়ে পয়গম্বর-দত্ত খাঁড়া দক্ষিণরায়ের গলায় বসিয়ে দিলেন। রায়ের কাটামুণ্ড আবার কাঁধে জোড়া লেগে গেল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধে পৃথিবী রসাতলে যায় দেখে ভগবান অর্দ্ধ কৃষ্ণ-অর্দ্ধ-পয়গম্বরবেশে আবির্ভূত হয়ে উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন।

তারপর পুষ্পদত্তও সমুদ্র মধ্যে সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখে তুরঙ্গশহরে উপনীত হলো। এর পরের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীরই অনুরূপ।

অষ্টাদশ শতকের কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর কালু রায় বা দক্ষিণ রায়ের পালা মেদিনীপুর ও ২৪পরগণার বিভিন্ন অংশে গীত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও এই পুঁথি অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। স্থানান্তরে আমরা এই পুঁথির বিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছি।

হিন্দুদের রায়মঙ্গল কাব্যের প্রতিরূপে মুসলমান কবিরাও 'গাজির গান' রচনা করেন। তন্মধ্যে, আবদুল গফুরের 'কালু গাজি ও চম্পাবতী' উল্লেখযোগ্য।

আজও ২৪পরগণা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে গাজির গান গীত হয়। বড়খান গাজি ও দক্ষিণ রায় ২৪পরগণার বিভিন্ন স্থানে পূজা পান। কুম্ভীরদেবতা কালু রায় হিজলীতে পূজিত হচ্ছেন।

একদল অধ্যবসায়ী মানুষ কিন্তু সুন্দরবনে চিরদিন আনাগোনা করেছে। কখনও মৎস্ত ও কাষ্ঠসংগ্রহে, কখনও মধু আহরণে, কখনও বা লবণ-অন্বেষণে।

কোম্পানির আমলে সুন্দরবন লবণশিল্পের জন্ত বিশেষ খ্যাত ছিল। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সুন্দরবনে অতি সহজেই প্রচুর লবণ উৎপন্ন হতো। সুন্দরবনের ২৪পরগণা এজেন্সি বছরে আট লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করতো। সাতাশ হাজার বিঘা জমি জুড়ে এর লবণ প্রস্তুতির কাজ চলতো। ১৮৪৮ সালে এজেন্সি সিষ্টেম্ উঠে যাবার পরও কিছুদিন এর কাজ চলে। আজও সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, বুড়াবুড়ি, বুলুছরি, গুর্দ্দা প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতির চিহ্ন দেখা যায়।

সম্প্রতি ভারত বিভাগের ফলে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও ২৪পরগণার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চল ছাড়া পূর্ব্ব-ভারতে লবণচাষের উপযোগী জমি আর নেই। বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় জানা গেছে, মাদ্রাজ অঞ্চলের সমুদ্রজলের সঙ্গে এখানকার সমুদ্র জলের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বর্ত্তমান অন্নসমস্তার দিনে ধান চাষের জমি কমিয়ে লবণ চাষ বাড়াবার কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু কাঁথি ও ২৪পরগণার সপ্তমুখী, ঠাকুরান ও মাতলা নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী দ্বীপ-গুলির প্রান্তিক অঞ্চলে এমন বহু জমি আছে, যেখানে লবণ চাষ করলে ধান চাষের দ্বিগুণ আয় হবে।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকার মধু ও মোম সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের লবণ আবহাওয়ায় প্রচুর গরানের গুল্ম জন্মে, সেই সব গুল্মে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বাসা-বাঁধে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ষ্ট্রীনসাম্-মাষ্টার তাঁর ডাইরীতে সুন্দরবনের মধুর কথা উল্লেখ করে গেছেন।

বাংলায় আজ প্রচুর মৎস্তের প্রয়োজন। সুন্দরবনেও যথেষ্ট মাছ জন্মে। পশ্চিম সুন্দরবনে বৎসরে দু'লক্ষ পনেরো হাজার মণ টাটকা মাছ এবং দু'লক্ষ বাট হাজার মণ শুটকি মাছ পাওয়া যায়। এতদিন বিদেশী-

রাই এই মাছের ব্যবসা চালিয়ে এসেছে। এখন যদি সমবায় প্রথায় এই ব্যবসা চালানো যায় এবং সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা যায়, তবে আজকার চাহিদার কিছুটা পূরণ হতে পারে।

১৮৩০ সালে ডাম্পিয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন জরীপ হয় এবং সমস্ত সুন্দরবন লাট বা খণ্ডে বিভক্ত হয়। কিন্তু যে প্রজাপত্তনের ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার করেছিলো, তাতে তাদের সুচতুর বণিক বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া গেছে। কারণ তারা স্বজাতীয় আমদানি ক'রে তাদের মধ্যেই সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশ ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করে নেয়। এখনও সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ক্যানিং, হ্যামিল্টন, ফ্রেজার, মিসেস্ মোরেল প্রভৃতির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সব ব্যবস্থার মূলে কিন্তু ছিল তাদের স্বার্থরক্ষার সুকৌশলী চেষ্টা। প্রজা-সাধারণের কোন হিত দীর্ঘকাল ধরে তো হয়ই নি, অধিকন্তু সুন্দরবনে যে ভূমিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা বর্ত্তমানে আমাদের সামনে এক বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এর সমাধানের চাবিকাঠি এখন আমাদের জাতীয় সরকারের হাতে এসেছে। আজ এ-সব সমস্যার সমাধান এবং এই বিস্তৃত ভূভাগ ও সম্পদকে মানুষের কাজে লাগানোর সব রকম প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের অতীত-ঐতিহ্য ও বিস্মৃত-কাহিনী উদ্ধারের জন্য আমি বাংলার বিদগ্ধ সমাজের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অবশেষে

অনিমা মুখোপাধ্যায়

হাহাকার, অশ্রুজল, ব্যর্থতাই জেনেছে নিঃশেষে,
তাই আজ নূতন চেতনা অবশেষে
নবরূপ পরিগ্রহ করে
চরম আঘাত হানিবারে।
দুঃখ আজ ক্রোধ ব্যঞ্জনায়
পুঞ্জীভূত ধুমায়িত হয়,
অশ্রু আজ অগ্নি হয়ে ফিরে
শিবিরে শিবিরে।
অবাক নূতন চোখে তাই
কোটি কোটি মূক মুখে চাই:
দৃঢ় মুষ্টি…স্থির পদপাত
বজ্র কণ্ঠে দৃপ্ত প্রতিবাদ—

মিছিলে মিছিলে
রক্ত নদী পার হয়ে চলে;
মুক্তির জোয়ার বয়ে আনে
দেশে দেশে।
যত প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ
ভেঙে চলে…হানে প্রতিশোধ:
দুর্ব্বার বলিষ্ঠ অভিযান—
সাম্যের ওঠে জয়গান
দিকে দিকে,
লাঞ্ছিত মানুষের মুখে।

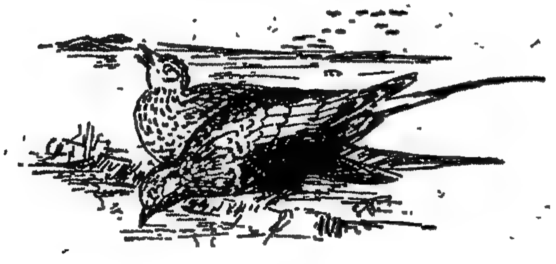

দুরবগাহ

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঙা মাসীমা হাসতে হাসতে এসে বারান্দার উপরে দাঁড়ালেন। এক হাতে তাঁর একটা অর্দ্ধ সমাপ্ত সোয়েটার, অন্য হাতে পশমের গুটী, বললেন, গলিতে যখন টাঙাটা ঢুকলো তখনই মনটা আমার ছাঁৎ ক'রে উঠেছিলো, তখনি মনে হচ্ছিলো, কে যেন আসবে।

বারান্দায় একটা মাঝারি স্যুটকেশ আর বেডিংটা নামিয়ে রেখে রজত এসে ততক্ষণে প্রণাম করেছে রাঙা মাসীমাকে, বললে, একেই বলে বোধ হয় অন্তরের যোগাযোগ, তার পরে সব খবর ভালো তো মাসীমা?

—হ্যাঁ বাবা, সব ভালো। আয় ঘরে আয়,-আনন্দে রাঙা মাসীমার সমস্ত মুখটা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো, বললেন, কতোদিন পরে যে তোকে দেখলুম, তারপরে বাড়ীর খবর সব ভালো তো?

—হ্যাঁ, মা ভালোই আছেন, কেন, কোন চিঠি পান নি এর মধ্যে?

—না বাবা, অনেক দিন কোনো খবর পাইনি তো। সেই মাসখানেক আগে একবার লিখেছিলেন, তুই এখানে আসবি। বাস, সেই শেষ চিঠি, তার পরে আর কোনো খবর নেই ন'দির।

—সে কি! রজত গায়ের থেকে আস্তে কোটটা খুলে ফেললে—এই তো দিন চারেক আগেও একখানা যেন চিঠি দিলেন আপনাকে। আমাকে আসবার আগে তাইতো বলছিলেন।

—এখানকার কথা আর বলবেন না, একটা বছর আঠারো বয়সের মেয়ে হঠাৎ কথা বললে, রায়ট লাগবার পর থেকে ডাকের যে কি গোলমাল আরম্ভ হ'য়েছে, তা আর বলবার নয়।

রজত চোখ তুলে থমকে গেলো—একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে রাঙামাসীমার দিকে। রাঙামাসীমা ততক্ষণে হেসে উঠেছেন—আরে বিনু, বিনু পেন্নাম কর শীগ্‌গীর, বোকা মেয়ে—রজু যে তোর বড়দা হয় রে।

এবারে রজত একেবারে কেটে পড়লো। বললে, এঁ্যা! আমাদের বিনুরাণি!—বলিস কিরে? এতো বড়ো হয়ে গেছিস তুই এই আট বছরে? থাক্, থাক্ আর পেন্নাম করতে হবে না! অখণ্ড পরমায়ু হোক, খুব ভালো রাজার মতো বর আসুক, আমরা গিয়ে একপাত করে নেমন্তন্ন খাই—।

—যান! আপনি ভারী ইয়ে। কোন রকমে প্রণামটা সেরে বিনু ছিটকে ঘরের একপাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো, ওরকম ক'রে যদি কথা বলবেন তো দেখবেন মজা।

রাঙা মাসীমা ইতিমধ্যে একটা আরাম কেদারায় ব'সে পড়েছেন. বললেন, পথে খুব কষ্ট হয়েছে তো বাবা?

—তা খানিকটা হোয়েছে, মোগলসরাই পর্য্যন্ত বেশ ভীড় ছিলো—তার পরে অবশ্য একটু হাত পা ছড়িয়ে আসতে পেরেছিলুম। আমাদের মতন লোকের, মাসীমা, ও থার্ড ক্লাসে আসা পোষায় না, তার ওপরে এই এতো দূরের পথ; কিন্তু বরাত। রজত নিজের কপালটা দেখিয়ে দিলে, বললে: কোন উপায় নেইএখানে।

রাঙামাসীমা ভিতরের কথাটা জানতেন, বললেন, ইন্‌টারের পাশ দেয় না বুঝি? কতদিন চাকরী হোলো তোর?

—না মাসীমা, তাহলে আর ভাবনা ছিলো কি; চাকরী তো আজ চার বছর হোলো করছি. কিন্তু হারাম-জাদাদের কি এসব দিকে লক্ষ্য আছে? রজত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

পিছন থেকে বিনুর পরের ভাই পিন্টু বললে, তা থার্ড ক্লাস তো ভালো রজুদা, মহাত্মা গান্ধী তো থার্ড ক্লাস ছাড় কোথাও যেতেন না—মহাত্মাজী কতো বড়ো মানুষ ভাবুন তো।

রাঙামাসীমা হাসলেন, বললেন, নে তোর এখন লেকচার থামা পিন্টু, জানো বাবা রজত, ছেলে আমার এখন থেকেই মহা 'স্বদেশী' হ'য়ে উঠেছে, খদ্দর ছাড়া পরবেন না, নিরামিষ ছাড়া খাবেন না, তার পরে আবার ক'দিন থেকে খেয়াল উঠেছে পিকেটিং করে এবারে

STUDENT C. A. ... MON-RO

জেলে যেতে হবে। ব'লে সাগ্রহে একবার পিণ্টুর দিকে তাকালেন তিনি।

রজত কোলের কাছে টেনে নিয়ে এলো পিণ্টুকে, আদর করে বললে, বাঃ পিণ্টু বাবু আমাদের লক্ষ্মী ছেলে হ'য়েছে দেখছি—কোন ক্লাস হোল এবার তোর?

ক্লাস সেভেন। পিণ্টু চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে।

—বাঃ পিণ্টু আমাদের সোণা ছেলে, কিন্তু এত কম বয়সেই তোর চশমা নিতে হোলো পিণ্টু, এটাই বড়ো দুঃখের।

—আর বোলো না বাবা, দিন রাত খালি বইয়ের ওপরে ঝুঁকে আছে—তাও যদি পড়ার বই পড়ে—যতো সব আজে বাজে বই—এর ওর তার কাছ থেকে চেয়ে আনবে—উনি তাই সেদিন ভয়ানক বকছিলেন ওকে।

দরজার ওপাশ থেকে এবার বিনু ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, বললে, বেশ তুমি মা, রজুদাকে এ'রকম ক'রে বসিয়ে রাখবে—হাত মুখ ধোবেন না উনি?

—হ্যাঁ মা, তাই তো। ওঠো বাবা রজু। ভারী অপ্রতিভ হোয়ে গেলেন রাঙা মাসীমা: আমার একটা ভারী খারাপ অভ্যাস আছে বাবা রজু, গল্প আরম্ভ হলে আর থামতে পারি না—যাও, হাত মুখ ধুয়ে একটু চা খাও, তার পরে তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করবো। ও রে, চাটা চড়িয়ে দিয়েছিস তো? ব'লে রাঙামাসীমা বিনুর দিকে চাইলেন।

—হ্যাঁ, তা আর তোমাকে বলতে হবে না, এমন কি আমি নিমকিও ভেজে রেখেছি।

এবারে অবাক হোলো রজত। রাঙামাসীমার দিকে চেয়ে বললো, বিনু আমাদের সত্যই বড় হোয়েছে মাসীমা, কেমন আপনাকে ধমক দিয়ে কথা বলে, সংসারের কেমন সব কাজ চমৎকার গুছিয়ে করে।

—আবার আপনার লেকচার আরম্ভ হোলো তো? মুখ টিপে একটু হেসে বিনু চাইলো রজতের দিকে।

—আচ্ছা বাবা এই উঠছি। রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটু দূরে রাঙামাসীমার ছোট ছেলে তপু দাঁড়িয়েছিলো, অবাক হয়ে সে এতোক্ষণ এক কোণ থেকে এই নবাগতটীকে লক্ষ্য করছিলো, ভারী সুন্দর ছেলেটী, বছর ছ'য়েক বয়েস, দুই হাতে রজত তাকে কোলের উপরে তুলে নিলে, বললে, তুমি বুঝি তপু বাবু! এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?

তপু ততক্ষণে রজতের এই আকস্মিক আদরে একটু বিস্মিত হোয়েছে, তাড়াতাড়ি একটা মৃদু অস্ফুট শব্দ করে এঁকে বেঁকে নেমে পড়বার জন্তে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

—ও ভারী শান্ত ছেলে আমার, ও যে বড় একটা কারো কাছে যেতে চায় না সহজে, রাঙামাসীমা বুনতে বুনতে হঠাৎ চোখ তুলে ব'ললেন: আয়—আয়, আমার কাছে আয় তপু, নতুন মানুষ দেখেছে কি না, তাই সঙ্কোচ করছে একটু।

—চকোলেট খাবে তপু বাবু, চকোলেট? রজত ততক্ষণে পকেট থেকে এক বাক্স চকোলেট বের করেছে, বললে, খুব ভালো জিনিষ, খেয়ে ছাখ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, তপু গিয়ে দুই হাতে রাঙামাসীমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

চায়ের আসরটা তাদের মন্দ জমলো না। বিরাট ঢালা বারান্দায় একধারে মোড়া আর বেতের চেয়ার পেতে বেশ গোল হয়ে বসলো তারা। রাঙামাসীমা বসলেন মাঝখানে, এপাশে পিণ্টু, ওপাশে তপু, তার পাশে রজত—আর তারো পার্শে ছোট্ট একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলো বিনু। গোল কাঠের টেবিলটার ওপরে কেটলী, চিনির শিশি, চামচে সব আস্তে আস্তে গুছিয়ে রেখে, তার পরে ট্রেতে করে চমৎকার এক সেট চায়ের কাপ ঘর থেকে নিয়ে এল বিনু। তার পরে কাপ আর ডিসগুলো সাজিয়ে চা ঢালতে আরম্ভ করলো।

রজত বললো, বাঃ চমৎকার কাপগুলো তো!—হুঁ হুঁ। হঠাৎ মাথা ঝাঁকালো বিনু, বললে, কে পছন্দ করে কিনেছে, সেটা দেখতে হবে তো?

—উঃ ভারীর তো কাপ—আমি ওর থেকে অনেক ভালো কাপ এনে দিতে পারি, জানেন রজুদা, দিদিটার আজকাল বড্ডো অহঙ্কার বেড়ে গেছে।

—তা বাড়বেই তো, তবে তোর থেকে কম। ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বিন্নু আবার উত্তর দিলে। পিকেটিং করে জেলে বাবার মতো অহঙ্কার তা বলে আমার নয়।

—ফের আবার ওই সব কথা বলছো মেজদি?

—আঃ বলতে না বলতেই আবার দুটোতে ঝগড়া লাগালি তো? থাম্ না বাপু, কেন ছেলেটাকে রাগাচ্ছিস মিছিমিছি। রাঙামাসীমা এবার নিজেই কেটলীটা হাতের উপর তুলে নিলেন।

—না—রাগাবো না। কেন ওর নাম ক'রে ও কথা, বলে আমার সঙ্গে? দাঁড়াও না বাবা আসুন। বিন্নু মাথা ঝাঁকিয়ে শাসন করলো পিন্নুকে।

অনিমেষ বাবু এলেন বেলা দুটোর কাছাকাছি। ব্যস্ত মানুষ—প্রায় সারাদিনই তাঁর বাইরে বাইরে কাটে। লোকে বলে এ-অঞ্চলে এরকম ডাক্তার উনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। রোগের ধন্বন্তরি। কোনরকমে দুপুরের দিকে একবার খাবার সময় ক'রে নেন—তার পরে বিকেল চারটে থেকেই আবার 'কল'-এ বেরোন।

রজতকে দেখে ভারী খুসী হ'লেন অনিমেষ বাবু। ষ্টেথিস্কোপ্‌টা বেশীর ভাগ সময়েই মালার মতো ক'রে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন—এর সঙ্গে তাঁর বর্ত্তমান জীবনের ভারী চমৎকার একটা মিল আছে। সত্যিই তিনি যেন আর্ত্তের সেবার এই মহৎ দায়িত্বকে নিজের গলার মালা করে নিয়েছেন। তাই যখনই কল আসুক, নেহাৎ কোনো বাধা না ঘটলে বেরিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। অর্থের দিকেও দৃষ্টি লোভ-লোলুপ নয়, এমনিই তাঁর যা মাসিক আয়, তা' অনেকের কাছে ঈর্ষাজনক, গরীবরা তাঁকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে অনেকদিনই দেবতার আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

পিঠ চাপড়ে বললেন, খুব খুসী হ'লাম রজুবাবু! অনেকদিন পরে এলে এ-দিকে, তার পরে থাকবে তো দু'চার দিন?

রাঙা মাসীমা গালে হাত দিয়ে আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, তোমার হ'ল কি-গো? এই না সে-দিন বললুম, রজু আসছে এখানে চাকরীতে বদলী হোয়ে, এখন এই কাশীতেই ওকে থাকতে হবে কিছুদিন—আচ্ছা মানুষ যা হোক।

একান্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন অনিমেষ বাবু, বললেন: তাই তো! দেখেছো, আমার একেবারেই মনে নেই কথাটা, বেশ, বেশ, আচ্ছা—আমাকে একটু পরেই বেরুতে হবে—রাত্তিরে তোমার সঙ্গে কথা বলবো, কেমন রজু বাবু?

বেশ তো! রজত শ্রদ্ধানত দৃষ্টিতে একবার তাকালো তাঁর দিকে—অনিমেষবাবু বেরিয়ে গেলেন।

রাঙা মাসীমা রজতের দিকে চেয়ে হাসলেন এবার—বললেন, এই ওঁর জীবন বাবা, মাঝে মাঝে তাই অবাক হ'য়ে ভাবি, এই অক্লান্ত উৎসাহ ওঁর আরো কতো দিন থাকবে—সব থেকে ভয় করে শরীরের কথা ভেবে—বিশ্ব শুদ্ধ লোকের অসুখের চিকিৎসা ক'রে বেড়ান—অথচ নিজের কথা একদিনও ভাবেন না।

কথা হ'ল দিন সাতেক এখানে থেকে তবে রজত ওদের রেলওয়ের মেসে চ'লে যাবে। এসেছে যখন তখন তো মেসে থাকবেই—তবু দু'চার দিন থাকুক না এখানে রজত—এতোদিন পরে যখন দেখা হ'ল। অনুরোধটা প্রথমে এসেছিল বিন্নুরই কাছ থেকে, রাঙা মাসীমা সেটার ওপরে জোর দিয়ে বললেন, তাই হোক বাবা, দিন সাতেক তুই থাক এখানে।

অবশ্য কথাটা অন্যভাবেও উঠেছিলো। রাঙা মাসীমা প্রস্তাব ক'রেছিলেন, ওঁর এখানে থেকেই না হয় চাকরী করলো রজত—এখানে যখন এসেছে তখন আবার কেন আলাদা ক'রে মেসের হাংগাম-করা। কিন্তু রজতই বাধা দিয়েছে। ব'লেছে: না মাসীমা, মেসে থাকলে আমার চাকরীর দিক থেকে কয়েকটা সুবিধে আছে, এতো দূরের এখান থেকে সেটা হবে না।

সাতদিন পরে রেলওয়ে মেসে চ'লে গেল রজত, কিন্তু বিন্নুর সঙ্গে একটা চুক্তি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত—রোজ সন্ধ্যার পরে একবার অন্ততঃ চা খেতে এখানে আসবেই সে, এই অবসরে তাকে নিয়ে বিন্নু তাদের চায়ের আসরটাকে ভাল ক'রে বসাবে। রজত রাজী হ'ল।

অবশ্য বিনুর হাতের তৈরী চায়ের-লোভও রজতের কাছে কম নয়, সে বললে : তোর হাতের এই অদ্ভুত চা সত্যি আমি ভুলবো না কোনো দিন, অনেক হাতের অনেক চা খেয়েছি সারা জীবনে, কিন্তু তোর তৈরী চা যেন অন্য রকম। রাঙা মাসীমা তো হেসেই অস্থির, বললেন, রজু আমাদের মাঝে মাঝে এমন একেকটা কথা বলে 'অদ্ভুত চা'—তা তোর কাছে সবই 'অদ্ভুত' বটে।

হাসি, ঠাট্টায়, আনন্দে, গানে রজতের এই একক জীবনের নির্জনতা ভ'রে উঠ্‌লো। সব থেকে ওকে বেশী আকর্ষণ করতো বিনুর গান—অপূর্ব্ব গলা ছিলো বিনুর—প্রায় প্রত্যেক দিনই তাদের চায়ের আসরে বিনুর গানে যেন সুরের ঝরণা নাম্‌তো।

সাতদিন পরে মেসে চ'লে গেলো রজত। কয়েকটা দিন যেন ভারী ফাঁকা ফাঁকা লাগ্‌লো চারদিক—বিনুর মতো রাঙা মাসীমাও সেটা অনুভব করলেন, এক সময়ে বললেন, রজুটা থাক্‌লে বেশ হোতো—কিন্তু যা একরোখা ছেলে।

একদিন এর মধ্যে নিয়মিত সান্ধ্য-আসরে রজত উপস্থিত থাক্‌তে পারলো না। অনেকক্ষণ বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রইলো বিনু। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি রজুদা আস্‌চেন—কিন্তু রাত ৮টা বেজে গেলো—রজত এলো না।

পরের দিন যথাসময়ে রজত এলো। রাঙা মাসীমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, বললেন, কাল এলি না, কোনো কাজে আটকে গিয়েছিলি বুঝি?

—হ্যাঁ—মাসীমা, অফিসের এক বন্ধু ছাড়্‌লো না কিছুতে, তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলো ধ'রে, তাই—।

নিয়মিত সান্ধ্য-আসর বস্‌লো। কিন্তু বিনু এলো না। রজত বললে, ব্যাপার কি মাসীমা, বিনু কোথায়?

—ও তো সন্ধ্যে থেকেই শুয়ে আছে বাবা, ভয়ানক মাথা ধ'রেছে—আজ আর উঠ্‌তে পারবে না মনে হচ্ছে।

দেরী করলো না রজত, পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুক্‌লো। নীল একটা আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে।

টেবিলের উপরে ধূপদানিতে ছুটী ধূপ—গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরা; বিছানার এক প্রান্তে চাদর ঢাকা দিয়ে চুপচাপ বিনু শুয়ে আছে।

আস্তে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো রজত, তারপরে আরো আস্তে ডাক্‌লো—বিনু!

উত্তর নেই।

—বিনু!

চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

এবারে আস্তে মাথার উপরে তার ঠাণ্ডা হাতটা রাখলো রজত, ডাক্‌লো—বিনুদিদি?

আস্তে হাতটাকে ধ'রে একেবারে নিজের বুকের উপরে টেনে নামিয়ে আন্‌লো বিনু, তারপরে আস্তে ছেড়ে দিলে।

বিছানার একপাশে এসে রজত বস্‌লো, বললে, মাথা ধ'রেছে তোমার বিনুদিদি?

—হুঁ-উ-উ!

—তাই অস্তে উঠতে পারছো না?

বিনু নিরুত্তর।

—রাগ ক'রেছো বিনুদিদি?

মুখটা ঈষৎ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুলো বিনু। আরো কাছে স'রে এসে রজত বললে, তুই বিশ্বাস কর বিনু—আমি কাল বড্ডো আটকে প'ড়েছিলুম—ও বিনু, শোন ভাই!

আস্তে মাথাটা এবারে ঘোরালো বিনু, বললে, যাও তোমার সঙ্গে আর আমি কোনোদিন কথা বলবো না রজুদাদা—জানো কাল আমি কি ছটুফটু ক'রেছি?

জানি ভাই, সেই জন্যেই তো আজ ছুটে এলুম এতো তাড়াতাড়ি।

দিনের পর দিন যেতে লাগলো। প্রায় মাস ছয়েকের কাজ হ'য়ে গেলো রজতের এখানে। শেষপর্য্যন্ত কাশীটাকে ভালোই লাগলো তার। প্রথমে ভেবেছিলো সেই গলি-ঘুঁজির আর শিবের দেশ বোধহয় ভালো লাগবেনা। ছোটবেলা থেকে গল্প শুনেছিলো অনেক; এবারে চোখে দেখে সন্দেহ নিরসন হোলো।

একটা জিনিষ এই, সন্ধ্যের পরে যতো কাজই থাকুক, গোধুলিয়ার দিকে রাঙামাসীমার বাড়ী যেন তাকে

টান্‌তো। বিকেল হ'য়ে এলেই সমস্ত দিনের কর্মতারাক্রান্ত মন যেন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। যতই ছুটীর সময় এগিয়ে আসতো ততোই, নিবিড় একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির ছায়া নামতো তার মনে, অফিস থেকে এসে প্রায়ই তাই সে গোধুলিয়ার পথ ধরতো।

অনিমেষবাবুর সংগে ইতিমধ্যে দিন দুয়েক কথা হোয়েছে। বিন্নুর সম্বন্ধে তাঁর অনেক আশা। ব'লেছেন, বিলেত পাঠাবেন ওকে। লেডী ডাক্তার হবে ও—বিন্নুরও নাকি ইচ্ছে আছে—অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী মেয়েটী, বিয়ে দিয়ে অসময়ে জীবনটাকে কিছুতে নষ্ট হোতে দেবেন না অনিমেষবাবু।

এরপরে পুরো দুবছর কেটে গেছে।

সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছিলো। রাঙামাসীমা ডাকলেন, রজতকে। বললেন: বাবা রজু, তোর সংগে বড়ো জরুরী কথা ছিলো, কাল একটু বেলাবেলি আসতে পারবি?

—কেন মাসীমা?

একটু হেসে বললেন, সিনেমায় যেতুম। কিন্তু তবু রজতের চোখ এড়ালোনা—রাঙামাসীমার হাসিটা কেমন যেন স্বতোৎসারিত মনে হোলো না, বললে, বেশ তো যাবো, বিন্নুও যাবে তো?

—না—বাবা, ও বাড়ী থাকবে, একজনের তো না থাকলে চলবেনা—আর অনেকদিন আমিও কোথাও বের হোতে পারছিনা—তাই।

—তা বেশ তো! সেদিনের মতো চা খেয়ে রজত রওনা হোলো।

পরের দিন বেলা থাকতেই রাঙামাসীমাকে নিয়ে সে পথে নামলো।

খানিকটা গিয়ে রাঙামাসীমা বললেন, সিনেমায় আর গিয়ে দরকার নেই রজু, তোর সংগে আমার একটা খুব দরকারী কথা ছিলো, আয় বরং দশাশ্বমেধ ঘাটের ওদিকটায় যাই।

তখন সন্ধ্যে হোয়ে এসেছে। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোগুলো সব জ্বলে উঠেছে। দূরে কয়েকটা শিবের মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে—রজত রাঙামাসীমার পিছন পিছন এগিয়ে চললো।

একটা প্রায় নির্জন জায়গায় সিঁড়ির একটা ধাপের ওপরে এসে বসলেন রাঙামাসীমা, পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আয়—বোস এখানে।

কুলকুল ক'রে সামনে গংগা ব'য়ে চ'লেছে। ওপারে অস্পষ্ট একটা নীল বনরেখার আভাষ পড়ছে চোখে। নারীপুরুষের মিশ্রিত একটী বিরাট দল মস্তো বড়ো একটা নৌকো ক'রে গংগা বিহারে বেরিয়েছে—তাদের শাড়ীর আর চশমার ঝলকে গংগার জলও যেন ঝলমল করছে। কলহাস্যে মেয়েরা মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়ছে—মাঝিরা একদিকে ব'সে চুপচাপ নৌকো বাইছে।

বজরাটা আস্তে আস্তে কেদার ঘাটের দিকে এগিয়ে চললো।

রাঙামাসীমা সেই দিকে চেয়ে খুব আস্তে বললেন, তোকে আজ একটা কথা বলবো রজু। গলাটা তাঁর কেমন যেন ভারী ভারী, কেমন যেন অস্বাভাবিক। একবার চোখ তুলে রজত তাকালো রাঙামাসীমার মুখের দিকে। না, তেমন কোনো আশঙ্কার কারণ নেই—তবু যেন ঈষৎ গম্ভীর মনে হোলো তাঁর চোখ মুখ। বললেন, অনেকদিন থেকেই বলবো ভাবছিলুম—কিন্তু সঙ্কোচের জন্তে বলতে পারি নি।

—সঙ্কোচ! একটু যেন দম বন্ধ হ'য়ে এলো রজতের, তবু সে সম্পূর্ণ ক'রে তাকালো রাঙা মাসীমার মুখের দিকে, ধরা আর অস্পষ্ট গলায় বললে, বলুন!

—এটা বুঝতে পারছিস? কোনো ভূমিকা না ক'রেই রাঙা মাসীমা কথা আরম্ভ করলেন, বিন্নু বড়ো হোয়েছে, আজকাল তার সম্বন্ধে আমায় বিশেষ ভাবে ভাবতে হয়।

—নিশ্চয়ই! স্বীকার করলো রজত।

—তাই, বাবা, আমাকে—তার মা হিসেবে একটু বিশেষ ভাবে সাবধান হোতে হবে। ছেলেমানুষ তোমরা—ঠিক তো বোঝো না, কী থেকে কী হ'বে। তারপরে যদি একটা অঘটন ঘটে যায়—তখন, অনেক ভেবেও কূল পাওয়া রীতিমতো কঠিন হ'য়ে ওঠে, তাই সময় থাকতে—

STUDENTS' COMMON-ROOM P.G.A.

রজত বললে, আপনি একটু স্পষ্ট ক'রে বলুন মাসীমা, আমি খোলাখুলিই সব কথা শুনতে চাই।

—তোমার আর বিনুর মেলা-মেশার কথাই বলছি বাবা, রাঙা মাসীমা আরো স্পষ্ট হোলেন—এটা বেশ বুঝতে পারছি, বিনু কি চায়, তুমিও তো জানো, আমার কাছে লজ্জা কোরো না, যেটা স্বাভাবিক সেটাই ঘটেছে, সুতরাং প্রতিবিধান দরকার বাবা।

ঈষৎ আরক্ত হোয়ে উঠলো রজতের মুখ, বললে, আপনার ওটা ভুল ধারণা মাসীমা।

—না বাবা, আমি যা বুঝেছি তা ভুল নয়, আজ একদিন নয়, অনেকদিন থেকেই কঠিন লক্ষ্য রেখেছি তোমাদের ওপরে—প্রমাণ পেয়েই তবে তোমার কাছে একথা তুলেছি বাবা।

প্রমাণ। রজতের মাথাটা হঠাৎ ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠলো। অবশ হোয়ে আসতে লাগলো শরীরটা রাঙা মাসীমা বললেন, এর প্রতিকার কোন্ দিক থেকে করা যায়, সে কথাও ভেবেছি। সত্যি কথা বলতে তোমাকে ও গভীর ভাবে ভালবাসে, তুমিও বাসো, সুতরাং এই দুই তীব্র আকর্ষণ যখন একটা স্বাভাবিক পথ পাবে না, তখন বিপর্য্যয় অনিবার্য্য হোয়ে উঠবে।

আমি তোমার মেশোমশাইয়ের স্ত্রী হোয়ে অন্য কোনো সীমানা পাই আর না পাই, এটা জেনেছি যে, সংস্কারের অনেক উর্দ্ধে উঠলে তবে জনকল্যাণের কথা ভাবা যেতে পারে—উনি তা উঠেছেন এবং সব থেকে আনন্দের বিষয় আমাকেও খানিকটা উঠিয়েছেন, তাই বলছি—তোমরা বিয়ে করো—আমি তার সব আয়োজন নিজের হাতে ক'রে দেবো—কিন্তু গোপনে। আমার শ্বশুর শাশুড়ী এখনো বেঁচে আছেন, তাঁদের এ আঘাতটা থেকে বাঁচাতে চাই।

সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে আসতে লাগলো রজতের, বললে, এ কী বলছেন আপনি মাসীমা? আপনি নিজেই জানেন না আপনি কি বলছেন?

—খুব ভালো জানি বাবা। প্রশান্ত হাসিতে রাঙা-মাসীমার সমস্ত মুখ যেন একবার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো; আর জানি ব'লেই নিতান্ত অর্বাচীনের মতো তোমার কাছে আজকের আমার এই প্রস্তাব।

মুখ নীচু ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো রজত—তারপরে আস্তে মাথা নাড়লো সে, বললে: না, তা হয় না মাসীমা।

বেশ। রাঙামাসীমার কোমল প্রশান্ত দৃষ্টি আস্তে আস্তে কঠিন হোয়ে এলো, বললেন, মেয়েকে এবং তোমাকে, দুজনকেই আমার বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। এখন এটাই আমার কঠিন কর্ত্তব্য—কাল থেকে তোমাদের দেখা হওয়া তাহ'লে আর উচিত হবে না—বাবা।

কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত্ত পার হোলো। তারপরে আস্তে মাথা তুললো রজত, বললে, তাই হবে মাসীমা।

ফিরবার সময়ে সারা পথ তাঁরা আর কোনো কথা বললেন না।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে বারান্দার মুখে, রান্নাঘরের সামনে বিনু দাঁড়িয়েছিলো, বললে, অতো চুপচাপ চ'লে যাচ্ছো রজুদা—চা-টা যে করলুম তা কি ফেলে দেবো?

—তাই দিস্। ম্লান একটু হাসলো রজত। আজ আর সময় নেই, তারপরে সংশোধন ক'রে বললো, আর কোনোদিনই সময় হবে না।

—তার মানে? বিনু আরো কাছে এগিয়ে এলো, বললে, কি বলছো তুমি রজুদা—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—রাঙামাসীমা আমাকে এ-বাড়ী আসতে নিষেধ ক'রেছেন।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া আর উচিত নয়।

—উচিত নয়? বিস্ময়ে বিমূঢ় চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, বললে, রজুদা, সব তুমি খুলে বলো আমাকে আজ।

—সব খুলে বলবার সময় নেই—সংক্ষেপে বলি, রাঙা মাসীমা আমার কাছে আজ তোকে বিয়ে করবার প্রস্তাব ক'রেছিলেন।

—বিয়ে ?

—হ্যাঁ—

—তুমি কি বললে ?

—বললুম, তা হয় না—একটু থেমে রজত কথা শেষ করলো, তাই তাঁর এই নির্দ্দেশ। আচ্ছা বিনু, চললুম।

সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করলো রজত।

—রজুদা, বিনু চাপা গলায় ডাকলো পিছন থেকে, মুহূর্ত্তের জন্যে একবার থেমে আবার নামতে আরম্ভ করলো রজত।

—রজুদা।

রজত ততক্ষণে নিঃশব্দে পথে নেমে এসেছে।

চেষ্টা ক'রলে যে অনেক কিছুই ঘটে পৃথিবীতে, রজত তা এবারে ভালো ক'রে বুঝলো—অবশ্য সে চেষ্টা আন্তরিক হওয়া চাই। দু'মাসের মধ্যেই তার লক্ষ্ণৌ বদ্‌লী হ'য়ে যাবার ব্যবস্থা পাকা হোলো। আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই সে রওনা হবে।

একদিন বিকেলে মেসের ঠাকুর এসে জানালো, একটী ভদ্রমহিলা তাকে খুঁজ্‌ছেন।

দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এলো রজত। রাস্তার উপরেই বিনু দাঁড়িয়েছিলো, একটু চমক লাগ্‌লো তার, তারপরে বললে, ভালো আছিস্ বিনু ?

—আছি, ম্লান হাস্‌লো বিনু, তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকার ছিলো, আস্‌বে একবার আমার সংগে ?

—এখনই ?

—হ্যাঁ রজুদা।

—দাঁড়া, তাহ'লে জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।

হাঁটতে হাঁটতে সারনাথে যাবার রাস্তার ধারে একটা পুলের কাছাকাছি তারা এলো। একটা সানবাঁধানো জায়গার উপরে ব'সে বিনু বললে, তোমার সংগে আমার আজ একটা বোঝাপড়ার দিন রজুদা, অনেক ভেবে আজকে তোমাকে এ কথা বলতে এসেছি।

বল ? রজত প্রায় নির্বিকার গলায় প্রশ্ন করলো।

সে-রাত্রে তোমাকে অনেক ডাকলুম, তুমি ফিরলে না। হয়তো তোমার সত্যিই আর ফিরে তাকাবার ইচ্ছে নেই কোনোদিন—কিন্তু তবু আমাকে তোমার কয়েকটা কথার উত্তর আজ দিয়ে যেতে হবে।

একবার ভালো ক'রে তাকালো রজত বিনুর মুখের দিকে, তারপরে বললে, বেশ দেবো।

—মায়ের প্রস্তাবটা কি এতোই ঘৃণার্হ মনে হ'য়েছিলো রজুদা যে, একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখবার প্রয়োজনও তুমি বোধ করলে না ?

—ঘৃণার্হ নয়, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো রজত, অসমীচীন—এটা আমি নিশ্চয়ই বলবো।

—সমীচীন জিনিষ পৃথিবীতে ক'টা হয় সে-সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি জানি না, কিন্তু থাক্—এই তোমার শেষ কথা ?

এবার একটু উষ্ণ হ'য়ে উঠলো রজত। বললে, রাঙামাসীমার দৃষ্টি যে এতো অন্ধ, এতো আবিল, এ আমি আগে জান্‌তুম না বিনু—তোকে আমি স্নেহ করি—সেইটাই যদি অপরাধ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে আমাদের মতো মানুষের পলাতক হওয়া ছাড়া পথ নেই। তর্ক আমি ভালোবাসি না—আর যদি তোর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহ'লে তা আমাকে করতে পারিস।

—আমিও তা ভালোবাসি না রজুদা, আর আমার কিছু বলবার নেই ; একবার স্পষ্ট ক'রে তোমার মুখে এই কথাটাই শুনবার ইচ্ছাটা প্রবল হ'য়েছিলো, তা—সে-সাধ মিটলো, আর তোমাকে কোনোদিন বিরক্ত করতে আসবো না—চললুম রজুদা। ব'লে রজতকে বাধা দেবার সময় পর্য্যন্ত দিলো না—নীচু হ'য়ে প্রণাম ক'রে পুরোণো একটা অপরিষ্কার পথ ধ'রে গোধুলিয়ার দিকে এগিয়ে গেলো।

রজত বুঝতে পারলো না, কি ঘটলো—এতোখানি ঘটনাতেও, আশ্চর্য্য এই, বিনু কই একটুও তো বিচলিত হয়নি। ভারী একটা আচ্ছন্ন ভাব নামলো তার মনে।

তারপরে এ আখ্যায়িকার অনেক পট-পরিবর্ত্তন ঘটলো, অনেক সুখ এবং দুঃখের ইতিহাস। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার পর আর একদিনের জন্যেও রজত রাঙামাসীমার বাড়ীর দিকে যায়নি—দীর্ঘ কয়েকটা

বছর এসে তাদের স্নেহের স্মৃতি-ফলকগুলিকে মুছে দিয়ে গেছে।

বছর দুই আগে যেবার কলকাতায় বদলী হোয়ে যাবার ডাক এলো রজতের, সেবার কানে এলো কাশীতে বেরিবেরি হয়ে অনিমেষবাবু মারা গেছেন সমস্ত সংসারের ভার এখন বিনুর উপরে, হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে সে বি-এস্-সি পাশ ক'রে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছে। রাঙামাসীমাও আজকাল কলকাতায় থাকেন।

এমনি সময়ে একদিন সন্ধ্যার আগে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের ওপরে দেখা হোলো বিনুর সংগে। মেডিকেল কলেজ থেকে সে ফিরছে। হাতে ষ্টেথিস্কোপ, চেহারা আগের থেকে অনেক ভালো। রজত সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো—বললে,—চিন্‌তে পারছিস্?

অবাক হ'য়ে একবার বিনু তাকালো তার দিকে তারপরে বললে, চিন্‌তে না পারলেই খুসী হোতুম—কেমন আছো?

—তবু যা হোক কথাটা জিজ্ঞেস করলি।

—কোথায় আছো আজকাল?

—শিবপুরে।

—কি করছো?

—চাকরী।

একটা ট্রাম এসে গিয়েছিলো। বিনু হাত দেখিয়ে থামালো সেটাকে, তারপরে রজতের দিকে ফিরে চেয়ে বললে, চললুম, একদিন যদি পারো দেখা কোরো আমার সংগে।

—তোর ঠিকানাটা?

ট্রামে উঠতে উঠতে বিনু বললে, চাঁপের এক আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ছাত্রী নিকেতন, লাল রংএর দোতালা একটা বাড়ী।

—আচ্ছা!

ট্রামটা ঢং ঢং শব্দ ক'রে এগিয়ে গেলো।

এরপরে রজত বার দুয়েক গিয়ে দেখা ক'রেছে বিনুর সংগে। আলাপ ক'রেছে সে—কিন্তু কোথায় যেন ভারী একটা শূন্যতা! রজত যে সেটা বোঝেনা তা নয়।

একদিন রজত বললে: বিনু, তোর সংগে আমার জরুরী কয়েকটা কথা ছিলো—বড়ো বিপদে প'ড়ে আজ আমি তোর কাছে এসেছি।

বিনু বললে, বলো।

এখানে নয়, একটু নিভৃত জায়গা দরকার, একটু অবসর। আসবি আমার সংগে?

—কোথায় যেতে হবে? বিনু এবারে একবার তাকালো রজতের মুখের দিকে। ঈষৎ সন্দিগ্ধ তার দৃষ্টি।

রজত বললে, এই চল্‌না খানিকটা দূরে, গড়ের মাঠের দিকে।

কি ভাবলো বিনু, তারপরে বললে, বেশ চলো।

রজত অবশ্য সত্যিই মনে মনে এতোটা আশা করেনি। হাতে স্বর্গ পেলো সে। দু'জনে এসে ট্রামে উঠলো।

তারপরে তারা এসে বস্‌লো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের কাছাকাছি একটা গাছের নীচে।

দু একটা অন্য কথা হবার পর বিনু বললে, এবার বলো কি তোমার বিপদ?

কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে রজত বললে, তুই জানিস না বোধ হয়, কাশী থেকে চ'লে আসার দু'বছর পরে আমি বিয়ে করে—ছিলুম?

—জানি।

—শ্রীরামপুরে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে। আজ বছর খানেক হোলো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে অসুবিধে হয় বলে শিবপুরে আমি আমার এক শালীর বাড়ীতে ছিলাম। ছিলাম ভালো, তারপরে একদিন শেষ পর্য্যন্ত ভূতে ধরলো আমাকে।

একবার চোখ তুলে তাকালো বিনু, তারপরে বললে, সোজা ক'রে বলো, হেঁয়ালী বুঝে নেওয়া আমার অভ্যাস নেই।

—না থাক গিয়ে। দরকার নেই ব'লে। রজতের মুখটা ঈষৎ ম্লান হ'য়ে এলো।

এবারে সামান্য একটু হাসলো বিনু, বললে, রাগটা দেখছি সেই আগের মতোই আছে—যদি বলবে নাই ঠিক ক'রেছিলে, তাহ'লে মিছিমিছি আমাকে নিয়ে এলে কেন এখানে?

রজত চুপ করে রইলো।

আবার তার দিকে চাইলো বিনু। আগের থেকে অনেক সহজ গলায় বললে, হ'য়েছে। নাও বলো—শুনবো আমি সব।

আরো কয়েকটা মুহূর্ত্ত কাটলো তার পরে। রজত বললে, জানি, তোমার কাছে এসব বলা বৃথা, কিন্তু কি জানি কেন বিপদ যখন এলো, তখন সকলের আগে তোমাকেই মনে পড়লো, তাই ছুটে এসেছিলাম।

—বেশ তো, বলো না এবার। বিনু বললে।

একটু থেমে রজত তার সমস্ত বিপদের ঘটনাটাকে এক এক করে বিবৃত করে গেলো।

জানালো—দুর্ঘটনাটা যে আসবে—তা মোটেই সে আন্দাজ করতে পারে নি এর আগে। অথচ করা উচিত ছিল।

রজত যা বললো তা' সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়:

শিবপুরে শালীর বাড়ীতে থাকবার সময়ে সেই বাড়ীরই আশ্রিতা একটী মেয়ের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায় সে—এবং যেমন হোয়ে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত তাই হ'লো। অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের কঠিন দায়িত্বের কথা চিন্তা ক'রে একসময় নিজের মধ্যে শিউরে উঠলো রজত। নিজের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চেষ্টায় কোনো পথ বাকী রাখেনি সে। কিন্তু নিস্ফল প্রয়াস। বীর মানবকের বীরাঙ্গনা প্রসবিনী রূপে একদিন সকলের চোখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো মেয়েটি। অবশেষে কি ক'রে ব্যাপারটি শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের হাত পর্য্যন্ত গড়ালো। অনেক কষ্টে রজত ৫০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে পুলিশের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। এখন দু'শো টাকা কোন রকমে সে জোগাড়ও করেছে। বাকী ৩০০৲ টাকা তার চাইই-চাই। সেটা বিনু দিতে পারে, কি না? এই জন্যই তার কাছে সে এসেছে।

অবশেষে বললে: আমাকে তুমি ঘৃণা করতে পারো বিনু এ ঘটনা শোনার পর, আর আমার মুখ তুমি নাও দেখতে চাইতে পারো সারা জীবনে, কিন্তু তবু আমি আজ তোমার সাহায্য চাই, আশা আছে তুমি আমাকে বাঁচাবে।

কথা শুনতে শুনতেই বিনুর মুখ কঠিন হয়ে এসেছিল। কথা শেষ হ'লে বললো, তুমি আমাকে মাপ করো, আর যাই করি; চরিত্রহীন ব্যভিচারী কোনো মানুষকে এভাবে সাহায্য করবার মতো দয়া যেন আমার কোনো দিনও না হয়। বলে সোজা সে ট্রামের দিকে এগিয়ে গেলো।

অল্প অল্প সন্ধ্যা হ'য়ে আসছিলো চারদিকে; রজতের একটা তীব্র পাশবিক ইচ্ছায় সমস্ত শরীর দুলে উঠলো। ভেবেছে কি সে? বাঘের গুহার মধ্যে বসে তারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ঝণৎকার?

হঠাৎ এক সময়ে সে চেয়ে দেখলে—বিনু নেই।

•

দু'দিন পরের ঘটনা। টলতে টলতে এসে ঘরে ঢুকলো রজত। টেবিলের ওপরে একখানা ভারী আর বড়ো খাম। একটানে সেটা খুলে ফেললে।

একটা চেক্ ভিতর থেকে মাটীতে প'ড়ে গেলো, আর তার সঙ্গে একখানা ছোট চিঠি। রজত পড়লো:

রজুদা,

তোমাকে লেখা এই আমার শেষ চিঠি। তিনশো টাকা চেয়েছিলে আমার কাছে বিপদে প'ড়েছো ব'লে; তাই পাঠিয়ে দিলুম—একদিন তোমার কাছ থেকে যে মহৎ জীবনের স্পর্শ পেয়েছিলুম—তার পূর্ণ মূল্য শোধ ক'রে দিলুম আজ তোমারই তেমনি ঘৃণ্য অ-পবিত্র জীবনকে শুচিশুদ্ধ হ'য়ে বাঁচবার জন্যে। কাল থেকে জেনো, বিনু মারা গেছে। ইতি— বিনু।"

চেকটা তুলে নিয়ে রজত ভালো ক'রে প'ড়ে দেখলো, না সত্যিই—তিনশো টাকাই লিখেছে বটে।

আনন্দে রজতের মনটা দুলে উঠলো, যাই হোক্ আজ রাত্তিরের আমোদটা তার জমবে ভালো। তি-ন-শো টা-কা! কম নয়!

হেনারাণীর সাজানো ঘরটা চোখের ওপরে ভেসে উঠলো রজতের। তিন দিন আগে টাকার অভাবে মাথা নীচু ক'রে তার ঘর থেকে চ'লে আসতে হ'য়েছিলো, আজ তার চরম শোধ নেবে। চোখ দুটো জ্বলছে তার। বউবাজারের মোড় থেকে একটা রিক্শা নিলো রজত।

সত্যি, কি লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দুখানি হেনারাণীর! আর আঙুরের মতো টস্‌টসে চমৎকার দুটী গাল!

রাত্রির অন্ধকারের দিকে টিং টিং ক'রে কালো রিক্সাটা এগিয়ে চললো।

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

রাজনীতির ন্যায় সাহিত্য-সাধনাও চিত্তরঞ্জনের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি বরাবর বলিতেন, "আমি আশৈশব সাহিত্য-সেবার চেষ্টা করিয়াছি।" চিত্তরঞ্জন বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। প্রথম হইতেই তিনি কাব্য রচনা করিতেন। যৌবনে দেশী বিদেশী প্রসিদ্ধ সাহিত্য পুস্তকের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তবে একথা সত্য যে, রাজনীতির ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ততটা সাধন-নিরত থাকিতে পারেন নাই। যদি অক্লান্ত সাধনায় তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে পারিতেন, আমরা সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে পুরোপুরি ভাবেই পাইতাম। তিনি সাহিত্যকে সমগ্র জীবনের অঙ্গভূতি বলিয়াই মনে করিতেন।

কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি সমাজসেবা, কি ধর্ম্মচর্চ্চা প্রত্যেকটিকে তিনি পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংজড়িত মনে করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জীবনের প্রত্যেক অংশ তো কবুতরের খোপের মত পৃথক করিয়া ভাগ করা যায় না। সবই যে একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ধারা।" তবে দেশ-প্রেমই (patriotism) ছিল চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাই তিনি রাজনৈতিক নাও হইতে পারিতেন, সাহিত্যক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহাই করিতেন, সমস্ত কর্ম্মপ্রভাবের উৎস হইত স্বদেশ-প্রীতি। আর যাহাই করিতেন, আধা-আধিভাবে করিতেন না, সমগ্র ভাবেই করিতেন। মহাপ্রস্থানের দেড়মাস পূর্ব্বে পাটনা সাহিত্যপরিষদ কক্ষে স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতিরূপে তিনি উপস্থিত সাহিত্যিকগণকে এই কথাই বলিয়াছিলেন :

"আপনারা রাজনীতিক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আমিও সাহিত্যসেবায় জীবনাতিবাহিত করিব বলিয়াই ঠিক করিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রেই এক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। নতুবা সেই পথই অবলম্বনীয় হইত। কিন্তু অনুশোচনা তজ্জন্য নয়, অনুশোচনা তখনই হইবে, যখন যে কাজেই হস্তক্ষেপ করা যাক্ না কেন, যদি যোল আনা ভাবে আত্মনিয়োগ না করা যায়। আমি যখনই যাহা করিয়াছি, যোল আনা ভাবেই করিয়াছি। আপনারাও সাহিত্য-সেবা যোল আনা ভাবেই করুন, আপনারাও নিশ্চিত ফল লাভ করিবেন।"

সুভাষচন্দ্র বলিতেন, "দেশবন্ধুর জীবনই একখানি মহাকাব্য।" এই মহাকাব্যরূপ চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনা যে কিরূপ ছিল এবং সাহিত্যে তাঁহার অবদান যে কতখানি—এখানে তাহাই উল্লেখ করিব।

দেশবন্ধু কয়েকটা কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। সেগুলির সংখ্যা খুব কম না হইলেও বেশী কিছু নয়। কাব্য কয়খানি যথা—

১। মালঞ্চ—(১৮৯৬) কবিতাগুলি পূর্ব্বে রচিত, আর ১৩০৩ সালে সাহিত্যপ্রেস হইতে সাহিত্য সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২। মালা—(১৯০২—১৯০৯) পর্য্যন্ত।

৩। সাগর সঙ্গীত—(১৯১০-এ রচিত, ১৯১৩তে প্রকাশিত)।

৪। অন্তর্য্যামী—(১৯১৪) "নারায়ণে" প্রকাশিত।

৫। কিশোর কিশোরী—(১৯১৫) "নারায়ণে" প্রকাশিত, উভয়ই পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

গল্প—

১। 'ডালিম'—(১৯১৪) নারায়ণে প্রকাশিত।

২। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'—(১৯১৫) নারায়ণে প্রকাশিত।

প্রবন্ধ—

১। কবিতার কথা—(১৯১৪—১৩২১ ফাল্গুন) নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত।

২। বাঙ্গালার "গীতি কবিতা"—(১৯১৬ ডিসেম্বর,)

বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে পঠিত।

৩। "বিক্রমপুরের কথা"—(১৯১৬) ভোমসার, বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতিরূপে পঠিত।

৪। "রূপান্তরের কথা"—(১৯১৭ ফেব্রুয়ারী) সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের অধিবেশনে পঠিত। মুদ্রিত চৈত্র ১৩২৩।

৫। "বাঙ্গলার কথা"—(১৯১৭ মে) প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

৬। "বাঙ্গলার গীতি কবিতা"—(১৯১৭) দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ১৩২৪, অগ্রহায়ণ।

৭। "বৈষ্ণব কবিতা"—(১৯১৭) উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে পঠিত, মুদ্রিত ১৩২৪, পৌষ।

৮। "স্বাগত"—(১৯১৮) ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, মুদ্রিত ১৩২৫ বৈশাখ।

৯। "বাঙ্গলার গীতি কবিতা"—(১৯১৮) তৃতীয় ভাগ ১৯২৫ মে মাসে সংশোধিত এবং ১৩৩৪ সালে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত।

১০। "বাঙ্গলার কথা"—(১৯২১ সালে) সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে তাঁহার অসংখ্য স্বদেশী বিষয়ক প্রবন্ধ।

১১। "বঙ্কিম সাহিত্য"—(১৯২৪) কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটী কীর্ত্তন সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলিও "নারায়ণে" প্রকাশিত হয়। এই নারায়ণ 'মাসিক' পত্রিকাও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং চিত্তরঞ্জনই ইহার সম্পাদনা এবং ব্যয়ভার বহন করেন। এই তালিকা সামান্তই হউক বা বড়ই হউক "স্বল্পমপি ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ", আমরা এই সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধে কোন সারবস্তু পাই কি না, তাঁহার সাহিত্যে জাতির ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছিল কি না, এই প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

এই আলোচনার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী সামান্ত সামান্ত বিষয়ের উল্লেখ করিব। বরাবর তিনি সাহিত্য সভায় এবং মাসিক পত্রিকার অকাতরে সহায়তা করিয়াছেন। অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত লিখিয়াছেন—"মানসী পত্রিকা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। যে কয়জন উন্নমশীল সাহিত্যরসিক যুবক নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া 'মানসী' পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিতেন তাঁহাদের কাহারই অর্থস্বচ্ছলতা বেশী ছিল না। অধুনালুপ্ত হপশিং কোম্পানীর দ্বিতলের একটি ঘরে ইহার কার্য্যালয় ছিল। চিত্তরঞ্জন মাসে মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া 'মানসী'র জন্ত দিতেন, তা ছাড়া এককালীন বেশী টাকাও দান করিয়াছেন। একবার ম্যানেজার সতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'মানসী'র জন্ত দুই হাজার টাকা আনিয়াছিলেন, তখন ইহা ঋণ বলিয়াই লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এ ঋণ আর শোধ করা হয় নাই। এই 'মানসী' ও 'মর্ম্মবাণী'ই সম্মিলিত হইয়া নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। অধুনা ইহা বিলুপ্ত।

"মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকাকে ঋণ হইতে বাঁচাইবার জন্ত তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আর একখানি মাসিক পত্রিকা "নির্ম্মাল্য" মনোহর পুকুর রোডস্থ একটী বাড়ী হইতে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। 'নির্ম্মাল্য'এ চিত্তরঞ্জনের অনেক কবিতা বাহির হইয়াছিল। এই মাসিকপত্র পরিচালনের আবশ্যকীয় খরচ চিত্তরঞ্জনই বহন করিতেন এবং সাহিত্যসেবী রাজেন্দ্র বাবুকেও নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। যৌবনাবস্থা হইতেই সাহিত্য-প্রীতি যে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সে বিষয়ে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের কয়েকটি কথা এখনও কানে বাজিতেছে—

"...তখন আর একজন সাহিত্যের উদ্যোগী, হিতৈষী কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সাহিত্যের জন্ত গদ্য, পান রচিয়া এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে মার্সাই হইতে ডাকে দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের চাষ করিয়াছিলেন। তার পরে আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন। তাঁহাকেও এতদিন পরে রোগে ধরিয়াছে। পরিণত বয়সে 'সাগর-সঙ্গীত' শুনিয়া শঙ্খের মত সমুদ্রের আরাব

ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর তিনি নারায়ণের চরণে সোণার তুলসী দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সফল হউক।"

"সেকালের স্মৃতি" "বাজে কথা" (১৩২১ মাঘ) "নারায়ণ"।

বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একত্র সাহিত্যানুশীলন করিতেন। চিত্তরঞ্জন বিলাতেও একখানি ইংরাজী নাটক লিখিয়া স্যার হেনরী আর্ভিং দ্বারা প্রশংশিত হন। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল যে, আলোচনার সময় বৈষ্ণব কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম, গিরিশ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি ও প্রবন্ধলেখকের কত জায়গা হইতে আবৃত্তি করিয়া ঠিক ঠিক ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। মনে হইত বাঙ্গলাসাহিত্যই যেন একেবারে তাঁহার কণ্ঠস্থ। যৌবনে সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্কিমের সাহিত্যেরই তিনি সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। "কমলাকান্ত" ছিল তাঁহার মুখাগ্রে, প্রবন্ধগুলির তিনি প্রায়ই আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "বঙ্কিমের অসাধারণ কবিত্বের একটা উদাহরণ দিতেছি। কমলাকান্ত একটি গীত গাহিতেছেন—

"এসো, এসো, বঁধু এসো
আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"।

কমলাকান্ত আক্ষেপ করিতেছে, হায় কিসেই বা নয়ন ভরিবে? নয়নে যে পলক আছে।" চিত্তরঞ্জন বলেন, "এখানে বঙ্কিমবাবুর কবিত্ব অতি অসাধারণ রকমের। এরূপ ভাব অল্প কবিতায় দেখিয়াছি।"

ইংরাজী সাহিত্যে তিনি সুইনবার্ণ, ব্রাউনিং, এমার্সন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুব পছন্দ করিতেন। বিলাতে অনেক পয়সা খরচ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য কিনিয়া আনিতেন। ব্রাউনিং-এর তিনি একান্ত ভক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল। ব্রাউনিং পড়িবার সময় স্থান ও কাল ভুলিয়া যাইতেন; রাজনৈতিক কোলাহলের সময়ও একদিন রাত্রি এগারটার সময় ব্রাউনিং-এর কথা উঠিলেই তিনি তখনই পুস্তকখানি আনাইয়া ভাবের সহিত উহা পড়িতে লাগিলেন, শ্রোতা বন্ধুবর সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (পরে President, Bengal Legislative Council)। অল্পক্ষণ পরেই সত্যেন্দ্রবাবুর চক্ষু নিদ্রায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। চিত্তরঞ্জনের পড়া শেষ হইল একটার সময়। তিনি সত্যেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, "তুমি যে কখন ঘুমাইয়াছ, আমি টেরই পাই নাই।"

সাহিত্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের রহস্যালাপও ছিল সাহিত্যিকের ন্যায়ই অভিনব রকমের। কীটসের কবিতায় একটী পদ আছে—

A thing of beauty
is a joy for ever.

একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার হরিধন দত্ত মহাশয় কর্পোরেশনের অফিসে আসিয়াছেন। দেশবন্ধু তখন মেয়র হইয়াছেন। আর হরিধনবাবু তখনও চীফ্ একজিকিউটারই আছেন। মেয়রের গৃহে একখানি টেবিল দেখিয়া ডাঃ দত্ত বলিলেন:

টেবিলখানা তো বড়ই সুন্দর।

দেশবন্ধু—হাঁ বেশ।

মিঃ দত্ত আবার বলিলেন, টেবিলখানি ভারী সুন্দর, "It is a thing of beauty".

দেশবন্ধুও কীটসের কবিতা আওড়াইয়া অমনি উত্তর করিলেন—But to me it is not a joy for ever.

বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্বন্ধেও এইরূপ রহস্যালাপ হইত। নাট্যাচার্য্য অমৃত বসু মহাশয়ের "খাস দখলের" একজায়গায় আছে যে, কোন ডাক্তার পায়ে ষ্টকিং না দিয়া লোকেনকে দেখিতে আসায় তাহার শিক্ষিতা স্ত্রী মোক্ষদা ১৬৲ টাকা ফি হইতে ৬৲ টাকা কাটিয়া দিতে বলে। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯২৫ সালে পাটনায় হঠাৎ একদিন রক্তামাশয় হওয়ায় পরামর্শ হয় যে, 'তবে ডাক্তার নীলরতন সরকার বা বিধান রায়কে চিঠি লিখে দেওয়া হউক।' দেশবন্ধু তৎক্ষণাৎই উত্তর করেন—

"কেন, সান্ন্যাল ম'শায় কি পায়ে ষ্টকিং দেন না বলে?"

পাটনার ডাঃ এস, পি, সান্ন্যাল ছিলেন তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

এইরূপ সাহিত্য সংক্রান্ত আলাপ তিনি বড় বড় সভায় করিয়াছেন। কাউন্সিল গৃহে শেষ বক্তৃতার সময়ও কাউন্সিল ভাঙ্গিবার প্রসঙ্গে বলেন, "কৃষ্ণ দর্শনের ফল ক্ষুন্নদর্শন"। জুরী বা এসেসারদের কাছে তাঁহার অভিভাষণেও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "বাঙ্গলার সম্পদ বাঙ্গলা ভাষা। কি রকম ক'রে কথার বিবর্ত্তন হয়েছে, সব সংগ্রহ করা দরকার। অন্য ভাষা থেকে যে সমস্ত কথা ঢুকেছে, তার অর্থের পরিবর্ত্তন অন্যান্য ভাষায় কি রকম ব্যবহার হয়েছে, বিভিন্ন লেখকেরা কি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন, ইত্যাদি একখানি বইতে থাকা আবশ্যক।" এই সম্বন্ধে মহিলা কবি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর পুত্র প্রকাশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়। প্রকাশ বাবু বলেন—

"Rhyme এর একটা dictionary কল্লে ভাল হয়না ?"

চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গলার rhymeএর dictionary ? সর্ব্বনাশ, একেই তো মিলের জ্বালায় অস্থির। তবে আপনাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে। যেমন 'ভামিনী' কথার কত রকম অর্থ ? কে কোন রকমে ব্যবহার করেছে, কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে, ইত্যাদি।

দেশবন্ধু এইরূপ একখানি অভিধান প্রণয়ন করিতে 'ক' হইতে 'চ' পর্য্যন্ত অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই সমস্তই 'এহো বাহ্য'। আমরা এবার এই সকলের মধ্যের সারতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই "মালঞ্চের" কথা বলিতে হয়। চিত্তরঞ্জন হৃদয়-কানন-প্রস্ফুটিত নানা কবিতা-কুসুমে মালঞ্চ সাজাইয়াছেন—

গাহে পাখী বহে বায়ু বসন্তের মত
নানাবর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে
এই মালঞ্চে।

'প্রেম', 'বাণী', 'আমার ঈশ্বর', 'স্বপ্ন', 'প্রাণের গান' 'অহঙ্কার', 'আকাঙ্খায়', 'ঈশ্বর', 'সুখ', 'স্মৃতি', 'চিরদিন', 'সে', 'জোছনা', 'সোহহং', 'সাগরে', 'সাগরতীরে', 'লালসা', 'মৌন', 'বার্দ্ধিক', 'অভিসার', 'বারবিলাসিনী', 'উষা', 'ওফেলিয়া' 'কল্পনা', 'সুখ', 'দুঃখ', 'জীবনের গান' প্রভৃতি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। কবিতাগুলিতে বিখ্যাত কবি সুইনবার্ণ এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, এবং চিত্তরঞ্জন তাহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের "খামখেয়ালী" ক্লাবের সভ্য ছিলেন, এবং প্রায়ই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে তিনি নিত্য নূতন নূতন খামখেয়ালী পোষাকে এই বৈঠকে যোগদান করিতেন। এবং একে অন্যের কবিতা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। যাহাহউক মালঞ্চের কবিতাগুলি বড় সহজ ও সরলভাষায় সুরচিত এবং উহার প্রত্যেকটী কথার সহিত কবির সম্পূর্ণ প্রাণের যোগ দৃষ্ট হয়। "মালঞ্চ" চিত্তরঞ্জনের বিবাহের ২।১ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এই সময় "মালঞ্চ" শিক্ষিত মহল এবং ব্রাহ্ম সমাজে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে হইয়াও একান্নভুক্ত পরিবারে প্রতিপালিত, আর নিজের বাড়ীতেই হিন্দু আচার ব্যবহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত ছিলেন। এদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার চিত্তের প্রসারতা তাঁহাকে আবার কোনও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি নির্ভীকভাবে ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণের আলোচনা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও চিত্তরঞ্জন এই সময় হারবার্ট স্পেন্সারের Agonisticism এর অজ্ঞেয়তাবাদের অনেকটা অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরের নাম করিলেও, ঈশ্বরের কারুণ্য সম্বন্ধে তিনি খুবই সন্দিহান ছিলেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের পরমতত্ত্ব তখন তাঁহার নিকট unknown এর unknowable ছিল বলিয়াই মনে হয়। তাই তিনি "মালঞ্চে" একটী কণ্টকময় পুষ্পরচনা করিয়া বলিতেছেন—

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া,
আমাদের সুখশান্তি নিতেছে হরিয়া
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!

জীবন—যাতনা তরে সজল নয়ন
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর স্মরিয়া
আপনার হৃদয়ের ধূম্ররাশি দিয়া,
সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন।
হায়, হায়, মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর ! ঈশ্বর ;

এই স্থানেই ব্রাহ্মসমাজের মতবাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বিদ্রোহ প্রকট হইয়া উঠে। এবং এই বিরুদ্ধ মত তিনি মুকের ন্যায় হৃদয়ে পোষণ না করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করায়, সেই বিরোধিতা সাধারণে আলোচিত হইয়া আরও প্রবল ভাব ধারণ করে।

তৃতীয়তঃ, তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকগণ অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মনে মুখে একরূপ নহেন। তাঁহারা মুখে ধর্ম্ম এবং ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিলেও অন্তরে খুব উদার নহেন। এইরূপ ভাব তিনি একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছেন। বরং তিনি ভগবানের অসীমশক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতেও প্রস্তুত, তথাপি এই সমস্ত অহঙ্কারী ধর্ম্মধ্বজ ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার কোনও বিশ্বাস নাই। তাই তিনি বলিতেছেন—

"অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্রবাণী
আপনার মনে আনে মোহ অন্ধকার,
ক্ষুদ্র তুমি ক্ষীণপ্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্তশক্তি মহাদেবতার,—
এ শূন্ত বিশ্বের বক্ষে কাহারে ধরিবে
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার।"

সোঽহং।

অন্যত্র তিনি এইরূপ ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের কপটতা আরও উজ্জলভাবে প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন :

"সুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায় :
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত অবনী
আহা ! আহা ! বলি তব চরণে লুটায়
ধরনীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান স্মরি'
মানবের শতপাপ দাও দেখাইয়া।

ওহে সাধু ! আমি জানি অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায়,
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ।"

আজীবন চিত্তরঞ্জন ছিলেন বিদ্রোহী, তাঁহার হৃদয়ের ভাবের সহিত কোন মতবাদের সামঞ্জস্য না থাকিলে তিনি উহার বিরোধিতা করিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। পূর্ব্বে ম্যাক্‌লিনের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা ব্রিটনবাসীর অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া Heaven-born service-এর লোভ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইবার ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সেই সমাজে অচল হইলেন।—ইতিমধ্যে একদিন কোন প্রবীণ প্রচারক ভুবন বাবুর বাড়ী আসিয়া চিত্তরঞ্জনকে পেগ্‌ সেবনে রত দেখিয়া মর্ম্মাহত হ'ন। এবং তাঁহাকে দেখিয়াও সুরাপাত্র গোপন না করিয়া চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ববৎই উহা পান করিলেন দেখিয়া তিনি বিরক্তির সহিত চলিয়া যান। ঐরূপ রচনা এবং তাহার সম্মুখে মদ্যপান। প্রচারক মহাশয় মনে করিলেন, "চিত্তরঞ্জন ইচ্ছা করিয়াই আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে"। ব্রাহ্ম সমাজেও এই কথা প্রচারিত হইল। আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সমাজের সভাপতিই ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন ও তাঁহার পিতা ছিলেন অন্যতম সভ্য। অবশ্য দুর্গামোহন তখন প্রায় শয্যাশায়ী থাকিতেন। ভুবন মোহনও কচিৎ সমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন। ব্রাহ্মগণের বিচারে চিত্তরঞ্জন দুর্নীতিপরায়ণ সাব্যস্ত হইলেন. তাঁহারা তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মদের বিরক্তির আরও একটী কারণ আবিষ্কৃত হইল, চিত্তরঞ্জনের কবিতা কুরুচি-প্রবণ মনে করিয়া তাঁহারা ইহার বিশেষ নিন্দাপ্রচার করেন। অন্ততঃ

চিত্তরঞ্জনকে হেয় করিবার ইহাই তাঁহাদের প্রধান আয়ুধ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা কয়েকটী কবিতায় যৌবনের উদ্দামতা, অতৃপ্ত আকাঙ্খা, সুখলিপ্সা, ভোগ-বাসনা এবং রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তায় জীবনের সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার দুর্দ্দমনীয় কামনা স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট—উল্লেখ করিয়া সেই নিন্দাবাদ প্রচারে আরও সহায়তা পান। বিশেষ তাঁহাদের বিবেচনায় সাব্যস্ত হইল যে, চিত্তরঞ্জন "বার-বিলাসিনী" কবিতাটীতে কামকলাকে মোহিনী সাজে লোকচক্ষুতে সুসজ্জিত করিয়া মানুষের রক্তমাংসের প্রেরণা উদ্দীপিত করিয়াছেন। যেমন, 'বারবিলাসিনী' বলিতেছে :

"রঙ্গিয়াছি অধর আমার।
কোমল বিচিত্র রাগে
আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে—মধু পুষ্পসার
রমণীর অধর আমার।
এসো পান্থ। ভ্রমিয়া ধরণী
হেথা আজ আঁধিয়া রজনী
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী
এসে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী!
অধর-চুম্বন কর পান!
তরঙ্গিত তনু ভ'রে
সব মধু লও হ'রে
আছে যত পুষ্প হাসি গান।
অধর চুম্বন করি পান।"

কিন্তু তাঁহারা ভাবিতেও পারেন নাই যে, মালঞ্চের ইহা বহিরাবরণ মাত্র—

"তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।"

ভাবিবার অবকাশ পান নাই যে, কবি সমগ্র কবিতাটিতে পতিতা নারীর হৃদয়ের জ্বালা কিরূপ মর্ম্মান্তিকভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রতি-ছত্রে পতিতার প্রতি চিত্তরঞ্জনের অবিমিশ্র সহানুভূতিই পরিস্ফুট হইয়াছে। সে সময়ে সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর দুর্দ্দশা পুরুষের প্রলোভন এবং প্ররোচনায়ই সংঘটিত হইত, কিন্তু পুরুষের অন্যায়ের কথা সকলেই ভুলিয়া যাইত, আর নারী থাকিত অনাদৃতা, বিদ্রূপাহতা, সমাজ পরিত্যক্তা। এই উপেক্ষিতা নারীর অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনিই কবিতাটিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন—

"তাই ব'লে নারীর নারীত্বটুকু, সে কি শুধু কথার কথা?" গিরিশচন্দ্রও 'বারাঙ্গনা' কবিতায় উহাদের প্রাণের কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন :

"শ্মশান আমার প্রাণ
রমণী হৃদয় আমি দিছি বলিদান।"

কবি চিত্তরঞ্জনও তাহাদের প্রাণের ব্যথাই প্রাণ ভরিয়া ছন্দে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন—

"নাহি স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া
নাহি কোন অনুতাপ
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া
দিবস রজনী আমি, হাসিয়া হাসিয়া
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া।"

পরবর্ত্তী কয়পংক্তিতে অভাগিনী যেন হৃদয়ের রক্ত-মোক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—

"যাহা আছে, সব লও তুলে।
রেখে যেয়ো রক্তজবা
তুলে নিও পুষ্পমালা
রজনী প্রভাতে যেয়ো ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হ'লে সব যেয়ো ভুলে,
আমার সকলি লও তুলে।"

আর নারীরই যে সব দোষ, সেই মাত্র কলঙ্কিনী, পুরুষের কোনরূপে দেবকার্য্যেও বাধা নাই, এই কথাই সে পরিস্ফুট করিয়াছে—

"তুমি যেয়ো এলে উষারাণী
পুণ্য দেহে শুভ্রহাসে
পশিও পবিত্রবাসে

STUDENTS COMMON-ROOM P. 599A.

রজনীর কলঙ্কের বাণী
ভুলে যেয়ো রজনীর কলঙ্কবাহিনী
শুধু আমি রব কলঙ্কিনী—"

চার্লস্ ডিকেন্স্ Threatening Letter to a Young-Man—যুবকের কৃতঘ্নতা এবং পতিতা রমণীর দুর্দ্দশা উল্লেখ করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া তুল্যরূপ একটী ঘটনা বিবৃত করিয়া টমাস্ হুড সহানুভূতির ভাবে লিখিয়াছেন—

"Touch her not scornfully
Think of her mournfully
Gently and humanely;
Not of the stains of her
All that remains of her
Now is pure womanly.
Make no deep scrutiny
Into her mutiny
Rash and undutiful
Past all dishonour
Death has left on her,
Only the beautiful."

কবি চিত্তরঞ্জনের কয়টি নিম্ন কলিতে সেই ক্রন্দন গুমড়িয়া গুমড়িয়া ভাসিয়া উঠিতেছে:

আমি যেন চিরদিন হৃদি
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে
বিলাই ভিখারী হ'য়ে
বাসনাবিহীন উদাসিনী
কে করেছে মোরে চিরঋণী ?

• পতিতার আছে:

হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী
জননীর স্নেহ রমণীর লাজ
কুমারীর নব নীরব প্রীতি।
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

কাহিনী—৯, কার্ত্তিক ১৩০৩

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী
এ-বিশ্বলালসা ছাই
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী
চিরদিন যৌবনে যোগিনী।

ইহাপেক্ষা নিজের মানসিক জ্বালা ব্যক্ত করিবার ভাষা কোথায় ? কিন্তু তথাপি এই বারবিলাসিনী পুরুষকে কোনরূপ নির্দ্দয় বাক্যে আহত করে নাই, সে কেবল আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়েই অকপটে কাঁদিয়া জানাইতেছে—

"কার অভিশাপে নাহি জানি
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা
প্রাণহীন প্রেম বিলাসিনী
সবারে বিলাসী তাই বারবিলাসিনী
তারি শাপে চিরকলঙ্কিনী।"

এই সহানুভূতি 'মালঞ্চের' ছত্রে ছত্রে। এবং মনে হয়—সব ছাড়িয়া দিলেও, এই একটী কবিত্বেরই দরদী চিত্তরঞ্জনের কবি-যশ বাঙ্গলা ভাষায় অমর হইয়া থাকিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'সোণা' ও 'কাদম্বিনী' চরিত্র ব্যতীত এরূপ দরদের পরিচয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সহানুভূতি চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। ১৯১৯ সালের একটী কথা মনে পড়িতেছে। মনোমোহন থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ও অভিনেত্রী যাদুমণির স্মৃতিসভা বসিয়াছে। চিত্তরঞ্জনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন বক্তা বলেন, "কেন অনেক লোক আজ এই সভায় আসেন নাই ? আমরা কি তার অন্যায়টুকু ক্ষমা ক'রে গুণের মর্য্যাদা দেখাতে পারি না ?" চিত্তরঞ্জনের প্রাণে ইহাতে বড় ব্যথা লাগে, তিনি অভিভাষণে বলেন, 'যারা আসেন নাই, তাদের চেয়ে এই বক্তা যাদুমণির স্মৃতির উদ্দেশে কম অশ্রদ্ধা দেখান নি। ক্ষমা করতে পারি এরূপ দম্ভের কথা আমি কল্পনাও কর্ত্তে পারি না। আমাদের কেবল লোককে সহানুভূতি করার ও ভাল

বাসারই অধিকার আছে। ক্ষমা বা ঘৃণা করতে পারি এরূপ কথা মুখে আনাও পাপ।"

যে বেদনা, দরদ ও সহানুভূতি লইয়া চিত্তরঞ্জন বরাবর আপামর সাধারণকে ভালবাসিতেন, তাহার উন্মেষই মালঞ্চে। হুড়ের স্থায় তিনিও মনে করিতেন, পতিতাদের ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং তাহাদের দুর্দ্দশার জন্ম সমাজের দায়িত্বই বরং বেশী।

প্রকৃত আর্ট তাপিত, পতিত, শোকার্ত্ত ও নিরন্নের প্রতি সহানুভূতিতে নষ্ট হয় না। বরং অপরাধের প্রশ্রয় না দিয়া অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিতে আর্টের পরিকল্পনা আরও মহত্তর হইয়া উঠে। এইরূপ সহানুভূতি চিত্তরঞ্জনের গল্প "ডালিম" এবং "প্রাণপ্রতিষ্ঠার" আশালতাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডালিম বলিতেছে :

"তারপর—এখন আমি কলকাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়ীতে সাজসজ্জার অভাব নাই। সোণার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক বাতি, ইলেক্‌ট্রিক পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারী ভরা কাপড়, বাক্স ভরা টাকা…

"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জলিতেছি, বুক যে জলিয়া জলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়। আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি…"

আশালতাও বলিতেছে—

"আমি কলঙ্কিনী, পাপিষ্ঠা, আত্মঘাতিনী।"

পরবর্ত্তী অনেক লেখকের বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "রাজলক্ষ্মী", "চন্দ্রমুখী" প্রভৃতি চরিত্রে এইরূপ সহানুভূতির অনেক নিদর্শন আছে।

সেই সময়কার বাঙ্গলা ভাষায় কোনও সাপ্তাহিকের সম্পাদক এই "বারবিলাসিনী" কবিতার খুব বিরুদ্ধ ও অনুদার সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক কি আধুনিক কালের কি তদানীন্তন সমাজের —নিশ্চয়ই এই অধীনের সহিত একমত হইবেন যে, এই দীর্ঘ কবিতাটী পাঠ করিলে দুরন্ত লালসার তো উদ্রেক হয়ই না, বরং বারবিলাসিনীর মর্ম্মন্তুদ বিলাপ, সর্ব্বনাশ ও অনুশোচনায় নির্ম্মম হৃদয়ও যে করুণায় বিগলিত হইয়া উঠে না, নরম পল্লব অশ্রুসিক্ত হয় না, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অথচ বিশেষভাবে এই কবিতাটীর জন্যই ব্রাহ্মগণ চিত্তরঞ্জনের বিবাহের সময় তো যোগদান করেনই নাই, এমন কি পণ্ডিত-প্রবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজের চক্ষে তিনিও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।"

[১৮৯৭ সালের Massenger]

প্রত্যাশা

অরবিন্দ গুহ

তৃণের সবুজ মনে চুপি চুপি শিশিরের মত
আসিতে পার না তুমি ? যে আকাশ সাগরে আনত,
রাতের মেঘের ভয়ে সে কী কোনোদিন থেমে থাকে—
সাগরের জল হয়ে তবু আমি পাবো না তোমাকে ?
জানি, তুমি মাঝরাতে আকাশের তারার দীপালি,—
মাটির প্রদীপ যদি এ হৃদয় ভ'রে আমি জ্বালি

তোমার কী এসে যাবে ? জানি, আমি রহিব অচেনা—
তোমার তারার ছায়া কখনো এখানে ফুটিবে না।
তোমারে দেখিতে পারি, তার বেশী আর কিছু নয়,
শুধিতে পথের ঋণ কেটে যাবে অনেক সময়।
হয়তো সবুজ নেই,—তবু আমি অবাধ একাকী,—
সাগর-হাওয়ার সুরে কিছু কথা রেখো যাবো বাকি।

তারার চোখের থেকে শিশিরের জল হ'য়ে তুমি
যদি আসো, যদি আসো—এ আশায় রবো তৃণভূমি।

খতিয়ান

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

জেনারেল-ম্যানেজারের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলুম। নতুন কথা অবশ্য কিছু নয়। এ কাজের জন্যই আমাকে রাখা। কোন ব্রাঞ্চে কে কোথায় হিসাবের জট পাকিয়ে ফেলেছে, বেসামাল ক'রে ফেলেছে খাতাপত্র, আমাকে ছুটতে হবে হিসাবের জট ছাড়াতে, কানুন মাফিক খাতা-পত্র রাখতে শেখাতে। ঝঞ্ঝাট কম নয় ক্যাশ বই থেকে আরম্ভ ক'রে জেনারেল লেজার, জার্নালের প্রত্যেকটি পাতা, স্তূপাকার ভাউচার তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে হ'বে কোথায় গলদের সুরু। পাই-পয়সার ছিদ্র দিয়ে কোথাব লুকানো রয়েছে লক্ষ টাকা গলে যাবার সম্ভাবনা। অপ্রিয় কাজ, হিসাব ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে মানুষটাকে নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। ম্যানেজার থেকে সুরু ক'রে লেজার কিপারকেও কেমন সন্দেহের চোখে দেখতে হয়। ন' পাইয়ের জায়গায় ছ' পাই লেখার পিছনে উদ্দেশ্য নেই তো কোন।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা একটু অন্য ধাঁচের। হিসাব-পত্রের গরমিল তো রয়েইছে, ম্যানেজারের চাল-চলন সম্বন্ধেও রিপোর্ট এসেছে নানা রকমের। সাজসজ্জা আর চলাফেরায় একটা উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস। মাইনের মাপকাঠিতে খরচের হিসাব চলছে না। একটু যেন উপচে পড়া ভাব। ব্যাঙ্কের ক্যাশবাক্সের সঙ্গে অসঙ্গত ছোঁয়াছুঁয়ি। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ, খুঁটিয়ে হিসাব করতে হ'বে সব কিছুর। বই খাতাপত্র তো দেখতেই হ'বে, প্রয়োজন হ'লে ক্যাশবাক্সেরও ডালা খুলতে হবে। পাই পয়সার গোলমাল হ'লেই ট্রাঙ্ক কল করতে হ'বে হেড অফিসে. আর তার বাড়াবাড়ি কিছু দেখতে হ'লে সোজা পুলিশে খবর দিতে হবে।

মোক্ষম রকমের কিছু না পেলেও, খাতাপত্র হিসাব নিকাশ করাটাতেই কেমন একটা সন্দেহের ছায়া। এ যেন খানাতল্লাসী, চোরাই মাল না পেলেও বদনামটা থেকে যায়।

খবর না দিয়েই কানপুর গিয়ে হাজির হলুম। নতুন ম্যানেজার। মানে আমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি এর আগে। আমি যখন ছুটিতে ছিলুম বছর দুয়েক আগে তখনই, বুঝি ভদ্রলোক বহাল হ'য়েছিলেন চাকরীতে। হেড অফিসে মাস চারেক ট্রেনিংয়ে থেকে বাইরে বাইরেই ঘুরছেন। এক নজরে ভদ্রলোককে দেখে নিলুম। সব কিছু জড়িয়ে অপচয়ের আমেজ। দামী সিগারেটের টিনে, হাতের গোটা চারেক আংটিতে, সোনার বোতামে, মূল্যবান পরিচ্ছদে পাকানো গোঁফের ছুঁচালো ডগাদুটি'তে পর্য্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলেপ। হেড অফিসের চিঠিটা দেখাতেই ভদ্রলোকের মুখের ভাব একটু চুপসে গেলো, 'কি ব্যাপার, খবর টবর না দিয়েই কি মনে ক'রে?'

মুখের গোড়ায় এলো কথাটা, 'যমের চরদের খবর দিয়ে আসার রীতি নেই। আসে যখন তারা হঠাৎই আসে', কিন্তু কথাগুলো সামলে নিয়ে বললুম, 'এ ব্রাঞ্চটা অডিট করবো। দিনের বেলা তো সুবিধা হ'বে না, রাত্রে খাতাপত্রগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে আমার হোটেলে।'

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, 'ওঃ, তা বেশ তো। আপনি কোথায় উঠেছেন?'

হোটেলের নাম বললুম।

ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'সে তো এখান থেকে প্রায় দু' মাইলের ধাক্কা। ভারী ভারী লেজার, ক্যাশ বইগুলো নিয়ে যাওয়াই তো এক হাঙ্গামা। তার চেয়ে এক কাজ করুন না'—কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন, 'আমার এখানেই চলে আসুন না। বাড়তি ঘর রয়েছে, খাটিয়া রয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না। জায়গা থাকতে কেন যাবেন হোটেলে?'

এ কসরৎটাও জানা ছিলো। সব জায়গাতেই এক ব্যাপার। গোলমাল থাক আর না-ই থাক, একটু আদর আপ্যায়ন, একটু যত্ন আত্তি এইটুকু বরাতে জুটে যায়। ম্যানেজাররাও তৎপর থাকেন। কি জানি

টাকা আনা পাইয়ের ব্যাপার, কোথায় কি হ'য়ে আছে, তার চেয়ে একটু তোয়াজ করলে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আর পৌঁছাবে না হেড অফিসের কানে।

মুখে একটু আমতা আমতা করলুম, কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। ব্যাঙ্কের পিয়ন পাঠিয়ে তখনি জিনিষপত্র আনিয়ে তবে ছাড়লেন।

সন্ধ্যার ঝোঁকেই খাতাপত্র আমার টেবিলে রেখে গেলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললুম, 'আপনার এখানে থাকবার দরকার নেই। যদি জিজ্ঞাসা করার কিছু থাকে, ডেকে পাঠাবোখন।' এ ছাড়া আর উপায়ও ছিলো না। অন্ত জায়গায় দেখেছি ম্যানেজার ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সে থাকেন পাশের চেয়ারে, লেজারের খাতা উল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। সে এক মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। মন দেওয়া যায় না কোন কিছুতে। নিজেকে যেন অপরাধী ব'লে মনে হয়।

আমার কথার সঙ্গেই ম্যানেজার দাঁড়িয়ে উঠলেন; 'আমি পাশের ঘরেই রইলুম, দরকার হ'লেই ডেকে পাঠাবেন। এদিক ওদিক দু একটা সামান্য রকমের ভুল হয় ত থাকতেও পারে, কম মাইনের কেরাণী নিয়ে কাজ, বোঝেনই-তো?'

ভদ্রলোক পর্দ্দা ঠেলে ভিতরে চলে গেলেন। খাতাপত্র নিয়ে বসবার আগে ভালো করে ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম। জানালায় পাতলা পর্দ্দা। দেয়ালে নীল রংয়ের আস্তরণ। সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার একটি। সব কিছু মিলে একটা রুচির ছাপ। ভদ্রলোক বেশ সৌখীন হবেন; কিন্তু দেড়শ টাকা মাইনের ম্যানেজারের পক্ষে অতটা সৌখীনতাও একটু অস্বস্তিকর।

ক্যাশ বইটা নিয়েই বসলুম প্রথমে। কাঁচা ক্যাস বই আর পাকা ক্যাস বই দুটোই রাখলুম পাশাপাশি। ভুল থাকলে ধরা সহজ হবে। দুটো বইয়ের ফাঁকটুকু ভরাট থাকা উচিত, কি জানি অনেক সময়ে এ-বইয়ের ফিগার ও-বইয়ে পৌঁছায় অন্য চেহারা নিয়ে।

খাতা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে ঠুক ক'রে আওয়াজ হলো। আভাসে বুঝলুম—ম্যানেজার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই রকমই হয়। পাশের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না কি মানুষ। কিছু হয় তো চোখের সামনেই হোক।

প্রথম পাতাতেই ভুল। নড়ে চড়ে বসলুম। গোলমেলে ব্যাপার। 'এ কি, এ যে গোড়াতেই ভুল হ'য়ে গিয়েছে', কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো। ফিছন ফিরে চেয়েই কিন্তু অবাক হয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ কথাই বের হলো না মুখ দিয়ে। সত্যিই তো গোড়াতেই ভুল হ'য়ে গিয়েছে। শুরুতেই ওলোটপালট। ভুলই যদি না হবে তো বাণী আসবে কেন এ বাড়ীতে? ম'হিষরেখার শ্যামাঙ্গী টলটলে মেয়েটি।

'বাণী'—এবারেও কথাটা বেরিয়ে গেলো মুখ থেকে।

'তবু ভালো চিনতে পেরেছো। আমি ভাবলুম বুঝি হিসাবের খাতা ছাড়া আর কোন দিকে চাইতেও হেড অফিস মানা করে দিয়েছে।' বাণী এগিয়ে এসে টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো।

'সুশীল বাবুর সংগে তোমার বিয়ে হয়েছে জানতুম না তো।'

"বিয়েতে গেলে তবে তো জানবে। বিয়ের দু'দিন আগেই তো পালালে গ্রাম ছেড়ে। বাণীর কথার খোচগুলো ফুটতে লাগল সারা গায়ে।

মাথা নীচু করে কাঁচা ক্যাশ বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলুম। মনের পাতাগুলো উল্টে গেল এক সময়ে। একটা দুটো করে পাঁচবছর পার হয়ে গেলো।

গোকুল কাকার মেয়ে বাণী। গ্রাম সুবাদে কাকা। জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবগিরি করতেন। অপবাদ ছিলো জমিদারীর খানিকটে নাকি বেনামীতে ওঁর কুক্ষিগত হয়েছিলো। কিন্তু এ সব শোনা কথা। গোকুল কাকা লোক হিসাবে চমৎকার ছিলেন, অন্ততঃ আমি যেটুকু দেখেছিলুম। ছেলেবেলা থেকেই বাণীর আসা যাওয়া ছিলো আমাদের বাড়ী। সেরেস্তা থেকে ফলপাকুর তরিতরকারী কিছু একটা এলেই খানিকটে বাণীর মারফৎ এবাড়ীতে এসে হাজির হতো। ছোট্ট

কালো রংয়ের মেয়েটি, বিশেষত্ব কিছু ছিলো না। আমার সঙ্গে দুটি বেলা দেখা হ'তো, কিন্তু সে দেখায় মনের বালাই ছিলো না।

গোলমাল সুরু হলো আই, এ পরীক্ষা শেষ করে যেবার বাড়ীতে ছুটি কাটাতে ফিরে গেলুম। বছর দু'য়েক শহরের নেশায় বাড়ীই যেতে পারি নি। বাপমায়ের উপরোধ অনুরোধ কোন রকমে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলুম। ফিরে গিয়ে রান্নাঘরে মার কাছে দাঁড়াতেই মুস্কিলে পড়ে গেলুম। বঁটি পেতে মা আনাজ কুটছিলেন আর ঠিক তাঁর পাশেই একটি কিশোরী হাত মুখ নেড়ে কি সব বুঝিয়ে চলেছে।

চৌকাঠের এপারে এসে দাঁড়াতেই মা মুখ তুলে চাইলেন, 'কি রে রবি চলে গেলি যে?'

'থাক, আর এক সময়ে আসবো', চটিজোড়া পায়ে গলাতে গলাতে উত্তর দিলুম। মা একবার আমার দিকে আর একবার মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলেন, তার পর হেসে উঠলেন সশব্দে, 'ওমা, একে দেখে তুই পালিয়ে গেলি লজ্জায়, এ যে আমাদের বাণী—গোকুল ঠাকুরপোর মেয়ে।

উঠান পার হয়ে যেতে যেতে মার কথাগুলো কানে গেল। বাণী, সেদিনের সেই পুচকে কালো মেয়েটা। দু' বছরের মধ্যে এ কি বদলে গেছে অদ্ভুত ভাবে। কেমন টলটলে ভাব, সারা দেহে জোয়ারের আবেশ, কালো দুটি চোখে দুর্বার আকর্ষণ। শীতের শীর্ণতা থেকে বর্ষার শ্রাবণবেগ। কুল ছাপিয়ে পড়ছে। পালানো ছাড়া আর উপায় আছে!

কিন্তু পালিয়ে কি নিস্তার আছে নাকি। পড়ার ঘর অবধি ধাওয়া করলো বাণী। 'বেশ লোক যা হোক তুমি আসবে বলে সকাল থেকে বসে রয়েছি, আর বাবুর পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো হচ্ছে।' গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে বাণী প্রণাম করলো। মন শক্ত করে মুরুব্বি আনা চালে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়েই চমকে হাত সরিয়ে নিলুম। কুচকুচে কালো চুল কালনাগিনীর ফণার মত। হাতটা কেমন শির শির করে উঠলো। চুলেও বুঝি যৌবনের ছোঁয়াচ লেগেছে।

'তুমি তো বেশ বড়ো হয়ে গেছো বাণী' গলাটা কেঁপে উঠলো।

'বাঃ রে বড়ো হবো না বুঝি? ছোট থাকলে তোমার মারবার বুঝি সুবিধা হয় খুব? মনে আছে রবিদা?' বাণী কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো, 'পেয়ারার ডাল দিয়ে কম মেরেছো তুমি আমাকে?'

কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই আচমকা থেমে গেলুম। কালো চোখদুটো দিয়ে একদৃষ্টে বাণী চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। মনের ভিতরটাও দেখছে বুঝি তলিয়ে?

রংয়ের ঘোর লাগলো দিনকতক পরে। দুপুরের দিকে আড্ডা দিয়ে ফিরছিলুম। হঠাৎ মাঝপথে দেখলুম বাণী চ'লেছে হন হন ক'রে। বোধ হয় আমাদের বাড়ী থেকেই ফিরছিলো। কিন্তু সাহস বলতে হবে মেয়েটার। একটু সুরপথ হয় বলে মল্লিকদের পড়ো বাড়ীটার ভিতর দিয়ে কেয়াবনের পথ ধরে চলেছে। ইটের কাঁটলে আর কেয়ার ঝোপে জাতসাপের আস্তানা। একবার ছুঁলেই আর দেখতে হবে না। ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বাণীর পিছু নিলুম। জব্দ করতে হবে মেয়েটাকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। ধারে কাছে কেউ নেই। ঠিক দুপুরবেলা কার দায় পড়েছে মাঠে পায়চারি করার। ঠিক বাণীর পিছনে গিয়েই 'ঔাক' ক'রে চিৎকার করে উঠলুম। নিছক ভয় দেখাবার চেষ্টা। কিন্তু ফল যে এমন মারাত্মক হবে ভাবতেই পারিনি আগে। 'ও-মাগো' বলে বাণী মাঠের ওপর লুটিয়ে পড়লো। অবস্থা কাহিল। ছুটে গিয়ে মল্লিকদের পুকুর থেকে কোঁচার খুঁট ভিজিয়ে জল নিয়ে ওর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিলুম। মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে ওরই আঁচল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস করলুম অনেকক্ষণ ধরে। নিচু হয়ে চোখের পাতাদুটোর ওপর হাত বুলোতে গিয়েই কেমন সন্দেহ হলো। ঠোঁট মুচকে যেন হাসছে বাণী। একটু পরেই সন্দেহ ঘুচলো। কাপড় গুছিয়ে বাণী উঠে বসলো। খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, 'কেমন জব্দ, আর লাগবে আমার পিছনে?'

'তবে রে মেয়ে' ওর একটা হাত ধরে হেঁচকা টান দিলুম, 'মজা দেখাচ্ছি তোমায়!' কিন্তু মজা আর দেখাতে পারলুম না। সমস্ত গোলমাল হয়ে গেলো। আমার টানে বাণী আমার বুকের ওপর এসে পড়েছিলো। টাল সামলাতে গিয়ে দুটো হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো। একটা মাদকতা। দুপুরের তীব্র দাহ ওর খোলা চুলের গোছায় ঢাকা পড়ে গেলো। আমার সমস্ত শরীর দুলে উঠলো অজানা আবেগে।

অনেকক্ষণ পরে বাণী আস্তে আস্তে বললো, 'ছাড়ো রবিদা, দেরী হয়ে গেছে।'

বাণীর কথায় খেয়াল হ'লো। নিজের অজানিতেই দুটো হাত দিয়ে ওকে আমিও আঁকড়ে ধরেছিলুম। কিন্তু যখন ছাড়লুম তখন সত্যিই দেরী হয়ে গেছে।

বাণীর আচমকা গলার আওয়াজে চমকে উঠলুম। মনটা এক ধাক্কায় আবার পুরোনো পাঁচটা বছর পার হয়ে এলো। মহিষরেখা থেকে কানপুর, গোকুল কাকার মেয়ে বাণী থেকে আজকের ম্যানেজারের পরিণীতা স্ত্রীর মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান। প্রচণ্ড স্রোতে পুরোণো দিনের তটরেখা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

'কি ভাবছো রবিদা?' বাণী আবার বললো কথাটা।

নিজেকে সামলে নিলুম। টেবিল থেকে লাল পেন্সিলটা তুলে নিয়ে দাগ দিলুম খাতার ওপরে। মুখে বললুম, 'এত বড় একটা ভুল সুশীলবাবুর নজর এড়ালো কি করে?'

বাণী উঁকি মেরে দেখলো, তারপর হেসে বললো, 'পেন্সিলের আঁচড় কিন্তু রবিদা. এখনো রবার দিয়ে মুছে ফেলা যায়; কি বলো?'

বাণীর দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলুম। চাউনি বদলায় নি বাণীর। ঠিক আগের মতনই আছে, কিন্তু মনটা, সেটাও কি আছে নাকি আগের মতন? রবার দিয়ে সেদিনের ভুল মুছে ফেলা যায় না। কাঁচা ক্যাশবইয়ের পেন্সিলের আঁচড় মুছে ফেলে পাকা খাতায় লেখা যায় না কালি দিয়ে? লেখা বদলানো তো আমারই হাত। কিন্তু ক্যাশ বইয়ের লেখা বদলাতে পারি বলে পাঁচ বছর আগেকার অদৃষ্ট রেখাও কি পারি নাকি বদলাতে? গোড়ার ভুল কি শোধরানো যায় এত দিন পরে।

যখন খেয়াল হলো, মাথা তুলে দেখলুম বাণী সরে গেছে। ক্যাশ বইয়ের পাতাটা তেমনি খোলা রয়েছে। মাত্র সাতদিন সময়। এর মধ্যে ব্রাঞ্চের খাতাপত্র সব কিছু দেখে ফেলতে হবে, এমন কি মজুদ ক্যাশ পর্য্যন্ত মিলিয়ে নিতে হবে। এভাবে এগোলে তো সাত মাসেও শেষ হবে না দেখা। খাতার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম।

কাশির শব্দে মুখ ফেরাতেই দরজার পাশে সুশীল বাবুর সংগে চোখাচোখি হলো। ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন একটু, তার পর বললেন, 'আসুন আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।' খাতাপত্র গুছিয়ে উঠে পড়লুম। সারা রাত জেগে যেভাবেই হোক শেষ করে ফেলতেই হবে। আলসেমী আর বাজে চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না কিছুতেই। যে হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে গেছে পাঁচ বছর আগে, কি হবে তার জের টেনে।

খাবার টেবিলে সুশীলবাবুই কথাটা পাড়লেন, 'বাণী বলছিলো আপনাকে নাকি সে ছেলেবেলা থেকেই চিনতো। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও না কি আছে?'

লুচির টুকরো ছিঁড়তে ছিঁড়তে থেমে গেলুম। সম্পর্কই নেই কোন—তার আবার দূর আর অদূর। কিন্তু এ ধরণের কথাবার্ত্তা এগোতে দিলে কোথায় গিয়ে শেষ হ'বে বলা যায় না। অবহেলিত কেঁচোই হয় ত রূপ নেবে কালসাপের। মরিয়া হ'য়ে বললুম, 'বাণী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। খুব ছেলেবেলায় ওকে দেখেছি।'

'শুধু দেখা! এমন অবস্থা ছিলো আমার যে, একদিন রবিদাকে না দেখলে ঘুমই আসতো না।' দুধের বাটি-গুলো টেবিলের ওপর সাজাতে সাজাতে বাণী বললো।

থালা থেকে মুখ ওঠালুম। ঠোঁটের কোণ দুটো বেঁকিয়ে বাণী হাসছে, অনেকদিন আগে মিথ্যা মূর্চ্ছার ভাণ করে যেমন হেসেছিলো আমার কোলে মাথা রেখে। ভয়-ডর নেই না কি মেয়েটার! নিজের সংসারে খাল কেটে বেনোজল ঢোকাতে চায়!

'মনে আছে রবিদা, রায়েদের বাগান থেকে কালো

STUDENTS' COMMON ROOM G. A.

জাম চুরি করার কথা।' বাণী যেন বেপরোয়া। শুধু কালোজাম চুরি কেন, আনাচে কানাচে আরো কত কি চুরি করার কথা মনে আছে আমার। কিন্তু সে সব কথা জানাবার দিন না কি আজ।

বাণী হাসিতে ভেঙে পড়লো, 'সত্যি চুরি করা জিনিষ খেতে কি ভালোই লাগতো!'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লুম। সুশীলবাবু হাঁ, হাঁ করে উঠলেন, 'ওকি কিছুই যে খেলেন না? দুধটুকু খেয়ে নিন। ক'লকাতায় ভালো দুধ তো চোখেই দেখা যায় না।'

হাত নেড়ে বারণ করলুম। পেটের গোলমাল, খাঁটি দুধ সইবে না। নিজের ঘরে পালিয়ে এসে দরজায় খিল দিয়ে দিলুম। বিশ্বাস নেই, সব পারে বাণী, সেদিনের মতন খাওয়া ক'রে হয় ত ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়বে। সে দিনের মতন কালো দুটি চোখ তুলে বলবে, 'তুমি আসবে ব'লে সকাল থেকে ব'সে রয়েছি।'

ঘণ্টাখানেক ধরে খাতাপত্র দেখে গেলুম একটানা। অজস্র ভুল। সন্দেহজনক ব্যাপার। এর ওপর যদি আবার ক্যাশেও কমতি থাকে, তবে সোনায় সোহাগা হ'বে। হেড অফিসে খবর দেওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারি আমি। ফল যে কি হ'বে তাও অজানা নয়। কিন্তু বাণীর কি হবে? এই রকম একটা ছন্নছাড়া বেহিসেবী লোকের হাত ধ'রে কোথায় বেড়াবে পথে পথে? কে ওর ভার নেবে অসময়ে?

মাথাটা সজোরে ঝেঁকে নিয়ে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলুম। যেই নিক-না ভার, আমার এত মাথাব্যথা কিসের? এতই যদি দরদ তবে সত্যি ভার নেবার দিনে কেন গিয়েছিলুম পিছিয়ে? মিথ্যা সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছিলুম।

কথাটা আমাদের দিক থেকেই উঠেছিল। আমার এক বুড়ি পিসীমাই শুরু করেছিলেন, 'আমাদের রবির সংগে কিন্তু বেশ মানায় বাণীকে।' মায়েরও অমত ছিলো না, কিন্তু তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, 'তা সত্যি, কিন্তু বাণীর বাবা কি আমাদের ঘরে মেয়ে দেবে। যাও একবার ঠাকুরপোর কাছে, মেয়েটিকে চাইগে আমার রবির জন্য।'

ঠাকুরপোর কাছে তিনি গিয়েও ছিলেন, কিন্তু ফল ভালো হয় নি। ফল যে ভালো হয়নি সেটা তাঁর কথাতেই টের পেলুম। আমাকে ডেকে বললেন, 'রবি, বাণী বড় হয়েছে, ওর সংগে তোমার এত মেলামেশাটা ভালো দেখায় না। তা ছাড়া গোকুল ঠাকুরপো যখন কুলীন ছাড়া কাজই করবে না, তখন আমাদের দিক থেকে সাবধান হওয়াই উচিত।

দাওয়ায় চুপচাপ বসে রইলুম। মার কথাগুলো হাজার ভীমরুলের হুল কোটাতে লাগল মাথায়। বাণীর ঘরেও হয়ত এই ধরণের কথাবার্তা হয়ে থাকবে, কারণ পরের অনেক দিন বাণী আর এলো না আমাদের বাড়ীতে।

একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে হঠাৎ বাণীর সংগে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো। বাণীই বোধ হয় ওৎ পেতে ছিল আমার জন্য। পাকুড় গাছের আড়ালে থেকে বেরিয়ে আমার সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো। খোলা চুল পিঠের ওপর মেলা, এলোমেলো বাতাসে আঁচল উড়ছিলো। থম-থম করছে সারা মুখ।

"তুমি পুরুষ না কি?"

থতমত খেয়ে গেলুম। আমতা আমতা করে বললুম, 'তোমার বাবার মত নেই, কি করবো ব'লো?'

বাণী যেন জ্বলে উঠলো। এক হাতে আমার একটা হাত ঝাপটে ধ'রে বললো, 'যখন আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলে, ইনিয়ে বিনিয়ে ভালোবাসার কথা শুনিয়েছিলে তখন কি আমার বাবার মত নিয়েছিলে? বলো? বলো?'

আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিলুম। একি করছে বাণী। কে কোথা দিয়ে দেখে ফেলবে, তারপরে কান পাতা যাবে না গাঁয়ে। ওর বিয়ে হওয়াই মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়াবে। বোঝাবার মুখেই বিপত্তি। বাণী আরও সরে এলো কাছে, 'জানো এ মাসের সতেরই আমার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। এখনও হাতপা গুটিয়ে তুমি বসে থাকবে? নাইবা রইলো বাবার মত। তুমি তো পুরুষ, আমাকে নিয়ে যেতে পারো না হাত ধরে?'

বাণী উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছে। ওকে কিছু বলার

চেষ্টা বৃথা। তাই আস্তে বললুম, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বাণী। একটা দিন শুধু ভাবতে সময় দাও আমাকে। বিয়ের এখনও পাঁচ ছ' দিন বাকি। আমি পরশু এইখানে তোমার সংগে দেখা করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি কথা দিচ্ছি।'

শুধু কথায় হয়ত বাণী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি। বললো, 'আমার গা ছুঁয়ে বলো। গা ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বললে কি হয় জানো, যার গা ছোঁয়, সে মারা যায়।'

বাণীর গা ছুঁয়ে শপথ করলুম। কিন্তু শপথ রাখতে পারি নি। মাথার মধ্যে কিলবিল ক'রে অজস্র চিন্তা এসে ঢুকলো। নিজের ভবিষ্যৎ, আত্মীয়স্বজন, গাঁয়ে ফিরে আসার পথে নানান কথা ভীড় করে এলো। অনেক ভেবে চিন্তে সরে দাঁড়ানোই ঠিক করলুম। পড়ার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে এই অজুহাতে সুটকেশ হাতে মাকে প্রণাম করে ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালুম। এ সব অনেক দিনের কথা।

হঠাৎ কোতোয়ালীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজতেই বিছানার ওপর উঠে বসলুম। আর ক্যাশবই দেখে লাভ নেই। অজস্র ভুল। এর আর আদি অন্ত নেই। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটানা ভুলের মিছিল। শুধু রবার দিয়ে ঘষলে হবে না, পাতা ছিঁড়ে নতুন ক'রে শুরু করতে হবে সব কিছুর। নয় ত সুশীল-বাবুকে বাঁচাবার আর কোন পথই নেই।

পরের দিন ক্যাশিয়ার আসার সংগে সংগেই তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম। কড়া গলায় বললুম, 'তিনটের সময় ক্যাশ বন্ধ হ'লে আমি ক্যাশ কাউন্ট করবো।'

ক্যাশিয়ারের বদলে ম্যানেজার উত্তর দিলেন। আমার সংগে সংগে কখন সুশীলবাবু পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্য করিনি। তিনি বললেন, 'বেশ তো দেখবেন এখন। এখানে বসে থেকে লাভ কি। আমার রুমে চলুন, তিনটের সময় এসে চেক করলেই হবে।'

ব্যাপারটা অতো সোজা হলে আর ভাবনা ছিলো কি! এখান থেকে সরে যাবো আর কারো কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে ধার-ধোর ক'রে কমতি টাকাটা পুষিয়ে রাখবেন সেই সুযোগে—সেটা হ'তে দেওয়াও তো বাঞ্ছনীয় নয়। কোম্পানীর তহবিল তো আর নিজের পকেট নয় যে ইচ্ছামতো খরচ করবে, আর দরকারের সময় টাকা জোগাড় করে হিসাব ঠিক ক'রে রাখবে।' হাত তুলে বাধা দিলুম, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না সুশীলবাবু। আমি এখানেই বসবো, আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

সুশীলবাবু নিজের রুমে চলে গেলেন।

বেলা দুটো নাগাদ বেয়ারা একটা স্লিপ এনে দিলো। সুশীলবাবুর লেখা, 'বিশেষ জরুরী কথা। দয়া ক'রে একটু আসবেন।' কি এমন জরুরী কথা। খটকা লাগলো মনে। ক্যাশ গোনবার হয় ত প্রয়োজনই হ'বে না। শুনেই আসা যাক ব্যাপারটা। কাউণ্টারে লোক নেই। ক্যাশ বন্ধ করতে বলে চাবিটা নিজে নিয়ে নিলুম। বললুম, 'আমি ম্যানেজারের রুমে রয়েছি। ক্যাশ খোলার প্রয়োজন হলে আমায় ডেকে আনলেই চলবে।'

যা আন্দাজ করেছিলুম তাই। ঢুকতেই সুশীল বাবু আমার একটা হাত জাপটে ধরলেন, 'আমায় বাঁচান রবি বাবু। বাণী বলছিলো, আপনার দয়ামায়ার শরীর। রক্ষে করুন আমাকে।'

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলুম, 'কি ব্যাপারটা খুলে বলুন তো। কত টাকা সরিয়েছেন ক্যাশ থেকে।'

সুশীল বাবুর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। 'বিশ্বাস করুন, এছাড়া আর উপায় ছিলো না। বাণীর অসুখের সময় সব খরচ হয়ে গিয়েছিলো; একটি পয়সা ছিলো না হাতে। আত্মীয়স্বজন কেউ উপুড় হস্ত করলে না। তাই বাধ্য হয়ে শ পাঁচেক টাকা নিতে হয়ে ছিলো ক্যাশ থেকে। ওই টাকাই কম আছে। ওটা আমি এ সপ্তাহের মধ্যেই এনে দোবো।'

আরচোখে একবার সুশীল বাবুর দিকে নজর চালালুম। কড়া গলায় বলে ফেললুম, 'টাকার অভাব তো আফিসের ক্যাশ না ভেঙে, নিজের আংটি, বোতাম, ঘড়ি এই সব বিক্রি করেও তো বউয়ের চিকিৎসা চালাতে পারতেন।"

ম্যানেজারের রুম থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, 'ক্যাশবাক্স খুলুন। এই নিন চাবি। আমি ক্যাশ গুণবো।"

পাঁচশো নয়, নশো তিপ্পান্ন টাকা কম। ক্যাশিয়ারকে ধমক দিতেই সে আঙুল দিয়ে ম্যানেজারের রুমের দিকে দেখিয়ে দিলো, 'আমি কি করবো বলুন। আমি তো ওঁরই তাঁবে। মালিক যদি এমন করেন তো নোকর আমরা কি করতে পারি!' ক্যাশিয়ারটি ভদেশেরই লোক। ম্যানেজার যখন নিজেই স্বীকার করেছে তখন ওকে আটকাবার আর দরকার নেই। তা ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার টাকার যে সিকিউরিটি র'য়েছে ভদ্রলোকের।

দেরী করে লাভ নেই। মন শক্ত করে ফেললুম। সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে আজই কড়া করে রিপোর্ট লিখে ফেলতে হবে একটা। তার পর সোজা ট্রাঙ্ক কল করবো জেনারেল ম্যানেজারের বাড়ীতে। জানিয়ে দেবো খুঁটিনাটি সব কিছু, তিনি যা বলেন সেই রকমই করবো। ম্যানেজারের টেবিলে বসে চার পাতা রিপোর্ট শেষ করলুম। হিসেবের গোলমাল থেকে শুরু করে ক্যাশের অবস্থা কিছুই বাদ দিলুম না। ম্যানেজারের চালচলনের বহর আর স্ত্রীর অসুখের কৈফিয়ৎ সবই লিখে দিলুম। এইবার ট্রাঙ্ককলটা করলেই আমার এখানকার কাজ মিটে যাবে। টেলিফোন তুলতে গিয়েই কিন্তু বাধা পেলুম।

দরজার গোড়ায় বাণী এসে দাঁড়িয়েছে। টকটকে লাল শাড়ী, গলায় লাল পাথরের মালা। মাথার ঘোমটা পিঠের ওপর খসে পড়েছে। আগুনের উদ্দপ্ত একটা শিখার মতন ও যেন জ্বলছে।

'হেডঅফিসে টেলিফোনটা করে চা খাবে, না আগেই দেবো! সেই সাতসকালে দুটি ভাত তো মুখে দিয়েছো।' বাণীর গলায় একটুও জড়তা নেই।

ফোনের হোল্ডারটা ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। একটু যেন ফ্যাকাসে দেখালো বাণীর গালের দুটো পাশ। চোখের কোলে ম্লান কালির প্রলেপ। সত্যিই হয়ত অসুখ হয়ে থাকবে ওর। ওকে বাঁচাবার জন্তই যদি সুশীলবাবু ক্যাশ ছুঁয়ে থাকেন, তবে অন্তায়টা কোথায়? হাতের কাছে প্রচুর অর্থ থাকতেও চোখের সামনে বিনাচিকিৎসায়, বিনাপথ্যে বাণীর মতন একটা মেয়ে মারা যাবে তিলে তিলে, তা কি হয় নাকি কখনো? আজ যদি সুশীলবাবুর অবস্থা আমারই হতো—

আর ভাববার অবসর পেলুম না। নম্বর চাইলো টেলিফোনের অপারেটর। নম্বর দিলুম। কিছুক্ষণ পরেই তারের ওদিক থেকে জেনারেল ম্যানেজারের ভারিক্কী গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

কথা বলবার আগে একটু বোধ হয় ঠোঁটটা কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিলুম নিজেকে। দরজার কপাটে বাণী একটা হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠলো। হয় ত আমার চোখের ভুল। গলাটা ঠিক ক'রে নিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা শুরু করলুম, 'হ্যাঁ স্যর, আমি রবি ঘোষাল কথা বলছি—আজ্ঞে হ্যাঁ কাণপুর থেকে। শরীর ভীষণ খারাপ এসে অবধি, খাতাপত্র কিছুই দেখতে পারি নি। ভাবছি আজ রাত্রের ট্রেণেই চলে যাবো। সারাদিনে প্রায় বার ছয়েক বমি করেছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভালো, অন্ত কাউকে পাঠালেই ভালো হ'বে। নমস্কার, নমস্কার।' ফোনটা নামিয়ে রেখে যখন উঠে দাঁড়ালুম, বাণী দরজা থেকে সরে গিয়েছে। উত্তেজিত মুহূর্তে রিপোর্টটা কখন হাতের চাপে মুচড়ে ফেলেছি খেয়াল ছিল না।

নটা কুড়ির গাড়ী। ঠিক বেরোবার মুখে ফটকের কাছে বাণীর সঙ্গে দেখা হ'লো। এগিয়ে পথ আড়াল ক'রে দাঁড়ালো: 'দাঁড়াও রবিদা, প্রণাম করি একটা।' নিশ্চিন্ত ভাবে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলুম। ওকে ছুঁতে আর ভয় হোল না। আস্তে আস্তে বললুম, 'আমি সরে যাচ্ছি বাণী, অন্ত কেউ হয় ত আসবে আমার জায়গায়।'

'এ আর নতুন কথা কি রবিদা, চিরকাল তো তুমিই সরে দাঁড়াও, অন্ত কেউই তো আসে তোমার জায়গায়।'

আশ্চর্য্য, ভিজে কাঁদো কাঁদো গলায় নয়, শুকনো খটখটে গলায় বাণী প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করলো।

STUDENTS & CO. P. G. A.

ইউরেনিয়াম

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

এটম বোমার কথা আজ আর কাহারও কাছে অবিদিত নাই। ইহাও জানা আছে যে, এটম বোমার অমিত শক্তি ইউরেনিয়াম ধাতুর কেন্দ্রীনে আবদ্ধ প্রচণ্ড শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর পরিবর্ত্তে উহার একটি আইসোটোপ, ইউরেনিয়াম-২৩৫, এটম বোমা তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর কেন্দ্রীন বিভাজনে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহা সাধারণ ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী এবং এই আইসোটোপটি সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতু হইতেই তৈয়ারী করা সম্ভব। একদিকে যেমন ধ্বংসলীলা সম্পাদন করিতে ইউরেনিয়াম অদ্বিতীয়, পক্ষান্তরে মানবহিতকর কার্য্যেও ইউরেনিয়াম তথা তেজস্ক্রিয় ধাতুগুলির ব্যবহার বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এখানে ইউরেনিয়াম সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। বর্ত্তমান যুগে কোন জাতির ইউরেনিয়াম সম্পদই তাহার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ, এ কথা বলিলে খুব বেশী বলা হইবে না বলিয়াই মনে করি।

১৭৮৯ সালেই সর্ব্বপ্রথম 'ইউরেনিয়াম' কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক এম, এইচ, ক্লাপ্রথ অষ্ট্রিয়ার পিচব্লেণ্ড লইয়া গবেষণা করিতে যাইয়া ইউরেনিয়ামের একটি কালো অক্সাইড আবিষ্কার করেন। তিনি ভুল-ক্রমে উহার নাম দিলেন 'ইউরেনিয়াম'। ১৮৪১ সালেই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত কালো পদার্থটি ইউরেনিয়াম নহে, বস্তুতঃপক্ষে উহা ইউরেনিয়ামের একটি অক্সাইড। যাহা হউক, ইউরেনিয়ামের গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়া দেখা গেল যে, ইহার প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা হইতে স্বতঃ-বিকীরণ-ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি নামে তিন প্রকার রশ্মি অনবরত বহির্গত হইয়া থাকে। এই সমস্ত রশ্মির বহির্গমনহেতু ইউরেনিয়ামের পরমাণুর গঠনবিধি পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং নানা জাতীয় নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হইতেছে। সর্ব্বশেষে পাওয়া যায় সাধারণ সীসা; পরিবর্ত্তন ক্রিয়ায় কি পরিমাণ সময় লাগে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য আরও কয়েকটি তেজস্ক্রিয় ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাদাম কুরী আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় ধাতু রেডিয়াম ইউরেনিয়াম ধাতু হইতে স্বতঃ বিকীরণ ক্রিয়ার পর পাওয়া যায়; সুতরাং ইউরেনিয়াম ধাতু প্রস্তর সমৃদ্ধ কোন খনিজ পদার্থে রেডিয়ামের অবস্থিতি অসম্ভব নহে; এবং রেডিয়াম বা অন্য ধাতুর পরিমাণ নিরূপণ করিয়া উক্ত প্রস্তরের বয়স নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ইউরেনিয়াম ধাতু একক অবস্থায় খনিতে থাকে না। নানা জাতীয় বিভিন্ন যৌগের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে অক্সাইড, ফসফেট, কারবোনেট অবস্থায় উহা খনিতে পাওয়া যায়। এ যাবৎ প্রায় ১১০ প্রকার ইউরেনিয়াম মাক্ষিক মিলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইউরেনিনাইট, কিউরাইট, ইউরেনোফেন, টোবারনাইট, পিচব্লেণ্ড প্রভৃতি প্রধান। কোন প্রস্তরে ইউরেনিয়াম মাক্ষিকের অবস্থিতি জানিবার জন্য উক্ত প্রস্তরের অতি সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত মিশ্রিত করিয়া যদি অতি বেগুনী আলোতে প্রকাশিত করা যায়, তবে হলদে এবং সবুজ রং-এর মিশ্রিত একটি দীপ্তি দেখা যাইবে। তবে প্রকৃতক্ষেত্রে খনিতে পরীক্ষা কার্য্যের নিমিত্ত আলফা-রশ্মিতে কার্য্যকরী একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর কিঞ্চিৎ ইউরেনিয়াম প্রস্তর ১২ ঘণ্টা হইতে এক সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিলে প্লেটের উপর আলফা-রশ্মির চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যাইবে। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইউরেনিয়াম হইতে অনবরত আলফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি প্রভৃতি নির্গত হইতেছে। খনিতে আরও নানাবিধ উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

উক্ত তিন প্রকার অদৃশ্য রশ্মি অন্য কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। কোয়ার্টজ প্রস্তরের উপর উক্ত রশ্মি পড়িলে উহার বর্ণ ধূসর হয়, কাচ এবং বালুকার বর্ণ বেগুনী হইতে পারে। অবশ্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পরিবর্ত্তিত বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। কোন বায়বীয় পদার্থের

বনানী [ফটো—শান্তি সেন

ভিতর দিয়া অতিবাহনকালে উহা বায়বীয় পদার্থকে বিদ্যুৎপরিবাহী করিয়া তোলে। তৃতীয়তঃ, এই রশ্মিগুলির উত্তাপ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। চতুর্থতঃ, তিন প্রকার রশ্মির মধ্যে গামা রশ্মি প্রাণীদেহের কোন রোগাক্রান্ত টিস্যুর বর্দ্ধন প্রতিহত করে; তজ্জন্য টিউমার, ক্যানসার এবং চর্ম্মরোগের নিরাময় হেতু গামারশ্মি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালে ইউরেনিয়াম ধাতুর সর্ব্বাধিক এবং সর্ব্বপ্রধান ব্যবহার এটম বোমা এবং ঐ জাতীয় ভয়াবহ মরণাস্ত্রের তৈয়ারীর নিমিত্ত। তবে পরমাণুর কেন্দ্রীয় ভাঙ্গন এবং উহা হইতে শক্তি বহির্গমন তত্ত্বের আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরেনিয়মের অক্সাইড্ এবং লবণ কাচ, চীনাবাসন, এনামেল প্রভৃতিতে রং করিবার নিমিত্তই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। তাহা ছাড়া ফটোগ্রাফীর কাজে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে এবং ঔষধ হিসাবেও ইউরেনিয়ামের ব্যবহার প্রচলিত আছে। জোরালো ইলেকট্রিক বাতির স্থায়িত্ব বাড়াইবার কাজে ইউরেনিয়াম অদ্বিতীয়।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক প্রস্তর, ধাতুপ্রস্তর, প্রাকৃতিক ফোয়ারার জল এবং জৈব পদার্থ হইতে সামান্য পরিমাণে ইউরেনিয়াম মিলিতে পারে এবং উহাদের মধ্যে কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়াম পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইউরেনিয়াম হইতে বিকীরণক্রিয়ার পর রেডিয়াম তৈয়ারী হয়। দেখা গিয়াছে যে, ইগ্‌নিয়াস্ প্রস্তরই রেডিয়াম সম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। সমুদ্রজল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে সামান্য পরিমাণে রেডিয়াম এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় ধাতুর লবণ রহিয়াছে। পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে যত জল আছে তাহা হইতে ২০,০০০ টন রেডিয়াম মিলিতে পারে।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে সামান্য পরিমাণে ইউরেনিয়াম ধাতুপ্রস্তর রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ইউরেনিয়াম নিষ্কাষণের পক্ষে পর্য্যাপ্তও নহে বা উহা সুবিধাও নহে। গয়া জেলার সিংগর জমিদারীতে একটি পাহাড়ের প্রস্তরের মধ্যে অন্যান্য নানাজাতীয় ধাতবপ্রস্তরের সহিত

পিচ্‌ব্লেণ্ড এবং মোনাজাইট বালুকা পাওয়া গিয়াছে। উক্ত স্থানের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আবরাকী পাহাড়ে যে খননকার্য্য হইয়াছিল তাহাতে ৪ হন্দর পিচ্‌ব্লেণ্ড মিলিয়াছিল। এ সমস্ত ইউরেনিয়াম প্রস্তর উক্ত স্থানেই সীমাবদ্ধ বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আজমীর প্রদেশের একটী বেরিলিয়াম খনির নিকটে ইউরেনিয়াম প্রস্তর মিলিয়াছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, এখানকার প্রস্তরে শতকরা ৭৫ ভাগ ইউরেনিয়াম অক্সাইড রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঝরিয়া, হাজারীবাগ, মান্দ্রাজের সালেম জেলায় ও নেলোর জেলায়, মহীশূর এবং ত্রিবাঙ্কুরের নানাস্থানে অল্প পরিমাণে ইউরেনিয়াম প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তবে ভারতের খনিজ সম্পদের অনেক কিছুই অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, কাজেই ধারাবাহিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধানকার্য্য না চালাইয়া ভারতের তেজস্ক্রিয় ধাতুর অবস্থিতি সম্বন্ধে এখন সঠিক কিছু বলা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর মধ্যে চারিটী দেশ ইউরেনিয়াম সম্পদে সমৃদ্ধ, (১) চেকোশ্লোভাকিয়া, (২) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, (৩) বেলজিয়াম কঙ্গো, ও (৪) কানাডা। তাহা ছাড়া পর্ত্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে কমবেশী ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউরেনিয়াম ধাতুপ্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় রেডিয়াম পাওয়া যায়। ৫ টন ইউরেনিয়াম প্রস্তরের মধ্যে প্রায় ১ গ্রাম রেডিয়াম মেলে। বিভিন্ন দেশে এ যাবৎ যে পরিমাণ রেডিয়াম নিষ্কাষিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইউরেনিয়াম প্রস্তরের ধারণা করা অসম্ভব হইবে না। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মোট প্রায় ১ হাজার গ্রাম রেডিয়াম তৈয়ারী হইয়াছে। উহার এক চতুর্থাংশ যুক্তরাষ্ট্রে এবং এক তৃতীয়াংশ বেলজিয়াম কঙ্গো হইতে পাওয়া গিয়াছে। ২০ হইতে ৩০ গ্রাম রেডিয়াম বাৎসরিক ব্যয় হয় জটিল রোগ চিকিৎসার নিমিত্ত। বর্ত্তমানে প্রতি মিলিগ্রাম রেডিয়ামের দাম ৫০ ডলার।

১৯৪০ সালে ১,৫০০ টন ইউরেনিয়ামপ্রস্তর উৎখাত হইয়াছে। ইহা হইতে ৭ টন ইউরেনিয়াম-২৩৫ পাওয়া যাইতে পারে এবং এই পরিমাণ ইউরেনিয়াম ২৩৫ হইতে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা কল্পনাতীত!

দ্বীপ

চিত্তরঞ্জন সরকার

তোমার চোখের দ্বীপে ছায়া নামে, ছোট বেলা তার.
রোদ শেষে রাত নামে, পাখী ফেরে, বড় ক্লান্ত মন—
(সুদীপা গো কাছে এসো চোখে মাখ সোনার স্বপন)
তোমার শ্যামল দ্বীপে আজ রাতে একা থাকা ভার!

অবিরাম পাতা ঝরে, বাতাসের ডাক যায় শোনা :
আজ রাতে অসহায়, ভীরু মন বড় অসহায়—
তোমার চোখের নীলে ঢেউ ওঠে···অবাধে ছড়ায়,
তোমার চোখের জল সাগরের মত যেন লোণা!

আজ রাতে ভাল লাগে ছোট চাঁদ···মৃদু জ্যোছনা;
আরো ভালো চেয়ে থাকা (তোমার দু'চোখে কত ঘুম
সুদীপা গো কাছে এসো, ছোট রাত কেমন নিঝুম)
তোমার চোখের তীরে কাল ভোরে খুঁজে নেব সোনা।

তোমার চোখের দ্বীপ বড় ছোট বড় নির্জ্জন :
যত ছোট বেলা তার, আরো তার ছোট অবসর ;
(কথা শোন, কাছে এসো, উত্তাল চোখের সাগর)
আজ রাতে নিরালায় একা একা কেঁদে মরে মন।

এক

একটা গোলাপী রঙের খামের উপর গোলাপী চিঠিটা বাঁ হাতের তর্জ্জনী ও বুড়ো আঙুলে চাপিয়া প্রৌঢ় কাশীপতি নিতান্ত অসন্তুষ্টভাবে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় ছুটিয়া আসিলেন। পৃথিবী এবং ভাগ্য সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ জানাইতে হইলে এখানে ছুটিয়া আসাই তাঁর অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। আজও আসিলেন।

সার্কাসের ঘোড়ার মতো একটা অনাহার-ক্লিষ্ট ভাব এবং ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়ার মতো একটা ক্লান্তি যেন রেষারেষি করিয়া কাশীপতিবাবুর মুখে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাটের কাছাকাছি বয়স; লম্বা দেহটা কাঁধের কাছে পৌঁছিয়া তবে কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চোখে চশমা পরেন না; আধ পাকা, আধ কাঁচা ঘন ভ্রূ জানালার উপরকার কার্ণিশের মতো সামনে ঠেলিয়া আসিয়াছে। চোখের চাউনি মার-খাওয়া কুকুরের মতন; অত্যাচারিত হইয়া যেন আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত, অথচ যেন নিজের শক্তির উপর ভরসা করিতে পারিতেছেন না।

'দেখলে, একবার কাণ্ডটা, দেখলে?' কাশীপতি রন্ধন-নিরতা স্ত্রী বিরজাসুন্দরীর উদ্দেশে কহিলেন। 'একটু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠব, তার কি উপায় আছে! এ অত্যাচার, অত্যাচার! অত্যাচার ছাড়া এ আর কিছু নয়! .....'

বিরজা শব্দায়মান কড়াটা উনানের পাশে নামাইয়া সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাহিলেন। ঈষৎ স্থূল চেহারার সাদাসিধে, শান্ত প্রকৃতির গৃহিণী বিরজাসুন্দরী। জীবনের উপর তার যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তাহা তাহার ভাবলেশহীন মুখ হইতে বুঝিবার উপায় নাই। সরল ভালো মানুষ। খাটুনিকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে, নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করা চলে, তাহা পর্য্যন্ত তিনি ভাবিতে পারেন না। জগতটা তাহার কাছে একটা মাত্র ছোট সংসার, এবং ইহার সমস্যা স্বামী ও সন্তানদের খাওয়া এবং পরার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা ছাড়া অন্য কোনও সমস্যার উদয় হইলে তিনি যেন অথৈ জলে গিয়া পড়েন।

'কিছুর মধ্যে কিছু নেই', কাশীপতি আহত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হুট্ করে' এই চিঠি। নাও, এবার এর ঠেলা সামলাও।'

'কার চিঠি? বিয়ের নেমন্তন্নো পত্তর নাকি?' বিরজাসুন্দরী নামানো কড়াটা আবার উনানে চাপাইবার উদ্যোগ করিলেন।

'তবে আর বলচি কি।' কাশীপতি বিরক্তভাবে কহিলেন: 'নিবারণের মেয়ের বিয়ে। ৭ই অঘ্রাণ। নাও, এবার তার ঠেলা সামলাও!'

রান্নাঘরেই উনানের কাছ হইতে কিছু দূরে কাশীপতির বড়ো মেয়ে সুষমা বাবার অফিসের টিফিনের জন্য রুটি বেলিতেছিল; সে খুসি মুখে, মুখ তুলিয়া কহিল, 'নন্দার বিয়ে নাকি, বাবা? এতো খুব ভালো খবর।'

'ভালো খবর বৈ কি।' বলিয়া কাশীপতি প্রায় আছাড় মারিবার মতো করিয়া চিঠিটা সুষমার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। 'তাদের মেয়ের বিয়ে, ইদিকে আমার তো

প্রাণান্ত। ধার না করলে এ-মাসে আর পাই পয়সাটি বাড়তি খরচা করবার উপায় নেই। অথচ কুটুম্বিতের ত্রুটী হলে তোর মাসি আমার পিণ্ডির জোগার না ক'রে ছাড়বে? যত সব! এত দিকে এত আন্দোলন হচ্ছে, অথচ এই যে কশাইয়ের মতো গলায় পা দিয়ে লৌকিকতা আদায় করা, এর দিকে কারুর নজর পড়ে না। আবার পাছে জিনিষ দেওয়ার কথা ভুলে যাই, তাই ফলাও করে' লেখা হয়েছে, "লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।"......নাও, যা হয়েছে, আমাকে চট্ করে দিয়ে দাও। নটা বাজে। নাকে মুখে চাট্টি গুঁজে ট্রামে আবার সেই বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে হবে তো!...'

কাশীপতি তাঁহার মুষ্টিমেয় শ্রোতার সভায় তীব্র প্রতিবাদ সমাপ্ত করিয়া তাড়াতাড়ি শুইবার ঘরে আসিলেন। স্নানের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া যে ফর্সা ধুতিটা লুঙ্গির মতো করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছেন, এইবার তাহা যথোচিতভাবে প্লেট করা হাতাবিশিষ্ট আধ-ফর্সা সার্টের উপর আঁটো করিয়া পরিলেন। কোটটা কোণার আল্‌না হইতে পাড়িয়া আনিয়া তাহার উপর দুইটা থাপর বসাইয়া কাঠের বৃদ্ধ ও বিবর্ণ চেয়ারটার পিঠে মেলিয়া রাখিলেন, খাওয়া সারিয়া অফিস যাইবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে গায়ে পরিবেন।

গত পয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইহাই তাঁহার নিয়মিত রুটিন। নটায় স্নান সারিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাইতে বসেন। শার্টের উপর ধুতি আঁটিয়া পরিয়া, তাহার উপর কোট চড়াইয়া, বার্ড, এডওয়ার্ড অ্যাণ্ড জন্‌সন্ কোম্পানীতে হাজিরা দিতে ছোটেন। এই নিষ্ঠার দরুণ একদিন যে কেরাণী মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে বাহাল হইয়াছিল, সে এখন যুদ্ধের ডিয়ার্নেস অ্যালাউন্সসহ প্রায় দুশো টাকা বেতন পাইতেছে।

মাত্র কয়েক বছর আগে পর্য্যন্তও তিনি তাঁহার এই ক্রমোন্নতিতে বেশ সন্তুষ্ট ও গর্ব্বিত ছিলেন। তারপর যুদ্ধের দরুণ দ্রব্য-মূল্য বাড়ার মুখে অফিসে নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের য়ুনিয়ন গঠিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রীতিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উদ্যোক্তারা তাহা ট্রেড য়ুনিয়ন হিসাবে রেজিষ্টারীভুক্ত করিল। সেই হইতে অফিসে উহারা নানা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। যে সব কর্ম্মচারিরা সাহেবদের ভয়ে প্রথমে ইহাতে যোগ দিতে রাজী হয় নাই, ক্রমে তাহাদেরও অনেকে ইহাতে যোগদান করিয়া ইহাকে কিছুটা শক্তিশালী এবং কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর বিরাগ ভাজন করিয়া তুলিয়াছে।

কাশীপতি বাবু বহুদিন ইহাতে যোগ দেন নাই, সাহেবদের চটাইবার তিনি পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ক্রমে যখন য়ুনিয়ন ধর্ম্মঘটের হুমকি দেখাইয়া কোম্পানীর কাছ হইতে একটা মাগ্‌গি ভাতা আদায় করিতে সমর্থ হইল এবং সাহেবরা যতই রাগ দেখাক, য়ুনিয়নকে দাবাইতে সমর্থ হইল না, তখন কাশীপতি বাবুরও সাহস বাড়িল। তা ছাড়া, এই জয়লাভের পর যে সকল কর্ম্মচারি য়ুনিয়নের সদস্য নয়, তাহাদের উপর সদস্য হইবার জন্য চাপ পড়িল। কাশীপতি আর অমত করিলেন না। এখন তিনিও অফিস য়ুনিয়নের সদস্য। তবে উগ্রপন্থী সদস্য তো ননই, বরঞ্চ য়ুনিয়নের বিতর্কে এবং ভোটে তিনি এখনও প্রচুর প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া ছাড়েন। ছোকরা কেরাণীরা তাঁহার নাম দিয়াছে, 'রায়বাহাদুর'।

শুইবার ঘরের সামনেকার বারান্দায় আগে হইতেই ঠাঁই করা ছিল। সুষমা থালা সাজাইয়া কাশীপতির সম্মুখে আনিয়া দিল। কাশীপতি বাক্যব্যয় না করিয়া গরম ভাত হইতে উষ্ণ বাষ্প ছাড়াইবার জন্য তাহাতে আঙুলের খোঁচা মারা শুরু করিলেন।

সুষমা কহিল, 'ভাত ঠাণ্ডা করে' দিয়েছি, বাবা। তুমি খাও।'

সুষমা বছর কুড়ি একুশের অবিবাহিতা তরুণী। বাপের ধরণে লম্বা এবং ছিপ্‌ছিপে। মায়ের ফর্সা রং পাইয়াছে। মায়ের মতোই শান্ত মুখ। পিতার জন্য প্রায় একটা বাৎসল্য ভাব যেন তার চোখের দৃষ্টিতে ব্যক্ত হইতেছে।

ডাল সমাপ্ত করিয়া তরকারীর বাটিটা ধরিবেন কি না দ্বিধা করিয়া কাশীপতি কহিলেন, 'চচ্চড়ি খেলাম না? আবার একটা তরকারী কেন! কতদিন তোর মাকে

বলিচি, অফিস যাওয়ার মুখে এত আমি খেতে পারি নে। একটা ডাল, একটা কিছু সেদ্ধ হলেই আমার যথেষ্ট। অফিসে গিয়ে খাটতে হবে তো। এমন ভরা পেটে… আবার কি ?…কাশীপতি সবিস্ময়ে উপর দিকে চাহিলেন।

বিরজাসুন্দরী একটা কাঁসারিতে ধোঁয়া-তোলা মাছের ঝোল লইয়া আসিয়াছিলেন। এখনও ঝোলটা যথেষ্ট ঘন ও সুস্বাদু হয় নাই, কিন্তু আর দেরি করিলে কাশীপতির নাগাল পাওয়া যাইবে না। তাই উনানের উপর হইতেই এক টুকরা মাছ উঠাইয়া আনিয়াছেন।

সহসা কাশীপতি চটিয়া আগুন হইলেন। চেঁচাইয়া আহত কণ্ঠে কহিলেন, 'মাছ! আবার মাছ! না, আমি খাব না, কিছুতেই খাব না। পই পই করে তোমাদের বারণ করেচি, এত সব গিলে আমি অফিস যেতে পারিনে, কষ্ট হয়, এত সব আমার চাইনে, অথচ নিত্য তোমরা…'

'সবার জন্যই মাছ হচ্চে, আর তুমি খাবে না!' বিরজা নির্ব্বিকার মুখে কহিলেন : 'এ হলে মেয়েরাও খেতে চায় না। তারাপদ শুনলে রাগ করে। বলে, "কম মাছ আসে, সবাই কম খাবে ; তা বলে তোমরা না খেয়ে আমাদের ভাগ বাড়াবে, তা হবে না। এত দামের মাছ, কত লোক তো মোটে খেতেই পারে না, আমরা তবু তো একবেলা করে রোজই খাচ্চি।"

'আরে কি মুস্কিল,' কাশীপতি ধরা পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। 'আমি কি সে-কথা বলচি। রেখে দিলে ও-বেলা কি খাওয়া যেত না ? একেই পেট ভরে গেছে, তার ওপর…' বলিয়া মাছের টুকরার সম্মানে তিনি বেশ কিছুটা ভাত মাখিয়া লইলেন।

আঁচাইয়া ঘরে গিয়া কাশীপতি অপরিহার্য্য কোটটি গায়ে পরিলেন। সুষমা পানের কৌটায় পান সাজিয়া লইয়া আসিল। কাশীপতি তাহার গোটা দুয়েক মুখে পুরিয়া কৌটাটি পকেট-জাত করিলেন।

সুষমা বলিল, দাঁড়াও বাবা, আমি তোমার টিফিন বাক্স এনে দিচ্চি!'

'তা না নিয়ে কি তোর কাছে ছাড়া পাব।' প্রশ্রয়ের সঙ্গে কাশীপতি কহিলেন। 'পয়সা থাকুক, আর না থাকুক, সবই হাওয়ার থেকে হচ্চে। এই তো আয়, তবু ভাগ্যিস তারাপদ একটা লাইনে গিয়েছিল, ক'টাকা আয় বেড়েচে। নইলে এই মাগ্‌গির বাজারে সবাইকে উপোস করে মরতে হতো। এর ওপর আবার যদি আত্মীয়তা কুটুম্বিতের বোঝা ঘাড়ে চাপে, বল তো তবে বাঁচবার উপায় কি ? আর তা-ও বলি, এই কি তারাপদর উপযুক্ত কাজ ? কত উঁচু বংশ আমাদের! এক সময় গুপ্তিপাড়ায় দত্তদের না চিনত কে ? দানে ধ্যানে, ক্রিয়া-কাণ্ডে সে এক রাজা-রাজ্‌ড়া ভাব! আমাদের বাড়িতে মেয়ে দেবার জন্য, আমাদের ঘরের মেয়ে নেবার জন্য সে যেন এক কাড়াকাড়ি! সেই বংশের আজ এই দুর্দ্দশা!, আমার ছেলেকে আজ মোটরমিস্ত্রির কাজ নিতে হয়েছে। অথচ তার এই একশো সোয়াশো টাকা আসচে বলেই এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে কোনও মতে টিকে আছি।' বলিয়া সহসা যেন একটু দ্বিধা করিয়া গলার স্বরটা কিছুটা নীচু করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁরে সুষি, হরিপদকে ক'দিন ধরে দেখচি নে। বাড়িতে আসাই ছেড়ে দিয়েছে বুঝি ?'

'না তো।' সুষমা একবার বৃদ্ধের করুণ মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া প্রায় সান্ত্বনার সুরে কহিল, 'মেজদা প্রায়ই এখন বাড়িতে এসে খান-দান, থাকেন। দুদিন হলো কোন্ একটা পার্টিকে জমি দেখাতে ঝাড়গ্রামে নিয়ে গেছেন তাই—'

'হুঁঃ! জমি দেখাতে!' কাশীপতি অসন্তুষ্ট মুখে কহিলেন, 'রেসে হেরে, গাঁজা-ভাঙ খেয়ে কোন নর্দ্দমায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।…দে টিফিন এনে দে।'

'এই দিচ্চি বাবা।' সুষমা কহিল : 'কিন্তু মেজদা আর রেসে যান না। বুকির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে। মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর জুয়োর মধ্যে থাকবেন না। এমন কি লটারির টিকিট বেচাও ছেড়ে দিয়েছেন। এবার জমির দালালি করবেন। বলেন শীঘ্রি একটা ভালো আয় হবে। দালালি করে কত লোক…'

'সবই করেচে।' বলিয়া কাশীপতি খাটের পেছনে

লক্ষ্মীর আসনের কাছে অফিস যাইবার আগেকার প্রাত্যাহিক প্রণাম জানাইবার জন্ত আগাইয়া গেলেন।

কাশীপতির বড়ো ছেলে দুর্গাপদ বিবাহের পরই কানপুরে কাজ লইয়া সস্ত্রীক সেখানে চলিয়া গেছে। বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় না থাকিবার মতো। কালে ভদ্রে ভদ্রতা করিয়া বাপকে দু' পাঁচ টাকা পাঠায়, বছরে এক আধখানা চিঠি লেখে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপদ ভুয়াড়ি ও ভবঘুরে, সে সংসারের উৎপাত, সহায়ক নয়। ছোট ছেলে তারাপদ শহরের একটা বিখ্যাত গ্যারেজে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী হইয়া ঢুকিয়াছে। এক মাত্র সেই সংসারের উপকারে আসে।

'উমাকে ডাক দিকি একবার।' কাশীপতি সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিলেন, যেন দেবতার কাছে প্রণাম জানাইবার পূর্ব্বে সাংসারিক সকল ঝামেলা মিটাইয়া পরিষ্কার হইতে চান।—'কি জানি সে আনতে বলেছিল। না নিয়ে এলে আবার হৈ-হাঙ্গামা বাধাবে।' ছোট মেয়ে উমার হৈ-হাঙ্গামাকে কাশীপতি সমীহ করিয়া চলেন।

'উমা বাড়ি নেই।' দরজার কাছে থামিয়া পড়িয়া সুষমা কহিল।

'কোথায় গেল?'

'পাশের বাড়ি গেছে।'

'কেন? পাশের বাড়িতে কেন?' সহসা কাশীপতির কণ্ঠস্বর আবার বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

'রেডিয়োতে কি একটা গান হবে। সেই গানটা শিখতে গেছে বাবা।'

সহসা কাশীপতি আগুন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'আমি কি বাড়ির কেউ নই? আমার কথার তাচ্ছিল্য করতে কারুর গায়ে লাগে না? এই যে আমি হাজার বার বলেচি, খবরদার, ওবাড়িতে যাবে না, মোটেই যাবে না, তাকি কারুর কানে পৌঁচচ্ছে! যারা অমন গুমোর দেখায়, বড়লোকি চাল মারে, যেচে তাদের বাড়িতে সর্ব্বক্ষণ যাতায়াত করতে লজ্জা হয় না? এই যে ওদের বাড়ির কর্ত্তা সেদিন আমাকে পষ্ট অবজ্ঞা দেখালে, যেন চিনতেই পারলে না, বলি তাতে কি সারা বাড়িরই অপমান হলো না? একটা পুরাণো পৈতৃক বাড়ি আর ভাঙা একটা মোটরগাড়ি আছে বলেই ধরাকে ওরা সরা মনে করতে পারে; কিন্তু আমরা ওদের খাই না পরি? আর বংশের যদি তুলনা করি, তবে আমার কাছে দাঁড়াতে পারবে? কুলি খাটিয়ে জাহাজের মাল খালাস করে কিছু টাকা কামালেই কুলির সর্দ্দার কুলিন হয়ে ওঠে না।—আজ আসুক উমি, ওরই একদিন আর আমারই একদিন। মেরে ওর হ্যাংলাপানা ঘোচাব। রেডিয়ো শুনতে গেছেন! বাড়ির কোনও কাজ কম্ম করবে না, কেবল মর্জ্জি করে বেড়াবে। ও মেয়েটার স্বভাব হয়েছে ঠিক ঐ হরিপদটার মতো, সেই রকম চাল-চলন, সেই রকম—'

'বাবা, সাড়ে নটা বেজে গেচে!' সুষমা শান্তভাবেই কহিল।

'ওঃ, তাই নাকি!' বলিয়া কাশীপতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কথা আর বাড়িতে পারিল না। তিনি দ্রুত প্রণাম সারিতে গেলেন।

দুই

বাড়ির চেহারা দেখিয়া যেমন সামাজিক শ্রেণীবিভাগে গৃহস্থের স্থান-নির্দ্দেশ করা চলে, তেমনি শহরের এই পাড়াটা দেখিয়া ইহার জাত-নির্ণয় করা কঠিন নয়। এ-রাস্তায় পুরাণো সম্ভ্রান্ত পরিবারের দু' চারখানা ফটক-ওয়ালা বড়ো দালান নাই, এমন নয়, তবে ইহারা রাস্তার অধিকাংশ বসত-বাড়ির জাত লুকাইতে সমর্থ হয় নাই। রাস্তাটা চওড়া নয়, খুব পরিষ্কারও নয়। মুদি ও মনোহারি দোকান, চা-চপের ষ্টল ও হেয়ার কাটিং সেলুনগুলি সমস্তই এ পাড়ার বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক স্তরের মাপে অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন।

রাস্তার দুধার ধরিয়া পাকা বাড়ি চলিয়া আসিবার পর সহসা রাস্তাটা যেন তার এই সামান্ত বাবুয়ানাও রক্ষা করিতে পারে নাই, বিভিন্ন সরু গলির সুযোগ লইয়া ভিতর দিকে মাঠকোঠা ঠাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাস্তাটা ধরিয়া উত্তর দিকে কিছু আগাইলে দেখা যাইবে, একমাত্র সামনের ইটের দোকানঘরগুলি ছাড়া, পিছনের

সমস্তটাই খোলার বস্তি। যেন মুখে একটা ঠুনকো মুখোস পরিয়া রাস্তাটা নিজেকে ভদ্রলোক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছে।

কালীঘাট অঞ্চলের এমনি একটি রাস্তায় কাশীপতি বাবু একটা অর্দ্ধজীর্ণ বিবর্ণ দো-তলা বাড়ির এক তলার ভাড়াটে। বস্তির সীমানা যেখান হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার কয়েকখানা বাড়ি আগে বাসা লইয়া যেন তিনি অতি কষ্টে ভদ্রতা বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এ-বাড়ির দোতলায় উঠিলে বস্তির অন্তহীন খাটকোঠা অন্তহীন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চোখে পড়ে। কাশীপতি বাবুর বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়াইলে অনতিদূরবর্তী গলির মুখে বস্তির বাসিন্দাদের ঢোকা ও বাহির হওয়া সহজেই নজরে পড়ে। তবে বস্তির ছোঁয়াচ না হউক, ছোঁয়া বাঁচাইবার পক্ষে বাড়িটা যে যথেষ্ট দূরে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে কাশীপতি যথেষ্ট সজাগ, এবং বাড়ির অন্তান্তেরাও উদাসীন নহে।

বেলা আড়াইটারও কিছু বেশি হইয়াছে। মাকে শুইতে দিয়া সুষমা ও উমা নিজেদের শুইবার ঘরে আসিল। কাশীপতি অফিসে যাইবার পর কাজের তাড়াহুড়াটা কমিয়া আসে। তারাপদর খাইতে আসিতে একটা দেড়টা। খাওয়া-দাওয়ার পাট সারিতে রোজই দুটো আড়াইটা বাজে। ইহার পর বিরজাসুন্দরীকে একটু ঘুমাইয়া লইতে হয়; দুই বেলার খাটুনির মধ্যে একটা ক্লান্তিহরা পূর্ণচ্ছেদ চাই।

মায়ের ঠিক পাশের ঘরটিই দুই বোনের। দুটি ছোট তক্তপোষ আঁটিয়া দুইয়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক আছে। বাইরের দিকে দুটি জানালা পাঁচিলের পর্দায় আড়াল করা। দুই জানালার মাঝামাঝি বার্ণিসবিহীন একটা ছোট টেবিল নক্সা আঁকা কালো রঙের টেবিল-ক্লথে ঢাকা। এরই উপর ফ্রেমে-বাঁধা একটা মাঝারি সাইজের আয়না এবং কিছু প্রসাধনের সরঞ্জাম রাখা আছে। দেওয়ালের গায়ে দুটি কেরোসিন কাঠের ব্র্যাকেট দুই বোনের জন্য বরাদ্দ। নিজ নিজ তোরঙ্গ নিজ নিজ তক্তপোষের নিচে।

সুষমা টেবিলের উপর হইতে উলের গোলা ও বুনিবার-কাঁটা তুলিয়া লইয়া কহিল, 'এবার বল, কি এমন মজার খবর।'

'বয়ে গেছে আমার বলতে!' বলিয়া উমা দুষ্টু হাসিয়া বালিসের নিচ হইতে পাতাখোলা একটা উপন্যাস বাহির করিয়া বিছানাতে চিৎ হইয়া গড়াইয়া পড়িল। চোখ মিটিমিটি করিয়া কহিল, 'তোমার সব কথা তুমি আমাকে বল যে আমার সব কথা তোমাকে বলব?'

উমার বয়স আঠারো-উনিশ; সুষমার চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট। মাথায়ও সে কিছুটা ছোট হইবে, কিন্তু সুষমার মতো অতটা রোগা নয়। মুখের গড়ন চোখা, পটল-চেরা চোখে চটুল দৃষ্টি। চলনে-বলনে চাঞ্চল্য; স্বচ্ছ দেহ-লতায় প্রতিটি ভাবাবেগ যেন হিন্দোল খেলিয়া যায়। যাহারা তাহাকে পছন্দ করে না, তাহারা বলে "ঢঙী"; যাহারা ভালোবাসে, তাহাদের কাছে "জীবন্ত।"

'আমার আবার কি কথা!' মেঝেতে পা রাখিয়া সুষমা বিছানার উপর বসিয়াছে; দৃষ্টি অসমাপ্ত শেলাইয়ের ঘরের উপর নিবদ্ধ। 'রাজ্যের যত কথা সব তো তোরই থাকে।'

'হ্যাঁ, তা বৈ কি।' উমা চোখ নাচাইয়া কহিল। 'তুমি পেটে চেপে রাখো, আমি সব বলে দিই, তফাৎ তো এই। আমার মধ্যে অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। শুধু কি তাই। তোমার মতো আমাকে যদি একটা ছেলে ভালোবাসত, তবে আমার বলবার কথার আর অন্তই থাকত না। তোমার মতো দাঁতে ঠোঁট কামড়ে...'

'থাম্, আর জ্যাঠামি করতে হবে না।' সুষমার কণ্ঠস্বরে এবার দিদি-সুলভ গাম্ভীর্য্য। 'যা জানো না, তা নিয়ে মস্করা করতে এসো না।'

'হ্যাঁলো, দিদি, হ্যাঁ, আমি সবই জানি।' উমা খোলা উপন্যাসটা বুকের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া দুই চোখ দুষ্টুমিতে পূর্ণ করিল। 'এই যে প্রকাশবাবু প্রত্যহ দু' তিনবার ক'রে এ-বাড়িতে হাজিরে দিয়ে যান, এ কি শুধু ছোড়দার সঙ্গে পরামর্শের জন্য। যারা সারাদিন একই জায়গায় কাজ করে, পরামর্শের যেন তারা আর সময় পায় না!......এতে দোষ

কি ভাই, দিদি। কয়লা একেই বিয়ে। কাজটা আর এমন কি খারাপ করে, ছোড়দাও যা করে, সে-ও তাই। আর দেখতে তো রীতিমত……।'

'উমি!' সুষমা অসন্তুষ্ট স্বরে কহিল।

'দোষ কি ভাই, দিদি।' উমা না-দমিয়া কহিল: 'বস্তিতে থাকে, এই তো। আজ বস্তিতে আছে, কালই দালানে এসে থাকবে। যে টাকা রোজগার করতে পারে, তার আর ভাবনা কি? আর আমরাই বা বস্তির থেকে আর কত দূরে আছি বল? দু' চারখানা বাড়ি দূরে। টাকা থাকলেই লোকে ভদ্র হয়, আর টাকা না থাকলেই ছোটলোক। পৃথিবীতে টাকাই সব। অথচ চোখের সামনে এত সব দেখেও বাবা কিছুই দেখবেন না; এখনও বংশের জাঁক ক'রে বেড়াচ্ছেন। ভাবেন, এখনও বুঝি……'

'বাবা আজ খুব রাগ করেছেন তোর ওপর।' সহসা বাবার রাগের কথাটা সুষমার মনে পড়িল। 'দেখিস্ রমাদের বাড়ি গেলে বাবা রাগ করেন, তবু নিত্যিনিত্যি তোর যাওয়া চাই। কেন, ওদের বাড়িতে যাওয়ার কি দরকার? বাবাকে যারা মিছিমিছি অপমান…।'

'রেখে দাও অপমান।' এবার উমাও প্রতিবাদ করিয়া কহিল: 'সব কিছুকেই তো বাবা অপমান ভেবে বসে আছেন। যদ্দিন ওঁর বংশের জাঁক না যাচ্ছে, তদ্দিন কেউ ওঁকে খুশি করতে পারবে না। আমরা কি কেউ-কেটা, আমরা গুপ্তিপাড়ার দত্ত।' বলিয়া উমা সহসা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'ও-ঘরে মা ঘুমুচ্ছেন, খেয়াল আছে?'

'বাবা, বাবা! তোমার জন্তে প্রাণ খুলে একটু হাসবার পর্য্যন্ত জো নেই।…রমাদের টাকা আছে বলেই বুঝি ওরা মন্দ লোক? না, বাপু, আমার সঙ্গে তো কেউ বড়লুকি দেখায় না, না রমা, না তার মা-কাকীমারা। বাবার যত বাড়াবাড়ি। বড়লোকের সঙ্গে মিশছি, তাতে আমার নিজেরও তো বড়লোক হ'তে কি? ইচ্ছে করে। টাকা হলে তবেই গুপ্তিপাড়ার দত্তদের গুপ্ত মানি আবার চকচকে হয়ে উঠত। আচ্ছা ভাই দিদি, হঠাৎ যদি অনেক টাকা পেয়ে যাই, কি রকম মজা হয় বল তো! রোজ নতুন নতুন দামি দামি শাড়ি পরছি, মোটরে ক'রে বেড়াচ্ছি, গয়না কিনছি, সিনেমা দেখছি, তবে না গুপ্তিপাড়ার দত্ত!' বলিয়া উমা আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইল।

'খুবই ভালো হ'তো।' সুষমা চোখ বোনা-য় নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল: 'কিন্তু হঠাৎ টাকা পেয়ে যাওয়াটাই যা একটু কঠিন।'

'আচ্ছা, সিনেমা করলে কেমন হয়, দিদি? শুনেছি, সিনেমা-ষ্টারেরা নাকি……।'

'তা বৈ কি। দিনে দিনে খুব উন্নতি হচ্ছে।' এইবার সুষমা শেলাই হইতে চোখ উঠাইয়া কৌতুক হাস্তপরায়ণ উমার মুখের দিকে তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে চাহিল। 'এ সব পরামর্শ কে দেয় শুনি? রমা না তার কাকীমারা?'

দিদির আতঙ্ক লক্ষ্য করিয়া উমা আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, 'দিদি যেন কি! সত্যি সত্যি যেন আমি ফিল্ম্ করতে নামছি।…রমার এক পিসতুত ভাই আছেন, ফিল্ম্-ডিরেক্টর। ওদের বাড়ি মাঝে মাঝেই আসেন। তাকে দেখলেই সিনেমার কথা আমার মনে পড়ে। কত সহজেই না বড় লোক হওয়া যায়! অথচ আমরা দিনের পর দিন টাকার অভাবে হা-হুতাশ করছি; ইচ্ছে মত জামা-কাপড় কিনতে পারছি নে, ইচ্ছেমত…।'

কিন্তু উমার নিবন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই সদর দরজা খোলার শব্দ হইল। জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল।

শীঘ্রই একটা ভাঙা গলার অনতি-উচ্চ ডাক আসিল, 'সুষি, উমি, কোথায় রে তোরা? কেউ আছিস্?…'

'এই যাচ্ছি, মেজদা', বলিয়া সুষমা উল ও কাঁটা রাখিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'মেজদা!' বলিয়া উমাও উপন্যাস মুড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিল।

বাড়ির ভবঘুরে ছেলে এই হরিপদ। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো বয়স। পরিবারের অন্যান্যদের চেয়ে ঢেঙা ও পাতলা, কিন্তু যেন রস-নিঙড়ানো প্যাকাটির মত

তন্দুর বরণের। চুল রুখ্‌শু, মুখমণ্ডল অ-কামানো। দাড়িতে অপরিষ্কার, দাঁতগুলি প্রায় তামাটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে ; চোখে একটা চোর চোর ভাব।

পাড়ার আড্ডাবাজ বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া ছেলেবেলা হইতেই একটা পলায়নের ভাব তার মধ্যে প্রকাশ পায়। এ-ছুতায় সে-ছুতায় বন্ধুদের বাড়ি, পাড়ার ক্লাব বা অন্ত যেখানে সেখানে এক-আধ রাত কাটাইয়া আসিয়া সে কাশীপতির তিরস্কার হজম করিতে শিখিল। তারপর ম্যাট্রিকে ফেল করিয়া হরিপদ একদম হাওয়া ; দু' তিন মাস আর তার খোঁজ নাই। অবশেষে নিজেই একদিন সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু পড়ার দিকে আর ঘেঁষিল না। পাড়ায় ক্লাবের তব্‌লা-বাদক হইয়া প্রচুর তবলা বাজাইতে লাগিল। কিন্তু বাড়ির কর্তৃপক্ষ তব্‌লার মর্ম বোঝে না ; ফলে হরিপদকে বীমার দালালি হইতে শুরু করিয়া পোস্তার আলু অশুবাবুর বাজারে আনিয়া বেচা পর্য্যন্ত নানা কাজের উদ্যোগ দেখাইতে হইয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত বাড়ির লোকেরা তার ভরসা ছাড়িয়া দেয়। তখন আপন প্রতিভার পথ অনুসরণ করিয়া হরিপদ পরিচিত ও অপরিচিতদের কাছ হইতে টাকা ধার লওয়া ও লটারির টিকিট বিক্রিতে হাত পাকাইল। ক্রমে উন্নতি করিয়া সে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের বুক-মেকারের সহকারী হইয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছাড়িল। সম্প্রতি এই চাকরিটি গিয়াছে। ইহার জন্ত একমাত্র বুকি-র অকৃতজ্ঞতাকে দায়ি করিয়া সম্প্রতি সে নতুন লাইনের দিকে মনোযোগ দিয়াছে। জমির দালালি যে খুবই লাভজনক ব্যবসা, তাহা পরিবারের সকলের কাছে বারবার উল্লেখ করিয়া সে উহাদের আশ্বস্ত করিয়াছে। প্রথম দাঁও মারিবার সুযোগ পাইয়া সে পার্টির সঙ্গে ঝাড়গ্রাম গিয়াছিল, এইমাত্র ফিরিতেছে।

'কিছু খেতে দিতে পারিস, সুষি ? চিঁড়ে মুড়ি যা হোক।'

'ভাত আছে। তুমি নেয়ে এস।' সুষমা হরিপদর অভুক্ত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির কণ্ঠে কহিল।

'ভাত আছে !' হরিপদ যেন বর্ত্তাইয়া গেল। 'তবে তো ভালই হয়েচে। বড্ড খিদে পেয়েচে। শালারা ঘোড়দৌড় করিয়ে নিলে, অথচ মজুরির বেলায় লবডঙ্কা ! হরিশ বাবু অত করে' বল্লেন, তাই ব্যাটাদের সঙ্গে গেলাম। তিন-তিনটে দিন আমার না হক্ নষ্ট হলো ! থাক্‌গে, নতুন নতুন অমন দু'একবার···ভাতটা রেখে বড় ভাল করেচিস। আজই ফেরবার কথা বলে গিছলাম বুঝি ?···'

উমা কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'হ্যাঁ, তুমি বলে যাবারই লোক বৈ কি ! আর বলে গেলে সে-কথার কত দাম ! ছোড়দা খেতে আসেনি, তাই তার ভাতটা ঢাকা আছে। চটপট খেয়ে নাও। খেয়েই শাড়ির দোকানে নিয়ে যাচ্ছ তো ? তৈরি হয়ে নেব ?—'

'ঐ দেখো পাগ্‌লি !' হরিপদ সস্নেহে ছোট বোনের দিকে চাহিয়া হাসিল। 'এবারে আর শাড়ি হলো না। শালারা যে এমন ঠকাবে, তা কি আগে ভেবেছিলাম ! নগদ পনেরোটি মাত্র টাকা গুণে দিয়ে কেটে পড়ল। তা বেশ, আমিও দেখে নেব !···তোর একটা ভালো শাড়ি চাই তো ? তা বেশ, পাবি ; এক হপ্তার মধ্যেই পাবি। এক গাদা কাজ তো হাতেই আছে ! হাতী বাগানের চৌধুরিদের ছোট তরফের প্রমোদ বাবু সেদিন তো নিজ মুখে বল্লেন, 'ক'দিন আগে এলে আলীপুরের নতুন বাড়িটা তোমার মারফতই কিনতে পারতুম ; বসে বসেই কয়েক হাজার টাকা দালালি পেয়ে যেতে। তা বেশ, সম্পত্তি কেনা-বেচা তো আমার লেগেই আছে ; এবার থেকে তুমিই না হয় আমার দালাল হলে।···' তা যখন বলেচে, ঠিকই ডাকবে। পরশুর আগের দিনই তো ডাকিয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন। আমি সেদিন ঝাড়গ্রাম চলেচি। বলে পাঠালাম, ফিরেই দেখা করব। এ ছাড়া আরও তিন তিনটে শাঁসালো পার্টি হাতে আছে। এ ব্যাটাদের মতো ফোতো পার্টি নয়। শাড়ি তুই একটা পাবিই।··· তারাপদ খেতে এলো না যে বড় ? অফিসে কেউ খাওয়াচ্ছে বুঝি ?'

'খাওয়া নয়, মিটিং !' উমা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল।

'কে বলে গেল ?'

'কে আর ! যে সর্ব্বক্ষণ বলে যায়, সেই প্রকাশ বাবু ছাড়া আবার কে !' বলিয়া উমা দৃষ্টিটা তীর্য্যক করিয়া সুষমার দিকে চাহিল। দেখিল, সে ইতিমধ্যেই হেঁসেলের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে।

গায়ে মাথায় ঝুপঝাপ করিয়া কয়েক ঘটি জল ঢালিয়া হরিপদ দু'মিনিটেই স্নান সারিয়া আসিল। গোগ্রাসে কয়েক গ্রাস ডাল ভাত গিলিয়া সে যেন কিছুটা ধাতাস্থ হইল। দিল্-দরিয়া কণ্ঠে কহিল, 'সুষি, উমি, আজ সিনেমা দেখতে যাবি ? চ' "চন্দ্রশেখর" দেখে আসি।'

'আজকে থাক, মেজদা,' সুষমা হরিপদকে আরেক হাতা ডাল দিয়া কহিল।

উমা অধৈর্য্য ভাবে প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'দিদির সবটাতেই বেশি-বেশি-পনা। কেন, আজ থাকবে কেন, শুনি ? কেউ তো কখনও দেখায় না। মেজদা তবু দেখাতে চাইলে। অমনি ছিসিবীপনা করে' বলা হলো, আজ থাক, মেজদা !'

'তুমি বরঞ্চ উমিকেই দেখিয়ে আনো, মেজদা।' উমা শান্ত কণ্ঠে কহিল। 'একজন বাড়িতে না থাকলে মার বড় কষ্ট হয়। একলা সব সামলানো…'

'তা বেশ, আমি একাই যাব !'

উমা জেদের সঙ্গে কহিলঃ 'যার কোনও সখ নেই তার সঙ্গে বুড়ি সেজে বসে থাকতে পারব না। বাবা, বাবা ! কোনও দিনই যদি একটু আনন্দ করতে পারবে ! নিয়ে যাচ্ছ তো, মেজদা ?…'

'যাচ্ছি বৈ কি !'

'আগেই টিকিট কিনে এনো বাপু।' উমা গম্ভীর হইয়া কহিলঃ 'গিয়ে আমি ফিরে আসতে পারব না, আগেই বলে রাখছি।'

'তাও কখনও আসতে হয় ! নগদ কড়-কড়ে পনেরোটা টাকা আজ পকেটে আছে। টাকা থাকলে খরচা করতে এ শর্ম্মা পিছ পা নয়।' হরিপদ সগর্ব্বে কহিল।

'চল না ভাই দিদি ?'

'আর একটু তরকারী দেব, মেজদা ?'

উমার আগ্রহাতিশয্যে কান না দিয়া সুষমা ক্ষুধার্ত্ত হরিপদকে প্রশ্ন করিল।

'দে। থাকে তো আর একটু দে।' হরিপদ উদারতার সঙ্গে কহিল।

[ক্রমশঃ

কতদূর

নির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী

এখানে এখনো সূর্য্য ওঠেনি, থামে নাই হানাহানি,
হিংস্রশ্বাপদ হারায় নি- তার লুব্ধ শিকারী চোখ;
সুদূর প্রসারী সবুজ ফসলে ফসিলের কানাকানি,
এখানে শুভ্র ফেনীল সাগর ধ্বংসের উপাসক।

এখানে এখনো বিন্দু বিন্দু রক্তের বিনিময়,
বন্ধু অনেক সৌধ গড়েছ, বক্ষে চেপেছ খুন,
অযুত লক্ষ দুঃখি মানব মেনে নিল পরাজয়,
সাবেকী পুরোণো বনেদী জীবনে ধরেনিতো কোন ঘুণ।

এখানে এখনো রাত্রি ভয়াল, কেঁপে ওঠে নিঃশ্বাস,
লক্ষ তারার সুনীল আকাশ কালো মেঘে আবছায়া,
এখানে মানুষ মানুষেরে কভু করে নাকো বিশ্বাস,
আকাশের চাঁদ ফেলে নাকো তার স্বপ্ন মেদুর ছায়া।

এখানে এখনো হাজার হাজার মৃত মানুষের ভীড়,
পেলো নাতো তারা সতেজ সবুজ জীবনের আস্বাদ;
ঝড়ের তাড়নে পলাতকা পাখি খুঁজে ফিরে ভাঙা নীড়,
আগামী কালের নতুন জীবনে ঘুচিবে কি অবসাদ ?

এখানে এখনো জীবনের পথ দুর্গম বন্ধুর;
আজিও কি আছে আমাদের পরে দেবতার অভিশাপ।
চল্লিশ কোটি মহামানবের স্বাধীনতা কতদূর ?
বন্ধু তোমায় শুধাই আজিকে বঞ্চিত করা পাপ।

রূপক নাটক ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'

শ্রীসুনিতকুমার শেঠ

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে এ-ধরণের নাটক ছিল না এবং পরবর্ত্তী যুগেও তাহার বিস্তার ঘটে নাই। ইহাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই প্রবর্ত্তন করেন এবং তিনিই তাহার উৎকর্ষতা বর্দ্ধন করেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটকগুলিকে এক অভিনব বস্তু বলা আমাদের বোধ হয় খুব অসঙ্গত হইবে না; কারণ রবীন্দ্রনাথ-উত্তর যুগ-সাহিত্যে ইহার আর লেখা হয় নাই।

নাটকের শ্রেণী বিভাগ করা যদিও এক প্রকার অসম্ভব, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা মোটামুটি ভাবে এই কয়টি ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি—(১) রস প্রধান, (২) ভাব প্রধান, (৩) রূপ প্রধান, এবং (৩) উদ্দেশ্য প্রধান। শেষোক্ত অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রধান নাটকগুলিকে আবার তিনটি পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি—(১) সমস্যামূলক নাটক, (২) রূপক নাটক এবং (৩) চরিত্র নাটক। রূপক নাটককেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে নীতিমূলক এবং সাংকেতিক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের বিশেষ নাটকগুলি সৃষ্টি করেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যে তাঁহার পূর্ব্বে ইহার প্রচলন ঘটে নাই। কারণ তখনকার যুগে কেবলমাত্র নাটক রচিত হইত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাহিরের স্থূল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। কারণ সংস্কৃত আলংকারিকদিগের মতে নাটক দৃশ্যকাব্য ছাড়া আর কিছুই নহে। ফলে, বাহ্য ক্রিয়ার রূপই ইহার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনই হইতেছে নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু তাহা বলিয়া নাটকে যে কেবল স্থূল ঘটনার বিবরণ থাকিবে এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত এবং গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এমন নহে; মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিরও পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই শেষ দিকটির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে সপ্রমাণ করিয়া দেন—তাঁহার রাজা, অচলায়তন এবং ডাকঘরের মধ্য দিয়া।

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং সেই কারণেই কল্পনা ও অনুভূতির সূক্ষ্ম বিকাশ তাঁহার এই ধরণের প্রত্যেকটি নাটকে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু কল্পনা এবং অনুভূতি নয়, আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঞ্জনা ইহার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। কারণ যে-সময়ে এই সমস্ত নাটক রচিত হয়—তাহাকে গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের মধ্যবর্ত্তী কাল বলা যাইতে পারে। তখন ভগবৎ প্রেম ও আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যঞ্জনা চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ফলে, তাঁহার এই সময়কার রচনাগুলিতে যে আধ্যাত্ম ভাবের ছায়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কেহ কেহ বলেন,—এই ধরণের নাটকের নাট্যরীতি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন,

কবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। এ-কথা ঠিক, কিন্তু যে বিশেষ মানস অনুভূতির পরিচয় আমরা এই সমস্ত নাটকগুলিতে পাই, তাহার সহিত পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একান্ত ভারতীয় এবং ভারতবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি। এই চিন্তাধারাই নাটকগুলিকে সার্থকতার পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। Thompson সাহেব তাঁহার Rabindranath নামক পুস্তকের এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

"It has been an independent development, in the main, but he is well aware of what is happening outside India and to his mind a hint is more than a full exposition is to most poets."

"রাজা" আধ্যাত্ম রসের নাটক। আধ্যাত্ম আকুতিই ইহার প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার একটি বাহ্যক্রিয়া আছে যাহার অভাবে মনোজগতের কোন রূপকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অর্থাৎ মনোজগতের স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিতে বাহ্যক্রিয়ার প্রয়োজন এবং এই বাহ্যক্রিয়ার মধ্য দিয়াই মনোজগতের সেই বিশেষ ভাব বা চেতনা অস্পষ্ট রেখায় রূপায়িত হইয়া উঠে। এখন কথা হইতেছে এই যে, যদি মনোজগতের আত্মকেন্দ্রিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইল, তবে উহা কেন আবার অস্পষ্ট থাকিবে? পাঠক বা দর্শকের সম্মুখে উহা সহজ সরল হইয়া প্রতিভাত হয় নাই বা কেন? কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে Symbolic Drama কেবলমাত্র—"A hint is more than a full exposition." যাহা অব্যক্ত থাকিয়া যায় তাহা পাঠক কিম্বা দর্শককে চিন্তা এবং কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই ধরণের নাটক যদি কেবলমাত্র ভাবময় জগতের সামগ্রী হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহাকে কবিতার সমপর্য্যায়ে ফেলিতেই বা দোষ কি? কিন্তু অগ্রেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নাটক কবিতা নহে এবং সেই কারণেই ইহা ভাবময় জগতের সামগ্রী হইয়াও বস্তুর সহিত সম্পর্কহীন হইতে পারে না। ফলে, তাহাকে বাস্তব জগতের সাধারণ মানবজীবন হইতেই রস গ্রহণ করিতে হয়। "Drama is above all the arts a co-operative effort and it is greatest when its roots are planted in the soil of common life."—Tendencies of Modern Drama, মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার মধ্য দিয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—ভাব জগতের দিকে, আধ্যাত্ম রাজ্যে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজে বলিয়াছেন—এই সমস্ত নাটক তাঁহার কাছে খুবই সুস্পষ্ট এবং বাস্তব। তিনি কবি—তাঁহার দৃষ্টি যে সুদূর প্রসারি এবং সূক্ষ্ম হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, যাহা তাঁহার কাছে সুস্পষ্ট এবং সহজ-বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমাদের কাছে তাহাই হইয়া উঠে অস্পষ্ট এবং দুর্ব্বোধ্য। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ যাহাই থাকুক না কেন, তাহার মূলে আছে—রবীন্দ্র-সাহিত্য-ভাবধারার একটি বিশিষ্ট সুর—যে সুর তাঁহার খেয়া—গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে অনুরণিত হইতে দেখা যায়। এ সুরের যিনি একবার সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার কাছে তাঁহার নাটকের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা বোধ হয় খুব বেশী কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে না।

শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অন্তর্মুখী ভাবটি অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে, বাহিরের বস্তু হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে নাই। ফলে, পাঠক এবং দর্শকের ইহার বাহ্যিক রস গ্রহণে কিছু ব্যাঘাত ঘটে না। এ সম্বন্ধে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলিয়াছেন—"সত্যই রূপক রচনার সব কিছু বুঝিবার জন্ত নয়; শুধু মনের মধ্যে একটা সুরকে বাজাইবার জন্ত, এই সুরই রূপক রচনার সবখানি।"

রবীন্দ্রনাথের "রাজা" আধ্যাত্ম রসের নাটক হইলেও ইহার মূলে আছে সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রবল আসক্তি এবং সেই আসক্তি নাটকখানির কেন্দ্রগত ভাবটিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে আধ্যাত্মিকতার গভীর মাঝে।

কিন্তু নাটকের নাট্যবস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—আর্টের সাধনা এবং আধ্যাত্মিক সাধনা উভয়ের দ্বন্দ্বের উপর। শিল্পী চায় বিশ্বকে আপনার মত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গড়িয়া লইতে। ইহাতেই তাহার আনন্দ। কিন্তু

আধ্যাত্ম পথের পথিক নিজেই বিশ্বের কাছে আত্মসমর্পণ জানায়, কারণ বিশ্ব তাহার জন্য নয়—সে নিজেই বিশ্বের জন্য। তাহার নিজের বলিয়া কিছু নাই, সবই বিশ্বের। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মানুষ আমরা, এ ধারণা আমাদের কিসে চলিবে কেন? এখন সব কিছুই আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। তবে সে মানার মধ্যে থাকিবে একটি ঐক্য। এই ঐক্যটি শিল্প সাধনা এবং আধ্যাত্ম সাধনার মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে, আমাদিগের এই উভয় সাধনাকে একই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আর কখনও তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না।

বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে সৌন্দর্য্য সাধনা এবং আধ্যাত্ম সাধনা—উভয়ের পথ ভিন্ন। কিন্তু আসলে তাহা নহে—একে অন্যেরই পরিপূরক। একের পূর্ণতা লাভ করিতে চাই অন্যের সহযোগীতা। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"রূপের মধ্য দিয়াই রূপাতিতের পথে গমন করা যায়, কারণ তিনি যে সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান যিনি সীমার মাঝে অসীমরূপে বিরাজ করেন।"

সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাই রূপের সাধনা। সুদর্শনা সেই অরূপ রাজাকে পাইবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিল প্রথমে রূপের সাধনায়। তিনি তাহার রাজাকে দেখিতে চাহিয়া ছিলেন—পথে, ঘাটে, মাঠে, গাছ-পালার মাঝে—প্রকৃতির রাজ্যে, সব ভোলানোর দেশে। তাই তাহার চাওয়া পাওয়ার রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে নাই। সুরঙ্গমা রাজার আগমন-ধ্বনী শুনিতে পাইত নিজের বুকের মাঝে; কারণ সে তাহার প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছিল অন্তরের নিভৃত কক্ষে যখন সে তাহার দেহ-মন সব কিছু তাঁহার পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই 'রাজা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন—"অন্ধকারের সাধনা যাহার পূর্ণ হইয়াছে, তিনি রাজাকে সবস্থানেই দেখিয়া থাকেন, ভুল তাহার নয়।" ঠাকুরদা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাই তাহার রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই —সুরঙ্গমার পক্ষেও সেই একই কথা।"

কিন্তু সেই ভুল করিয়াছিল—সুদর্শনা। কারণ সে প্রথমে বিশ্বাস করে নাই সুরঙ্গমার নিষেধ বাণী—"অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন, সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্ব্বত্র তাহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নইলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায়, তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে।" সুদর্শনা এ কথা জানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল।

তারপর তাহার অন্তরের মধ্যে যে আত্মাভিমান ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল এবং যখন সে প্রবল অন্তর্দাহে অন্তঃপুরের অগ্নির মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে উদ্যত হইল, তখন সে দেখিতে পাইল তাহার রাজাকে—যেমনি অন্ধকারের মত মিশমিশে কালো এবং কুৎসিত, তেমনি আকাশের ধূমকেতুর মত ভয়ঙ্কর। সে-রূপকে সে সহ্য করিতে পারিল না—তাহার মন তখনও সন্দেহাতুর। তাই অরূপ কুরূপ রাজাকে স্বীকার করিয়া লইতে তাহার মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কারণ রূপের নেশা তখনও তাহার টুটে নাই।

শেষ দৃশ্যে যখন তাহার সাত রিপুর টানাটানি হানাহানিতে রূপজ মোহের অবসান ঘনাইয়া আসিল, তখন সে বুঝিতে পাড়িল—এতদিন সে যে রূপের সাধনা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা যে এত কুৎসিত তাহা আগে জানিতে পারে নাই। ছত্রধর সুবর্ণের কৃত্রিম রূপ তাহাকে এই সত্যে পৌঁছাইয়া দিল। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ছীঃ, ছীঃ, অমন মনোমোহন রূপ, তার ভেতরে মানুষ নেই; এমন অপদার্থের জন্য এত বড় নিজেকে বঞ্চনা করেছি?" তখন সে চিনিল তাহার আপন রাজাকে—সেই সব-ভোলানোর রূপকে। তাই তো, সে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পাড়িয়াছিল—তাহার পদপ্রান্তে। আজ সে চিনিতে পাড়িল—এতদিন যাহাকে সে শুধু উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছে—সে কালো নয়, সে অরূপও নয়, সে কুৎসিতও নয়, সে শুধু সুন্দরও নয়—সে অনুপম।

এই রূপাতিত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করা যায় একমাত্র আপনার চিত্তকে দুঃখ তাপে পরিশুদ্ধ করিয়া। সুদর্শনা সেই দুঃখকে জয় করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই অবশেষে অন্ধকারের মধ্য হইতেও তাহার রাজাকে চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় নাই এই ভাবটি আমরা কবির খেয়া এবং আগমনীর মধ্যে ব্যক্ত হইতে দেখিতে পাই—

"ওরে দুয়ার খুলে দেরে—
বাজা শঙ্খ বাজা;
গভীর রাতে এসেছে মোর
আঁধার ঘরের রাজা—"

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"র যিনি নায়ক সেই অরূপ কুরূপ রাজাকে ভগবানেরই একটি Prototype ছাড়া আমরা আর কি বলিতে পারি? তাঁহার সত্যকারের স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানি না; এবং সেই কারণেই নাট্যকার ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছেন। সেই নিরাকার ব্রহ্মের সহিত যাহার পরিচয় ঘটিয়াছে, তাঁহার বিশ্বরূপ যিনি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—তিনিই পারেন তাঁহার স্বরূপটিকে আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে।

রাজার দেখা মিলিলে রাণী বলিল—"প্রমোদ বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম, সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"

রাজা বলিলেন—"তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।"

সুদর্শনা বলিল—"যদি থাকে সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে; সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখিতে পাও। সে আমার কিছু নয়, সে তোমারই।"

এইখানেই নাটকটির অন্তর্নিহিত ideaটি চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঠাকুরদা ও তাহার দলটি নাটকের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে এবং সেই কারণেই তাহাদিগের কোন একটিকে বাদ দিলে, ইহার সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ কেন—এই ঠাকুরদাটিকে কিম্বা তাহার অনুরূপ চরিত্রকে প্রায় তাঁহার প্রত্যেক রূপক নাটকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন? নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় ইহার সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—"এই ঠাকুরদা প্রত্যেকটি নাটকের সদা উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রসারিত গবাক্ষ; এই গবাক্ষ দিয়াই যত পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনা, যত বদ্ধ দূষিত বাতাস সব বাহির হইয়া যায়, এই গবাক্ষ দিয়াই সত্য এবং ন্যায় ধর্ম্মের ভরি মুক্ত স্বচ্ছ সহজ সুনির্ম্মল আলোকের দীপ্তি ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে। ... ... নাটকীয় চরিত্র হিসাবে এইখানেই তাহার সার্থকতা, আজিকের দিক হইতে এইখানেই তাহার যথার্থ মূল্য। ... ... এই দাদাঠাকুরটি না থাকিলে কবির নিজের কথাটি নাটকে আর বলা হয় না, নিজের মনটি আর প্রকাশ করা হয় না, কাজেই তিনি প্রায় অপরিহার্য্য।"

কিন্তু তিনি মাত্র পথের সন্ধানটুকুই পাইয়াছিলেন; সাধনার চরম শিখরে আরোহণ করা তাহার আর হয় নাই। সাধনার পথ সকল লোকের কাছেই উন্মুক্ত—এ যেন একটা open road—প্রত্যেকেরই সমান অধিকার আছে সে পথে অগ্রসর হইবার। কিন্তু সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে নিজেকে পার্থিব সকল ভোগ বাসনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের ঠাকুরদা ঠিক সেই typeএর লোক। তিনি শুধু পথটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন মাত্র; রাজাকে দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার এতটুকু দুঃখ নাই। কারণ সে জানে, তাহার প্রভুকে চিনিয়া লইতে তাহার কোন কষ্টই হইবে না। তাই মুক্তকণ্ঠে সে বলিয়াছিল—

"আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মাণিক জ্বলে,
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।"

পরিশেষে ঠাকুরদার এই দলটিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—তাহা গ্রীক নাটকের chorusএর অনুরূপ একটি Lyric ধর্ম্মী সুর। একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল নাটকের মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে একটি Lyric আখ্যায়িকার ছায়া পড়িয়াছে এবং সেই ছায়ার মধ্যেই মূল নাটকের ক্রম পরিণতির একটি পূর্ব্বাভাস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। গীলবার্ট মারে এই chorusএর উৎকর্ষতা সপ্রমাণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—It is necessary to translate an act in the drama।" বাস্তবিক এই ঠাকুরদার দলটি আমাদিগকে নাটকের চরম climaxএ পৌছাইয়া দিবার পূর্ব্বেই তাহার আভাস জানাইয়া দেয়।

আক্রমণ

জন্ ষ্টেন্‌বেক্

অন্ধকার রাত্রি, ছোট্ট কালিফোর্ণিয়া সহরের পিছনের দিকের রাস্তা দিয়ে দু'টি লোক খাবারের গাড়ী থেকে নেবে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিল ; চমৎকার প্রতিবেশ—ফলের সুমিষ্ট গন্ধময় বাতাস, কোণের দিকে উপরে নীল রঙের আলো জ্বলছে, টেলিফোনের তারের ছায়া নীচে মাটিতে ইতস্ততঃ পড়ছে, কাঠের বাড়ীগুলো নীরবে বিশ্রাম গ্রহণ করছে, আর ময়লা জানলার কাঁচগুলো থেকে আলো যেন করুণ ভাবে প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

লোক দু'টি আকারে প্রায় একরূপ হলেও একজন আর একজন থেকে বয়সে অনেক বড়। তাদের চুল ছিল ছোট ছোট করে ছাঁটা ও পরিধানে ছিল নীল জীন, বৃদ্ধটির গায়ে ছোট একটি কোট ও যুবকটির গায়ে নীল রঙের একটি সোয়েটার : তারা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় পিছনের কাঠের বাড়ীগুলো থেকে পদধ্বনি জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। যুবকটি শিষ দিয়ে গাইছিল, "হে মোর বিষন্ন শিশু, আমার ধারে এস" হঠাৎ থেমে সে বলল, "এগানের সুরটা আমার মন থেকে মুছে গেলে ভাল হত ; সারাদিন ধরে এটা আমার মনের মধ্যে ঘুরছে— আর এ সুরটাও একেবারে সেকেলে।"

তার সংগী তার দিকে ফিরে বলল, "রুট তুমি ভয় পেয়েছ ? সত্য কথা বল, তুমি খুব ভয় পেয়েছ।"

তারা একটা নীল আলোর নীচু দিয়ে যাচ্ছিল রুটের মুখাবয়ব অটলাকার ধারণ করল ; মুখ বাঁকা করে আড়চোখে চেয়ে সে বলল, "না, আমি ভয় পাইনি। আলো থেকে বেড়িয়ে আসতেই তার মুখ কোমল হয়ে এল। সে বলল, "আমি যদি দড়িগুলো সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানতাম ; ডিক্ আপনার আগের অভিজ্ঞতা আছে, কি হতে পারে তা ত আপনি জানেন ; কিন্তু আমি ত কখনও বাইরে যাইনি।"

ডিক্ উত্তর করল, "কাজ করেই শিখতে হয়, আসলে বই থেকে তুমি কখনও কিছু শিখতে পারোনা।"

তারা একটা রেলের জমি পেরিয়ে গেল। রেল লাইনের অদূরে উঁচু কতগুলো বাড়ী সবুজ আলোমালায় নক্ষত্রের মত সুশোভিত হয়েছিল। "কি ভয়ানক অন্ধকার", রুট বলল, "আমি ভাবছি এরপরে চাঁদ উঠবে কিনা ; সাধারনতঃ এরূপ অন্ধকারের পরেই চাঁদ ওঠে। ডিক্, আপনিই ত প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছেন ?"

"না প্রথমে তুমি বলবে। তোমার চেয়ে আমার বেশী অভিজ্ঞতা আছে, তাই তোমার বলা আমি লক্ষ্য করব এবং যেখানে ওরা বাধা দেবে আমি সেখানে আঘাত করব। কি বলবে, ঠিক আছে ত ?"

"নিশ্চয়ই, আমার জানা আছে। আমি প্রতিটি শব্দ পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখেছি। আমি শুনেছি, অনেক লোক বক্তৃতা দিতে উঠে কি বলবে ঠিক পায়না, তারপর গড়গড় করে এমন ভাবে বলতে আরম্ভ করে যে মনে হয় অন্ধ কেহ বুঝে বলছে। বিগ্ ইকৃসিন্ বলছিল, তার অবস্থাও নাকি একপ হয়েছিল। কিন্তু আমি ত আর সুযোগ পাইনি, তাই লিখে নিয়েছি।"

একখানা রেলগাড়ী করুণ ভাবে বাঁশী বাজিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা বাঁক ঘুরে এসে লাইনের উপর ভীষণ উজ্জল আলো ফেলল।

আলোকিত গাড়ীগুলো ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে চলে গেল। ডিক্ গাড়ীখানা লক্ষ্য করে সন্তুষ্টচিত্তে বলল, "এগাড়ীতে বেশী লোক নেই, তুমি না বলছিলে, তোমার বাবা রেলে কাজ করে ?"

রুট গলার তিক্ত ভাবটা বাহিরে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তিনি রেলে কাজ করেন—ব্রেক্‌ম্যান, আমি কি করছি টের পেয়ে তিনি আমায় বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। তিনি চাকরি যাবার ভয় করতেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি না বুঝে আমায় বার করে দিলেন।" হঠাৎ যেন সে বুঝতে পারল যে, বাড়ীর জন্ম তার মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, তাই সে একটু কর্কশ কণ্ঠে বলল, "ওঁদের নিয়ে ঐত হল মুস্কিল। ওঁরা ওঁদের চাকুরি ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, ওঁদের যে কি হচ্ছে, তাও বোঝেনা, শুধু শিকলেই আবদ্ধ থাকেন।"

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী

ডিক্ বলল, "ঐ কথা কয়টি মনে রেখো, ঐত হল আসল জিনিষ। এও কি তুমি বক্তৃতার ভিতর বলবে ?"

"না, তবে আপনি যদি ভাল বলেন, তবে বলব।"

এ দিক্‌টায় আলোর সংখ্যা কম ; সহর প্রায় শেষ হয়ে আসছে আর পাড়াগাঁ আরম্ভ হচ্ছে—তাই রাস্তার ধারে এক সারিতে অনেকগুলো গাছ রয়েছে। কাঁচা রাস্তার ধারে ছোট

ছোট কয়েকটি বাড়ী ও তার সংলগ্ন অযত্নে রক্ষিত কয়েকটি বাগানও রয়েছে।

"হে ভগবান! এ যে, অন্ধকয়ার", রুট বলল, "আমি ভাবছি আজ কোন গোলমাল হবে কিনা, আর হলে পর সরে পড়ার মত উপযুক্ত রাতই বটে।"

ডিক্ তার কোটের কলারের মধ্যে নাকটা নিয়ে একটু ঘোড়ার মত শব্দ করল। তারা খানিক নীরবে হাঁটল।

"ডিক্, আপনি কি সরে পড়বেন ভাবছেন?" রুট জিজ্ঞাসা করল।

"ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, না, সে যে আমাদের আদেশের বিরুদ্ধ। কিছু ঘটলে পরও আমাদের থাকতে হবে। তুমি একেবারেই খোকা। আমার মনে হয়, তোমাকে একটু বললেই পরই হয়ত তুমি দৌড়িয়ে পালাবে।"

রুট দাম্ভিকভাবে বলল, "আপনি ভাবছেন, কয়েকবার বেরিয়েছেন বলে আপনি একেবারে ওস্তাদ্ হয়ে গেছেন, আর আপনার কথা শত শত লোকে শুনবে।"

"আমার অসাক্ষাতে কে কি বলে, তা'তে আমি ভ্রূক্ষেপ করিনা।"

রুট মাথা নীচু করে খানিক হেঁটে কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ডিক্, সত্যিই কি আপনি পালাবেন না? সত্যিই কি সেখানে দাঁড়িয়ে এর সম্মুখীন হবেন?"

"নিশ্চয়ই, এ আমি আগেও করেছি, এইত আদেশ—তাই না? আর এতে আমাদের বেশ সুনামও হবে," সে অন্ধকারের মধ্যে রুটের প্রতি কুটিল দৃষ্টিপাত করল। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার ভয় হচ্ছে, তুমি দৌড়ে পালাবে, না? ভয় পেলে তোমার এখানে করবার কিছু নেই।"

কাঁপতে কাঁপতে রুট বলল, "ডিক্, শুনুন, আপনি ত ভাল লোক, আমি যা' বলব, কাকেও বলবেন না ত? আমি কখনও চেষ্টা করে দেখিনি, তাই কেউ যদি লাঠি দিয়ে বারবার আমার মুখের উপর আঘাত করে, তখন আমি কি করব—তা কি জানি? এমন অবস্থায় কি করব তা' আগে কে বলতে পারে? আমি পালাব বলে মনে হয় না, তবে আমি চেষ্টা করব যাতে পালাতে না হয়।"

"ঠিক আছে খোকা; যে-ভাবেই চলুক, কিন্তু দৌড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করেছ ত' আমি তোমায় নাম ফিরিয়ে দেব। সেরূপ বেল্লমাদের আমাদের দলে কোন স্থান নেই, এ-কথা মনে রেখো।"

"ও-সব বাজে কথা রেখে দিন, আর খোকা খোকা বলবেন না।"

তারা যতই এগুতে লাগল, গাছগুলো ততই ঘন হ'য়ে এল। মৃদু বাতাস সকারণে গাছের পাতা খস্ খস্ শব্দ করতে লাগল। কাছেই এক বাড়ীর উঠান থেকে একটা কুকুর লোক দেখে ঘেউ ঘেউ করে অসন্তোষ প্রকাশ করল। হালকা কুয়াশা বাতাসের ভিতর সঞ্চালিত হতে লাগল আর নক্ষত্রগুলো তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ডিক্ জিজ্ঞাসা করল, "সব ঠিক আছে ত'? আলোগুলো লেখাগুলো সব ঠিক আছে ত'? আমি কিন্তু এ-সবের ভার তোমার উপর দিয়েছি।"

রুট উত্তর করল, "সে-সব আজ আমি সন্ধ্যায়ই ঠিক করে রেখেছি, প্রাচীরপত্রগুলো এখনও পর্য্যন্ত লাগান হয় নি, সেখানেই একটা বাক্সের মধ্যে রেখেছি।"

"আলোগুলোর ভিতর তেল আছে ত'?"

"হ্যাঁ, প্রচুর আছে। ডিক্, আমার মনে হয়, কোন শালা হয়ত গোয়েন্দাগিরি করছে। আপনার কি মনে হয়?"

"নিশ্চয়ই সব সময়ই কেউ না কেউ গোয়েন্দাগিরি করে।"

"আচ্ছা, আপনি কখনও কোন আক্রমণ সম্বন্ধে কিছু শোনেন নি?"

"বাঃ রে, আমি কি করে শুনব? তুমি ভাবছ, তারা এসে আমায় বলবে যে, তারা আমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। রুট নিজেকে ঠিক রাখ—আর তুমি যদি এ-চিন্তা পরিত্যাগ না কর, তা'হলে আমাকেও দুর্ব্বল করে ফেলবে।"

দুই

অন্ধকারে তারা কালো চতুষ্কোণা একটা বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। কাঠের একটা সিঁড়ি থেকে তাদের পায়ে একটু চোট লাগল। "এখনও পর্য্যন্ত কেউ এখানে আসে নি।" ডিক্ বলল, "এস, আমরা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আলোর বন্দোবস্ত করি।" তারা একটা পরিত্যক্ত গুদামে এসেছিল। পুরাতন জানালার কাঁচগুলো ধুলার অস্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ঘরটার একদিকের কাঁচের উপর ধর্ম্মঘটের একটা প্রাচীরপত্র লাগান ছিল—আর অপরদিকে পীজবোর্ডের তৈরী একটা নারীমূর্ত্তি ভূতের মত দাঁড়িয়েছিল। ডিক্ তারপর ছুটো দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল, দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে একটা কেরোসিনের আলো জেলে, সেটাকে দাঁড় করান একটা আপেলের বাক্সের উপর রেখে বলল, "রুট চলে এস, আমাদের সব জিনিষ ঠিক করে নিতে হবে।"

বাড়ীটার দেয়ালগুলোতে বিভিন্ন রং-বেরং-এর ডোরাকাটা ছিল। কতকগুলো মলিন সংবাদপত্র স্তূপাকারে এক কোণে

অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল; পিছনের দিকের জানালা ছ'টি ছিল মাকড়সার জালে ভর্তি। সে-গুদামে আপেলের বাক্স তিনটী ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ছিল না। স্কট একটা বাক্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে গাঢ় লাল ও কাল রং দিয়ে মানুষের ছবি আঁকা একটা প্রাচীরপত্র বার করে নিয়ে আলোর পিছনের দিকের দেওয়ালে এঁটে দিল। তার পাশে সে সাদা জমিনের উপর বেশ বড় লাল নিদর্শনবিশিষ্ট আর একখানা প্রাচীরপত্র এঁটে দিল। তারপর সে আর একটা আপেলের বাক্স খাড়া করে নিয়ে তার কতকগুলো ছাপার কাগজ, বই প্রভৃতি স্তূপাকারে রাখল। কাঠের মেজের উপর তার পদধ্বনির আওয়াজ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছিল।

"ডিক্, ঐ আলোটাও জ্বেলে দিন।"

"খোকা তুমি অন্ধকারকেও ভয় করছ?"

"না, লোকগুলো খুব শীঘ্রই এখানে এসে পড়বে, তাই ওরা যখন আসবে তখন যেন আরও আলো থাকে. ক'টা বাজে?"

ডিক্ তার ঘড়ি দেখে বল্‌ল, "আটটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী, কয়েকজন লোক খুব শীঘ্রই এখানে আসা উচিত ছিল।" বলে সে তার বুক পকেটে হাত দিল ও বইগুলোর বাক্সের কাছে এসে দাঁড়াল। সেখানে বসবার কিছুই ছিল না। কালো ও লাল রঙে অঙ্কিত ছবিখানা যেন কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। স্কট দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

একটা আলোর রঙ হলদে ও শিখাটা ছোট হয়ে এল, ডিক তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি না বলছিলে তেল ভর্ত্তি আছে, কিন্তু এটাও একেবারে খারাপ।"

"আমি ভেবেছিলাম, প্রচুর আছে। দেখুন, এটা প্রায় ভর্ত্তি। আমরা এই আলোটা থেকে কিছু তেল ঐ আলোটায় ঢেলে নিতে পারি।"

"তা' কিরূপে হবে? তেল ঢালতে হলে ত' দুটো আলোই নিবিয়ে দিতে হবে। তোমার সঙ্গে দেয়াশলাই আছে?"

স্কট পকেটে হাত দিয়ে বল্‌ল, "মাত্র দুটি।"

"এখন বুঝছ? একটা আলো দিয়েই আমাদের এ-সভার কাজ চালিয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যার সময় এ-সমস্ত জিনিষ আমারই দেখা উচিত ছিল। কিন্তু সহরে ছিলাম—আর ভেবেছিলাম এ-সবের ভার তোমার উপর দেওয়া যায়।"

"হয়ত তাড়াতাড়ি এর খানিকটা তেল একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে পরে ঐ আলোটায় ঢেলে দিতে পারা যাবে।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, তারপর বেশ আগুন ধরিয়ে দেওয়া যাবে, তুমি ত' দেখছি খুব কাজ করতে পার।"

স্কট পুনরায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "তারা হ'লে ভাল হ'ত, আচ্ছা ডিক্, ক'টা বাজে?"

"আটটা বেজে পাঁচ মিনিট।"

"আচ্ছা ওরা আসছে না কেন? দেরী করছে কেন? আপনি তাদের আটটার কথা বলেছিলেন?"

"ওহে খোকা চুপ কর, ওরা শীঘ্রই এসে পড়বে, কেন যে দেরী হচ্ছে জানি না; হয়ত ঠাণ্ডার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসতে পারছে না, এখন কিছু সময়ের জন্য চুপ করে থাক", সে পুনরায় তার পকেটে হাত দিয়ে বলল, "স্কট একটা সিগারেট আছে?"

স্কট উত্তর করল, "না।"

রাত্রি একেবারে নিঝুম; সহরের মধ্য দিয়ে মোটরগাড়ী যাতায়াত করছিল—তার ইঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ ও মাঝে মাঝে হর্ণের শব্দ ভেসে আসছিল। পাশের এক বাড়ী থেকে একটা কুকুর অনুত্তেজিতভাবে ঘেউ ঘেউ করছিল; দমকা হাওয়া এসে গাছগুলোকে যেন অস্থির করে তুলছিল

"ডিক্. শুনুন, কারো গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আমার মনে হয়—" তারা উভয়ে কারো স্বর শোনা যায় কি না লক্ষ্য করল?

"আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তুমি শুনেছ মনে মনে!"

স্কট ময়লা একটা জানলার ধারে যেয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল; খানিক বাদে সে স্তূপীকৃত বইগুলো সাজিয়ে রাখতে আরম্ভ করল—"এখন ক'টা বাজে, ডিক?"

"তুমি চুপ করবে কি? তুমি আমাকে পাগল ক'রে দেবে, দেখছি। এ কাজের জন্য তোমার কিছু সাহস আনাও ত দরকার, ভগবানের দোহাই, তোমায় যে তা' আছে, একটিবার দেখাও।"

"আচ্ছা। ডিক্, আমি আর কখনও বার হইনি।"

"তুমি কি জান না, এ কথা যে কেউ বলতে পারত—আর এ তুমি খুব সহজ ভাবে নেবে।"

দমকা হাওয়া বইছিল। সম্মুখের দরজায় মৃদু আঘাত হ'তেই তাদের একজন দরজা খুলে দিতেই দরজার কব্জা থেকে কোঁ-কোঁ করে আওয়াজ হ'ল, হাওয়া ঢুকে স্তূপীকৃত মলিন সংবাদপত্র-

গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ও প্রাচীরপত্রগুলো দেয়াল থেকে খুলে যাওয়ায় পর্দার মত উড়তে আরম্ভ করল।

"রুট, ঐ দরজাটা বন্ধ কর,...না; খোলাই থাক। এবার ওরা এলে পর আমরা বেশ শুনতে পারব।" পরে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, "প্রায় সাড়ে আটটা বাজে।"

"আপনার কি মনে হয়, ওরা আসবে? ওরা না এলে পর আমরা কত সময় অপেক্ষা করব।

বৃদ্ধ লোকটি উন্মুক্ত দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাড়ে ন'টার পূর্ব্বে আমরা এখান থেকে যাব না, আজকের এ সভা করবার জন্য আমাদের আদেশ দেওয়া হ'য়েছে।" খোলা দরজা দিয়ে নৈশ আওয়াজ বেশ স্পষ্ট ভাবেই ভেসে আসছিল—রাস্তার শুকনো পাতাগুলো যেন হাওয়ায় নাচছিল আর সেই কুকুরটা তখনও থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ করছিল।

দেয়ালের লাল ও কালো রঙের সেই ছবিটি অস্পষ্ট আলোতে যেন ভীতি প্রদর্শন করছিল; ছবিটির নীচের দিকটা খুলে যাওয়ায় হাওয়ায় পত্ পত্ করছিল। ডিক্ এব চতুর্দ্দিকে চেয়ে আস্তে বলল, "শোন খোকা, আমি জানি তুমি ভয় পেয়েছ। তুমি যখন ভয় পাবে, একবার এর দিকে চাইবে"—বলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ছবিখানা দেখিয়ে দিল, "এ কখনও ভয় পায় নি। এ যা' করেছে তা' মনে রেখো।"

রুট ছবিখানা দেখে বলল, "আপনি বলছেন, এ কখনও ভয় পায় নি?"

ডিক্ তাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে বলল, "যদিও বা পেয়ে থাকে, কেউ তাকে কখনও ভয় পেতে দেখে নি। এ থেকেই তোমায় শিক্ষা নিতে হবে—আর সকলকে মনের কথা খুলে বলে বেড়িয়ো না।"

"আপনি ত বেশ লোক, কিন্তু আমাকে যদি একা পাঠায় তখন কি করব না করব, তা' বুঝতে পাচ্ছি না।"

"তুমি ঠিকই পারবে। আমি জানি, তোমার শক্তি আছে; তুমি কখনও বিপদে পড় নি, তাই।"

রুট তাড়াতাড়ি দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনুন, কেউ আসছে, টের পাচ্ছেন?"

"ও কথা ছেড়ে দাও। ওদের যখন আসবার, ঠিক আসবে।"

"ভাল কথা, দরজাটা বন্ধ করে দিই, ঠাণ্ডা আসছে। দেখুন, ঐ কে যেন আসছে।

পায়জামা পরিহিত একটা লোক দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আপনারা সরে পড়ুন, আপনাদের আক্রমণ করবার জন্য একদল লোক আসছে, আজকের সভায় কোন লোকই আসবে না। তাদের ইচ্ছা, আপনারা এখানেই থাকুন, কিন্তু আমার তা নয়, আপনারা সব জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, ঐ দল এল বলে।"

রুটের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে দুর্ব্বলভাবে ডিকের দিকে চাইল। সে কেঁপে উঠল; তাড়াতাড়ি হাত দুটি আমার বুকপকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ, আমাদের এ কথা জানাবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনি সরে পড়ুন, আমরা ঠিক থাকব।"

লোকটি উত্তর করল, "অন্য সবার ইচ্ছা, আপনারা এখানেই থাকুন।"

ডিক্ মাথা নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই, কারণ তারা ভবিষ্যৎ বোঝে না, ওরা ওদের চোখের সম্মুখে যা' দেখে তার বেশী কিছু দেখতে পায় না, আপনি ধরা পড়বার আগেই সরে পড়ুন।"

"বেশ, আপনারা আসবেন না? আমি আপনাদের কিছু জিনিষপত্র নিয়ে যেতে সাহায্য করব—"

ডিক্ শক্ত হয়ে বলল, "আমরা এখানেই থাকব। আমাদের থাকবার জন্যেই আদেশ দেওয়া হয়েছে—আর আমরাও তা' পালন করব।"

লোকটি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আমিও কি আপনাদের সংগে থাকব?"

"না, আপনি খুব ভাল লোক। আপনার অপেক্ষা করবার দরকার নেই, আপনাকে হয় ত অন্য সময়ে আমাদের কোন কাজে লাগবে।"

"বেশ, আমার যা' করবার ছিল, তা'ই করেছি।"

তিন

লোকটি ফুটপাথ পেরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। আবার নৈশ গুঞ্জন আরম্ভ হ'ল—হাওয়ায় রাস্তায় শুকনো পাতা পড়তে লাগল; দূরে সহর থেকে মোটর গাড়ীর শব্দ ভেসে এল।

রুট ডিকের দিকে তাকাল। দেখল, সে তার হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে বুকের উপর আড়াআড়ি ক'রে রেখেছে; মুখের মাংসপেশীগুলো দৃঢ় হ'য়ে গেছে কিন্তু তবুও তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। দেওয়ালের প্রাচীরপত্রগুলো হাওয়ায় একটু সঞ্চালিত হ'য়ে আবার স্থির হ'য়ে রইল।

"খোকা ভয় পেয়েছ?"

রুট প্রথমতঃ একটু অস্বীকার করবার চেষ্টা করল, কিন্তু

পরক্ষণেই সত্য কথা বলল, "হ্যাঁ, আমি ভয় পেয়েছি ; হয় ত তার জন্য কোন কাজ করতে পারব না।"

"সাহসী হও", ডিক্ শক্তভাবে বলল, "রুট তুমি সাহসী হও।"

ডিক্ তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, "অল্প সাহসী লোকদের সম্মুখে থাকা দরকার, স্থির সংকল্পের উদাহরণ—আর সাধারণ লোকদের সম্মুখে থাকা দরকার অন্যায়ের জলন্ত উদাহরণ। এখানেই তা' আছে—আর এই আদেশ", বলেই সে চুপ করে রইল। কুকুরটা একটু জোরে ঘেউ ঘেউ করতে আরম্ভ করল।

"আমার মনে হয় ঐ তারা আসছে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, তারা আমাদের মেরে ফেলবে?"

"না, তারা সাধারণতঃ কাকেও মেরে ফেলে না।"

"কিন্তু ওরা হয়ত আমাদের আঘাত করবে, লাথি মারবে; তাই করবে না? হয়ত লাঠি দিয়ে মুখে আঘাত ক'রে আমাদের নাক ভেংগে দেবে ; ওরা বিগ্ মাইকের চোয়াল তিন জায়গায় ভেংগে দিয়েছিল।

"তুমি শক্ত হও, আর শোন, তোমায় যদি কেউ হঠাৎ আক্রমণ করে তবে জেনে রেখো, এ আক্রমণ সে করছে না, করছে এই সমাজ ব্যবস্থা—আর এ আক্রমণ তোমার প্রতি নয়, তোমার আদর্শের প্রতি, সে কথা বোঝ না?"

"ডিক্, আমি পালাতে চাই না, সত্যি বলছি, আমার সে ইচ্ছা নয়। যদি আমি পালাতে চেষ্টা করি, আপনি আমায় ধরবেন, ধরবেন ত?"

ডিক্ এগিয়ে যেয়ে তার কাঁধ স্পর্শ ক'রে বলল, "তুমি ঠিক পারবে। আমি লোক দেখেই বলতে পারি, কে ঠিক পারবে।"

"আচ্ছা, আমাদের বইগুলো লুকিয়ে রাখলে ভাল হয় না, তা'হলে ওরা এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না।"

"না, কেউ না কেউ অন্ততঃ একখানা বই পকেটে রাখবে ও পরে পড়বে, তখন ওতেই কিছু কাজ হবে, বইগুলো ওখানেই থাক ; আর এখন চুপ কর, বেশী কথা বললে সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

কুকুরটা পুনরায় নিরুত্তেজিত ভাবে ডাকছিল ; একটা বাতাসের ঝাপটা কতকগুলো শুকনো পাতা ঘরের ভিতর নিয়ে এল, হাওয়ায় ছবিখানার একটা দিক্ আলগা হয়ে গিয়েছিল—রুট এগিয়ে যেয়ে সেইটেকে আবার এঁটে দিল ; সহরের দিকে একখানা মোটর গাড়ী হঠাৎ ব্রেক্ কষায় কোঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করে উঠল।

"ডিক্, কিছু শুনতে পাচ্ছেন কি? ওরা কি আসছে?"

"না।"

"শুনুন, বিগ্ মাইক্ ছদিন চোয়াল ভাংগা অবস্থায় পড়ে ছিল, এর মধ্যে কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে নি।"

বৃদ্ধ রাগান্বিত হ'য়ে চোখ সংকুচিত করে তার দিকে চাইল। পকেট থেকে মুষ্টিবদ্ধ একখানা হাত বার করে তার কাঁধের উপর রেখে বলল, "খোকা, খুব মন দিয়ে শোন, আমি খুব বেশী কিছু জানি না, তবে আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে। তোমায় আমি শুধু এই নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি যে, সে যখন আসবে তোমায় আঘাত করবে না। কেন বলতে পারি না, কিন্তু তা'তে তোমার লাগবে না ; এমন কি তারা যদি তোমায় মেরেও ফেলে তবুও তোমার লাগবে না"—এ কথা বলে সে কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে সম্মুখের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের দিকে খানিক সময় চেয়ে কিছু শুনতে পায় কি না লক্ষ্য করল, তারপর ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু শুনতে পাচ্ছ?"

"না, কিছু না।"

"ওদের আসতে দেরী হ'চ্ছে কেন?"

"আমি কি ক'রে জানব। রুট তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলল, "হয়ত ওরা আসবে না, লোকটা ঠাট্টা করবার জন্য মিথ্যা কথা ব'লে গেছে।"

"হতে পারে।"

"আচ্ছা, আমরা কি সারা রাতই—কখন ওরা এসে আমাদের মাথা ঠুকবে, সেজন্য অপেক্ষা করব?"

ডিক্ একটু ঠাট্টা ক'রেই বলল, "হ্যাঁ, আমরা সারা রাতই ওদের জন্য অপেক্ষা করব।"

বাতাসের প্রবল একটা ঝাপ্টা এল—আবার পরক্ষণেই একেবারে শান্ত হ'য়ে গেল। কুকুরটার চীৎকার বন্ধ হল, খুব জোরে বাঁশী বাজিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের ওখান দিয়ে একখানা গাড়ী ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করতে করতে চলে গেল। তারপর রাত্রি আগের চেয়েও নিঝুম হ'য়ে এল, নিকটেই এক বাড়ীতে ঘড়ির এলার্ম বেজে উঠল ; ডিক্ বলল, "কে কে যেন খুব সকালে কাজে যায়, হয়ত কোন রাত্রের প্রহরী।"

"ডিক্, ক'টা বাজে?"

"ন'টা বেজে পনেরো মিনিট হ'য়েছে।"

"হা ভগবান্, মাত্র তাই। আমি ভেবেছিলাম, বুঝি ভোর হ'য়ে এল। ডিক্, আপনার কি মনে হয় না, ওরা এখানে আসবে? শুনুন, আমি যেন কারো গলার আওয়াজ শুনছিলাম।"

—তারা শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটু সম্মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে লক্ষ্য করতে লাগল। "ডিক্, আপনি শুনতে পাচ্ছেন ?"

"আমারও তাই মনে হয়। ওরা খুব আস্তে আস্তে কথা বলছে।" কুকুরটা আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কতগুলো লোকের গুঞ্জন শোনা গেল। "ডিক্ শুনুন, আমি পিছনের জানালা দিয়ে কা'কে যেন দেখলাম।"

বৃদ্ধলোকটি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে একটু মৃদু হাস্য করে বলল, "তাই দেখছি, আমরা বেরোতে পারবনা। ওরা চারদিক ঘিরে ফেলেছে। ওরা আসছে খোকা, তুমি শক্ত হও—আর মনে রেখো, এ ওরা নয়, এ হল সমাজ ব্যবস্থা।"

এক সংগে কতকগুলো লোকের পদধ্বনি শোনা গেল; দরজাটা খুব জোরে খুলে গেল। ভিড় করে কতগুলো লোক ভিতরে ঢুকে পড়ল—তাদের পোষাক ছিল এলোমেলো, মাথায় ছিল কালো টুপি, আর হাতে ছিল লাঠি সোঁটা। ডিক্ ও রুট সোজা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তাদের চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

ভিতরে এসে ওরাও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। প্রথমতঃ ওদের দুজনকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে চোখ রাংগাতে লাগল—যেন প্রথম কেউ আরম্ভ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। রুট একবার আড়চোখে ডিকের প্রতি চাইল; দেখল, সে শান্তভাবে তার দিকে চেয়ে যেন তার ব্যবহার লক্ষ্য করছে। রুট তাড়াতাড়ি তার কম্পিত হাত দু'খানি পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে গেল। সে ভয়চকিত কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে বলল, "কমরেড্স্, আপনারাও আমাদের মত মানুষ। আমরা সব ভাই···" বলতে না বলতেই সে মাথায় খুব জোরে কশাঘাত অনুভব করল। সে হাটু ভেংগে পড়ে গেল, কিন্তু তবুও হাতে ভর করে স্থিরভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

লোকগুলো তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। রুট হামাগুড়ি দিয়ে পায় ভর করে উঠে দাঁড়াল। তার কান কেটে যাওয়ায় রক্তের ধারা ঘাড় বেয়ে পড়ছিল; মুখাবয়বের এ দিকটা পিংগল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খুব জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। এবারে তার হাত দৃঢ় হয়ে এল ও উত্তেজনায় চোখ গরম হয়ে গেল। সে জোর গলায় চীৎকার করে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না; এ সব কিছুই আমরা আপনাদের জন্য করছি। আপনারা যা' করছেন তা' জানেন না।"

"মার শালাদের।"

কে একজন মূর্চ্ছাগ্রস্থ রোগীর মত হেসে উঠল, তারপর ঢেউয়ের মত তার ওপর আঘাত আসতে লাগল। রুট পড়ে যাওয়ার সময় ডিকের প্রতি এক পলক তাকিয়ে নিল—দেখল, তার মুখাবয়ব দৃঢ় অথচ রূঢ় হাস্যপূর্ণ।

কয়েকবার নড়াচড়া করবার পর রুট চোখ মেলে চাইল ও তার অবস্থা বুঝতে পারল। তার মাথা ও মুখাবয়বে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছিল। সে স্ফীত চোখের পাতার মধ্য দিয়ে মাত্র একটা আলোক-রশ্মি দেখতে পেল, কিছু সময় শুয়ে থেকে চিন্তা করল, কিভাবে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তারপর সে ডিকের গলার স্বর শুনতে পেল। সে জিজ্ঞাসা করছিল, "খোকা, তুমি কি জেগে আছ ?"

সে কথা বলতে যেয়ে দেখল যে, তার গলায় স্বর খুব কর্কশ হয়ে গেছে। উত্তর করল, "তাই ত মনে হয়।"

"ওরা ঠিক তোমার মাথায় আঘাত করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, তুমি শেষ হয়ে গেছ। তুমি নাকটা কিন্তু ঠিক রেখেছ, এ আর বিশেষ ভাল হবেনা।"

"ডিক্, ওরা আপনার কি করেছে ?"

"ওরা আমার একখানা হাত ও কয়েকখানা পাঁজর ভেংগে দিয়েছে, এবার থেকে তোমার মুখ মাটির দিকে নীচু করে রাখা শিখতে হবে, কারণ তা'তে চোখ দুটি রক্ষা পায়।" সে একটু থেমে সতর্কভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "অনেকের পাঁজর ভেংগে গেলে পর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, আমাদের সৌভাগ্য যে, পুলিসের লোকগুলো আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।"

"ডিক্, আমরা কি এখন জেলে ?"

"জেল হাসপাতালে।"

"আমাদের বিরুদ্ধে ওরা কি অভিযোগ এনেছে ?"

সে টের পেল যে, ডিক্ মৃদু হাস্য করবার চেষ্টা করছে ও কষ্টসহকারে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। সে বলল, "দাংগা বাঁধাবার চেষ্টা করছিলাম; আমার মনে হয় আমাদের দু'মাস করে সাজা হবে। পুলিশগুলো আমাদের বইগুলো পেয়েছে।"

"ডিক্, আপনি কিন্তু বলবেননা যে আমার বয়স কম, বলবেন না ত ?"

"না, বলবনা। তুমি বরং চুপ কর। তোমার গলার স্বর কিন্তু তেমন শোনাচ্ছেনা। এ তুমি খুব সহজভাবে নেবে।"

রুট ব্যথায় নীরব হয়ে পড়ে রইলো, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার বলল, "ডিক্, এতে আমি কিন্তু কোন ব্যথা পাইনি। এ যেন আমার কাছে বেশ মজাই লাগছিল।"

"তুমি বেশ করেছ। আমি আজ পর্য্যন্ত যত ভাল কর্ম্মীদের দেখেছি, তুমি ঠিক তাদের মতই করেছ। আমি দলের ভিতর নাম ছড়িয়ে দেব। তুমি খুব সুন্দর করেছ।"

রুট বলল, "ওরা যখন আমাকে আঘাত করছিল, তখন আমি ওদের বলতে চাইছিলাম যে, ও আমি গ্রাহ্য করিনা।"

"নিশ্চয়ই খোকা। তাইত আমি তোমাকে বলছিলাম, এর জন্য ত ওরা দায়ী নয়—দায়ী এ সমাজের কুচক্র। ওদের কিন্তু কখনও ঘৃণা কোরোনা। কারণ এর চেয়ে ভাল আর কিছু আছে বলে ওরা জানেনা।"

ব্যথা রুটকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে নিদ্রালুভাবে বলল, "ডিক্, আপনার বাইবেলের সে কথা মনে আছে, 'ওদের ক্ষমা কোরো, কারণ ওরা কি করছে, তাই জানেনা।"

ডিক্ কঠোরভাবে বলল, "ও সব ধর্ম্মের কথা ছেড়ে দাও খোকা, ধর্ম্ম হল জনসাধারণের আফিং-স্বরূপ।"

রুট উত্তর করল, "নিশ্চয়ই, তা আমি জানি, কিন্তু ওর মধ্যে ধর্ম্মের কিছু ছিলনা। আমারও ঐ রকমই বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, আমি ঠিক ঐ রকমই ভাবছিলাম।"

ঝুলি-ঝাড়া উপাখ্যান

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

STUDENTS' COMMON-ROOM

শ্রীমন্মহারাজ হবুচন্দ্র ও তস্য প্রধান অমাত্য শ্রীগবুচন্দ্রের নাম আমরা সকলে শুনিয়াছি; তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাসম্ভূত গুটি কয়েক গল্প-গাথাও আমাদের মনে অস্পষ্ট রেখা পাত করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, আমরা গবেষক জাতি বলিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিলেও এত বড় একজন স্বনামধন্য ও ভারত-প্রসিদ্ধ রাজার কার্য্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণের জন্য আদৌ আমাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি এই ঔদাসীন্য কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না?

গল্প আছে, রাজা হবুচন্দ্র একসময়ে অনিদ্রা রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশবিদেশাগত চিকিৎসকদিগের অকুণ্ঠ ও বিশদ চিকিৎসাসত্ত্বেও রাত্রি রাজার পক্ষে কালরাত্রি হইয়াছিল এবং কাল রাত্রির করাল কবল হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই পাওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে হবুচন্দ্র রাজার প্রধানমন্ত্রী গবুচন্দ্র স্বহস্তে রাজচিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন।

রাজধানীর চরণ চুম্বন করতঃ স্রোতস্বতী একটি নদী প্রবাহিত ছিল। তাহার স্বচ্ছ বারিবক্ষের উত্তুঙ্গ তরঙ্গোত্থিত সুললিত সঙ্গীতলহরী অবিরাম রাজধানীর অধিবাসীদিগের কর্ণকুহর সুশীতল করিত। গর্ভস্থ মৎস্যকুলের আস্ফালনে থাকিয়া থাকিয়া রাজপুরী কাঁপিয়া উঠিত। অমাত্য গবুচন্দ্র বিধান দিলেন, ঐ নদী বক্ষে শয্যা বিস্তার করিতে পারিলে রাজার অনিদ্রা দূর এবং শান্তিদায়িনী সুনিদ্রা সম্ভোগ সম্ভব হইতে পারিবে। অন্যের নিকট প্রস্তাব উদ্ভট বিবেচিত হইলেও, গবুচন্দ্রের কথায় রাজার অপরিসীম আস্থা বিদ্যমান। কিরূপে প্রস্তাবটি বাস্তবে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে, হবুচন্দ্র তাহাই জানিতে চাহিলেন। গবুচন্দ্রের কণ্ঠে সরস্বতী বিরাজিতা। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাঞ্জল ভাষায় কার্য্যকরী পন্থা বিবৃত করিলেন। 'বলং বলং বুদ্ধিবলং' পৃথিবীতে এই সত্যই পুনঃপ্রচারিত হইল।

হবুচন্দ্রের কুবেরের ভাণ্ডারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার অসদ্ভাব ছিল না। অবিলম্বে থলি ভরিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া মুদ্রা সকল নদীতীরে প্রেরিত হইল এবং রাজস্ব পতিগণ নৌকারোহনে মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মুদ্রারাশি নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নদীর বুক আনন্দে ভরিয়া উঠিল; তদুপরি দুগ্ধ-ফেণনিভ একখানি সুকোমল শয্যা বিস্তারিত হইল। যথাকালে হবুচন্দ্র তথায় গমনানন্তর অপূর্ব্ব ও অভিনব এবং অভাবনীয় নদী-শয্যায় শয়ন করিলেন। নদীর জল দোল দেয় ও ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহে—বহুকাল পরে সন্তাপহারিণী শান্তিদায়িনী নিদ্রা আসিয়া রাজনেত্রদ্বয় আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সে কালটা যদি একাল হইত, তাহা হইলে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীনির্ম্মিত 'স্বপ্নাদ্য' ও অব্যর্থ "River Bed Projct"টি "Tennesey valley Project" এর মতো বিজ্ঞাপন-প্রচার করিবার এই দুঃসময়ে ও দুর্ভিক্ষের বাজারে গবুচন্দ্র একটি পেটেণ্ট রেজেষ্টারী লইয়া খোলা হাটে (white marketএ) কিছু করিয়া লইতে পারিত। সে যাহাই হৌক, সেকালের যে কয়জন লোক "নদী শয্যা" দেখিল, তাহারাই ধন্য ধন্য করিল। লোকের মুখে মুখে খবরটা অনেকদূর পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু যে সংখ্যক লোক দেখিলে এবং যে পরিমাণ খ্যাতি বিস্তারিত হইলে কলম্বাস-সদৃশ গবুচন্দ্রের চিত্ততৃপ্তি ঘটিতে পারিত, তাহা না হওয়ায় কিঞ্চিৎ মনোকষ্ট যদি থাকিয়াই যায়, তাহাকে অন্যায় অথবা অসঙ্গত বলা সঙ্গত হইবে কি? তদুপরি, পরোপকার প্রবৃত্তি ত মানুষের সহজাত বৃত্তি। পৃথিবীতে অনিদ্রা ব্যাধি প্রপীড়িত লোক ত ঐ একটিই মাত্র নহে। শুভ সংবাদটি তাহাদিগের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার বাসনা হওয়াই ত স্বাভাবিক।

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

ভগবান না করুন, অনিদ্রা কাহারও যেন না হয়। ভুক্ত-ভোগীমাত্রেই জানে, সে কি কষ্ট! আমার হইয়াছিল, তাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, অতি বড় দুষমণকেও যেন অনিদ্রায় না ধরে।

অতঃপর হবু ও গবু বিশ্বময় মিশন ডেলিগেসন প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্যের কেউ কেটা মাত্রকেই সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যখন পুরুষের অভাব ঘটিল, তখন প্রমীলা বাহিনী প্রেরিত হইতে লাগিল। পৃথিবীময় সাড়া পড়িয়া গেল। হবু ও গবু অচিরকালমধ্যে বিশ্বসাহিত্যে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন; রাজনৈতিক দরবারে বিনা প্রচেষ্টাতেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল; ঠাকুরদা ও ঠাকুমার গল্পেও সুপ্রাচীন বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর মতো হবু গবুও চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইলেন। আমেরিকার লোকের এমন আশঙ্কাও হইল যে, বুঝি বা তাহাদের "টিনেসী ভ্যালি" রাহুগ্রাসে শশধরের মত মলিন-বিবর্ণ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের ভাগ্য বলিতে হইবে যে,

তখনও দামোদর উপত্যকার স্বপ্নও অ-দৃষ্ট ছিল, নহিলে নিঃসন্দেহে তাহাও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া যাইত। রাজা হবুচন্দ্র ও অমাত্য গবুচন্দ্রের পরম সৌভাগ্য যে তাঁহাদের নদী-শয্যা "প্রোজেক্ট" প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, অতএব অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিযোগী না থাকায়, অপরাজেয় ও অপরাজিত বলিয়া বিঘোষিত ও অভিনন্দিত হইয়াছিল। স্কুলের ক্লাশে একটি মাত্র ছাত্র, বই না খুলিয়া ও খাতা না ছুঁইয়াও সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম ও সর্বোত্তম আসন হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে কাহার সাধ্য?

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরমুহূর্ত হইতেই-আমাদেরও যেন মিশনে পাইয়া বসিয়াছে। পৃথিবীতে হেন স্থান নাই, এমন একটি সভা নাই, এমন একটি বৈঠক বসে নাই, যেখানে হবুগবুর অন্তরঙ্গগণ হাজিরা না দিয়াছেন। বাবুরথে চক্র সঙ্গীতে অনেকের অনিদ্রা দূরীভূত হইয়াছে। নদীর তরঙ্গভঙ্গের মতো বিমানের দোদুল দোলে অনেকের সুখনিদ্রা আসিয়া গিয়াছে। নিঃখরচায় বিশ্ব-ভ্রমণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হোটেলে পানভোজন ও অবস্থান, বহুজনের বহুকালের, বহু আধি ব্যাধির অবসান ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষের "ষ্টক্" আজ ভারি উচ্চ; খ্যাতি আর ধরে না, বর্ষার নদীর মত দুকূল প্লাবিয়া উপছাইয়া পড়িতেছে। হবুচন্দ্রেরও পড়িয়াছিল। ঐতিহাসিক গল্পলেখকগণ ইহাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, হবু গবুর একদিন পৃথিবীর নেতৃত্ব করিবার সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছিল। আজ ভারতবর্ষের নিশ্চিত নেতৃত্ব সম্ভাবনায় সন্দেহ পোষণ করে, এমত দৃষ্টিহীন অন্ধ কি কেহ আছে? কৈ মনে ত হয় না?

ভারতের পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সেদিন পাকিস্থানের উদ্দেশে রঙ্গভরে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর পাকিস্থান-প্রীতি অকপট, অকৃত্রিম ও আন্তরিক না হইলে তিনি যে রঙ্গ রহস্য করিতেন না, ইহাও সর্ববাদী স্বীকৃত সত্য। তথাপি আমাদের এই আশঙ্কা যে, অরসিকেষু রস নিবেদনম্ না হয় ত বাঁচি। পাকিস্থান আজও অনেক দেশেই এম্বেসী লিগেসন খুলিতে পারে নাই এবং তাহার মিশন, ডেলিগেসন গুলাও পায়াভাঙ্গা তেপায়ার মত নড়বড় করে ও ল্যাংচায়। পাকিস্থানের কল্যাণকামী পণ্ডিতজীর পক্ষে ইহা পীড়াদায়ক হইয়াছে। প্রতিবাসী রাষ্ট্রের মহদ্দৃষ্ট দেখিয়াও যে পাকিস্থান পিছাইয়া পড়িতেছে, ইহাতে দুঃখ না হইলেই অশোভন ও অস্বাভাবিক হইত। কিন্তু, যাহারা বহিরঙ্গ (এবং যাহাদের অন্তরঙ্গ হইবার কোন ভরসাই আর নাই, অর্থাৎ-এই আমরা যেমন।) তাহারা যদি সবিনয় বিনয় পূর্ব্বক সম্মানপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশ্ন করে যে, পিছাইয়া পড়িয়া পাকিস্থান হারিয়াছে, না, জিতিয়াছে, তবে তাহার কি জবাব পাওয়া যাইবে?

'উনোতে' কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রেরণ ভারতবর্ষই করিয়াছিল। ভারতবর্ষের নালিস ছিল, পাকিস্থানই উদ্যোগ আয়োজন করিয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরে হানাদার প্রেরণ করিয়া মর্ত্ত্যে স্থায়ীভাবে নরক প্রতিষ্ঠা করিতেছে। পাকিস্থান ভাল মানুষ, ভাজা মাছটি উল্টাইয়া খাইতে জানে না। বলিল, তোবা, তোবা! ভারতবর্ষ তামা তুলসী গঙ্গাজল—গীতা গান্ধী জহরলাল তেত্রিশ কোটী সাকার নিরাকারের নামে শপথ করিয়াও "উনোকে" বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিল কি? ভারতবর্ষ এসিয়া মহাদেশের নেতা হইতে চলিয়াছে, ইংলণ্ড, আমেরিকা গায়ে পড়িয়া ভারতকে জরির পোষাক পরাইয়া নেতার সিংহাসনে না বসাইয়া ছাড়িবে না, ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা। সেই ভারতবর্ষকে "উনোর" বিশ্ব আদালতে, ফরিয়াদী হইয়াও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আত্মাপরাধ খালনে গলদঘর্ম ও প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইতে হইতেছে না? লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া বিশ্ব-বিমোহন, সর্ব্বজনমনোরঞ্জক "নদী শয্যা" রচনা করিয়াও "কি ফল লভিনু, হায় তাই ভাবি মনে।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষের যে খাতির, যে সমাদর ও সম্মান দেখা যাইতেছে, তাহাতেও যে ভারতের মান মর্য্যাদা শনৈঃ শনৈঃ স্থল-জল গগন স্থাবর জঙ্গম অতিক্রম করিতেছে, তাহাও বোধ করি না বলিলেও চলিতে পারে। কথায় কথা বাড়ে মিছামিছি। আমার তাহাতে অত্যন্ত অরুচি।

হবুচন্দ্র রাজের উপাখ্যানটি শেষ করা দরকার। হবুচন্দ্রের কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ এমন দিনও উপস্থিত হইল যেদিন হবুচন্দ্র যেদিকে চাহেন, দেখেন, সর্ষপ পুষ্প শোভায় দশদিক বিভাসিত। আবার একবার অমাত্য প্রধান গবুচন্দ্রের তলব পড়িল। গবুর পরামর্শ, ট্যাক্স বৃদ্ধি। উত্তম যুক্তি, কিছুদিন তাহাতেই চলিল; কিন্তু পৃথিবীর দ্রুত ক্রমোন্নতির সহিত সমান তালে চলিতে চলিতে, অনতিবিলম্বে রথচক্র গ্রাসিল মেদিনী। গবু এবার বড় রকমের যুক্তি দিলেন, প্রজাপুঞ্জের সঞ্চিত ও সংগৃহীত ধনে এক চতুর্থাংশ "মিশনানা" স্বরূপ আদায় করিতে পারিলে সঙ্কটমোচন হইবে। কিন্তু কাল হি বলবত্তরঃ! হায়, সেকাল কি আর আছে?

এককাল ছিল বটে যখন হবুচন্দ্র মোটর কিনিবার বাসনা

ব্যক্ত করিলে, প্রজারা হাস্যমুখে 'মোটরানা' দিত। সেদিন, হবুর যমুনাতটস্থ কদম্বকুঞ্জছায়ে মদননিকুঞ্জে প্রবীর নাচের "পরীয়ানা" সংগ্রহে কি কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইয়াছিল? হবুর পৌনে পাঁচ গণ্ডা পুত্রের অন্নপ্রাশনের ব্যয় কি "ভাতুয়ানা" দ্বারাই নির্ব্বাহ হয় নাই? রাজার আড়াই ডজন কন্যার উদ্বাহে প্রজারা কি সানন্দেই "বেটিয়ানা" আদায় দিয়া যায় নাই? হবু যতবার দার পরিগ্রহ করতঃ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃগণের দায় উদ্ধার করিয়াছেন, প্রজারা ততবারই "জরুয়ানা" (জরিমানা) দিয়া রাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। কিন্তু হায়, সে কাল কি আর আছে? গবু, প্রজার সঞ্চিত অর্থের সিকি "মিশনানা" দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, হায়, একটি সিকি পয়সাও কেহ দিল না। বলিল, কেন দিব? মিশন দ্বারা আমাদের কোন্ কানাকড়ির উপকার হইয়াছে?

রোষে, ক্ষোভে, হতাশায় বিদগ্ধচিত্ত রাজা একদা সন্ধ্যাকালে নদী-শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। নদীর রাগ নাই, অভিমান নাই, দুঃখও নাই, চিরকাল যেমন রোদ্ দেয়, সেদিনও দিল; তরঙ্গভঙ্গে বীচিভঙ্গে অন্যদিনও যেমন গীতধ্বনি উত্থিত হয়, সেদিনও তেমনই গীতিরব উত্থিত হইল, হবুচন্দ্র অচিরে নিদ্রামগ্ন হইলেন।

বৈশাখ মাস, একটু পরেই অকস্মাৎ ভৈরব হরষে কাল-বৈশাখী আসিয়া উপস্থিত। নদীর জল আকাশ স্পর্শ করিতে পারে কি না, ঢেউ উঁচু, না, তালগাছ উঁচু, এবম্বিধ চিরন্তনের দুর্ভেদ্য সমস্যাগুলির সমাধান যেন সেই দণ্ডে না করিলেই নয়, এমনই একটা গোঁ চাপিয়া গেল। রাজা এ সকলের কোন খবরই রাখেন না। তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সোনারূপায় গড়া খাটিয়ার পায়া খসিয়া পড়িল। হবুচন্দ্র সমেত রাজশয্যা খরস্রোতে ভাসিয়া চলিল—রাজা যেমন সুখনিদ্রা বিভোর ছিলেন, তেমনই রহিলেন।

বোধ করি শেষ পর্য্যন্ত নীল সমুদ্রগর্ভেই হবুচন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইলেন। খুঁজ ঝাড়িয়াও গল্পের উপসংহারের হদিস্ পাওয়া গেল না।

বিষকুম্ভ

দিলীপ দাশগুপ্ত

STUDENTS P. G. A. COMMON-ROO

পিঙ্গল জটা রঙিন হল হে মহাকাল!
প্রলয় নাচন নেচেছ একদা বিশ্বের বুকে
দম্ভভরে,
এক মুঠো সেই দম্ভের ধূলি জাল বুনে বুনে তোমার কেশ
বাজালো বাঁশি যে সর্ব্বনেশে—
তার ছায়া ঐ দুই নয়নে কি জ্বলে জ্বলে হল ছাই!
আমরা সভয়ে নীরবেই বলি:
হয়েছে বেশ।
লালনের ছলে যে-শিশুর ভালে জয়ের টিকা
দিয়েছিলে আর হেসেছিলে তুমি প্রভাতসূর্য্যে ছুঁয়ে,
সেই সূর্য্যেরই তেজে জ্বলে এই দিনের চিতা—
যে চিতার বুকে শিশু শয়ান।
শিবানী যদিও আড়ালে মোছেন নয়ন-জল,
রুধির সাগর বক্ষে ভাসায়ে বাণিজ্য পোত—
আমরা দম্ভে চীৎকার করি:
হয়েছে বেশ।
হাতের তোমার ডমরু বাজে না! বাজে কি বীণা?
যে বীণার তালে সাতসমুদ্রে আনে জোয়ার,—
হাসি ভুলে গিয়ে হানাহানি আর কর্ম্মফল
আমাদের চোখে শ্রাবণ ঝরাতে হল চতুর!
তুমি মহাকাল! কত চতুরতা করিতে জান?
তোমার দম্ভে গড়া আকাশের সিংহাসন
আনবিক ঘায়ে বিশ্বের তলে আগত ঐ!
আমরা হর্ষে বলিয়া বেড়াই:
হয়েছে বেশ।

জোচ্চোর

শ্রীরমাপতি দাস

ডাক্তার বন্ধুটি যক্ষ্মা-রোগে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তার নিজের রোগ—অবসর সময়ে সাহিত্য আলোচনা করা। সেই জন্ম আমাকেও অবসর সময়ে তার কাছে যাইতে হয়। আজকাল যখনই যাই, দেখি—ঘরভর্ত্তি লোক; কেউ নিজে রোগী, কেউ আসিয়াছে রোগীর খবর লইয়া। আগে এত ভিড় দেখি নাই। আমি হাসিয়া বলি, "ডাক্তারের আজকাল বেশ পড়তা পড়েছে দেখ্‌ছি। যক্ষ্মার এমনি মড়ক চলতে থাকলে—।" মুখ গম্ভীর করিয়া সে বলে, "চাইনে-এ-টাকা। দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।" আমি বলি, "উচ্ছন্নে যেতে বাকী আছে তা হ'লে!" চোখে মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ব্যথা নিয়ে সে বলে, "যত-রোগী আসে তার মধ্যে শিশু ও বালকের সংখ্যা কত জানো? এ রোগটা আগে বাড়তো বছরে চারগুণ; এখন যে কতগুণ বেড়ে চলেছে তার ঠিক নাই।" আমি বলি, "আর হিসেব রাখতে পারছো না বুঝি? আমি রাখতে পারি।"—"কি হ'বে? প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্ম তত দুঃখ হয় না। কিন্তু যারা দেশের ভবিষ্যৎ তাদের মধ্যে এ রোগ এভাবে ঢুকলে জাতটা টিকবে না।" আমি তারই মত মুখ গম্ভীর ক'রে বলি, "ঢুকবে না কেন? খেতে পাচ্ছে বেচারীরা? দুধ আছে দেশে?"—উত্তেজিত ভাবে সে বলে, "এদের যেমন ক'রে হোক সুস্থ রাখা উচিত। এটা আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। এর ত্রুটি হ'লে চরম প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে সবাইকে।" প্রচণ্ড হতাশার ভাব ফুটে উঠে তার মুখে। সে বলতে থাকে, "ছেলেদের মুখের দিকে চাইলে আতঙ্কে শিউরে উঠি। লালিত্য নাই, কমনীয়তা নাই, স্বাস্থ্যের দীপ্তি নাই, মুখ শুকনো, চোখ বসে যাচ্ছে, বেশীর ভাগ যকৃৎ খারাপ, গলায় গ্ল্যাণ্ড বেরিয়েছে, এরা করবে কি? পথে কয়টি দেখতে পাও স্বাস্থ্যবান বালক—যাদের মুখ দেখলে আনন্দ হয়, আশা হয়? রাজনীতির শুধু শুক্‌নো কচ্‌কচানিতে বাঁচবে এ জাতি?" আমি অপরাধীর মত তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাই। আমার নিজের তিনটি সন্তান। আপিসে পাই ৯২১; একটি ছাত্র পড়াই, ৩০১; কিছু কিছু সাহিত্যচর্চ্চা করি; তাতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই বেশী; রাত্রি জাগরণ, হাঁটাহাঁটি ও হয়রাণিই সার। ঘর ভাড়া দিয়া এই উপার্জ্জনে দু'বেলা ডালভাতের ব্যবস্থাই হওয়া কঠিন। ছেলেদের দুধ কোথা হইতে আসিবে? বলি, "বাতাস খেয়ে স্বাস্থ্য থাকবে? আমার তিনটি ছেলে, একটিকেও এক ছটাক দুধ দিতে পারি না। তা ব'লে আমার ছেলেদের রোগে ধরবে সে হ'বে না। এই বেলা ওষুধ-পত্র ব্যবস্থা ক'রে দাও।" ডাক্তার বলে, "খাদ্যের কাজ ওষুধে হয় না।" আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলি, "আমার ছেলেরা তা হ'লে—।" ডাক্তার জোরের সহিত ব'লে, "There can't be any compromise with food,—যথোচিত খাদ্য না দিলে চলবে না।" হতাশভাবে আমি চেয়ারে এলাইয়া পড়ি।

"আপনার সন্দেহ ঠিক। ছেলেটার দু'দিক ধরেছে। এই দেখুন X'Ray Plate।" চাহিয়া দেখি আমার পাশে বসিয়া আছেন এক ভদ্রলোক; পাৎলা ছিপছিপে চেহারা, কয়েক দিন-না কামানোর জন্ম মুখের দাড়ি খোঁচা খোঁচা হইয়া আছে,—কণ্ঠস্বর অতীব করুণ। ডাক্তার প্লেট ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "ব্যস্ত হওয়ার কারণ দেখি না। যে ইনজেক্‌সনের কথা বলেছি তাতে সেরে যাবে।" "কিন্তু প্রত্যেকটার ২০১ খরচ পড়বে যে, ডাক্তারবাবু! পাবো কোথায়?" "ছেলেকে বাঁচাতে হ'লে যেমন ক'রে হোক্ জোগাড় করতে হ'বে।" ভদ্রলোক-মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁর পাঁচ বছরের ছেলের যক্ষ্মারোগ হইয়াছে। আমারও শেষ সন্তানের বয়স পাঁচ বছর। শিহরিয়া উঠিলাম, চীৎকার করিয়া বলিলাম, "টাকা নাই বলে ছেলে মারা যাবে তা হতেই পারে না।"

"কোথায় পাবো? চুরি করা আইনবিরুদ্ধ। ধার কেউ দেবে না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিল, "আমার পারিশ্রমিক বাদ দিতে পারি। ওষুধের জন্ম পাঁচ ছ'শো টাকা লাগবে।"

জড়ানো সুরে সে ভদ্রলোক বলিলেন, আমার পক্ষে অসম্ভব। গিন্নীর যা দু'চারখানা গহনা ছিল তা আগেই শেষ হয়েছে।"

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে আমি বলিয়া উঠিলাম, "যেমন করে হোক জোগাড় করতেই হবে।"

ডাক্তার আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "উপায় বলে দাও। শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভিজে না।"

আমি দমিয়া গেলাম। ফাঁসির আসামীর মত সেই ভদ্রলোক চুপ করিয়া রহিলেন। পাঁচশো টাকা কোথায় পাওয়া যায়?

বিছানায় শুইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছি, ঘুম আসিতেছে না। ছেলেটা এইভাবে মারা যাবে? দুনিয়ায় ত পয়সার অভাব নাই। পয়সা লইয়া অনেকে ছিনিমিনি খেলিতেছে; তিনটি মটর গাড়ী থাকা সত্ত্বেও আরও পাঁচটি কিনিয়া গ্যারেজ ভর্ত্তি করিতেছে, সাজানো ঘর ভাঙিয়া দশগুণ খরচ করিয়া নূতন ফ্যাসনে ঘর তৈয়ার করিতেছে, ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার শোভাযাত্রা বাহির করিয়া সকলকে ভাল করিয়া জানাইয়া দিতেছে তাহাদের পুত্রের বিবাহ হইল। এই সব সাজানো বড় বড় অট্টালিকা, এত 'রং-বেরং'এর মটর গাড়ি, এত কোট প্যাণ্ট, এত চকচকে শাড়ীর ছড়াছড়ি, এত হাসিখুসি, এত ষ্টাইল, এত আদব-কায়দা। কলিকাতা নগরী ত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের পীঠস্থান। অথচ এর মধ্যে পাঁচশো টাকার অভাবে এক অসহায় শিশু যক্ষ্মারোগে—চিন্তা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। এই নূতন ইনজেকসনে অনেক যক্ষ্মারোগী নাকি সারিতেছে। কিন্তু গরীবের জন্য ইহা নয়। না খাইতে পাইয়া যাহারা এই রোগের কবলে পড়িয়াছে, কোথায় পাইবে তাহারা এত টাকা? ছেলেটা তাহা হইলে মরিবে।

অন্তর বিদ্রোহ করিয়া উঠিতেছে। কেন এরূপ হইবে? গরীব হইয়া জন্মানোর এই প্রায়শ্চিত্ত মানিয়া লইতে হইবে? শিশু বেচারার অপরাধ কি? যাহাদের এ রোগ হইতেছে তাহাদের অপরাধ কি? না খাইতে পাওয়ার জন্য এই প্রচণ্ড শাস্তি। ডাক্তার বলে, "দীর্ঘকাল শরীরকে বঞ্চিত করার জন্য ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ।" যে প্রকৃতি অসহায়ের উপর এই ভাবে প্রতিশোধ লয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা উচিত। মানুষ বেচারী পারে না, আসে যক্ষ্মারোগ। শুধু মানুষই দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া চলে না, যে যেখানে আছে প্রত্যেকে নিষ্পেষিত করিতে চায় দুর্ব্বলকে। কোন সুপরিচিত গানের সুর অনুকরণ করিয়া আমার জনৈক বন্ধু প্রায়ই শোনান:

দুর্ব্বলেরে হত্যা করো দুর্জ্জনেরে মানো।

দেখিতেছি ইহাই দুনিয়ার নীতি। প্রকৃতিও এই নিয়ম মানিয়া চলে। গরীব হইয়া জন্মানো রোধ করিতে পারে না, অথচ গরীব হইয়া জন্মাইলে যক্ষ্মারোগ দিতে পারে।

বাপ-মা'র চোখের সামনে ছেলেটি তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া অস্থিপঞ্জরসার হইবে। দিনের পর দিন যাইবে; বুকের ক্ষত ক্রমশঃ বাড়িবে, উৎকট কাশি হইবে, শ্বাসকষ্ট আসিবে, কাশির দাপটে বুকের পাঁজর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইবে, শেষে তেল ফুরাইলে প্রদীপের শিখার মত ধীরে ধীরে প্রাণ বাহির হইবে। বাপ মাকে এই দৃশ্য দেখিতে হইবে পাশে বসিয়া। উপায় থাকিতেও কিছু করিবার উপায় নাই। পাঁচশো টাকা!

ঘুম কিছুতেই আসিতে চাহে না। আজ একটু সকালেই শুইয়া পড়িয়াছি। পাশের বাড়ির রেডিওতে বাজিয়া উঠিল—

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং—

মন দিয়া গানটা শুনিতে লাগিলাম। এত মন দিয়া বুঝি কখনও শুনি নাই। গান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমি তন্ময় হইয়া আছি। মনে মনে কল্পনা করিলাম ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র,—তাহার মধ্যে আমাদের সকলের মা। হিমালয় হইয়াছে তাঁহার কিরীট, নীল সিন্ধু ধোয়াইয়া দিতেছে তাঁর পা, মৃদুমন্দ বাতাসে উড়িতেছে তাঁর শ্যামল অঞ্চল। মনে হইল এ মূর্ত্তি জীবন্ত। মা হাসিতেছেন; বহুদিনের শৃঙ্খল আজ

অপসারিত হওয়ার জন্ত বোধ করি বেশী করিয়াই হাসিতেছেন। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ সে মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল,—ভাসিয়া উঠিল তাহার স্থানে একটি কঙ্কালসার শিশুর মূর্ত্তি। মনে হইল এ যেন প্রেতের সন্তান; বহুকষ্টে হাত-পা ছুঁড়িতেছে আর করুণ সুরে চীৎকার করিতেছে 'ম্যায় ভুঁখা হুঁ।' আর একটি; তারপর আর একটি। ক্রমে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল অসংখ্য এইরূপ মূর্ত্তি,—সকলেই কঙ্কালসার ও মর্ম্মভেদ সুরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, "ম্যায় ভুঁখা হুঁ।" দুই হাত দিয়া চোখ বন্ধ করিলাম; অজ্ঞাতসারে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "সর্ব্বনাশ।" গৃহিণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; জোরে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "স্বপ্ন দেখ্‌ছো বুঝি? চীৎকার ক'রো না,—ঘুমোও।"

মন বড় বিগড়াইয়া গেল। এই দেশ সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা, অথচ এখানে শিশুমেধ ও নরমেধ যজ্ঞের এই উৎকট অনুষ্ঠান চলিতেছে। কেবল মনে পড়িতে লাগিল ডাক্তারের কথা, "ভবিষ্যৎ অন্ধকার।" এ জাত বাঁচিবে কি করিয়া? যাদের লইয়া জাতি, তাদের রূপ যদি হয় এই, আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি? নিজের প্রতি একেবারে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমার ছেলেদের অন্তরাত্মাও ঐ কঙ্কালদের মত চীৎকার করিতেছে, "ম্যায় ভুঁখা হুঁ।" মা, তুই যে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা! কিন্তু তবে কেন এমন হয়?

ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের সঙ্গে মাথার মধ্যে করিতেছে দপ্ দপ্। ক্ষিপ্ত নদীর স্রোতের মত ধমনীর ভিতর উদ্দাম গতিতে আরম্ভ হইয়াছে রক্ত চলাচল। আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়া আছি অস্ত্রোপচারের টেবিলে রোগীর মত। এ জাতটা ধ্বংস হইয়া যাইবে? এত ত্যাগ, এত আত্মবলিদান, এত বুটের ঠোক্কর ও পুলিশের লাঠি সওয়া, হাসি মুখে ফাঁসিতে ঝুলিয়া পড়া!—সব বৃথা হইবে? অথচ এমন ত ছিল না।

কল্পনার চোখে দেখিবার চেষ্টা করিলাম সবুজ ঘাস, ফুল ও ফলে ভরা একটি সুন্দর বাগান,—তাহার মধ্যে ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে; কেহ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কেহ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে ও হাততালি দিতেছে, কেহ ফলের গাছের নীচে গিয়া হাত বাড়াইতেছে, ফল আপনি আসিয়া তাহার হাতে পড়িতেছে; কেহ পাত্র লইয়া গরুর বাঁটের নীচে ধরিতেছে, গরু দুধ দিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেছে। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রত্যেক শিশু একটি মূর্ত্তিমান আনন্দ। অদূরে দাঁড়াইয়া মা,—মুগ্ধনেত্রে শিশুদের দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ সমস্ত ছবিটা জীবন্ত হইয়া উঠিল; আমি যেন অভিনয় দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল কতকগুলি লোক বাঁকে করিয়া ভিতর হইতে দুধ লইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; মা তাদের সামনে গিয়া বাধা দিলেন।

মা—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো এ সব?

সামনের লোক—আজ্ঞে, মা ঠাকরুণ, দুধ তোয়ের করতে।

মা—এই ত দুধ। এথেকে আবার দুধ তোয়ের করবে কি?

সেই লোক—এতে কিছু বকাল আর তিনগুণ জল মিশিয়ে জাল দিলে হ'বে দুধ। তা খেলে হজম হ'বে, গায়ে বল হ'বে। এতে পেটের অসুখ হয়।

মা—পেটের অসুখ হ'বে কেন? আমার ছেলেরা বরাবর এই খেয়ে মানুষ। তোমরা নিয়ে যেয়ো না তাদের খাওয়ার দুধ তাদের মুখ থেকে ছিনিয়ে।

অন্য একজন—চল, চল। মেয়ে মানুষের কথা শুনলে চলবে না। (মা'র প্রতি বড় বড় চোখ বাহির করিয়া) কেন নিয়ে যাবো না, শুনি? এক সের দুধ চার সের হ'বে, এক টাকায় চার টাকা হ'বে। দেবে তুমি?

মা—(কাঁদ-কাঁদ ভাবে) আমার ছেলেদের মেরে টাকা নেবে তোমরা? সহ্য হ'বে?

সেই ব্যক্তি—(হাত নাড়িয়া) অত খুঁৎখুঁতে মন আমাদের নয়। সব সহ্য হ'বে। টাকা পেলে জুতো-লাথি, ঝাঁটা পর্য্যন্ত সইবে। তোমাদের মেয়ে জাতের বুদ্ধি!

মা—(কাতর কণ্ঠে) নিয়ে যেও না। মেয়ো না আমাদের ছেলেদের এ ভাবে।

সেই ব্যক্তি—(শ্লেষের সুরে) তোমার ছেলেরা মরলো আর বাঁচলো আমাদের কি? (সঙ্গীদের প্রতি) চল্-চল্—

সকলে চলিয়া গেল। মা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বস্তা মাথায় করিয়া আরও কতকগুলি লোক তাড়াতাড়ি দরজার দিকে আসিল। মা ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মা—এতে কি আছে, বাবা?

তাহাদের একজন—চুপ। চাল আছে।

মা—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

সেই ব্যক্তি—চোরা বাজারে। কাউকে ব'লো না।

মা—আমার ছেলেরা খাবে কি?

সেই ব্যক্তি—গাছের পাতা খাবে, ঘাস খাবে। আমাদের দু'পয়সা চাই। তোমাকেও না হয় কিছু দেবো। গোলমাল ক'রো না।

মা—আমার ছেলেরা যে মরে যাবে।

সেই ব্যক্তি—থোড়োর, তোমার ছেলেদের কিছু বলেছে! হয় কেন? না হ'লে, মরতো না। আমাদের টাকা চাই।

মা—এখন যা পাবে আমার ছেলেরা বড় হয়ে তার বিশগুণ দেবে।

সেই ব্যক্তি—(ব্যঙ্গের সুরে) বড় হোক; আমরা ততক্ষণ ঘুরে আসি। তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মা—(করুণভাবে) যেও না। নিশ্চয় দেবে আমার ছেলেরা।

সেই লোকটি—(অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া) আমরা সেই আশায় থাকি আর কি। কোথাকার ক্যাপা মেয়ে। (আগাইয়া গিয়া আবার পিছাইয়া আসিয়া) ভাখো, তোমার ছেলেদের মিষ্টি কিনে দিও। কাউকে ব'লো না যেন।

তাড়াতাড়ি কতকগুলি নোট মা'র হাতে গুঁজিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আর সকলে তাহার পিছনে ছুটিল। হতবুদ্ধি মা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পরে বস্তা মাথায় করিয়া আরও কতকগুলি লোক প্রবেশ করিল। মা এবারে ক্ষিপ্তভাবে পথ রুখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "খবরদার! এ-সব কিছুতেই নিয়ে যেতে পাবে না।" "ও-বাবা!"—তাহারা থাব-ড়াইয়া গেল। হঠাৎ নজর পড়িল হাতে গোঁজা নোটগুলির উপর। "তাই বলো।" হাতে আরও কতকগুলি নোট গুঁজিয়া দিয়া তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। একজন পিছন ফিরিয়া বলিয়া গেল, "কাউকে ব'লো না যেন।" মা করুণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কম্পমান হাত হইতে নোটগুলি পড়িয়া গিয়া বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। বজ্র ডাকিয়া উঠিল কড়্-কড়্-কড়্, বাগান কাঁপিয়া উঠিল। শিশুরা অতর্কিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা!"

গৃহিণী আবার ধাক্কা দিলেন। আমি না কি "মা" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি। বেকুবের মত ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে পড়িয়া আছে শিশুদের কঙ্কাল। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারও প্রায় তদ্বৎ। ফুল ফল প্রভৃতির গাছ নিষ্পত্র হইয়া মরার মত পড়িয়া আছে। কতকগুলি লোক জীবন্মৃত শিশুদিগকে ভাতের ফেন বিতরণ করিতেছে। জনৈক যুবক একটি গাড়িতে চারিদিক হইতে কঙ্কাল কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় জমা করিতেছে। জনৈক ভুঁড়ি-মোটা ব্যক্তি কঙ্কাল স্তূপের সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ভুঁড়ি-মোটা-ব্যক্তি—বাবুজি, হমকো দে দিজিয়ে।

যুবক—কি দে দিজিয়ে?

ভুঁ-মো-ব্য।—যেৎনা হড্ডি হয় সব দে দিজিয়ে।

যুবক—কেন?

ভুঁ-মো-ব্য। হম লেগা। আপকো মুনাফা দেগা।

যুবক—হড্ডি নিয়ে মুনাফা দেবে?

ভু-মো-ব্য।—জরুর দেগা। রূপেয়া নহি দেকে হমলোক কাম নহি করতা হয়।

যুবক—তা বেশ। যে-গুলো বেঁচে আছে সে-গুলোও নেবে ত'?

ভুঁ-মো-ব্য।—জিল্লা নহি লেগা, বাবুজি। হড্ডিকো কাম হামারা; হড্ডি দেনা।

যুবক—নিয়ে যাও। আজ যেগুলো এখনও একটু নড়ছে কাল সে-গুলো অচল হড্ডি হবে। একেবারেই ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। কত দেবে?

ভুঁ-মো-ব্য।—(পকেট হইতে এক বাণ্ডিল নোট বাহির করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিয়া) লিজিয়ে।

যুবক—(নোটগুলির দিকে তাকাইয়া) হাড়ের বদলে কাগজ, কাগজের বদলে হাড়?

ভুঁ-মো-ব্য।—কাগজ নহি বাবু। এক একটো এক্‌শ' রুপেয়াকা নোট।

যুবক—(আনমনে) যারা এই মাটিতে জন্মেছিল, এই মাটির অন্নজলে পুষ্ট হ'য়ে যারা হ'তে পারতো ভবিষ্যতের গৌরব, তারা অকালে শুকিয়ে গেল। আজ তাদেরি কচি হাড় নিতে এসেছে কতকগুলো কাগজ দিয়ে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ভুঁ-মো-ব্য।—হাসতেঁ হেঁ কাঁহে, বাবুজি?

যুবক—আচ্ছা, কচি হাড়ে খুব ভাল সার হয়, না?

ভুঁ-মো-ব্য—বহুৎ আচ্ছা হোতা হয়, বাবু। উসসেই ত উলোক লেতা হয়।

যুবক—ভিটামিন্ জানো? এতে ভিটামিন আছে খুব। দেশে কুকুরও নেই যে এগুলো চিবিয়ে খায়। (আনমনে) এই স্তূপের মধ্যে কত রবীন্দ্রনাথ, কত প্রফুল্লচন্দ্র, কত জগদীশ, কত সুভাষ সমাধিস্থ হয়ে আছে কে জানে? যে মায়ের কোলে এরা জন্মেছিল সে অভাগী এদের দুটো খেতে দিতে পারলো না। বেচারীরা মরে গেল। আজ এসেছে ভুঁড়ি মোটা ব্যবসাদার তাদের হাড় কিনতে কতকগুলো কাগজ দিয়ে! (নোটগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) যাও এখান থেকে, যাও এখান থেকে, —যাও—

ভুঁ-মো ব্য।— (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া) আয় দাদা! হমারা এৎনা রুপেয়া—

যুবক—যাও এখান থেকে,—বেরোও। ব্ল্যাক-মার্কেটিং করতে এসেছ এখানে? হড্ডির কনট্রোল হয়েছে জানো? ধরিয়ে দেবো এখনি।

ভুঁ-মো-ব্য।—(শঙ্কিতভাবে দাঁড়াইয়া) হড্ডিকা কনট্রোল! আয় দাদা! হামারা এৎনা রূপ—

যুবক—আবার! বেরোও—

(ভুঁড়ি-মোটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।)

হায় রে দেশ! ম'রে এখানে হাড় ক'খানাও জিরোতে পায় না।

অ্যালার্ম ঘড়ি বাজিয়া উঠিল ক্রিং ক্রিং ক্রিং। বড় ছেলের পরীক্ষা; তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইবে। এতক্ষণ ক্লোরোফর্মের অধীনে থাকিয়া এবারে যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। মাথার অণুপরমাণুগুলো সব নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। একটা প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ছিন্নপত্র ডালপালাভাঙা গাছ দাঁড়াইয়া থাকে চুপ করিয়া একটা তুমুল যুদ্ধের সাক্ষ্যস্বরূপে; যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম, মনে হইল—আমি এইরূপ একটি গাছ। ছেলেকে ঘুমাইতে বলিলাম; স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া পড়িয়া কি হইবে? একটু ফরসা হইলেই বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যাইব কোথায়? সে ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা কিছুই জানি না; শুধু জানি তাঁর পাঁচ বছরের ছেলের যক্ষ্মারোগ হইয়াছে। পথে এলো-মেলো ভাবে খানিক ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কোথাও পাই নাই। অনেকের দুয়ারে গিয়াছি। কেহ মুখ গম্ভীর করিয়াছে, কেহ বিব্রতভাবে মাথা চুলকাইয়াছে, কেহ সমবেদনা জানাইয়াছে; প্রায় সকলেই বলিয়াছে, দিতে পারিলে খুব আনন্দিত হইত। কিন্তু কেহ দেয় নাই। বড় চাকুরিজীবী, বড় ব্যবসাদার, নামডাকওয়ালা পুঁজিপতি, অনেকের কাছে অফিস কামাই করিয়া ধন্না দিবার চেষ্টা করিয়াছি; কোথাও দর্শন পাইয়াছি, কোথাও পাই নাই। যেখানে দর্শন পাইয়াছি, দর্শনী পাই নাই। এলোমেলো ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি অমসৃণ জায়গায় বেকায়দায় ঘোরানো লাট্টুর মত। শেষে চুপ করিয়া গিয়াছি। সাহস করিয়া অনেক দিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই।

একদিন গিয়া হাজির হইলাম। ছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ডাক্তার জানাইল শিশুটির অনেকগুলি ইন্‌জেক্‌সন্ হইয়া গিয়াছে,—এখন ভাল আছে। টাকা তাহা হইলে জোগাড় হইয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া ডাক্তার বলিল, "হয়েছে বৈ কি।" কিন্তু এমনভাবে কথাটা বলিল যে, আমার স্পষ্ট মনে হইল—ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। ডাক্তার একটু বসিতে বলিল। এক ভদ্রলোক আসিলেন, নাদুস-নুদুস চেহারা, ঘাড়ে এত চর্বি জমিয়াছে যে সমস্ত শরীরটা না বাঁকাইলে ঘাড় বাঁকে না, ভুঁড়ি উদরপাতে। দেখিয়াই মনে হইল বেশ শাঁসালো লোক। ডাক্তার তাঁহাকে সযত্নে একটি ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া কি খাওয়া হইতেছে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, দু'বেলা চারখানি করিয়া পাৎলা রুটি ও কিছু শাক সিদ্ধ। "তিনখানা খেলে অসুবিধে হবে?" ভদ্রলোক করুণ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার চারখানি খাইতেই অনুমতি দিল। শ্রদ্ধা সহকারে তিনি ফি ও কুড়িটাকা ঔষধের দাম দিয়া গেলেন। পরে ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিল, "ইন্‌জেক্‌সন্ ত ঘোড়ার ডিম,—শুধু রি-ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার। ওষুধ হচ্ছে কম খাওয়া। এই কুড়িটাকায় ছেলেটার ইন্‌জেক্‌সন্ হ'বে।" আমি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম, অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলাম, "তুমি একটা পাকা জোচ্চোর।"

জিজ্ঞাসা

পরিমল মুখোপাধ্যায়

STUDENT COMMON-R P.G.A

মুখর মনের মাটি:
মননের বিক্ষুব্ধ বীজাণু
জন্ম দেয় অন্তর্লীন লাল মহীরুহে।
উত্তরের বেপথু নক্ষত্র,
মেরুর রুক্ষতা হতে দৃষ্টি হানে জিগীষায়।
সমুদ্র-মেখলা পৃথ্বী উদ্বেল উত্তাল—
আশ্বাসের ব্যর্থ নির্মোকেরা
পিরামিড-চূড়া থেকে ঝড়ে উড়ে যায়,
উদ্‌ঘাটন চূড়ান্ত সত্যের।
দিগন্তবিসারী আলো
মৃগয়ার অন্বেষণে ঘোরে—
নিষ্ঠুর মৃগয়া।
শ্রমলব্ধ শিকারেরা
সুপাচিত খাদ্য হয়ে
বিলাবে কি সাম্যের আস্বাদ?
জীবনের প্রতি কোষে
লাল রক্তকণিকার তরংগ-রণন্
শান্ত হবে নবমন্ত্রে!
এবণার ইথারে ইথারে
তাই বুঝি জেগে রয়
উদ্দেজিত মানসের বিদ্রোহী জিজ্ঞাসা!

গুপ্ত পত্রাবলী
দুইটী প্রাণীর গোপনীয় পত্রাবলী। ৫০খানি পত্রে প্রেম ও প্রণয়ের দুর্লভ সংগ্রহ। অল্প কয়েকখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আজই অর্ডার দিন, মূল্য ২, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রেম চক্কর, অমৃতসর।

কুয়োমিনটাঙ আর কমিউনিষ্ট কারা?

ওঙ্কারনাথ গুপ্ত

মাস কয়েক আগে মাদাম চিয়াং কাইশেক আমেরিকা গিয়েছিলেন।

খবরটা বড় বড় হরফে আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলিতেও উঠেছিল, মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতেও উঠেছিল। কিন্তু খবরটাকে নিয়ে দু'দেশের সাংবাদিক মহল যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ দু'রকমের। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাগজেই দেখেছি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসের শব্দ—যাক্, এবারে আর শুধু দূর থেকে অর্থ-শস্ত্র দিয়ে নয়, মাদামের দৌত্যের ফলে শ্যামখুড়ো নিজেই নেমে পড়বেন ফুটো জাহাজ কুয়োমিনটাঙকে রক্ষা করতে। কিন্তু মার্কিন সাংবাদিকেরা শুধু ঠোঁট উল্টেছিলেন আর কার্টুন আঁকিয়েছিলেন; এবং সে-কার্টুনগুলোর মূল বক্তব্য যা' ছিল, তাকে বাংলায় ভাষান্তরিত করলে অনেকটা এই রকম শোনাবে—'আমার এই রিক্ত ডালি।'

আপাতজ্ঞানে ব্যাপারটা শুনতে একটু আশ্চর্য্যই লাগে। আমাদের কাগজগুলির একটুখানি ভুল হয়েছিল—তাঁরা কুয়োমিনটাঙ, রঙ্গমঞ্চের আদৎ খবর রাখেন নি, মার্কিন জাতটাকেও চেনবার চেষ্টা করেন নি। আমেরিকানরা জাত-জুয়ারী, আগে থেকে ঘোড়ার নাড়ী-নক্ষত্রের সব খবর না নিয়ে ওরা বাজি ধরে না। কুয়োমিনটাঙের তাসের ঘরের ভিৎ যে কমিউনিষ্টদের গত শরৎকালীন পাল্টা আক্রমণের ধাক্কাতেই ধ্বসে গেছে, এটা আমেরিকা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে নিয়েছে। মার্কিন জাতটা রিয়ালিষ্ট, উপ্‌চেপড়া দুধ নিয়ে বুক চাপড়ানো ওদের স্বভাব নয়। চীনের ব্যাপারে আমেরিকার সাম্প্রতিক মৌনতার কারণও হল এই।

দীর্ঘশ্বাসে মুখর তবু আমাদের কাগজগুলি। চীনের ঐতিহ্য গেল, সংস্কৃতি গেল, প্রাতঃস্মরণীয় সান ইয়াৎ সেনের পবিত্র প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে কলঙ্কিত করে দিল বিজাতীয় বেইমান কমিউনিষ্টরা, এমনি সব খেদোক্তিতে আমাদের কাগজগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি রুদ্ধকণ্ঠ। আবার একটুখানি ভুল, 'কমিউনিষ্ট' নামটাতেই সম্ভবতঃ আমাদের কাগজওলারা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান মন্ত্রী স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে যা বহুবার বলেছেন, তার দুটো মোটা কথা আমাদের সর্ব্বথা মনে রাখতে হবে ভারত তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত শিবির দুটোরই থেকে শত হস্তের তফাৎ থাকবে এবং এশিয়ার কোনো মাটিতেই সাম্রাজ্য-বাদের কোনো ভূমিকাকে ভারত সহ্য করবে না। আমাদের তো মনে হয়, আমাদের কাগজওলারা কমিউনিষ্ট নামাতঙ্কে কুয়োমিনটাঙের জন্য যে খেদোক্তি করছেন, তাতে পণ্ডিতজীর নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিকে অবমাননাই করা হয়েছে।

কথাটা আরো কিছু স্পষ্ট করে বুঝতে হলে আমাদের খুঁটিয়ে জানা দরকার—আধুনিক চীনের রাজনীতি-রঙ্গের কোন্ দলের কী স্বরূপ। কুয়োমিনটাঙ এবং কমিউনিষ্ট এ-দু'পক্ষ কারা? কে কোন্ আদর্শের অনুসারী আর কাদের তারা দোসর? এমন কিছু দুর্জ্ঞেয় নয় প্রশ্নগুলির উত্তর। আধুনিক চীনের যে-কোনো ইতিহাসেরই একটুখানি পিছনের পৃষ্ঠাগুলিতে উত্তরগুলি স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে; দুর্জ্ঞেয় হচ্চে আমাদের কাগজওলারা কেন এ-পৃষ্ঠাগুলি খুলে দেখেন নি, সেই রহস্য।

১৯১২ সাল। শতাব্দী-জীর্ণ রাজতন্ত্রকে সমূলে বিধ্বস্ত করে সান্ ইয়াৎ সেন চীনের দক্ষিণাংশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। এশিয়ার মাটিতে এই প্রথম সফল গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লব বস্তুটা আকস্মিক নয়, অলঙ্ঘ্য ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই তার আত্মপ্রকাশ। ইতিহাসের নিয়ম নয় কোনো অনাচারকে অতি দীর্ঘদিন ধরে পুষ্ট হতে দেওয়া। বর্দ্ধিষ্ণু অনাচারের সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে ভেঙ্গে ফেলবার উপাদানও ইতিহাস সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে নিজের গর্ভে সৃষ্টি করে তোলে। কিন্তু চীনে অনাচার হচ্চিল একা রাজতন্ত্রেরই তরফ থেকে নয়, বিভিন্ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিও তখন মাঞ্চু রাজবংশকে দুর্ব্বল দেখে

চীনকে নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছিল। চীন প্রজাতন্ত্রের জনক সান্‌কে এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধেই আজীবন লড়াই করতে হয়েছে।

কিন্তু সান্‌-এর আদর্শের এর চেয়েও বড় শত্রু ছিল 'তুচুন'রা। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরও তেরো বছর তিনি চীনের গণতন্ত্রী জনতার সেবা করেছিলেন—কিন্তু এই 'তুচুন'দের শত্রুতায় এই তেরো বছরের মধ্যে একদিনও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। আগেই বলেছি, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র চীনের দক্ষিণাংশে, উত্তর চীনের মালিক ছিল ঐ 'তুচুন'রাই; এরাই চীনের জনসাধারণের দুর্ভাগ্যকে বরাবর কায়েম করে রেখেছে। প্রকৃতিতে এবং স্বরূপে 'তুচুন'রা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের ফিউডাল নায়কদের মত। আমাদের দেশের দেশীয় নৃপতিদের সঙ্গেও এদের কিছুটা মিল আছে—বিরাট এক একটা ভূখণ্ডের মালিক এরা। সকলেই একটা করে বড় সেনাবাহিনী পোষণ করতো। সান ইয়াৎ সেনের প্রবর্তিত আদর্শের প্রেরণায় তাদের প্রজারাও ক্রমশঃ অধিকার-সচেতন হয়ে উঠছিল, এটা তাদের পক্ষে সুনজরে দেখবার জিনিষ নয়। প্রজাতন্ত্রকে ভাঙবার জন্তে তাই এরা নানাদিকে আঘাত হেনেছে। কিন্তু সানের জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁর দীক্ষিতরা 'তুচুন'দের সকল আঘাতই প্রতিরোধ করেছে।

১৯২৫ সালে সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হল। সান তাঁর প্রজাতন্ত্রকে খুব বেশী বিস্তৃত করে যেতে পারেন নি অবশ্য, কিন্তু জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সুস্থ জীবনাধিকারের এই তিনটি অজেয় আদর্শকে[১] তিনি তাঁর অনুগামী এবং সমগ্র চীনের অনাচার-পীড়িত অগণন গণসমাজের চিত্তে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে সান ঠিক সোস্যালিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু নতুন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের সাফল্য দেখে তিনি সে আদর্শকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি বুঝেছিলেন—চীনের বুভুক্ষু ও অশিক্ষিত গণসমাজের উন্নতিবিধানের জন্তে তিনি যে জীবন-পণ ব্রত গ্রহণ করেছেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-ব্যবস্থা ছাড়া সে-ব্রত সফল হবার নয়। এই জন্তেই একজন বিচক্ষণ সোস্যালিষ্ট অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞকে তিনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ধার নিয়ে প্রজাতন্ত্রের উপদেষ্টাপদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সোভিয়েট বিশেষজ্ঞটির নাম বোরোদিন্‌। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা উল্লেখনীয়, চীনে ইতিমধ্যে (১৯২০ সালে) খুব ক্ষুদ্রাকারে 'কুঙ চানটাঙ' অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েটের সাফল্যে চীনের নতুন ছাত্রসমাজ কমিউনিজম এর প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ১৯২৭-এর প্রতি-বিপ্লব অবধি তেমন কোনো পৃথক সত্তা চীনে এ-পার্টির ছিল না। সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনটাঙ[২]-এরই একটি অভিন্ন শাখা হিসেবে এ-পার্টি প্রজাতন্ত্রের সেবা করেছে।

সানের মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্রের সব চেয়ে বড় শত্রুপক্ষ উত্তরের 'তুচুন'রা ভাবলে, এইবার প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হবে। তাদের এ অনুমান ব্যর্থ হ'ল যেমন, তেমনি আবার একদিক দিয়ে সফলও হল। ব্যর্থ হল যেমন করে আগে সেই কথা বলা যাক। সানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রজাতন্ত্র উত্তরাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রজাতন্ত্রের এই যুদ্ধ পৃথিবীর সামগ্রিক গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, সানের প্রবর্তিত আদর্শ উত্তর-চীনের প্রজাসাধারণকেও উদ্বুদ্ধ ও অধিকার-সচেতন করে তুলেছিল—এবারে রিপাব্লিকান স্বেচ্ছাসৈন্তরা যখন তাদের শাসকগোষ্ঠীর এক একটা জমিদারি আক্রমণ করতে লাগলো, 'তুচুন'দের প্রজারা তাদের সেই আক্রমণকে ঈশ্বর-প্রেরিত বরের মত ক'রে গ্রহণ করল। শাসকদের হয়ে কেউ একটি অস্ত্র গ্রহণ করল না, একটার পর একটা তুচুন-অধিকৃত প্রদেশ বিনা প্রতিরোধে রিপাব্লিকের অন্তর্ভুক্ত হতে

১। সানের Three Principles – Nationalism, Democracy and Livelyhood.

২। ১৮৯৪ সালে সান ইয়াৎ সেন তাঁর পার্টি গঠন করেছিলেন। তখন পার্টির নাম ছিল 'চীন-পুনরুজ্জীবন পরিষদ'; ১৯১১-র বিপ্লবের সময় তিনি পার্টির নাম পাল্টে নাম রাখেন 'কুয়োমিনটাঙ' অর্থাৎ 'চীন জাতীয় পরিষদ'।

লাগলো—এমনি করে প্রায় অর্দ্ধেকের ওপরেও চীনে প্রজাতন্ত্র বিস্তৃত হয়ে গেল।

'তুচুন'দের আশা সফল হল কী করে, এবারে সে কথা। আমাদের উপস্থিত আলোচনায় এই কথাটাই মুখ্য।

চীন দেশটা যে প্রধানতঃ কৃষিজীবী, আশা করি এই কথাটা আমাদের পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে। পৃথিবীর সবদেশেরই কৃষিজীবী সমাজের একটা খুব বড় অংশ হল মধ্যবিত্তধারী জমিদার সম্প্রদায়, চীনেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এই সব মধ্যবিত্তধারী জমিদারেরা তাদের অনিবার্য্য আর্থ-নৈতিক প্রকৃতির জন্যেই কখনও বিত্তহীন গণ-সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। কিন্তু তবু চীনের মধ্যবিত্ত-ধারী জমিদারেরা কুয়োমিন্‌টাঙ পার্টিতে যোগ দিয়ে-ছিলেন। দেশের বিত্ত ও ভূমির অধিকাংশই ছিল কতি-পয় তুচুনদের ভোগাধিকৃত, এই জন্যেই তাদের প্রতি মধ্যবিত্ত জমিদারেরা ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের সহায়তায় সামন্ত নায়ক তুচুনদের বিধ্বস্ত করে তাদের জমিগুলি প্রজাদের অছিগিরি করার ছুতোয় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবেন, সানের পার্টিতে যোগ দেওয়ার মূলে এই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের এই অপ-উদ্দেশ্য পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন সান ইয়াৎ সেন নিজে আর তাঁর মৃত্যুর পরে তার প্রকৃত মন্ত্রশিষ্যরা। কুয়োমিন্‌টাঙ পার্টিতে সানের এই শিষ্যরা ছিলেন বামপন্থী, ক্ষুদ্র কমিউনিষ্ট পার্টিও এই বামপন্থী দলে ক্রমেই শক্তিমান হয়ে উঠছিল। সানের মৃত্যুর পরবর্ত্তী আন্দোলনে বামপন্থীদেরই প্রভাব বৃদ্ধি পেতে লাগলো। চীনের নতুন ছাত্র সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ জনগণ সবাই দলবেঁধে দাঁড়াতে লাগলেন তাদের পিছনে। কুয়োমিনটাঙ-অধিকৃত চীনে চারিদিকে নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হতে লাগলো।

দক্ষিণ-পন্থী এবং তাদের সুহৃদরা সভয়ে দেখলেন, প্রলয় গতিতে তাদের সর্ব্বনাশ এগিয়ে আসছে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র চীনের মাটিতে দৃঢ়মূলে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে। আত্মরক্ষার জন্যে এখন থেকেই প্রত্যাঘাত না করলে তাদের অস্তিত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশে যাবে সর্ব্বহারা গণ আকাঙ্খার স্রোতে। গোপনে গোপনে তারা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলেন।

১৯২৭ সাল। এই বছরের প্রায় গোড়া থেকেই বৃটীশ বণিকদের সঙ্গে নানা খুঁটিনাটি নিয়ে কুয়োমিনটাঙ সরকারের কিছু ঝগড়া হচ্ছিল। রিপাব্লিক ইতিমধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেছে, কুয়োমিনটাঙের দক্ষিণপন্থী নেতারা তাই প্রস্তাব করলেন যে, এবারে বিদেশী শক্তিদের কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার, বর্ব্বর সাম্রাজ্য-বাদীরা একবার দেখুক যে, চীনের মাংস আর এত নরম নেই যে যখন তখন খুসীমত সেখানে দাঁত বসান চলবে। তাঁরা স্থির করলেন যে, চীনস্থ বৃটীশ অধিকারের প্রধানতম বন্দর সাংহাই কুয়োমিনটাঙ বাহিনী আক্রমণ করবে। তখন কুয়োমিনটাঙ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক হচ্ছেন চিয়াং কাইশেক, সাংহাই আক্রমণ প্রস্তাবের নেতৃত্ব করলেন তিনিই। বোরোদিন কিন্তু এ-প্রস্তাব অনুমোদন করতে চাইলেন না; তিনি বললেন, প্রবলপ্রতাপান্বিত বৃটীশের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ করার সময় কুয়োমিনটাঙের এখনও হয়নি, এত শক্তি অর্জ্জন করেনি চীনের প্রজাতন্ত্র। বাম-পন্থীরাও সেই কথাই বললেন। কিন্তু চিয়াং কাইশেক এবং দক্ষিণপন্থীরা কানেই তুললেন না সে কথা;—২২শে মার্চ্চ চিয়াং তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সাংহাইয়ের দিকে অগ্রসর হলেন।

মাত্র দু'দিন পরেই দিবালোকের মত স্পষ্ট বোঝা গেল চিয়াংএর সাংহাই আক্রমণের উদ্দেশ্য। সাংহাইয়ের পর চিয়াংএর বাহিনী নানকিংও আক্রমণ করলো। নানকিং ছিল প্রজাতন্ত্রেরই আরেকটি বড় ঘাঁটি—চিয়াং সেখানে নতুন করে এক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করলেন, অর্থাৎ সোজাসুজি নিজের গভর্ণমেণ্টেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তিনি। এই সময়ে চিয়াং আরও কি কি করেছিলেন সেই কথাটি আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুবাদের ভাষায় বিবৃত করছি—

"Having rebelled against his own government at Hankow, Chiang now made war on communis s left-wingers and trade union workers. The very workers who had made it easy for him to take

Shanghai and had welcomed him joyously there, were now hunted out and crushed. Large numbers of people were shot down or beheaded, thousands were arrested and imprisoned. The freedom that the nationalists were supposed to have brought to Shanghai was soon converted into a bloody terror." (Glimpses of World History)

বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী এবং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে পণ্ডিতজীর ওই 'bloody terror' চিয়াং চীনে বরাবরই চালিয়ে এসেছেন, একদিনের জন্যেও যে তার ব্যতিক্রম হয় নি, সে কথার নজির আরও আমরা পাব।

লক্ষ লক্ষ চৈনিক জনগণের সহায়তায় এবং নিজের জীবনপণ সাধনায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে মহান সৌধটি গেঁথে তুলেছিলেন সান ইয়াৎ সেন, তা যে এত অকস্মাৎ তাঁর দলেরই একজন এমন করে ভেঙে দিতে পারে, সানের মন্ত্রশিষ্যরা সেজন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও সানের এ আদর্শের পতাকাকে রক্ষা করবার জন্যে কুয়োমিনটাঙের বামপন্থীরা হাংকাও থেকে প্রথম ক'দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিয়াং ষড়যন্ত্র করেছিলেন উত্তরের তুচুনদের সঙ্গে, তাদের সৈন্যেরা যখন পিছনদিক থেকে আক্রমণ করল, তখন বামপন্থীদের সে প্রতিরোধ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চিয়াং কাইশেক অল্পকালের মধ্যেই চীনের জমিদার, ব্যবসাদার আর 'তুচুনদে'র সহযোগিতার প্রায় সমগ্র চীনেরই ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসলেন এবং শুনতে আশ্চর্য্য লাগে, তাঁর দলের এবং গভর্ণমেণ্টেরও তিনি নাম রাখলেন কুয়োমিনটাঙ।

কিন্তু পর্য্যুদস্ত করা গেল না কমিউনিষ্টদের হাংকাওতে বামপন্থী কুয়োমিনটাঙ ভেঙে যাওয়ার পর তারা পিছু হটে চীনের অভ্যন্তরে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সব বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্র থেকে তারা চীনের জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করতে লাগল, শুধু বক্তৃতায় নয়, সক্রিয়ভাবে চিয়াংএর সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যে সব স্থান দুর্গম, কমিউনিষ্টরা চীনের সেই সব পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের নিজেদের সমাজতন্ত্রী সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করল। তারপর সেইখান থেকে গোরিলা প্রথায় যুদ্ধ করে তারা চিয়াংএর রাজত্বের মধ্যেও ঢুকতে সুরু করে। বাইশ বছর ধরে এইভাবেই ওরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য চিয়াংএর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

চিয়াং কাইশেকের প্রচার-যন্ত্রগুলি এবং তাদের বহির্জাগতিক সহানুধ্যায়ীরা ক্রমাগত পৃথিবীবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, চাইনিজ কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের জাতীয় স্বার্থের, গণস্বার্থের শত্রু। কিন্তু চীনের এই শত্রুরাই বাইরের কারো কাছে বিন্দুমাত্র সাহায্য না নিয়ে কেমন করে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই সামান্য একটা জেলার পরিধি থেকে তাদের প্রভাবকে চীনের এক-ষষ্ঠাংশ গণসমাজের মধ্যে বিকীর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল, এ কথা সে প্রচারযন্ত্রগুলি একবারও প্রকাশ করে নি।

শুধু কি তাই, জন্মের প্রায় প্রথম ক্ষণ থেকেই এই কমিউনিষ্ট অঞ্চলগুলির ওপরে চিয়াং পাঁচগুণ ছ'গুণ এমন কি দশগুণ বেশী সৈন্য ও অস্ত্রবল নিয়ে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁর সে আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে প্রায় সদ্যজাত কমিউনিষ্ট সরকারকে চিয়াং যখন আক্রমণ করেন, তখন কুয়োমিনটাঙ বাহিনীতে ছিল আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক লাখ সুশিক্ষিত সৈন্য, আর কমিউনিষ্ট পক্ষে মাত্র ৭০ হাজার নিরস্ত্রপ্রায় গোরিলা—কিন্তু চিয়াংএর বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। পরের বছরই প্রায় ছ' লাখ সৈন্য তাদের আক্রমণ করে, ছ' সপ্তাহের মধ্যে এ বাহিনীও পর্য্যুদস্ত হয়ে যায়, তার পরের বছর চিয়াং নিজেই তাঁর বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে কমিউনিষ্ট অঞ্চলে হানা দিলেন, এবারেও তাঁকে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হল। পরের বছরও চতুর্গুণ সৈন্য আক্রমণ করা হল, কিন্তু গোরিলাদের প্রত্যাঘাতে চিয়াংএর সবচেয়ে ভালো দুটো ডিভিসন বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

পঞ্চম বারের আক্রমণের চেহারাটা ছিল চরমতম। ৯ লক্ষ কুয়োমিনটাঙ সৈন্য তিন দিক থেকে কমিউনিষ্ট অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, কমিউনিষ্টদের হাতে মাত্র ৯০ হাজার গোরিলা। কিন্তু এবারও চিয়াংএর

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। কমিউনিষ্ট সেনানায়ক চুটে তাঁর বাহিনীকে ৬ হাজার মাইল পায়ে হাটিয়ে চিয়াংএর বাহিনীর কবল থেকে বার করে নিয়ে এলেন। এর পর কমিউনিষ্টদের নতুন ঘাঁটি তৈরী হল সেনসি প্রদেশে। ঐতিহাসিকেরা তাদের এই অভূতপূর্ব্ব পশ্চাদপসরণের নাম দিয়েছেন "Long March". এ সম্পর্কে বৃটেনের একজন মহিলা চীন-বিশেষজ্ঞের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"They trekked six thousand miles accross country, doing an average of twenty-three miles a day on two hundred and sixty-five days with only a hundred days of rest, on most of which they fought a battle. They engaged in two hundred and sixty-three major and minor skirmishes against the government troops, against the provincial lives and against local militia. Ninety thousand Reds are said to have started, and little more than twenty thousand arrived in Shensi. It is a stirring story, and the Chinese lack a Herodotus to tell the epic."

(The Chinese by Winifred Galbrieth)

সৈন্যসংখ্যা এবং অস্ত্র-রসদের দিক থেকে হীনবল হয়েও কেন কমিউনিষ্টরা এইভাবে বার বার কুয়োমিনটাঙ বাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিল? চিয়াং-এর নিজের এবং তাঁর সুহৃদদের প্রচার বিভাগগুলি এ সম্পর্কেও নিশ্চুপ। কিন্তু সত্যকে সাহস করে যাঁরা উচ্চারণ করতে পারেন তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। চাইনিজ কমিউনিষ্টদের শক্তির উৎস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনাচার ও উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ চীনেরই অগণন মুক্তিকামী জনসাধারণ। এই অগণন মুক্তিকামীদের সক্রিয় সহায়তা পেয়েছে বলেই বাইশ বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও চিয়াং তাদের বিধ্বস্ত করতে পারেন নি, আমেরিকার মুক্তহস্ত সাহায্য পেয়েও নয়। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি জাপানের সকল প্রচেষ্টাও এই জন্যেই ব্যর্থ হয়েছিল। পক্ষান্তরে তাদের নেতৃত্বে চীনের মুক্তিকামী জনগণ দিনের পর দিন ইঞ্চি ইঞ্চি ক'রে বাইশ বছর অবিরাম সংগ্রামের পর আজ তাদের অসম্পূর্ণ জয়যাত্রার সবচেয়ে শেষের পথে পদার্পণ করেছে। পরম লক্ষ্যে পৌছতেও তাদের আর খুব দেরী নেই, এ কথার প্রমাণ চিয়াং-এর প্রতি পরম সুহৃদ আমেরিকারই সাম্প্রতিক নিস্পৃহতা।

কিন্তু জনসাধারণের এত ব্যাপক সমর্থনই বা একা কুওচানটাঙ রাই কেন পেল? আমাদের দেশবাসীর পক্ষে এটা এক বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন; চিয়াং এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব পৃথিবীবাসীকে দেন নি। অথচ মজা এই যে, চীনের কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করার জন্যে গত বছর-কয়েক ধরে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে চিয়াংকে সাহায্য করছে যে সেই আমেরিকারই একজন নামকরা সাংবাদিক Edger Snow তাঁর 'Glory and Bondage' বইটিতে স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটি খুলে বলতে দ্বিধা করেন নি। Snow আমেরিকান ধনপতিদেরই মাইনে করা লোক, সুতরাং তাঁর কথায় অহেতুক পক্ষপাতিত্ব যে থাকবে না, এ কথা সহজেই বিশ্বাস্য।

চাইনিজ কমিউনিষ্টদের প্রবর্ত্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে Snow কী বলেছেন, আগে সেইটে বিবৃত করা যাক্। এই প্রসঙ্গের ভূমিকাতেই তিনি আসল কথাটি খুলে বলেছেন—

"The fact is real "Communism" was Never established in China, even in the former Soviet areas, and Chinese Communists never claimed otherwise.... ... In practice they have won their following by enforcing and immediate two-sided program of social economy and political reforms (-the over- throw feudalism), and by leading the fight for national emancipation from foreign control. Socialism was and is an ultimate, but admittedly distant, gcal. ... ... Private enterprise was encouraged and the economy was frankly described as "state-controlled capitalism."

মৌল উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহাত্মাজীর পরিকল্পিত অর্থনীতি এর চেয়ে অনেক বেশী সমাজতান্ত্রিক। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে Snow কুওচানটানদের প্রবর্ত্তিত এই 'state controlled capitalism' আরও একটু খুলে বলেছেন—জাপানী এবং স্বদেশী শত্রুদের কাছ থেকে

ছিনিয়ে নেওয়া বেওয়ারিশ জমিগুলি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পারিবারিক সংখ্যানুপাতে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে; আফিং কেনাবেচা নিষিদ্ধ হয়েছে; হাজার হাজার নানা ধরনের সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে তাদের অঞ্চলে; স্কুল হয়েছে হাজার হাজার, শিক্ষাদানের সমস্ত ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্টই বহন করছে, কমিউনিষ্ট এলাকার কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এখন শতকরা প্রায় ৮০ জন ছেলে মেয়ে অক্ষর জ্ঞানযুক্ত; সরকারী বিভাগের সমুদয় কর্ম্মচারী শুধু খাওয়া পরার খরচটুকু বাদে প্রায় বিনা বেতনেই তাদের বিপুল দায়িত্ব বহণ করে যাচ্ছেন– সর্ব্বাধিনায়ক মাও সে তুঙ-এর মাইনে নাকি মাত্র তিন ডলারের মত।

সরকারী গঠনতন্ত্রেও Snow বলেছেন, কমিউনিষ্টরা এইরূপ উদারনীতিক ব্যবস্থাই চালু করেছে।—আঠারো বছর ও ততোধিক বয়সের প্রায় স্ত্রী-পুরুষই ভোট দেওয়ার অধিকারী, সেই ভোটেই কুংচান্‌টাং-শাসিত এলাকার ছোট বড় সমস্ত শাসন-সংসদ নির্ব্বাচিত হয়। এর চেয়েও বড় কথাটা এই যে কমিউনিষ্টরা তাদের গভর্ণমেণ্টে নিজেদের পার্টি থেকে এক তৃতীয়াংশের অধিক সদস্যপদ গ্রহণ করতে দেয় না।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হচ্ছে যে, Snow এই বিবরণ দিতে শুধু নিজের অভিজ্ঞতারই নজির দেন নি, স্ব-উক্তির সমর্থনে আরও তিন-তিনজন নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীকে সাক্ষী মেনেছেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন একটি বিখ্যাত মার্কিন মিশনরী প্রতিষ্ঠানের এক উচ্চপদস্থ সদস্য, আরেকজন একটি বৃটীশ অধ্যাপক, আর তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন পিকিং ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সুতরাং যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, আধুনিক চীনের জাতীয় জনক সান ইয়াৎ সেন চৈনিক জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য যে জীবনপণ ব্রত গ্রহণ ক'রে ছিলেন, কমিউনিষ্টরা সকল দিক থেকে সানের সেই অপূর্ণ ব্রত সফল করারই সাধনা করছে।

এখানে এই চিত্রটার পাশে চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্টের ছবিটা মিলিয়ে দেখা যাক্।

কুয়োমিনটাং-এর অর্থনীতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রসঙ্গটি নতুন ক'রে উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে না আশা করি। সেখানকার অবিশ্বাস্য রকমের মুদ্রাস্ফীতি, সরকারী কর্ম্ম-চারীদের দুর্নীতি এবং সদাই অনাহার-পীড়িত জনগণের কথা বলতে গিয়ে চিয়াং-এর অতি বড় বন্ধুরাও অবধি একটুখানি চোখের জল না ফেলে পারেন নি। চিয়াংএর রাজ্যে প্রজাদের কারু পক্ষে পেট ভরে খেতে পাওয়ার একমাত্র উপায় সরাসরি সৈন্যদলে নাম লেখানো, এ পথ ছাড়া কুয়োমিনটাঙে বেঁচে থাকার অন্য উপায় নেই। অথচ এই সদাবুভুক্ষু দেশেরই সকল সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মালিক চিয়াং নিজে আর তাঁর দু'টি পরমাত্মীয় ব্যক্তি সুং আর কুং—কুয়োমিনটাংএর যাবতীয় বড় বড় ব্যবসা-পত্র এই তিন পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থনীতির মত চিয়াং-এর কুয়োমিনটাং সান ইয়াৎ সেনের গণতন্ত্রের আদর্শও, ঠিক এইভাবেই রক্ষা করছে। শুধু গৃহযুদ্ধ সমর্থন করে নি বলেই চিয়াং তাঁর একটা বড় সমর্থক দল মডারেটপন্থী ডেমোক্রেটিক পার্টিটাকে ভেঙে দিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের শেষ দিক থেকে আমেরিকার জেনারেল মার্শাল চীনে সবদল মিলিয়ে একটা কোয়ালিশন সরকার গড়বার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। দেশে ফিরে গিয়ে এ ব্যর্থতার কারণটি জানাতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট বল্লেন যে, চীনে কুয়োমিনটাং-এর প্রাধান্য ব্যতীত চিয়াং কোনো গভর্ণমেণ্ট হতে দেবেন না।

কিন্তু চিয়াং-এর সবচেয়ে বড় দাবী এই যে, চীনের জাতীয় সত্তাকে তিনি অক্ষুণ্ণ অকলঙ্কিত রাখতে চান বলেই কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ; কমিউনিষ্টরা স্বদেশকে রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে চায়। এ কথাটারও প্রমাণের জন্য অবশ্য মাত্র কেবল তারস্বর ছাড়া চিয়াং ও তাঁর উকিলেরা আর কোনো নজিরই উপস্থাপিত করতে সক্ষম হন নি, পক্ষান্তরে চিয়াং চীনের স্বাজাত্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে গত বাইশ বছর ধরে যে অভিনব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এসেছেন, নানাদিক থেকে তার প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া গেছে।

১৯৩১ সালে জাপান যখন আন্তর্জ্জাতিক চুক্তিপত্রের

কোনো সহবৎ না মেনেই কার্য্যতঃ মাঞ্চুরিয়া কুক্ষিগত ক'রে নেয়, তখন তার প্রতিবাদে চিয়াং শুধুমাত্র একটি লিখিত প্রতিবাদ লীগ অব নেশন্‌সে প্রেরণ করেছিলেন। পরের বছরেই জানুয়ারী মাসে যখন জাপানী সেনা নৌ ও বিমান-বাহিনী সাংহাইয়ের চীনা-অধ্যুষিত এলাকা চাপেইতে প্রায় সাতদিন ধরে ক্রমাগত মৃত্যুতাণ্ডবের অনুষ্ঠান করছিল, তখনও চিয়াং এবং তাঁর কুয়োমিনটাং সরকার লীগে একটি প্রতিবাদপত্র লেখা ব্যতীত আঙুলটি তোলেন নি পর্য্যন্ত। জাপানী সেনা সে-বছরেই হয়তো চীনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তো, কিন্তু হঠাৎ কোথ থেকে একটা নিরস্ত্রপ্রায় ছিন্নবস্ত্র বাহিনী এসে জাপানীদের পথ রুখে দাঁড়াল ;—জাপান সেবছর আর এগুতে পারে নি। ওই বস্ত্রহীন নিরস্ত্রপ্রায় বাহিনীটা 'কুংচানটাংদের।'

১৯৩৩ সাল থেকে জাপান খোলাখুলি ভাবেই চীনের মূলভুমির ওপরে হানা দিতে থাকে, এবং তখন থেকে বিগত মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি তারা চীনের মাটি আঁকড়ে ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত জাপানী জঙ্গীরা যখন একটার পর একটা চীনা জনপদ দখল ক'রে যাচ্ছে, নির্ব্বিচারে লক্ষ লক্ষ নিরীহ চীনবাসীকে হত্যা করে যাচ্ছে, তখনও চিয়াং ও তাঁর জাতীয় বাহিনী স্বদেশবাসীদেরই হত্যার জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সৈন্য, কোটি কোটি টাকার অস্ত্র ও বারুদ খরচ করেছেন, অথচ বিদেশী হানাদারদের প্রতিরোধ করার নামটি অবধি উচ্চারণ করেননি। শেষ পর্য্যন্ত বেইমান কম্যিউনিষ্টরাই চিয়াংকে গুম ক'রে তবে তাঁকে দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র চীনের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত ক'রেছিল।

তারপর পার্ল হার্ব্বারের ঘটনা। আমেরিকাকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হল ; সমশত্রুর বিরুদ্ধে কুয়োমিনটাং আর আমেরিকার মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। এতদিন ধরে নির্ব্বিচারে চীনের গ্রামগুলি ধ্বংস ক'রতে জাপানের যে অস্ত্র বারুদ লাগছিল, তাঁর অনেকখানিই যোগাচ্ছিল এই আমেরিকা। জাপানের সঙ্গে সেই সম্পর্ক ছিন্ন হতে আমেরিকা এবারে চোখ ফিরিয়ে চাইল চীনের দিকে ; চেয়েই দেখে—চীন এযে বহির্ব্বাণিজ্যের প্যারাডাইস্, মার্কিন যন্ত্রজাত পণ্যের এমন বিরাট অবারিত বাজার সারা দুনিয়ায় আর কোথাও নেই, যথেচ্ছ টাকা খাটাবারই এমন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র কোথায় ? কিন্তু একটা প্রতিবন্ধক আছে—বেইমান কমিউনিষ্টগুলো, ঐ লাল ভূতরা সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে যেমন পিছন দিক থেকে ছুরি মারছে, আমেরিকানদের কি আর চীনের মাটিতে ওরা স্বস্তিতে হাত-পা ছড়াতে দেবে ? অতএব আগে নিষ্কণ্টক করে নেওয়া দরকার এই বাণিজ্য-স্বর্গকে। নিষ্কণ্টক হবার চেষ্টা চিয়াং-এরও ; কিন্তু এতদিন তিনি ছিলেন নির্ব্বান্ধব, শ্বেত রাষ্ট্রগুলো শুধু জাপানকেই দুহাত ভরে সাহায্য করেছে। এবারে শত্রু নিপাতের বহু পোষিত আশা সফল হবার, সুবর্ণ সম্ভাবনা দেখে উৎফুল্ল চিয়াং আমেরিকার কাছে স্বদেশকে বন্ধক দিয়ে দিলেন।

কিন্তু বেচারা চিয়াং! এত করেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর তরী ডুবলই।

চীনের সাম্প্রতিক রাজনীতি-রঙ্গমঞ্চের প্রধান কুশীলবদের একটা মোটামুটি পরিচয় বোধ হয় স্পষ্ট করেই তুলে দেওয়া সম্ভব হল।

এর পরেও আর আশা করি প্রশ্ন হওয়া উচিত নয়, কেন আমরা বলছিলাম যে ডুবন্ত কুয়োমিনটাং-এর জন্যে খেদ প্রকাশ করলে সেটা পরোক্ষে আমাদের স্বাধীন ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধতাই করা হবে। আগামী-সম্ভাবিত তৃতীয় মহাযুদ্ধের (?) জন্যে যারা উন্মত্ত আয়োজনে লিপ্ত, তাদেরই একদিকের প্রধানতম পক্ষ হ'ল আমেরিকা ; কুয়োমিনটাং-এর পরাজয়ে সেই আমেরিকা একটা ভালো ঘাঁটি হারালো—এটা নিরপেক্ষ ভারতের পক্ষে কিছু আপশোষের ব্যাপার নয়, বরঞ্চ এর ফলে তো আমাদের মনে হয়, সম্ভাবিত যুদ্ধটা ভারতের সীমানা থেকে অনেকখানি দূরেই সরে গেল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, চিয়াং এশিয়ার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম রাখার চেষ্টা করেছিলেন ; তাঁর সেই বহু প্রমাণিত চেষ্টাটা ব্যর্থ হওয়াই যদি ভারতের কোনো দুঃখের কারণ হয়, তবে বুঝতে হবে, এতদিন ধরে আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী যে সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত একক এশিয়ার স্বপ্নচিত্র আমাদের আদর্শের সামনে এঁকে দিয়েছেন, পণ্ডিতজীর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ফল্গু

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

এক

পাশের ঘর হইতে মায়ের বিলাপধ্বনি শোনা যাইতেছে। মুখ গুঁজিয়া পিতা বিছানায় পড়িয়া আছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাতু পিসির গলা ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন কোনো মতে নিজেকে একটু সংযত করিয়া তিনি ঝিল্লীর হাতের শাঁখা ভাঙিতে আর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া দিতে আসিয়াছেন।

ঝিল্লীর লাল কল্‌কা-পাড় ডুরে সাড়ীখানা ছাড়াইয়া তিনি তাহাকে নরুণ-পাড় একখানা ধুতী পরাইয়া দিলেন। শাখা দু'গাছা ভাঙিয়া ফেলিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "হাতের চুড়ি ক'গাছা আর গলার হারটা থাক্ মা—কত বুড়ো মাগীর থাকে, আর তুই তো দুধের বাচ্ছা!"—

বলিয়াই ঝিল্লীর দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ভাই বোনেরা একেক বার ম্লানমুখে আসিয়া ঝিল্লীকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কাহারো মুখে কথা নাই। সমস্ত বাড়ী আজ শোকাচ্ছন্ন ম্লান।

জানালার গরাদ ধরিয়া প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল ঝিল্লী; কাহারো সহিত সে কোনো কথা কহিল না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল না, একটি শোকের বাণী উচ্চারণ করিল না। বাড়ীতে এই যে শোকের সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার একটি তরঙ্গও কি তাহার অন্তর স্পর্শ করে নাই? কেন করিবে? কণাদকে তো সে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করে নাই! জগতের কত লোক এমনি ভাবে জীবন-যাত্রা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, কণাদও তো তাহাদেরই একজন! ঝিল্লীর জীবনের সহিত তাহার তো কোনো যোগ ছিল না! সুতরাং তাহার মৃত্যুতে এই শোকের অংশ সে গ্রহণ করিবে কেন?

কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া সে গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া ফেলিল; ধুতির অপরিসর পাড়টুকুও ছিঁড়িয়া ফেলিল। অকস্মাৎ নিরাভরণ হাত দু'খানার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে ড্রেসিং আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিজের নিরাভরণ বৈধব্য মূর্ত্তি দেখিয়া এতক্ষণে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কুমারী জীবনে যাঁহাকে সে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তো এখনো জীবিত আছেন। ঝিল্লীর সহিত এ জীবনে মিলন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়াও তাঁহার অনুরাগ এতটুকু হ্রাস পায় নাই; তবু ঝিল্লী আজ বিধবা, সমাজের এমনি অনুশাসন!

কিন্তু অর্থহীন এ শাসন সে মানিবে কেন? কিসের জন্য মানিবে?

ওই তো টেবিলের উপরে তাহার অলংকারগুলি পড়িয়া আছে, আল্‌নায় সাজানো রহিয়াছে কত বিচিত্র রকমের শাড়ী, ইচ্ছা করিলেই সে আবার এগুলি পরিতে পারে। কিন্তু সে তেমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরিত্যক্ত বিলাসদ্রব্যের একটিও স্পর্শ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এতক্ষণে সে নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, জগতের সমস্ত ভোগবিলাস হইতে সে বঞ্চিতা হইয়াছে, সামাজিক শাসনে সে আজ বিধবা।

কিন্তু দৈহিক সজ্জার পরিবর্ত্তন ভিন্ন তাহার অন্তরের কি কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই?

ঝিল্লী তাহা জানে না, জানিবার প্রবৃত্তিও তাহার নাই। কণাদ কোনোদিন তাহার কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে ঝিল্লীর অন্তরের পরিবর্ত্তন ঘটিবে কেন? শুধু সামাজিক বিধানে দেহ সজ্জার এই পরিবর্ত্তন! কিন্তু ইহাও তো সামান্য নয়!

তাহার এই নিরাভরণ দীন মূর্ত্তি সমস্ত জগতে তাহাকে অভাগিনী বলিয়া পরিচিত করিবে। কণাদ বাঁচিয়া থাকিতে কোনোদিন ঝিল্লী তাহাকে স্বামীর অধিকার দেয় নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর আজ সে তাহার সকল অধিকার স্বীকার করিয়া লইতেছে। কণাদের জীবনকালে কখনো সে তাহাকে স্মরণ করে নাই, তাহার মৃত্যুর পরে বৈধব্যের কঠোর আচরণ

অহর্নিশ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু সকল ভোগ-সুখে বঞ্চিতা হইয়া, সকল মাঙ্গলিক কার্য্যে অপাংক্তেয় হইয়া কেন সে অভাগিনী নারীর মত জীবন কাটাইবে? কাহার জন্ত? যাহাকে সে কোনো দিন এক বিন্দু ভালো বাসে নাই, তাহারই জন্ত?

এই অন্তায় বিধানের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, সমস্ত বিধান সে গুড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। এত অত্যাচার সে কখনো সহ্য করিবে না। কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে সে কাহার বিরুদ্ধে! সে তো সকলরকম কৃচ্ছ্রসাধন স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইতেছে। তবে?

দুই

বালিকা বয়স হইতেই ঝিল্লীর সঙ্গে কুনালের বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। এই দুই পরিবারের গভীর সৌহার্দ্দ্য ছিল, এবং পুত্র কন্তার বিবাহ দ্বারা তাহা গভীরতর করিবার জন্ত দুই পক্ষই উৎসাহী ছিল। বিবাহ হইলে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইত, সন্দেহ নাই, আর না হইলেও যে অসম্ভব কিছু ঘটিবে, এরূপ ধারণা অথবা কল্পনা তাহাদের ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে কুনাল আর ঝিল্লী পরস্পরকে হৃদয় দান করিয়া বসিবে এত বড় আশংকাও তাহারা করে নাই।

কুনাল ও ঝিল্লী তাহাদের মিলন সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত ছিল, এবং ইহার যে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাহারা একথা কখনো ভাবে নাই।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটিল।

শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্ত কুনাল ইয়োরোপে গেল। সে ফিরিবার পূর্ব্বেই প্রস্তাবটিকে পাকা করিবার আয়োজন চলিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে যে পুত্র ছিল সাধারণ, ইয়োরোপ যাত্রার ফলে সেই পুত্রই এখন পিতার কাছে অসাধারণ হইয়া উঠিল। অসাধারণ পুত্রের জন্ত তিনি যে বরপণ দাবী করিলেন, তাহাও নিতান্ত সাধারণ নয়। সে দাবি মিটাইবার ক্ষমতা ঝিল্লীর পিতার ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে সাধারণ একটি পাত্রের সন্ধান করিতে হইল। বিবাহের প্রস্তাব ভাঙিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শস্তাদরে একটি ভালো পাত্রের সন্ধান পাইয়া ঝিল্লীর পিতা কন্যা পাত্রস্থ করিয়া দিলেন।

ঘটনাটি এত আকস্মিক যে ঝিল্লী কুনালকে কিছু জানাইবার সময় পাইল না। বিশেষতঃ শেষ পর্য্যন্ত তাহার আশা ছিল যে, এ বিবাহ কিছুতেই হইবে না, হইতে পারে না। তাহার পূর্ব্বে অঘটন একটা ঘটিবেই। তাই সে বিশেষ প্রতিবাদও করিল না। কিন্তু কোনো অঘটন ঘটিল না; বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল, এবং যথা নিয়মে স্বামীর সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া ঝিল্লী শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে সকলে বিপুল সমারোহে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল; তাহার অন্তরের নিরানন্দতা ভিন্ন কোথাও বিষাদের লেশ মাত্র রহিল না।

পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া আসিল ফুলশয্যার রাত্রি। জ্যোৎস্নার ঢেউ ভাঙা রজনী। জানালা দিয়া খণ্ড খণ্ড জ্যোৎস্না আসিয়া উহাদের বিছানার উপরে পড়িয়াছিল। এয়োরা নতুন দম্পতিকে পুষ্প-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া পুষ্প-খচিত শয্যায় রাখিয়া চলিয়া গেল। ফুলের সুবাস দম্পতিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল, উহাদের মিলন দেখিবার জন্ত পূর্ণচন্দ্র জানালার ফাঁক দিয়া আড়ি পাতিয়াছিল।

এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর যত সৌন্দর্য্য, জীবনের এই মিলন-সন্ধিক্ষণের যত মাধুর্য্য, ঝিল্লীর জীবনে সবই নিরর্থক বিষাদ বলিয়া মনে হইল। বুকের মধ্যে বেদনার বিরাট কোলাহল। জানালার মধ্য দিয়া দেখা যায় গভীর মৌন আকাশ, আলোয় ধোয়া অস্পষ্ট নক্ষত্র-মণ্ডলীর চোখে চির বিরহের অব্যক্ত ইঙ্গিত। মিলনের ছলনায় তাহার জীবনে একি বিচ্ছেদের সূচনা হইতেছে, সানাই তখন মিলনের সুরে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পরম মুহূর্ত্তে মিলনের সেই সুর ঝিল্লীর কানে ঝরিয়া পড়িতে চাহিল, কিন্তু নির্ম্মম উপেক্ষায় ঝিল্লী মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার জীবনে এ কি ক্ষণ উপস্থিত হইল? কে তাহাকে পথ দেখাইবে?

কণাদের উদ্যত আলিঙ্গন হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া সে স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়াছিল, সে অপরের বাগ্‌দত্তা, তাহাকেই সে হৃদয় দান করিয়াছে। কণাদকে স্বামী

বলিয়া গ্রহণ করা আর আত্মহত্যা করা দুই-ই তাহার পক্ষে সমান। তাহার জীবনে এ বিবাহ একটা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নহে।

ফেনিল মদিরাপাত্র অধরস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই কঠিন স্পর্শে চুর-মার হইয়া গেল। আশা আনন্দে সমুজ্জ্বল কণাদের সেই প্রসন্ন সুন্দর মুখখানা এক নিঃশেষে কেমন বিবর্ণ বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল—ভুলিতে চাহিলেও ঝিল্লী এখন ভুলিতে পারেনা।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত দুই জনেই চুপ করিয়া ছিল। লজ্জায় আকাশের চাঁদ একখণ্ড কালো মেঘের নীচে মুখ লুকাইয়াছিল। বাতাসও এই সীমাহীন ধৃষ্টতায় ঘরে থাকিতে পারে নাই, ফুলের সুবাস চুরি করিয়া লইয়া চুপি চুপি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। ঝিল্লীর শ্বাস রোধ হইয়া আসিল। মিলনের সুর গাহিয়া গাহিয়া ক্লান্ত হইয়া সানাইও এই মাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শান্ত স্বরে বলিয়াছিল, 'তুমি আগে কেন বলনি ঝিল্লী! যে ভুল হ'য়ে গেছে, তার সংশোধন ক'রতে গেলে, আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমারও যে অনেক দুঃখ পেতে হবে ঝিল্লি। কিন্তু আমার দ্বারা তোমাদের প্রেমের কখনো কোনরকমেই অসম্মান হবে না।"

কনাদের হাত লাগিয়া তাহার গলার ফুলের মালা-ছড়া পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। ছিন্ন মালাছড়া হাতে লইয়া সে বলিয়াছিল, "এই মালার সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে গেল ঝিল্লি। তুমি দুঃখ কোরোনা, ভুল মানুষের জীবনে হ'য়েই থাকে—কিন্তু আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরো না—"

সেই বালারুণের মত স্নিগ্ধ অথচ তেজোময় মুখের দিকে চাহিয়া ঝিল্লী আশ্বস্ত হইয়াছিল।

কণাদ কাহারো কাছে কোনো অভিযোগ করে নাই, কোনো ছুতায় কোনো দাবি জানায় নাই, নীলকণ্ঠের মত সমস্ত বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া লইয়াছিল। ঝিল্লীর সম্মানকে কাহারো কাছে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই।

এই ভাবে এক বছর কাটিয়াছিল। সেই সময় ইয়োরোপে মহাসমর উপস্থিত হইল। মাতা পিতা ও অন্যান্য পরিজনদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া কণাদ যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঝিল্লী বুঝিয়াছিল, তাহার মুখের ছোট্ট একটু অনুরোধের জন্য সে কী ব্যাকুল প্রতীক্ষাই করিয়াছিল। একটি কথাতেই ঝিল্লী তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিত, কিন্তু সে করে নাই। কেন করিবে? যাহাকে সে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে নাই, সামান্য মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তাহার উপর এত বড় অধিকার জন্মায় নাই যে, মিনতি করিয়া তাহাকে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবে! ঝিল্লীর চোখের সম্মুখেই তাহার যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। হয় তো সে বাঁচিতে পারিত, কিন্তু ঝিল্লী তাহাকে বাঁচিতে দেয় নাই, মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জীবন আহুতি দিয়া সে ঝিল্লীকে মুক্তি দান করিয়া গিয়াছে। সে তাহার সত্য রক্ষা করিয়াছে, জীবনে তাহাদের প্রেমের অমর্য্যাদা ঘটিতে দেয় নাই।

তিন

বিবাহের পরেও ঝিল্লী কুণালকে চিঠি লিখিত, কিন্তু কণাদের মৃত্যু সংবাদ আসিবার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আর কুণালকে লিখিতে পারিল না।

এই সময় ইয়োরোপের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া কুণাল দেশে ফিরিয়া আসিল।

সংবাদ শুনিয়া এই তরুণ বয়সেই ঝিল্লীর সমস্ত চিন্তা-শক্তি যেন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের বাড়ী হইতে কুণালদের বাড়ীর দূরত্ব তো বেশী নয়, এ বাড়ীতে তার অবাধ যাতায়াতের কোনো বাধা নাই, কিন্তু ঝিল্লী কি করিবে? তার এ নিরাভরণ দীন হতশ্রী মূর্ত্তি সে কেমন করিয়া কুণালের সম্মুখে বাহির করিবে? নিজেকে সে কি ছুতায় কোথায় গোপন করিয়া রাখিবে? এই একটি মাত্র চিন্তাতেই তাহার সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন চলিয়া গেলেও কুণাল তাহাদের বাড়ীতে আসিল না। সকলেই আলোচনা করিতে লাগিল যে, ইয়োরোপে গিয় তাহার পায়াভারি হইয়াছে; নয় তো আগে যে বাড়ীতে তার দিনের

বেশীর ভাগ সময় কাটিত, বিদেশ হইতে আসিয়া নিছক ভদ্রতার খাতিরেও সেখানে তার একবার দেখা করিতে আসা উচিত ছিল।

কিন্তু সে আসিবেনা একথা ঝিল্লী বিশ্বাস করিতে পারে না। সে আসিবেই। দীর্ঘ দিন রাত্রির প্রতিটি ক্ষণ ঝিল্লী কুণালের প্রতীক্ষায় যেমন অধীর হইয়া রহিল, আবার তেমনি তাহার আগমনাশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু কুণাল আসিল না দেখিয়া অভিমানেও সে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে মনের এই ভাব পরিবর্ত্তনে দুঃসহ যাতনায় সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার অন্তরের এই আকুলতা কি কুণাল বুঝিতে পারে না? ঝিল্লীর ভাগ্যে আজ যে বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহাতে যে ঝিল্লীর কোনো হাত ছিলনা, সে কথা তো কুণাল জানে, এতদিন কত সান্ত্বনা, কত সহানুভূতি সে তাহার নিকট হইতে পাইয়াছে। কিন্তু আজ সে এ ভুল করিতেছে কেন?

তাহার বুকের রক্তস্রোত অহরহ এক দুর্দ্দামগতিতে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি চায় সে? কি পাইলে তাহার এই দুঃসহ যাতনার অবসান ঘটিবে! কিসের জন্ত তাহার অন্তর এমন বাঁধ-ভাঙ্গা হইয়া ছুটিতে চাহিতেছে! সে কি কুণালের সহিত মিলনের আকাঙ্খা অথবা সম্ভ বৈধব্যের মনস্তাপ? কুণালের উপেক্ষা জনিত অভিমানও হইতেপারে,; যাহাই হোক এ অসহ্য যাতনা সে আর সহিতে পারে না।

সেদিন দিদিমার বাড়াবাড়ী অসুখের খবর পাইয়া মা বাবা বরাহনগর গিয়াছিলেন; হয় তো রাত্রে সেখানে থাকিবেন। ছোট ভাই বোনেরা বাহিরের ঘরে বসিয়া পড়া শুনা করিতেছে, পাচক ভৃত্য রান্নাঘরে কর্ম্মে ব্যাপৃত। ঝিল্লী ধীরে ধীরে বাগানে গিয়া প্রবেশ করিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে। দিক্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার আসিয়া ঝিল্লীকে ঘেরিয়া ফেলিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সে যেন এই আর্দ্র অন্ধকারকে অনুভব করিতে লাগিল। অন্ধকার যে মধুর এতদিন সে তাহা জানিতে পারে নাই। সুনীল আকাশে তারকাগুলিও যেন প্রতীক্ষারত নব-বধুর মত ভীরু চোখে চাহিয়া আছে। রজনীগন্ধার গন্ধে উতলা হইয়া এক ঝলক বাতাস তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ বুলাইয়া দিল। অন্ধকারের মধ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুষ্প-পল্লবগুলি যেন হাত বাড়াইয়া স্নেহের স্পর্শে তাহাকে সান্ত্বনা দিল।

সহসা তাহার গণ্ড ছাপাইয়া এক ঝলক অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সে-তো জানে না তাহার এ-অশ্রুবর্ষণ হইল কেন? এ-কি প্রিয়তমের সহিত মিলনের আনন্দাশ্রু? অথবা তাহার উপেক্ষাজনিত অভিমানের অশ্রু? কি দিয়া সে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে, এ-অশ্রু সে অক্ষমতা ভাবিয়াও তো ঝরিয়া পড়িতে পারে? যে-অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছে, সে-অশ্রুর পরিচয় সে জানে না। কে তাহাকে বলিয়া দিবে তাহার অশ্রু ঝরিতেছে কেন?

সহসা কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার বক্ষশোণিত এত উতল হইয়া উঠিল যে,, বক্ষাবরণ বুঝি আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

এই কণ্ঠস্বর শুনিবার আশাই কি অহর্নিশ বুকের মধ্যে লালন করিয়া সে অসহ দুঃখ পায় নাই? এই কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষাতেই কি তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে না? সহসা 'না' 'না' বলিয়া সে কয়েক পা পিছাইয়া গেল। যে মুহূর্ত্তটীর প্রতীক্ষায় সে অধীর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তটাই কি তাহার জীবনে সমাগত হয় নাই?

যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে সে কি?

কুণাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা যায় না, শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত তাহার দীর্ঘ দেহের দিকে এক পলক চাহিয়াই ঝিল্লী মুখ ফিরাইয়া লইল।

কুণাল বলিল, "তোমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক, তা' বুঝি। প্রায় দেড় মাস এসেছি, এর মধ্যে তোমার সঙ্গে একটিবারও দেখা করতে আসিনি। বাবা যা' কাণ্ড করলেন, লজ্জায় আমি তোমাদের মুখ দেখাতে পারিনে। আমাকে ক্ষমা কর ঝিল্লি।"

"আপনার তো কোনো দোষ নেই এতে। ক্ষমার কথা নিতান্তই অবান্তর।"

নিজের কণ্ঠস্বরে ঝিল্লী নিজেই চমকে ওঠে; এত রূঢ় স্বর কি তাহার কণ্ঠই উচ্চারণ করিতেছে?

"ক্ষমা কর ঝিলুয়া, আমার দিন যে কি ভাবে কেটেছে এই সব শুনবার পর থেকে—"

"আমি বিধবা— নির্জ্জন রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন? যদি কিছু বলবার থাকে, আমার বাবা মার সামনেই বলবেন।"

"বিধবা তো তুমি নও ঝিলু, তুমিই তো লিখেছিলে, তাঁকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ কর নি। তবু বিধবা বিবাহে সামাজিক—

ঝিল্লীর কণ্ঠ যেন অগ্নি উদ্গীরণ করে: "তাঁকে পেয়ে গ্রহণ করতে পারি নি? সে আমার পরম দুর্ভাগ্য, কিন্তু তাঁকে হারিয়ে গ্রহণ করিছি। তিনিই আমার স্বামী।"

"এ-তো তোমার মনের কথা নয় ঝিলু!"

"হ্যাঁ, এই-ই আমার মনের কথা। এতদিন যা' বলেছি, সে আমার দম্ভের অভিব্যক্তি।"

"তুমি ভুল করছ ঝিলু।"

"ভুল করেছিলাম সে ভুল ভেঙেছে। আমার জীবনের পূর্ণ সৌভাগ্যকে আমি দম্ভভরে পদদলিত করেছি। আর সেই ধৃষ্টতা, সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন আপনি। আপনার জন্যই আজ আমি বিধবা সমস্ত জগতের করুণার পাত্রী।"

'কিন্তু ঝিল্লী, তুমি তো আমাকে ভালোবাসো।"

"না, বাসিনে। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি।"

তিনি ছিলেন উদার, মহৎ মহিমময়; আপনি নীচ, লোভী। আপনাকে আমি ঘৃণা করি। সদ্য বিধবাকে প্রেমের কথা শোনাতে এসেছেন কোন্ মুখে? এই আপনার শিক্ষা? চলে যান এখান থেকে, আর কখনো আমার সম্মুখে আসবেন না।"

ঝিল্লীর গলায় একটা সরু সোনার চেইনের লকেটে কুণালের ছবি ছিল, সেটা খুলিয়া সে কুণালের দিকে ছুঁড়িয়া দিল: "এটা আমার অস্পৃশ্য"—বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তাহার ঘরে আসিয়া বিদ্যুতালোকে তাহার বিবাহ রজনীর ছবিখানার দিকে চাহিয়া সে ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের মত কণাদের কি মূর্ত্তি! তাহারই হাতে পরানো ফুলের মালাগাছি বক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পাশে বসিয়া আছে ঝিল্লী। এ-মূর্ত্তির দিকে সে তো কোন দিন চোখ তুলিয়া চাহে নাই। জীবনের যে দিন সে দম্ভ করিয়া হারাইয়াছে, মাথা কুটিয়া কাঁদিলেও আর তাহা ফিরিয়া পাইবে না। কিন্তু আজ তাহার জীবনে যে লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে, এ পরম লগ্নকে সে বহিয়া যাইতে দিবে না। আজ সে স্বামীকে পাইয়াছে।

"কণাদের পায়ের উপরে সে মাথা রাখিল। এতদিন যে বেদনা, যে আশংকা যে অপমান তাহার অন্তরকে নিপীড়িত করিতেছিল, নিমেষে সে সমস্ত দূর হইয়া পরম পুলকে, পরম গৌরবে তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

'...আমি এই চাচ্ছি—আমার যে দেবতা তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইছি যে, তোমরা এবং আমি একত্র যেন আরও কিছুকাল এমনি আনন্দে সুস্থ দেহে কাটাতে পারি। সুস্থ শরীর মানেই তুষ্ট মন। ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে, সুখে স্বচ্ছন্দে ও সোয়াস্তিতে আমরা সব এক হয়ে থাকবো—এই আমার আশা।—আমার একটা কথা মনে রেখো তোমরা—আর্ট নিয়ে লড়াই যেন না হয়। আমার সময় লড়ায়ের দরকার একটু হ'য়েছিল। কিন্তু আর যাতে লড়াই না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

অবনীন্দ্রনাথ [শিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহার সৌজন্যে

আমি আর্ট নিয়ে সারাজীবন কাটিয়েছি, এটুকু আমি বুঝেছি—রসের ধারা এক। পশ্চিম থেকেই আসুক, পুব থেকেই আসুক, আর্ট এক, তার মধ্যে ভিন্নতা নেই। তবে রূপ একটু ভিন্নতর হয়। যেমন বাঙালীর রূপ ইংরেজের রূপ এক নয়। দেশ ভেদে কাল ভেদে রূপের পার্থক্য হয়। নিজের ঘরের মধ্যেও ভিন্ন রূপ দেখা যায়; কিন্তু অন্তরটা আছে সে-ই। নানা রকম ফুল ফল সৃষ্টি হয়, কিন্তু সৃষ্টি হবার মূলে এই একটুকু রস—মাটির রস। সেটুকু বন্ধ হ'লেই সব গেল। আসল হচ্ছে রসের ব্যাপার—এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তোমরা আর্ট নিয়ে দলাদলি ক'রতে যেয়ো না; ক'রে লাভও নেই। ছবি আঁকো আর ছবি গড়ো অ বা একেবারে নাও বা আঁকো—ছবি স্বপ্নেও যদি দেখ, সেও ছবি আঁকাই হবে। সেইভাবে আর্টকে দেখে আমরা সব এক হ'য়ে থাকি, এই আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। আমার দেশের আর্ট বড়, ওদের দেশের ভালো নয়, এ বল্‌বার দিন গেছে। সন্দেশ খেয়ে দেখো, এর মতো অপূর্ব্ব জিনিষ নেই। কিন্তু সন্দেশ যেমন ভালো, তেমনি ভালো 'কেক'ও। আমার কথা হ'লো—সব আর্টই ভালো। যদি কেউ অমৃত ব'লে দেয় এবং সেটা যদি কারুর ভালো না লাগে, তবে আর কি বল্‌ব!'

১৩ই চৈত্র রবিবার 'রূপথানী' কর্ত্তৃক কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জয়ন্তী উৎসবে অবনীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ভাষণ।

নব্যভারতের রূপশিল্পের পথিকৃত তিনি। আজিকার ভারতীয় শিল্পের সার্থক রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে অবনীন্দ্রনাথের রেখা-তুলীকায়। শিল্পকে শুধু অগ্রগতির পথই দেন নাই তিনি, সেই শিল্পের মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন তিনি ভারতলক্ষ্মীকে। শিশু-সাহিত্য ও গাথার সঙ্গে শিল্পের সংযোজনা করিয়া তিনি রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ভাবী শিল্প-ভারতকে। আজিকার ভারতীয় শিল্প বিশেষভাবে অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত। 'রূপথানী'র পক্ষ হইতে যে মানপত্রটি তাঁহাকে দেওয়া হয়, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

'...ভারতের জীবনে যুগ যুগ ধরিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের যে উপলব্ধি ঘটিয়াছে, নতুনভাবে রূপে রেখায় ও বর্ণে তুমি তাহাকে পুনঃ প্রকাশিত করিয়াছ। পার্থিব শিল্পকে দৈব শিল্পেরই স্তুতি বা প্রতিধ্বনি মাত্র বলিয়া বৈদিক ঋষিরা বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি নূতন করিয়া সেই দৈব শিল্পের চপলা দ্যুতিকে তোমার রচনায় চিরতরে স্থির চপলা রূপে ধরিয়া দিয়াছ। বঙ্গবাণীর বীণাও অপূর্ব্ব মধুর ও রমনীয় ঝঙ্কারে তোমার করস্পর্শে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। তোমার নানামুখী প্রতিভা দর্শনে আমরা বিস্মিত হই। শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তোমার চরণে আমরা মস্তক অবণত করি।...'

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

ভারতরাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে ও গ'ড়ে তুলতে হবে ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীগুলির ভিত্তিতে। ঐগুলিই রাষ্ট্রদেহের জীবনকোশ। তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রাচুর্য্যই ভারত মহারাষ্ট্রের বল ও ঐশ্বর্য্য। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের নামে যারা রাষ্ট্রভাষাকে সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের ভাষা না রেখে সর্ব্বভারতীয় ভাষা ব'লে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছেন, তাদের মনে জাতি ও রাষ্ট্র এক। কিন্তু জাতি ও রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্র জাতির একটা বিশেষ প্রকাশ মাত্র।—দুর্ভাগ্য সেই জাতি, দুর্ভাগ্য সেই যুগ যার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন পলিটিক্স। ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতা এ পরিণাম থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা ক'রবেন।...

পশ্চিম ইউরোপের ন্যাশনাল ষ্টেটের আদর্শের মাপে ভারতবর্ষের বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটির উপকরণ ও সামর্থ্য র'য়েছে এক একটি ন্যাশনাল ষ্টেট্ হ'য়ে গ'ড়ে ওঠার—কি জনসংখ্যায়, কি ভৌগোলিক বিস্তারে, কি আচার-ব্যবহার, ভাষার সমতায়। কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আমরা স্বতন্ত্র সব ষ্টেটে ভাগ হবো না; সমস্ত ভারতবর্ষে এক রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলবো। দেশী-বিদেশী কোনো বাইরের চাপ নয়, সকলের স্বেচ্ছায়। অশোক, সমুদ্র গুপ্ত, আকবর, ইংরেজের একরাট্ ভারতবর্ষ নয়, ভারতবাসীর মহারাষ্ট্র ভারতবর্ষ। এ মনোভাব কতক ইতিহাসের বিচিত্র গতির ফল, কতক আমাদের রাষ্ট্রীয় শুভবুদ্ধি। এমন মহারাষ্ট্রের কল্পনা ও প্রয়াস পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা। বিশ্বরাষ্ট্রের যে কল্পনা, এ তার একটি ছোট বাস্তব পরীক্ষা এবং নিতান্ত ছোট নয়। পুরণো কি পরিচিত কোনো রাষ্ট্রের নকলে এ রাষ্ট্রকে গড়া চ'লবে না। এর জন্য সৃষ্টি ক'রতে হবে অভিনব রাষ্ট্রীয় শরীর, তাতে সঞ্চার ক'রতে হবে নবছন্দের প্রাণ ও আত্মা। সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শ এখানে অচল। সেখানে রুশিয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাই প্রধান ও নেতা—যাঁরা নূতন রুশিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা। ভারতরাষ্ট্রে কোনো বিশেষ ভাষাগোষ্ঠির এ প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব নেই। যদি কোনো ভাষাগোষ্ঠীর লোকের মনে এমন অভিমান ও আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে, তাদের চৈতন্যোদয় হ'তে বিলম্ব হবে না। আমাদের চোখের সামনে যে ভারতরাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে, তার অভিনবত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য যাদের গতানুগতিক মোহান্ধ চক্ষু দেখ্‌তে পায় না, এর সৃষ্টিকাজে তাদের হাত কর্ম্মনাশা অন্ধের হাত, তারা অতীত পৃথিবীর লোক, বর্ত্তমানের নয়। তারা কাণে শোনে এবং সম্ভব মুখেও বলে, ভারতবর্ষের ঐক্য বহুর মধ্যে একের ঐক্য। কিন্তু তার অর্থ কি কখনও ভাবে নি এবং ও তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ কি তা জানে না।...

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির লোক এমন স্বচ্ছন্দ প্রাণবেগে স্পন্দমান গোষ্ঠীতেই জন্মাতে পারে, নাম-গোত্রহীন পলিটিক্যাল ভারতবর্ষের নির্ব্বিশেষ মহাকাশে নয়। এই সব ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যে শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, আদান-প্রদানে তারা একে অন্যকে প্রভাবিত ক'রবে। তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকবে মিল, মিলের মধ্যে থাকবে বৈচিত্র্য। এর মধ্যে দিয়েই আসবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথার্থ ঐক্য,—শ্রদ্ধার ও প্রীতির ঐক্য, পলিটিক্যাল প্রয়োজনে কোনো স্বার্থের ঐক্য নয়। ভাষার ভেদ এ, ঐক্যের বাধা নয়। শিক্ষিত ভারতবাসী অন্য দেশের ভাষা শিখবে তার সাহিত্যের টানে, তার সৃষ্টির নিবিড় পরিচয়ের লোভে, তার মধ্যে অনেকে আনবে নিজের ভাষা ও সাহিত্যে নতুন রং, নতুন রস। এম্‌নি ক'রেই গ'ড়ে উঠবে প্রকৃত ভারত-সাহিত্য ও ভারতশিল্প, রাষ্ট্রভাষার একবর্ণ তুলির টানে নয়।...

শ্রীঅতুল গুপ্ত

ভাষা ও সাহিত্য

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

হিন্দী বনাম উর্দ্দু: হিন্দী, উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী ভাষা লইয়া যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ করিব। ভাষার নামগত বিরোধের কোনো অর্থ হয় না। যদি উর্দ্দুই হয়, তবে উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে কি? যাহাই হউক, উর্দ্দু তো ভারতীয় ভাষা; উহার বিকাশ ভারতেরই একটি অঞ্চলের মধ্যে অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশে সীমাবদ্ধ। উহার প্রধান কেন্দ্র দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ। ভারতের বাহিরে কোথাও এ ভাষার প্রচলন নাই। যাঁহারা এই ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন ও ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভারতীয়। ইহার মৌলিক গঠনভঙ্গী ও শব্দভাণ্ডার ভারতীয় ভাষা হইতেই সৃষ্ট। যে ভাষা ভারতীয় ভাষারই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহার বিকাশে

কতিপয় ভারতীয় বিরুদ্ধতা করিবে, ইহা আমার কাছে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। এদিকে পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; সেখানে এই ভাষাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ পাকিস্তানে ইহা কাহারও ভাষা নহে। পাকিস্তানের ভাষা হইতেছে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পুস্তু ও বাঙ্গলা। তাহারা উর্দ্দু শিক্ষার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু উর্দ্দু যেরূপ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় প্রভাব সব সময় থাকিবেই। সুতরাং এই ভাষার বিকাশে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার জন্যই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহার প্রমাণও আমি পাইয়াছি। যাহারা উর্দ্দু ভাষার বিরোধী, তাঁহারা হিন্দীর বিকাশের অপেক্ষা উর্দ্দু ভাষার নিন্দা করিয়া কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। অতীতেও দেখিয়াছি, উর্দ্দু ভাষার বড় বড় সমর্থকেরা উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তেমন মনোযোগ না দিয়া হিন্দী ভাষাকে দমাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দী ও উর্দ্দুর এই সব উগ্র সমর্থকদের গোঁড়া মনোভাব নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। ভাষার উন্নতি বিধান করিতে হইলে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন এবং ভাষার এমন ভাবে বিকাশ করিতে হইবে যে অন্যান্য লোকেরা তাহাতে যেন আকৃষ্ট হয়। আমি এ সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষার একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। বিশ্বে ইংরেজি একটি প্রাণবান ভাষা—বর্ত্তমানে ইহা ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। এই ভাষার পশ্চাতে রহিয়াছে দুইটি বিরাট ঐতিহ্য—প্রথমতঃ বাইবেলের সঠিক অনুমোদিত অনুবাদ—ইহাই ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের আদর্শ নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় এবং দ্বিতীয়তঃ সেক্সপীয়রের রচনাবলী—এইগুলি ইংরেজি ভাষার বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বর্ত্তমানে এমন কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি নাই যিনি সেক্সপীয়রের নিকট ঋণী নহেন। ভাষার সমর্থকেরা যেন ইংরেজি ভাষার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যের এমন ভাবে উন্নতি বিধান করেন যে, শুধু স্বদেশ নয়, বিদেশ হইতেও লোকেরা আকৃষ্ট হইয়া সেই ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করে।

প্রাদেশিক ভাষা: বহুকাল পূর্ব্বেই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হইবে। অতীতে সকলেই অভিযোগ করিতেন যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বালকবালিকাদের উদ্যম অনেকখানি নষ্ট হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাঁহাদের এই অভিযোগ সত্য। তাই বর্ত্তমানে যদি মাতৃভাষা ভিন্ন অপর কোনো ভাষায় শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়, তবে ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে আমরা পূর্ব্বে যে যুক্তি দেখাইয়াছিলাম, এখানেও তাহা খাটিবে। ইহার উপর ভারতীয় ভাষা সমূহ এমনভাবে প্রচলিত রহিয়াছে যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। তাই সেই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক। এই সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিতে গেলে বিরোধ দেখা দিতে পারে, হয় ত বা অধিবাসীদের মধ্যে নূতন সংঘর্ষও বাধিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বাঙ্গলা ও আসাম অথবা তামিল ও তেলেগুর প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথা বলা যাইতে পারে। এক ভাষা-গোষ্ঠির লোকেরা যদি চাপ দিতে থাকে যে, তাহাদেরই ভাষায় শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তবে অন্য ভাষাভাষী অধিবাসীরা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। অধিবাসীদের এইরূপ স্থান ত্যাগের ফল হইবে অতীব ভয়ানক। এইরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি কেহ কি চাহেন?

রাষ্ট্রভাষা: অনেক কারণে হিন্দুস্থানী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রাদেশিক ভাষা সমূহ ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই ভাষাগুলির স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত থাকিবে, কারণ আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে সুবিধার জন্য ও রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য সর্ব্ব ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন। অতীতে ইংরেজি ভাষা এই উদ্দেশ্য সাধন করিত, এখনও তাহাই করিতেছে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, কিছুদিনের জন্য এই দিক দিয়া ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা থাকিবে। গণপরিষদে প্রস্তাব করিয়াই কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা চলে না; এমন কি প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করিয়াও রাতারাতি শাসন পরিচালনার উপযোগী রাষ্ট্রভাষা করা যায় না। যাহাই হউক, সময়ে ইংরেজি ভাষার পরিবর্ত্তে সর্ব্বভারতীয় ভাষা দেখা দিবে। আর এই ভাষা হইবে হিন্দুস্থানী ভাষা। হিন্দুস্থানী ভাষার বিকাশে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ, সাধারণ্যে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই শব্দ ইংরেজি, ফরাসী, আরবী, পার্শী, রুশ, জার্মান প্রভৃতি যে কোনো ভাষা হইতেই আসুক না কেন, তাহা সকলের বোধগম্য হইলে রাখিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দুর্ব্বোধ্য শব্দ প্রচলনের যেন ব্যর্থ চেষ্টা না হয়। এমন কি, গ্রামবাসীরা 'ষ্টেশন', 'মোটর' শব্দ বুঝিতে পারে—সে ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রতিশব্দ গঠনের চেষ্টা করা হইলে তাহা অদ্ভুত ঠেকিবে। ভাষার বৃদ্ধি ও প্রসার

থাকা প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিবৎসর প্রায় ৫ হাজার নতুন শব্দ এই ভাষায় গৃহীত হয়। হিন্দুস্থানী ভাষাকেও এইরূপ হইতে হইবে—কোনও শব্দকে বর্জ্জন না করিয়া বরং আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুস্থানী ভাষা সম্পর্কে আর একটি উদারনীতি গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইবে পারিভাষিক শব্দ। অনেক পারিভাষিক শব্দ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে। 'অক্সিজেন', 'নাইট্রোজেন' প্রভৃতি শব্দগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সব শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অথবা আরবী প্রতিশব্দ চালাইবার চেষ্টা করিলে তাহা শুধু যে নিরর্থক হইবে, তাহা নহে; ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে উহা অনাবশ্যক ভার স্বরূপ হইয়া উঠিবে। বিশ্বের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হইলে এই সকল আন্তর্জ্জাতিক পারিভাষিক শব্দগুলি তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। কৃত্রিম পারিভাষিক শব্দ রচনা করিয়া এই সকল শব্দ বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হইবে না। আমি জানি, বর্ত্তমানে বিদেশী শব্দ বর্জ্জনের পশ্চাতে রহিয়াছে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। ভারত বিভাগের ইহা একটা বেদনাদায়ক পরিণতি। আমি শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির কথা বলিতেছি না, দেশবিভাগের ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষতিও যথেষ্ট হইয়াছে। সঙ্কীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেককে পাইয়া বসিয়াছে। আমার মনে হয়, এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী; কারণ ভারতের প্রতিভা সমন্বয় সাধনে চিরকাল নিয়োজিত হইয়াছে। ভারত চিরকাল বিশ্বের অবদান গ্রহণ করিয়াছে এবং বিশ্বকে দে দিয়াছে পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ ও সমন্বয়বাদ। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া ইহার মূল্য শুধু বেশী নয়, জীবনের আচরণের দিক দিয়াও ইহা অমূল্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিনিময়ের দ্বারাই পরমতসহিষ্ণুতার দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হইবে।* (আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ।)

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এক ও অবিচ্ছিন্ন

আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী

ভারতবর্ষে একটি মাত্র সংস্কৃতি আছে এবং তাহা হইল ভারতীয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তাহার সহিত ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্মেরও কিছুটা সংমিশ্রণ হইয়াছে। কাজেই প্রাদেশিক কোনো কিছুর কথা শুনিলে বা লোকেরা প্রাদেশিক ভিত্তিতে চিন্তা করিতেছে দেখিলে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হই।—আমেরিকায় ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্ন ওঠে না। ব্রাজিলের ভাষা পর্ত্তুগীজ। ব্রাজিলে যে কেহ যান, তাহাকে পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর বহু লোক আসে। তাহাদের শিশুসন্তানদিগকে ইংরাজী ভাষা শিখানো হয় এবং তাহাতে কোনই অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষে আমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। ভারতীয় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাইতে হইবে, সেখানে বসবাস করিতে হইবে, অবশ্য স্বতন্ত্র উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া নহে।—সীমান্ত এলাকাগুলিকে দুই ভাষাভাষী এলাকারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। উভয় গোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষা থাকিবে, তবে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য উভয়কে উভয়ের ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

বাংলা দেশকে পুনরায় ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল

যদিও দেশ বিভক্ত হইয়াছে, তথাপি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অখণ্ডই রহিয়াছে; এসকল ক্ষেত্রে কেহই দেশকে বিভক্ত করিতে পারিবে না। একদা বাংলাদেশের নিকট হইতেই আমরা রাজনৈতিক স্বপ্নসুধা পান করিয়াছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সকল বিরাট পুরুষ নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা অনুপ্রেরণা পাইয়াছি। আধুনিক কালে বাংলাদেশ যে দুঃখভোগ করিয়াছে, তাহা কি বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর? ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস কে বিস্মৃত হইতে পারে? যে দুঃখ ও দুর্গতি নোয়াখালি ভোগ করিয়াছে, তাহাই কি ভুলিতে পারা যায়? নোয়াখালিতে বসিয়াই গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শের জন্যই শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। দেশ বিভাগের দিন হইতে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত এক ও অখণ্ড রহিয়াছে এবং সম্ভবতঃ অনাগত বহু শতাব্দী এক ও অখণ্ডই

থাকিবে—এ অবস্থায় ভারতবর্ষে প্রাদেশিক বিরোধ কি ভাবে দেখা দিতে পারে? আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া বা দেশপ্রেমের অভাব ছিল বলিয়া ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় নাই। বিগতকালের দুর্ভাগ্যের দরুণই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে। সে দুর্ভাগ্য আমাদিগকে বিদেশী শক্তির অধীনে রাখিয়াছিল এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে এবং এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং উহারই পরিণতি হিসাবে আমাদিগকে দেশবিভাগেও সম্মতি দিতে হইয়াছে। যখন আমরা দেশবিভাগে সম্মত হই, তখন মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, যত শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়, ততই ভাল। পাঞ্জাব সম্পর্কেও একথা সত্য। পাঞ্জাবে এমন একজন লোকও ছিলেন না, যিনি দেশ বিভাগে সম্মত হন নাই। মনঃকষ্ট সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমরা দেশবিভাগে সম্মত হইয়াছি। দুই একজন লোক যাহাই বলুক না কেন, আজ যদি পুনর্ম্মিলনের কোনো চেষ্টা হয় তবে দেশের অধিকাংশ লোকই বলিবে যে, না আমরা পুনর্ম্মিলন চাহি না। এই মিলন যে কি বস্তু তাহা আমরা জানি। যে মিলন আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে উদ্বেগের সৃষ্টি করিবে এবং যাহা আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিবে না, তাহা আমরা কিছুতেই চাহিনা। আমরা বিভক্ত হইয়াছি, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। যাহারা আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যদি কোনদিন শক্তিশালী হইয়া উঠে, সম্পদের অধিকারী হয় এবং যদি তাহাদের মনে সুবুদ্ধি দেখা দেয় ও মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে তখনই আন্তরিক মিলনের কথা উঠিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিভাগ সত্ত্বেও ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ যে সংস্কৃতির উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া রহিয়াছে, ভৌগোলিক বিভাগ সত্ত্বেও উহা বিভক্ত হইবে না। মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন, বাংলাভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে বিভক্ত করা সম্ভবপর হইবে না।

যাহারা বাস্তুহারাদের দুঃখ কষ্টকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছে, তাহারা বাস্তুহারাদের কোনই কল্যাণ সাধন করিতেছে না। এক শ্রেণীর লোক যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, তাহা যে প্রকৃত সহানুভূতি নহে, যথাসময় তাহা প্রমাণিত হইবে। যে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে, সে গভর্ণমেণ্ট কি করিয়া লক্ষ লক্ষ গৃহহীন নরনারীর কথা বিস্মৃত হইতে পারে বা তাহাদের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তিতে কাল কাটাইতে পারে? কিন্তু প্রবল ঝড়ের সম্মুখে মানুষ হয়ত শত চেষ্টা করিয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।—কেহ যেন একথা মনে না করেন, গভর্ণমেণ্ট সমগ্র সমস্যাটিকে এড়াইয়া চলিতেছেন। সম্ভাব্য সকল প্রকার অবলম্বন করা হইতেছে। দুঃখদুর্গতি বৃদ্ধি পাইতে পারে, এমন কিছুই করা উচিত হইবে না। যাহার দেশপ্রেম বা মনুষ্যত্ব রহিয়াছে, সে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। অদ্যকার অনুষ্ঠানে আমি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আপনারা শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের বক্তৃতা শুনিয়াছেন। আমি সাহিত্যিক নই। একজন কৃষক ও সৈন্য হিসাবে আমার জীবন আরম্ভ হয় এবং গান্ধীজী যে সেনাবাহিনী গঠন করেন, উহাতে আমি যোগদান করি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি একজন সৈন্য হিসাবেই দেশের সেবা করিতে চাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি বাংলার সেবা করিব।

বাংলার যুবসমাজকে আমি বলিতে চাই যে, ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশে কিছু করা হইলে বাংলা দেশ ও বাংলার যুবসমাজের ক্ষতি হইবে। বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের সহিত আপনারা পরিচিত রহিয়াছেন; কিন্তু সে-যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশ্বের দূরত্ব আজ হ্রাস পাইয়াছে। সংবাদ আদান প্রদান দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছে এবং আমরা যাহাই করি না কেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই বাংলার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর—সে-শক্তিকে আমরা যেন কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না করি।—আজ এমন সময় আসিয়াছে যখন আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধভাবে একই উপায়ে সকলের সেবা করিয়া সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমরা যেন নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত না হই।…বাংলাদেশ যতদিন না শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, এবং সমগ্র ভারতের নেতৃত্বলাভ করিতেছে, ততদিন আমাদিগকে অন্য সকল কিছুই বিস্মৃত হইতে হইবে। কেন না, বাংলাদেশ যদি পিছনে পড়িয়া থাকে, বাংলাদেশ যদি পঙ্গু ও ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।*

(প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ।)

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

সর্ব্বভারতীয় ঐক্য

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কিছুকাল যাবৎ ভারতের স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক বুদ্ধির অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এখন হইতেই এই ভাব দূর করিতে না পারিলে সাম্প্রদায়িকতার ন্যায় প্রাদেশিকতাও ভারতের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। বিহার বিহারীর জন্য, আসাম অসমীয়াদের জন্য, বাঙ্‌লা দেশ বাঙ্গালীদের জন্য এই প্রকার ভাবধারা জাতীয়তা এবং ঐক্যের প্রতিপন্থী। এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা দূর করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের স্থানীয় অধিবাসীদের মত প্রবাসীদেরও তৎপ্রদেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, একথা প্রত্যেক দেশবাসীদের পক্ষে প্রযোজ্য। ইংরেজরা যেভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়া দূরবীণ দিয়া দূর হইতে এ দেশবাসীকে দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন না করিয়াই স্বদেশে চলিয়া যাইতেন, ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে বাস করিবার সময়ে যেন সেই মনোবৃত্তি অবলম্বন না করেন।

ভারতে বিভিন্ন প্রদেশগুলির যে স্বাতন্ত্র্যই গড়িয়া উঠুক না কেন, প্রত্যেকেরই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে এক সংস্কৃত ভাষা এবং এক ভারতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতিতে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া শুধু সম্ভবপর নয়, অনায়াস-সাধ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিকলিপি এক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি করে, তাহা দূর করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নহে। আজ যদি সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই স্বীয় লিপির সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগরী লিপিও গ্রহণ করে, অর্থাৎ যদি দেবনাগরী লিপিতেও প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মুদ্রণ হয়, তবে তাহাতে শুধু যে প্রদেশগুলির পক্ষে পরস্পরের সংস্কৃতির স্বাদ গ্রহণ করার পথ সুগম হইবে তাহা নহে, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলি একটা স্বাভাবিক সমন্বয় এবং সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের পথে চলিবে। শুধু অনুবাদের ভিতর দিয়া কেবল বিভিন্ন সাহিত্যের মূল রস পূর্ণভাবে আস্বাদ করা যায় না। সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় লিপি আবশ্যক—এ ক্ষেত্রে দেবনাগরীই হইবে সেই লিপি। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে, লিপি ভাষা নহে, ভাষার চিহ্ন মাত্র। সমগ্র ইউরোপে একই রোমানলিপি প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সেখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কীর্ণতা ও দ্বন্দ্বের লাঘব হয় নাই। তাহা হইলেও যেখানে অভিন্ন ঐতিহ্য ও অখণ্ড রাজনৈতিক সম্বন্ধের পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং যেখানে বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মূল উৎসও অভিন্ন, সেখানে সর্ব্বভারতীয় লিপির চলনের দ্বারা প্রদেশগুলির মধ্যে আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে, প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে এবং সর্ব্বভারতীয় ঐক্য একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সর্ব্বভারতীয় চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রভাব ও মর্য্যাদা ক্ষীয়মাণ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

গত কিছুকাল হইতে একটি অপ্রিয় এবং উদ্বেগজনক সত্য দিন দিন বিশেষ করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্ম্মজগতে বাঙালীর প্রভাব ও মর্য্যাদা অতি দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের নব জাগরণের যুগে বাঙালী শিক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সর্ব্ববিষয়েই এ দেশের নেতৃত্ব করিয়াছে এবং সারা ভারতবর্ষও বাঙালার এই চিন্তানায়কত্ব সশ্রদ্ধচিত্তে মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বাঙালী তাহার পূর্ব্ব প্রাধান্য ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিয়া আজ বহু নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে নানাবিধ গুরুতর সমস্যা ও নানা প্রকার বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া সারা দেশে যে বিপুল কর্ম্মব্যস্ততা চলিতেছে, বাঙালীর স্থান তাহার মধ্যে খুব বেশী নহে।—রাজনীতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালীর এই ক্রমক্ষীয়মাণ প্রভাব বাঙালীর জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। জীবনের অগ্রগতির পথে যে ভাবে আমরা ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে সন্দেহ হয় যে, আমাদের সমাজ-জীবনে কোথাও কোনো মারাত্মক দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে। আমার ধারণা যে, এই দুর্ব্বলতা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। বাঙালী যে আজ তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রতিভার পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যান্য যে কারণই থাকুক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙালীর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যই সর্ব্বাঙ্গীন অবনতির একটি প্রধান কারণ।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ যে কতখানি ঘনিষ্ঠ, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে নানা জাতীয় সরকারী এবং বেসরকারী চাকুরীর উপর শিক্ষিত বাঙালীর প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাহা ছাড়া শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, চিকিৎসক ইত্যাদি-রূপেও তখন বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া

নিজেদের বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এইরূপ উপার্জ্জনের ফলে বাঙ্‌লা দেশে তখন আর্থিক সচ্ছলতা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং এই অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সমাজ-জীবনে নূতন শক্তি ও প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। বাঙলার সেই রেনেসাস-এর যুগে বাঙালী গর্ব্ব করিবার মতো অনেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছে—শিক্ষায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে শিল্পে বাঙালী-প্রতিভা তখন অপূর্ব্ব গৌরবে বিকশিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সহজলভ্য চাকুরী দুর্লভ হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য অর্থোপার্জ্জনের পথও নানা কারণে রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন হইতে আর্থিক অভাবের তাড়নায় বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির প্রখরতা এবং উজ্জ্বলতা দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেশকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, সে কথা বুদ্ধিমান বাঙালীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালীই প্রথম স্বদেশী শিল্প গড়িয়া তুলিবার উদ্যম করিয়াছিল এবং এই জন্য বাঙলার ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রচুর ত্যাগ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীর এ শিল্প-সাধনার স্বপ্ন বাঙলা দেশে সার্থক হইল না, তাহা সফলতা লাভ করিল বাঙলার বাহিরে।

বাঙালীর প্রেরণায় এবং বাঙলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙলার বাহিরে যে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিল, তাহাতে বাঙালীর আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস হইল না। চাকুরী ও শিক্ষিত পেশা (Learned profession)—এই দুইটি চির-পরিচিত অর্থোপার্জ্জনের পথ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে রুদ্ধ প্রায় হইয়া গেল, কিন্তু বাঙালীর ব্যবসাবিমুখ মন শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোনো প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিল না; এই শিল্পবিমুখতার ফলে আজ সারা বাংলাদেশ শুধু ক্রেতা' বা Consumnig Province-এ পরিণত হইয়াছে। বাঙালী আজ তাহার জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সবই বাহির হইতে কিনিতে বাধ্য। কাপড়, চিনি, তেল ইত্যাদি সকল জিনিষেরই জন্য সে অপর প্রদেশের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন ক্ষমতার অভাবে বাঙলার জাতীয় অর্থসম্পদ ক্রমশঃ দ্রুতবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং সমস্ত বাঙালী জাতি ক্রমশঃ দীনদরিদ্র, বেকার ও ভিখারীতে পরিণত হইতেছে।

এই ভয়াবহ দারিদ্র্য ও দুর্দশার একমাত্র প্রতিকার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্য বিস্তার। বাঙালী যদি এখনও চাকুরীর মোহ ত্যাগ না করিয়া শিল্পবাণিজ্য-বিমুখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙালী জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, ইহাতে সন্দেহ নাই।

* (বৃহত্তর বঙ্গ শাখায় প্রদত্ত ভাষণ।)

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(ক) সম্মেলনের দৃঢ় অভিমত এই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ হইতে অবলম্বিত হওয়া উচিত।

(খ) সম্মেলন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সাধারণনীতি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়।

(গ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারিগণের স্ব স্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের যে সকল সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমানে রহিয়াছে, অথবা কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, তাহা যাহাতে কোনোভাবে ক্ষুন্ন না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সম্মেলন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও অন্যান্য শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন। কোনো বিশেষ ভাষাভাষি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য সচেষ্ট হইলে রাষ্ট্রের তরফ হইতে যাহাতে কার্য্যকরিভাবে সেই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়, তজ্জন্যও সম্মেলন অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ঘ) সম্মেলনের অভিমত এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম কোন্ ভাষা হইবে, সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রাখা উচিত।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজি ভাষার পরিবর্ত্তে অপর কোনো ভারতীয় ভাষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে যে সকল ছাত্রের মাতৃভাষা উক্ত ভাষা নহে, তাহাদের সেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য যথাযোগ্য সময় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

(চ) সম্মেলন মনে করেন যে, বাঙলার বাহিরে বসবাসকারী বাঙালী ছাত্রগণের পক্ষে বাঙলা ভাষার ন্যায় স্থানীয় রাষ্ট্র ভাষাও যত্ন এবং অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা কর্ত্তব্য।

(ছ) সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রাথমিক অথবা পরবর্ত্তী শিক্ষাকালে মাতৃভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক না রাখার নীতি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলা চলে। সুতরাং সম্মেলন দৃঢ়ভাবে দাবী জানাইতেছেন—প্রবেশিকা অথবা অনুরূপ শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষা শিক্ষা যাহাতে বাধ্যতামূলক থাকে, তৎপ্রতি শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(জ) প্রত্যেক প্রদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি ও শিক্ষার মাধ্যম নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রাদেশিক শিক্ষা সচিব ও বিভিন্ন ভাষার শিক্ষাবিদ্‌দের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের এক সম্মেলন আহ্বানের অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ও অন্যান্য প্রধান প্রাদেশিক ভাষাসমূহ যাহাতে এম্. এ, শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াইবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকে, তজ্জন্যও সম্মেলন অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

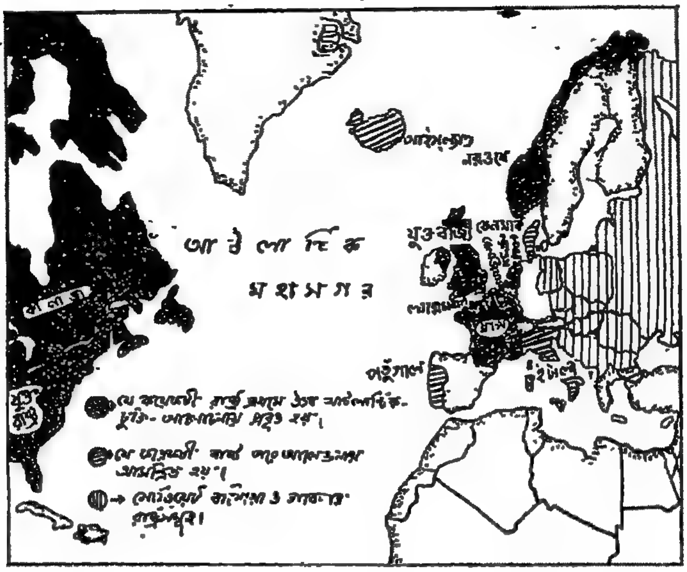

১৮ই মার্চ পি- টি-আই-আর ওয়াশিংটনের একটি সংবাদ পরিবেশন করিয়া বলে: অন্ত পশ্চিমের সাতটি দেশ (বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, লুক্সেমবুর্গ ও হল্যাণ্ড) এই নোটিশ দিয়াছে যে, ইউরোপ অথবা উত্তর আমেরিকায় কোনো আক্রমণ হইলে তাহারা সমবেতভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছুক।

এই সংবাদ পরিবেশনের মূল ভিত্তিস্থল হইল উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি—যাহার খসড়াটি সুদীর্ঘ আটমাস ধরিয়া গোপনে আলোচনা চলিবার পর উক্ত সাতটি দেশে এক সহযোগে প্রকাশ করা হয়, এবং ইহাতে ভবিষ্যৎ স্বাক্ষরের জন্য নিমন্ত্রণ থাকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইস্‌ল্যাণ্ড, পর্তুগাল এবং ইতালীর।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাশিয়াকে এই চুক্তির বাহিরে রাখা হইয়াছে, অথবা রাশিয়াই আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া এই চুক্তি হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন এবং সম্পদশালী আমেরিকার চির-কালের শত্রু সাম্যবাদী রাশিয়া। বিশেষতঃ বার্লিন অধিকারের পর পূর্ব জার্ম্মাণে সোভিয়েট-একনায়কত্বের উদ্যোগে ইঙ্গ-মার্কিনের চোখে রাশিয়া আরও তিক্ত ও ভীতিস্থল হইয়া উঠিয়াছে। বিবাদ যদি চরম হইয়া ওঠে, তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত মিত্রশক্তি কতার করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। কারণ যন্ত্র এবং অস্ত্র-শক্তিতে রাশিয়া এখনও পুরাপুরি সম্পদ্‌শালী। যদিও সেই সম্পদ আমেরিকায়ও পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে এখনই অবতীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে নিরাপদ নয়। যুদ্ধকে এড়াইবার জন্যই তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় আত্মবল বাড়াইবার জন্য ব্যাকুল প্রয়াস দেখা দিয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্র-মানসে। বার্লিনের এক গুজবে প্রকাশ—সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন। রাশিয়া ও পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে পারে। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের একটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য: এই বারই সর্ব্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক সময়ে পশ্চিম গোলার্দ্ধের বাহিরের কতকগুলি দেশের সহিত সম্মিলিত নিরাপত্তা চুক্তির অংশীদার হইল। ইহা অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি নূতন অধ্যায়। কিন্তু রাষ্ট্রসচিব একিসনের উক্তির সহিত আমরা একমত যে, ইহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র তাহার আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বকেই মানিয়া লইতেছে।' সোভিয়েট রাশিয়া যখন শান্তির পথ অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রকেও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই পশ্চিমী জাতিগুলির সহিত মিলিত হইতে হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই চুক্তিটীর মূল উদ্দেশ্য কেবল নিরাপত্তা

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

রক্ষাই নয়,—জগতের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিউইয়র্ক টাইম্‌সের উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই আসল তত্ত্বটি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত লণ্ডন-ওয়াকিবহাল মহলেরও ধারণা—'এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মস্কোর শাসনবিভাগের সাম্প্রতিক অদলবদলের উপর সর্ব্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।' এদিকেও আন্তর্জ্জাতিক-বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কথা।

'চুক্তিটির পিছনে যে-একটি নতুন যুদ্ধোদ্যম লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট আভাষিত হইয়া উঠিয়াছে ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব রবার্ট স্যুমানের একটি ভাষণে। তিনি বলেন: 'আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে'। —এ-কথার তাৎপর্য্য কি ইহাই নয় যে, তলে তলে একমাত্র যুদ্ধকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্যই এই অস্ত্র সংস্থানের প্রয়াস। অথচ ইতিপূর্ব্বে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে রাশিয়ার সমর্থন দেখা যায়। ১৯শে মার্চ্চ আটলাণ্টিক চুক্তির সমালোচনা করিয়া মস্কো বেতার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, 'এই চুক্তির অর্থ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম; লক্ষ লক্ষ লোক এই বিষয় উপলব্ধি করিতেছেন।' মস্কোবেতারের ভাষ্যকার ডাঃ লেমিন বলেন যে, 'যুদ্ধের উদ্যোগ এই চুক্তির বিরুদ্ধে ইটালীতে যে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বের কোটি কোটি জনসাধারণের মনোভাবের অভিব্যক্তি। আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তিগোষ্ঠী সংগঠনে ইঙ্গ-মার্কিন জঙ্গীবাদী ও তাহাদের সহায়কগণ দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হইতেছে, এইসব ব্যাপার তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি শান্তি স্থাপন করে দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেছে। ইটালীর শ্রমিকসমাজ আটলাণ্টিক চুক্তির ঘোর প্রতিকূলতা করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও গণসমর্থক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের উদ্দেশ্য লইয়া এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।'

রাষ্ট্রসচিব একিনের বিবৃতির সঙ্গে ডাঃ লেমনের বিবৃতিটি মিলাইয়া দেখিলে দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদেরই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। এখানে এই আশঙ্কা হওয়া অমূলক নয় যে, এই পরস্পরবিরোধী মতবাদই এক সময় বিশ্ববিন্যাসের বিষোদ্গারণ করিবে। ইহার উপর একটি বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন বলেন: 'যদি কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমবায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিসন্ধি রহিয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিয়া থাকেন, তবে আমি মাত্র এই কথাই বলিব যে, আমাদের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ইহা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে সকল প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, আটলাণ্টিক চুক্তি উহাদের অন্যতম। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। ব্যাপকতম ভিত্তিতে যৌথ নিরাপত্তাবিধানই চুক্তির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি যে, এমন রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে এই যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইবে।'

মিঃ বেভিনের বিবৃতির উপরে একটি কথাই বিশেষ ভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ্ অব্ নেশনসের সৃষ্টি হইল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উহা রূপান্তরিত হইল ইউ-এন্-ও'তে এবং তাহারও একটি বৃহত্তর (মহত্তর!) রূপের বিকাশ ঘটিল উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিতে, কিন্তু কেন এবং কিসের অব্যবস্থায় ও কাহার ষড়যন্ত্রে বার বার নিরাপত্তার এই রূপান্তর লাভ? তাহার জন্য কি একমাত্র রাশিয়াই দায়ী, না তাঁহারাও এই অপকৃষ্টির মূলে বিরাট কিছু একটা মূলধনের প্রত্যাশায় বারবার সজ্জা পরিবর্ত্তন করিতেছেন? এ প্রশ্ন কঠিন প্রশ্ন হইলেও সাধুজনবাক্য এখানে উল্লেখযোগ্য: 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাও।' ধর্ম্মপালনের কঠিন তপস্যায় সে শিক্ষা কি মিত্ররাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত যথার্থ ই জগৎকে দিয়াছেন?

এবারে চুক্তির মূল পটভূমির দিকে লক্ষ্য করি।

চুক্তির পঞ্চম ধারায় বলা হইয়াছে—আক্রমণকালে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই ধারায় বর্ণিত

সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কেই সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উক্ত ধারায় বিধান রহিয়াছে যে, কোনো আক্রমণ হইলে এবং উত্তরে আটলাণ্টিক অঞ্চলে নিরাপত্তা পুনঃ সংস্থাপন ও রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাপরিষদকে তাহা জানাইতে হইবে।—বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের রহিয়াছে বা সম্মিলিত জাতিবর্গের সনদ অনুযায়ী যে সকল বাধ্য-বাধকতা বর্ত্তাইয়াছে, এই চুক্তির দ্বারা তাহা কোনো ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

চুক্তির অষ্টম ধারায় বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ, যেমন ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি, ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি—সম্পর্কে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি দেশ ঘোষণা করে যে, বর্ত্তমানে যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রহিয়াছে, ইহা দ্বারা সেই-গুলির কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না বা সংশ্লিষ্ট দেশগুলি এমন কোনো নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে না যাহা এই চুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে।—স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি দেশ যাহাতে সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হইতে পারে, এই চুক্তিতে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চুক্তি দশ বৎসরকাল বলবৎ থাকার পর কোনো স্বাক্ষরকারী দেশ অনুরোধ করিলে চুক্তির সর্ত্তসমূহ পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। কুড়ি বৎসর পর কোনো স্বাক্ষরকারী দেশ ইচ্ছা করিলে এক বৎসরের নোটিশ দিয়া এই চুক্তির বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

চুক্তির পূর্ণবিবরণীর মুখবন্ধে বলা হয়: এই চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহে পুনরায় পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং সকল জাতি ও বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের সহিত শান্তিতে বসবাসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে। চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি তাহাদের জনসাধারণের স্বাধীনতা, ঐতিহ্য এবং সভ্যতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উত্তর আট-লাণ্টিক এলাকায় জনসাধারণের কল্যাণ ও তাহাদের নিরাপত্তা বিধানই তাহাদের লক্ষ্য।

পি-টি-আই-আর-এর প্রদত্ত রিপোর্টে চুক্তির মূল-স্বরূপ দাঁড়ায় উপরোক্ত রূপ।

কিন্তু অস্ত্রসজ্জাই যদি শান্তিরক্ষার একমাত্র পথ হইয়া থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বে সেই শান্তির স্বরূপ কতদূর রক্ষা পাইবে, তাহা বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহের কারণ। যন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রকেই উন্নত রাখা যায়, তাহাতে প্রেমের সঞ্চার সম্ভব নয়। সেই প্রেম ও শান্তিমন্ত্রের উদ্গাতা একমাত্র ভারতবর্ষ। মহাত্মাজীর প্রদর্শিত আদর্শের পথই প্রকৃত শান্তির পথ। বিশ্বশান্তির খসড়া প্রণয়ন-কারীরা সে পথে না আসিয়া চলিতেছে ঘোর জিঘাংসার পথে। এ পথ যদি শান্তির পথই হইবে, তবে ক্রমাগত চুক্তির পর চুক্তি হইয়া আবার সেই চুক্তি বিচূর্ণ হইয়া যাইবে কেন? লীগ অব নেশন্স, হারভার্ড য়ুনিভার্সিটির উদ্ভব, ইয়াল্টা-চুক্তি, পটস্‌ডম-চুক্তি, ইউ, এন্, ও—কোনোটাই কি শেষ পর্য্যন্ত তাহার আইন ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিল? এই না চলিতে পারার একমাত্র কারণ হইতেছে পূর্ণ মানবিক আদর্শে আন্তরিকতার অভাব। হৃদয়স্থল বড় না হইলে যত 'প্ল্যান' ও অস্ত্রসজ্জারই প্রাচুর্য্য দেখা দিক না কেন, শান্তি চিরকালই দূর-পথ দিয়া চলিবে।* অথচ মজার ব্যাপার এই যে, বৃহত্তর বিশ্বের সভ্যতার সংরক্ষণকারী এই সব বাঘু রাষ্ট্রবিদ্‌গণের চুক্তিনামার পিছনে অনুরূপ হৃদয়ঘটিত কোনো কার্য্যের সুচারুপ্রসুতা আজ অবধি তেমন একটা দেখা গেল না।

চুক্তি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার ক্রম-অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জনৈক সাংবাদিকের নিকট মঃ ষ্ট্যালিন বলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একযোগে যুদ্ধকে বিশ্ব রাজনীতিক্ষেত্র হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া ঘোষণা প্রচার করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং এমন কি, এ সম্বন্ধে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার জন্য প্রয়োজন-বোধে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছেন।—ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ ইহাই প্রমাণিত হইবার সুযোগ থাকিত যে, বিশ্বশান্তির উদ্যোগে সোভিয়েট যেমন বিঘ্নস্বরূপ নয়, তেমনি চুক্তি সম্পাদনের

* মৎপ্রণীত 'সমাজ-দর্শন', পৃষ্ঠা ৪৩-৭২ দ্রষ্টব্য

অনুকূলে তাহার উদ্যোগী উৎসাহ পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তার মূলোচ্ছেদ করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই বাঞ্ছিত পথ দুরতিক্রম্য হইয়া দাঁড়াইল। স্বভাবতঃই তখন সোভিয়েটের লক্ষ্য পড়িল নরওয়ের দিকে। নরওয়ে এবং রাশিয়ার সীমান্ত পারস্পরিক সংলগ্ন। এইরূপ ক্ষেত্রে নরওয়ে আটলান্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে সোভিয়েটবিরোধী সমরায়োজন ব্যাপারে নরওয়েকে ঘাঁটি করিয়া চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি মিলিত ভাবে আক্রমণোদ্যত হইতে পারে। নরওয়েকে এইরূপ ঘাঁটিতে পর্য্যবসিত করিবার কোনোরকম কারণ ঘটিবে না বলিয়া যদিও নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট আশা দেন, কিন্তু সে আশায় আশ্বস্ত হইবার মতো লোক ন'ন ষ্ট্যালিন। এই কারণেই সোভিয়েট কূটনৈতিক বিভাগ নরওয়ে গভর্ণমেণ্টকে জানান যে, সোভিয়েটের সংশয় নিরসনকল্পে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

—নরওয়ে যদিও এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে রাজী হইল না, কিন্তু আট্লাণ্টিক চুক্তিতেও স্বাক্ষর করিতে ভরসা পাইল না। মনে মনে তাহার সোভিয়েট-চাপের ভয় থাকিয়া গেল। ইতিমধ্যে সুইডেনের পক্ষ হইতে নরওয়ে ও ডেনমার্কের স্কাণ্ডিনাভিয়ান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের আমন্ত্রণ আসে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে পাঁচটি সর্ত্তে সম্মত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়;—এইগুলি সবই মধ্যকালীন বা সাময়িক চুক্তি। ৪ঠা এপ্রিলের পাকা স্বাক্ষরের হিসাবে দেখা গেল—আত্মস্বাতন্ত্র্য তথা সন্ত্রাসমুক্ত হইবা নরওয়ে ও ডেনমার্ক আট্লাণ্টিক-চুক্তিতে পাকাপাকিভাবেই আবদ্ধ হইয়াছে। মোট ১২টি দেশ আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যথা: বেল্‌জিয়াম (এম্. পল. হ্যারি স্পাক), কানাডা (মিঃ লেষ্টার পিয়ারসন), ডেনমার্ক (মিঃ জি রাসমুসেন), ফ্রান্স (মিঃ রবার্ট স্যুম্যান), আইস্‌ল্যাণ্ড (মিঃ জারৃণি বেনিডিক্‌শন), ইটালী (কাউণ্ট কার্লো ফর্জ্জা), লুক্সেমবুর্গ (মিঃ জোসেফ বেচ), নেদারল্যাণ্ডস্ (মিঃ ডার্ক ষ্টিকার), নরওয়ে (ডাঃ হল্‌ভার্ড লেঞ্জ), পর্ত্তুগাল (সিনর সি. ডা. মাট্টা), ইউনাইটেড কিংডম (মিঃ আর্নেষ্ট বেভিন), এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস্ (মিঃ ডিন একিসন)।

এই উপলক্ষ্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেন:

It would create a bulwork behind which the people of the world could get on with 'achieving a fuller and happier life.' In taking steps to prevent aggression against our own peoples we have no purpose of aggression against others. To suggest the contrary is to slander our institutions and defame our deals and our inspirations.—We have come together in a great co-operative economic effort, but we cannot succeed if our people are haunted by the constant fear of aggression and burdened by the cost of preparing their nations individually against attack. The alliance was a simple document but if it had existed in 1914 and in 1939, supported by the nations which are represented here to-day, I believe it would have prevented the acts of aggression which led to two world wars.

ইহার পরেও বলিতে হয়, যদি যুদ্ধোত্তমই এই চুক্তির পিছনে ইন্‌জেক্‌শনের মতো কাজ না করিবে, তবে পি. টি. আই. আর. উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিবে কেন—The North Atlantic Treaty unites 12 western countries with a total population of 332,439,000 nearly 15 per cent more manpower than the Soviet Group; অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়াই হইতেছে চুক্তি-আবদ্ধ এই বারোটি দেশের একমাত্র শত্রু। রাশিয়াকে পর্য্যুদস্ত ও শতচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই বিশ্বশান্তির বিজয়বৈজয়ন্তী। সম্ভবতঃ এই কারণেই ইতিপূর্ব্বে মার্শাল প্ল্যানের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় তথা এশিয়ার দেশগুলিকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ধীরে ধীরে হাত করিতে চাহিয়াছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়াসে সমস্ত দেশে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল মার্শাল প্ল্যান, এখন সামরিক শক্তির বিস্তার ঘটাইয়া জনবল ও অস্ত্রবলের আশ্বাস দিয়া দাঁড়াইয়াছে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি। "একমেব বহু স্যাম্": এক ইচ্ছারই বিভিন্ন প্রকাশ। ইহাই যদি বিশ্বশান্তি ও বিশ্বকল্যাণের পথ সুগম করে, তবে বলিতে হয়, 'ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও।'

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

রূপলোক

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল

কালিকা থিয়েটারে সপ্তাহে একবার করিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মমূলক নাটক "বিল্বমঙ্গল" অভিনীত হইতেছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম—এতদিন পরে নাটকখানির পুনরায় মঞ্চাবির্ভাবে ইহার গভীর ভাবও প্রকটিত হইবে না, গানগুলিরও ভাব সংরক্ষিত হইবে না। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম যাঁহারা খাঁটি অভিনয় করিতে জানেন, অনুকরণের দিকে যান না, স্থান ও ভাব রক্ষা করিয়া চরিত্রের রূপদান করেন, তাঁহারা নূতনই হৌন পুরাতনই হৌন, তাঁহাদের সাত্ত্বিক অভিনয়ে লোক মুগ্ধ হইবেই। কালিকা থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী সবই আধুনিক যুগের, কিন্তু মনে হয়—গিরিশচন্দ্রের সময়েও অন্যভাবের অভিনয় হইত না। কেহই কোনরূপ অনুকরণপ্রিয়তা দেখান নাই, অস্বাভাবিক ভাবে হাত পা নাড়েন নাই এবং কোথাও ভাবের বৈলক্ষণ্য প্রকটিত হয় নাই। আজকালকার দিনে গিরিশচন্দ্রের নাটক যাঁহারা অচল বলেন, একবার কালিকা থিয়েটারের অভিনয় দেখিলে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইবে।

শ্রীমতী মলিনা অতি প্রাণস্পর্শীভাবে অভিনয় করিয়াছেন ও বিভিন্ন ভাবগুলি অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে চিন্তামণির ভূমিকায় এরূপ অভিনয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 'ধন্য সংস্কার, বসি তরুতলে মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর'—প্রভৃতি পংক্তির আবৃত্তি হইলে আরও ভাল হয়। পাগলিনীর গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী রাধারাণীর 'চিন্তামণি কভু এলোকেশী'—আবৃত্তিটিতে নাট্যকারের আদর্শ সংরক্ষিত হইয়াছে। রাখাল বালকটিও খুব ভাল হইয়াছে। ভিক্ষুকের গানেও ভাব সংরক্ষিত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়বাবু বিল্বমঙ্গলের অভিনয় অতি দরদের সহিত করিয়াছেন। 'ভেবে দ্যাখ মন' প্রভৃতি অংশেরও আবৃত্তি হওয়া উচিত। অন্যান্য ভূমিকাও মন্দ হয় নাই। তবে 'সোমগিরি'কে তাচ্ছিল্য করা না হইলেই ভাল হয়।

বিল্বমঙ্গলের পুনরভিনয়ের আয়োজন করিয়া এবং তাহাকে সুষ্ঠুভাবে রূপদান করিয়া কালিকা থিয়েটার সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

'বহুব্রীহি' চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য।

'সন্দীপন পাঠশালা'র জের

কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসটি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হওয়ার পর বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত গ্রন্থে মাহিষ্য সম্প্রদায়কে ছোট করা হইয়াছে। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁহাদিগকে এই

আশ্বাস দেন যে, গ্রন্থকার ও চিত্রের প্রয়োজকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া শীঘ্রই তিনি ইহার একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ইহার কয়েকদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে হাওড়ার একটি সভার কাজ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিবার পথে কতিপয় উন্মত্ত যুবক কর্তৃক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুতররূপে আহত হন। যুবকবৃন্দ মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী যোড়ই এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন—'পুস্তকে ও চিত্রে যাহাদিগকে ঘৃণিত, নীচ ও অস্পৃশ্য বলিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে সকল লজ্জা ও অপমান সহ্য করিয়া অতুল্য বাবু ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপমান করিবার উদ্ধত সাহস রাখিলেন এবং মহাত্মাজীর সাধের শ্রেণীহীন সমাজ-গঠনের স্বপ্নকে কুঠারাঘাত করিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেস-সম্পাদকের নীরবতা সত্যই বেদনাদায়ক। আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের নরনারীকে তিনি শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তেমনিভাবে উক্ত চিত্রপ্রদর্শনও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার কথা চিন্তা করিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু তাহা না হওয়ায় বাংলার মাহিষ্যগণ অসন্তুষ্ট।'

অসন্তুষ্টি যে শেষ পর্য্যন্ত এতদূর গড়াইবে, ইহা কল্পনার অতীত ছিল। শিক্ষিত ভদ্র সমাজের শালীনতা-বোধ বলিয়া এতকাল যে গর্ব্ব ছিল, শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঘাতের দ্বারা তাহা কি ধূলিসাৎ হইয়া গেল না? মাহিষ্য-সমিতির ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলিয়াছেন যে, উক্ত উন্মত্ত যুবকবৃন্দ কাহারা, তাহা তাঁহারা জানেন না। কিন্তু ইহা কি বাস্তবিকই লজ্জার বিষয় নহে যে, উক্ত যুবকবৃন্দ যাহারাই হউক—তাহারা মাহিষ্যশ্রেণীভুক্তই, অন্যথায় এইরূপ নিরর্থক আন্দোলনের অজুহাত লইয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐরূপ ভাবে আক্রমণ করিতে দুঃসাহসী হইত না। শ্রীযুক্ত যোড়ই তাঁহার বিবৃতিতে 'মহাত্মাজীর সাধের শ্রেণীহীন সমাজ'-এর উল্লেখ করিয়া উন্নাসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হয় ত জানেন না যে, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর মহাত্মাজীর আদর্শেই একসময় স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কোনো সমাজ-সচেতন দরদী লেখকের পক্ষেই দেশের জনগণের প্রতি আঘাত করিয়া কিছু লেখা সম্ভব নয়। 'সন্দীপন পাঠশালা'য়ও তেমন কোনো আঘাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যোড়ই এবং ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হংসধ্বজ ধাড়ার নিকট ৮-৪-৪৯ তারিখে একপত্রে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য:

'চাষী কৈবর্ত্ত জল-অচল সম্প্রদায় এই কথায় সম্ভবতঃ প্রথম এবং প্রধান আপত্তি আপনাদের। কারণ চাষী-কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্প্রদায় এক—এই আপনাদের বক্তব্য (মাহিষ্য শব্দের উল্লেখ চিত্রে বা পুস্তকে কোথাও নাই)। এই লইয়া সামাজিক ইতিহাসের ব্যবহারিক অর্থাৎ বিগত প্রচলিত প্রথার আলোচনা থাক। শুধু এইটুকু বলিব যে, মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি যে অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় অবস্থাপন্ন, শিক্ষায় অগ্রসর, যাহাদের মধ্যে শাসমল, ধাড়া, যোড়ই প্রভৃতি নানা উপাধি প্রচলিত আছে এবং যাঁহারা মাহিষ্য, তাঁহাদের সঙ্গে আমার নায়ক ও তাহার সম্প্রদায়ের যেন পার্থক্য আছে। বীরভূম, বর্দ্ধমানে দাস কৈবর্ত্ত উপাধিধারী এক শ্রেণী আছেন, যাহারা ঐ সব অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত। দাস ছাড়া অন্য উপাধি আমার চোখে পড়ে নাই। আমার নায়কের উপাধিও দাস। কৃষিজীবী শান্তিপ্রিয় মানুষ, কৃষিবৃত্তিতে অসাধারণ পারদর্শিতা। আচারে ব্যবহারে সদ্‌গোপ প্রভৃতি নবশাখ সম্প্রদায়ের শুচিতা ও রুচিতে কোনো পার্থক্য নাই, অথচ তাঁহারা সমাজে জল অচল সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত। শিক্ষায় তাঁহারা সদ্‌গোপ সম্প্রদায় হইতে পশ্চাৎপদ, আজও পর্য্যন্ত ইহাদের কেহ ম্যাট্রিক পাশ করেন নাই। আমি ইঁহাদের লইয়া লিখিয়াছি।...আপনাদের মনে আঘাত লাগে, এমন কোনো উক্তি করা আমার অভিপ্রেত নয়। কাহারও

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

রূপলোক

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল

কালিকা থিয়েটারে সপ্তাহে একবার করিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মমূলক নাটক "বিল্বমঙ্গল" অভিনীত হইতেছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম --এতদিন পরে নাটকখানির পুনরায় মঞ্চাবির্ভাবে ইহার গভীর ভাবও প্রকটিত হইবে না, গানগুলিরও ভাব সংরক্ষিত হইবে না। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম যাঁহারা খাঁটি অভিনয় করিতে জানেন, অনুকরণের দিকে যান না, স্থান ও ভাব রক্ষা করিয়া চরিত্রের রূপদান করেন, তাঁহারা নূতনই হৌন পুরাতনই হৌন, তাঁহাদের সাত্ত্বিক অভিনয়ে লোক মুগ্ধ হইবেই। কালিকা থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী সবই আধুনিক যুগের, কিন্তু মনে হয়—গিরিশচন্দ্রের সময়েও অন্য ভাবের অভিনয় হইত না। কেহই কোনরূপ অনুকরণপ্রিয়তা দেখান নাই, অস্বাভাবিক ভাবে হাত পা নাড়েন নাই এবং কোথাও ভাবের বৈলক্ষণ্য প্রকটিত হয় নাই। আজকালকার দিনে গিরিশচন্দ্রের নাটক যাঁহারা অচল বলেন, একবার কালিকা থিয়েটারের অভিনয় দেখিলে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইবে।

শ্রীমতী মলিনা অতি প্রাণস্পর্শী-ভাবে অভিনয় করিয়াছেন ও বিভিন্ন ভাবগুলি অতি চমৎকার-ভাবে ফুটাইয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে চিন্তামণির ভূমিকায় এরূপ অভিনয় দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। 'ধন্য সংস্কার, বসি তরুতলে মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর'—প্রভৃতি পংক্তির আবৃত্তি হইলে আরও ভাল হয়। পাগলিনীর গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী রাধারাণীর 'চিন্তামণি কভু একো কেনী' —আবৃত্তিটিতে নাট্যকারের আদর্শ সংরক্ষিত হইয়াছে। রাখাল বালকটিও খুব ভাল হইয়াছে। ভিক্ষুকের গানেও ভাব সংরক্ষিত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়বাবু বিল্বমঙ্গলের অভিনয় অতি দরদের সহিত করিয়াছেন। 'ভেবে দ্যাখ মন' প্রভৃতি অংশেরও আবৃত্তি হওয়া উচিত। অন্যান্য ভূমিকাও মন্দ হয় নাই। তবে 'সোমগিরি'কে তাচ্ছিল্য করা না হইলেই ভাল হয়।

বিল্বমঙ্গলের পুনরভিনয়ের আয়োজন করিয়া এবং তাহাকে সুষ্ঠুভাবে রূপদান করিয়া কালিকা থিয়েটার সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

'সন্দীপন পাঠশালা'র জের

কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসটি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হওয়ার পর বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত গ্রন্থে মাহিষ্য সম্প্রদায়কে ছোট করা হইয়াছে। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁহাদিগকে এই

'বহুব্রীহি' চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য।

আশ্বাস দেন যে, গ্রন্থকার ও চিত্রের প্রয়োজকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া শীঘ্রই তিনি ইহার একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ইহার কয়েকদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে হাওড়ায় একটি সভার কাজ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিবার পথে কতিপয় উন্মত্ত যুবক কর্তৃক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় গুরুতররূপে আহত হন। যুবকবৃন্দ মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোড়ই এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন—'পুস্তকে ও চিত্রে যাহাদিগকে ঘৃণিত, নীচ ও অস্পৃশ্য বলিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে সকল লজ্জা ও অপমান সহ্য করিয়া অতুল্য বাবু ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপমান করিবার উদ্ধত সাহস রাখিলেন এবং মহাত্মাজীর সাধের শ্রেণীহীন সমাজ-গঠনের স্বপ্নকে কুঠারাঘাত করিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেস-সম্পাদকের নীরবতা সত্যই বেদনাদায়ক। আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের নরনারীকে তিনি শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তেমনিভাবে উক্ত চিত্রপ্রদর্শনও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার কথা চিন্তা করিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু তাহা না হওয়ায় বাংলার মাহিষ্যগণ অসন্তুষ্ট।'

অসন্তুষ্টি যে শেষ পর্য্যন্ত এতদূর গড়াইবে, ইহা কল্পনার অতীত ছিল। শিক্ষিত ভদ্র সমাজের শালীনতা-বোধ বলিয়া এতকাল যে গর্ব্ব ছিল, শ্রীযুক্ত বন্দো-পাধ্যায়কে আঘাতের দ্বারা তাহা কি ধূলিসাৎ হইয়া গেল না? মাহিষ্য-সমিতির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলিয়াছেন যে, উক্ত উন্মত্ত যুবকবৃন্দ কাহারা, তাহা তাঁহারা জানেন না। কিন্তু ইহা কি বাস্তবিকই লজ্জার বিষয় নহে যে, উক্ত যুবকবৃন্দ যাহারাই হউক—তাহারা মাহিষ্যশ্রেণীভুক্তই, অন্যথায় এইরূপ নিরর্থক আন্দোলনের অজুহাত লইয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐরূপ ভাবে আক্রমণ করিতে দুঃসাহসী হইত না। শ্রীযুক্ত ঘোড়ই তাঁহার বিবৃতিতে 'মহাত্মাজীর সাধের শ্রেণীহীন সমাজ'-এর উল্লেখ করিয়া উন্নাসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হয় ত জানেন না যে, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর মহাত্মাজীর আদর্শেই একসময় স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কোনো সমাজ-সচেতন দরদী লেখকের পক্ষেই দেশের জনগণের প্রতি আঘাত করিয়া কিছু লেখা সম্ভব নয়। 'সন্দীপন পাঠশালা'য়ও তেমন কোনো আঘাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ঘোড়ই এবং ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হংসধ্বজ ধাড়ার নিকট ৮-৪-৪৯ তারিখে একপত্রে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

'চাষী কৈবর্ত্ত জল-অচল সম্প্রদায় এই কথায় সম্ভবতঃ প্রথম এবং প্রধান আপত্তি আপনাদের। কারণ চাষী-কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্প্রদায় এক—এই আপনাদের বক্তব্য (মাহিষ্য শব্দের উল্লেখ চিত্রে বা পুস্তকে কোথাও নাই)। এই লইয়া সামাজিক ইতিহাসের ব্যবহারিক অর্থাৎ বিগত প্রচলিত প্রথার আলোচনা থাক। শুধু এইটুকু বলিব যে, মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি যে অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় অবস্থাপন্ন, শিক্ষায় অগ্রসর, যাহাদের মধ্যে শাসমল, ধাড়া, ঘোড়ই প্রভৃতি নানা উপাধি প্রচলিত আছে এবং যাঁহারা মাহিষ্য, তাঁহাদের সঙ্গে আমার নায়ক ও তাহার সম্প্রদায়ের যেন পার্থক্য আছে। বীরভূম, বর্দ্ধমানে দাস কৈবর্ত্ত উপাধিধারী এক শ্রেণী আছেন, যাহারা ঐ সব অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত। দাস ছাড়া অন্য উপাধি আমার চোখে পড়ে নাই। আমার নায়কের উপাধিও দাস। কৃষিজীবী শান্তিপ্রিয় মানুষ, কৃষিবৃত্তিতে অসাধারণ পারদর্শিতা। আচারে ব্যবহারে সদ্‌গোপ প্রভৃতি নবশাখ সম্প্রদায়ের শুচিতা ও রুচিতে কোনো পার্থক্য নাই, অথচ তাঁহারা সমাজে জল অচল সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত। শিক্ষায় তাঁহারা সদ্‌গোপ সম্প্রদায় হইতে পশ্চাৎপদ, আজও পর্য্যন্ত ইহাদের কেহ ম্যাট্রিক পাশ করেন নাই। আমি ইঁহাদের লইয়া লিখিয়াছি।...আপনাদের মনে আঘাত লাগে, এমন কোনো উক্তি করা আমার অভিপ্রেত নয়। কাহারও

মনে লাগে, এমন অভিপ্রায় আমার নাই। বিচার করিয়া দেখিবেন, সীতারাম পণ্ডিত যেদিন প্রথম বীরানন্দের বাড়ীতে আসিয়াছেন, সেদিন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ জমিদারের ছেলেকে দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করাইয়াছি—তাহকে রাণী-মা স্বহস্তে আসন দিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে কোনো অধঃপতিত চরিত্রের উক্তি গ্রন্থকারের উক্তি হয় না। বিশেষ করিয়া এই বইখানিতে গ্রন্থকারের উক্তি কোনগুলি তাহা বাছিয়া লইতে ভ্রম হওয়ার অবকাশই নাই। কারণ পরিশেষে যেখানে বীরানন্দই সন্দীপন পাঠশালা গ্রন্থের লেখক হইয়াছেন, সেখানে বীরানন্দের উক্তিই গ্রন্থকারের উক্তি। বার বার বীরানন্দ সীতারামকে যে শ্রদ্ধা প্রদান করিয়াছে, তাহার জীবনের জয় ঘোষণা করিয়াছে, তাহাই আমার উক্তি। মাতাল শিবশঙ্করের উক্তির দায়িত্ব আমার উপর চাপাইলে অবিচারের অপরাধ বিচারককেই স্পর্শ করিবে।"

লেখকের এই স্পষ্টোক্তির পর কাহারও কি কোনরূপ সন্দেহ থাকা উচিত? এতৎসত্ত্বেও মূল গ্রন্থ এবং চিত্রনাট্য হইতে 'চাষী কৈবর্ত্ত' কথাগুলি তুলিয়া দিতে তারাশঙ্কর বাবু স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা লেখকের মহানুভবতার লক্ষণ। বস্তুতঃ গ্রন্থে বা চিত্রে আমাদের কোথাও দুষ্টক্রিয়া লক্ষ্যে পড়ে নাই। আর—কোনো গ্রন্থ বা অভিনয়, নাটক বা চিত্রনাট্য সমগ্রভাবেই বিচার করা কর্ত্তব্য এবং রচয়িতার উদ্দেশ্যও তাহা হইতে গ্রহণ করা উচিত।

আমরা ছবিখানি দেখিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, দেখিয়া সীতারাম পণ্ডিত যে-শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর লোকদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছি। সীতারাম পণ্ডিত একটি আদর্শ চরিত্র, এইরূপ চরিত্র আঁকিয়া তারাশঙ্কর বাবু সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন বলিয়াই মনে করি।

বাংলা তথা বাঙালী জাতির জীবনে সমস্যার আজ অন্ত নাই। এখানে এইরূপ বর্ণস্বাতন্ত্র্যের দোহাই লইয়া সাহিত্যিকের উপরেও যদি এইজাতীয় উন্মত্ত হামলাবাজী চলিতে থাকে, তবে মনে হয়—তাহার চাইতে নিকৃষ্ট অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। যে উন্মত্ত যুবকবৃন্দ অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তারাশঙ্কর বাবুকে আহত করিয়া তাঁহার গাড়ীর কাচের আবরণ প্রভৃতি ভাঙিয়া দিয়াছে, পুলিশের উপযুক্ত তদন্তের দ্বারা তাহাদের উপযুক্ত সাজা হওয়া উচিত এবং বাংলার সাহিত্য সমাজের পক্ষ হইতে তারাশঙ্কর বাবুর নিকট এই অপ্রতিকর ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

টুকরো খবর

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি) সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য সম্প্রতি রূপশ্রী ষ্টুডিওর প্রাঙ্গণে 'ভারত লোক চিত্রম'-এর পক্ষ হইতে পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার এক প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে ডক্টর কালিদাস নাগ পৌরোহিত্য করেন। বহু সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রসেবীর একত্র সমাবেশে অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হয়।

•

গত ৬ই চৈত্র ক্যালকাটা মিউজিক কলেজের অভিনয় বিভাগ ও জনশ্রী সঙ্ঘ কর্তৃক চারুচন্দ্র কলেজে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এবং অভিনয় পরিচালনা করেন বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী। অভিনয়ে তারাপদ বাবুর শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকা বিশেষ ভাবে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

•

নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত কয়রূপায়নীর চিত্রনাটক 'বহুব্রীহি'র প্রদর্শন গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সুরু হইয়াছে। নাট্যকার হিসাবে জলধর বাবু খ্যাতিমান। পরিচালক হিসাবে সম্ভবতঃ এই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব।

চিত্রনাটকের কাহিনী আরম্ভ হয় এই ভাবেঃ 'বরপণের বাজারে বারো মেয়ের বাপ অপরূপ যে চলতি পথে মেয়ে চালাতে পারেন না, একথা তাঁর সঠিক জানা ছিল। জমিদার অক্ষয় বাড়ুজ্জেকে একদিন তিনি ব'লেছিলেন, তোমার সিন্দুকে টাকা আছে আর আমার গোলায় আছে ধান। কিন্তু ধনী জমিদার ধানী

অপরূপকে আমোল দিলেন না। তাই অপরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রলেন,—জমিদার অক্ষয় বাড়ুজ্যের ছেলে অব্যয়ের সাথে তাঁর একটি মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি শিখা বাঁধবেন না।'

সামান্য এই ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়াই মূল কাহিনী রচিত। অপরূপের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; বহুব্রীহির ভূমিকায় তরুণী অভিনেত্রী বরণা রায়ের অভিনয় আশাপ্রদ হইয়াছে।

*

কানন দেবীর প্রযোজনায় ও অভিনয়ে শ্রীমতী পিকচার্সের বহু প্রতীক্ষিত 'অনন্যা' সম্প্রতি কলিকাতার রূপবাণী, ইন্দিরা ও ছায়া প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে। এক শিক্ষিতা ধনীর কন্যার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে এমন এক স্থানে বিবাহ হইল, যেখানকার বিশ্রী পরিবেশ তাহার মনকে তিক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু সাধারণ মেয়ের মতো সে পরাভব স্বীকার না করিয়া তাহার আদর্শ ও স্বপ্নকে একদিন বন্যার ভিতর দিয়া সফল করিয়া তুলিল।—চিত্রটি পরিচালনা করিয়াছেন সব্যসাচী। কানন দেবীই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

*

সংবাদ পাওয়া গেল—ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল টকিজের 'অনুরাধা'র কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। 'অনুরাধা' অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের নাট্যরূপ। প্রধানাংশে অভিনয় করিয়াছেন কানন দেবী ও জহর গাঙ্গুলী। শরৎচন্দ্রের বইয়ে কানন দেবীর এই প্রথম আবির্ভাব। নাটকটি সুঅভিনয়ের দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

*

'সান্দীপন পাঠশালা'র পর মীনার, বিজলী ও ছবিঘরে একযোগে প্রদর্শিত হইবে এস্, এল্, কারণানী প্রযোজিত ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র 'নিরুদ্দেশ'। পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীনীরেন লাহিড়ী। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন—রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি রায়, সুপ্রভা, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা প্রভৃতি।—পরিচালক ও অভিনেতাদের নাম অনুসারে আশা করা যায়—নাটকটি দর্শক সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

রামকৃষ্ণ

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী

রামকৃষ্ণ, "দেব" তুমি,—সরল মধুর,
একনামে পরিচয় সর্ব্বত্র "ঠাকুর।"
বিবেকের মুখে উঠে তব জয়গান,
শঙ্খস্বরে যেইমত পবিত্র আহ্বান
আরতির। ঋষিবর, প্রিয় পুণ্যশ্লোক,
মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধকাম, নির্ম্মল অশোক।
আজন্ম শৈশব তব, নিত্য বাল্যকাল,
মাতৃক্রোড় লাগি' নিত্য উন্মাদ, মাতাল
চিত্ত তব, মুখে ক্ষরে সুধামৃত ভাষ,
কামিনী কাঞ্চনে লিপ্ত নরের তিয়াস
স্পর্শে নাই কোনদিন তোমার অন্তর—
অপার্থিব যে সম্পদ, যে অবিনশ্বর
সে আলোক ধ্যানে লীন, দীন তুমি, নত
দিক রেখা 'পরে মগ্ন বনস্পতি মত ॥

সম্পাদকীয়

মানভুম সত্যাগ্রহ

কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্ম্মীদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন খুব সুখের বিষয় নহে; কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষেও নহে, কর্ম্মীদেরও নহে। তথাপি মানভূমের কংগ্রেসানুরাগীরা বিহার কংগ্রেস-সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বারো দফা দাবী পেশ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। গত ৬ই এপ্রিল হইতে এই অহিংস প্রতিরোধ আরম্ভ হইয়াছে।

সত্যাগ্রহীদের দাবী কয়টি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পড়িয়া দেখিলাম। দাবীগুলির মধ্যে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে মানভূমবাসীদের যে অভিযোগ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোনো কংগ্রেসসেবীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিবে। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বঙ্গবাসীদের বাধাদানের ফলে কার্য্যকরী করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে বিদ্রোহী বাংলাকে সায়েস্তা করিবার জন্য ক'টি বাঙ্গালী অঞ্চল এই প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বিহার প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সমগ্র জাতীয়তাবাদী ভারত তখন বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই কাপুরুষোচিত প্রতিশোধপরায়ণতার প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং সঙ্কল্প করিয়াছিল যখন সময় আসিবে তখন জাতীয়তাবাদী স্বাধীন ভারত এই কাপুরুষোচিত অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবে। বিষয়টি এত পুরাতন যে, ইহার উল্লেখই চরম বাহুল্য। কিন্তু পুরাতন হইলেও বিহারের জাতীয়তাবাদী নেতারা নাকি সেই সঙ্কল্প এখন শুধু নিজেরাই বিস্মৃত হন নাই, অধিকন্তু কংগ্রেসের বহু-বিঘোষিত অহিংসা আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া মানভূমবাসীদেরও বলপ্রয়োগে সেই পুরাতন কথাটি ভুলাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভাষা, সংস্কৃতি, দেশাচার—সমাজ জীবনের সকল দিক হইতেই মানভূমবাসীরা অবিমিশ্র বাঙ্গালী। বিহার সরকার নাকি সর্ব্বপ্রকারে মানভূমবাসীদের এই বাঙ্গালীত্বকে জোর করিয়া গলা টিপিয়া মারিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মানভূমবাসীকে তাঁহারা বাংলা পড়িতে দিবেন না, বাংলায় আত্মপ্রকাশ করিতে দিবেন না, বাংলায় চিন্তাও পর্য্যন্ত করিতে দিবেন না নাকি। স্বপ্রদেশের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সকল স্বাধীনতা হরণ করিতে বিহার সরকার তাঁহাদের সকল অস্ত্রই হাতে তুলিয়া নিয়াছেন।

অভিযোগগুলি একা বাঙ্গালীরাই করিলে এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু অবকাশ থাকিত। শ্রী শীলভদ্র যাজী একজন পাকা বিহারী, পাকা জাতীয়তাবাদী পর্য্যন্ত—তিনি বিহারের বাঙ্গালী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সম্প্রতি স্বচক্ষে ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়া প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়াছেন—

"The local officials are playing havoc with the people in suppressing their mother tongue—Bengali and enforcing the Hindi language on unwilling people. The officials are also using the Public Safety Act to curb the civil liberty of the people for preaching their mother tongue।"

পাব্লিক সেফটি অ্যাক্ট বা জন-নিরাপত্তা আইন প্রদেশগুলির ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত ও গৃহীত হইবার কালে সকলক্ষেত্র হইতে দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, স্বাধীন শিশুরাষ্ট্র ভারতীয় ইউনিয়নের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার যাহারা বিরুদ্ধতা করিবে, এই আইন শিশুরাষ্ট্রের কল্যাণকল্পে সেই রাষ্ট্রদ্রোহীদেরই উপরে প্রযুক্ত হইবে। মাত্র এই সেইদিন ভারতীয় গণপরিষদে একটি আইন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল যে, "ভারতের যে কোন অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বা ভাষাগত কোনো বৈশিষ্ট্যের উপরে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, আপন-আপন বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের

সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা উক্ত মাইনরিটি গোষ্ঠীসমূহের থাকিবে এবং কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এই মাইনরিটিভুক্তদের আপন-আপন ভাষায় শিক্ষাগ্রহণে কোনো প্রতিবন্ধকতা করা চলিবে না।"

বিহার-সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা মানভূমবাসীদের প্রতি আচরণে স্পষ্টতই ভারতরাষ্ট্রের এই নীতিকে লঙ্ঘন করিতেছেন। অথচ আমাদের শিশুরাষ্ট্রের নিরাপত্তারক্ষার দায়িত্বও যে তাঁহাদেরই, এই কথাও ঘোষণা করিতেছেন তাঁহারাই। আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য।

স্বাধীন ভারতের কারাগার

কিছুদিন পূর্ব্বে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজটিতে স্বাধীন ভারতের কারাগারগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেল পরিচালকদের আচরণ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় মুখপত্রসমূহে এইজাতীয় মন্তব্য অবশ্য অনেক দিন আগে হইতেই নিয়মিতভাবে প্রচার করা হইতেছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, এই সব দলীয় মুখপত্রে সর্ব্ব ব্যাপারেই আসল তথ্য অপেক্ষা অতি-শয়োক্তিটাই বড় বেশী স্থান পায়। অতিশয়োক্তি সত্যাপলাপেরই সগোত্র, এই কারণে ভারতীয় কারাগারগুলি সম্বন্ধে তাহাদের মন্তব্যগুলির উপরে আমরা তেমন অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানীয়' আনুগত্যের খ্যাতি এক প্রশ্নাতীত বস্তু। সুতরাং সরকারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পর্কে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যদি কোনো অভিযোগ উত্থাপিত করেন তবে বুঝিতে হইবে যে, সেটা নিরপেক্ষ সমালোচনাই এবং তাবৎ রাষ্ট্রানুরাগীরই প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

মূলতঃ 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' যাহা বলিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপ: "সম্প্রতি কিছুকাল হইতে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেল-কর্ত্তৃপক্ষের জঘন্য ও হৃদয়বিদারক আচরণের অভিযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। নানাবিধ গুরুদায়িত্বে ব্যাপৃত গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে হয়তো অবহিত না হইতে পারেন, খবরগুলি হয়তো সরাসরি তাঁহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু এ সব অভিযোগ যখন আমাদের দপ্তরে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে, তখন বিভিন্ন পরিষদীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই এ অভিযোগগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে এতৎসম্পর্কে সত্যানু-সন্ধানের সহযোগিতা করুন। কারণ, অভিযোগগুলি এমন যে, এ সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকিলে জনসাধারণের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইবে।

"রাজনৈতিক আদর্শ ও গঠনতন্ত্রের দিক হইতে পূর্ব্বতন গভর্ণমেণ্টের সহিত এখনকার স্বাধীন ভারত-গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য এ কথা আমরা মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও তো মানিতে হইবে যে একদিক দিয়া পূর্ব্বতন সরকারী নীতির সহিত বর্ত্তমান সরকারের কিছুটা মিলও আছে—বরঞ্চ অধিকতর পরিমাণেই আছে —রাজনৈতিক কারণে বর্ত্তমান সরকারকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোককে আটক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হোক্ বন্দীদের প্রতি অসৎ ব্যবহার বা নৃশংস আচরণ (যদি সত্য হয়) মনুষ্যত্ব বিরুদ্ধ। কয়েকজন অতি উৎসাহী নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী যে বন্দীদের প্রতি রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন, এ কথার প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত নিতান্ত অল্প হইলেও উহা একেবারে অবিশ্বাস্য নয়।"

ইহার পর অন্যান্য কয়েকটা মন্তব্যের সহিত ষ্টেট্‌স্‌ম্যান একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

"If many persons now in jail because of their politics. Young men especially are acquiring a burning sense of grievance, that would be a fact of tragic implications and ill omen for free India's future."

বহুলোক—বিশেষতঃ যাহারা বয়সে যুবক, কারাগারে থাকিয়া এক্ষণে যদি তাহারা শুধু তাহাদের রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-বীজ পোষণ করিবার কারণ পাইতে থাকে, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের পক্ষে সেটাকে এক অশুভ লক্ষণই বলিতে হইবে।

সেরূপ কারণ থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই বিদূরীত করা জাতীয় সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

P.G.A.

মন্ত্রিত্ব ও দলীয় রাজনীতি

মাদ্রাজের মন্ত্রিসভা তৃতীয়বার হস্তান্তরিত হইল। গুজব, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভাতেও দিনকয়েক আগে ছাদবদল হইবার প্রায় উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু এক দুজ্ঞের্য় উপায়ে পদাসীন মন্ত্রী কোনোক্রমে ফাঁড়া উৎরাইয়াছেন। পূর্ব্বপাঞ্জাব হইতেও মাঝে মাঝে এই-জাতীয় সম্ভাবনাগর্ভ সংবাদ আসিয়া পৌছায়। কিছুদিন পূর্ব্বেই সেখানে এক মন্ত্রিদলের পতন হইয়াছে।

উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দের মুখে প্রায়ই শুনিয়া থাকি যে, স্থায়ী সুশাসনের জন্য প্রয়োজন শাসনপরিচালকদের নিরুদ্বিগ্ন দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া। বেহিসাবী দাবী ও অকারণ আক্রোশপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা কংগ্রেসকে বিব্রত না করিতে এইজন্যই দেশবাসীকে তাঁহারা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বাস্তব দৃষ্টি দিয়া যাঁহারা রাজনীতির সামান্য একটুও ধার ধারেন, তাঁহারা এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দিহান হইবেন না। কিন্তু স্বাধীনতা আসিবার পর হইতে উপরোক্ত প্রদেশগুলির মন্ত্রিত্ব নিয়া আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতারা এ কি ব্যাপার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? কথা নাই বার্ত্তা নাই, কারণ নাই যুক্তি নাই, হঠাৎ একদিন প্রাতঃ-কালীন সংবাদপত্র খুলিয়া দেখি মন্ত্রিত্বের একদল কুশীলব আর একদলের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। গণতন্ত্র কংগ্রেসের আদর্শের শ্রেষ্ঠতম ঈশ্বর। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রথম প্রতিপাদ্যই হইল এই যে—যে গোষ্ঠীর স্কন্ধে জনতার পরিচালনা-দায়িত্ব আরোপিত হইবে, সেই গোষ্ঠীকে পরিপূর্ণ ভাবে জনতার কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। এই প্রতিপাদ্য কি উক্ত প্রদেশ ক'টির সদ্যপরিবর্ত্তমান মন্ত্রীরা পূরণ করিতেছেন?

ভারতবর্ষ মানেই কংগ্রেস। এবং এইজন্যই সরকারী রীতিনীতির অতিপ্রকট ব্যাপারগুলির সকল রহস্য জানিবার অধিকার কংগ্রেসী সরকারের নিকট আমাদের দুইদিক হইতে—এক কংগ্রেসের আদর্শানুগ হিসাবে, দ্বিতীয় ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে। অথচ এক একটী মন্ত্রিসভা রাতারাতি কেন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে-ছেন, এ সংবাদের বিন্দুবিসর্গও আমরা জানিতে পারি না; পূর্ব্বতন মন্ত্রিসভার কী অপরাধ ছিল বা [illegible] অপরাধ ছিল কি না, তাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শের কোনও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন কি, অথবা অন্য কোনো কারণে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন?—ভারতবাসীর কাছে এ সবই এক অতি গোপন রহস্য। কিন্তু নেতৃবৃন্দ সে রহস্য উদ্ঘাটন করা দূরে থাক্, সযত্নে বরঞ্চ সে গোপনতাকে প্রাণপণে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন।

কু-লোকে অর্থাৎ অকংগ্রেসী রাজনীতিকরা বলিয়া বেড়ান যে, অধিকাংশ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের কাছে এখন মন্ত্রিত্বের মহার্ঘতাই নাকি সবচেয়ে বড় আদর্শ। মন্ত্রিত্ব সকল পার্থিব সুখের আকর, আখের করিয়া রাখার সর্ব্বোত্তম উপায়—ব্রিটিশ আমলে লীগমন্ত্রীরা এ কথাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসীরা নাকি আজকাল লীগের সেই মন্ত্রিত্বাদর্শেরই অনুসরণ করিতেছেন। এই-জন্যই কংগ্রেসের সকল আদর্শ এখন পরিবদ্ধগৃহের দলীয় স্বার্থপ্রণোদিত রাজনীতির বাহন হইয়াছে।

কুলোকদের উক্ত কুৎসার মধ্যে কিছুটাও কি অন্ততঃ সত্য?

বিদেশী মূলধন ও ভারতবর্ষ

স্বাধীন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্বক্ষেত্রে সম-সুবিধা সহ অংশগ্রহণ করিবার জন্য ভারত সরকার বিদেশী মূলধনীদের আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে সেদিন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু এতৎসম্পর্কে সরকারের অনুসৃত নীতি স্পষ্টভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন:

"ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়নে গঠনমূলক এবং সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য সরকার অভারতীয় মূলধনকে সাদরে আহ্বান জানাইতেছেন। ভারতের দ্রুত সমৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও উপকরণ প্রয়োজন, আমাদের তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, বিদেশী মূলধন এইকারণেই ভারতের পক্ষে অপরিহার্য্য। কেবলমাত্র তাহাই নহে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও যে-পরিমাণ আমাদের আবশ্যক তাহাও শুধু আমরা বিদেশী মূলধনীদের মারফৎই লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

অতঃপর পণ্ডিতজী বৃটীশ বণিক্‌দের উদ্দেশ্যে বলেন—

"এবারে আমি বৃটীশ বাণিজ্য স্বার্থের প্রতি কিছু বলিতে চাই। বৃটীশ মূলধন স্বভাবতঃই এদেশে সর্ব্বাধিক পরিমাণে খাটানো হইতেছে। একথা সর্ব্বথা স্মরণীয় যে, যদিও ভারত সরকারের নীতি এদেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য-প্রচেষ্টাকেই সর্ব্ববিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, কিন্তু বৃটেনের বন্ধুদের আমি বেশী করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বৃটীশ মূলধন খাটাইবার পর্য্যাপ্ত সুযোগ এদেশে এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।"

বছর পনেরো আগে এই পণ্ডিত নেহরুই কিন্তু বিদেশী মূলধনের স্বরূপটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে অঙ্কিত করিয়া ভারতীয় জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। Glimpses Of World History তাঁহার একটি পৃথিবী-বিখ্যাত গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞরা আজও বলেন যে, আধুনিক পৃথিবীর দুরারোগ্য রুগ্নতার বহুবিধ কারণ এই পুস্তকটিতে যত প্রাঞ্জল-ভাবে ও আন্তরিকতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেরূপ নাকি এতাবৎ অতি অল্প পুস্তকেই হইয়াছে। পণ্ডিতজী এই পুস্তকের এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একাধিক প্রকারের সাম্রাজ্যবাদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রাচীন যুগে ইহার অর্থ ছিল—অন্য এক দেশকে জয় করিয়া সেই বিজিত দেশের ভূমি, সর্ব্ববিধ সম্পত্তি, এমন কি সে দেশের অধিবাসীবৃন্দকে পর্য্যন্ত বিজয়ীর সম্পত্তিতে পরিণত করা। ...... অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাম্রাজ্যবাদে আর বিজিত দেশের অধিবাসীবৃন্দকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত না, কারণ, দেখা গেল যে বিজিত জাতির মস্তকে নানাপ্রকার করভার চাপাইয়া এবং অন্য বহুবিধ উপায়ে তাহাদের শোষণ করিয়াই বিজয়ী সরকার বেশ লাভবান্ হইতে পারেন। "সাম্রাজ্যবাদ" বলিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই ধরণের ব্যাপারটি বোঝেন, যেমন ভারতের বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ; এবং উক্ত ব্যক্তিদের ধারণা যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বৃটীশ কর্ত্তৃত্ব অপহৃত হইলেই ভারত স্বাধীন হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হইতেছে। আধুনিককালে সাম্রাজ্যবাদের রূপও হইয়াছে আধুনিক, উহা অনেক বেশী উন্নত এবং দোষমুক্ত। এই নবতম সাম্রাজ্যবাদ কোন দেশ আক্রমণই করে না, জয় করার কথা তো দূরে থাক, ইহা অধিকার করে অন্য দেশের সম্পদ অথবা সম্পদ-উৎপাদক প্রাকৃতিক ও অন্যবিধ উপকরণসমূহ। এই উপায়ে অন্য একটা দেশের শোষণের কাজটি যথেচ্ছভাবেই করা যায়, উহার রাজনৈতিক বিষয়ের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিতে কোনো অসুবিধা হয় না, অথচ শোষিত দেশটির শাসনকার্য্যের জন্য কোনো দায়িত্বও বহন করিবার প্রয়োজন হয় না।

"কালের অগ্রগতির সহিত সাম্রাজ্যবাদের এই রূপান্তর হইয়াছে; আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ অদৃশ্য অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদ। প্রাচীনকালের ক্রীতদাসপ্রথা যখন লুপ্ত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে ফিউডাল যুগের ভূমিদাসত্বও যখন উঠিয়া যায়, তখন মনে হইয়াছিল এবারে মানুষের বুঝি মুক্তি আসিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই দেখা গেল যে, অর্থশক্তি যাহাদের কর্তৃত্বাধীন সাধারণ মানুষ তাহাদের দ্বারা সেই আগেরই মত উৎপীড়িত এবং শোষিত হইতেছে—পূর্ব্বতন ক্রীতদাস ও ভূমিদাসের পরিবর্ত্তে সাধারণ মানুষ এক্ষণে বৈতানিক ক্রীতদাসে (wage slaves) পরিণত হইয়াছে। উক্ত নবতম সাম্রাজ্যবাদের অধীন দেশগুলিরও সেই দশা। জনসাধারণের ধারণা যে, পরাধীন দেশগুলির পক্ষে রাজনৈতিক প্রভুত্বই একমাত্র সমস্যা; এই সমস্যার সমাধান হইলেই স্বাধীনতা আপনিই আসিবে। কিন্তু একথা যে সত্য নহে ইহা আমরা আধুনিক পৃথিবীর বহু রাজনৈতিক স্বাধীনতাযুক্ত দেশ-গুলির দিকে দৃক্‌পাত করিলেই উপলব্ধি করিতে পারি; শুধু অর্থনীতিক অধীনতাতেই এক দেশ অন্য দেশের সম্পূর্ণ করতলগত হইতে পারে। ভারতের বৃটীশ সাম্রাজ্য-বাদই তো একথার প্রকট প্রমাণ। ভারতের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব বৃটেনের হাতে, ইহা ভারতে বৃটেনের প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্য; কিন্তু ইহারই পাশে রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বের অপরিহার্য্য সঙ্গী হিসাবেই আছে বৃটেনের আর্থনীতিক প্রভুত্ব।

"ইহা খুবই সম্ভব যে অনতিবিলম্বে একদিন ভারত হইতে বৃটেনের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব হয়তো অপহৃত হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও আর্থনীতিক কর্ত্তৃত্বদ্বারা

বৃটেনের পক্ষে ভারতের অদৃশ্য সাম্রাজ্যটি রক্ষা করা তখনও সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থা যদি ভারতে আসে তবে বুঝিতে হইবে ভারতে বৃটীশ শোষণ অটুটই রহিয়াছে।"

ইহার পর আর কোনো মন্তব্য করিবার প্রয়োজন হয় না। তবু একটি কথা না বলিয়াও আমরা পারিতেছি না। বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, অক্ষম কালগতির সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হইয়াছে কার? ভারতীয় রাজনীতি অর্থনীতিগত পরিস্থিতির, না পণ্ডিতজীরই নিজের?

কাশ্মীর

একটি রহস্য আজও পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নই রহিয়াছে,—মুসলিম লীগ যে পাকিস্তান দাবী করিয়াছিল সে কি প্রকৃতই তাহাদের বহু-ঘোষিত ঐসলামিক স্বাতন্ত্র্যলাভের অভিপ্রায়ে, না ভারতীয় উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বদা বিপর্য্যস্ত রাখিবার জন্যই কোনো গুপ্ত প্রভুর অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহারা সে দাবী উত্থাপিত করিয়াছিল?

দেশবিভাগের পূর্ব্বে লীগের ঘোষণা ছিল যে,কংগ্রেসের তথা গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী ভারতের বিরুদ্ধে তাহাদের ঝগড়া শুধু পাকিস্তানের সমস্যা লইয়াই—পাকিস্তান পাইলে মুসলিমলীগ ভারতের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা ও মিত্রতা স্থাপন করিবে। এখন দেশবিভাগ হইয়া গিয়াছে, তথাপি পাকিস্তান কেন ভারতের সহিত সহযোগিতা ও মৈত্রীর সর্ব্বক্ষেত্রে ক্রমাগত বিপক্ষাচরণ করিয়া চলিতেছে? জুনাগড় নিয়া, কাশ্মীর নিয়া এমন কি ভারতের অভ্যন্তরস্থ হায়দ্রাবাদকেও নিয়া যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই পাকিস্তান ভারতের সহিত একাধিকবার বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেকথার প্রমাণ ভূরি-ভূরি আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাটিও স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, এই সব বিবাদে গায়ের জোরে জয়ী হওয়ার মত সামর্থ্য পাকিস্তানের নাই, সঙ্গতিও নাই; অধিকন্তু অর্থনীতির বহু ক্ষেত্রে এখনও পাকিস্তানকে ভারতেরই মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। তবু কেন ভারতের সহিত পাকিস্তানের এই বিরাবলিপ্সা? প্রশ্নের উত্তরটি আগেই আমরা দিয়া রাখিয়াছি, এই রহস্য এখনও অনুদ্‌ঘাটিত।

কিছুদিন হইতে কাশ্মীরের পটভূমিকায় উক্ত প্রচ্ছন্ন রহস্যটি যেন আরও কিছু ঘনীভূত হইতে চলিয়াছে। কাশ্মীরবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের স্বদেশকে বলপূর্ব্বক স্বকবলিত করার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় বছর দেড়েক ধরিয়া অজস্র অর্থ ও সৈন্য অপব্যয় করার পর, পাকিস্তানের শেষ পর্য্যন্ত বুঝি চৈতন্য হয়; এবং উনোর সালিশী অনুযায়ী পাকিস্তান আপোষ ও স্থানীয় জনমতের নির্দ্দেশের পথেই কাশ্মীর-সমস্যার মীমাংসা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পাকিস্তানের এই সুমতি হইবার দরুণই গত কয়েক মাস হইতে কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি বলবৎ আছে। এবং কাশ্মীরের অধিবাসীরা আপন অভিপ্রায় অনুসারে ভারত অথবা পাকিস্তান এই রাষ্ট্র দুইটির কোনটির সহিত স্বদেশের ভাগ্য জড়িত করিবে, সেই চরম প্রশ্নটির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিবার জন্য উনোর প্রেরিত প্রতিনিধিরা গত কয়েক মাস হইতে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল, পাকিস্তান প্রকাশ্যে এবং গোপনে উক্ত শান্তি প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিতেছে। উনোর শান্তি-প্রস্তাবে একটি প্রধান সর্ত্ত ছিল যে, কাশ্মীরের মূল ভূমি হইতে পাকিস্তান আগে তাহার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইবে, পরে ভারতবাহিনীও কাশ্মীর ত্যাগ করিবে। পাকিস্তান নাকি এখনও সে সর্ত্ত পুরাপুরি পালন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না। আজাদ্ কাশ্মীর বাহিনী পাকিস্তানেরই ছদ্মবেশী বাহিনী, সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী এই বাহিনী কাশ্মীর হইতে সরাইয়া লইতে পাকিস্তান বাধ্য। কিন্তু কাশ্মীর ত্যাগ করা দূরে থাক্, তথাকথিত 'আজাদ বাহিনী' আবার নানাদিকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ সুরু করিয়া দিয়াছে। তা ছাড়া, সন্ধি-সীমানা লইয়াও পাকিস্তানের তরফ হইতে একাধিক সর্ত্ত লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মোট কথা, ব্যাপারটা ক্রমশঃ এরূপ দাঁড়াইতেছে যে পাকিস্তানের এই বিপক্ষাচরণ অধিক অগ্রসর হইলে যে কোনোদিনই হয় তো উনোর শান্তি

প্রতিনিধিদের সকল প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হইবে এবং এবারে ভারতকে হয় তো সরাসরিই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, এবারে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী আচরণের মূলে সম্ভবতঃ কেবলমাত্র গোপন প্রভুর অঙ্গুলিনির্দ্দেশই আসল কারণ নয়। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ যে, লীগের বাক্‌সর্ব্বস্ব পবিত্রভূমির অসারতা সম্পর্কে পাকিস্তানের অধিবাসীরা স্বয়ংই দিন-দিন নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিতেছে। সিন্ধুপ্রদেশে খুড়োর দলের দুর্নীতি, সীমান্তপ্রদেশে পাঠানিস্থান-আন্দোলনকারীদের প্রতি কোয়ায়ুম মন্ত্রিসভার বর্ব্বরোচিত দলন-নীতি, পূর্ব্বপাকিস্তানে উর্দ্দু ভাষা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের অ-গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি প্রভৃতি পাকিস্তানি শাসনের এক-একটি অতি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। শুধু ইসলামের জয় ঘোষণা করিয়া বুঝি পাকিস্তানের জনগণকে আর এই সব দুর্নীতি সম্বন্ধে যা খুসি তাই বলিয়া নিবৃত্ত করা যাইতেছে না, তাহারা সত্য লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানী জনতার সেই সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিবার জন্যই পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ জনতাকে হিংসার উন্মত্ততার দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন।

সন্দিগ্ধদের এ সন্দেহ নিছক মিথ্যা নাও হইতে পারে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান

শুধু ভারতেরই সহিত নয়, পাকিস্তানে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ইসলাম-রাষ্ট্র আফগানিস্তানেরও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার যোগাড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। দিন কয়েক আগে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজের করাচীস্থিত সংবাদদাতা খবর দেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের রাজনৈতিক স্বরূপ লইয়া গত কিছুকাল হইতেই এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে-মতবিরোধ চলিতেছিল, সম্প্রতি সেই বিরোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, অনতিবিলম্বেই সম্ভবতঃ রাষ্ট্র দুইটির মধ্যে সমুদয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। গুজব-সাংবাদিকরা অবশ্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সংবাদদাতার বহু পূর্ব্বেই খবরটি আমাদের শুনাইয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর এই ব্যাপার সম্বন্ধে আরও কিছু 'প্রামাণ্য' তথ্য আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। মাস খানেক আগে আফগানিস্তানের সরকারী রেডিও নাকি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান বিমান-বাহিনী উপজাতি অঞ্চলের উপরে নির্ব্বিচারে বোমাবর্ষণ করিতেছে; ১৭ই ফেব্রুয়ারী মিরানশাহ মসজিদের উপরেও পাকিস্তানী বোমা বর্ষিত হয়, ফলে মসজিদস্থ ৫০০০ প্রার্থনারত পাঠান হতাহত হইয়াছিল। সংবাদটি তাহা হইলে নিঃসন্দেহেই গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তান-আফগানিস্তানের এই বিবাদের মূল কারণ খুব প্রচ্ছন্ন নয়। সীমান্ত প্রদেশের এবং তৎসংলগ্ন উপজাতি অঞ্চলের পাঠান অধিবাসীরা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে মূলতঃ ভারতীয় মুসলিমদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু শোষণের সুবিধার জন্যই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ তাহাদিগের একাংশকে ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ভারত এক্ষণে সেই সাম্রাজ্যবাদের কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে; এই কারণেই উক্ত পাঠান অধিবাসীরা তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইতে চাহিতেছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এই পাঠানরা আফগানিস্তানীদেরই সগোত্র; সীমান্ত ও উপজাতি পাঠানদের উক্ত দাবীর সমর্থনে এই কারণেই আফগানিস্তান এতখানি উচ্চকণ্ঠ। স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, ব্যাপারটি আমাদের মানভূমবাসী বাঙ্গালীদের সমস্যার মতই।

কিন্তু সে যেমনই হোক, পাকিস্তান-আফগানিস্তানের বিবাদ তাহাদের উভয়েরই পক্ষে নিতান্ত নিজেদেরই সমস্যা, ইহা নিয়া বাহিরের কাহারও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, পাকিস্তানের ভারতবিদ্বেষ। উহার কর্ত্তৃপক্ষরা তাহাদের এই ঘরোয়া বিবাদের মধ্যেও ভারতের গোপন ভূমিকা নাকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন; আফগানিস্তানের ইপির ফকিরের সমুদয় আচরণের মূলেই তাঁহারা ভারতের ভূতকে দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্বেষ প্রচার করিয়া পাকিস্তান-কর্ত্তৃপক্ষ সত্যকে কতদিন চাপা দিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন?

আগামী কমনওয়েলথ সম্মেলন

পৃথিবীর পাশ্চাত্য খণ্ডের সাংবাদিক এবং রাজনীতিক মহলে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি নিয়া যেরূপ অনুমান ও বিশ্লেষণের সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও গত মাসখানেক কাল হইতে সেইরূপ হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে লণ্ডনের আগামী কমনওয়েলথ সম্মেলনকে নিয়া।

উক্ত সম্মেলনটি আহূত হইবার উদ্দেশ্য কি এবং কি কি বিষয় সেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আলোচিত হইবে, সে সম্বন্ধে অবশ্য কোনো সঠিক তথ্য এখনও পর্যন্ত সরকারী ভাবে জানানো হয় নাই; ভবিষ্যতে হইবেও না বোধ হয়। প্রকাশ, এই সম্মেলনের আলোচ্য ও আলোচিত বিষয়ের গোপনতা সর্বপ্রকারে রক্ষা করা হইবে। কর্তৃপক্ষীয় পরিচালনা-নীতির এই বিষয়টার যাথার্থ্য ও ন্যায্যতা আমরা সাধারণ জনগণ আজ অবধি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের শাসন-কর্তৃপক্ষরা প্রতিনিয়ত নীতিগদ্‌গদ কণ্ঠে গণতান্ত্রিক আদর্শের দোহাই দিবেন, রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের মধ্যে প্রোজ্জল অলঙ্কৃত ভাষায় এই নির্দেশও লিপিবদ্ধ করিবেন যে, জনতার মতামতই শাসন-যন্ত্রের সকল ভিত্তি; অথচ যদ্দ্বারা জনতার জাতীয় ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে—এমন এক একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়ও উহার বিন্দু-বিসর্গও জনতাকে তাঁহারা জানিতে দিবেন না। এ গণতন্ত্র জনগণের দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু যাক সে কথা।

সরকারী স্বীকৃতি না পাইলেও সম্মেলনের উদ্দেশ্যটি অন্ততঃ অনুমান করা চলে। উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে গণতান্ত্রিক মুক্তি-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, চীনের সাম্প্রতিক রূপান্তরে সেই শক্তি এবারে হয়তো এশিয়াস্থ সমুদায় সাম্রাজ্য-শক্তির বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হইবে। বৃটীশ কমনওয়েলথকে সেই বিরুদ্ধ শক্তি যাহাতে বিধ্বস্ত করিতে না পারে, এই আশঙ্কাতেই কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি নিজেদের মধ্যে একটা সামরিক ও আর্থনীতিক সম্পর্ক পাকাপাকি ভাবে পাকাইয়া রাখিতে চান। আগামী সম্মেলনে সম্ভবতঃ সেই সম্পর্কটা কার্যকরী করা যাইবে কি উপায়ে সেই আলোচনাই হইবে। আরো একটু স্পষ্ট বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, এই সম্মেলন উত্তর আটলান্টিক চুক্তিরই একটি কমনওয়েলথীয় পরিকল্পনা। কমনওয়েলথের দু'টি সদস্য বৃটেন ও কানাডা আটলান্টিক চুক্তিরও দুটি প্রধান কুশীলব এবং তাহারা আমেরিকার অর্ধ-আত্মীয়—তাহারা তাহাদের সুখী পরিবারের অন্য সদস্যদেরও যে তাহাদের সঙ্গে আমেরিকার সহিত যুক্ত হইতে অনুরোধ করিবে না—এ কথা বিশ্বাস করা সহজ নয়।

উপরোক্ত অনুমানটি সত্য হইলে আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হইলে ব্যাপারটি এই দাঁড়ায় যে, ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যেই বিবাদ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্ব-সংগ্রামকে অপরিহার্য করিয়া তুলিতেছে ভারতকে সেই আত্মঘাতী সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্যেই তাহারা নানা ফন্দিফিকিরে ভিড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু একবার নয়, বহুবার, এমন কি এই সেদিনও ভারতীয় পার্লামেন্টে এই সম্মেলন-সম্পর্কিত আলোচনায়ও পণ্ডিত নেহেরু ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে খোলাখুলি ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন—ইয়োরোপ যা করে করুক, ভারতবর্ষ মানবতাবিরোধী এবং হিংসাত্মক কোনো ব্যাপারে প্রাণ থাকিতেও অংশ গ্রহণ করিবে না। যেদিন যে পক্ষের মধ্যেই যুদ্ধ বাধুক, ভারত বরাবরই নিরপেক্ষ থাকিবে।

সুতরাং আমরা ধরিয়া নিতে পারি যে, আগামী কমনওয়েলথ সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর সেই উদ্‌ঘোষিত নিরপেক্ষতারই পরীক্ষা হইবে।

উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি

গত ৪ঠা এপ্রিল ওয়াশিংটনে বহু সমারোহ এবং ঢক্কাধ্বনির সহিত উত্তর আটলান্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। আটলান্টিক মহাসাগরের ভৌগোলিক সম্বন্ধযুক্ত বারোটি রাষ্ট্র, যথা—বেলজিয়াম, বৃটেন, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যাণ্ড, ইটালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল এবং যুক্তরাষ্ট্র—এই চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। চুক্তিটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—অধুনা পৃথিবীর এক অংশ অ-গণতান্ত্রিক ও

'টোটালিটেরিয়ান' রাষ্ট্রাদর্শ দিন-দিন বলীয়ান ও আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিতেছে; এখন হইতেই প্রস্তুত না থাকিলে এই অ-গণতন্ত্রী 'টোটালিটেরিয়ান' শক্তি পৃথিবীর গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিবে; আটলান্টিক তীরস্থ গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি এই চুক্তি দ্বারা সেই সম্ভাবিত আক্রমণের বিরুদ্ধে একত্রিত হইল। এবং চুক্তিবদ্ধ উক্ত বারোটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকেরই সমুদয় রাজনৈতিক সত্তা সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই সর্ব্বতোভাবে দলবদ্ধ হইল। আপাততঃ আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত চুক্তির সর্ত্তাবলী ও সম্পর্ক বলবৎ থাকিবে; উপযুক্ত প্রয়োজন বোধে দশবৎসর পরে এই চুক্তিই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুনঃ স্বাক্ষরিত হইতে পারিবে।

চুক্তিটির আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব নিয়া পৃথিবীর প্রায় সবদেশেরই সাংবাদিক ও রাজনীতিক মহলে প্রচুর হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

হৈ-চৈ'টা অহেতুক কিছু নয়। কারণ, স্বাক্ষরিত হইবার আগে ও পরে চুক্তির অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনিচয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা যে সব সানন্দ বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তা পাতানোই চুক্তিটার আসল উদ্দেশ্য নয়—সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে লোকবল ও অস্ত্রবলের আস্ফালনে ভয় দেখানোই চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ভয় দেখানোটা আসলে ভয় পাওয়ারই একটি ছদ্মবেশী অভিব্যক্তি। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড সোভিয়েটের শক্তিতে ভয় পাইয়াছে, তাই তাহাদের অনুগৃহীত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দল পাকাইতে সচেষ্ট হইল। পক্ষান্তরে ঠিক এইরূপ ভীতিমূলক মানসিক প্রতিক্রিয়া সোভিয়েটের তরফেও সক্রিয়; সুতরাং অতঃপর সে পক্ষও আটলান্টিক শক্তিদের বিরুদ্ধে দল পাকাইবে এবং প্রবলতর লোকবল ও অস্ত্রবলের আস্ফালন দেখাইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। উত্তর আটলান্টিক চুক্তিটি নিয়া সাংবাদিক এবং রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়াছে এইজন্যই। উত্তর আটলান্টিক চুক্তি আগামী তৃতীয় যুদ্ধের জন্য অন্যতম পক্ষের প্রথম সক্রিয় প্রস্তুতি।

কিন্তু যদিও অবশ্য এই অনুমানটিই অধিকাংশের, রাজনীতিজ্ঞ মহলের কেহ কেহ আবার চুক্তির সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অল্পপক্ষের ধারণা যে, উদ্‌ঘোষিত নীতি এবং উদ্দেশ্যের কোনটাই আটলান্টিক চুক্তির আসল কথা নয়। কারণ নাতিদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার মত শক্তি এবং উপকরণ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির কাহারই নাই; এমন কি যুক্তরাষ্ট্রেরও নাই। যুক্তরাষ্ট্রের জনমত যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেকথা উহার সাম্প্রতিক সৈন্যসংগ্রহ পরিকল্পনার ব্যর্থতাতেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ইংল্যাণ্ডেরও তাই; ফ্রান্সে তো প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরোধী শক্তিই প্রবলতর। তা ছাড়া এই প্রধান রাষ্ট্র তিনটির অধিকাংশ সৈন্য তো বিক্ষুব্ধ উপনিবেশগুলি রক্ষা করিতেই নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর আটলান্টিক চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আমেরিকা মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষকে শক্তিমান্ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মার্শাল প্ল্যান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিন্দুমাত্র সফল হয় নাই এবং উহাদের যুদ্ধপীড়িত জনগণেরও কোনো অভাব মোচন হয় নাই। এই ব্যর্থতা স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে এই ভয়েই সাহায্যদাতা এবং সাহায্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি একত্র হইয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের ভাঁওতা মারিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উত্তর আটলান্টিক প্যাক্ট আসলে পৃথিবীর বিশেষতঃ পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বর্ত্তমান অর্থনীতির প্রকৃত স্বরূপকে জনসাধারণের জাগ্রত সচেতনতা হইতে আড়াল করিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কে. ভি. আপ্পারাও

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গশ্রী

ষোড়শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬ | ২য় খণ্ড— ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রাম

শ্রীমতী অমিয়া বসু

বিগত ষোড়শ শতাব্দী হইতে প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত মিশর তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুরস্কের সুলতানই মিশরের শাসনকর্ত্তা (Governor) নিযুক্ত করিতেন। ক্রমশঃ সুলতানের দেহরক্ষী (Mameluks) হইতে গভর্ণর মনোনীত হইতে লাগিল। ১৮০৫-সনে মহম্মদ আলী অপ্রত্যাশিতভাবে সুলতানের দেহরক্ষীদের হত্যা করিয়া নিজে গভর্ণরের পদে উন্নীত হইলেন। অবশেষে সুলতানের অনুমোদনে মহম্মদ আলীর পরিবার-বর্গ উত্তরাধিকারসূত্রে গভর্ণরের পদ পাইতে লাগিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত মিশর নামেমাত্র তুরস্কের অধীনস্থ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মিশরের অধিপতি (Khedive) স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিশরের অধিপতি ছিলেন ইসমাইল পাশা। তিনি সংস্কারক ছিলেন বটে কিন্তু অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। তজ্জন্য তিনি ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় ফরাসী কোম্পানী, বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার লেসেপ্‌স্-এর নেতৃত্বে সুয়েজ খাল খনন করে। ইস্‌মাইল পাশা এই কোম্পানীর বহু অংশের মালিক ছিলেন। সুয়েজ খাল খনন কার্য্যে ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েরই স্বার্থ নিহিত ছিল, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল সুয়েজ খাল খনন করিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্য-পথ সুগম এবং বিশেষতঃ ইংরেজের ভারতে সুদৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করা। ভিক্টোরিয়া তখন ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, রক্ষণশীল দলপতি ডিস্‌রেলী সেই সময় প্রধান-মন্ত্রী। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টাতে দিল্লী দরবারে ভিক্টোরিয়াকে ভারতের 'রাজরাজেশ্বরী' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ডিস্‌রেলী ইস্‌মাইল পাশার সুয়েজ কোম্পানীতে যে অংশ (shares) ছিল তাহা

কিনিয়া লইলেন। ইস্‌মাইল পাশা ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ১৮৭৯ খ্রীঃ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় ইংরাজ ও ফরাসীর দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। তাহারা ইস্‌মাইল পাশার পুত্র টিউফিক্ পাশাকে মিশরের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিল।

ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রচেষ্টায় মিশর সরকারের ঋণ সমস্তার সমাধান করিবার জন্ত একটী আন্তর্জ্জাতিক ঋণ কমিশন (International Debt Commission) স্থাপিত হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে মিশর সরকার জনসাধারণের উপর বহুল পরিমাণে কর ধার্য্য করে। মিশরবাসিগণ করভারে পীড়িত হওয়ায় এবং বৈদেশিক প্রভুত্ব সহ্য করিতে না পারায় ১৮৮১ খ্রীঃ মিশরে আরাবী পাশা নামক এক সামরিক কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহানল-জ্বলিয়া উঠে। সুচতুর ইংরাজ মিশরের বিদ্রোহ দমনের অছিলার অপেক্ষাই করিতেছিল এবং অচিরেই মিশরে ইংরাজ সৈন্ত-সামন্ত প্রেরিত হয়। এই বিদ্রোহ দমনকালে ইংরাজগণ কিরূপে নির্ম্মমভাবে আলেকজাণ্ড্রিয়া সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। বিদ্রোহ দমন হইল এবং আরাবী পাশাকে সিংহলে নির্ব্বাসিত করা হইল। ফলে মিশরের উপর ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফরাসীগণ এই বিদ্রোহ দমনে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ না করাতে মিশরের উপর তাহাদের আধিপত্য অন্তর্হিত হইল।

আরাবী পাশার বিদ্রোহ দমন হইল বটে, কিন্তু মিশরের দক্ষিণে সুদান প্রদেশে ধর্ম্মপ্রাণ মাহ্দী (Mabdi) মহম্মদ আহমেদের নেতৃত্বে এক প্রবলতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন ১৮৮৫ সনে বিদ্রোহ দমনের জন্ত General Gordonকে সুদানে প্রেরণ করেন। General Gordon সুদান যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাহার পর লর্ড সলিস্‌বেরীর মন্ত্রীত্বকালে সেনাপতি Kitchener বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক ১৮৯৮ খ্রীঃ সুদান উদ্ধার করেন এবং ইংরাজ সৈন্তগণ সুদানে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্তে একরকম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এদিকে ১৮৯০ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট গ্ল্যাড্‌ষ্টোন পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"অনির্দ্দিষ্টকালাবধি মিশরে ইংরাজ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন বৃটিশ সরকারের নীতিবিরুদ্ধ।" ১৮৯২ খ্রীঃ লর্ড ডাফ্‌রীন বলিয়াছেন—"মিশরের সহিত ইংরাজের সুদৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে এবং মিশরবাসিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজের মতামত তাহাদের উপর ন্তস্ত করা হইবে না…।" অন্তান্ত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ সময়ে এই সূত্রেই বিশ্বদরবারে ইংরাজ ও মিশরের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচার করেন এবং তাঁহারা বলিয়াছেন যে মিশরে শান্তি স্থাপিত হইলে এবং মিশরবাসিগণ স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য হইলেই ইংরাজগণ মিশর ত্যাগ করিবে।

১৯১৪ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন তুরস্ক ইংরাজদের বিপক্ষে ছিল এবং মিশর নামেমাত্র তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ, সেই সময় ইংরাজগণ মিশরকে বৃটিশ 'রক্ষণাধীন' বলিয়া ঘোষণা করিল। মিশরে ইংরাজগণ সামরিক আইন জারী করে, তদানীন্তন মিশর অধিপতিকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাহাদের অনুগত ফোয়াৰ্দকে 'মিশরের সুলতান' পদে অধিষ্ঠিত করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর মিশরে বৃটিশ শক্তি দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অসহনীয় অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় মিশরের স্বনামধন্ত জগ্‌লুল পাশার নেতৃত্বে এক জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্রগতিতে দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। মহাযুদ্ধের অবসানের পর জগ্‌লুল পাশা এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ 'শান্তি সম্মিলনী'তে মিশরের স্বাধীনতার দাবী পেশ করিবার জন্ত লণ্ডনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশর ত্যাগের ছাড়পত্র মঞ্জুর করিল না। ফলে দেশব্যাপী গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ১৯১৯ সালে জগ্‌লুল পাশাকে মাল্টাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করে। আন্দোলন ভীষণাকার ধারণ করিলে জগ্‌লুল পাশাকে নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি এবং তাঁহাকে লণ্ডন যাত্রা করিতেও অনুমতি দেওয়া হইল। জগ্‌লুল লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু 'শান্তি সম্মিলনিতে' তাঁহাকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি ভগ্নমনোরথ

হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। ১৯১৯ সনের মে মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লর্ড মিল্‌নারকে শাসন সংস্কারের জন্ম মিশরে প্রেরণ করে। জগ্‌লুল এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এই মিল্‌নার কমিশনকে ভারতবর্ষের সাইমন কমিশনের মত বয়কট করে। সুয়েজ খালের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব জগ্‌লুল পাশা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, তিনি উহার উপর মিশরের আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মিল্‌নার কমিশন সুয়েজ খাল সমস্তার সমাধানে নিশ্চেষ্ট রহিল। মিল্‌নার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মিশরের পার্লামেণ্টে নূতনরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইল। জগ্‌লুল পাশা এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পার্লামেণ্টে ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইলেন এবং জগ্‌লুল পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

এ-দিকে ইংলণ্ডে শ্রমিকদল শাসনভার গ্রহণ করে। মিশরবাসী এই স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকদলের সহানুভূতি লাভে আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা নিরাশ হইল। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনেল্ড স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, সুয়েজখালের উপর ইংরাজের কর্ত্তৃত্বের দাবী তিনি কোনমতে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ ও মিশরের রাজনীতিজ্ঞদের সহিত সুয়েজখাল সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে থাকে। ১৯২৪ সনের ১৯শে নভেম্বর কাইরো সহরে স্যার লি ষ্ট্যাক্ সাহেব এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ষ্ট্যাক্ হত্যার ফলে ইংরাজগণ সুবিধা পাইয়া মিশরের উপর কঠোর শাসন চালাইতে লাগিল এবং মিশরবাসীকে এই হত্যার জন্ম জবাবদিহি করিতে হইল। জগ্‌লুলপাশা তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বের পদত্যাগ করিলে ইংরাজদের অনুগত জিয়ারপাশা মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং রাজা ফোয়াডের আদেশানুযায়ী পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এমতাবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। দেশের উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে জিয়াপাশা পুনরায় পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। এইবারেও জগ্‌লুল ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভোটাধিক্যে সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু জগ্‌লুলকে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে অনুমতি দেওয়া হইল না। ফলে জগ্‌লুল মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে জগ্‌লুল পরলোক গমন করেন। ১৯২২ সনে ইংরাজের মিশরের উপর 'রক্ষণাধিকার' (Protectarote) শেষ হইল। ফোয়াডকে মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ১৯৩৬ সনে লণ্ডনে ইঙ্গ-মিশর সন্ধি অনুসারে মিশরকে স্বাধীনরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু সুদান প্রদেশ তখন পর্য্যন্ত ইংরাজদের অধীনস্থ ছিল। ১৯৪১ সনে মিশরবাসিগণ উক্ত ইঙ্গ-মিশর সন্ধি পুনরালোচনার জন্ম আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। পুনরায় ১৯৪৭ সনে নিরপত্তা পরিষদ (Security Council)-এর নিকট উক্ত সন্ধি নাকচ করিবার জন্ম মিশরবাসিগণ আবেদন করেন। মিশর সমস্তার সমাধান এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই।

মেঘলা দিনে

অশ্বিনী পাল

মেঘে ঢাকা আকাশের অন্তহীন কালোছায়া মাঝে
কে তুমি বসিয়া আছ প্রশান্ত নীরব ?
মোর প্রাণ-স্বর্ণ-বীণা মধুগীতে মধু ছন্দে বাজে,
লভে তব সুদূরের অনন্ত বৈভব।

তব মৌন আসনের তল হ'তে নেমে আসা-বাণী
সাগর তরঙ্গ তোলে তন্দ্রাতুর প্রাণে ;
তব বক্ষ নিঃশ্বাসের কম্প লয়ে বাঁচি আমি জানি,
তব প্রেম-বিশ্ব-স্রোত নিত্য যেন টানে।

লাল পাখী

রজত সেন

নীলমাধবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে গাছের মাথায় ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল তার। পুকুরের ওপারে বাঁশবন তোলপাড় হয়ে গেল। পরস্পরের মিতালি বাঁশঝোড় ভুলে গেছে ঝড়ের দাপটে, বেঁচে থাকবার, সুস্থ থাকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তাদের মধ্যে, কট কট শব্দে রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর এক দানব বাঁশগুলোকে যেন আজ উপড়ে ফেলবে।

নীলমাধব একটু বুঝি ভয় পেল। ছোট ঘরটায় একটিমাত্র জানালা হাওয়ায় কখন বন্ধ হয়ে গেছে। চাপা একটা গন্ধে নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে, গাঢ় অন্ধকার তাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। জানালাটা—নীলমাধব ভাবল, খুলে দেবে। কিন্তু শোবার আগে জানালাটা কোন দিকে দেখেছিল—কয়েক মিনিট চিন্তা করেও সে বুঝতে পারল না। মা কোথায়? সে যে শুয়েছিল মা'র পাশে। মুখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, অনেক-ক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকবার পর মার ঘুমন্ত শরীরের অস্পষ্ট আকৃতিটা চোখে ধরা পড়ল।

নীলমাধব শুয়ে রইল আরও কতক্ষণ। মুখের ওপর মশা উড়ছে। শুধু হাত নাড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই, মার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

বাইরে বৃষ্টি সুরু হল ঝমঝম, বিদ্যুৎ চমকাল, তারই চকিত আলোয় ঘরটা মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাথা পর্য্যন্ত কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছে তার মা। জানলাটা পায়ের দিকে। আবার সেই ঘন অন্ধকার যেন জড়িয়ে আছে তার খোলা চোখ দুটি।

প্রথম দিনের মামার বাড়ীর সেই আদর আর আন্তরিকতা মনে পড়ল তার। দিদিমা তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকের মধ্যে, মামীমা দিয়েছিলেন কপালে চুমো, মামাতো ভাই-বোনেরা চোখের আড়াল করে নি এক মুহূর্ত। তার শোবার জায়গা হয়েছিল বাইরের দোতলার ওপর দেবনাথ, গৌরীপ্রিয় আর নিত্যানন্দদের সঙ্গে পাশাপাশি এক বিছানায়। খটখটে পরিষ্কার ঘর, সাদা ফুলের মত নরম বিছানা। আর প্রথম রাত্রির কি মধুর ঘুম। এক আশ্চর্য্য স্বপ্নের মধ্যে রাত্রিটা কেটে গেছে তার। সকালে ঘুম ভেঙেছিল ঘুঘুর ডাক শুনে। আমের পাতায় পিছলে পড়েছে নরম রোদ, ঘুম ভাঙা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল নীলমাধব শুপুরী গাছের শাখা দুলছে বাতাসে, অস্পষ্ট, অদ্ভুত এক শব্দ—অবাক হয়ে গেল সে, কান পেতে শুনল পাতার মর্ম্মরধ্বনি। মীরজাফর লেনে তাদের বাড়ির পূবদিকে দেবদারু গাছটা কতদিন সে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু এমন শব্দ কোন দিন তার কানে বাজেনি। ঘুম আর জাগরণের মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য এক পাখীর ডাক স্পর্শ করেছিল তার শ্রবণেন্দ্রিয়, মগজ থেকে সে-সুর ছড়িয়ে পড়েছিল তার রক্তে, অদ্ভুত এক উন্মাদনায় ভরে উঠছিল তার মন। পরে সে জেনে নিয়েছিল ঐ পাখীটার নাম লাল পাখী।

চুপি চুপি সে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "দিদিমা, লাল পাখীর ডাক শুনে কান্না পায় কেন?

'ও যে কান্নার ডাক।' দিদিমা বলেছিলেন, 'শোন্ তা হলে: সদাগরের ছেলে সিদ্দিক সিল্কের পা'জামার ওপর চুমকী বসানো আচকান পরে; লম্বা চুল, বড় চোখ, বাঁশী বাজায়। সতেরো পেরোবার পর সিদ্দিকের বাবা নুরমহম্মদ সদাগর সিদ্দিকের বিয়ে ঠিক করল রমজান মিঞার মেয়ে সুরতন্নেছার সঙ্গে। রমজান মিঞা বাহাদুর লোক, পাঁচটি গ্রামের একটি হাটের মালিক সে, লোকে সমীহ করে, খাতির করে। সাতদিন আগে থেকে বাদ্যি সুরু হল, শানাই বাজে অষ্টপ্রহর, কুটুম বন্ধু এল পাল্কী করে, নৌকা করে। সহর থেকে পিরাণ এল সিদ্দিকের, চোখ ঝলসে যায়।

কিন্তু সিদ্দিক বসল বেঁকে। সে বলল, খালেক মাঝির মেয়ে নাজিম ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না,

STUDENTS' P. G. A. COMMON ROOM

ওকে না পেলে রূপসী নদীর জলে ডুবে মরবে সে, নিশ্চয় মরবে।

নুরমহম্মদ সদাগর মন বেজার করবার মরদ নয়। এক মাত্র ছেলে সিদ্দিক—তার বুকের ধন, তার চোখের মণি, আত্মহত্যা করবে? খালেক মাঝির ডাক পড়ল।

'গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জড়সড় হয়ে উঠানে ডুমুর গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'হাতের গড়গড়া মাটিতে নামিয়ে রেখে নুরমহম্মদ নেমে এল উঠোনে, খালেকের হাত ধরে বলল, এসো বেয়াই, ওপরে এস, দাঁড় টান বলে লজ্জা পাবার কিছু নেই, মাঝিরাও ত মানুষ।—নুরমহম্মদ তাকে নিয়ে এল দাওয়ায়, চাকর নিয়ে এল পা ধোয়ার জল, বাটায় এল পান। খালেক মাঝি চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল, বুঝল না কিছু, দানোর মত শরীরটায় তার রক্তের খেলা যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমার পোলা সিদ্দিক তোমার মেয়েকে নিকা করতে চায়, আপত্তি আছে তোমার?

'খালেক তখনও তাকিয়ে আছে বোকার মত। বলে কি সদাগর? এ তল্লাটের সেরা মানুষ নুরমহম্মদের সেরা ছেলে সিদ্দিকের সাথে নাজিমের নিকা? নাজিম যে ওর বাঁদি হবার যোগ্য নয়।

'ঠাট্টা নয় খালেক ভাই, তোমার মেয়েকে সোনা দিয়ে মুড়ে রাখব; ওদের আমি বানিয়ে দেব ময়ুরপঙ্খী নৌকো, রূপসীতে বেড়াবে ওরা।

'খালেক নুরমহম্মদের হাত দুটো চেপে ধরে বলল, নাজিমের নসীব।

'খবরটা শুনে সিদ্দিক গেল নদীর ধারে বাঁশী নিয়ে অশথ গাছের যে মোটা শিকড়টা একেবারে জলের মধ্যে ডুবে গেছে, তার ওপর পা ছড়িয়ে বসল সিদ্দিক, বাতাসে উড়ছে তার চুল। ও-পাশে নুয়ে পড়া ঘন শাখা আড়াল করে রেখেছে যে মাটির কুটির—ওখানে কে থাকে? কে থাকে বলতে পার? সিদ্দিক যেন প্রশ্ন করল নিজেকে। নরম মাটির ওপর রাঙা পায়ের চিহ্ন রেখে মাটির কলসীতে জল তুলতে যায় কে? বলতে পার?—সিদ্দিক জিজ্ঞেস করল তার বাঁশীকে।

*

'বালর লাগানো পাল্কী চড়ে সিদ্দিক চলল বিয়ে করতে। চোখে তার সুরমা, আলপাকার চাপকানে আতরের খুস্‌বু, সোনার মেয়ে ঘরে নিয়ে আসবে সে, দেখে ঝলসাবে চাঁদের আলো।

'চিক-কাটা লাল সাড়ি পরা নাজিমকে কোলে করে নিয়ে এল খালেক মাঝি। মাথায় উড়ছে তার রঙীন ওড়না।

'বিয়ে যে কেমন করে হল সিদ্দিক বুঝতে পারল না কিছুই, গভীর এক স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল তার সারা মন।

'তার পর বাড়ী ফেরবার পালা। নাজিমকে সাজাল তার মা, তার দাদী, তার চাচী।

'সব প্রস্তুত।

'পাল্কীতে উঠবার আগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল নাজিম। মাটিতে রক্তের দাগ দেখে সিদ্দিকের বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। হাত বাড়াল সে, কিন্তু ততক্ষণে ভূলুণ্ঠিতা নাজিমের চার পাশে ভিড় জমে গেছে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল সিদ্দিক, আর দেখতে পেল না নাজিমকে।

'নুরমহম্মদ বলল, খালেক ভাই, ব্যস্ত হওয়া বৃথা, আজ আর বৌ নিয়ে ফেরা হবে না। সিদ্দিককে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি, গিয়ে হাকিম সায়েবকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এই পাল্কীতেই, ভাববার কিছু নেই। ছেলে মানুষ ভয় পেয়ে গেছে। কেমন থাকে জানিও, ভালো থাকলে বিস্যুৎবার নিতে আসব।

'পাল্কীর দরজায় মাথা রেখে সিদ্দিক তাকাল রূপসীর জলের দিকে। চাঁদের ছায়া টলমল করছে। চাঁদ—না নাজিমের মুখ?

কিন্তু নাজিমের শ্বশুর-ঘর কর কপালে ছিল না। বুধবার রাত দুপুরে ডাকাত পড়ল খালেক মাঝির বাড়ি। নাজিমের গায়ে গয়না ঝলমল করছে এ-ক'দিন। সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত খালেক পড়ে রইল বাড়ির পেছনে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে। তিনজনকে ঘায়েল করেছে সে। তারই প্রতিশোধ নেবার জন্তে নাজিমকে তারা নিয়ে পালাল

রূপসীর ওপারে। কন্না-মেশানো ভয়ার্ত্ত গলায় নাজিম চীৎকার করে বলছিল—সিদ্দিককে বোলো, সিদ্দিককে বোলো তোমরা, সিদ্দিককে বোলো, সিদ্দিককে বোলো—

'রাত্রির অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল নাজিমের কাতর অসহায় চীৎকারে, নদীর তরঙ্গের সঙ্গে মিশে গেল সে শব্দ।

'রূপসীর ওপারে ডাকাতদের নৌকা ভিড়ল, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সব।

'নাজিমকে আর কেউ দেখতে পায়নি। হয়ত তার মৃতদেহ রূপসীর স্রোতে ভেসে চলে গেছে সাগরে।

'নুরমহম্মদ খবর শুনে মুহ্যমান হয়ে রইল।

'সিদ্দিক তার বাঁশী নিয়ে গেল নদীর ধারে, বসল সেই অশথ গাছের ডালে; খালেক মাঝির বাড়ির আগুন তখন নিবে গেছে। নাজিমের শেষ কথা কয়টি লোকের মুখে শুনেছে সিদ্দিক। অশথ গাছের ওপাশে সে আর তাকাতে পারল না।

'বাঁশীটা আস্তে আস্তে ভাসিয়ে দিল সে নদীর জলে, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য, সুন্দর ছোট একটি পাখী আকাশ থেকে উড়ে এসে বসল তার মাথার পাশে সরু শাখাটার ওপরে, লাল সোনালী পালক ওর সকাল বেলার নরম রোদে ঝলমল করে উঠল; সিদ্দিক সন্তর্পণে আবার তাকাল, পাখীটা ভয় পেল না, গভীর লাল রংটা নাজিমের ওড়নার কথা মনে করিয়ে দেয়; ও যেন সিদ্দিকের দিকেই তাকিয়ে আছে। মন্ত্রমুগ্ধ সিদ্দিকের চোখের পলক পড়ে না।

'লাল পাখী ডানা ঝাপটাল, বিদ্যুৎ চমকাল যেন সিদ্দিকের শরীরে, তারপর আশ্চর্য্য মধুর সুরে ডেকে উঠল, যেন দিগন্ত থেকে ভেসে আসা কোন এক হারাণো স্বপ্নের সুর, তার শিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল সে-তরঙ্গ, মাথার মধ্যে বাজতে লাগল ঝিমঝিম।

'আবার ডাকল, চমকে উঠল সে, তার হৃৎপিণ্ডে লাগল দোলা, লাল পাখী যেন ডাকছে—সিদ্দিককে বোলো, সিদ্দিককে বোলো, সিদ্দিককে বোলো—তাই ত! এতক্ষণ সুরটা সে ধরতে পারে নি।

'অজ্ঞাতে হাত বাড়াল সিদ্দিক, লাল পাখী উড়ে গেল জলের কিনারে কিনারে সেদিকে—যেদিকে ভেসে গেছে তার বাঁশী। বাতাস প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, সিদ্দিককে বোলো, সিদ্দিককে বোলো, সিদ্দিককে বোলো—'

দিদিমা গল্প শেষ করলেন।

নীলমাধবের বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। কোথায় সেই লাল পাখী? যদি একবার সে জানত। তাহলে দেখত খোঁজ করে বাঁশ-ঝাড় আর আমের বাগান।

'কৈ আর ত লাল পাখীকে দেখতে পাই না দিদিমা।'

দিদিমা হাসলেন, 'মনের দুঃখে ঘুরে বেড়ায় বনে বনে, কেমন করে দেখতে পাবি বল?'

* * *

বাইরে বৃষ্টির দাপট কমে এসেছে, কিন্তু বাজ-ডাকা থামে নি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। একটা ভ্যাপসা, চাপা গন্ধে সারা ঘরটা ভরে উঠেছে। নীলমাধব আস্তে আস্তে উঠে জানলাটা খুলে দিল, দক্ষিণের ডোবা থেকে পচা পানার দুর্গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। তবু ঠাণ্ডা বাতাসটা তার ভাল লাগল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় আর দেরি নেই ভোরের।

ও জানে খুব ভোরে ওঠে তার মা, উঠেই বাড়ির পেছনের পুকুরে যায় মুখ ধুতে, স্নান করতে। চার পাশের পার ধুয়ে জল নোংরা হয়ে গেছে, ঐ জলে আজও স্নান করবে, তার পর ঢুকবে রান্না ঘরে। আগে সে দেখেছে মামীমাকে রাঁধতে, এখন রান্নাঘরের পাশ দিয়েও হাঁটেন না, যখন তখন হুকুম করেন, ভাতের হাঁড়ি বা তরকারির কড়া নামিয়ে চায়ের জল গরম করে দিতে হয় সকালের দিকেই প্রায় বার চারেক; ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা দরকার মামীমার—না হলে মাথা ধরে। আগে চা খেতেন না তিনি, মার কাছ থেকেই শিখেছেন, মার অভ্যেস, কিন্তু পায় না এক বাটি-চা।

সে দিন মা বলছিল, 'দিদি, আমায় একটু চা পাঠিয়ে দেবে!'

"তুমি ত চা ছেড়ে দিয়েছ।" মামীমা বললেন।

"না ছাড়ি নি, তবে কাজের তাড়ায় সুবিধে হয় না।' মা হাসলেন।

"দিচ্ছি পাঠিয়ে, কিই যে সহরে অভ্যেস করে দিয়েছ ভাই, খেলে অম্বল হয়, না খেলে মাথা ধরে।'

নীলমাধব পরে এক ফাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'চা পেয়েছ মা ?"

"না রে। বোধ হয় ভুলে গেছে।"

'আমি চেয়ে নিয়ে আসব ?"

"দূর পাগল। এতক্ষণ কি চা থাকে ? কেটলী ধোয়া হয়ে গেছে কবে।"

"তুমি জল গরম করে দাও মা। বাসন্তীদিকে বলছি চা করে দেবে।"

"তুই খেল গে যা, আমি বলব বাসন্তীকে। পড়া করেছিস ?"

নীলমাধব উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

"পড়িসনি ?" আবার জিজ্ঞেস করল মা।

"না, নিতু বলছে ও আর বই ধার দেবে না। আরও বলেছে—আমার বাবা বই কিনে দিতে পারে না ?"

উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে মা জিজ্ঞেস করল, "নিতু এই কথা বলেছে ?"

"শুধু তাই নয়, ওরা কেউ আমার সঙ্গে খেলে না পর্য্যন্ত।"

"এ-সব আবার কবে থেকে হল ? আমি ত কিছুই জানি না।"

"তুমি জানবে কোত্থেকে, তুমি ত সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত রান্নাঘরেই পড়ে থাক। মা চল, আমরা কলকাতা ফিরে যাই, কেন তুমি বাবাকে লিখছ না আমাদের নিয়ে যেতে ?"

"সেখানে কোথায় যাব ? আমাদের যে বাড়ি নেই।"

"আমরা মীরজাফর লেনের বাড়ি থেকে চলে এলাম কেন মা ?

"স্বেচ্ছায় চলে আসিনি, তোমার জেঠামশাইরা আমাদের চলে আসতে বাধ্য করেছে। দিনের পর দিন অপমান সহ্য করে আর থাকতে পারলেন না তোমার বাবা। হঠাৎ চাকরি চলে গেল যে! তাই ত এত মুস্কিল।"

"কিন্তু তা বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বাবাকে ?" রুদ্ধ একটা আবেগ নীলমাধবের কণ্ঠ রোধ করল।

"তাড়িয়ে দেননি ওঁরা, আমরাই চলে এসেছি। ভাবনা নেই রে। তোর বাবা চিঠি লিখেছেন, আগামী মাসেই একটা কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে।

"কিন্তু এখানে আর একদিনও থাকতে পারছি না মা, এখানে থাকলে খেটে খেটে তুমি মরে যাবে।"

"চুপ চুপ। কেউ শুনতে পাবে।"

"পা'ক।"

* * *

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মাকে সে দেখতে লাগল। মা অনেক রোগা হয়ে গেছে, বাবা বোধ হয় চিনতেই পারবে না। আগুনের ধারে বসে বসে রংটা কেমন যেন তামাটে হয়ে উঠেছে। কি সুন্দর ছিল তার মা। বড় মামা রাঁধবার জন্য কেন একটা লোক রাখেন না ? এত টাকা বাড়িতে এত লোক খাটে। সত্যি। তার মা কি মরে যাবে তা হলে ? নীলমাধব প্রায় ছুটে এল মার কাছে। ঘন চুলের গোছাটা স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছে। নীলমাধব সন্তর্পণে বালিসের পাশে সরিয়ে রাখল চুল, ডাকল, "মা, মা।"

নয়নতারার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসল সে ব্যস্ত হয়ে, চুলে কোন রকমে একটা পাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, না ? অনেক বেলা হয়ে গেল, কেউ ডাকছিল বুঝি ?"

"কেউ ডাকেনি ত'! তোমার চোখ লাল হয়েছে কেন মা ?"

"লাল হয়েছে নাকি ? বোধ হয় রাত্রে একটু জ্বর উঠে থাকতে পারে।"

নীলমাধব মার কপাল স্পর্শ করল হাত দিয়ে, "ইস্! গা যে পুড়ে যাচ্ছে মা। তোমার আজ উঠে যেতে হবে না কোথাও, শুয়ে পড়, জ্বর হলে কেউ কাজ করে না।"

'কাজ না করলে চলবে কেমন করে ?'

'চলবে; খুব চলবে, মামীমা দু'দিন রাঁধতে পারেন না ? তুমি শুয়ে থাক।'

নয়নতারা তাকাল নীলমাধবের মুখের দিকে, বলল, 'যাদের টাকা নেই, যারা গরীব এবং অন্যের ওপর বোঝা হয়ে আছে, তারে তাদের শুয়ে থাকলে চলে না। কাজ না করলে খেতে দেবে কেন!'

'মামার বাড়ীতে খেতে দেবে না ?'

'না,' কঠিন গলায় বলল নয়নতারা।

'চল, আমরা কলকাতা পালাই।'

'গরীবকে সেখানেও কেউ আশ্রয় দেবে না।'

নীলমাধব অবাক্ হয়ে গেল, 'যাদের টাকা নেই, তারা মরে যাবে!'

নীলমাধবের রাগ দেখে নয়নতারা হাসল, 'তা নয়। তোর বাবা বলেন যাদের টাকা আছে তারাই বেঁচে থাকবে, সুখে থাকবে, আরও বাড়াবে তাদের টাকা, যারা বড়লোক—আমরা মরি বাঁচি, খেতে পাই না পাই—ওদের কিছু এসে যায় না। সংসারে বেশীর ভাগ লোক গরীব না থাকলে—কয়েকজন বড়লোক কেমন করে থাকবে ?'

'বুঝতে পারলাম না মা,' নীলমাধব মা-র গা ঘেসে বসল, 'বুঝিয়ে দাও।'

'সকালবেলা খুব গল্প জমিয়েছিস। আমার কাজ নেই ? কত বেলা হয়ে গেল দেখ।'

'তুমি শুয়ে থাকবে না ?' অনুনয় করল নীলমাধব।

'না।'

টলতে টলতে মা চলল পুকুরঘাটে, নীলমাধব তাকিয়ে রইল।

ভোর হল। বাতাসে তখনও বৃষ্টির গুঁড়ো। আকাশের মেঘ যেন নেমে এসেছে অনেক নীচে। নীলমাধব পশ্চিমের উঠানে নেমে এল। গাছের মাথায় ক্লান্ত কাকের দল ভিজে পালক শুকোচ্ছে পাখা ঝাপটে, সারা রাত্রি ওরা ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করেছে। কামরাঙা গাছটায় ছুটো সালিক ঘাড় নাড়ছে, অনেক কামরাঙা ঝরে পড়ছে মাটিতে।

মেহেদি গাছের বেড়া ডিঙিয়ে নীলমাধব এগিয়ে গেল; ঘন আম কাঁঠালের বন, আনারসের ঝোপ, মাথা উঁচু কতবেল আর মাদার-গাছের সারি, বাঁ ধারে মরা পুকুর। একটা কাঠবেড়াল পালাল পায়ের পাশ দিয়ে। তারপর কেয়ার ঝাড়, ফণি মনসা আর বেতবন। প্রত্যেকটি ঝোপ সে লক্ষ্য করে দেখছে, কি গভীর রহস্য যেন লুকিয়ে আছে গাছ পালার ফাঁকে, ভিজে ঘাস আর পাতার গন্ধে নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে। তাকাল সে চার পাশে, একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, অতি পরিচিত, কিন্তু মনে করতে পারছে না কিছুতেই। একটা কাঠ-ঠোকরা শুপুরি গাছ ঠুকরোচ্ছে। নীলমাধব দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ঠিক এমনি সময়ে কোথায় কোন দিক থেকে আশ্চর্য্য সুরে ডেকে উঠল সেই লাল পাখী। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল নীলমাধব—নিস্পন্দের মত, মুখ ফিরিয়ে তাকাবার তার সাহস হল না, অন্যদিকে যদি উড়ে যায়। আবার ডাকল, কাকে যেন কি বলতে অনুরোধ করছে পাখী, নামটা মনে নেই নীলমাধবের, কিন্তু কথার সঙ্গে সুরের মিলটা তার মনে আছে।

সাবধানে, আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল নীলমাধব; পেছনে যজ্ঞি-ডুমুরের গাছ, ঘন পাতার ফাঁকে অস্পষ্ট শব্দে ডানা ঝাপটাল কোন পাখী ? নরম মাটির ওপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে গাছটার নিচে। ঐ ত। ঐ ত। ইস্। কি আশ্চর্য্য সুন্দর। পাখীটা কি পালাবে ? উড়ে পালাবে তাকে দেখে ? আবার ডাকল সোনালী পাখী, বুঝি বেজে উঠল অপরূপ, মোহময় কোন বাজনা। নিস্তব্ধ সকালে পাতায় পাতায় কাঁপতে লাগল সে-শব্দ। পাখীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল কোন দুঃখিনী মেয়ের করুণ মিনতি, হারাণো দিনের কোন সে বেদনা।

নীলমাধব মনে মনে প্রার্থনা করল, পাখীটা যেন তাকে দেখে ভয় না পায়, মনে মনে সে বলল, 'ভয় পেও না, আমি তোমার বন্ধু।' ভাবল সে—পাখী কি বোঝে মানুষের ভাষা ? সে দেখবে আজ লাল পাখী কোথায় যায় ? কোথায় তার বাসা ? রোজ সে খাবার রেখে আসবে তার বাসার কাছে, গাছের নিচে, তারপর

একদিন পাখীটা চিনতে পারবে তাকে, হয়ত উড়ে আসবে তার হাতের ওপর। নীলমাধব অজ্ঞাতে হাত বাড়িয়ে দিল শূন্যে। আর পাখীটা উড়ে পালাল হুস্ করে, কাল কামিনী গাছের মাথায়, তারপর ছোট গুপুরি গাছের পাতা একবার স্পর্শ করে মিলিয়ে গেল ঘন গাছের আড়ালে।

সারা সকাল ভিজে পায়ে ঘুরে বেড়াল নীলমাধব গাছের আড়ালে আড়ালে, হাজার রকমের ঝোপের আশেপাশে, এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল তার মাথার ওপর, সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট ভিজে চুপসে গেল। আবার শুকালো সব। ওপর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। কোথায় সেই লাল পাখী?

মেঘের আড়াল দিয়ে সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, সোনালী আলো পিছলে পড়ল রাশি রাশি সবুজ পাতায়।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত নীলমাধব ফিরে এল ঘরে। খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে ছেলেমেয়েদের। কেউ তার খোঁজ করে নি, কেউ তাকে ডাকে নি। মাসীমা শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে গরু চরিয়ে এলি?'

'মাছ ধরতে গিয়েছিল জেলেদের সঙ্গে!' নিত্যানন্দ ফোঁড়ন কাটল, 'দেখছ না হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা।'

নীলমাধব উত্তর দিল না, রান্না-ঘরে এল মা-র খোঁজে। খাওয়ার পাট কবে চুকে গেছে। মা কি তবে ভুলে গেছে তার কথা?

রান্না-ঘরে তার মা-কে দেখল না, তার ভাত ঢাকা রয়েছে। এমন ত কোনও দিন হয় না, তাকে ফেলে কোন দিন ত তার মা আগে খেয়ে নেয় নি। সে এল তাদের ঘরে; নয়নতারা অঘোরে ঘুমোচ্ছে গায়ের ওপর কাঁথা চাপিয়ে, হাঁটু দুটো কুঁকড়ে নিয়ে এসেছে বুকের কাছে। নীলমাধব নিশ্চিন্ত মনে খেতে গেল, এতক্ষণ যে মা না খেয়ে বসে থাকেনি, তার জন্যে মনে মনে সে কৃতজ্ঞ হল।

মাথায় তার লাল পাখী ঘুরছে, কিই যে খেল সে নিজেই জানে না।

খাওয়া শেষ করেই সে মামাতো ভাই নিত্যানন্দ আর দেবানন্দের খোঁজে গেল। লাল পাখীর রহস্য-কাহিনী তাদের না বলে সে স্থির থাকতে পারল না। 'দেবুদা, কি বলব তোমায়? এমন পাখী তুমি দেখ নি কোন দিন। সোনার মত রং, যখন ডাকে মনে হবে তুমি কোন বাজনা শুনছ। যদি তুমি ধরতে পার কোন রকমে, আমরা পোষ মানাব।'

দেবানন্দ পনেরো, জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি? আমায় দেখাবি? তুই বুঝি সারাদিন এই পাখীর পেছনে ঘুরে বেড়াস? দাঁড়া, তোকে আমি ধরে দিচ্ছি। পিসেমশাইর সঙ্গে নিয়ে যাস কোলকাতার চিড়িয়াখানায়, টাকা দেবে।'

'তুমি ঠাট্টা করছ দেবুদা?'

'আমরা পাড়াগাঁ-র ছেলে, আমরা কি কলকাতার ছেলেদের ঠাট্টা করতে পারি?'

নিতু যোগ দিল না এ পরিহাসে, লাল পাখীর ব্যাপারটা সে জেনে নেবে ভাল করে।

দেবু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় দেখলি রে এমন পাখী?'

"পশ্চিমের বাগানে যাবে?"

"আমি যাচ্ছি এখন ফুটবল খেলতে।"

নীলমাধব আর নিত্যানন্দ আবার বেরুলো পাখীর খোঁজে। সমস্ত বিকেলটা তারা ঘুরে বেড়াল গাছের আড়ালে আড়ালে। সন্ধ্যার একটু আগে একবার মাত্র শোনা গেল পাখীর ডাক। শক্ত হয়ে দাঁড়াল তারা, ঘন শাখার আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাদের চোখ, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না লাল পাখীকে।

"আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি নিতু। তুই খাবার নিয়ে আয়।"

"আচ্ছা আনছি।"

আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল নীলমাধব। কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল, এখনও—এখনও যদি একবার অন্ততঃ দেখা যেত। গাছের পাতায় জড়ানো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল নীলমাধব।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল। কখন থেমে গেছে সমস্ত শব্দ, কান পাতলে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে পায়ে চলা পথের দাগ। নিতু আর আসবে না, খেলায় মেতেছে হয়ত, হয় ত ভুলে গেছে, কিংবা ইচ্ছে করে আসেনি।

কিসের একটা খস খস শব্দে ভয় পেল নীলমাধব, কি যেন নড়ে উঠল কেয়া ঝোপে। দৌড় মারল সে। কতবার যে হোঁচট খেয়ে পড়ল তার ঠিক নেই। কিন্তু এক সময়ে তার মনে হল ভয় পাবার কিছু নেই, হলই বা অন্ধকার, দিনের আলোয় যদি এখানে ভয় না থাকে রাত্রেই বা থাকবে কেন? অন্ধকার কোন জিনিষকে বদলে দিয়ে অযথা ভয়ের কারণ ঘটাতে পারে না। এ কথা বলেছে তার মা।

গায়ের সার্ট ছিঁড়ে পা কেটে ফিরে এল নীলমাধব। কিন্তু তার ডাক পড়েনি, সে জানে কেউ তাকে ডাকবে না মা ছাড়া। মার কথা মনে পড়তে বিষণ্ণ হল তার মন। কি আশ্চর্য্য। এতক্ষণে একবারও মনে পড়ে নি?

রান্না ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে শুনল মামীমা বকছে তার মাকে; অকথ্য সে ভাষা। তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল; আর অপেক্ষা করল না সে, দৌড়ে গেল মাকে দেখতে।

নয়নতারা তেমনি শুয়ে আছে নিস্পন্দের মত, পায়ের কাছে জ্বলছে হ্যারিকেন লণ্ঠন। বাসন্তী মুখ নীচু করে মাথায় লাগাচ্ছে জলপটি। নীলমাধব নিঃশব্দে বসে পড়ল বাসন্তীর গা ঘেঁসে।

"কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?"

নীলমাধব উত্তর দিল না।

"এখানে বোস, যাচ্ছি আমি, দিদিমা সেই কখন থেকে ডাকছেন।"

"আর আসবে না?" অসহায় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল নীলমাধ।

বাসন্তী হাসল, বলল, "আসব।"

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল বাসন্তী। বলল, 'কবরেজ জ্যাটার কাছে লোক পাঠিয়েছে বাবা, আজ রাত্রে যদি সময় না পান, কাল সকালে নিশ্চয়ই আসবেন। কাল সকালেই পিসে মশাইকে চিঠি লিখে দে নিতু, আমি পোষ্টকার্ড দেবো।"

"আমি ত ঠিকানা জানি না।"

"পিসিমা জানেন না?"

"না, বাবা চিঠি লিখেছিলেন, ঠিকানা দেন নি।"

এমন অদ্ভুত ব্যাপার, বাসন্তী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। পিসিমার রোগটা যে খুব সহজ নয় এটা বুঝতে তার সময় লাগল না। পিসেমশাই কেমন যেন লোক, বাসন্তীর আন্দাজের বাইরে, আজ ঐ হৃদয়হীন অবুঝ লোকটির প্রতি অশ্রদ্ধার সীমা রইল না তার।

শেষবার সুরবালাকে বার্লি খাইয়ে বাসন্তী বলল, "খেয়ে আয়।"

"দেবে আমাকে এখন খেতে?"

"দেবে, মাকে বলেছি আমি।"

পিঁড়ি পেতে জল ঢেলে দাওয়ায় বসে পড়ল নীলমাধব। দেবোজা দুমিনিট পরে ঝনাৎ করে ভাতের থালা রেখে গেল তার সামনে, রাখল না, যেন ছুঁড়ে মারল, খানিকটা ডাল ছলকে পড়ল তার কোলের ওপর।

নিঃশব্দে খেয়ে উঠে গেল নীলমাধব, দ্বিতীয়বার এক মুঠো ভাত চাইতে সাহস হল না তার।

"বোস এখানে, ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন, সময় হলে আসব আমি।"

নীলমাধব বসে রইল চুপচাপ।

এক সময়ে সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। খাওয়ার পাট চুকল এক সময়ে।

রাত্রি গভীর। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তার। বাটি থেকে খানিকটা জল নিয়ে চোখে দিল সে। বাসন্তীদি আসবে বলেছে, হয়ত মনে নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে। কি অসুখ হল তার মার, সারবে কবে? বাঁচবে ত? যদি হঠাৎ এসে পড়ত তার বাবা!

দূরে কোথায় শেয়াল ডেকে উঠল। হ্যারিকেন লণ্ঠনের পলতেটা বাড়িয়ে দিল সে, আবার জল দিল চোখে।

দরজার কাছে চুড়ির টুংটাং আওয়াজ শোনা গেল। বাসন্তী এসেছে, চোখে তার তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে।

"এবার শুয়ে পড় নিতু, আমি বসছি। বাসন্তী বসলো সুরবালার মাথার কাছে মাটিতে।

"তুমি ঘুমোতে যাও বাসন্তী দি, আমি জেগে থাকব।"

"অনেকক্ষণ জেগেছিস, এবার ঘুমো, আবার জাগিয়ে দেবো তোকে।

নীলমাধব শুয়ে পড়ল।

বাসন্তী বসে রইল।

নীলমাধব যখন জাগল তখন ভোর হয়ে গেছে। বাসন্তী ঠাণ্ডা মাটিতেই জড়সড় হয়ে পড়ে আছে, হয়ত ঘুমিয়েছে এই মাত্র। নীলমাধব জাগিয়ে দিল তাকে।

সুরবালা জাগল। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ পিসিমা?"

"ভালই ত। তোরা দু'জনেই কি সারা রাত জেগে বসে আছিস?"

"দুজনেই ঘুমিয়েছি পিসিমা, বার্লি নিয়ে আসব?"

"এত ভোরে কি উনুন ধরেছে?"

"আমি ধরাব।" বাসন্তী চলে গেল।

"কেমন আছ মা?"

"ভালই আছি, ভাবনা নেই, কে বেঁধেছে কাল?"

"মামীমা!"

নয়নতারা চুপ করে রইল, উত্তর দিল না।

আধঘণ্টা পরে বাসন্তী এল খাবার নিয়ে। নয়নতারা হাসল, মধুর সে হাসি। বলল, "বাসন্তী আয় তোকে একটা চুমো দিই।"

নীলমাধব ঠিক এই ফাঁকে পালিয়ে গেল! বাসন্তীদি যতদিন আছে ততদিন আর ভাবনা নেই তার।

আম কাঁটালের বন অতিক্রম করে সে এসে পড়ল দূরে লাল পাখীর খোঁজে। কিন্তু যা দেখল তা বিশ্বাস করা যায় না। দেবানন্দ ফিরে আসছে, ডান হাতে তার পাখী মারবার গুলতি, বাঁ হাতে ঝুলছে মরা, রক্তাক্ত লাল পাখী। নীলুকে দেখে দাঁড়াল সে। হাসতে হাসতে বলল, 'জ্যান্ত ধরতে পারলাম না, তাই একেবারে মেরে নিয়ে এলাম, নে, যত্ন করে রেখে দে, যাবার সময়ে নিয়ে যাবি কলকাতা, মিউজিয়ামে দেখালে ওরা রেখে দেবে, নে, হাত বাড়া।'

নির্ব্বাক নীলমাধব স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হাত বাড়াল নিজের অজ্ঞাতে, চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে।

মরা পাখীটা নীলমাধবের হাতে দিয়ে দেবানন্দ বলল, 'ও কি রে? কেঁদে ফেললি? দেখ না, মাথায় জল-ঝাপটা দিয়ে বাঁচে কি না!' দেবানন্দ চলে গেল।

নীলমাধবের হাত রক্তে লাল হয়ে গেছে। বুকের কাছে পাখীটাকে তুলে ধরে সে দৌড়ে গেল পুকুরে, জল ছিটাল মাথায়, গায়ে, ডাকল, 'এই! এই!' পাখী চোখ খুলল না।

তীরে এল নীলমাধব; কদম গাছটার নিচে, হাত দিয়ে মাটিতে গর্ত্ত করে তার মধ্যে অতি সন্তর্পণে শুইয়ে দিল লাল পাখীকে। মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিল গর্ত্ত। তারপর বাড়ি ফিরে এল। তার চোখ দিয়ে তখনও গড়িয়ে পড়ছে জলের ফোঁটা।

সম্ভাবনা

শ্রীবটকৃষ্ণ দে

P. C. A.

অমাবস্যা তমিস্রার বক্ষো ভেদি' রূপালি পূর্ণিমা
পরালো রাত্রিরে আজ কী অসীম সৌন্দর্য্যের সীমা!
দিকে দিকে মাঠে মাঠে স্বরগের অমৃত ঝরণা
অনন্ত অশ্রান্ত ধারে ঝরে পড়ে জাগায়ে চেতনা!

মৃত অতীতের কত বিদ্যুতের বহ্নি জ্বলা রাতে—
ছিলো নাকো ধ্রুবতারা উত্তরের অশান্ত জ্যোনাতে।
কৃষ্ণ পুঞ্জ মেঘরাশি চন্দ্র-গ্রাসে ক্ষুধার্ত্ত উল্লাসে,
বাজাতো মৃত্যুর ডঙ্কা মেদিনীর মন্দ্রিত সন্ত্রাসে!

*

আজ জানি গ্রহণের পালা শেষে সুতীব্র উচ্ছ্বাস,
ক্রন্দসী উঠিছে ধ্বনি'—আনন্দের প্রসূন-সুবাস!
নিষ্ঠুর নির্ম্মম আর শতাব্দীর রূঢ় অভিযান,
অস্তিমের বংশীধ্বনি মুহূর্ত্তেই করে অবসান।
স্বপন-বৈভবে-ভরা স্বর্ণময় বিরাট অন্তর,
শ্মশানের জীর্ণ-হাড়ে জন্ম নেয় শ্যামল প্রান্তর॥

সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রণীত 'মালঞ্চে'র কবিতা সম্বন্ধে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা "জাতীয় পাঠাগার") অধিনায়ক কবি জন এলেকজেণ্ডার চ্যাপমান তাঁহার "Religious Lyrics of Bengal" পুস্তকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদও করিয়াছেন।

মালঞ্চের "দুঃখ" সম্বন্ধে কবি চ্যাপমান বলেন, 'Misery' is a strange poem to me. ইহার কয়েকটি ছত্রের নমুনা দিতেছি—

"তোমারে চিনেছি দুঃখ, তুমি বাধ মোরে,
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেবলীর মত
সংসারের সর্ব্বসুখ হ'তে, সাধ ক'রে
প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লও প্রাণ-পুষ্প শত।
অধর চুম্বন ছলে রক্ত কর পান
নিঃশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার
আলিঙ্গন পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।"

"I know thee, misery. A wondrous fairy you keep me
From life's sweets ever. You pluck away
From the living the myriad life-flowers.
In guise of kissing
Blood to drink! So make death with me play
At every breath. Hold me in death's embracing."

'মালঞ্চে'র পরে 'মালা'র কবিতাগুলি রচিত হয়। তারপরে রচিত হয় 'সাগর সঙ্গীত'। তবে 'মালা' প্রকাশিত হয় 'সাগরসঙ্গীতে'র পরে 'অশোকগুচ্ছের' কবি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে।

যে সামান্য অবিশ্বাসের অন্ধকার মালঞ্চে প্রতিভাত ছিল, 'মালা'য় তাহা বিদূরিত হইয়া মালা ঈশ্বরের দিকে কবির মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুখ করিয়াছে। কবি "প্রেম ও প্রদীপ" কবিতায় প্রদীপের আলো দেখিয়া ভগবানের সন্ধান করিতেছেন—

"ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী,
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি, মরণ মাঝারে
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব সাধনায়
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর সন্ধ্যায়
হে-মোর লুকান ধন! আজো তুমি জয়ী
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ী!"

অন্ধকারে খুঁজিয়া কবি কেবল নিরাশই হন নাই, তাঁহার মনে আশারও সঞ্চার হইয়াছে। কারণ—

"হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার?"

কবি তখন স্পষ্ট দেখিতেছেন—

"সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী 'পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া।
এরি মাঝে সত্যরূপে উজলি উঠেছে ওই
তোমার প্রদীপখানি!
কি সত্য সুন্দররূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি!"

কবিও আনন্দভরে বলিতেছেন—

"তখন কি বেজেছিল হৃদয় আকাশে
এমনি উদাস করা বিধাতার বাণী?
উজলি উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকার ভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো! সকল আঁধার।"

'মালা'র কবিতাগুলি সমধিক আনন্দ দিত স্বর্গীয়া

স্বর্ণকুমারী দেবী এবং উক্ত চ্যাপমান সাহেবকে। স্বর্ণকুমারী দেবী 'মালার' কবিতাগুলির সমালোচনা করিয়াছিলেন 'মাসিক বসুমতী'তে, আর চ্যাপমান সাহেবও অনেক কবিতার ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। যেমন 'প্রার্থনা' কবিতাটি—

"নিখিলের প্রাণ তুমি! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার,
জাগরণে কর্ম্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্ব্বপ্রাণময়! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার!

Thou art the life of the universe, to me
The light of day art, and the dark of night
Activity's field when I do wake and see,
In sleep my dream Oh, Life of Life, the light
Thou art to me of day, the dark of night

ভগবানে প্রেম আরও দৃঢ় দেখিতে পাই "তুমি" কবিতায়:

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যতনা সৌন্দর্য্য আছে যতনা স্বপন
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র, ওগো ক'র আমারি জীবন
তোমার চরণভূমি।

মালঞ্চের অন্ধকারভাব "মালার প্রেম ও প্রদীপে" বিদূরিত হওয়ায়, তিনি এখন নির্ভয়, এখন মনকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম বলিয়াই কবি গাহিতেছেন—

"ভয় নাই ওরে মন! কররে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি 'পর।
এই যে আঁধার রাত্রি
নয়ন ভরিছে আজি
এরি মাঝে পারি তুই আত্মপরিচয়,
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়।"

আর এই আলোই তাঁহাকে শান্ত করিয়াছে—

"পরাণ মন্দিরে আজি মহা নীরবতা।"

আজ আর ছোট ছোট গানগুলি তাঁহার ভাল লাগে না—

"আজিকে ডুবুক্ যত ছোট ছোট গান
ওই তব মহাগানে ওগো মোর প্রাণ"।

তিনি মহাসঙ্গীতের দূরাগত অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছেন—

হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে।
("নীরবতা")

যে মহান ত্যাগ চিত্তরঞ্জনকে জগতের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে, তাহারও আভাস পাই এই "মালা"য়—

"সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি কি দিব গো আমি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।"

সকল ঐশ্বর্য্যসহ সর্ব্বস্ব সমেত তাঁহার শূন্যপ্রাণই জগতের ইতিহাসে "মৃত্যুহীন প্রাণ", তাই বিশ্বকবি বাঙ্গালীর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া সত্যই গাহিয়াছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান!"

পূর্ব্বোক্ত কবিতা হইতে 'সাগরসঙ্গীতে'র ভাব আরও গভীর, ইহার দার্শনিকতত্ত্ব এই সমস্ত সঙ্গীতের অন্তরালে নিবদ্ধ।—

"তোমার এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! বাজাও আমারে,
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে।"

"সাগরসঙ্গীত"-এর একটু ইতিহাস আছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে মুক্ত করেন। মোকদ্দমায় "তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র" প্রভৃতি অনেক দার্শনিক কথার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বরাবর বলিতেন, "নারায়ণ" তাঁহাকে বাঁচাইবার ভার দিয়াছেন। দেশবন্ধু বলিতেন, "সওয়াল জবাবের সময় 'চেনে'র লকেটে অঙ্কিত নারায়ণ মূর্ত্তিকে আমি যেন দেখিয়াছিলাম ধুর্জ্জটিরূপে।" ইহার পরে

তিনি ডুমরাওন মোকদ্দমায় মহারাজা কেশোপ্রসাদ সিংহকে রাজগদিতে বসান। কিন্তু এইখানে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বসন্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যান। ফিরিবার পথে ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া উহা রচনা করেন। সেই নিভৃতে বসিয়া বিশাল নিলাম্বুব তরঙ্গভঙ্গি দেখিতেন, আর দেখিতেন ঐ দূরে—দিক্ নাই, অন্ত নাই,—কূল নাই, কোন্ দিগন্ত প্রদেশে ঐ ঊর্দ্ধের নীলাকাশ এই বিস্তীর্ণ জলরাশির সহিত মিশিয়াছে, আরও ঊর্দ্ধে চাহিতেন,—ভাবিতেন এই অদ্ভুত সৃষ্টি যাঁহার রচনা, কি অনন্ত তাঁহার রূপ, কত সুন্দর সেই বিশ্বস্রষ্টা, কত অসীম তাঁহার করুণা! সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত, আর সেই অর্ণবের গানে অন্তর বিজনে অসীমকে বাঁধিতে চাহিতেন। অসীমের উদ্দেশে রচিত সেই গানই "সাগরসঙ্গীত।" অপরিমিত ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দই এই অপূর্ব্ব কাব্যখানি সুররাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

কবি গাহিতেছেন –

"হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ী
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে!
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি ছন্দে গেঁথে লই।
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে
পরিপূর্ণ শব্দহীন অন্তরের তানে
ছন্দাতীত ছন্দে আমি তোমারে বাঁধিব
তুমি কি রবে না সেথা! হে স্বপ্ন-অঞ্চলা।
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ নিত্য অ-চঞ্চলা।

এখানে অসীম সাগর তাঁহার আরাধ্য অসীমেরই পার্থিব প্রতীক—বারিব্রহ্ম!

"সাগরসঙ্গীতে" কেবল অদ্বৈতদর্শনই নাই, অসীমের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা ইহার ছত্রে ছত্রে। সময় সময় মায়াবাদ শূন্যবাদের মধ্যে দিশাহারা হইলেও—

"গগন আলোকহীন, শশীতারা কিছু নাই,
যেন কোন মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই।"

তখনই আবার "মহাকাল থেমে গেছে, তোমার চরণতলে", আর নির্ভরতার অবস্থা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—

"ওগো যন্ত্রি! আমি যন্ত্র বাজাও আমারে,—
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে।
আমার জীবন ল'য়ে কি খেলা খেলিলে
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে।
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!"

"সাগর-সঙ্গীত" বৈদান্তিকের মায়াবাদ ও বৈষ্ণবীয় প্রেমের আত্মসমর্পণ,- এতদুভয়ের সংযোগস্থল। কখনও দেখিতেছেন—"অন্তহীন দিশাহারা"…"শিশুশশী নাই", আবার কখনও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বৈতভাব—গুপ্ত অভিসার—পুরাতন প্রেম—

"দুইজনে মিলিব হে! শাব দু'জনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী,
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দু'জনে
তরুণ উষার কোলে স্বপনে বিজনে।"

বৈষ্ণবীয় প্রেমে বিভোর কবি কান্তভাবাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার।"

কেবল মিলনেই নয়,—সাধন ভজনে রত থাকিয়া মিলন,—তাই কবি বলিতেছেন—

"হে সার্থক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব!
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধনে ভজনে স্তব!"

"সাগর-সঙ্গীতে" কবি সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় পরম প্রেমাস্পদের আহ্বান শুনিতেছেন, কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিতে তিনি আপনার প্রাণের ধন দেখিতে পান নাই, তিনি কেবল আভাস পাইয়াছেন—

"পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসিয়াছি কর মোরে একাকার—"

তাই তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া কাতরভাবে বলিতেছেন—

"কার পানে কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ ?"

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিই যেন তাহার গুরুর কাজ করিয়া তাঁহার অন্তরের নিধি পাইবার জন্ত সহায়তা করে,—তাই তিনি গাহিতেছেন—

"দীক্ষা দাও ওগো গুরু ! মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে !

ইহার পরে Exacting Mistress আইনের গোলক ধাঁধায় তিনি এমন জড়িত হইয়া পড়েন যে, আর কাব্য রচনার অবকাশ হয় না। আবার কয়টি ঘটনা তাঁহার জীবনে বড় রেখাপাত করে। পিতৃঋণ তাহার গলদেশ লৌহশৃঙ্খলের মত এমন ভাবে জড়াইয়া বাধিয়াছিল যে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেই ঋণ (সত্তর হাজার টাকা) শোধ করিয়া তবে সেই শৃঙ্খলমুক্ত হন। সেইবারই তিনি বিলাত যান। আসিবার সময় বোম্বাই জাহাজঘাটে মাতৃরূপ দর্শন করেন। সে মা তাঁহার নিজ জননী নিস্তারিণী দেবী। গৃহে আসিয়া মাকে আর দেখিতে পান না - দুইদিন পূর্ব্বে স্বর্গারূঢ়া হইয়াছেন। ইহার পরেই তাঁহার জীবনের ধারায় ঘোর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এবার আবার তিনি সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। মোকদ্দমা করিতেন, অর্থও আসিত, কিন্তু চিত্ত নিবিষ্ট থাকিত একমাত্র অন্তর্য্যামীর প্রতি। এই "অন্তর্য্যামী"ই ১৯১৪ সালে রচিত হয়। তিনি 'নারায়ণের' চরণেই উহা নিবেদন করেন।

"এই অশ্রু, এই ব্যথা, এই হাহাকার,
তুমি না লইবে যদি কারে দিব আর ॥"

তিনি একান্ত নির্ভরভাবে অন্তর্য্যামীকে উপলব্ধি করিতেছেন—

"যখনি দেখিতে নারি অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ তারি চারি পাশে।
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ সমুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার ;
যখনি হৃদয় যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর।"

কিন্তু কবি আক্ষেপ করিতেছেন— তুমি তো অপার দয়াল—আমার প্রাণে যে অসংখ কাঁটা, আমি তোমার আসন কোথায় স্থাপন করিব ?—

"এস আমার প্রাণের বঁধু ! এস করুণ আঁখি,
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা, তোমায় কোথা রাখি !"

কিন্তু - তুমি একটুখানি দাঁড়াও প্রভু, আমি সব কাঁটাগুলি তুলিয়া ফেলি।

"কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি !"

এখন আমি নির্ম্মল, তুমি প্রশস্ত ভাবে আমার হৃদয়ে অবস্থান করো—

"এস আমার মৃত্যুঞ্জয় এস অবিনাশি
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী,
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে চিরদিনের তরে।
নাইক আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে।
প্রাণের মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভীষিকা যত—
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অণুক্ষণ
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন।"

স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া 'অন্তর্য্যামী'র কয়েকটি ছত্র আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—"ইহাই কি স্বরাজের পথ ? ধন্য তুমি দেশবন্ধু !" ছত্রগুলি এই—

"সব তার ছিঁড়ে গেছে একখানি তার
প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার।
সব আশা ঘুচে গেছে। একটী আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায়,
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার
সব কর্ম্ম শেষে আজ মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা।
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী।

দেশবন্ধু যখন "অন্তর্য্যামী" লেখেন, স্বরাজের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন নাই। পরে হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই জীবন, ধন, মান, বাড়ীঘর সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও ছিল 'বাহ্য'। তিনি বরাবর সেই অন্তর্য্যামীর আহ্বানই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন।

"অন্তর্য্যামী"তে তবু 'তুমি' 'আমি' ভেদাভেদ আছে, কিন্তু "কিশোর কিশোরী"তে একেবারেই একাত্ম মিলন—কত জনম জনম তুমি আমি পরস্পরে প্রেমাবদ্ধ। কত জনমের চেনা চেনা ভাব, কিন্তু আজ কি আনন্দ, আমাদের কি মধুর—যুগে যুগে পাওয়া না পাওয়া—মিলন সার্থক হইল—

"তোমার আমার মাঝে
অপর কি কেহ আছে ?
কে বলেরে বন্ধ বন্ধ
কার পদরজ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে। হে মিলিত। হে ম র
হে পূর্ণ, অপূর্ণ, তুমি বন্ধ, আমি বন্ধ।

এই একাত্মমিলন—মধুর রসই "কিশোর কিশোরী"তে প্রতিভাত। আমরা আরও দেখিতে পাই, যে সুরে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ বাঙ্গলা প্লাবিত করিয়াছিলেন, যে সুরে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বাঙ্গলায় প্রাণস্পর্শ করিয়াছেন, চিত্তরঞ্জনের গানেও সেই সুরই ধ্বনিত হয়—

মেঘের মাঝে ঐযে ভাসে
নীল সাগরের নীলমণি,
আমার প্রাণের মাঝে কি যে করে,
আমি ঝাঁপ দিব এখনি।
এতদিনের সাধনের ধন
ঐ যে ডাকে ভয় কিরে মন,
ওরে তোরা বারিস না কেউ
আমি ঝাঁপ দিব এখনি।
ঐ যে ভাসে ঐ যে হাসে
নীল সাগরের নীলমণি।

নিম্নলিখিত গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল,—

ওগো আমার উজল বরণ
কেন লুকাও মেঘের মাঝে ?
ওই তুমি কাছেই আছ
ওই যে তব নূপুর বাজে।

এই গানটিও বড়ই মধুর—

মিটায়ো এই পিয়াসা
এইত আমার মিষ্টি লাগে।
ওগো বিরহী, চিরবিরহী
এই তৃষা যেন নিত্য জাগে।
মিলন আমি চাই না হে,
এই তিয়াসা যেন নিত্য থাকে,
চোখের জলে এত মধু
প্রাণবঁধু হে প্রাণবধু।
মুছায়োনা চোখের বারি
নাই এলে আঁখির আগে।
নাই বা যদি মিলন হলো।
এই বিরহ যেন নিত্য জাগে।

এইবার নারায়ণ পত্রিকার কথা কিছু বলিব—

১৯১৪ সালের জুনমাসে চিত্তরঞ্জনের পিতাও স্বর্গগত হন। ইহার পরেই তিনি 'নারায়ণ' পত্রিকা বাহির করেন। বাঙ্গালার প্রাণধারার সন্ধান লইয়া সাহিত্য রচনা করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

'নারায়ণ' পত্রিকা যে বাঙ্গালী জাতির অশেষ হিত-সাধন করিয়াছে, সে সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ভক্তি-প্রাণ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে নারায়ণ ভাবে দেখায় একটা ফল ফলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যে কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম করিয়াছেন 'নারায়ণ'।

"তাঁহার মনের মধ্যে সে মন তাহার তলদেশে বিশ্বাস ছিল যে, "নারায়ণ" দেশরক্ষা করিবে। হইয়াছেও তাই। একটা মহলে বাঙ্গালার বড় একটা আদর ছিল না; সেটা ব্যারিষ্টার ও বিলাত ফেরত মহল, 'নারায়ণ' সে মহলে বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। এমন সকল লোক আমার

কাছে নারায়ণের কথা কহিতেন, যাঁহারা কখনও যে বাঙ্গালা পড়েন, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।... যাঁহারা ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলেই পাছে বাঙ্গলা কথা শিখিয়া বাঙ্গালী হইয়া যায়, সেই জন্য গোড়া থেকে ছেলেদিগকে সাহেব করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারাও "নারায়ণ" পড়িতেন।

"নারায়ণ একটা বড় কাজ করিয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গলা পণ্ডিতি সাধুভাষার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। 'নারায়ণ' পারিয়া উঠিয়াছিল। নারায়ণের সময় হইতেই সাধুভাষা একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন "নির্ম্মিৎসা চিকীর্ষা, জিগমিষা" নদ নদী পর্ব্বত কন্দর প্রভৃতি শব্দ আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; 'নারায়ণ' বাঙ্গলা ভাষাকে খাঁটি বাঙ্গলাভাষা করিয়া দিয়া গিয়াছে। "নারায়ণে" ছোট ছোট গল্পগুলি খুব ভাল ছিল। দাশ মহাশয়ের নিজের গল্পগুলি বেশ মিষ্ট লাগিত; তিনি যেন কি একটা প্রেমভক্তি ভালবাসার জিনিষ খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না, পাইবার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, উধাও হইয়া বেড়াইতেছেন মনে হইত।

"নারায়ণে" সমালোচকের অভাব ছিল না, সমালোচনা কোনদিকে চলিয়া পড়িত না, বিশেষ করিয়া চারিদিক দেখিয়া লেখা হইত। অনেক লোকের উপাস্য দেবতাকে অসার বলিয়া উল্লেখ করিতে 'নারায়ণ' ভয় পাইত না। অনেক ঋষি তপস্বী ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। অনেক অজানা লেখককে নারায়ণ জানাইয়া দিয়াছে।"

স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন :

"সাহিত্যানুরাগ ও অন্যান্য কারণে ভাব প্রেরিত হইয়া চিত্তরঞ্জন "নারায়ণ" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম "নারায়ণ" পূজায় ত্রুটী হয় নাই।..."নারায়ণের" পূজা অব্যাহত থাকিলে আমাদের সাহিত্য সম্ভারের প্রকৃষ্ট প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিত সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যথেষ্ট মনোবাদের কারণ হয়।"

ইহা মোটেই মনোবাদ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিত্তরঞ্জনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তবে তাৎকালীন রচনায় তিনি প্রতিবাদ করিতেন; এই সময় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়া শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিতেছিলেন। কলিকাতা হইতে স্যর জগদীশ বসু, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ প্রায় দুই শত লোক সেখানে গিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাহার ৩।৪ মাস মধ্যেই ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস ইংরাজী ১৯১৪ এপ্রিল হইতে "একটা নূতন কিছু করিবেন" বলিয়া স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীরবলী ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া "সবুজপত্র" কাগজ বাহির করেন। তিনি 'মুখবন্ধে' বলেন—

"ইউরোপের সংস্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তাব থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ, সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি। এই নবজীবনের নব শিক্ষা প্রচার করবার একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলেই আমরা এই নূতন পত্র প্রকাশ ক'রতে উদ্যত হয়েছি।"

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের কাগজে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় একটি ছোট কবিতা বাদে সব লেখাই ছিল রবীন্দ্রনাথের। কি প্রবন্ধ, কি গল্প, কি কবিতা সবারই রচয়িতা ছিলেন একমাত্র তিনি। এক ১৩২১ সালের হালদার গোষ্ঠী, হৈমবতী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র প্রভৃতি ৮।৯টি গল্প বাহির হয়, আর কোন কোন চিত্রে সম্পাদক কথিত নব-সাহিত্য প্রচার সুগম হইয়াছিল। ইবসেনের A Dolls House নাটকটির নায়িকা নোরা "I have duties to myself, I must educate myself" বলিয়া স্বামীর সঙ্গে সামান্য মনোবাদ হওয়ায় কেবল একখানি গরম কাপড়, টুপীটি এবং একটি ছোট ব্যাগ লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে এবং কেন আসিয়াছে তাহা সে ব্যক্ত করিয়াছে। আর "স্ত্রীর পত্রে" মেজবৌ মৃণাল স্বামীর

ঘর ছাড়িয়া আসিয়া পরুষভাবে স্বামীকে লিখিতেছে— "তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নাই, যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ীতে আর ফিরব না …আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই, আজ আমি বেঁচে থাকতে লেগে রইলুম,- কারণ লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা।"

"ঘরে বাইরে"ও সবুজপত্রে বাহির হয়।

চিত্তরঞ্জন এই সাহিত্যের প্রতিবাদ করিলেন আর উহা মুখর হয় "নারায়ণে"—উহা সবুজ পত্রের ৭ মাস পরে অগ্রহায়ণ ১৩২১ (১৯১৪ নভেম্বর) হইতে বাহির হয়। ইহাতে চিত্তরঞ্জনের গান, কীর্ত্তন, অন্তর্য্যামী, কিশোর কিশোরী এবং গল্প দুইটি 'ডালিম' ও 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' বাহির হয়। আর ইহার লেখক ছিলেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জলধর সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজা-শঙ্কর রায়চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণ। এই নবসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার "কবিতার কথায়" চিত্তরঞ্জন স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করেন—

"বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে।"

"হিন্দুর আন্তরিক ভাব—বাঙ্গালী কবিতার প্রাণ—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—সেই অক্ষুণ্ণ ধারা কোথায় লুকাইল? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গলা কবিতার যে প্রাণ, তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতেছি, অনেকের এ কথা ভাল লাগিতেছে না। তাহারা হয় তো বলিবেন কবিতা কি চিরকাল একরকমই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমনে চলিবে?" আমি তো কোন গণ্ডীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্যলোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম, অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইবসেন হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। নানাফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটারলিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে, আমরা সে বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্য-লোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। এতদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিষ নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলন মন্দিরের সাধক হওয়া চাই।...সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীতস্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই। নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদি রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

"বাঙ্গলা কবিতার সেই সরল সত্যপ্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভূত কিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে

"এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল"—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তা না হইলে না কি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটী ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিষটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরল ভাবে পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে

তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

"কিন্তু ইহা ত বাঙ্গালার কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব নয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।"

ছন্দ এবং ভাষার কথায়ও তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন:

"আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের। আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাধাসিধে লোক বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগ-রাগিণী আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতে পারে না।

"আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্য সেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না। হয় তো আমার বুঝিবার মত ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই সত্য, কিন্তু আমি তো সাধক নহি,—সাহিত্য-মন্দির প্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!"

(কাব্যের কথা, ১৯১৪ ডিসেম্বর)

চিত্তরঞ্জন তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন, কেননা চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। তিনি বলিতেন "শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়, সে Naturalist। তাঁহার মতে যাঁহার ইন্দ্রিয়ভোগে অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই ও যিনি কেবল নীতি কথাই প্রচার করিতে চাহেন, উভয়ের কেহই কল্প-কলা সৃষ্টির অধিকারী নহে। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পায়, সেই কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং চণ্ডীদাস এই ভাবের শ্রেষ্ঠ কবি তাহারই কবিতার মহামিলন মন্দিরের গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন—কৃষ্ণ প্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি।"

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঁই।

চিত্তরঞ্জন বলেন—

"এরূপ কবিতা আজকাল শুনিতে পাই না, আর কি শুনিতে পাইব না?"

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"—তে চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "এ তো সেই মহামিলন মন্দিরের গীতধ্বনি, আর জীবনের সকল গীতই এই মিলন মন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হয়, তাই এত শতাব্দী পরেও গানটি পড়িলেই মনে হয়—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ"

এ সুর কোন্ ভাষার কোন্ সাহিত্যে পাওয়া যায়!

'নারায়ণ' ৫।৬ বৎসর সমভাবে চলিয়াছিল। তারপর তিনিও ফকিরি গ্রহণ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, নারায়ণও উঠিয়া যায়। উপরোক্ত মতদ্বৈধ থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার কখন ব্যত্যয় হয় নাই। ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আর তাঁহার মহাপ্রয়াণের পরে দুইটি ছত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে বাহির হয়, তাহাও অমর সাহিত্যেই পরিণত হইয়াছে—

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

উপসংহারে চিত্তরঞ্জনের শেষদিকে রচিত গানটি আপনাদিগকে উপহার দিতেছি—

"নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার
আমার সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই যে হাতে মোহন বাঁশী,
সেই মুরতি হেরব ব'লে
পরাণ বড় অভিলাষী।
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার;
এসো আমার পরশ মাণিক,
বেদ বেদান্তে কাজ কি আর।"

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গান শুনিয়াছি, কিন্তু এখন তাহা থামিয়া গিয়াছে। আজ সেই মোহন বংশীধারী নীল সায়রের নীলমণিই আমাদের সকল গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বাঁশী হস্তে আমাদের সকলের হৃদয় সুশোভিত করুন এবং আমরা যেন সমস্বরে গাহিতে পারি—

"মেঘের মাঝে ঐ যে সাজে নীল সাগরের নীলমণি
আমার প্রাণের মাঝে কি যে করে
আমি ঝাঁপ দিব এখনি।"

গান

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

বাহির তোমারে আর কিছু জানে
অন্তর জানে কিছু;
তোমারে যখন বাসিয়াছি ভালো
ভাবি নাই আগু পিছু।

চিত্ত যখন করিয়াছ জয়,
লোকে কি বলিবে করি নি সে ভয়;
তোমারে আপন করিতে যাইয়া
কেন হবে মাথা নীচু।

ভালবেসে লোকে লাজ-মানে ওগো
ক'রেছে কভু কি বড়,
কেন ভালবাসি যায় নি ত করা
প্রশ্ন এমনতর।

কা'র চোখে কে যে কেন ভাল লাগে,
কা'র তরে ব'সে কে যে রাত্ জাগে,
কে বলিতে পারে জীবন ধরিয়া
কেন ফিরি তব পিছু।

রূপনারায়ণের তীরে

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

তখন আমি হাওড়া সেটেল্‌মেণ্টের চার্জ্জ-অফিসার। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস। তাঁবু পাতিয়াছিলাম বাগনান গ্রামে। একদিন মানকুড় প্রভৃতি গ্রামে মাঠের কাজ পরিদর্শন করিবার সময় হঠাৎ খেয়াল চাপিল, সেই-দিন দুপুর বেলায় পানিত্রাস গ্রামে যাইয়া শরৎবাবুর পায়ের ধুলা নিব।—১৯১৯ সালে শীতকালে, শরৎবাবুকে আমি আর একবার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি তখন লক্ষ্ণৌতে। বাঙালী পাড়ায় সোড় পড়িয়া গেল, শরৎ বাবু লক্ষ্ণৌ বেড়াইতে আসিয়াছেন; আবার ঐ দিনই রাত্রে বেনারস ফিরিবেন। খোঁজ,—খোঁজ,—চতুর্দ্দিকে তল্লাস সুরু হইল। আমরা কয়েকটি বন্ধু খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে বাহির করিলাম ভিক্টোরিয়া পার্কের একটি গাছের তলায়। গায়ে পাঞ্জাবী, একখানা শাল জড়ানো, হাতে একটি দশ পয়সা দামের মাটির করসী হুকো। সম্মুখের রাস্তাতে টাঙ্গা অপেক্ষা করিতে-ছিল। সকলেই পায়ের ধুলা নিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আত্মগোপন করেই রাত্রের গাড়ীতে বেনারস ফিরে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমরা তা' হ'তে দেবে না দেখছি। এখন কোথায় যেতে হবে বল। কিন্তু মেরে ফেললেও আমি কোন সভা-সমিতিতে যাব না।" আমরা উত্তর করিলাম,—'চলুন আপনাকে মিঃ সেনের বাড়ী নিয়ে যাই; সংবাদ পেয়ে, তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে চারদিকে খুঁজতে।'—মিঃ সেন হচ্ছেন, স্বর্গত এ. পি. সেন,—সাহিত্যিক এবং লক্ষ্ণৌ-এর স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার। শরৎ বাবুকে মিঃ সেনের বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল। মিঃ সেন তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। দুই তিন ঘণ্টা অবস্থানের পর আহারাদি শেষ করিয়া, শরৎ বাবুকে মিঃ সেনের মোটরে চারবাগ ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম, আমি আর একজন বাঙ্গালী যুবক। আমরা যখন তাঁহার বিছানা পাতিয়া গাড়ীতে সযত্নে সব গুছাইয়া রাখিলাম তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের চিনি না—জানি না—কোনও পরিচয়ই নেই—, অথচ কী যত্নটাই না আজকে আমাকে করলে। ক'লকাতায় গেলে, আমার সঙ্গে হাওড়া-পঞ্চাননতলায় দেখা কোরো।"

আমরা পায়ের ধুলা নিয়া নামিলাম; গাড়ী বংশী-ধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি এবং পথ-নির্দ্দেশ লিখিয়াই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শরৎবাবু তখন পুস্তকাকারে বিরাজ করিতেছিলেন প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে। শরৎবাবুর সঙ্গে সেদিনের পরিচয়ের কথা মনে করিতে ১৫।১৬ বছর পর আজও মনে আনন্দ পাইতে-ছিলাম। ইতিমধ্যে সাহিত্য-জগতে খ্যাতি এবং সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তিনি—প্রচুর। জাতি এবং সমাজের দরদী বলিয়া সবাই তাঁহাকে চিনিয়াছে। তাই আজ যখন শরৎবাবু দর্শনে সাইকেলে যাইতেছিলাম, তখন অনেক কিছুই মনে হইতেছিল। বিশেষ আশঙ্কা হইতেছিল যদি বা তিনি সাক্ষাৎ না করেন।—রূপ-নারায়ণের বাঁধের উপর দিয়া সাইকেল করিয়া যখন পানিত্রাস গ্রামে পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। নভেম্বর মাসের ২৬কী ২৭শে হ'বে—তারিখটা আমার ঠিক মনে নাই। পানিত্রাস গ্রামে পৌছিয়া খবর নিতেই শরৎ বাবুর বাড়ীর সন্ধান মিলিল। সাইকেলটি কাঁধে করিয়া একটি সাঁকো পার হইয়া বাঞ্ছিত স্থানে পৌছিলাম। বারান্দার দাওয়ার গায়ে সাইকেলটি ঠেস্ দিয়া রাখিয়া ধীর-পদক্ষেপে বারান্দায় উঠিলাম সেখানে তখন আর কেহই ছিলেন না, কেবল দেখিলাম একটি লোক এঘর ওঘর করিতেছেন। বুঝিতে সময় লাগিল না যে, সে ভদ্রলোকটিই হচ্ছেন—কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বারান্দায় আসিলে আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি বলিলেন, "আমিতো আপনাকে চিনতে পারলুমনি।" আমি বলিলাম,—'চিনবার কথা নয়—আপনার পদধূলি নেওয়ার সৌভাগ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।' আজ সুযোগ পেয়েছি তাই এলাম।—শরৎবাবু বলিলেন, 'তা' বেশ, বেশ। আপনি কোথা' থাকেন এবং কী করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কী? পূর্ব্ব পরিচয়ের কোন কথাই না তুলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম—'বর্ত্তমানে কিছুকাল আপনাদের

জেলাতেই থাকব। আমি ডেপুটি কালেক্টর, আপনাদের জেলায় যে জরীপ হচ্ছে, তার চার্জ্জ অফিসার। বাগনানে ছাউনী ফেলেছি। লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। মাপ করবেন, এতবড় সুযোগ জীবনে হয়ত আর পাব না। আজ আপনাকে যে ভাবে পেয়েছি, এভাবে আপনাকে পাওয়ার সুযোগ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। পায়ের ধুলো নেওয়া হ'য়ে গেছে, আজকের মত যাই, অনুমতি পেলেই আর একদিন আসব।'—শরৎ বাবু বলিলেন, "আরে বোসো, বোসো ভাই ('আপনি' 'তুমি' হইয়া গিয়াছে)। দেশবন্ধু যখন জেলে গেলেন, তখন একদিন আমায় ডেকে বল্লেন, 'শরৎ, আমার রাধাকান্ত জীউকে তুমি বাড়ী নিয়ে যাও। তুমি তাঁকে বেশ পূজো এবং যত্ন করবে জানি।'—দেশবন্ধুর অনুরোধ মাথা পেতে নিলেম। রাধাকান্তজী এখন এখানেই বাস কচ্ছেন। তুমি একটু বোসো ভাই, আমি পুজোটা সেরে আসি। আমি বলিলাম—'তাইতো, আপনার আহার পর্য্যন্ত হয়নি। আমি চলি, আর এক দিন আসব।'—শরৎ বাবু স্নেহভরে উত্তর করিলেন—'না না, বোসো ভাই। তোমার কাছে অনেক কথা জানব।' আমি বলিলাম—'বেশ তাই হোক।'

শরৎ বাবু দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। ওখানে একখানা ফরওয়ার্ড পত্রিকা ছিল। আমি উহা নিয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, একটি হাই-টেবিলে একখানা খাতা; তাহার নিকটে ফাউনটেন-পেন ষ্ট্যাণ্ড-এ চারিটি ফাউন্টেন-পেন। শরৎ বাবুর আশে পাশের সব কিছুতেই মনটা আমার ঔৎসুক্যপূর্ণ ছিল। হাই-টেবিলের নিকট যাইয়া দেখিলাম, খাতাখানায় শরৎ বাবু তখন "বিপ্রদাস" লিখিতেছিলেন। ইহা দেখিয়াই আমি খাতাখানা রাখিয়া দিলাম। উহার একটি লাইনও আমি পড়ি নাই। নিকটস্থ তক্তপোষের উপর বসিয়া আমি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকাখানাই দেখিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পর শরৎ বাবু হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"তার পর এবার তোমার খবর বল।" আমি বলিলাম—এখন আপনি বিশ্রাম করুন। আমি যাই, আর একদিন আসব।'—শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "তা কী হয়? কিছু না খেয়ে কোথায় যাবে? গিন্নী বল্লেন বামুনের বাড়ী হিন্দুর ছেলে দুপুর বেলা না খেয়ে কী করে যাবে?" আমি বলিলাম,—দাদা, কত ভাগাড়, কত আদার, মাঠের এদিক ওদিক কত কিছু ঘুরে আপনার এখানে এসেছি, এ অবস্থায় ভাল রকম হাত পা' না ধুয়ে কী কিছু খেলা যাবে? আমি আর-এক দিন এসে খেয়ে যাব।'—আমার কথাগুলি শেষ না হইতেই সাত আট বছরের একটি মেয়ে একখানা পাথরের রেকাবিতে লুচি, তরকারী, ভাজা এবং বাতাসা লইয়া বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন,—'এটি আমার ভাইজী।' মেয়েটির পশ্চাতে আসিল একটি ভৃত্য—এক বালতি জল, সাবান গামছা সহ। বুঝিলাম সব কিছু বন্দোবস্তই তিনি করিয়াছেন। হাত-মুখ ধুইয়া আহার শেষ করিলাম। তারপর শরৎ বাবু তাঁহার বাড়ীর বাহিরের দিকটা আমাকে দেখাইলেন। রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত এই বাড়ীটি। গৃহের সংলগ্ন নদীতীরে শরৎ বাবু তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদরের সমাধির স্থানটুকু অতি যত্নসহকারে রাখিয়াছিলেন। বেলা সাড়ে তিনটে, চারটে অনুমান সময় তাঁহার প্রতিবেশী আসিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইতেই শরৎ বাবু দাবার ছক নামাইলেন। আমি পায়ের ধুলা নিয়া বলিলাম—'আজকে যাই, আর একদিন আসব।'—তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এসো কিন্তু ভাই; শনি রবিবার বাদ দিয়ে এসো। অনেক সময় সভা-সমিতির জন্ত ঐসময়টা কলকাতায় থাকতে হয়।"

মাসখানেক পর আমি আর একদিন যাইয়া উপস্থিত হইলাম—শরৎ বাবুর বাড়ীতে। তখন দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে। যাইয়া দেখি তাঁহার ডাক্তার প্রতিবেশীর সহিত সেদিনকার দাবা খেলার শেষ বাজী মাত্র শেষ হইল। আর এক বাজী হয়ত বসিত। কিন্তু আমাকে দেখিয়া সব গুটাইয়া রাখিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'আরে এই যে ভাই, এসো, এসো; এতদিন দেখিনি কেন?' আমি পায়ের ধুলা নিয়া উত্তর করিলাম,—'রোজই ত' আসতে ইচ্ছা হ'ত, কিন্তু সময় যে পেতাম না।' তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদূর থেকে এলে?" আমি বলিলাম যে, আজ বাগনান থেকেই আসছি। আমি সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলাম একটিন 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট' সিগারেট, তিনি ধূম পান করিতে ভালবাসিতেন; উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'তা'হলে ত রোজই তোমার আসা উচিত হ'বে।' তিনি সেদিন আমাকে তাঁহার বাড়ীর অন্দর সব দেখাইলেন। বাড়ীতে যে বইয়ের লাইব্রেরী ছিল, তাহাও আমি দেখিলাম। নানা-রকমের গ্রন্থ সেখানে ছিল, কিন্তু অযত্ন-রক্ষিত। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'দাদা, আমি আপনার লাইব্রেরীখানা গুছিয়ে ক্যাটালগ্ করে দেব।' তিনি বলিলেন, "ক'খানা বা বই; কী আর ক্যাটালগ্ করবে!" সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। তুলসীমঞ্চে আলো দেওয়ার পর শাঁখের শব্দ কানে পৌছিতেই শরৎ বাবু বলিলেন, "তুমি কী এখনই যাবে?" আমি বলিলাম,—'না, আজকে জ্যোৎস্না রাত; রাতের আলোয় এ তিনটা মাইল বাইক করে যেতে আমার কোন কষ্টই হ'বে না।'—সেদিন একথা-সেকথার পর আমি তাঁহাকে মূর্খের মত বলিয়াছিলাম যে, গৃহ-দাহ এবং স্বামীর underlying philosophy এক। সংক্ষিপ্ত হইলেও "স্বামী" সহৃদয়-গ্রাহী, কিন্তু গৃহ-দাহ জটিল সমস্যাপূর্ণ। এর স্থানে স্থানে মন যেন ঠিক খাপ খেতে চায় না। শরৎ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সুযোগ পাইয়া আমি আবার বলিলাম—'সুযোগ পেয়েছি, তাই বলছি। আপনার লেখা সব কিছুই আমাকে মাতিয়ে তোলে; প'ড়তে প'ড়তে, ব্যথায় এবং আনন্দে আমার চোখের জল আপনা হ'তেই এসে পড়ে। আপনার লেখার আলোচনা করতে পারি, সে সাহস আমার নেই। তবে কিনা দু'একটা কথা যা ঠিক মনের সঙ্গে খাপ খায়নি, হয়ত আপনাকে পেয়ে আমার মন সেগুলির সমাধান করে নিতে চায়। তাই আবোল তাবোল বকছি। ধৃষ্টতা মাপ ক'রবেন। দিবাকর এবং কিরণময়ীর ব্যবহারটা কিরকম যেন মনে হয়। নিজের psychologyর সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খাইয়ে উঠ্তে পারি না।' শরৎ বাবু নির্বাক্। চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। আমি মূর্খের মত বলিয়া যাইতে লাগিলাম—সত্যি বলতে কি, বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র সরযূকে চন্দ্রনাথের সহিত গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। সেখানকার বিবরণীটি যতবারই পড়েছি, কোনবারই অশ্রু-সংবরণ করতে পারিনি। সত্যি; আমাদের মনের সব খুঁটিনাটিই কী আপনি জানেন। যে কথা গুছিয়ে বলতে পারি না, অথচ মনের মধ্যে আমার সেগুলো রয়েছে, দেখতে পাই যে আপনি ঠিক সেগুলোই ব্যক্ত করেছেন;—ঠিক যেন অন্তর্য্যামী।'—এবারে কথাশিল্পী একটু হাসিয়া বলিলেন, "এসো ভাই, অন্য কথা বলি; ওসব কথা থাক। আমি যখন লিখি, বুকের রক্ত নিংড়ে লিখি। লোকে ভাল বলবে কী মন্দ বলবে, সে খেয়াল আমার থাকে না।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হঠাৎ চৈতন্য হইল—কাহার সহিত আলাপ করিতেছি। উত্তরের কোন ভাষাই আর আমার ছিল না। আমার অবস্থাটা সহজ এবং সরল করিবার জন্য শরৎবাবু বলিলেন, "এখন জরীপের কথা বলুন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন আমাদের কাজ থাকিবে। আমি বলিলাম—'আশা করি যে মাস পর্য্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে।' শরৎ বাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিস্তোয়ার, খানাপুরী, বুঝারত, এটেষ্টেশন্, তিনধারা সবগুলি ষ্টেজ-এর কাজই জানিয়া লইলেন। নিজেই বলিলেন, "বাঃ বেশ ত। সবাইর বিশেষতঃ প্রজাদের স্বত্ব ও দাবীর সব কিছুই তোমরা স্থির করে দেবে। তা' বেশ, ভাল। আচ্ছা, বাংলা দেশের সাতাশটি জেলার সব ক'টিরই জরীপ এবং রেকর্ড তোমরা তৈরী করেছ কী?' তখন দিনাজপুর, রংপুর এবং হাওড়ায় জরীপ চলিতেছিল। তাই আমি উত্তর করিলাম,—হাওড়া জেলায় জরীপ হ'লেই বাংলা দেশের সমস্ত জেলায় রেকর্ড প্রস্তুত শেষ হ'বে। তিনি বলিলেন, "জানতুম নি। তোমরা ত একটা মনুমেন্টাল কাজ শেষ করেছ। আচ্ছা, আমার বাড়ী এবং এই পুকুর, এ সবও তোমাদের ম্যাপ-এ উঠবে?" আমি উত্তর করিলাম, নিশ্চয়ই; আমি ম্যাপে আপনার বাড়ীটির দাগের মন্তব্যে লিখে রাখব—'কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর আবাস-স্থান'—। ইংরেজেরা Ttratford-on-Avonএ কত কী করেছে।

আমরা কী সামান্য এই মন্তব্যটুকু রাখতে পারব না?' তিনি একটু হাসিলেন মাত্র। রাত্রি হইতেছিল; তাই সেদিনের মত পায়ের ধূলা নিয়া আমি তাঁবুতে ফিরিলাম।

আমার সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলেন রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখার্জ্জী—যিনি পরে ডি. এল. আর. হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের একজন কৃতী কর্ম্মচারী, রায় বাহাদুরের দেশাত্মবোধও কম ছিল না। ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথমদিকে তিনি আমাকে বলিলেন যে, একদিন শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। বেলা অনুমান দু'টা আড়াইটার সময় আমি রায় বাহাদুরকে নিয়া শরৎবাবুর রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত বাড়ীতে গেলাম। শরৎবাবু স্বভাবতঃই একটু লাজুক ছিলেন। তিনি রায় বাহাদুরকে যথাযথ ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। আলাপ-আলোচনা যা' কিছু, সবই করিলেন রায় বাহাদুর;—শরৎবাবু কেবল মাঝে মাঝে দু' একটি কথা মাত্র বলিলেন। রায় বাহাদুর সামাজিক দুর্নীতির কথা অনেক কিছু বলিলেন, কিন্তু শরৎ বাবু চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন; কেবলমাত্র বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ। সামাজিক দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে দূর করতে হবে। তা' না হ'লে আমাদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার অধিকার নেই।" নমস্কার এবং প্রতি-নমস্কারের সহিত রায়বাহাদুর বিদায় লইলেন। আমি শরৎবাবুর পায়ের ধূলা লইলাম। সেদিন তিনি আমাদের তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ সাঁকো পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেলেন।

এরপর যেদিন আমি শরৎবাবুর বাড়ী যাই, সেদিন মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম শরৎবাবু বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া যে, এস, এস। তোমায় বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কী খাবে বল?" আমি উত্তর করিলাম—'ডাব খাব।'—ডাব এল; সঙ্গে এল বাতাসা। হাসিয়া বলিলেন, "জান ভাই। বাতাসাই গ্রামের সন্দেশ।" তখন বেলা অনুমান ১২টা হইবে। বহু ভিখারীর দল আসিয়া জুটিল। সেদিনটি ছিল রবিবার। বারান্দার কাঠের বাতায় একটি থলে ঝুলান ছিল। তখনকার দিনের তামার পয়সা এবং ডবল পয়সায় উহা ছিল পরিপূর্ণ। আমি চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। তিনি থলে হইতে একটি একটি ডবল পয়সা বাহির করিয়া প্রত্যেক কানা-খোঁড়া এবং খঞ্জকে দিলেন এবং অপরাপর ভিক্ষুককে প্রত্যেককে দিলেন একটি করিয়া পয়সা। ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—'প্রত্যেক রবিবারই কী এরূপ দেন?'—তিনি বলিলেন, "দেওয়ার শক্তি কৈ; চেষ্টা করি বটে। আমাদের দেশে এ দুর্ভাগাদের বাঁচাবার কোন ব্যবস্থাই ত আমরা করিনি। কেবল যদি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি, তবেই এরা বাঁচতে পারে। এদের ভেতর এমন লোকও আছে যা'রা এ দুটো পয়সার জন্য দু'তিন ক্রোশ দূর থেকে এ'য়েছে। চেষ্টা করেছিলুম, মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা গ্রামে এদের জন্য একটা সাহায্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে। গ্রাম্য দলাদলির জন্য সে সম্ভব হয়নি। সাহায্য-ভাণ্ডার গড়বার আগেই প্রশ্ন উঠল—কে হবে তার প্রেসিডেণ্ট, কে হবে তার সেক্রেটারী। সে প্রশ্নের আর সমাধান হ'ল না; আমার চেষ্টাও সেখানেই পর্য্যবসিত হ'ল। শুনেছি বিলেতে ভিক্ষুক নেই। তার মানে, এ সব দুর্ভাগাদের ব্যবস্থা সরকারই করেছেন। আর আমাদের হতভাগ্য দেশে—; তুমি ক'লকাতার রাস্তায় ঘুরলেই বুঝতে পার যে, গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদেরও ব্যবস্থা করা সরকার আবশ্যক বোধ করেননি।" কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে বলিলাম,—'ঐ যে গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়টি দেখিলাম, শুনেছি আপনি নাকি তার সব খরচ বহন করেন?' তিনি উত্তর করিলেন, "আমার ৭০।৭৫৲ টাকা খরচা হয় বটে, কিন্তু তা'তে কোন কাজ হয় না। ওখানেও সেই একই প্রশ্ন—কে কর্ত্তৃত্ব করবে। আর, বিশেষ করে, আমিও ঠিক এখানকার লোক নই। আমি ছিলুম দেবানন্দপুরে। দিদির স্নেহের আকর্ষণে এখানে এলুম। কাজেই, গ্রামের লোক আমাকে ঠিক বরদাস্ত ক'রতে পারে না। তার জন্য আমার দুঃখ

নেই। মনে হয় যে হয় ত বা তারাও একদিন আমায় ভালবাসবে।—আচ্ছা ভাই, একটা কাজ করনা তুমি। শ্যামতা-বেড় নাম দিয়ে আমার এ গ্রামটুকুকে পানিত্রাস গ্রাম থেকে আলাদা করে দাও না? শুনেছি, জরীপের লোকরা নাকি ইচ্ছে করলেই তা' করতে পারে।"—সমস্যায় পড়িলাম। অতি নম্রভাবে উত্তর করিলাম,—'দাদা, আপনার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি কী আনন্দই না পেতাম! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে, এটা সম্ভবপর নয়। তার প্রধান কারণ, আপনার পল্লীটির আয়তন একশ' একরের অনেক কম।'—তিনি বলিলেন, "যাক্‌গে, তা হলে থাক্।" প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা দাদা, শ্রীকান্তের ঠুন্‌ঠুন্ পিয়ালাকে কোথায় পেলেন?" তাঁহার 'হোঃ হোঃ' উচ্চ হাসি সমস্ত ঘরটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল। হঠাৎ—এর উপর বলিলেন, "জান ভাই, আমি যখন বর্মায় চাকরী করতুম, তখন আমার সার্ভিসবইতে, ইংরেজী ভাষার এমন কোন খারাপ বিশেষণ নেই, যা তুমি খুঁজলে না পাবে। কাজে ত আমার মন ছিল না, কেবল যেন দিন গুণছিলুম।" কথাপ্রসঙ্গে, বর্মার অনেক সুখ্যাতি তিনি করিলেন। আমাদের বাঙালী চরিত্রের নানা প্রকার দুর্নীতির কথাও তিনি বলিলেন। বেলা হইয়া যাইতেছিল, তাই আমি পায়ের ধুলা নিয়া সেদিনের মত উঠিলাম।

কিছুদিন পরে শরৎবাবুর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, পানিত্রাস গ্রামের দুই পক্ষের সেই বড় disputeটা আমি যেন নিজে বিচার করি। কিন্তু বিচারের ভার আমি দিলাম আমাদের একজন রেভিনিউ অফিসারের উপর। এ সব বিচার কখনও সবাইকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। গ্রামের অনেকেই জানিত যে আমি শরৎবাবুর অনুগত। তাই, যে দল হারিয়া গেল, তাহারা শরৎবাবুর চিঠি নিয়া রেভিনিউ অফিসারের আদেশ review করিবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত পেশ করিলেন। সেদিনই বিকেলে আমি শরৎবাবুর বাড়ী গেলাম। যাইয়া দেখি তিনি দাবা খেলায় মত্ত। চুপ করিয়া বসিয়া দাবা খেলা দেখিতে লাগিলাম। বাজীটি শেষ হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চলিয়া গেলেন। দু'এক কথার পর আমি বলিলাম,—"দাদা, আমি যে আপনাকে অনেক উঁচুতে রাখতে চাই। আপনি এ সব গ্রাম্য দলাদলিতে কেন যোগ দেন। Disputeএ একদল না একদল হারবেই; তা'তে আপনার কী এল আর গেল। আমি দেবেন্দ্র গাঙ্গুলীর (রেভিনিউ অফিসার) রায় প'ড়েছি; সে ত কোন ভুল করে নাই। এ সব ব্যাপারে আপনার চিঠি পেলে আমি বড় বিপন্ন হই। আপনার অনুরোধ না রাখতে পারলে আমি যে কী ব্যথা পাই তা' হয় ত আপনি ঠিক-ঠিক বোঝেন না। আমার অনুরোধ, এসব বিষয়ে আপনি আমাকে আর কিছু লিখবেন না।'—তিনি শিশুর মত সরল ভাবে বলিলেন, "ওরা আমাকে এসে ধরলে কি না, তাই আমি তোমাকে চিঠি দিলুম। তা' তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই।" আমি তখন অন্য কথা পাড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের দেশে গিয়েছিলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটী থেকে ডক্টরেট্' ডিগ্রী আনতে আর মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীতে। বাঙালদের দেশ কেমন লাগল?'—তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাঙালদের দেশ! ওটাও ত বাঙলাই! আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই, মুসলমানদের জুলুম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ও-দিকটা ছেড়ে তোমরা যদি সব এ দিকে চলে এস, তাহ'লে কেমন হয়?" আমি বলিলাম,—'এটা ত ঠিক আপনার মত কথা হ'ল না। আপনিই লিখিয়াছেন যে, শ্রীকান্ত যেদিন গ্রাম থেকে চলে যায়, সেদিন কেবলই তার মনে হইতেছিল যে, এ রাস্তা দিয়েই একদিন ঠাকুরমাকে ঠাকুর্দা বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন; আর তাঁহার মা-ও বধূরূপে এসে ওই রাস্তা দিয়েই গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।'—আমরা যদি গ্রাম ছেড়ে চলে আসি, আমাদের কী ঠিক এই কথাগুলিই মনে হ'বে না। কত পুরুষের শালগ্রাম শিলা, কত পুরুষের দোল-দুর্গোৎসব, সবই যে সেখানে ফেলে আসতে হবে।'—শরৎবাবু আমার পিঠে একটা কিল মারিয়া বলিলেন, "বাঙাল আমায় খুব জব্দ করলে।"

আজ কিন্তু ঘটনাবিপর্য্যয়ে শরৎবাবুর কথাগুলি সত্যে পরিণত হইয়াছে। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আমাদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন। অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ, অনেক অপমান-লাঞ্ছনা, অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া বাস্তুহারাদের দিন অতি ধীরে কাটিতেছে। সমস্যা তাদের জটিল, প্রতি নিঃশ্বাসে তাদের

জীবনীশক্তির দ্রুত ক্ষয় হইতেছে। শরৎবাবু আজ নাই; আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে মনে হয়, তাঁহার অমর লেখনীতে বাস্তুহারাদের জন্য দু'চারটি কথা বলিতেন। বাস্তুহারাদের করুণ কাহিনীকে তাঁহার অমর লেখনী ইতিহাসের পাতায় স্থান করিয়া দিত।

শরৎ বাবুর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে আমি অনেকদিন গিয়াছি। তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, অনেক সময় তিনি তাঁর নিজের গাড়ীতে আমাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিতেন। একদিন যাইয়া দেখি যে, নিউ থিয়েটার্সের অমর মল্লিক প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'এস, বোসো ভাই। এঁরা বলছেন যে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস আমার বইগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করবে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেনা-পাওনার কথা এখনও ঠিক হয় নি।" কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক এবং অপরাপর সকলে উঠিয়া গেলেন। শরৎ বাবুকে তখন একা পাইলাম। হঠাৎ তিনি উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নাটকাকারে গ্রথিত তাঁহার 'বিজয়া' পুস্তকের এক কপি আনিয়া নিজের হাতে লিখিয়া আমাকে উপহার দিলেন। তাঁহার memento স্বরূপ এই বইখানা অতি যত্নসহকারে আমি আমার পরিবারে রাখিয়া দিয়াছি। তিনি স্নেহভরে আমাকে বলিলেন, "চারু যাবে? চল বিজয়া দেখে আসি। ওরা খুব ভাল অভিনয় কর্চ্ছে।" আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, 'আপনি আমাকে স্নেহ করেন, সে আমি জানি। তবুও শরৎ বাবুর সঙ্গে পাশাপাশি বসে অভিনয় দেখবার যোগ্য ত আমি নই। সেটা আমার পক্ষে ধৃষ্টামি হবে। বিজয়া, আমি দেখব।'—তিনি বলিলেন, "বেশ ত, তোমায় কমপ্লিমেন্টারী আনিয়ে দিচ্ছি।' আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম 'চার টাকা ব্যয় করে থিয়েটার দেখবার সামর্থ্য আপনার আশীর্ব্বাদে আমার আছে।' তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাঙালের সঙ্গে কথায় পেরে উঠবার জো নেই।"

তারপর শরৎ বাবু হলেন অসুস্থ। আমি তখন পুরীতে। জানিলাম তিনি নার্সিং হোমে আশ্রয় নিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে দেখিলাম শরৎবাবু আমাদের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার দুঃখ রাখবার জায়গা আমার নাই। তাঁহাকে শেষ দেখার সুযোগ আমি পাইলাম না। বর্ত্তমানে আমি তাঁহার অশ্বিনী দত্ত রোডের আবাসের প্রতিবেশী। কিন্তু সে বাড়ীতে আর আমার যাওয়া আসা নাই—কারণ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

আমাদের ডাক

হাসিরাশি দেবী

স্বপনকুমার! আজিকে এ অমা-অন্ধকারের পারে
তোমার প্রাসাদ-শীর্ষে কি জাগে শুক্লা তিথির চাঁদ?
নামহীন কোন পাখীরা আকাশে উড়ে যায়
সারে সারে,
নিশি-গন্ধার গন্ধে আকুল উৎসবময়ী রাত?

সে উৎসবের মাঝে কি বাজে না বিদায় বাঁশীর তান,
বারি ঝরোঝর মেঘের মাঝারে বিদ্যুৎ জ্বলে নাকো?
শুক্লা-তিথির জ্যোৎস্নারাশির হয়নাকো অবসান?
ঝড়ের দোলায় ভাঙ্গে না পাখীর
আশ্রয় লাখো লাখো?

তোমার শুভ্র বাহুবেষ্টিত মাণিকের বন্ধনী
নয়নমণির মরকত-বিভা তন্দ্রায় বিমলিন,
স্ফটিক পুরীর সীমানার পারে পাঠায় আমন্ত্রণী
মাটির বুকের যাত্রীর তরে,...যারা চির উদাসীন।

স্বপনকুমার! তুমি শোনো, আমি সেই উদাসীর দলে,
যাদের কপালে চির দুঃখের রক্ততিলক আঁকা,
যাদের আকাশে অমা-রজনীতে জোনাকীর দীপ জ্বলে,
যাদের পৃথিবী রৌদ্রতপ্ত...জলে ও কাদায় মাখা।

চক্ষে যাদের অনলের শিখা, বক্ষে লুপ্ত আশা
মুখর কণ্ঠ কল-কল্লোল তুলিছে আর্ত্তনাদে,
ক্ষমা নাই, নাই যাদের হৃদয়ে সুকুমার ভালোবাসা,
প্রেমের কাহিনী তাহারা রচে না ক্ষণিকের আলেয়াতে।

আমি তাহাদেরই একজন; তাই তোমারও ভাঙ্গাব ঘুম
আমাদেরই এই ঝড়ে জলে ভরা বিজলীর পরশন,
তোমার প্রাসাদ-শিখরে একদা নির্ব্বাক নিঝ্ঝুম
প্রহরের শেষে আনিবে জানিও,—উজ্জ্বল উদয়ন।

স্থাপত্যশিল্পে ভারতবর্ষ :

বৌদ্ধ স্থাপত্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

স্থাপত্যশিল্পে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিতে উদ্যত হইলে প্রথমেই বৌদ্ধ স্থাপত্যের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কারণ বৌদ্ধ স্থাপত্য ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য-শিল্পের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এই সত্য সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রাচীনতায় সৈন্ধবী সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন মোহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার পরেই ইহাদের স্থান। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট উত্তর ভারতের সুপ্রাচীন স্থাপত্য-কীর্ত্তিগুলির অধিকাংশই ইস্‌লামের প্রচণ্ড প্রবাহে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু স্থাপত্যের মধ্যে দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিগুলিই দূর দক্ষিণে বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রাচীন হইলেও সুপ্রাচীন বলা চলে না। আমরা বৌদ্ধ স্থাপত্যের পর ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যশিল্পপ্রসঙ্গে দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের উৎপত্তি ও পরিণতির কাহিনী কহিতে চেষ্টা করিব।

সিন্ধু-উপত্যকায় মোহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার অবশেষগুলি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, সম্রাট অশোকের শাসন সময়ে স্থাপত্যে প্রস্তরের ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে বৌদ্ধ স্থাপত্যকেই ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সৈন্ধবী সভ্যতার আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলি সিন্ধু-উপত্যকায় খননের ফলে বাহির হইল, তাহারা খৃষ্টাবির্ভাবের তিন হাজার বৎসর অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী, এ সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রহিল না। যাঁহারা আর্য্যদের ভারতে আগমনের বার্ত্তায় বিশ্বাসী, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—আর্য্যগণ এই দেশে প্রবেশের পূর্ব্বেই এই দেশের অধিবাসীরা ইষ্টক ও প্রস্তরের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে শুধু অভ্যস্ত নহে, সে বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোহেঞ্জোদারো ও

পশ্চিম তোরণে ভাস্কর্য্য কারুকার্য্য, সাঁচি।

৩নং স্তূপ, সাঁচি।

জাতকের কাহিনী ভাস্কর্য্যে রূপান্তরিত, সাঁচি।

হারাপ্পাবাসীরা দ্রাবিড়ী ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। সে যাহাই হউক, এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, প্রস্তর ও ইষ্টক স্থাপত্যকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে কাষ্ঠই গৃহনির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল। কাষ্ঠের সাহায্যে গৃহ নির্ম্মিত হইবার সময়েও গৃহের ভিত্তি প্রস্তরে প্রস্তুত হইবার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। শুধু ভিত্তিই বা বলি কেন, প্রাচীর বা প্রাকার, তোরণ, সেতু এবং বাঁধ, এগুলিও স্থাপত্যে দারু প্রধান স্থান অধিকার করিবার সময়, সাধারণতঃ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারাই প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে যে সকল গুহাগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে ৩টি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে আমাদের মনে হয় কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের আদর্শেই তাহাদিগকে গড়িয়া তুলা হইয়াছে।

বৌদ্ধ স্থাপত্য কীর্ত্তি বা সৃষ্টিগুলির ভিতর আমরা প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার বস্তু দেখিতে পাই। প্রথমে স্তম্ভের কথা উল্লেখনীয়। স্তম্ভকে প্রথম বা প্রাচীনতম বৌদ্ধ স্থাপত্যকীর্ত্তি বলিলেও ভুল হয় না। স্তম্ভের গাত্রে লিপি উৎকীর্ণ অথবা কোন প্রতীকচিহ্ন বা পশুমূর্ত্তি ক্ষোদিত করা হইত। সম্রাট অশোক স্থাপিত স্তম্ভগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্যের মধ্যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বৌদ্ধ স্তূপগুলিকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ বুদ্ধদেব বা কোন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সাধু বা সিদ্ধ-পুরুষের দেহাবশেষ স্তূপস্থ কক্ষের অভ্যন্তরে রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। যে সকল রেল বা রেলিং বা বেষ্টনী স্তূপাদির চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাণ করা হইত, তাহাদিগকে তৃতীয় স্থান দেওয়া যায়। ইহাদের গুরুত্বও কম নয়। স্তূপ ছাড়া কোন পবিত্র পাদপ, স্তম্ভ, মন্দির বা অন্য কোন ধর্ম্ম সম্পর্কিত বস্তুকে বেষ্টন করিয়া 'রেল' বা পরিবেষ্টনী প্রস্তুত করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। ইহার পর চৈত্য ও বিহারের কথা উল্লেখযোগ্য। চৈত্য বলিলে সাধারণতঃ বৌদ্ধ মন্দির বুঝায়। সভাগৃহ বা বৌদ্ধ সভা-ভবনকেও চৈত্যের মধ্যে ধরা চলে। বিহার বলিলে বৌদ্ধ মঠ বা ভিক্ষু-ভবন বুঝায়। প্রাচীনতর কালে চৈত্য ও বিহার প্রায়ই পাশাপাশি প্রস্তুত করা হইত। পরে বিহারগুলি চৈত্য হইতে পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়ে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অশোকস্থাপিত স্তম্ভগুলিই স্তম্ভের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন। শাসন-সময়ের একত্রিংশ বৎসরে তিনি স্তূপগুলি স্থাপন করেন। বুদ্ধদেবের বাণী বা উপদেশ অশোকস্তম্ভগুলির গাত্রে প্রধানতঃ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অশোক স্তম্ভগুলির ভিতর যেটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে ফিরোজ শাহ তোগলক আম্বালা জিলার টোপ্রা নামক স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া দিল্লীস্থ স্বকীয় কোটিলায় স্থাপন করেন। এই অতি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তম্ভের প্রকৃত তত্ত্ব ফিরোজ শাহ জ্ঞাত ছিলেন না। ইহার গাত্রস্থ লিপি সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীর উত্তরস্থ একটি উচ্চস্থানের উপর আর একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ফিরোজ শাহ উহাকেও স্থানান্তরিত করেন। তবে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্তম্ভটি পূর্ব্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত হয়। অশোক স্তম্ভগুলির মধ্যে যেটি মর্য্যাদাসম্পন্ন সেটি প্রয়াগে দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দানে ভূপতিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে এই স্তম্ভটিকে ক্যাপ্টেন স্মিথ পরিকল্পিত পাদপীঠের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই স্তম্ভটির গাত্রে সম্রাট অশোকের দ্বারা উৎকীর্ণ লিপি ব্যতিরেকে পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক ক্ষোদিত বাণীও বিদ্যমান রহিয়াছে। সমুদ্র গুপ্ত স্বীয় এবং পিতৃপুরুষগণের গৌরব-কথা এই অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভটির অদৃষ্ট অতি বিচিত্র। আরও পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীর ইহার বক্ষে পার্শী ভাষায় স্বীয় সিংহাসনারোহণের বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া দেন। চম্পারণ জিলায় তিনটি অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপাল-তেরাই অঞ্চলের নিলগিভার নিকটেও একটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভে যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্ম—ইহাই বুদ্ধ দেবের জন্মস্থান। নিলগিভা হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের খাস জন্মস্থলী রুম্মিণী দেই নামক স্থানেও একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত দুইটি স্তম্ভে একই লিপি উৎকীর্ণ আছে। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী

সারনাথে একটী অশোক-স্তম্ভের শীর্ষ-সমন্বিত উর্দ্ধাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধ স্তম্ভগুলি দেখিয়া মনে হইতে পারে—প্রত্যেক স্তম্ভ কোন স্তূপ বা তদনুরূপ কোন ইমারতের সম্মুখে বিরাজিত ছিল, পরে সেই ইমারত-গুলি কোন কারণে ধ্বংস পাইয়াছে, কিন্তু স্তম্ভগুলি দৃঢ়তার জন্য নষ্ট হয় নাই। পরে স্তম্ভগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলি-য়াও অনেকে মনে করেন। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গিয়াছে যে, প্রত্যেক প্রকাণ্ড স্তূপের তোরণের দুই পাশে বা পুরোভাগে তাহা স্থাপিত করার প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। চৈত্যগুলির সম্মুখে স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত। সাঁচিতে ছয়টি বা সাতটি এবং অমরাবতীতেও প্রায় সেই-

বুদ্ধগয়ার মন্দির

বহির্ভাগেও স্তম্ভ ও স্তম্ভ থাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কার্লে গুহা-সমূহের বৃহত্তম গুহাটির সম্মুখে একটি স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভ-টির শীর্ষদেশে সিংহ চতুষ্টয় নির্ম্মিত দেখা যায়। একটি ধাতুপ্রস্তত চক্রও শীর্ষে স্থাপিত রহিয়াছে। কার্লে গুহার পুরোভাগে আরও একটি স্তম্ভ হয় তো ছিল, কিন্তু পরে উহা বিনষ্ট বা স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। কার্নহেরি গুহার সম্মুখে দুইটি স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। কার্নহেরি গুহাকে প্রাচীন-তর কার্লে গুহার অনুকরণ বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত-গণ মনে করেন। এরাণ নামক স্থানের স্তম্ভ এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভ বৌদ্ধ স্তম্ভসমূহের সদৃশ হইলেও উহারা গুপ্ত যুগের বা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের এবং

চৈত্যের অবশেষ, সাঁচি।

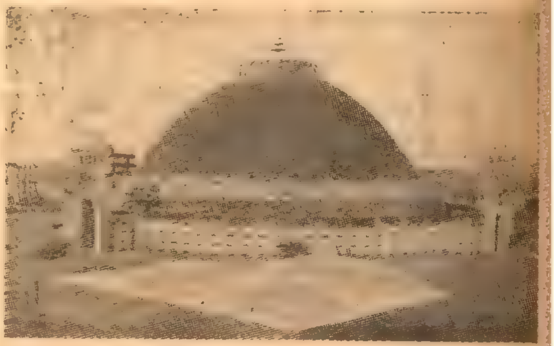

বৃহত্তম স্তূপ, সাঁচি।

রূপ সংখ্যক স্তম্ভ বিদ্যমান রহিবার নিদর্শন পাইয়া থাকি। শেষোক্ত স্থানটিতে রেল বা বেষ্টনীর অভ্যন্তরভাগে এবং দুইটিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়া বৈষ্ণব মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহারা ভারতবর্ষের

প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিবৃত্তের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য।

পরে স্থানান্তরিত এবং অন্যরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার জন্য কতকগুলি বৌদ্ধ স্তম্ভকে চিনিবার উপায় নাই। এখনও অনুসন্ধানের ফলে বহু বৌদ্ধ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ফার্গুসনের মতে, সুপ্রাচীন কোন স্মৃতিস্তম্ভ ভারতবর্ষে আজিও পাওয়া যায় নাই। ফার্গুসনের সময়ে বহু স্তম্ভ অনাবিষ্কৃত ছিল এবং বৌদ্ধস্তম্ভ-তত্ত্ব তাঁহার সময়ে সেরূপ বিস্তৃত ভাবে জানা যায় নাই। কাবুলের নিকটে সুর্কমিনার ও মিনার চকরি নামক দুইটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। এই দুইটিকে সেকেন্দার শাহের স্মৃতিস্তম্ভ বলিয়া লোকে মনে করিলেও ইহা যে বৌদ্ধ স্তম্ভ, সে বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। কেন এই বৌদ্ধ স্তম্ভদ্বয় এখানে স্থাপিত হয়, তাহা বলা কঠিন। ইহাদের বয়স নির্দ্ধারণও সহজ নহে, তবে ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ যাহাদিগকে "ভিলসা স্তূপাবলী" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সংখ্যাধিক। ভূপাল রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত ভিলসা নামক স্থানের নাম হইতে স্তূপাবলীর নামকরণ করা হইয়াছে। এই স্তূপ-ক্ষেত্রটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ১০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ৬ মাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। এই প্রসিদ্ধ স্তূপ-শ্রেণীর মধ্যে সাঁচির স্তূপগুলিই প্রসিদ্ধতম এবং গুরুত্বেও সর্ব্বপ্রধান। এই শ্রেণীর ইমারতের মধ্যে সাঁচির স্তূপ-গুলিকে অদ্বিতীয় বলিয়াও অভিহিত করা যায়। সিংহলের মহাবংশ নামক ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, সম্রাট অশোক পিতার শাসনসময়ে প্রাদেশিক শাসক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকার কালে, উজ্জয়িনী যাইবার পথে চেড়াগিরি বা ওয়েজানগর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। ওয়েজানগর বর্ত্তমান বেজানগর ছাড়া অন্য কিছু নহে। পরে ভারতবর্ষের নানাস্থানে স্তূপ স্থাপন করার সময় এই স্থানেও তিনি কতিপয় স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বেজানগরের নিকটেই সাঁচি।

অশোক কর্ত্তৃক (৮৪০০০) চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মহাবংশে কথিত আছে। এই সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত হইলেও বহু সংখ্যক স্তূপ এই ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট নির্ম্মাণ করান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহের দাহকার্য্য সম্পাদিত হইবার পর তাঁহার দেহাবশেষ ভারতবর্ষের আটটি সহরে প্রোথিত করা হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সাঁচি এই অষ্ট নগরের অন্যতম কি না সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। তবে খননের ফলে বুদ্ধদেবের কোন দেহাবশেষ সাঁচি স্তূপসমূহের অভ্যন্তরে বা নিম্নে পাওয়া যায় নাই। স্তম্ভে বা বৃহত্তম স্তূপটিতে কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। ২ নম্বর স্তূপটির ভিতর অশোকের শাসন সময়ের কতিপয় বৌদ্ধ প্রচারকের দেহাস্থি পাওয়া গিয়াছে। ৩ নম্বর স্তূপটিতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই আজ শুধু সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া নয়, সমগ্র প্রাচী ব্যাপিয়া প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয় বলিয়া খ্যাত সারিপুত্র ও মোগ্‌গলায়নের অস্থি এই তৃতীয় স্তূপটির অভ্যন্তরেই পাওয়া গিয়াছিল। পরে অস্থিগুলি ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয় এবং লণ্ডনে দুইটি যাদুঘরে কিছুকাল অবস্থিত রহিবার পর সিংহলী বৌদ্ধদিগকে প্রদান করা হয়। সম্প্রতি সিংহল হইতে এই সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ-দ্বয়ের অস্থি ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে। অস্থিগুলি পুনরায় সাঁচিতেই রাখা হইবে। অশোক এই অস্থিগুলি সাঁচিতে আনিয়া তাঁহার স্থাপিত স্তূপের ভিতর রক্ষা করেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সাঁচির বৃহত্তম স্তূপটির গম্বুজাকৃতি প্রধান অঙ্গের ব্যাস প্রায় ১০৬ ফিট এবং উচ্চতা ৪২ ফিটের কম নহে। স্তূপের ভিত্তি বা পাদপীঠ ১৪ ফিট উচ্চ এবং উহার ব্যাস প্রায় ১২১ ফিট। এই গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত প্রকাণ্ড স্তূপের কেন্দ্রদেশ বা মধ্যস্থল সম্পূর্ণ নিরেট। ইহা ইষ্টকে প্রস্তুত। ইষ্টকগুলি কর্দ্দমের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। অভ্যন্তরভাগ এইরূপ হইলেও ঊর্দ্ধদেশ প্রস্তরখণ্ডসমূহে মণ্ডিত বলিয়া কর্দ্দমপ্রলিপ্ত ইষ্টকের কথা আমাদের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক। শিলাখণ্ডসমূহের উপরে ৪ ইঞ্চি

ঘন সিমেন্টের আচ্ছাদন। স্তূপের মস্তকে ৩৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটি সমতল ক্ষেত্র বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই ক্ষেত্রটির চতুর্দ্দিকে প্রস্তর প্রস্তুত রেলিং বা পরিবেষ্টনী ছিল বলিয়া জানা যায়। শীর্ষের মধ্যস্থলে যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাকে ছত্র বলিলে ঠিকই বলা হয়। এই ছত্রাকার প্রত্যঙ্গের চতুর্দ্দিকেও এক প্রকার সুদর্শন পরিবেষ্টনী নির্ম্মিত আছে। ১নং স্তূপটির এবং ২ ও ৩ নম্বরের স্তূপ-দ্বয়ের শিরোভূষণ একই প্রকার নহে। যে ৩নং স্তূপটির বক্ষে সারিপুত্র ও মোগ্গলায়নের পুণ্যাস্থি পাওয়া যায় উহার শীর্ষভূষা অবিকল ছত্রাকার। এই ছত্র যে স্তূপগুলির শুধু সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে তাহা নহে, উহাদিগকে এক প্রকার বিচিত্র মর্য্যাদা বা আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়াছে বলা যায়।

সাঁচির ছয়টি বা সাতটি স্তূপ ছাড়া ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সোণারী নামক স্থানেও এইজাতীয় কতিপয় ইমারত বা স্থাপত্যকীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের দুইটির গুরুত্ব অত্যধিক। চতুষ্ক অঙ্গনের দ্বারা বেষ্টিত এই স্তূপদ্বয়ের অভ্যন্তরে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু বৌদ্ধ সাধুর পুণ্যাস্থি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরও ৩ মাইল অগ্রসর হইলে শতধারা নামক স্থানে ১০১ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার ভিতর কিছুই পাওয়া যায় নাই। সাঁচির ৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ভোজপুর নামক স্থানে বহু বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট পাদ-পীঠের উপর প্রায় ৩৭টি স্তূপ এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। কতকগুলিতে খ্যাতনামা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দেহাবশেষ থাকার জন্য তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোজপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে আন্ধের নামক স্থানে তিনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় কিন্তু গুরুত্ববিশিষ্ট স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূপালের অন্তর্গত ভিলসা বা সাঁচি অঞ্চলে সর্ব্বসমেত ৬০টি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপগুলি দেখিলে মনে হয়, কোনটি অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের নহে (খৃঃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০)। অবশ্য ইহাও সত্য যে এই অঞ্চলের কোন স্তূপই খৃষ্টপূর্ব্ব শেষ শতকের পরবর্ত্তী কালের নয়।

যাহাদিগকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বঙ্গীয় স্তূপাবলী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথের ধামেক স্তূপ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সংরক্ষিতও বটে। প্রসিদ্ধনামা প্রত্নতাত্ত্বিক জেনারাল কানিংহামের দ্বারা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই স্তূপ

তোরণ, সাঁচি

আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কোন পুণ্যাস্থি পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে বুদ্ধদেবের পুণ্য স্মৃতি বহন করিতেছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহা সর্ব্বজনসুবিদিত যে, সার-নাথেই বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তিনি দীর্ঘকাল এই মৃগদাব নামক স্থানে অবস্থান করেন। পরবর্ত্তী অনু-সন্ধানের ফলে নিঃসংশয়িতরূপে স্থির হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব গয়ায় বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর ৫জন শিষ্যসহ মৃগদাবে আসিয়া যে স্থানে তাঁহার মতবাদ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন, সেখানেই ধামেক স্তূপ রচনা করা হইয়াছে। এই স্তূপের পাদপীঠাদির ব্যাস ৮৩ ফিট। ইহা প্রস্তরে প্রস্তুত এবং অত্যন্ত নিরেট। স্তূপটি ভিত্তি হইতে ৪৩ ফিট উচ্চতা পর্য্যন্ত লৌহের দ্বারা পরস্পর সন্নিবিষ্ট শিলা-খণ্ডসমূহের দ্বারা প্রস্তুত; উহার ঊর্দ্ধাংশ ইষ্টকে নির্ম্মিত।

স্তূপটির নিম্নাংশে আমরা আটটি মুখ দেখিতে পাই। প্রত্যেক মুখে একটি করিয়া কুলুঙ্গি রহিয়াছে। এই কুলুঙ্গিগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি (উপবিষ্ট আকারে) স্থাপিত থাকিবার জন্য নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা হয়। কুলুঙ্গিগুলির নীচে যে ভাস্কর্য্য সৃষ্টিগুলি দৃষ্ট হয়, তাহাদের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রচেষ্টার ফলে সারনাথে যে সকল স্থাপত্য কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম, উহারা সম্রাট অশোকের সময়ের এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী,তাহাও খৃষ্টীয় একাদশ শতকের।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি অশোক-পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্থাপত্যকীর্ত্তি ভারতবর্ষে নাই। অশোকপূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তর-প্রস্তুত স্থাপত্য কীর্ত্তি একটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহা রাজগৃহে অবস্থিত এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা 'জরাসন্ধকা বৈঠক' আখ্যায় অভিহিত। এই অতি প্রাচীন ইমারতটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরে প্রস্তুত। চুণ, সুড়কি বা অন্য কোনরূপ মশলা ইহা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় নাই। এই কীর্ত্তিটির ৬ মাইল পূর্ব্বে আর একটি প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তূপাকার ইমারতটিও 'জরাসন্ধকা বৈঠক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সুন্দর ও বুরুজাকৃতি স্তূপটিকে কানিংহাম সারনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার মতে ইহা ৫০০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত। বঙ্গীয় স্তূপাবলীর মধ্যে যাহা তৃতীয় আখ্যায় অভিহিত,তাহা বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের পুরোভাগে বিরাজিত। ইহাকে স্তূপ না বলিয়া চৈত্য বলিলেই ভাল হয়। এইস্থানে বুদ্ধদেব খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৫ অব্দে, ৩৫ বৎসর বয়সে সম্বোধি লাভ করেন।

প্রসিদ্ধনামা চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সিয়াং এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার রচনাবলীতে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্রাট অশোক সর্ব্বপ্রথমে একটি ক্ষুদ্র বিহার এই পুণ্য স্থলে প্রস্তুত করান। পরে ঐ বিহারের স্থানে একটি মন্দির রচিত হয়। কানিংহাম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, এই বৌদ্ধ মন্দির কুশান সম্রাট হবিষ্কের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল (খৃষ্টপূর্ব্ব শেষ শতকে)। এই মন্দিরগাত্রে বহু প্রকার লিপি রহিয়াছে। কতকগুলি লিপি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে সপ্তম শতকের, কতকগুলি নবম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত সময়ের। মন্দিরগাত্রে আরাকানী ভাষায় লিখিত লিপি হইতে যাহা জানা যায়, তাহাতে এই মন্দির ক্রমশঃ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়ে এবং ১১০৫ খৃষ্টাব্দে ও ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কার সাধিত হয় বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কর্ণেল এইচ বার্ণে আরাকানী লিপির অনুবাদ প্রকাশ করেন। হিউয়েন সিয়াং মন্দিরের কুলুঙ্গিগুলিতে স্বর্ণনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহ স্থাপিত থাকার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ কোন মূর্ত্তি এখন দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে যে মূর্ত্তিগুলি আমরা দেখি তাহারা ব্রহ্মদেশীয় প্রভাবের পরিচায়ক। আরাকানী লিপি হইতেও এই প্রভাবের পরিচয় আমরা পাই। হিউয়েন সিয়াং যে সকল 'আমলক' বা তাম্র লিখিত সোণালি শীর্ষের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কোন চিহ্ন বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই না। ইহাতে মনে হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি পরে পুনর্নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

অন্ধ্র দেশে বা দ্রাবিড়ের কোন কোন অংশে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদীর উপত্যকায় এককালে বৌদ্ধ প্রভাব প্রসারিত থাকার বহু প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। স্তূপকে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ডিব্বা আখ্যায় অভিহিত করে। একমাত্র কৃষ্ণা জিলাতেই প্রায় ৩ শত ডিব্বা আমরা দেখিতে পাই। এই সকল স্থাপত্য কীর্ত্তির অধিকাংশই প্রাচীন নগরাদির ধ্বংসাবশেষের বক্ষে বা নিকটে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের অনেকগুলিকেই বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরে ইহার ইষ্টক এবং মর্ম্মর প্রস্তরের আকর রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে অনুসন্ধান প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৃহত্তম এবং অপর কতকগুলি স্তূপে পুণ্যাস্থি রক্ষিত ছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই। শুধু দেশীয় নরনারী নহে, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের লোকরাও এই সকল প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য-কীর্ত্তির বিকৃতির জন্য কম দায়ী নহে।

আমরা কাবুলের দুইটি বৌদ্ধ স্তূপের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গান্ধার স্তূপাবলীর মধ্যে পাঞ্জাবের মানিকালা নামক স্থানের স্তূপ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। রাওয়ালপিণ্ডির ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ইহা বিরাজিত। গান্ধারস্তূপের

STUDENTS' P.G.A. COMMON-ROOM

বৈশিষ্ট্য ইহাদের চতুর্দ্দিকে রেল বা পরিবেষ্টনীর অভাব। এই অভাব এক প্রকার কারুকার্য্য মণ্ডিত পিলাণ্ডারের দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সোয়াত উপত্যকায় বহু বৌদ্ধ স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের অন্যান্য অংশের স্তূপ হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। ইহার প্রশস্ততা তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বা লম্বা। ইহাদের আকার গুম্বজাকৃতি না হইয়া বুরুজাকৃতি। অন্যান্য অংশের স্তূপ অপেক্ষা আকারে ইহা ক্ষুদ্রতর বটে।

বৌদ্ধ রেল বা পরিবেষ্টনীগুলির মধ্যে বুদ্ধগয়া ও ভারাওটের রেলই সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রথমটি অশোকের সময়ের বলিয়া এবং দ্বিতীয়টিকে সুঙ্গ বংশীয়দের শাসনকালের বলিয়া মনে করা হয়। সুঙ্গগণ খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে রাজত্ব করেন। বুদ্ধগয়ার পরিবেষ্টনীকে সম দ্বিভুজাকৃতি এবং আবিষ্কৃত করার কালে বিশেষ বিকৃত অবস্থাপন্ন ছিল বলা চলে। অবশ্য পরে সংস্কৃত হইয়াছে। পরিবেষ্টনীর স্তম্ভগুলি অর্দ্ধচক্রাকার ভাস্কর্য্য অলঙ্কারের দ্বারা মণ্ডিত; এবং ঐ অর্দ্ধচক্রগুলির গাত্রে মনুষ্যমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। কোথাও একটি মানুষ, কোথাও বা অনেকগুলি মানুষ বিদ্যমান রহিয়াছে। স্তম্ভগুলিতে নানাপ্রকার পশুমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়াও প্রাচীন শিল্পিগণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পরিবেষ্টনীর দুইটি স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী অংশগুলিতে চক্রাকার পদ্ম পুষ্প রচনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানাপ্রকার প্রতীক চিহ্ন ছাড়া পার্থিব ব্যাপার সমূহের চিত্রও শিল্পীরা রচনা করিয়াছেন। কোথাও তরুণ তরুণী পরস্পর প্রণয় নিবেদন করিতেছে। কোথাও বা পানপাত্রে পানকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। বুদ্ধদেবের বা বোধিসত্ত্বগণের ব্যক্তিগত জীবনের কোন চিত্র বুদ্ধগয়ার রেলের বক্ষে আমরা দেখিতে পাই না। এইরূপ চিত্র সাঁচির আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন তোরণগাত্রেই আমরা সর্ব্বাধিক দেখিতে পাই।

ভারহুটের পরিবেষ্টনী অধিকতর চিত্তাকর্ষক। বেষ্টনীর উর্দ্ধাংশের অভ্যন্তরভাগ নিরবচ্ছিন্ন ভাস্কর্য্য চিত্রের দ্বারা ভূষিত। এই সকল উৎকীর্ণ আলেখ্য তদানীন্তন নানাপ্রকার ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। তৎকালের প্রসিদ্ধ নামা বৌদ্ধ সাধু ও প্রচারকদের নামও ঐ সকল চিত্র হইতে জানা যায়। সুতরাং বৌদ্ধযুগের ইতিহাস যাঁহারা পূর্ণরূপে জানিতে চান, ভারহুটের পরিবেষ্টনীগাত্রে খোদিত আলেখ্যগুলি তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু ঐতিহাসিক কাহিনী নহে, বৌদ্ধ পৌরাণিকী কথাও ভারহুটের পরিবেষ্টনীর গায়ে খোদিত রহিয়াছে। ভারহুটের রেল এবং তোরণে যে স্থাপত্য প্রণালী আমরা প্রকটিত দেখি, তাহাতে আমাদের এ বিষয়ে সংশয় থাকে না যে কাষ্ঠরচিত গৃহাদির আদর্শে বা অনুকরণে ইষ্টক ও প্রস্তরে প্রস্তুত ইমারত পরে গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এই অনুকরণের বার্ত্তা সাঁচি অপেক্ষা ভারহুটই অধিকতর ব্যক্ত করে বলিলে ভুল হয় না। সাঁচির স্তূপ ও তোরণ যতই চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ হউক, বুদ্ধগয়া ও ভারহুটের রেল ভারতবর্ষের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। তবে এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সাঁচির তোরণ সৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্যে সমগ্র ভারতবর্ষে অতুলনীয়। সাঁচির তোরণ দেখিবামাত্রই মনে হয়—কাষ্ঠের প্রস্তুত অপরূপ শিল্প সৃষ্টির অনুকরণে ইহারা প্রস্তুত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বুদ্ধজীবন-সংক্রান্ত চিত্রাবলীর বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্য্যেও সাঁচির তোরণ

বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ, সাঁচি

অনুপম আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে। কাষ্ঠ প্রস্তুত এইরূপ তোরণ আমরা চীনে ও জাপানে প্রচুর দেখিতে পাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় প্যালেষ্টাইনের প্রধান নগর জেরুজালেমের বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরের সম্মুখে এই

ধরণের তোরণ রচিত রহিয়াছে। সেই তোরণের গাত্রকে পবিত্র স্বর্ণ দ্রাক্ষা জড়াইয়া র'হিয়া উহার চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

শিল্প-দক্ষতার দিক দিয়া অমরাবতীর রেলকে অন্যান্য সকল স্থানের রেল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব'লিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। ভারতীয় শিল্পের সহিত একত্রীয় গ্রাক শিল্পের সংমিশ্রণ এই রেলের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চক্ষে অমরাবতীর রেলের গুরুত্ব যতখানি আমাদের দৃষ্টিতে, ততখানি নহে বলিলে ভুল বলা হয় না।

বৌদ্ধ চৈত্যজাতীয় স্থাপত্য কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে মুসলমানদের দ্বারা অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি এখনও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা সাঁচিতে একটি চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই। অংশতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও আমরা এই চৈত্যের বৃহত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। এই চৈত্য এথেন্সের মিনার্ভা মন্দিরের কথা আমাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত করে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নলদুর্গ জিলার 'তের' নামক স্থানে একটি চৈত্য আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা বর্ত্তমানে বিষ্ণু মন্দিরে পরিণত। মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণা জিলার 'চেরজালা' নামক স্থানেও একটি চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শিব মন্দিরে পরিণত হওয়ার ফলে সংরক্ষিত হইতেছে বলা যায়। তের এবং চেরজালা উভয় স্থানের চৈত্যই ইষ্টকে প্রস্তুত।

বিহার শ্রেণীর স্থাপত্য কীর্ত্তির মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিহারের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পাহাড় কাটিয়া যে সকল গুহাকায় চৈত্য ও বিহার প্রস্তুত হইয়াছে, ভারতবর্ষের চৈত্য ও বিহার সমূহের মধ্যে তাহাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করা যায়। ভারতবর্ষে এরূপ অসংখ্য গুহাগৃহ রহিয়াছে যাহারা বৌদ্ধ যুগে চৈত্য ও বিহাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের ভিতর এইরূপ গুহার প্রায় দশ ভাগের নয় ভাগ দেখা যায়। বিহার প্রদেশে ও উড়িষ্যায়, ধামার, কোলভি, বেজানগর ও বাঘে (রাজপুতানা), মামল্লপুরম্, বেজওয়াদা ও গুণ্টার-পিল্লে নামক স্থানে (মাদ্রাজ) আমরা এই শ্রেণীর গুহা দেখিতে পাই। পাঞ্জাবে ও আফগানিস্থানেও অল্পসংখ্যক গুহা রহিয়াছে।

প্রাচীনতম চৈত্যগুহা পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর বক্ষে বিরাজিত ভাজা নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা তোর ঘাটস্থ কার্লে গুহা হইতে ৪ মাইল দূরে। এই সকল গুহা গৃহের অভ্যন্তরে আমরা কাষ্ঠের উপর প্রকটিত বহু কারুকার্য্যের নিদর্শন দেখিতে পাই। যাহাতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের প্রয়োজন তাহা এবং গঠনমূলক কতকগুলি কার্য্য ছাড়া অবশিষ্ট সবই কাষ্ঠের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারুকার্য্য কমনীয় কাষ্ঠগুলি বা কাঠের কাজ কালের কঠোর আঘাতে বিনষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; তবে কোন কোন গুহায় কাঠের কাজ এখনও দেখা যায়। ভাজার গুহাগৃহে তেমন কোন ভাস্কর্য্য ঐশ্বর্য্য আমরা দেখিতে পাই না। সামান্য যাহা আছে, তাহা গুহা মুখে বা গুহার সম্মুখ ভাগেই দৃষ্ট হয়, অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য কোন ভাস্কর্য্যই নাই। ভাজা গুহাবলীর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র বিহার-গুহা আমরা দেখিতে পাই। এইটিই পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত গুহাকার বিহার সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গুহাটি উত্তর মুখ এবং ইহাতে বারান্দা, হল এবং ভিক্ষুগণের থাকিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। সাতটি কক্ষেই ভিক্ষুদের শয়নের জন্য প্রস্তরে প্রস্তুত শয্যা দৃষ্ট হয়। কার্লে গুহাবলী হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর বক্ষে কোণ্ডেন চৈত্য ও বিহার বিরাজিত। ভাজাস্থ চৈত্যের সম্মুখ ভাগের সহিত কোণ্ডেন চৈত্যের সম্মুখ ভাগের সাদৃশ্য উল্লেখনীয়। কাঠের কাজের আদর্শে উভয়েই প্রস্তুত, ইহা পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়। আকার বা আয়তনে উভয় চৈত্যই প্রায় সমান। উভয় চৈত্যকে প্রায় সমসাময়িক বলিয়া অনুমিত হয় এবং প্রাচীনতর চৈত্যাবলীর উৎকৃষ্ট নমুনা বলিয়া ইহাদিগকে অভিহিত করা যায়।

কার্লে হইতে ১০ বা ১১ মাইল দক্ষিণে বেদসা নামক স্থানে যে গুহাবলী দেখা যায় তাহারা উন্নতির পথে কিঞ্চিৎ অগ্রগতির বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। কার্লে গুহা অত্যন্ত মনোরম এবং প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্করগণের বিশেষ দক্ষতার কথা আমাদিগকে জানায়। ভারতবর্ষের ভিতর যত চৈত্য গুহা আছে, তাহাদের মধ্যে ইহাই বৃহত্তম, সন্দেহ নাই। বোম্বাই ও পুনার মধ্যবর্ত্তী রেলপথে কার্লে বিরাজিত। প্রাচীনকালের স্থাপত্য কৃষ্টিগুলির ত্রুটিগুলি ইহাতে লক্ষিত হয় না। সুতরাং স্থাপত্য ও

ভাস্কর্য্যশিল্পে ভারতবর্ষ যখন বিশেষ উন্নত বা অগ্রগামী তখনকার সৃষ্টি এই গুহাগৃহ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও কার্লের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রণালীকে বিশুদ্ধতম বলিয়া অভিহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্ক্রিন বা যবনিকায় যে ভাস্কর্য্য ঐশ্বর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বিশেষ মনোমুগ্ধকর। স্তম্ভগুলির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই গুহাগৃহের গাত্রে বহুসংখ্যক লিপি উৎকীর্ণ থাকিলেও বয়স নির্দ্ধারণে তাহারা বিশেষ কোন সাহায্য করে না। প্রস্তুত প্রণালী দেখিয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন, ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব শেষতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কার্লে গুহার অভ্যন্তরভাগ দেখিলে ইউরোপের গুরুগম্ভার প্রাচীন গীর্জ্জাগৃহগুলি মনে পড়িতে পারে।

অজন্তা গুহাবলীর ভিতর চারিটি চৈত্য গুহা রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই চিত্তাকর্ষক। এই স্থানের প্রাচীনতর গুহাগুলি ভাজা ও কোণ্ডেলের ন্যায় কাঠের কাজ হইতে আদর্শ গৃহীত হইবার বার্ত্তা বিঘোষিত করে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ গুহাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রায় প্রত্যেক গুহাতেই বুদ্ধমূর্ত্তি নানাভাবে ও ভঙ্গীতে নির্ম্মিত থাকা। অজন্তার চৈত্য গুহাবলী ছাড়া আর যে সকল গুহা রহিয়াছে প্রায় সবগুলিই বিহার রূপে ব্যবহৃত হইত। এই বিহার গুহাগুলির সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য প্রাচীর চিত্রাবলী। বিশেষ করিয়া অজন্তার দুইটি প্রাচীর চিত্র মণ্ডিত বিহার গুহাকে সমগ্র ভারত-বর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বিহার বলিয়া অভিহিত করিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। এই দুইটি ছাড়া অজন্তার একটি বিংশ স্তম্ভশালী গুহা রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দিকে পরিমাপ ৬৫ ফিট। ইহাতে ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য ১৬টি কক্ষ এবং বৃহৎ বুদ্ধবিগ্রহ বিশিষ্ট একটি মন্দির বিদ্যমান। বুদ্ধমূর্ত্তির পদদ্বয় নিম্নে রহিয়াছে, গুহার প্রাচীরগুলি প্রাচীর-চিত্রে আচ্ছাদিত। চিত্রের বিষয় বুদ্ধদেবের জীবনী। স্তম্ভ এবং ছাদ নিম্ন ও ভাস্কর্য্য কারুকার্য্যে মণ্ডিত।

অজন্তা হইতে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে বাঘ গুহাবলী। এই স্থানে স্মরণীয় যে, বাঘ নামক দুইটি স্থান আছে। একটি দাক্ষিণাত্যে, একটি রাজ-পুতানায়। দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত বাঘের গুহাগুলির সমস্তই বিহার। চৈত্যগুহা এখানে নাই। সর্ব্বসমেত ৯টি গুহা বাঘে বিদ্যমান। বৃহত্তরগুহার প্রত্যেকটির সহিত একটি করিয়া শিক্ষা গৃহ বা বিদ্যালয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মন্দিরগুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দাগাবা নামক বৌদ্ধ প্রতীক স্থাপিত আছে। বাঘের গুহাগাত্রে যে প্রাচীর চিত্রাবলী রচিত রহিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য প্রায়ই অজন্তার অনুরূপ।

ভাজার চৈত্য গুহা

নাসিকের ২৬টি গুহা আর একটি উল্লেখনীয় বৌদ্ধ স্থাপত্য কীর্ত্তি। এখানে গুহামুখে যে ভাস্কর্য্য কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা উৎকর্ষে কার্লের গুহায় প্রকটিত ভাস্কর্যকে অতিক্রম করিয়াছে বলা যায়। এই ২৬টি গুহার মধ্যে ১টি গুহা চৈত্য জাতীয়। বহু প্রকার লিপি উৎকীর্ণ থাকার জন্য নাসিক গুহাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। এলোরার বিশ্বকর্ম্মা গুহা চৈত্য গুহার অতি সুন্দর নিদর্শন। ইহার বক্ষে পরবর্ত্তী মহাযান বৌদ্ধ শিল্পের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। উন্মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে, প্রশস্ত মঠের পার্শ্বে খননের ফলে এই গুহাটি বাহির হইয়াছে। পুরোভাগে বিস্তৃত অঙ্গন থাকার জন্য এই গুহার মুখ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা গুহার দক্ষিণে কতিপয় বিহার গুহা দেখা যায়। এলোরায় বিরাজিত এই সকল গুহা দেখিলে বুঝা যায় ইহারা সেই যুগে প্রস্তুত যখন এই জাতীয় স্থাপত্য কলার বা গুহা গৃহ নির্ম্মাণ শিল্পের পূর্ণ পরিণতির পর ক্রমশঃ অবনতি বা অপকর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এলোরার কৈলাস মন্দিরকে গুহা শিল্পের পরাকাষ্ঠা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্করগণ পাহাড় কাটিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলা যায়। এলোরার অজন্তা, বাঘ ও নাসিকের ন্যায় বিহার গুহা না থাকিলেও ইহাদের গুরুত্ব অতুলনীয়। এখানে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস হওয়া এবং হিন্দু প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই।

পরিক্রমা

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে, নিবিড় নিথর রাত্রি! স্তব্ধ বনভূমি হতে ভেসে আসে শুকনো পাতার দীর্ঘশ্বাস, রাত্রির আকাশে তারার বুকে জাগে শিহরণ! কর্ম্মক্লান্তির ঘন সুপ্তি নেমে এসেছে পাতায় পাতায়—নিথর ধরণীর বুকে—বনভূমির পত্রমর্ম্মরে—! বক্রেশ্বর তীর্থের নিবু নিবু চিতার আগুন লালাভ করে তোলে ধূমায়িত উচ্চ কুণ্ডের পরিচয়! আকাশ-বাতাস দিক-দিগন্তর নিস্তব্ধ, মুখ বুজে কোন মৌনী জটাজুটধারী শঙ্করের ধ্যানে মগ্ন! চিতাটা নিভে আসছে! মড়া পোড়ার তীব্র গন্ধ মিলিয়ে গেল বনের হাওয়ায়, শ্মশান-বন্ধুর দল চলে গেছে! সবাই নিদ্রামগ্ন, ঘুমোয় নি একজন— শঙ্কর বাবাজী!

সারা জেলা—আশপাশের ও অঞ্চলের যে কেউ এসেছে তীর্থে……বৈতরণীর উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করেছে—সেই দেখেছে বাবাজীকে! ও পারের নীরব বিষ-করমচা গাছ ঘেরা—বনতুলসীর বেড়া জন্মান একটা জায়গায় ধুনি জেলে বসে থাকে—বিভূতি ভূষিত অঙ্গ,—ত্রিশূলের প্রান্তে ঝিকমিক করে দিনের সূর্য্য! কতদিন হতে ও আছে কেউ জানে না—কেউ বলে একযুগ—কেউ বলে একশো বছর—প্রবীনরা বলে কলীর প্রারম্ভ হতেই ডেরা বেঁধেছে ওইখানে!

মহাদেবের আশ্রম!—আশেপাশে শিবলিঙ্গ—ছোট বড় মাঝারী! দূর বিস্তৃত লাল ডাঙার প্রান্তে…সাঁওতাল পরগণার কাল বন-সীমার ধারে কোন পৌরাণিক যুগের ইতিহাস বুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বক্রেশ্বরতীর্থ! বৃদ্ধ-বটের নীচে হুঙ্কাক করা কালাপাহাড়ের কীর্ত্তিময় কোন প্রস্তরদেবতা··দুধকুণ্ডের উপরে শেওলা ধরা…কোন বিস্তৃত যুগের শিল্পীর জন্ম জন্মের সাধনার প্রতীক হয়ে রয়েছে বক্রেশ্বরের মূল মন্দির গাত্র,—আশে পাশে চারিদিকে উষ্ণ প্রস্রবন,—ক্ষারলবণ,—গন্ধক…নানা কিছুর সন্ধান বলে দেবে এ যুগের বৈজ্ঞানিক,—একটু দূরেই বয়ে চলেছে বক্রেশ্বর নদী!…

শিবরাত্রির মেলা ভেঙ্গে চলেছে! দুবরাজপুরের দিকে রওনা হয়ে যাচ্ছে গরুর গাড়ীতে বাঁশ-টিন-চট-বাসনকোসন বোঝাই করে দোকান-পসারীরা, সার্কাস কোম্পানীর তাঁবু খোঁটা-জন্তু জানোয়ার—লোহার শিক—বার ইত্যাদি নিয়ে সারি বেঁধে চলেছে গাড়োয়ানের দল—অন্ত কোন দূরের মেলার উদ্দেশ্যে! সারা প্রান্তরটায় পড়ে থাকে গরুর গাড়ীর দাগ—খড় বিচোলীর আঁটি খোলা জঞ্জাল—এঁটো শালপাতা—মাঠের মাঝে পাথর খাড়া করে উনোনের কালির দাগ—আর ছাইগাদা! নিভে গেল আলো—রোশনাই-শতসহস্র অজানা পথিকের পদধ্বনি—মুখর কোলাহল স্তব্ধ হয়ে এল, প্রান্তর তীর্থ বক্রেশ্বর, শান্ত হল মন্দিরের দেবতা—সমাহিত হল বনভূমি—আকাশ-বাতাস,—ছোট দিগন্ত! হতাশ হল পাণ্ডার দল,—কে কত কামাল বৎসরান্তে তারই হিসাব নিয়ে গোল বাঁধে।

শঙ্কর বাবাজীর কোন জ্রক্ষেপই নাই! তিনিও যেন শান্তি পেলেন! প্রভাত-রবির পূর্ব্বাভাষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই স্নান সেরে জপে বসেন! দিনের সূর্য্য মধ্যাকাশে উঠে যায়,—বৈতরনীর উষ্ণ প্রস্রবনে ধোঁয়ার মাঝে চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে ওঠে রোদের শিখা,—শঙ্কর বাবাজীর তখনও হুঁস নেই! অতভ্রমনের পরতে কোন দূর সীমাহীন জগতের স্বপ্নরেখা!

'বাবাজী! বাবাজী!'

কার ডাকে চোখ মেলে চাইল শঙ্কর বাবাজী!… সামনে কয়েকজন লোক ভিড় করে রয়েছে…অদূরে নামান একটা মৃতদেহ।—

শবদাহ করবার আগে শঙ্কর বাবাজীর পাদোদক নাকি নিয়ে আসে সকলেই, কোন কারণ তার নেই—তবু এটা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে! নিঃশব্দে উঠে আসে সন্ন্যাসী! ঘন জটাজালসমাকীর্ণ রক্তবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী সৌম্য নয়নে চেয়ে থাকেন শ্মশানবন্ধুদের দিকে! তার চোখের দ্যুতিতেই সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পায় মৃতের পরিজনবর্গ।—

দেহ চিতায় তোলা হয়! বৈতরণীর তীরে লেলিহান চিতার আগুনে নিঃশেষ হয়ে গেল নশ্বর দেহখানা!

দিনের সূর্য্য ঢলে পড়েছে দূরের শালবনসীমার ওপারে। প্রান্তর-তীর্থে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে!

নীরব হয়ে আসে আকাশ-বাতাস, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায়। জনহীন হয়ে যায় সারা প্রান্তর—প্রস্রবণের অস্পষ্ট শব্দ মৌনী আকাশতল ভরিয়ে তোলে, নীরবে বসে থাকে সন্ন্যাসী! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যেন সে!

দীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর প্রতিদিন-প্রতিক্ষণে দেখে আসছে মানুষের এই মৃত্যুর পরিহাস! কে না গিয়ে পারে—প্রত্যেক শবই দাহ হয়ে যায়—গন্ধকমাখা জলধারায় নিশিক্ত হয়ে যায় প্রতিদিনের প্রতিটি চিতা,—বৈতরণীর কুণ্ডে ভস্মের রাশি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে!

অনুভব করে তারও মৃত্যুর ইঙ্গিত! প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার যে আত্মার ক্ষয় হয়ে চলেছে, একদিন আসবে যেদিন তার সমস্ত কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে! ঘনিয়ে আসবে মৃত্যুর কালিমা—! ঘটবে আত্মার অপমৃত্যু!...মৃত্যুকে তার ভয় কেন—? হাসি পায়, হ্যাঁ,—হাসতে থাকে সন্ন্যাসী মহানন্দে বিদ্রূপের হাসি!

আকাশকোল যেন শুভ্র নীলাভ আলোয় ভরে গেছে!

এ কোন দেশের আকাশ! বায়ুস্তর হালকা···নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়,—চারিদিকে জ্যোতিরেখার আনাগোনা—ঘুমের মত সারা শরীরে কেমন যেন একটা সুষুপ্তি! একটা প্রবল জ্যোতির আগমনে চোখের সামনে যেন বিরাট এক শূন্যলোকের সৃষ্টি হয়! কার কণ্ঠস্বর শুনেই বিস্মিত হয়ে যায় সন্ন্যাসী,—নীলাভ আকাশকোলে ক্রমশঃ দেখা যায় একটা নারীমূর্ত্তি।

আমি আত্মহত্যা করি নি! ওরা আমাকে দাহ করে গেল—তুমিও দাঁড়িয়েছিলে—কিন্তু বুঝতে পারনি—ওরা আমাকে নিশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলেছিল!

মনে পড়ে সন্ন্যাসীর, এইত কিছুদিন আগে·· এমনি একটি মেয়েকে কারা দাহ করে গেল, ছেলেটার কি কান্না,—বোধ হয় বেচারারই স্ত্রী হবে,···লালপাড় শাড়ী,—সিমন্তে সিন্দুর—

—সতীন এসেছিল!

মর্ম্মন্তুদ কাহিনী! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, সংসারের জ্বালা বোঝে না! ঘরের মায়াও নেই,—তবু কোন হতভাগিনী নারীর করুণ কাহিনীতে তার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে!

—'আমার ছেলে একটি আছে, তাকেও বোধহয় মেরে ফেলবে ওরা! বাঁচতে তাকেও দেবে না!···

—"আমি কি করতে পারি মা, আমি ত সন্ন্যাসী!"

"সন্ন্যাসীর কি করবার কিছুই নাই!"

মেয়েটির চোখে জল! নীরবে যেন মিলিয়ে গেল আকাশ-সীমায়! রাত্রির নিস্তব্ধতা আবার ঘনিয়ে আসে! বনের হাওয়া তপ্তকুণ্ডের পার্শ্বে উচ্চতর হয়ে গন্ধকের গন্ধ বয়ে নিয়ে যায় দূরে বনসীমাপারে লোকালয়ের দিকে!

"সন্ন্যাসী ঠাকুর!"

সামনেই গলিত পঙ্গু এক বৃদ্ধের মূর্ত্তি!

বিস্মিত হয়ে যায় সন্ন্যাসী এদের মায়া দেখে! মৃত্যুর আগে তার নবপরিণীতা স্ত্রীর জন্যে চিন্তায় সে নাকি অস্থির!

"বুড়ো বয়সে সেই স্ত্রীই একমাত্র আমার জন্য চোখের জল ফেলে, ছেলেরা-বৌ সব আমার পর হয়ে গেছে ঠাকুর!"

'চিরকাল কি বেঁচে থাকবে তুমি?'

হাসে বুড়ো—মলিন বিবর্ণ কপিশ আঁখিতারায় মৃতের ও পৃথিবীর উপর মায়া, মায়া তার আত্মীয়দের উপর! বিস্মিত হয়ে যায় সন্ন্যাসী।

সারারাত্রি তার পার হয়ে যায়—ভোরের দিকে বনের আগে লালাভা ফুটে ওঠে, সন্ন্যাসী উঠে পড়ে, স্নান করবার সময় হয়ে গেছে, সারা মনে একটা বিক্ষোভ—সাধনার ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য দেহধারী মানব···দেহহীন আত্মা কারুরই চেষ্টার বিরাম নাই!

নীরব হয়ে আসে সমস্ত মন্দিরগুলো।—

এখনও হয়ত কেউ ওঠেনি। সন্ন্যাসীর প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়ে যায়! তপে বসতে যাবে—আসনশুদ্ধি হয়ে গেছে।

হঠাৎ পিছন হতে কার পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে চাইল।

'বাবাজী!'

মুখ ফিরিয়ে নেয় বাবা সন্ন্যাসী। ওরা সিদ্ধির পথে বাধা জন্মাতে যেন বদ্ধপরিকর হয়ে লেগেছে!

'বাবাজী—বাবাজী—একটি বার—'

'জপের সময় উঠবার উপায় নাই। কোন কথাই বলে না সন্ন্যাসী, নীরবে চোখ বুজে প্রাণায়াম সুরু করে। তন্ত্রচারী ঋষির ধ্যানভঙ্গ করতে সাহস হয় না, নীরবে ফিরে যায় তার!

ভোরের আলো ফুটে ওঠে, সারা বনানীর নূতন শাল-পাতায় ঝিকমিক করে সকালের মিষ্টি রোদ, শালফুলের গন্ধ...বাতাবী লেবুর মদির সুবাস মিশে গেছে পুণ্য ভূমিতে। তপ্তকুণ্ডের তীরে পাণ্ডাদের স্নান সুরু হয়েছে।

একি! সন্ন্যাসীর সারা মনে কেমন যেন একটা আলোড়ন, একটা বিশৃঙ্খলা বার বার বাধা দিচ্ছে। একাগ্রভাবে ভাববার কোন ক্ষমতাই তার নাই। প্রাণায়ামের মুদ্রা আসন সবকিছুই যেন ভুল হয়ে যায়। উঠে পড়ে সন্ন্যাসী! দূরে বৈতরণীর শ্মশানঘাটে চিতার ধুমশিখা প্রথম আলোতে জ্বলে উঠল। এগিয়ে আসে সেইদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত!

ফুলের মত সুন্দর একটি শিশু—নিষ্পাপ মলিন চেহারা, প্রাণহীন দেহটার দিকে এগিয়ে আসে সন্ন্যাসী! যেন খুব চেনা, কিন্তু তার চেনা আসলকে—! ত্রিসংসারে আপন বলতে তার কেউ নাই, তবু সারা মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। শিশুর মৃতদেহটার পানে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে থাকে। সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়।

চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সব কিছু!

ম্লান হয়ে আসে বিকালের রোদ. প্রান্তরের মাঝে ফালিপথের নিশানা দিয়ে গরুর গাড়ীর চাকার ধূলো সোনার হয়ে আকাশে মিলিয়ে যায়, বনভূমির মহুয়া বনে মাতাল ফুলের গন্ধ, তীব্র গন্ধকের রাজত্ব পার হয়ে কোন ফুলে ফলে ভরা বসন্তমাখা জগতের সংবাদ আনে। ঝিকিমিকি রোদ পাতায়—হলদে রোদ শয়ন বিছায় সেদিনের মত। আকাশে এল সন্ধ্যার তমসা।

অবাক হয়ে যায় সন্ন্যাসী, চারিদিকে বসন্তের সমারোহ, ওপারে বনসীমার শুলক্ষ পলাশ গাছ রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে গেছে; ফাগুনের মধুমাসে পথিকভ্রমরের কানাকানি, বক্রেশ্বর নদীজলে আকন্দ বনে মহুয়ার নিলাজ হাসির ঝঙ্কার, আকাশে বাতাসে মাখামাখি, বনে বনে বসন্তের নিশানা, তার আশ্রমের বুকে মঞ্জরীত গাছগুলো নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে আসছে, পলাশ গাছের ডালে একটা স্তবকও কালোকেশরের আড়ালে উঁকি মারেনি, গাঁদাগাছের বনে উই পোকার আনাগোনা. বনমালতীর কুঞ্জে হলদে হয়ে গেছে লতাগুলো।

নীরবে চেয়ে থাকে—! মাটির বুকে কোথায় কোন বিভ্রাট ঘটল—বুঝতেই পারেনা সন্ন্যাসী।

স্তব্ধ হয়ে এল দিনের কোলাহল, মন্দিরের শেষ শিখা নিভে গেল, টিকারা সানাইএর আলাপ থেমে গেল স্তব্ধ মিনারে, জেগে আছে কেবল প্রস্রবণের কলনাদ—আর ক্ষারগন্ধকের উগ্র গন্ধ।

"কে?"

চমকে যায় সন্ন্যাসী! আগেকার দেখা সেই মেয়েটি; চোখে তার জল।

আজ সকালেই তার ছেলের মৃতদেহ ওরা দাহ করে গেছে। কোন স্তরের বিঘূর্ণনে অস্থায়ী আত্মার স্রোত মিলিয়ে গেছে টের পায়নি।

'বলেছিলাম ওরা ওকে বাঁচতে দেবে না, দেয় নি, ওরাই ওকে মেরে ফেলেছে ঠাকুর।'

নীরবে বসে থাকে সন্ন্যাসী! জপ করাও হল না! কিই বা উত্তর দেবে বিদেহিনী নারীকে! আজ সকালেই যাকে দাহ করে গেল ওরা—ওরই সন্তান!

সারা মন বিষিয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর, পৃথিবীর এই কলুষতার মধ্যে থাকতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে! এত নীচ—এত পাপময় এই পৃথিবী, এর জন্য এত মায়া কেন মানুষের! এক মুহূর্ত্তও তার এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না!...

নীরবে বসে থাকে সন্ন্যাসী! মিলিয়ে গেছে বিদেহী আত্মা—কোন সুদূর তমিস্রায়।

এত ক্লেদ, এত কলঙ্ক নীচতায় ভরা পৃথিবী মানুষের; তবুও এ অহেতুক মায়া কেন! সারা পৃথিবীর উপর ঘৃণা ধরে গেছে তার—সব চেয়ে বড় কামনা হবে তার—এই বন্ধনমুক্তি!

চোখের সামনে জ্যোতিমাখা কোন দেশ, নীল অঞ্জন যেন সারা চোখে বুলিয়ে দেয় শান্তির প্রলেপ, লাল-হলদে···স্বচ্ছ সমস্ত গাছ-পাতা! কোন পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধতর স্তরের সান্নিধ্যে এসে গেছে সন্ন্যাসীর অচেতন মন! আরও—আরও ঊর্দ্ধে চলেছে কোন মহাজ্যোতির পানে!

কেমন যেন মহাবেগে সারা চোখের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়,—কোন মহাপুরুষ ধাবমান জ্যোতির বেগে এগিয়ে আসছেন—

প্রণাম করে দাঁড়ায় সন্ন্যাসী,—প্রভু, মুক্তি,—মুক্তি চাই পৃথিবী হতে! এ কলঙ্ক পাপময় মানুষের পৃথিবী হতে মুক্তি চাই!

হাসেন মহাপুরুষ,—"পৃথিবীকে ভাল বাসলে না মুক্তি চাও কি করে? মুক্তির সাধনা কর—তবে আশা করো মুক্তির!"

মহাজ্যোতি মণ্ডলে কেমন একটা আলোড়ন উঠেছে, তীব্রবেগে নীলাভ জ্যোতি-রেখাগুলো আসা যাওয়া করছে, প্রবল একটা আকর্ষণ সারা দেহ যেন টুকরো টুকরো করে দিতে চায়—সবেগে নীচের দিকে ছুঁড়ে যেন কে ফেলে দিল! কেমন সব অন্ধকার, সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসে!

চোখ মেলে সন্ন্যাসী, ক্লান্ত বিষণ্ণ—বিবর্ণ চোখে চাইতে থাকে চারিদিকে! নাঃ আশ্রমেই রয়েছে, রাত্রির দেখা ঘটনা কি দুঃস্বপ্ন, না সত্যি কোন মনের অতীন্দ্রিয় স্তরের পরিচয়! রাত্রি শেষ হয়ে আসে, প্রভাতের নিশানা ফুটে ওঠে বনের পুরোভাগে, সপ্তাশ্বের বিজয়রথ পৃথিবীর সিংহদ্বার পার হয়ে প্রবেশ করল মানুষের জগতে!

রাত্রি শেষ হয়ে গেছে! একরাত্রেই কেমন যেন বদলে গেছে সন্ন্যাসী! সারা দেহ মনে ক্লান্তির ছোঁয়া, অবসাদ-ভারাক্রান্ত মন যেন আজ বিদ্রোহী হয়ে যায়! বারই হয় না আশ্রম হতে! কারা এসে ফিরে গেল, ডাকতে সাহস পায় না সন্ন্যাসীকে!

সারা আশ্রমে একটা শ্রীহীনতা অনুভব করে সন্ন্যাসী! মুকুলিত মাধবীলতাকুঞ্জ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে! পলাশের ডালটায় একটা স্তবকও নাই! গন্ধক ক্ষারের তীব্র গন্ধ সারা আকাশ বিষাক্ত করে তুলেছে!

'বাবাজী! বাবা!'

"কেন! যাও—যাও—যাও এখান হতে!"

লোকটার সঙ্গে একটা পাংশু শিশু! হয় ত বা প্রণাম করতেই এসেছিল, সন্ন্যাসীর রুদ্র মূর্ত্তি দেখে ধীরে ধীরে ম্লানমুখে ফিরে যায় তারা; সন্ন্যাসী যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, দেহী বিদেহী আত্মার যুক্ত ষড়যন্ত্র হতে সে মুক্তি পেতে চায়! এ বন্ধন হতে, এই আকাশ—এই বনানী-ছায়া-ঘেরা বক্রেশ্বর তীর্থের পরিক্রমা এই ছোট্ট দিগন্ত হতে বৃহত্তর অচেনা জগতে চলে যেতে চায়! যেখানে কেউ তাকে চিনবে না—ডাকবে না! সাধনার পথ হতে বন্ধনের দিকে টেনে আনবে না!

একদিন—দু'দিন—তিন দিন তিন রাত্রি পার হয়ে গেল, প্রান্তর তীর্থের কেউ তাকে দেখে নি! ব্রহ্মমুহূর্ত্তে কুণ্ডের প্রথম স্নাতকদের দলেও নেই, বৈতরণী তীরে কোন সদ্যজ্বালা চিতার ধারে সৌম্য নয়নে চেয়ে থাকতে তাকে কেউ দেখে নি! আশ্রমটা নীরব নিস্তব্ধ, কাকে আসতে দেখে শিবাদল লেজ তুলে উঠে দাঁড়াল!

পথের দাগে জন্মেছে ঘাসের বন, আশ্রমের মুকুলিত গাছ লতাগুলো শুকিয়ে গেছে!

—"বাবাজী—বাবাজী! ঠাকুর—"

কোন সাড়া নেই, সকলেই শোনে খবরটা, শঙ্কর বাবাজী নেই—কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না! কুণ্ডের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত প্রথম স্নাতকের সামগীতিতে মুখর হয়ে উঠল না, পলাশের স্তবকে মহাদেবকে রাঙ্গিয়ে দেবার জন্যও নাই কেউ!

পালাম ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছে গাড়ীখানা, অচেনা অজানা যাত্রীর মাঝে শঙ্কর বাবাজী চলেছে অপরিচিতের মতই! শ্যামা ধরিত্রীর বালুবেলার প্রান্তে বাত্যান্দোলিত নারিকেল বনসীমার পারে—নীলা ঊর্ম্মি মেখলা জলরাশি, সমুদ্রের ঢেউএর মাঝে কালো পাহাড়ের স্তূপ উঠে রয়েছে, ভারতের শেষাগ্রভাগ!

ঢেউ-এর মাথায় মাথায় হাজারো মাণিকের মেখলা-পরা কোন মহান বিশ্বরূপ! বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাবাজী!

দ্বারকার তটপ্রান্তে শান্ত নিথর সমুদ্র! কত পায়ের

আনাগোনার দাগ বালিতে মুছে গেছে—আবার ফুটে উঠছে নোতুন পথিকের নোতুন যাত্রীর!

রাজপুতনার রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে চলেছে বি, বি, এণ্ড সি, আই-এর মিটার গেজের গাড়ীখানা, কর্কশ বন্ধ্যা প্রান্তরের বুকে কোন সর্ব্বনাশা রুদ্র দেবতার তৃতীয় নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষ, মুক্ত খেজুর বাবুল গাছের বন, লোকালয় নয় নেই—বসতি নেই। ভুসোয়াল ইটাসিগার হয়ে এগিয়ে আসছে গাড়ীখানা—আরাবল্লীর পর্ব্বতসীমা মলিন ছায়া-তীব্র রোদের মাঝে স্বপ্নজাল রচনা করে। সারা ভারতের বৈচিত্র্যময় বিশালতার মাঝে শঙ্কর বাবাজী কোন সূক্ষ্ম অতিন্দ্রীয় মনের সংবাদ হারিয়ে যেন মাটি পাথরের ভারতবর্ষে তার ভিন্ন ভাষাভাষী মানবের মহামেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

এতদিনে আবার নিজেকে খুঁজে পায় বাবাজী।

শুভ্র তুষার মৌলী পর্ব্বতসীমা কোন স্বর্ণ মুকুটের কল্পনা আনে, ধ্যানরত মহাদেবের মত শুভ্র গম্ভীর বিপুল বিশ্বরূপ এ দৃশ্য সে জীবনেও দেখে নি!

লছমনঝোলা পার হয়ে এগিয়ে চলেছে কেদার বদরীর পথে শঙ্কর বাবাজী, কর্ণ প্রয়াগ—বিষ্ণু প্রয়াগ—রুদ্র প্রয়াগ—হিমালয়ের হিমশীতল-পর্ব্বতসানুর মধ্য দিয়ে চলেছে যাত্রী! রাত্রের নিস্তব্ধতায় তুষারমৌলী পর্ব্বতসীমার দিকে চেয়ে চটিতে বিনিদ্র রজনী কাটায় বাবাজী! কানে আসে বহু নিম্নে প্রস্তর পাচীর পার হয়ে খরস্রোতা গঙ্গার ক্রুদ্ধ গর্জ্জনধ্বনি! পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে এগিয়ে চলেছে কনখল-হরিদ্বার—বাংলার দিকে!

মানুষ নেই,- একা-একাই পৃথিবীর পথে সে ত ঘুরে বেড়াচ্ছে! কোন বন্ধনই মানবে না কোনদিন, চিরদিন দূরেই সরে থাকবে পৃথিবীর বন্ধন হতে—খুঁজে নেবে তার মুক্তির পথ!

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বাবাজী—হাটুতে অসহ্য বেদনা, হাটবার ক্ষমতা নাই, পা-টা দু'এক জায়গায় কেটে গেছে, ঘা শুকোয় নি! পেটে কেমন যেন একটা বেদনা! আমাশয় হবে হয় ত—! চটিতে পৌছতেই হবে যেমন করে হোক,—পথ তার সামনে—পিছনে নয়!

দুচোখ যেন বুজে আসে! নিঃশ্বাস নেবার সামর্থ্যও তার নাই, সারা দেহে অসহ্য বেদনা! বাতাস কেমন যেন হালকা হয়ে আসে!—দূরে পাহাড় সীমা পারে রঙীন আকাশ চোখের সামনে নেমে আসে, কাদের হালকা পায়ে আনাগোনা! দুহাত তুলে যেন ঐ অশরীরিদের ডাকতে চায় বাবাজী—কে—কে তোমরা? চোখের সামনে জমাট-ঘন অন্ধকার।

কদিন কেটেছিল জানে না। চোখ মেলতেই কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়ে যায় সন্ন্যাসী! কোথায় এল সে! চারিদিকে পাথরের পরিবেষ্টনী,—উঠে বসতে যায়, পারে না,—কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে!

"অব শো যা—সব ঠিক হো যায়ে গা।"

নীরবে বর্ষিয়সী মেয়েটির কথাই শোনে বাবাজী! বিস্মিত হয়ে যায়, কেন তাকে ওই দুর্গম পথ হতে তুলে এনে সেবা-যত্ন করে সারিয়ে তুলছে—কি এর দরকার!

হাসে মেয়েটি, উত্তর দেয় না।

"পি লে—বাচ্চা!"

পাথরের একটা বাটিতে খানিকটা সদ্য আনা দুধ!

একটু একটু করে হাটতে পারে, শরীরে ফিরে আসে হারাণ শক্তি! "মায়ি!"

বুড়ী ফিরে চাইল সন্ন্যাসীর ডাকে।

"কেয়া বেটা—"

যেতে হবে সন্ন্যাসীকে!—

"দো চার রোজ র' যানা!"

এখানে যেন কোন এক অদৃশ্য বন্ধন!—নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বার হয়ে যেতে চায় সন্ন্যাসী! তার পথ এ নয়—!

রাত্রি নিশিথে কার ভজনের সুর শুনে উঠে পড়ে সন্ন্যাসী! ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত! পর্ব্বত-সানু ভেদ করে দূর গাড়োয়াল কুমায়নের দিকে নুতন সূর্য্যের লালিমা,—বনের মাঝে উঠছে জাগরণের সুর,—তুষার মৌলী গিরিশৃঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় কোন মহামন্ত্র ধ্বনির শুচিতা! ভজন গাইছে বুড়ী—

দূর হতে সন্ন্যাসীর মাথা নত হয়ে আসে! পবিত্র

নদী-তীরে— [ফটো—জয়ন্ত দে

পরিবেশে যেন কোন নোতুন তীর্থের সন্ধান পায় আজ সে। মাথা নুইয়ে মাটি স্পর্শ করে।

প্রয়াগের নীলা দিগন্ত সীমা—যমুনা ব্রীজ হতে 'নাইনি'র দিকে আসতে শেষ বারের মত মাথা নুইয়ে প্রণাম জানায় সন্ন্যাসী,—সুরু হয়েছে বিন্ধ্যাচলের পর্ব্বত-সীমা,—বাঁ পাশে—নীলাঞ্জনমাখান গঙ্গার বালির রূপালি

STUDE... P. G. ...UNION

বালু-বেলার পরই জলরেখা—এ পাশে ধ্যানসমাহিত বিন্ধ্যাচলের পরিক্রমা, রাস্তাটা এঁকেবেঁকে রোটাসগড়ের দিকে চলে গেছে—ছায়াঘন আম্রবীথি সমাকীর্ণ পর্ব্বত-সানু—কোন অনাদিকাল হতে মাথা নত করে আছে মহা অগস্ত্যের পুনর্যাত্রার পথ চেয়ে!

দুপুরের রোদ সারা শরীর যেন ঝলসে দিচ্ছে, মির্জ্জাপুরে নামল সন্ন্যাসী, বিন্ধ্যাচলে গিয়ে মহাদেবের মন্দিরে পূজো দিতে হবে। রোদের তাপে বাইরে বার হওয়া যায় না,—কোন রকমে পথ চলতে থাকে! মাঝে মাঝে শিরীষ তাল গাছের প্রহরা,—নির্জ্জন রাস্তাটা ধরে চলেছে সন্ন্যাসী একা—! হঠাৎ কান্নার শব্দে ফিরে চাইল। কে যেন কাঁদছে একটা গাছতলায়!

আবার চলতে থাকে—কিন্তু থমকে দাঁড়াল! এগিয়ে আসে! হ্যাঁ,—একটি মেয়ে—সঙ্গে বছর দুয়েকের একটি ছোট ছেলে। মেয়েটি মারা গেছে! নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে গেছে তার দেহ! বোধ হয় দুপুরের রোদে সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েই মারা গেছে—কাঁদছে ছোট ছেলেটা পড়ে পড়ে!

চলে যাবে! পরক্ষণেই মনে পড়ে তার নিজের জীবনের কথা, কুমায়ুন-গাড়োয়ালের কোন এক পার্ব্বত্য বৃদ্ধার কাছে সে আজও ঋণী,—সে ঋণের বোঝা কি করে শোধ করবে সে! ভাববার সময় নাই,—গলা শুকিয়ে গেছে ছেলেটার,—চীৎকারও বন্ধ হয়ে যাবে! তুলে নেয় ছেলেটাকে!—জল! ছেলেটাকে বোধ হয় একটু জল খাওয়ান দরকার, লোকালয়ও কাছে কোথাও নেই,—জনহীন চুনারের দিকে তীব্র রোদে রাস্তা যেন কাঁপছে! ছেলেটার চোখ ভিতরের দিকে টানছে; কোন রকমে গলাটা জিবটা ভিজান ওর দরকার, কোন নীচজাতের ছেলেই হবে বোধ হয়—! হোক্ গে! সমস্ত সংস্কার-সাধনা আজ ভুলে যায় সন্ন্যাসী!

ছেলেটা সন্ন্যাসীর জিবটা চেটে চলেছে মহা আনন্দে, ছোট চোখে আনন্দের ঝিলিমিলি, প্রাণপণে শুক্‌নো জিবখানা ভিজোবার চেষ্টা করছে ছেলেটা! ছোট্ট দুখানা হাতে সন্ন্যাসীর গলাটা চেপে ধরেছে!

মলিন হাসি ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর চোখে। মাত্র কয়েক বৎসর এসেছে পৃথিবীতে, এরই মধ্যে ওর এত মায়া! কি বোঝে ও সকালের প্রথম আলোর, কি বোঝে সে বিন্ধ্যাচলের শুষ্ক বনমর্ম্মরের, গঙ্গার নীলা বারিরাশি কি কোনদিনও ওকে ডেকেছিল কাজল চোখের মায়ায়! তবু কেন ভালবাসে সে পৃথিবীকে—জানে না, এতদিনের সাধনা তাকে এ সত্যদৃষ্টি দেয় নি।

তীর্থ পরিক্রমা আর ভাল লাগে না সন্ন্যাসীর, দিক-দিগন্ত চষে এসেছে, এবার চায় বিশ্রাম, পথের নেশা যেন শেষ হয়ে এসেছে, গয়ার ইষ্টিশানের পাশেই ফল্গুর ধার ঘেঁষা পাহাড়শ্রেণী মৌনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে…বেগে চলেছে গাড়ীখানা! পরেশনাথের পর্ব্বত সীমা, নীল ছায়াচ্ছন্ন বেণুবনঘেরা পর্ব্বতরাজ্য পার হয়ে সমতল মাটির দিকে এগিয়ে আসে গাড়ীখানা।

আবার সেই বনরাজ্য, মহুয়া গাছের পরিক্রমা, পাথরের স্তূপ ভরা দিগন্ত ছোঁয়া তরুশ্রেণীর নীচে বক্রেশ্বরের শুষ্ক বালুবেলাময় বক্রেশ্বর! ভারততীর্থ সেরে ফিরে এল সন্ন্যাসী তার পরিত্যক্ত সেই প্রান্তর-তীর্থে!

সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়—সঙ্গে বাবাজীর একটি ছোট্ট শিশু! দু'হাতে সারা বিশ্বকে ধরতে চায় সে—ছোট্ট আঁখিতারায় তার বিশাল দিগন্তের ছায়া! উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে আশ্রমটা আবার পরিষ্কার করে, ধুনির ছাই তুলে, মৃতপ্রায় মাধবীলতার শুকনো পাতার স্তূপ মুক্ত করে, আবার নীড় বাঁধলেন সন্ন্যাসী।

একদিন—দুদিন—তিনদিন, মনের বিশালতা ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়ে এল, দিনের প্রথম আলোর আগমনীর ব্রহ্মমুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার জপে বসেন, ওদিকে বৈতরণীর তীরে চিতার আগুন জলে ওঠে।

—"বাবাজী! একবার -"

আসন শুদ্ধির প্রয়োজনও হয় না…বাবাজী সন্ন্যাসী উঠে পড়ে, ওদের ডাক এড়াবার মত সাহস যেন তার নেই!

ছোট্ট ছেলেটার সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল,—দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদে মেয়েটি—বিধবার একমাত্র সন্তান, ফুলের মত সুন্দর শিশু আগুনের স্পর্শে নিঃশেষ হয়ে গেল! সন্ন্যাসীর মনটা যেন কেমন করে ওঠে, তারই ছোট্ট বাচ্চুয়ার মত ছেলেটা।

নিবিড় রাত্রি নেমে এসেছে গাছের পাতায় পাতায়, তারার ম্লান আলো ছোঁয়া দিয়ে যায় দিগন্তের শাল-বীথিকায়, কার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে পড়ে সন্ন্যাসী, কে যেন কাঁদছে, বাড় হয়ে যেতেই অবাক হয়ে যায়, ছায়ামূর্তি এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীর পায়ে আছড়ে পড়ে,—প্রথমটা চিনতে পারে না, তারার নীলাভ আলোয় কান্নার শব্দ শুনে বুঝতে পারে সন্ন্যাসী—সকালের সন্তানহারা সেই নারী।

"আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর—ও ছাড়া আর যে আমার কেউ নাই।"

অনাথা কি নিরাশ্রয়া বিধবা,—একমাত্র সন্তানের মুখ চেয়ে বেঁচে ছিল, বুক বেঁধেছিল স্বামীর মৃত্যুর পর। আজ শেষ সম্বলও তাঁর নাই—চোখের জলে সন্ন্যাসীর মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। নিয়ে আসে তাকে কুড়ে ঘরের মধ্যে; প্রদীপের ম্লান আলোতে মেয়েটি চারিদিকে কি যেন খুঁজছে—হঠাৎ ছোট্ট একখানা হরিণচামড়ার উপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে দেখেই কেমন যেন হয়ে যায়, সারা মনে তার চিন্তার ঝড়—সন্ন্যাসীর দিকে চাইতেই দেখে হাসছে সন্ন্যাসী, চোখে তার মধুর হাসির আভা। এগিয়ে যায় মেয়েটি শিশুর দিকে। হাঁ—তারই ছেলের মতই চোখ—টিকলো নাক! প্রদীপের আলো যেন সব মুছে যায় ঘর হতে, জেগে থাকে মাত্র ছেলের চোখ দুটো··· তার মধুর হাসিমাখা ঘুমন্ত মুখ—মেয়েটির সারা মনে চলেছে ঝড়ের দোলা···

রাত্রি ঘনিয়ে আসে আশ্রমের বুকে, চারিদিক নিস্তব্ধ, সন্তানহারা নারীর ক্রন্দনধ্বনি মুছে গেছে, জেগে থাকে প্রস্রবণের কলতান—গন্ধকের তীব্র গন্ধমাখা বাতাস আর দূরের শালবনে কোন পথহারা শশক-শিশুর ছন্দহারা আনাগোনা।

সকালের আলো ফুটে ওঠে বক্রেশ্বরের মন্দির শীর্ষে, মাঠের চারিদিকে আবার দোকান পসার বসবার আয়োজন হয়, বৎসর ঘুরে এসেছে আবার শিবচতুর্দশীর গাজন। বনসীমায় আবার দেখা দেয় শাল ফুলের মঞ্জরী, মন্দিরের ধ্বসে পড়া চত্বর আবার সাফ করে নোতুন করে রং লাগান হয়, সুরু হয় পাণ্ডাদের ব্যস্ততা। বৎসরের মরশুম। দূর দূরান্তর গ্রাম হতে সারি বেঁধে আসবে যাত্রীর দল, রঙীন ধুলোয় দিগন্ত ছেয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীর আশ্রমেও আবার সুরু হয়েছে সংসারের ভিত পত্তন, মেয়েটি রয়ে গেছে—সেই ছেলেটির ভাবনা আর ভাবতে হয় না সন্ন্যাসীর, প্রথম যারা আসে সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখতে, সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে ছোট ছেলে—নারী! হাসে বাবাজী।

যাত্রীর দল প্রণাম করে সন্ন্যাসীকে, দিয়ে যায় ফল দুধ আতপ চাল। আগে এসব কিছুই দিতে কেউ সাহস করত না, ভয়ে দূরে দূরে থাকত লোকজন। এখন সকলেই যেন তাকে আপনার করে পেয়েছে।

উঁহুঁ।

যাত্রীদের একটি ছেলে গাছের ডাল ভেঙে এক থোলো রঞ্জন ফুল নিতে যাবে, সন্ন্যাসীর ডাকে চমকে উঠল তারা, অনেকেই ছুটে আসে, বুড়োরা মারতেই যায় ছেলেটাকে কে যেন একটি মেয়ে বোধ হয় মা হবে তার, কয়েকটা চর চাপড়ই বসিয়ে দেয়—বাধা দেয় সন্ন্যাসী, "ছিঃ মারতে নেই, ছোট ছেলে, ও ত কোনো দোষ করে নি, এই নাও—"

এক থালা রঞ্জন ফুল তুলে দেয় সন্ন্যাসী ক্রন্দনরত ছেলেটিকে, তবু থামে না, নিজেই কোলে তুলে নিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করে, সশঙ্ক হয়ে যায় যাত্রীদল।

"অপরাধ নেবেন না বাবা, ছোট ছেলে, নাবিয়ে দেন ওকে, কে জানে কোথায় ময়লা লেগে আছে···ধুলো বালি—হাসে সন্ন্যাসী ম্লান মধুর হাসি।

তার আশ্রমে যেন যাত্রী-ছেলে-পুলেদের মেলা বসে গেছে। তার ভিড়ে যেন সন্ন্যাসী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। শান্ত সমাহিত নির্জীব আশ্রম সমাগতের কল-কাকলীতে মুখর হয়ে যায়। সন্ন্যাসীর সারা অন্তরে যেন কোন্ আনন্দের ধারা! শত সহস্র যাত্রীদলের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিবার প্রবল তৃপ্তি! এ স্বাদ থেকে এতদিন সে বঞ্চিতই ছিল।

অনেকেই বিস্মিত হয়ে যায়—বোধ হয় সন্ন্যাসী পাগল হয়ে গেছে জপ তপ করে। না হলে নিজের

আশ্রমে কোন ছেলে—নিরাশ্রয় অনাথা নারী—রাজ্যের যাত্রী!

মেলার জনতা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দূর প্রান্তর অবধি বিস্তৃত গরুর গাড়ী, যাত্রীর ভিড়, টিনের ছাওনা করা দোকানগুলো চটের ঝাপ ফেলে ঘুমুচ্ছে দোকানীর দল। খড় জমা করে কাঠ-কুটো কুড়িয়ে আগুন পোয়াচ্ছে কারা যেন। তবু কেমন যেন সন্ত্রস্ত ভাব।

আশে পাশে অনেকেই মরেছে কলেরায়—মাঠে, ঘাটে—দিঘীর পাড়ে অশ্বত্থ গাছের নীচে কে যেন শেষ মুহূর্ত্ত গুণছে পড়ে পড়ে। জনতার মাঝে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

দোকান পসার দুদিনেই উঠে যাচ্ছে, যাত্রীর দল যারা পড়ে রইল প্রান্তরতীর্থে, মৃত্যুর দিন গণনা করে, নদীর দিকটাতে পড়ে রয়েছে কয়েকটা মৃতদেহ, তালগাছে শকুনীর ভিড়। কাদের আর্ত্তনাদে নৈশনীরবতা শিউরে ওঠে, পলাতক যাত্রীর মাঝে কে আগে চলে যাবে তারই পাল্লা লেগেছে।

সন্ন্যাসী যেন বাতাসে আজ অনুভব করে কোন মহা কর্ত্তব্যের আহ্বান, দিন রাত্রি নাই, ক্লিষ্ট ভীত যাত্রীর মাঝে ঘুরে বেড়ায় মুমূর্ষু, মৃত্যুপথযাত্রীর চোখের কালো ছায়ায় কোন অজানা লোকের স্বপ্ন। আজ আশ্রমের মধ্যে কোন অবচেতন জগতে আত্মিক সিদ্ধি লাভের পথরেখা যেন হারিয়ে ফেলেছে সন্ন্যাসী। চোখের সামনে আজ মুমূর্ষু জনতা—

"জপ তপ করবেন না বাবা?"

মেয়েটির ডাকে ফিরে চাইল সন্ন্যাসী।

"বাচ্চুয়া খেয়েছে?"

"হাঁ—কিন্তু তপ—"

হাসে সন্ন্যাসী—"ওদের ডাকে আজ না গিয়ে পারছি না মা—সারা জীবন ত তপ করলাম, তপ আবার করবও, একটা দিন একটু ওদিকে দেখতে হবে মা—"

বার হয়ে গেল সন্ন্যাসী মেলার ভিড়ে রোগীদের মাঝে।

চারিদিকে কোন নীল জ্যোতিমাখা...হালকা বাতাসের আনাগোনা উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে চলেছে সন্ন্যাসী, আজ যেন দম আটকে আসে না! আকাশচারী আত্মার দল পথ ছেড়ে দেয় সসম্ভ্রমে তাকে, কোন মৃদু মধুগন্ধী বাতাসের সাথে তার অভিসার।

দূরে হিরাকস্ জাফ্‌রাণী রংএর মেঘের আনাগোনা, কোন মহাব্যোমে চলেছে সন্ন্যাসী। নীচে, বহু নীচে পড়ে রইল তার আকাশ বাতাস আর বন ঘেরা শ্যামল তপোবন, উষ্ণ প্রস্রবণের কলনাদ ভরা প্রান্তর তীর্থ, তার বাচ্চুয়া, সেই মেয়ে!

মেলার সকলেই এসে জমেছে, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, পাণ্ডারা, দেবাংশী সকলেই। সন্ন্যাসীর নিস্পন্দ দেহটা পড়ে আছে, কাঁদছে মেয়েটি বাচ্চুয়া সকলেই! কলেরাই বোধ হয়। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে সেবা করতে গিয়ে আজ নিজেই বরণ করে নিয়েছে ওই মৃত্যুরোগ।

স্বপ্নময় জগৎ, এখানে আগে এসেছিল কি সন্ন্যাসী! চারিদিকে যেন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! একি! সেই মহাপুরুষই! সন্ন্যাসীর সারা মন যেন হাহাকার করে ওঠে; তার বাচ্চুয়া···মেয়ে···মুমূর্ষু যাত্রীদল, শ্যামল তপোবন, উষ্ণ প্রস্রবণের কুলুনাদ, সকালের অরুণিমা-স্নাত তার দিগন্ত, সেখানে কি ফিরে যাবে না, আর কি যেতে পাবে না সেখানে!

হাসেন মহাপুরুষ, আজ সন্ন্যাসীর মুক্তির সংবাদ এসেছে, ডাক এসেছে কোন আলোকোজ্জল দেশের দিকে, পৃথিবীকে ভাল বেসেছিল, ভাল বেসেছিল তার মানুষ তার তরুলতা—তার সকাল সাঁঝের আলো আঁধারি! আজ তাই ত এসেছে মুক্তির ডাক!

উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে কোন জ্যোতির্লোকে চলে গেল সন্ন্যাসীর বন্ধনমুক্ত আত্মা!

সন্ধ্যা নেমে আসে! বৈতরণীর জলরেখার পাশে জ্বলে উঠল আজ চিতার আগুন, সন্ন্যাসীর সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল! দাঁড়িয়ে থাকে সকলেই অবনত মস্তকে অশ্রুসজল চোখে, উর্দ্ধাকাশ হতে মুক্ত আনন্দময় আত্মাও অশ্রুসজল চোখে মৃত্তিকার বুকে পাঠাল নম্র নমস্কার কোন নাম না জানা তারার আলোক-শিখায়!

রাত্রি গহীন নিস্তব্ধ হয়ে আসে।

জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চন-জঙ্ঘায় সূর্য্যোদয়ের মত—সে এক "তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়"। তাঁর প্রতিভা বহু উত্তুঙ্গ শিখরসমন্বিত, শুভ্র তুষারকিরীটী হিমালয়ের সহিত তুলনীয়। তাঁর প্রতিভার বিকাশ বিশ্বতোমুখী এবং উচ্চতা আকাশস্পর্দ্ধী। আমি সেই মহাগিরির একটী শিখর থেকে একটী মাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করে—সেইটীকেই তাঁর স্মৃতি-বাসরে আজ প্রদর্শন ক'রব।

তিনি অজস্র রূপ ও রীতি, নিত্য নব আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গী নিয়ে বঙ্গের সাহিত্যগগনে যুগ সৃষ্টির নূতন সূর্য্যের রূপে সমুদিত হ'লেন, এবং অশীতিবর্ষ ধরে সমান ভাবে তাঁর প্রতিভার সহস্রাংশু ভূগোলের উভয় ভূখণ্ডে বিকীর্ণ করলেন অমলিন ভাবে।

Apollo-র মুখে Shelley যে বলেছেন—

"I am the eye with which the universe
Beholds itself and knows itself divine."

অথবা Dryden যে কথা বলেছেন—

"A man so various, that he seemed to be
Not one man but all mankind's epitome."

এই উভয় উক্তিই রবীন্দ্রনাথে পরম সার্থকতা লাভ করেছে। আজ দিকে দিকে জাতীয়তার চেতনাদ্যোতক নানা বর্ণের নানা পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে, দেশে জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। জাতীয় জীবন-প্রভাতে বহু বিহঙ্গ কাকলির কল-কলালাপ—বহুবিধ slogan-এ এবং গানে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে তুলেছে। "বন্দে মাতরম্" থেকে "জয় হিন্দ্" পর্য্যন্ত কংগ্রেস-কৃষক-প্রজা-শ্রমিক কমরেড কেউ কম 'রেড' নন্—সকলেই দেশপ্রাণতার লালে লাল হয়ে উঠেছেন। সকলেই বলছেন—'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা'।

মহাকবির ভাষাতেই বলি—

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি'—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

এই সকল ভয়-ভঞ্জন অলখ-নিরঞ্জনের নামে কবিগুরু আমাদের কানে কানে মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন। যদি কোনও মুহূর্ত্তে কারও মনে কোনও কুণ্ঠা কার্পণ্য দুর্ব্বলতা বা ভয় এসে ভয় দেখায়—তা হলে শিখগুরুর মুখে কবিগুরুর অভয় বাণী আমরা শুনতে পাব-"রে পুত্র ভয় নাহি"। ১৫ই আগষ্ট অদূরবর্ত্তী। বন্দার পুত্র শিখ বালকের মত, এই 'অভীঃ'—মন্ত্রে দীক্ষিত এবং জাতীয় যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পবিত্র প্রাণগুলি আজ মহাকবির স্মৃতি পূজায় শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি।

মহেঞ্জোদারো, হারাপ্পা, এবং বহু নদ-নদী-মাতৃক আর্য্যভূমির তপোবন মুখরিত করে যে প্রার্থনা উঠেছিল—"আবিরাবির্ম্মএধি", যে আহ্বান উঠেছিল "প্রকাশ হওগো, উদয় হওগো, পথিক হওগো নয়ন পথে" সেই সুরের প্রতিধ্বনি, সেই প্রকাশের অভিব্যক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, তখনও সিপাহী যুদ্ধের হুতবহশিখার ধূম এবং গন্ধ, জাতীয় জীবনে চেতনা এবং প্রেরণা যোগাচ্ছিল। তখনও গ্যারিবল্ডি এবং ম্যাটসিনি দ্বারা অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে ইটালির স্বাধীনতা লাভ, ভারতবর্ষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

ঠাকুর পরিবারের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র-গণেন্দ্র-সত্যেন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রনাথ যখনি বিদেশী বর্জ্জন করে স্বদেশী শিল্পের প্রসারকল্পে 'হিন্দু মেলা'-প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিলেন—তখন থেকে রবীন্দ্রনাথ, কৈশোরে পা দিতে না দিতেই স্বাদেশিকতার এবং জাতীয়তার দীক্ষা লাভ করেন।

তখন রঙ্গলালের—"কত কাল পরে বল ভারত রে"—
দ্বারকানাথের—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা—
এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না"—
হেমচন্দ্রের—"ভারত তবুও ঘুমায়ে রয়"
দ্বিজেন্দ্রনাথের—"চল্ রে চল্ সবে ভারত সন্তান—
মাতৃভূমি আজি করে আহ্বান"—

সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সব ভারত সন্তান…গাও ভারতের জয়" ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীত—জাতির মনে জাতীয় প্রেমের উন্মেষ সম্পাদন করছিল। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ—'হিন্দুমেলার উপহার' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে 'স্বাদেশিক সভা' বলে যে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হয়, তাতেও রবীন্দ্রনাথ সহযোগিতা করেছিলেন। তার-পর থেকে কংগ্রেসী আন্দোলন—শিবাজী উৎসব—বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রবাহে এবং সম-সাময়িক জাতীয় জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ—অজস্র কবিতা এবং সঙ্গীত রচনা দ্বারা চারণ কবির মত দেশের জয়যাত্রায় তাঁর দেশবাসীকে আবাহন জানিয়ে এসেছেন।

১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গান করেন—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে—
ঘরের হয়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।"

তখনো কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল আরাম চেয়ারের উপর। নীতি ছিল আবেদন-নিবেদনমূলক। গভর্ণমেন্টের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল এই ভিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্র নাথ কখনই আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ছিলেন আত্ম-শক্তির সাধনায় বিশ্বাসী। ১৮৯২ সালে এই সাধনা প্রচারের জন্তই তিনি 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করে-ছিলেন।

বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে হলে জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার জন্ত বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে নির্ম্মাণ করেন নি। আত্মম্ভরি অহং-সর্ব্বস্ব বা আক্রমণশীল জাতীয়তার (Aggressive Nationalism) পোষণ বা সমর্থন করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' রূপ উদার মতবাদের অনুবর্ত্তন করে সেই সেই পথের অসংখ্য পথিকের মিলনতীর্থ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ—পরবর্ত্তীকালে তাঁর 'ভারততীর্থে' 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। তাঁর প্রতিভাও যেমন বিশ্বতোমুখী তাঁর প্রকৃতিও তেমনি আন্তর্জ্জাতিক উপাদানে গঠিত। বিরোধ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি মিলনের কবি, সংগঠনের কবি, সংশ্লেষণের কবি—Synthesis-এর কবি। তিনি সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম অনুভূতির কবি। তিনি বিশ্বকে ভারতবর্ষের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর বিশ্বভারতী রচনা করেছেন। সব ঠাঁই তাঁর ঘর, সব ঘরে তাঁর পরমাত্মীয়, সব জাতিই তাঁর স্বজাতি, এক জন্মেই তিনি দেশ দেশান্তরে গিয়ে বহুজন্ম লাভ করার সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন। নিজের স্বরূপকে তিনি বিরাট বিশ্বরূপের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছেন। জাতি ধর্ম্ম দেশ রাষ্ট্রের গণ্ডী লোপ করে বিশ্বমানবতার প্রেম ও মমতার অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে বিশ্বমানবকে তিনি আবদ্ধ করতে চেয়েছেন :—

হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।

ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া বৃহৎকে পাবার আকুলতা নিয়ে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের পর তারি গতিবেগ ও আকুলতা নিয়ে তিনি মহাসাগর সঙ্গমে ছুটেছেন—বলেছেন—

আকাশ-ভরা সূর্য্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।

তাঁর মতবাদ উদার অসংকীর্ণ বিশ্বমৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

"বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলাময় যে-ভূমি,
সেই তো স্বর্গভূমি
সবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
ওগো সেই তো আমার তুমি।"

তিনি 'বহ্বী প্রজা স্বজমাণস্বরূপা'—বিশ্ব প্রকৃতির কুল পুরোহিত এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

যেখানে ভেদবাদী Kippling বলেছিলেন—

"The West is West, the East is East
And the twain shall never meet."

সেখানে অভেদবাদী রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য-সাধনের মুক্তি পরিত্যাগ করে অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বাস্তব কর্ম্মজীবনে নেমে এসে কর্ণধার হয়ে বসেছিলেন এবং এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে তাঁর অপরিসীম অধ্যবসায়ে এবং আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন বলিষ্ঠ সাধনায়—'বাঘে ও বলদে' এখানে এক ঘাটে জল

খাইয়ে ছিলেন—এই 'সবার পরশে পবিত্র করা' পুণ্য-তীর্থের জল।

তাই বুঝি তাঁর গোঁড়া স্বধর্মনিষ্ঠ 'গোরা'কে পরিশেষে আইরিশ সন্তানরূপে এক গঙ্গা-যমুনার সম্মিলিত প্রয়াগ মূর্ত্তিতে—এই বিংশ শতাব্দীর ভাব সম্মিলনের প্রতীকরূপে আমরা সবিস্ময়ে অবলোকন করি। অহং-ধর্মী স্বার্থসন্ধ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ পিছনে ফেলে, 'পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে'—এই তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর জাতিকে-'আগে চল—আগে চল ভাই' বলে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—'যক্ষপুরীর' সর্ব্ববিধ 'জালাবরণ' ভেদ করে,—শাস্ত্র-সভ্যতা শস্ত্র-সভ্যতা এবং যন্ত্র-সভ্যতার পরপারে।

তিনি রাখী বন্ধনের সৌভ্রাতৃকতার উৎসবে হিন্দু মুসলমানকে এই রাখীতে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন। এ চেষ্টা এমন করে তাঁর আগে আর কেউ করেন নি।

কাব্য সাধনার সমাধিতে মগ্ন থাকলেও তিনি কর্ম্ম-ভূমির কুরুক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হননি। তিনি রণশঙ্খের আহ্বান শুনে বলে উঠেছেন :

"কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন অন্ধ কারা মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁর উর্ব্বশীর মত বৃন্তহীন পুষ্প সম নহে।

ভারতবর্ষের বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ মধ্য এবং আধুনিক সকল যুগের ঐতিহ্য থেকে তিনি মহান মহী-রুহের মত পাদমূলে রস সঞ্চয় করে ভারতের আদর্শকে নিজের সমগ্র সত্তার অগ্রভাগে শাখাশীর্ষে ফুলফলের মত ফুটিয়ে এবং সফল করে তুলেছেন। তাঁর স্বপ্ন এবং কল্পনাকে, তাঁর আশা এবং প্রেরণাকে মূর্ত্তিমন্ত এবং প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন।

ভারতীর প্রসাদে শুধু পরশমণির স্পর্শ নয় তিনি পেয়েছিলেন রূপকথার সোনার কাঠির সঞ্জীবন স্পর্শ। তাই দেবযানীর অভিসম্পাতে তাঁর কচের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অনধিগত থাকতে পারেনি কারণ প্রত্যভিশাপ দিতে সে জানেনা, সে অভিশাপকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে :—

"আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে,
ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।"

তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ীভূত যত রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সমাজনৈতিক 'শুষ্কং কাষ্ঠং'কে তাই তিনি স্পর্শমাত্র নব কিশলয়ের শ্যাম সমারোহে পরিপূর্ণরূপে সাহিত্যরসোপেত করে, বিকশিত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। ভট্টির ভাষায় বলা যায়—

ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজম্
ন পঙ্কজং তদ্‌যদলীনষট্‌পদম্‌
ন ষট্‌পদো, সৌনক্ষুগুঞ্জ যঃ কলম্
ন গুঞ্জনং তন্ন যহার যন্মনঃ।

ঠিক সেই সুষমা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে। এমন কোনো বিষয় ছিল না যাতে তিনি ফুল ফুটিয়ে তোলেননি,—ভারতীয় কাব্য মঞ্চের মালাকর হয়ে—মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী বল্লরী বিতানে, কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বনে, এমন কোনো ফুল তিনি ফোটাননি যাতে গৌড়জন মধুপের মত আনন্দে করেনি পান সুধা নিরবধি। এবং সেই সুধা পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে যখন তাঁরা গুঞ্জন করেন তখন এমন কেউ থাকেন না, যে সে-গুঞ্জনে মুগ্ধ না হন। তিনি ভারতীর রাজসভাবহিঃপ্রান্তে 'স্বেচ্ছাবন্দীদাস' হয়ে এই মহানগরীর সাতমহলাভবন ছেড়ে—পল্লীর ক্রোড়ে কুটীর নির্ম্মাণ করেছিলেন। দেবীর নিভৃত প্রসাধনে—

"প্রতি সন্ধ্যাবেলা অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল চরণ অঙ্গুলি প্রান্তে—
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া"—

নিয়া যে পুরস্কার কবি লাভ করেছিলেন তাকেই সাহিত্যে বলি 'ভূমা' যাকে শ্রুতি বলেছেন, 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'।

কিন্তু এই রসাত্মক গীতি কাব্যের প্রসঙ্গ করা আজকের প্রস্তাবনার বিষয়ীভূত নয় সুতরাং ফিরতে হবে এখান থেকেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বমলহীরের পাথরটাকেই

বলে বিত্তে আর তার থেকে যে আলো ঠিক্‌রে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি"—আজ তাঁর মণিদীপের দীপ্তির শুধু একটী মাত্র রশ্মি দিয়ে সেই হীরকের একটা মাত্র 'পল' বা facet আমরা দর্শন করবো তাও অসম্পূর্ণ ভাবে। এই পরাধীন পতিত জাতিকে মনুষ্যত্বের কোঠায় উন্নীত এবং উদ্বুদ্ধ করবার জন্ত তিনি কি করেছিলেন?

সোভিয়েট কবি বলেছিলেন—

"Arise,
Our beloved Country groans—
It calls for deliverance—
As it has never called before."

মহাকবি প্রার্থনা করেছিলেন—

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে—
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।"

তিনি বিশ্বমানবতার সার্ব্বভৌম কবি হলেও জাতীয় জাগরণের মহাসন্ধিক্ষণে আপন-চারণ কবির কর্ত্তব্য বিস্মৃত হননি। তিনি সেদিন যে দুঃখে বলেছিলেন—"এ-যে বুককাটা দুখে গুমরিছে বুকে দারুণ মরম-বেদনা—" ভারতের সে-দুঃখের অবসান আজও হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে জানালেন—'দুরন্ত পথের অন্ধকারে' বিদেশীর রাজসিংহাসন পাতা হয়ে গেছে, ছদ্মবণিকের 'মানদণ্ড' শর্ব্বরীপোহাতেই রাজদণ্ডরূপে ধরা পড়ে গেছে। তখন জলৌকার শোষণ অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে'। দেশ, শাসনে মূর্চ্ছিত, শোষণে শোণিত-হীন পাংশুবর্ণ হয়ে পড়েছে। তখন ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ে ম্লানমুখে বিরস বদনে দিবসের পর দিবস ভিক্ষা করে ফিরছে। তখন শারদোৎসবের সহকার শাখা এবং মঙ্গলকলস একান্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত ফাঁকিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। আজ তাই অনুশোচনায় এবং অনুতাপে দেশ তাঁর কথার আবৃত্তি করে বলছে—'সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ শির পাতি লব' তিনি চিত্রতুলিকা গ্রহণের বহু পূর্ব্বেই চিত্র করেছেন—এই নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বলা, অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চলা—ভুবনমনমোহিনী শুভ্রতুষারকিরীটিণী—দেশ মাতৃকার মহিমময়ী প্রতিমা,—রেখায় নয় লেখায়।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিরোধ কল্পে বাংলায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় সে আন্দোলনের পুরোভাগেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি গাইলেন—

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি—
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস—
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

তিনি আশ্বাস দিলেন—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে—
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।"

তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক—"
"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই...."
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—"
"তা'বলে ভাবনা করা চলবে না—"
"বাংলার মাটী বাংলার জল—"
"বিধির বিধান কাটিবে তুমি এমন শক্তিমান—"

ইত্যাদি স্বদেশী যুগের অগ্নিগর্ভ চারণ গীতিকা—বঙ্গ-ভঙ্গের কালে ১৯০৪ গতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের রচনা। কবি তাঁর স্বকীয় কর্ত্তব্যে সজাগ হলেন, নিশ্চেতন জাতিকে তার নিজস্ব স্বত্বে প্রবুদ্ধ করে তুলতে ব্রতী হলেন—বললেন—'আবার তোরা মানুষ হ।' ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মাকে লিখিত (৭ই বৈশাখ ১৩০৯ সালে) পত্রেও দেখতে পাই তিনি নিজের সমস্ত তেজকে হৃদয়ের গোপন গুহায় অহরহ প্রজ্জলিত করে রেখেছিলেন। পত্রখানি মাঘ ১৩৫২ 'অলকা'র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পত্রে কবি লিখেছেন—"বিদেশীর উপদেশে যদি আমরা নিজে-দের হীন বলিয়া মনে করি তবেই আমাদের যথার্থ পরাভব। বেশভূষা, আহার বিহার, গৃহসজ্জা, বিলাস উপকরণ আমরা কেবলি ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগ করিতেছি—তেজ ভ্রষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট, চরিত্রবল চূর্ণ...তাহারা আজ পশুর মত হীনতা ও অবমাননায় লুণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে? বাঁচিয়া কি হইবে যদি এমন করিয়া বাঁচিতে হয়?"

কবি বারে বারে দ্বারে দ্বারে আবেগকম্পিত করাঘাত করে ফিরেছেন, 'হয়তো দুয়ার খুলবে না' কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চলবে না'—তিনি তাঁর আশাবাদ পরিত্যাগ করেন নি। আজ তাই বুঝি জাতি জেগেছে।

কলকাতায় মিসেস বেসান্তের সভাপতিত্বে নিয়ে কংগ্রেসের নরমদল ও গরম দলের মধ্যে যখন বিবাদ বাধে তখন নরম দলের মিটিং ভেঙে গরমদল রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের দলের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচন করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, কিন্তু গরম দলের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চিন্তা গঠনমূলক ক্রিয়ার অনুবর্তী। মহাত্মাজীর গঠনমূলক তালিকার অধিকাংশ কার্যসূচীই রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী লেখার অথবা পরবর্তী কার্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই জন্যই বুঝি মহাত্মাজীও সাগ্রহে কবিকে 'গুরুদেব' সম্বোধন করেছেন। তিনি বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, চীন জাপান, কোরিয়া, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার বহুদেশে—এবং ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করে সকল দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির রত্ন আহরণ করে দেশের ভাবধারাকে এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছেন। গ্রাহ্যকে গ্রহণ করেছেন এবং ত্যাজ্যকে ত্যাগ করতে বলেছেন। তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতে নবযুগের আদর্শ এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, আলস্য ও নিঃসহায়তা সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত হয়েছে।

প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের মনে এই আন্দোলন negative বা নেতি-ধর্মমূলক বলে কিছু পরিমাণে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী আন্দোলনে তাঁর অন্তর মহাত্মাজীর আইন-অমান্য করা অসহযোগের আন্দোলনে ঐকান্তিকভাবে সাড়া দিয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ ও সমাজ সংগঠনের ভাবধারা তাঁর ১৯২২ সালে রচিত 'মুক্তধারা'র রূপকে রূপ গ্রহণ করেছে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার আদান প্রদানের পক্ষপাতী তাই বলেন—

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে মিলাবে
মিলিবে যাবেনা ফিরে।

জগৎকে 'এক ঘরে' করে ডোবার ব্যাঙের মত নিজে 'এক ঘরে' হয়ে থাকার নিঃস্ব রিক্ত আত্মকেন্দ্রিক অভিমানকে রবীন্দ্রনাথ কখনও সমর্থন করেন নি।

জালিয়ানা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কবি ক্ষোভে দুঃখে অপমানে চার পাঁচদিন প্রায় অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন, অতঃপর ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে বড়লাট চেমস ফোর্ডকে ১৯১৯ সালে যে পত্র লেখেন তা ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর মতের অনেক অংশে ঐক্য থাকলেও প্রথমে তিনি চরকার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। "চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে" (স্বরাজ সাধন—প্রবন্ধ সবুজ পত্র ১৩২২) বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে হিজলী (মেদিনীপুর) জেলে নিরস্ত্র বন্দীর উপর বেপরোয়া গুলি চালনার পর আবার কবির অগ্নিগর্ভ দৃপ্তবাণী আমরা শুনতে পাই সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। তিনি মনুমেন্টের নীচে বিরাট জনসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন—"রক্ষক নামধারী নরঘাতকদের" বিরুদ্ধে জনসাধারণের নালিশ জানাবার জন্ম।

মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কবি বাণী দিয়েছিলেন—"ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে ···তারা দীপ জ্বালাবার জন্ম ভুল করে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ।' তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ দুঃখের পর দুঃখ সেই তাদের প্রাণ-নিবেদন আজ নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারাতো নির্ভীকমনে চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। বাঙালীর স্বভাবে যাকিছু শ্রেষ্ঠ তার সরসতা, তার কল্পনা-বৃত্তি তার নূতনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপ-সৃষ্টির নৈপুণ্য অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে

ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে, নব বসন্তে নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টি-কর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি।……

আজ আমার শেষ কর্তব্য রূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে। (শনিবারের চিঠি জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩)

তাঁর 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' 'পথ ও পাথেয়', 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' 'শিক্ষায় মিলন' 'স্বদেশী সমাজ, 'ছোট ও বড়' প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রবন্ধ তাঁর স্বাদেশিক এষণার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই স্বাদেশিকতা কবির ভাবসমুদ্রের একটি চঞ্চল তরঙ্গ নয় সাময়িক চিত্তবিক্ষোভ নয় এটি তাঁর সমগ্র সত্তার এক অখণ্ড, অবিভাজ্য অংশ। সমাজের অচলায়তন গোঁড়ামিকে তিনি বার বার কশাঘাত করেছেন। মানুষের প্রয়োজনে সমাজ হয়েছে, সমাজের প্রয়োজনে মানুষ হয়নি। সামাজিকতার চেয়ে মানবিকতা বড়। দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী সময়ের অগ্রগতি অনুসারে সমাজকেও তাল রেখে চলতে হবে। 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং 'স্বদেশ' 'হোলি খেলা' 'পণরক্ষা' 'শিবাজী উৎসব' 'মুক্তির ফাঁক' 'নিষ্কৃতি' 'ভারততীর্থ' 'অপমান' প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্যে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর মতবাদ।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

নিয়তির মত অমোঘ এবং কঠোর মহাকবির এই ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁর নিঃস্ব নিরীহ দেশবাসীর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"বংশ বংশ ধরি
নাহি ভৎর্সে অদৃষ্টেরে নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।"

গত দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করুন—

"সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

এ যেন ঋষি-চেতনায় উদ্ভাসিত কবির ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ১৩৫০ থেকে আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধোত্তর ভারতের নারকীয় দুর্গতির দ্যোতনা করছে। যারা মরেছে তাদের যেন মরারই অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। দুর্ব্বল অক্ষম নিঃসহায় তারা, তারা কোনো প্রতিকারই করতে পারে না।

দুঃখে শোকে অপমানে কবি আর্ত্তনাদ করে ওঠেন :—

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে—
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে—
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

এই নিরীহদের প্রতি অত্যাচারের যারা হেতু, সেই বিশ্বাসঘাতক black marketeerদের লক্ষ্য করেই যেন বলেছেন :—

"অক্ষমের বক হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।"

ভিসুভিয়াসের তরল অনলোদ্গারের মত কবি বলছেন :—

"যে নপুংস কোনোদিন—
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে দুর্গতির করে অহংকার

দেশের দুর্দশা লয়ে যা'র ব্যবসায়
অন্ন তার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়—
সেই ভীরু নতশির চির শাস্তি তার
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার।"

কবির এই বাণী, অত্যাচারীর বিভীষণ গুপ্তচরদের বিশ্বাসঘাতকতার জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলবে। আমাদের অভুক্ত এবং অর্দ্ধভুক্ত দরিদ্র ভাই বোনদের দেখিয়ে তিনি বলেছেন—

"অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।"

দেশবাসীর কর্ত্তব্যও তিনি নির্দ্ধারণ করেছেন :—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা. এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

যা'রা 'ভাই-ভাই' হয়েও আজ ঠাঁই-ঠাঁই হ'য়ে প'ড়েছে তাদের কাছে তিনি দাবী করেছেন :—

"ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হ'বে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি—
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।"

আমাদের অন্তরের প্রদীপ তিনিই জ্বালিয়েছেন। আজ যে-কেহ অন্তরের মধ্যে জীবন-পোড়ানো হোমানলের অন্তর্দ্দাহ অনুভব করেন তিনিই কবির মর্ম্মপীড়া উপলব্ধি করেন—

"যেন সচেতন বহ্নি সমান-নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে।"

সমাজের শ্রেষ্ঠ আভিজাত্যে জন্ম গ্রহণ করে এবং চির সুখীজনদের মধ্যে একজন সুখীতম জন হয়েও ব্যথিত বেদনের আশীবিষ-জ্বালা তিনি ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করেছেন।

আজ যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে বাংলায় তথা থেকে থেকে ভারতবর্ষে নরকাগ্নি জ্বলে উঠছে তার মৌরসী পাট্টা ম্যাক্‌ডোনাল্ডের কম্যুন্যাল য়্যাওয়ার্ড প্রবর্ত্তন করবার সময় রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—

"My advice to my countrymen is, they should ignore this award and focus all their forces against irrational communal and class differences, come to an agreement between ourselves and thus remove one of the greatest obstacles in the path of our national self expression."

রাজনীতিকে পশ্চাতে রেখে পরবর্ত্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

শান্তিনিকেতনে বাস বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, জমিদারীতে সমবায় সমিতি পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন, যথাযোগ্য চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা বিধান, বৃক্ষ রোপণ, ইষ্টাপূর্ত্ত (public works) বা জনহিতার্থে কূপ জলাশয়াদি খনন, রাস্তা মেরামত-প্রস্তুত ও জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি দ্বারা পল্লী সংস্কার করা, ঋণ থেকে চাষীদের মুক্ত করা, সালিশী বিচারে গ্রাম্য বিবাদ নিষ্পত্তি করা, শ্রীনিকেতন স্থাপন, পশু পালন, ব্যবসা বাণিজ্য, কুটির শিল্পাদির প্রসার, National Council of Education-এ যোগদান প্রভৃতি দ্বারা তিনি বহু প্রকারে চেষ্টা করেছিলেন, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্ত দেশের সমবেত শক্তিকে জাগ্রত করতে। এই স্বাবলম্বনের আদর্শে তিনি বহু তথাকথিত 'স্বদেশী' নেতার চেয়ে বস্তুতন্ত্র বা রিয়ালিষ্টিক ছিলেন।

যাঁরা অনুযোগ করেন 'রবি ঠাকুর' দেশটাকে 'মেয়েলি' বা effeminate ক'রে দিয়েছেন তাঁদের আমি বলি—

"নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিনঃ।" অর্থাৎ ক্ষীণশক্তি বিহঙ্গের মত তাঁরা আপন ডানার জোরে আকাশের পরিমাপ করতে চান। অথবা তাঁদের জ্ঞান 'অন্ধ হস্তি ন্যায়'। অন্ধ যেমন হস্তীর অঙ্গ বিশেষ স্পর্শ করে কখনো বলে হস্তী কুলোর মত, কখনো বলে স্তম্ভের মত, কখনো বা বলে রজ্জুর মত!

যাঁরা পল্লবগ্রাহী, গণ্ডূষ জল সফারী শফরীন মত ফর্‌ফরায়মান পাঠক, তাঁরাই আপন আপন অধিকার বিচার না ক'রে বৈষ্ণব কবিদের প্রতি বা রবীন্দ্রনাথের প্রতি রজ্জুতে সর্পভ্রম আরোপ করে থাকেন। তাঁরা কুরুক্ষেত্রের গীতা না বুঝে বৃন্দাবনের ভাগবত বুঝতে চান ভাগবতের ভাষাতেই বলি—

বিচেষ্টিতং তেৎর্ভকচেষ্টিতং যথা।

সে চেষ্টা বালকেরই মত হাস্যকর অপচেষ্টা মাত্র।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্মদিনের বাণীতে কবি বলেছিলেন—আক্ষেপে এবং আফসোসে—"পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতার অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।.....জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হ'য়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্ত্তার জন্ম দিন আসছে আমাদের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব দিগন্ত থেকেই।"

মিস্ র‍্যাথবোনের চিঠির প্রতিবাদেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, যে-বিজেতা রাজশক্তি, স্বীয় রাজকোষ পূর্ণ করবার জন্য নিঃস্বকেও শোষণ, নিরন্নকেও নির্য্যাতন করতে কুণ্ঠা বোধ করে না—সে-রাজশক্তি আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতা দান করেছে বলে বড়াই করলে তার সার্থকতা নেই—সে শুধু প্রলাপ মাত্র।

যুদ্ধের অজুহাতে আমাদের দেশের উপর এক ধ্বংস লীলার বীভৎস অভিনয় হয়ে গেল। দেশে আজ অন্ন হীনতা বস্ত্র-হীনতা চিকিৎসা-হীনতা এবং ততোধিক ব্যক্তিত্ব-হীনতা চরিত্র-হীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিতে নাড়া দিয়েছে। ছোট খাটো ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিভেদের বশে আমরা নিজেদের দুর্গতি বাড়িয়েই চলেছি। তাই ক্ষোভে দুঃখে তিনি বলেছেন—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
সরমের ডালি
নিশিনিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি
লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

তাই তিনি আমাদের সংকল্প করালেন—

"নব স্বদেশের দীক্ষা।"

প্রার্থনা করালেন—

"বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হৌক এক হৌক এক হৌক হে ভগবান।"

জাগৃতি মন্ত্র গান করলেন—

"হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে।"

প্রণাম করলেন—

"ও আমার দেশের মাটী তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা।"

আজ তাই বুঝি মহাকবির পাঞ্চজন্যের আহ্বানে দেশের পাঁচজনে সাড়া দিয়েছে।

সূর্য্যেরই মত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সূর্য্য রবীন্দ্রনাথের উদয়নেও যেরূপ, অস্তায়নেও সেই রূপ :—

উদেতি সবিতাতাম্র তাম্র এবাস্তমেতি চ
উদয়াস্তমনে পুং সাং মহতামেকরূপতা।

মহাকবি সম্বন্ধে এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রান্তিকের ভূমিকায় যখন দেখি :—

"অস্ত সিন্ধু কূলে এসে রবি—
পূরব দিগন্ত পানে পাঠাইল অন্তিম-পূরবী।"

তখনও দেখি রবিরশ্মি অম্লান এবং ভাস্বর। তাঁর স্মরণ দিনে আমরা তাঁরই শাশ্বতী স্মৃতি ধ্যান করি :—

"তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন
অন্তরে অলক্ষ্য লোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চির স্পর্শ মণি
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।"*

---

* বিপণ কলেজিয়েট হোস্টেলে, রবীন্দ্র-স্মৃতি-বাসরে সভাপতির অভিভাষণ।

তিন

সন্ধ্যার পর রোজই কাশীপতিবাবু মল্লিকদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে যান। বিরজাসুন্দরী সুষমার সহায়তায় রন্ধনে ব্যাপৃত থাকেন। উমা গান সমাপ্ত করিয়া উপন্যাসে মনোযোগ দেয়। ছোট ছেলে তারাপদর কাছে বন্ধুবান্ধব আসে; সদর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বাঁ দিকের যে ঘরটি মিলিত বৈঠকখানা ও শয়নঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নানা দুর্বোধ্য আলোচনা ও সতেজ তর্ক জমিয়া ওঠে।

তারাপদ বছর সাতাশ-আটাশের গম্ভীর প্রকৃতির যুবক। পরিবারের অন্যান্যদের মতোই কৃশকায়, কিন্তু খুব চেঙা নহে। শরীরের বাঁধুনি মজবুত ধরণের। নাকটা তীক্ষ্ণ, কপাল চওড়া, চোখের দৃষ্টি ধারালো। মুখে বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব এবং কিছুটা মননশক্তির পরিচয় আছে; তবে তাহার প্রকৃতিটা যে কিছু উগ্র ধরণের, তাহাও না লক্ষ্য করিয়া উপায় নাই।

কম্বাইন্‌ড্‌ বৈঠকখানা ও শুইবার ঘরটি তারাপদর রাজত্ব। এই রাজত্বটি চওড়ায় দশ ও লম্বায় বারো ফুট, ইহার একধারের দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপরিসর তক্তপোষে তারাপদর বিছানা সুজনিতে ঢাকা। উল্টা দিকেই সমান মাপের আর একটি তক্তপোষ; এটি শতরঞ্জিতে আবৃত থাকিয়া ফরাসের কাজ করে এবং প্রয়োজন হইলে বিছানায় পরিবর্তিত হয়। ছুটো কাঠের ও একটা বেতের চেয়ার জানালার ধারের টেবিলটিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের কোনও মতে আঁটাইয়া লইয়াছে। টেবিলের উপর খোলা বই ও বিভিন্ন বর্ণের প্যাম্ফলেটের ভিড়। গোটাকয়েক সস্তা বুক-সেলফের উপর তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বই চাপাইয়া দিয়া উটের পিঠের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তা সে যাই হউক, এ সব লক্ষ্য করিবার পর শব্দ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তারাপদর আসক্তি যে রীতিমত প্রবল, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বর্তমানেও সে এই আসক্তিরই পরিচয় দিতেছিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বোম্বাই মেলের বেগে কলম চালাইতেছে। দুর্বল টেবিলটা ওই বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বারবার আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তারাপদ ইহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেছে না।

তাহার পাশেই বিছানার উপর বসিয়া তাহার সহকর্মী ও বন্ধু প্রকাশ মজুমদার নির্বাক বসিয়া ইহা হইতে রস উপভোগের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু খুব যে পাইতেছে, তাহা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছে না। এমন একটা জরুরি কাজে ব্যাঘাতসৃষ্টির জন্য সে যে উসখুস করিতেছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অবশেষে প্রকাশ সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিল, 'বাৎসরিক ছুটির বরাদ্দ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত কি ঠিক হলো?...'

তারাপদ ইহার জবাব না দিয়া আরও কয়েক সেকেণ্ড লেখা চালাইয়া গেল। অবশেষে কাগজের উপর কলমের একটা অতিরিক্ত জোরালো খোঁচা মারিয়া তাহার উপস্থিত প্রতিপাদ্য সমাপ্ত করিল। লেখা কাগজটি উঁচু করিয়া

চোখের সম্মুখে ধরিয়া সে কিন্তু তাহা পাঠ করিল না; কাগজের উপর চোখ নিবদ্ধ রাখিয়া প্রকাশের প্রশ্নের জবাব দিল।

'নিজে য়ুনিয়নের মিটিঙে যাবে না, অন্যের কাছ থেকে কি সুবিধে আদায় হলো জেনে নেবে, এটা কি রকম আচরণ শুনি? য়ুনিয়ন আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, একলার দায়িত্বও নয়; তোমাদের পাঁচজনের জিনিষ। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও যদি দেখি, তোমরা কেউ হাজির নেই, ব্যাপারটাকে তুচ্ছ মনে করে…'

'বড় খিদে পেয়েছিল', প্রকাশ কিছুটা অপরাধীর মতোই কহিল, 'খেতে চলে এসেছিলাম। সাইকেলে এসেছিলাম; ভেবেছিলাম, মিটিং শেষ হওয়ার আগেই ফিরে যেতে পারব। এসে দেখি, তখনও রান্নাই শেষ হয় নি…'

প্রকাশ তারাপদর সমবয়সী। শক্তিমান দোহারা গড়ন। রং ফর্সার দিকে। হাতের পেশি লোহার মতো শক্ত। চওড়া বুক ক্রমে সরু হইয়া কোমরে নামিয়া আসিয়াছে। মাথার প্রচুর চুল ব্যাক্-ব্রাশ করিয়া আঁচড়ানো। পোষাকে একটু বাবুয়ানা লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় চোখ দুটির দৃষ্টি স্নিগ্ধ এবং মুখের সরলতা সুস্পষ্ট।

তারাপদর সঙ্গে একই গ্যারাজে প্রকাশ মেকানিকের কাজ করে। লেখাপড়াও তারাপদর সমান—ম্যাট্রিক পাশ। সামনের গলিটা দিয়া ঢুকিয়া বস্তির প্রথম বাড়িটাই তাদের বাসা। সংসারে এক বিধবা মা, অন্য দায়িত্ব নাই। মায়ের হাতে কিছু টাকা আছে। ইহার সাহায্যে বাড়ির সম্মুখের বড রাস্তার উপর এক ফালি খালি জায়গা ভাড়া লইয়া সম্প্রতি সে ছোটখাট এক মোটর মেরামতের ওয়ার্ক-সপ খুলিয়াছে। এখনও তাহার কারখানায় যথেষ্ট সংখ্যক বিকল মোটরগাড়ি আকৃষ্ট হইতেছে না এবং হইলেও বেশি কাজ নেওয়ার মতো তার সামর্থ্য নাই, তবে টুকিটাকি মেরামত করিয়া কিছু বাড়তি আয় হইতেছে।

'দেখ, প্রকাশ,' তারাপদ গম্ভীর ভাবেই কহিল, 'আমাদের এই আয়োজন যত সামান্যই হোক্ একেবারে তুচ্ছ নয়। যে মহাসংগ্রামের জন্য আমরা তৈরি হচ্চি, এ কাজ তার পক্ষে অপরিহার্য্য। ক্যাপিটেলিজমের বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত খাটিয়েদের মিলিত হ'তে হবে। সব ওয়ার্কারের এই একমাত্র মন্ত্র, এই একমাত্র কর্ত্তব্য। পুঁজিবাদ চুরমার করতে হলে, শ্রেণীভেদ দূর করতে হলে, প্রোলিটারিয়েন ষ্টেট গড়তে হলে…'

'সে তো ঠিক কথা', বাহুল্য ভয়ে প্রকাশ তাড়াতাড়ি সায় দিয়া কহিল: 'আমরা যারা বস্তিতে বাস করিয়া, তারা এই শ্রেণীভেদের অপমান…'

'তোর বস্তির খোলার ঘরে', তারাপদ বাধা দিয়া কহিল 'আর আমার এই পোড়ো দালানটাতে তফাৎ কতটুকু শুনি! আস্ত কাঁথা আর ছেঁড়া কম্বলে পার্থক্য কতখানি? আমার বাবা আমাদের বংশের জাঁক করেন; তার সমান আয়ের লোকের চাইতে নিজেকে সম্ভ্রান্ত মনে করেন। এই পার্থক্য বোধ ওকে না দিতে পারে স্বাচ্ছন্দ্য, না দেয় শান্তি। এই মূঢ়তা শুধু বাবার নয়, এই মূঢ়তা সমাজে ব্যাপক। তাইতো আমাদের প্রোলিটারিয়েটদের একতা আসতে এত দেরি হচ্চে। সবাই আমরা সবার চেয়ে আলাদা মনে করি; অন্যদের পেছনে ফেলে নিজে উঁচু ধাপে উঠে যেতে চাই। এই তো আমাদের দুর্ব্বলতা। পুঁজিবাদী এরই সুযোগ নিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখে। আমরা সব বঞ্চিত খাটিয়েরা যেদিন বুঝতে শিখব—আমরা সবাই এক আর ওরা আলাদা, ওরা শত্রু, যেদিন সব মজদুর লাল ঝাণ্ডার তলায় মিলিত হয়ে একযোগে…কে, সুষি? চা এনেচিস? নিয়ে আয়।'

সুষমা দুই কাপ চা দুই হাতে লইয়া কিছুটা সলজ্জিত মুখে ঘরে ঢুকিল। তর্কের এই উত্তুঙ্গ অবস্থায় ভিতরে ঢুকিবে কি না বুঝিতে না পারিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, অভয় পাইয়া আগাইয়া আসিল। ইতিমধ্যে প্রকাশ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, প্রথমেই তাহার হাতে এক কাপ দিয়া অপর কাপটি সে তারাপদর টেবিলের কাছে লইয়া গেল।

'উমি কোথায়? চা তৈরির কাজটা ওকে দিলেই

পারিস। অত আলসেমি ভালো নয়।' তারাপদ পেয়ালা গ্রহণ করিয়া সহানুভূতির সঙ্গে কহিল।

'উমা সিনেমায় গেছে।'

'সিনেমায়! কার সঙ্গে?'

'মেজদা নিয়ে গেছেন।'

'মেজদা বাড়ী এসেচে নাকি?'

'দুপুরেই এসেচেন।'

'কিছু টাকা বোধ হয় হাতে এসেচে। সঙ্গে সঙ্গেই ওড়াচ্ছে।'

সুষমা ইহার কোনও জবাব দিল না, দু' এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করিয়া সে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

প্রকাশ কতক্ষণ হইতেই কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, এতক্ষণেও সে পেয়ালায় চুমুক দেয় নাই। সুষমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গলা সাফ করিল। কহিল, 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেবেন বলেছিলেন। বইটি পাওয়া গেছে কি?'

সুষমা দরজার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল, থামিয়া পড়িল। ফিরিয়া কহিল, 'না, এখনও খুঁজে রাখা হয়নি। কাল দুপুরে খুঁজে রাখব।'

'আমার কিছু তাড়াতাড়ি নেই।' প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া কহিল: 'কি জানেন, মূর্খ মানুষ, একটু লেখাপড়া করে ভদ্র সমাজের উপযুক্ত হতে চাই। আমার পেছনে তো কোনও কাল্চার নেই, যেটা আপনাদের কাছে সহজেই এসেচে, তাও আমাকে কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়। আপনাদের সংস্পর্শে না এলে তাও হয় তো· আচ্ছা দেখুন, আপনাদের উপরতলাটা শুনচি খালি হচ্ছে?' সুষমাকে চৌকাঠের উপর দিয়া পা বাড়াইতে দেখিয়া প্রকাশ তাড়াতাড়ি কহিল।

'খালি হচ্ছে? আমি জানিনে তো?'

'দয়া করে একটু খোঁজ নেবেন।' প্রকাশ প্রায় আবেদনের সুরে কহিল: 'কোথায় পড়ে আছি, জানেন তো? একেবারে হাঁপিয়ে উঠেচি। অথচ কিছু করবার উপায় নেই। যুদ্ধের মরশুমে কলকাতা সহরে পাঁচটা চাকরি জোটানো গেছে, কিন্তু একটা বাড়ি জোটাতে হিমসিম খেতে হয়। অথচ যেখানে আছি, সেখানে আর কিছুকাল বাস করলে আমি পাগল হয়ে যাব। একটু ভদ্রভাবে থাকবার অধিকার সকলেরই আছে, কি বলেন?'

প্রকাশের বিনয় ও আচার আচরণ সুষমার কাছে ভদ্রজনোচিতই মনে হয়। শুধু তাড়াতাড়ি ভদ্র হইবার এই বাড়াবাড়িটা কিছুটা বালকোচিত এবং হাস্যকর। পোষাকে কথাবার্ত্তায় পয়সা খরচের উদারতায় সে ভদ্রতার লক্ষণগুলি বড় বেশি স্পষ্ট করিয়া তোলে। বেচারি যে বস্তিবাসী ইহা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে না, এ-কথা ভাবিয়া সুষমার একটু করুণাও হয়।

'আমি খোঁজ নেব' বলিয়া আর কথা না বাড়াইয়া সুষমা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

'তোকে পরশু যে বইটা দিয়েছিলাম, সেটা পড়া হয়েচে?' সহসা তারাপদ প্রশ্ন করল।

'বই! কোন্ বই!' চম্‌কাইয়া দরজার দিক হইতে প্রকাশ মুখ ফিরাইল। 'ওঃ, "মার্ক্সীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি"-র কথা বলচ? না, ভাই, ওটা পড়িনি। সত্যি বলতে কি, বইয়ের নামটা পড়ে তার পড়ার মতো সাহস হচ্চে না। রাগ করো না, ভাই। যার যার বুদ্ধির অনুপাতে বই দিতে হবে তো। তুমি যে-সব কঠিন কথা বোঝ, আমি কি তা বুঝি? তোমার ব্রেন্ আর আমার ব্রেন্ এক ক্লাসের নয়। শত হোক, তুমি যে বংশে জন্মেচ, ইন্টেলেক্চুয়াল বৃত্তি তার জন্মগত অধিকার। আমাদের শ্রেণীর পক্ষে…'

'দেখ্, প্রকাশ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না!' তারাপদ বিরক্তির সঙ্গে কহিল 'এই শ্রেণীভেদের কম্‌প্লেক্সটা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে না পারলে তোর উদ্ধার নেই। জগতে মাত্র দুই জাতি আছে—এক শোষক ক্যাপিটেলিষ্ট, অন্য শোষিত প্রোলিটারিয়েট। এ ছাড়া অন্য শ্রেণীভেদ নিছক কুসংস্কার। তার কোনও ডায়ালেকটিক ভিত্তি নেই। বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিকের বই পড়ে সমাজের মূল তত্ত্বটা ভুললে চলবে না।…এই জন্যই তোর উপন্যাস পড়ায় আমার আপত্তি। নইলে গোর্কির "মাদারের" মতো বই পড়লে কোনও আপত্তিই…'

'তোমার বোনের কাছ থেকে তার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আমি পড়িনি মনে কর ?' প্রকাশ সগর্ব্বে কহিল। 'বেশ ভাল। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি ভাই, "দুর্গেশনন্দিনী" পড়ে এমন চমৎকার লেগেচে যে বঙ্কিমচন্দ্রের...'

'ডায়ালেকটিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা না করলে তোর এই ছেলেমানুষি রোমান্টিসিজম্‌ কিছুতেই দূর হবে না।' হতাশার সঙ্গে এই কথা বলিয়া তারাপদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, এবং পুস্তকের স্তূপ ঘাঁটিয়া কাস্তে ও হাতুড়ি চিহ্নিত এক বলিষ্ঠ আকারের কেতাব উদ্ধার করিল।

'নে, এটা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেল।' বলিয়া ধন্বন্তরী ডাক্তারের বড়ির মতো সে প্রকাণ্ড বইটা ভীত ও অনিচ্ছুক প্রকাশের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

প্রকাশের প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাহাকে এমন বিপদে ফেলিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন আর উপায় কি ?

চার

সেদিন দুপুরবেলা দিদির কাছে একটা নতুন অজুহাত উপস্থিত করিয়া উমা তাহার প্রতিবেশী বন্ধু রমাদের বাড়ি আসিল। রমারা সচ্ছল অবস্থার লোক। তিন পুরুষ ধরিয়া রমাদের বাড়ির লোকেরা জাহাজ কোম্পানীর ষ্টিভেডরি করিতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে লোকবল ও ধনবল কোনওটারই অভাব নাই।

কাছের একটা মেয়ে-স্কুলের নিচু ক্লাসে এক সময় রমা ও উমা উভয়েই একত্র পড়িয়াছে, এই সূত্রেই সখ্যের আরম্ভ। উমা মিশুক, হাসিখুসি লোক। রমা এবং রমার অল্প-বয়সী কাকীমারা সবাই উহাকে পছন্দ করে। তার গান শোনে, কাপড় জামা গহনা সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করে, তাস বা ক্যারম খেলে; কখনও বা তাহাকে থিয়েটার, সিনেমায় লইয়া যায়। রমাদের বাড়ির সচ্ছলতায় আরাম উমার বড়ো ভালো লাগে। এখানে আসিলে সে যেন স্বাভাবিক বোধ করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটা সহজাত শত্রুতা আছে।

'এই যে, নিজেই এসে পড়েচিস। আয়, আয়। অনেকদিন বাঁচবি।' বলিয়া রমা বসার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া খুশিভরে উমার হাত ধরিল।

উমা মাত্র ভিতরের বারান্দায় উঠিয়া আসিয়াছিল। প্রসন্নমুখে কহিল, 'তা তোকে কে বল্‌লেরে, রমা ? আজ-কাল জ্যোতিষ শিখচিস নাকি ?'

'তা আর শিখচি না।' রমা সকৌতুকে কহিল: 'জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে, যাকে ডেকে পাঠাবে ভেবেছিলে, ঝি পাঠানোর আগেই সে যদি সশরীরে এসে হাজির হয়, তবে অতিথি অনেক দিন বাঁচে।......আয়, শীগ্‌গির আয়। ভেতরে চল।'

'কি ব্যাপার !' রমার উচ্ছ্বাসের কারণ না বুঝিয়া উমা চোখের পাতা উর্দ্ধায়িত করিল, এবং রমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের ড্রইং রুমে প্রবেশ করিল।

'বস্‌', একবার সবিস্ময়ে নির্জ্জন ঘরের চারদিকে চাহিয়া রমা বন্ধুকে একটা প্রকাণ্ড সোফার উপর ঠেলিয়া বসাইল। 'আমি এই এলাম বলে। দেখি, ছোট কাকীমা শুয়ে পড়েছেন কি না। বিছানায় গিয়ে পড়লে তার আর এক মিনিটও নয়।' বলিয়া ইঙ্গিতে নিদ্রা বুঝাইয়া দিয়া রমা দ্রুত ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

সাধারণতঃ রমার ও রমার কাকীমাদের শোওয়ার ঘরেই তাহাদের আড্ডা বসে। ড্রইং রুমের পোশাকী আবেষ্টনে মজলিশ জমে না। কিন্তু এ ঘরে বসিলে উমা যেন সমৃদ্ধির স্পর্শ অতি স্পষ্ট করিয়া অনুভব করে। দামি সোফা কৌচ। নরম রঙিন কার্পেট, দেওয়ালের অয়েল-পেন্টিং, কাচের বুককেসে চকচকে বাঁধান বই, বিচিত্র কারুমণ্ডিত কাঠের ষ্ট্যাণ্ডে মর্ম্মর ও অ্যালাবেষ্টারের ষ্ট্যাচু-য়েট, এ সমস্তই তাহার মনে একটা সম্ভ্রম ও তৃপ্তির উদ্রেক করে। 'আমাদেরও যদি এমন একটা বসার ঘর থাকত!' মনে মনে সে কামনা না করিয়া পারে না।

'না, কেউ জেগে নেই।' রমা মিনিট কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল। উমার পাশে বসিয়া পড়িয়া

উমার হাত দুটি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সে বলিল, 'কেন তোকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম, জানিস ?'

'তা আমি কি করে জানব ?' উমা সখীর আগ্রহাতিশয্যে পুলকিত হইয়া কহিল : 'আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ গণৎকার ছিল বলে জানিনে। তবে মনে হচ্চে, অনেক কিছুই মনে হচ্চে। এই যেমন, তোর বর, ঠিক হচ্চে, তার সম্বন্ধে আমার......'

'অসভ্য মেয়ে কোথাকার।' বলিয়া রমা কৃত্রিম বিরাগের সঙ্গে উমার হাত দু'টি ঠেলিয়া দিল। 'বরের জন্ত তোরই খুব লোভ হয়েচে দেখচি। শোন, তবে কারণটা বলি। কিন্তু অনুরোধ ঠেলতে পারবে না, আগেই বলে দিলুম। যারা গান জানে, তারা এমন ঢঙ্গা হয়...'

'ওরে সর্ব্বনাশ !' উমা কৃত্রিম আতঙ্কের সঙ্গে কহিল : 'গান গাইতে হবে নাকি ?'

'হ্যাঁ, গাইতে হবে।' রমা গম্ভীর হইয়া কহিল।

'এই দুপুর বেলায়! তা ছাড়া, তোর মা কাকীমারা সব ঘুমিয়েচেন ; চিলের গলা শুনে...।'

'হয়েচে, হয়েচে লো, নেকী। নিজের গলার আর সুখ্যাতি করতে হবে না। সুখ্যাতি যা করবার, তা আমিই করে বেড়াই...।'

'তোর মত কি আর বন্ধু হয়।' উমা সকৌতুকে কহিল : 'তোর হুকুমে সব করা যায়, গান গাওয়া কোন ছার! কি গাইতে হবে ?'

'সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা', রমা খুশি হইয়া উঠিল। 'সেই যে—"রোদন-ভরা এ বসন্ত।"—সব চেয়ে তোর এ গানটাই আমার ভালো লাগে।'

'কিন্তু হঠাৎ রোদন-ভরার কথা মনে পড়ল কেন ? আর তা এতই কি জরুরি যে, শোনবার জন্ত ঝি পাঠাবার উদ্যোগ হচ্ছিল ?'

'ওটা আমার এখনই শোনা চাই।' রমা গম্ভীর হইয়া কহিল : 'কিন্তু আর কৈফিয়ৎ চাইলে মার খাবি। এবার গিয়ে ঐ অর্গ্যানটা খুলে নাও। যত ভালো ক'রে পার, গানটা আমাকে শুনিয়ে দাও। এ ঘরে আমিই একমাত্র শ্রোতা, মনে রেখো ; তোর নার্ভাস না হলেও চলবে। উঠলি ?......'

'ভালো গাইলে কি পুরস্কার পাওয়া যাবে ?' উমা প্রশ্ন করিল।

'তা আগেই বলতে চাই নে।' রমা ভারিক্কি ভাবে কহিল : 'কিন্তু আর দেরি করলে কি পুরস্কার দেব, তা হাতের এ ছুটো আঙুলের দিকে তাকালেই বুঝতে...'

'কোনই কষ্ট হচ্চে না।' বলিয়া উমা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এ গানটা উমা ভালোই গায়। প্রথমে স্বরলিপি হইতে সুর উঠাইয়া পরে উমা তাহা রেডিও হইতে সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু রমা ও রমার কাকীমাদের মতে, রেডিয়োর প্রচলিত গায়ক-গায়িকাদের চেয়ে এ গানটা তাহার ভালো হয়। কিন্তু এই স্বীকৃতি এই বাড়ি হইতে ইতিপূর্ব্বেই এতবার পাওয়া গেছে যে, আরেকবার, বিশেষতঃ একা বন্ধু রমার কাছে মাত্র গাহিয়া তাহার পরীক্ষা দেওয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু বড়লোক বন্ধু রমার বিভিন্ন মর্জ্জি উমাকে মানিয়া লইতেই হয়। এইবারও মানিয়া লইল।

বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গানটা মিনিট দশেক গাহিবার পর উমা অর্গ্যানের ঘাট কেবলমাত্র সমাপ্তি-সূচক টিপুনিগুলি দিয়াছে, এমন সময় একটা সবল হাত-তালির শব্দ শুনিয়া সে সবিস্ময়ে রমার দিকে চাহিল, কিন্তু সেখানে ইহার উৎপত্তি আবিষ্কার না করিয়া পাশের ঘরের পর্দ্দার দিকে ঈষৎ বিরক্ত, ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টি প্রেরণ করিল। স্পষ্ট বোঝা গেল, কে বা কাহারা পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া এতক্ষণ গান শুনিতেছিল, গান সমাপ্ত হওয়া মাত্র হাততালি দিয়া উঠিয়াছে।

'কে, ছোটকাকীমা ?' উমা অর্গ্যানের টুল হইতেই রমাকে প্রশ্ন করিল।

'না।'

'তবে ?'

'দেখাচ্চি।' বলিয়া রমা সোফা হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে ঢুকিল, এবং পরক্ষণেই তার পিসতুত ভাই সিনেমা-ডিরেক্টর নরেন বর্দ্ধনের হাত ধরিয়া প্রায় হিড়হিড় করিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া আসিল। কৃত্রিম তিরস্কারের সঙ্গে কহিল, 'তুমি এমন চোর! পরের বাড়ির মেয়েদের

গান এমন ফাঁকি দিয়ে শুনে নাও, এ কি রকম আচরণ! তারপর বল, বাজি হেরেছ কি না। তোমার হাততালি তোমার পরাজয় ঘোষণা করেছে, ন'দা; এখন প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে চেষ্টা করো না।'

'না, তা করব না। সত্যিই হেরেছি।' বলিয়া নরেন উমার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে নমস্কার জ্ঞাপন করিল। 'একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হলো বলে মাফ্ করবেন, উমা দেবী। আজ এদের বাড়িতে এসেই রমার সঙ্গে আমার একটা বাজি ধরাধরি হয়ে গেছে। আমার নতুন ফিল্মে "রোদন-ভরা" গানটি একজন বিখ্যাত গায়িকা প্লে-ব্যাক্ করেছেন। ছবি রিলিজের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে রেকর্ডটিও রিলিজ হবে। কিন্তু একটা রেকর্ড আমি আগাম নিয়ে এসেছি। রেকর্ড শুনে আপনার বন্ধু বললেন, উমা এ গানটা এর চেয়ে ভাল গায়। আমি বললাম, তা বৈ কি। এ গান গেয়েচে বিখ্যাত গায়িকা অমুক। তখনই বাজি ধরাধরি হয়ে গেল; পাছে আপনি আমার সামনে গাইতে রাজি না হন, বা প্রতিযোগিতার কথা শুনে আপনার খাঁটি ফর্ম্ম প্রডিউস করতে না পারেন এজন্যই এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিতে হয়েছে। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

'আর বাজি হারা সম্বন্ধে?' রমা প্রশ্ন করিল।

'সম্পূর্ণ হার স্বীকার করছি।'

'বাজি হারলে কি দেওয়ার কথা আছে।

'দু' ডজন সুইস পেষ্ট্রি, দু'ডজন-মুর্গি প্যাটিস।'

'কখন পাচ্ছি?'

'গাড়ি প্রস্তুত। যদি রাজি থাকো, এখনই নিউ মার্কেট থেকে নিয়ে আসতে পার।'

'খুব প্রস্তুত।' রমা কহিল। 'তোমাদের সিনেমা-অলাদের কথায় বিশ্বেস নেই। দেরি করলে মারা যেতে পারে।—চল্ উমা, তুইও চল্।'

'আমি!' উমা সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল: 'আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি।'

'তা হলোইবা। কতক্ষণের আর ব্যাপার। আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট বৈ তো নয়। বাড়ির কে আর জানছে বল।' বলিয়া রমা উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কাপড়টা বড় ময়লা, আমি বদলে আসি। তুমি তোমাদের বিখ্যাতার রেকর্ডটা উমাকে একটু শুনিয়ে দাও না ন'দা। আমার পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না।'

রমা কাপড় বদলাইবার জন্ত প্রস্থান করিবার পর নরেন কিন্তু সহসা রেকর্ড বাজাইবার কোনও উদ্যোগ করিল না। প্রশংসার দৃষ্টিতে উমার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া সে কহিল, 'সিনেমায় সো দেবার কথা কি আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন?'

'না।' উমা কহিল।

'কি গলার দিক দিয়ে, কি চেহারার দিক দিয়ে ফিল্মে অভিনয় করবার পক্ষে আপনার সকল রকম উপযুক্ততা আছে।—বাড়িতে আপত্তি হবে বুঝি?'

'হাঁ, নিশ্চয়ই হবে।' উমা প্রসঙ্গটায় কিছুটা ভীত এবং কিছুটা পুলকিত হইয়া কহিল। 'আমাদের বাড়ির লোকেরা খুব সেকেলে মানুষ। তারা এ সব খুব মন্দ…।'

'কত ভদ্র বাড়ির সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তো আজকাল ফিল্মে নামচেন।' নরেন উমার দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া কহিল: 'স্কুলে শিক্ষয়িত্রী-গিরী, অফিসে কেরাণী-গিরি করার চেয়ে এ কাজ মন্দ কি? মেয়েদের যদি কাজ করতেই হয়, তবে যেটাতে আয় বেশি সেটাই তো করা ভালো।…আপনি বাড়ির লোকদের একবার সাউণ্ড করে দেখতে পারেন। আমার হাতে একটা কাজ আছে। শীগগিরই হয় তো আমার একজন হিরোয়িনের দরকার হবে। আপনাকে যদি পাওয়া যায়…আপনি কখনও স্কুলে প্লে করেচেন?…'

'খুব। কিন্তু সে হলো ইস্কুলের প্লে। তাতে কি হবে?' উমা কহিল।

'নিশ্চয়ই হবে।' নরেন উৎসাহ পাইয়া জোর দিয়া কহিল: 'এ অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোন ক্ষতি হতো না। আপনাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনই আপনার সম্ভাবনা আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। কথাটা ভেবে দেখুন। যদি গার্জ্জিয়ানকে রাজি করাতে পারেন…।'

'ওরেঃ সর্ব্বনাশ! তা হবে না।' উমা কহিল, 'একেবারে মেরে ফেলবে। তা ছাড়া, আমি ওসব হতেও চাইনে।' উমা সাবধান হইয়া উঠিল।

'তা তো ঠিকই।' নরেনও হুঁসিয়ার হইল। 'নিজের ইচ্ছে না থাকলে তো কথাই নেই। গার্জ্জিয়ানদের প্রশ্ন নিজের বিশেষ আগ্রহ থাকলে তবেই ওঠে। আমি শুধু এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে, সিনেমা লাইন অন্ত লাইনের চেয়ে কিছু নিন্দনীয় নয়, অথচ অনায়াসেই মাষ্টারির দশ-বিশগুণ আয়···হয়ে গেল সাজসজ্জা, রমাদেবী। সামান্ত কুড়ি-পঁচিশ মিনিটও লাগে নি···?'

'তা বৈ কি।' রমা ফোঁস্ করিয়া উঠিল। 'নিজেদের যেন সাজ করতে কম লাগে। আজকাল ছেলেরা তোমরা যা সাজ, তিনটে মেয়েতেও তা সাজে না।' বলিয়া সে নরেনের সাজের দিকে নজর দিল।

নরেন সুপুরুষ লোক। মুখটা একটু গোল ধরণের; নাকের তলায় গোঁফের রেখায় সযত্ন পরিচর্য্যার লক্ষণ আছে। গায়ে টাই-হীন শার্টের উপর গ্যাবার্ডিনের কোট; পরণে নীলচে-কর্ড্রয়ের ট্রাউজার্স। পায়ে ডুয়াটা সোলের মোটা দামি জুতো। হাতের আঙুলে দু'তিনটা গ্রহ-রত্নের আংটি। চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা।

'তোমরা যেমন সবলা হয়ে উঠেছ', নরেন সকৌতুকে কহিল, 'তাতে ক্রমে সাজবার ভারটা হয় তো পুরুষদেরই নিতে হবে। কিন্তু এখনও তার বাকি আছে।···তবে আর দেরি কেন, উঠে পড়া যাক্···চলুন, উমা দেবী। কতক্ষণের আর ব্যাপার। অ্যাক্‌সিডেন্ট না করে' আমি খুব জোরে গাড়ি চালাতে পারি···'

উমা জানে, দিদি শুনিলে রাগ করিবে, কিন্তু মোটরের জন্ত তাহার দুর্ব্বলতাও প্রচুর। অন্ত যাত্রিদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ট্রামে দাঁড়াইবার প্রয়োজন-হীন যথেচ্ছ ছুটিয়া বেড়াইবার জন্ত যে আকাঙ্ক্ষা তাহার অবচেতন মনে সুপ্ত থাকে, সুযোগ পাইলে তাহা দুর্ব্বাধ্য হইয়া ওঠে।

নরেনের নিচু সিট্রোয়ঁ-গাড়ির সামনের আসনেই তিনজনে আঁটিয়া গেল।

রমা কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কহিল, 'তোমার সঙ্গে যাওয়া এক মস্ত বিপদ।'

'কেন, আমার দোষ কি?' নরেন প্রশ্ন করিল।

'যেই দেখবে, সেই ভাববে, আমরা সিনেমা ষ্টার।'

'তাতে ক্ষতি কি।' নরেন অবিচলিত ভাবে কহিল। 'আমি তো তোর বন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, মেয়েদের অন্ত আর পাঁচটা প্রফেশানের চেয়ে সিনেমা-অভিনেত্রীর প্রফেশান এমন কিছু খারাপ নয়, অথচ এতে আয়···,

'কত আয়?' রমা প্রশ্ন করিল। 'ধর, উমা যদি সিনেমায় নামে, কত টাকা পাবে? আমার কথা ছেড়ে দিলাম। আমাকে কেউ পছন্দ করবে না জানি···'

'ওকে প্রথমেই একেবারে হিরোয়িন করে নামানো যায়।' নরেন সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল: 'তা হলে প্রথম ছবিতে, ধর, মাসে পাঁচ শো। তারপর উৎরে গেলে, পরের ছবিতে, আট, দশ, পনেরো, কুড়ি যে কোনও অ্যামাউন্ট্ হ'তে পারে···'

'কি রে উমা নাম্‌বি?' রমা রগড়ের সুরে কহিল। 'যদি নামতিস্, তবে ওদের খ্যাতনামা গায়িকার মতো ওদের খ্যাত নামা তারকাদের জ্যোতিও নিবু নিবু করে' দিতে পারতিস, এ আমি জোর করেই বলতে পারি।'

'তা আমিও পারি।' নরেন কহিল। [ক্রমশঃ

গুপ্ত পত্রাবলী

দুইটী প্রাণীর গোপনীয় পত্রাবলী। ৫০খানি পত্রে প্রেম ও প্রণয়ের দুর্লভ সংগ্রহ। অল্প কয়েকখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আজই অর্ডার দিন, মূল্য ২৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রেম চক্কর, অমৃতসর।

এথেন্‌স্‌

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ইয়োরোপে গ্রীস্‌ নামের একটা মোহ আছে। ইয়োরোপ মহাদেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, জ্যোতিষ, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় গ্রীস দেশে। কেবল সূত্রপাত নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগের প্রকৃত উন্নতিও হইয়াছিল গ্রীসে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্রে রোমের অসাধারণ পটুতা ছিল, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহার দান নগণ্য। রোমের মনীষীদিগের চিন্তা গ্রীক চিন্তাধারাই প্রভাবিত ছিল। গ্রীসের সীমা ভৌগোলিক গ্রীসের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এসিয়া মাইনর ও তাহার সন্নিহিত ভূমধ্যসাগরস্থিত দ্বীপাবলি পূর্ব্বে যবন (Ionia) দেশ নামে পরিচিত ছিল। গ্রীকগণ গ্রীস হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সিসিলি দ্বীপ ও ইতালির দক্ষিণ উপকূলে গ্রীকগণ যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা বৃহত্তর গ্রীক (Magna Grecia) নামে প্রাচীন কালে পরিচিত ছিল। এই সমস্ত উপনিবেশেই গ্রীক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয়। এ পর্য্যন্ত আমরা যে সমস্ত দার্শনিকের পরিচয় দিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই এই সমস্ত উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন যাঁহাদিগের কথা বলিতে হইবে, তাঁহাদিগের সহিত এথেন্‌স্‌ নগরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য গ্রীক-দর্শনের পাঠকগণের এথেন্সের ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এথেন্সের প্রাচীন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া পরে এথেনীয় দার্শনিকগণের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

এথেন্‌স্‌ ছিল এটিকা-রাষ্ট্রের রাজধানী। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে এটিকা কৃষিপ্রধান ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মাত্র ছিল—রাজধানী এথেন্‌স্‌ ছিল একটি ক্ষুদ্র নগর। অধিবাসী শিল্পজীবী ও কারিগরগণ তাহাদের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিত। পল্লীবাসী কৃষিজীবিগণ দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত ছিল। হোমারের সময় অন্যান্য গ্রীক রাজ্যের মতই এটিকায় রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। কালক্রমে শাসনশক্তি রাজার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, এবং রাজপদ বিলুপ্ত না হইলেও রাজার কর্তৃত্ব শুধু রাজ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রীয়ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ফলে দেশে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে; অবশেষে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সংস্কারক, সোলনের (Solon) আবির্ভাব হয়। ৫৯৪ অব্দে তিনি রাজা (archon) নির্ব্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা দমন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। সোলনের চেষ্টায় অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচার নিবারিত হয় এবং শাসনতন্ত্র অনেক পরিমাণে প্রজাতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। শান্তিস্থাপন করিয়া সোলন দেশভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু তাঁহার দেশত্যাগের অব্যবহিত পরেই পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ৫৬০ খৃঃ পূঃ অব্দে পিসিস্ট্রেটাস (Pisistratus) শাসনযন্ত্র অধিকার করিয়া রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হন। অন্যায় উপায়ে যাহারা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিত, গ্রীসে তাহাদিগকে বলা হইত tyrant। এই শব্দের আধুনিক অর্থ "অত্যাচারী", কিন্তু অন্যায় উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিলেও অনেক tyrant ন্যায়ানুগত ভাবেই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এথেন্‌স্‌-এ tyrantদিগের রাজত্ব ৫৬০ হইতে ৫১০ অব্দ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ৫১০ অব্দে Pisis-tartus এর পুত্র হিপিয়াস ও হিপারকাস-এর শাসনে জনসাধারণ উত্যক্ত হইয়া বিদ্রোহ অবলম্বন করে এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করে; তখন Cleisthencs-এর অধীনে এথেন্‌স্‌এ প্রকৃত প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পারস্যসাম্রাজ্য প্রবলশক্তিশালী হইয়া উঠে এবং যবন দেশের গ্রীক রাষ্ট্রগুলি এক এক করিয়া পারস্য কর্তৃক বিজিত হইতে থাকে। ৫০০ অব্দে যবন রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইয়া পারস্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। এথেন্‌স্‌ তখন যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য দিয়া স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করে। ছয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরে পারস্যপতি দরায়ুস্‌ সমগ্র যবন দেশ জয় করিয়া এথেন্‌স্‌কে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। পারসীক সৈন্য সমুদ্র পার হইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করে, কিন্তু আক্রমণ ব্যর্থ হয়। দুই বৎসর পরে পারসীক সৈন্য আবার গ্রীসে গিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু মারাথনের যুদ্ধে ১০ সহস্র এথেনীয় সৈন্য ৬০০ প্লেটীয় সৈন্যের সাহায্যে এক লক্ষ পারসীক সৈন্য পরাস্ত করে। ইহার ফলে এথেন্সের প্রতিপত্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র গ্রীসে এথেন্‌স্‌ই প্রধান রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। চিত্রকরগণ চিত্রে এবং কবিগণ কাব্যে এথেন্সের

গৌরব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে দরায়ুসের মৃত্যু হয় এবং দশ বৎসর যাবত গ্রীসে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ৪৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে দরায়ুসপুত্র করাক্সিস (x'erxes) আবার গ্রীস আক্রমণ করেন। দশ লক্ষ সৈন্যসহ সমুদ্র পার হইয়া তিনি গ্রীস দেশে উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের ১২০০ যুদ্ধজাহাজ গ্রীস অভিমুখে যাত্রা করে। থারমপিলি ক্ষেত্রে ৭০০০ গ্রীক সৈন্য স্পার্টার রাজা লিওনিদাসের অধীনে বিপুল পারসীক বাহিনীর গতিরোধে অগ্রসর হয়। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় দিনে তাহাদিগের অধিকাংশই পশ্চাৎপদ হয়। তখন লিওনিদাস তাহার ৩০০ স্পার্টান সৈন্য ও ৭০০ থেসপিয়ান সৈন্যদিগের হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সকলেই নিহত হয়। ইহার পরে করাক্সিস এথেন্স্ অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা সমগ্র নগর ভস্মসাৎ করেন। কিন্তু তাঁহার নৌবাহিনী সালামিসের যুদ্ধে গ্রীক নৌবাহিনী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হয়। করাক্সিস গ্রীস ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তাহার সেনাপতি মার্দোনিয়াস আসিয়া পুনরায় এথেন্স অধিকার করেন; ইহার পরে প্লেটিয়ার যুদ্ধে পারসিকবাহিনী ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়। ইহার ফলে করাক্সিসকে গ্রীস বিজয়ের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয়।

পারসিকগণকে গ্রীস হইতে বিতাড়িত করিয়া এথেনিয়গণ যবনরাষ্ট্রগুলিকে পারস্যের অধীনতা হইতে মুক্ত করে। এই ব্যাপারে স্পার্টা কোনও অংশই গ্রহণ করে নাই। এই জন্য পারস্যের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়, এথেন্সই তাহার নেতৃত্ব লাভ করন। নৌশক্তির সাহায্যে এথেন্স্ সংঘ-বহির্ভূত অন্যান্য রাষ্ট্রের উপরও কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। এইরূপে এথেনিয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়

সালামিসের যুদ্ধের পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসর এথেনিয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। পেরিক্লিসের পূর্ব্বে এথেনসের গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না। গ্রীসের অনেক নগরই এথেন্স্ অপেক্ষা উন্নত ছিল। কলা ও সাহিত্যে তাহার দান নিতান্ত নগণ্য ছিল। কিন্তু পারস্যের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাহার অর্থসম্পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং নানাদিকে এথেনিয় প্রতিভার স্ফুরণ হয়। করাক্সিস এথেন্সের ধ্বংস করিয়া গিয়াছিলেন, এক্রোপলিসের (Acropolis) উপরিস্থ মন্দিরগুলি পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর বিধ্বস্ত নগরীর পুনর্গঠনের জন্য বড় বড় স্থপতির আবির্ভাব হইল; বড় বড় ভাস্কর আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। প্রসিদ্ধ ভাস্কর Phaedius রাষ্ট্রকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বহু দেবদেবীর অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে যে সমস্ত মন্দির ও হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখন পর্য্যন্ত দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

এই সময়ে গ্রীক সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। Aeschylusi গ্রীক tragedyর সূত্রপাত করেন, তাঁহার পরে Sophocles এবং Euripides আবির্ভূত হইয়া নাট্যশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি বিধান করেন এবং পরিহাস রসিক কবি Aaistophenes তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় মতের উপর শ্লেষবাণ বর্ষণ করেন।

দর্শনশাস্ত্রে এথেনসের দান দুইটি—সক্রেতিস ও প্লেটো। আরিষ্টটল এথেন্স-এ জন্মগ্রহণ না করিলেও, এথেন্সেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাকেও এথেন্সের দান বলা যাইতে পারে। এথেন্স্ই তাঁহার অধ্যাপনার পীঠস্থান ছিল। এই তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের দানের জন্য জগৎ এথেন্স্-এর নিকট কৃতজ্ঞ।

এথেনীয় ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল যুগ পেরিক্লিসের যুগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য পেরিক্লিসকে দেবরাজ জিউসের সহিত তুলনা করা হইত। তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে এতাদৃশ গুণশালী রাষ্ট্রনেতা অধিক আবির্ভূত হন নাই।

পেরিক্লিসের যুগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সত্বরই স্পার্টার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ২৭ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর এথেন্স স্পার্টা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও এথেন্সের প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। এক সহস্র বৎসর যাবৎ এথেন্সে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আলেকজান্দ্রিয়া এথেন্সকে অতিক্রম করিয়া গেলেও, দর্শনে কোনও দেশই এথেন্সকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এক সহস্র বৎসর যাবৎ দার্শনিক জগতে প্লেটো ও আরিষ্টটল অবিসংবাদিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ৫২৯ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট ধর্ম্মান্ধ জাষ্টিনিয়ান এথেন্সের দর্শনের চতুষ্পাঠীগুলি বন্ধ করিয়া দেন। ইহার ফলে অজ্ঞানান্ধকারে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

নাগপাশ

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

১৩৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। তারিখটা সেদিন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। মাসখানেক প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে ঝলসে দিয়ে সহসা সেদিন বাংলার বুকে সন্ধ্যার দিকে এক পশলা বর্ষা হোল। আবহাওয়ার গতি ফিরে গেল।

মফস্বল সহর। স্থানীয় উকীল ভদ্রেশ্বরবাবু জন-প্রিয় ব্যক্তি। জন-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন বলে জন-সেবক বলে খ্যাতি আছে। সন্ধ্যার পর তাঁর বৈঠকখানায় এ-পাড়া ও-পাড়ার শিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ়গণ প্রায়ই সমবেত হন। বিশেষতঃ শনি রবিবারে কলিকাতা প্রবাসী চাকুরিয়ার দল।

সেদিনও সন্ধ্যার পর অনেকে এসে জুটেছিলেন। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একদল তর্ক বিতর্ক করছিলেন। ঘরের অন্য প্রান্তে বসে কয়েকজন যুবক তাস পিটতে পিটতে মাঝে মাঝে তর্কে যোগ দিচ্ছিলেন।

একজন বললেন, "ভারতের মানচিত্র এবং মনের গতি বড় দ্রুত বেগে পরিবর্ত্তনের পথে চলেছে।"

তাস খেলতে খেলতে সুনীল বললেন, "এই দ্রুততাই জীবনের লক্ষণ।...এই মারলুম গোলাম! ব্যস্ ডবল হ্যাণ্ড! আমাদের রেড সেট্।"

ক্ষণেকের জন্ম উল্লাস-মত্ততার হৈ চৈ। তারপর পুনশ্চ খেলারম্ভ হোল। অনিল বললেন, "কিন্তু যাই বলুন, নারী নির্য্যাতন, পরস্ব হরণ, পরপীড়নের দ্বারা কোন বিরাট রাষ্ট্র গঠন করা যায়, এটা বিশ্বাস করেন ভদ্রেশ্বর দা?"

প্রৌঢ় ভদ্রেশ্বর বাবু সনিশ্বাসে বললেন, "করি! যদিও সে অভিশপ্ত রাষ্ট্রের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করি না। হিটলারও ইহুদি দলনে বিস্তর কারুকার্য্য .."

ফুটবল খেলোয়াড় সুনীল হাতের তাস গুটিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে ভদ্রেশ্বরবাবুর দিকে চাইলেন। বাধা দিয়ে বললেন, "কেন করেছিল জানেন? তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যোচিত সৎসাহস নিয়ে, মাথা তুলে দাঁড়াবার লোক ছিল না বলে! লোক-চক্ষে তিনি তখন দেবতা, অবতার, মহামানব,—আরও কত কি! মোহ ভঙ্গ হতে অনেক সময় লেগেছিল, তবে প্রতিকার হোল। আমাদেরও যা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েচে, আর দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্ব্বলচেতা হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। অত্যাচার দমনের জন্য, ন্যায়পরায়ণ সৎসাহসীর দল গড়ে তোলাই আজ আমাদের দেশে সব চেয়ে বড় দরকার।"

ঠিক সেই সময় দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রেশ্বর বাবুর ছাত্রজীবনের বন্ধু ও প্রতিবেশী পরেশ বাবু। ইনি কলিকাতার কোন অফিসে চাকরী করেন। প্রতি শনিবারে বাড়ী আসেন।

তাঁকে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত মনে হোল। ঘরে ঢুকে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ভদ্রেশ্বরবাবুর পাশে বসলেন। ভদ্রেশ্বর বাবু বললেন, "দিদিকে কাপড় ছ'যোড়া দিয়ে এলে? উঃ, কাপড় যোগাড় করা আজকের দিনে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই হয়েচে। দিদি আছেন কেমন?"

"খুব অসুস্থ। অনেক চেষ্টা করলুম, শ্বশুর বাড়ী থেকে কিছুতে আসতে রাজি হলেন না। পাঁচ ভায়াদের বাড়ী। দুয়ের জাতিরা তবু উপকার করে অসহায় হিন্দু বিধবাকে কৃপার পাত্রী ভেবে। কিন্তু নিজের জাতিরা—যাক সে কথা। রাও বিল সিলেক্ট কমিটিতে গেছে, পাশ হবে কি না বলতে পার?"

"হবে বলেই জানি।"

"কত দিনে?"

"বলা শক্ত। সরকারি চাল চিরদিনই গদাই-লস্করী। তাতে এখন কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট। সবাই নয়া-নতুন লোক। ঘর সামলাতে, কায বুঝে নিতে, ভুলভ্রান্তি সংশোধনকরে কায চালাতে একটু সময় চাই। তবে এঁদের মধ্যে কর্ম্মতৎপর, সততা নিষ্ঠ, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মানুষ আছেন কয়েকজন। তাঁরা উঠে-পড়ে লাগেন ত, শীঘ্র পাশ হয়ে যাবে বিল। দিদি খুব অসুস্থ?"

বিষাদভরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পরেশবাবু বললেন, "বেশী দিন আর বাঁচবেন না। স্বামীর অন্নকে পবিত্র জানেন, কিন্তু সে-অন্ন থাকলেও ত বিধবাকে তা পেতে

নাই। হিন্দু আইন বর্ত্তমান। ব্লাফ দিয়ে বঞ্চনা করে সবাই।...চমৎকার কৌশলে ওঁর বিধবা বড় জা'কে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মেরেছে। দিদিকেও হয়ত মারবে।"

"ওঁর স্বামীর শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণের, গয়াকৃত্যের ঋণ এখনো শোধ হয়নি?"

"বিষয়ের আয় পেলে ত? শ্রাদ্ধ করে স্বামীর আত্মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিদি আজ স্বয়ং নরকস্থ। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, না পাচ্চেন খরিদদার, না পাচ্চেন বিষয় বিক্রী করে ঋণমুক্ত হবার অধিকার। দিদির একমাত্র ব্যাকুল কামনা, স্বামীর শ্রাদ্ধের ঋণ স্বহস্তে শোধ করবেন। তার পর আমার কাছে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু সাধন ভজন করে মরবেন। কিন্তু নাঃ।...এ বিল পাশ হতে দেরী হলে, এ দুর্দ্দিনে দিদির মত হাজার হাজার অসহায় বিধবাকে অনাহারে লাঞ্ছনায় মৃত্যু বরণ করতে হবে।"

"এখনো রেঁধে খেতে দিচ্চে না? এখনো খাবার নষ্ট করে দিচ্চে?"

"বিধবা নির্য্যাতন এদেশের চিরাচরিত প্রথা।...সে সব শুনে তোমাদের কায নাই।"

"শুনলেও আমরা বিশ্বাস করব না। কিম্বা সে কথায় কান দেব না। সে দিন যাত্রা শুনতে গেছলাম। একটা নতুন নাটকে নতুন কথা শুনলাম..."হিন্দু বিধবার দীর্ঘশ্বাসে ভারতবর্ষ ছারখার হয়ে গেছে!" চমকে গেলাম। বুঝলাম, নাট্যকার হৃদয় দিয়ে সত্যকে অনুভব করেছেন। নতুন দৃষ্টিতে সত্যকে নিরীক্ষণ করতে পেরেচেন।"

বিষাদ-বিবর্ণ মুখে পরেশবাবু বললেন, "দিদিকে দেখে ফেরবার পথে ট্রেণে আজ এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করলুম। ন'পাড়ার জমিদারগোষ্ঠির অন্যতম প্রধান সরিক জন্মেজয় চৌধুরীকে চেন?"

মুচকে হেসে ভদ্রেশ্বর বাবু বললেন "আদালত শুদ্ধ সবাই তাঁকে চেনে। তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তি।"

হাতের তাস ফেলে অনিল এক লাফে এসে তাঁদের কাছে বসলেন। বললেন, "হাঁ স্বনাম ধন্য! জালিয়াতি, জুয়াচুরি, মামলাবাজিতে। বীমা কোম্পানীকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়ে, জাল মানুষের জীবন বীমা করিয়ে বহুৎ টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন। কেউ হাতে ছুঁতে পারে নি। মহা ভাগ্যবান!"

আশ্বস্ত ভাবে পরেশ বাবু বললেন, "ওঃ! তাই! Life Interest আইনের নাগপাশ হাতে আছে! পশ্চিম বঙ্গ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সুযোগে কি কৌশলে এবার বিধবা সরিকদের ঠকাবেন, তার পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত হয়েছেন। ট্রেণের সে কামরায় তখন কেউ ছিল না। বৃষ্টিনামায় আমি বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়েছিলাম। নীচের বেঞ্চে বসে উনি ছেলের সঙ্গে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করছিলেন। হঠাৎ ছেলে সান্ত্বনাদায়ক কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, "তাতে কি? নিক না গবর্মেণ্ট জমিদারী। আপনি কমন ম্যানেজার। দাদের টাকা পড়বে আপানারই হাতে। পঞ্চাশ ষাট হাজার হাতে নিয়ে আপনি চুপ করে বসে থাকুন। চ্যাঁচক নাবালক বিধবা ঘরের মধ্যে। আদালত যেতেও পারবে না, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে বলতেও পারবে না। ভয় কি?"

অনিল উত্তেজিত বিস্ময়ে বললে, "বটে! রাম না হতে রামায়ণ!"

সুনীল তাস খেলা ফেলে কাছে এসে বসলেন। বললেন, "প্রতিভা মশাই প্রতিভা! বলুন আর কি স্কিম তৈরী হোল?"

পরেশ বাবু বললেন, "ছেলে আরও পরামর্শ দিলে, বেশী গোলমাল ঘটে, তখন বিধবাদের টাকায় ঠাকুর দেবতাদের গয়না, কাপড়, ঘটি বাটি, আসবাব পত্র তৈরী করিয়েছেন বলে হিসেব লিখে দেখাবেন। হিন্দু বিধবার সেন্টিমেণ্ট! ঠাকুর সেবার নামে ভয়ে চুপ করে যাবে। এমন ত কত বারই হয়েছে। কেউ টুঁ শব্দ করতে পারে নি। মরুক-না না-খেতে পেয়ে!"

অজিত ডাক্তার হেসে বললেন, "ঠাকুর দেবতার নামে প্রবঞ্চণা! তাহলে দেখছি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার ঠিকই চলচে। তাই দেবতারা ঘৃণাভরে ভিন্ন ধর্ম্মীর হাত দিয়ে দেব দেবীদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি চূর্ণীকৃত করাচ্চেন। বহুৎ আচ্ছা! ৬৪১ স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার আগে মন্ত্রী সভা

:২৮২টা পাগলা গারদ খুললে ভাল করতেন; এ সব জটিল-মানসিক বিকারগ্রস্তদের ব্যবস্থা করা আগে দরকার।"

অনিল উত্তেজিত কণ্ঠে বললে "পাগল! চাতুর্য্য কৌশলে এঁরা সাতবার আপনাকে পাগল বানাতে পারেন!"

অজিত ডাক্তার মৃদু হেসে বললে, "তা ত পারেন-ই। কিন্তু ডাক্তার আমরা। অনেক তথাকথিত বড় বড় বংশের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসে আমাদের হাতে। জানি সবাইকে। ব্যবসার দায়ে প্রকাশ করা নিষেধ। প্রমাণ চান, রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখুন।"

আরক্ত মুখে অনিল বললেন, "আচার ব্যবহার থেকেই প্রমাণ পেয়েছি। রক্ত পরীক্ষার দরকার নাই। Life Interest আইনের নাগপাশে বন্দিনী হয়ে নিঃসন্তান হিন্দু বিধবাগুলো মরে রয়েছে। যাদের সম্পত্তি নেই, তাদের কথাই নাই। কেউ ঝি খাটচেন, কেউ রাঁধুনী খাটছেন। কেউ অবস্থাপন্ন আত্মীয়দের দ্বারে পড়ে, বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা প্রদত্ত অন্ন কুড়িয়ে খাচ্চেন। যে বিধবাদের স্বামী সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাঁরা ততোধিক লাঞ্ছনাগ্রস্ত। সম্পত্তি আয় আদায় হয় না। হয় লুণ্ঠন। বেচারাদের সম্পত্তি কিনতে, এমন-কি লীজ নিতে কেউ সাহস করে না। হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি থাকতেও তাঁরা না খেয়ে মারা যাচ্চেন, কেউ দেখে না। আগের দিনে বিধবাদের তীর্থ, ধর্ম্ম, ভরণ পোষণের ভার আত্মীয় অভিভাবকরা নিতেন, তখন জীবন স্বত্ব আইনের না হয় অর্থ ছিল। কিন্তু আজ? এক বেলার জন্ম এক মুঠো অন্ন দেবার মুরোদ নাই, অথচ Life Interest এর শাসনি! উত্তরাধিকারীরা নৃশংস উৎপীড়নে চটপট তাঁদের মরণ ঘটিয়ে সম্পত্তি গ্রাস করতেই ব্যগ্র!"

অজিত ডাক্তার বললেন, "তোমার ছোট বোনের ওই ন' পাড়ার জমিদার গোষ্ঠিতে বিয়ে হয়েছে, নয়?"

"হ্যাঁ, সেই জন্তেই ওদের চিনি। বিধবা হয়েছে বলে ওদের বিচারে সে যেন 'চার পো দোষ পাওয়া মড়া?' কি নিদারুণ লাঞ্ছনায় বেচারার জীবন কাটচে, বলবার নয়। এবার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলে, কিছু নগদ সংস্থান হাতে পাবে, সে নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু তাও ফাঁকি দেবার স্কিম!"

পরেশবাবু বললেন, "পরের ষ্টেশনে নেমে যাবার আগে ছেলে বললে, 'ওদিকে রাও বিল সিলেক্ট কমিটিতে গেচে। শেষ পর্য্যন্ত কি হবে কে জানে।' বাপ দম্ভভরে বললেন, 'ছঃ, রাও বিল! অত বড় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পারলে না, এই ল্যাদাড়ু গবর্ণমেণ্ট করবে বিধবাদের গতি-মুক্তি? বিলের জন্ম চ্যাঁচাতে, সভা সমিতি করতে, লেখালেখি করতে বিরোধী দলের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে বিশ বছর কেটেছে, আরও বিশ পুরুষ কাটুক, তা-পর···। আমাদের দলের সবাই বেঁচে রয়েচি। সহজে ছাড়ব না কি?"

গর্জ্জন করে অনিল বললেন, "হুঁঃ! এঁরাই দেশের বুদ্ধিমান, ভদ্রলোক, ধনী! অভাব ত নাই—"

সুকুমার বললেন, "কিন্তু স্বভাব? সে ত ছাড়া যায় না। শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থহানির দিক থেকে নয়। সমগ্র দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের দিক থেকে বিচার করে দেখো, নীচ মন এঁদের! smilesএর character বই খানায় পড়েছি—"the greatness of a country, does not depend upon the extent of its territorry, but on the character of its people." এই আমাদের people! এই তাদের character!"

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বসে বসে অলস ভাবে হা হুতাস করলে এর প্রতিকার হবে না! Great minds are rich in radiating force, not only exerting power, but communicating and even creating it."

ভদ্রেশ্বর বাবু বললেন, "এর মধ্যে উঠছ? এই ত সবে আটটা।"

"চললুম আত্মশুদ্ধির জন্ম। এ দেশের, এই অভিশপ্ত জাতের একজন মানুষ আমি। আমারও স্ত্রী, কন্তা, পুত্র-বধূ, নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হতে পারে, অভাবে পড়তে পারে। তাদের জন্মও এই লাঞ্ছনা-বঞ্চনাময়ী আইনের নাগপাশ তৈরী হয়ে আছে। বিধবা মাসী, পিসী, খুড়িদের দুর্গতি দেখেচি। পূর্ব্ব পুরুষরা আমাদের মাথা

STUDENTS P. G. A. COMMON ROOM

খেয়ে গেছেন। বংশধরদের মথাগুলো খেলে আমাদের চলবে না। তাদের স্তায়-পরায়ণতা, ভদ্র প্রবৃত্তি শিক্ষা দিতে চাই; আসুন পরেশ দা, অনিল দা, চলুন আনন্দ বাবুর কাছে যাই।"

ভদ্রেশ্বর বাবু বললেন, "আনন্দ বাবু? স্থানীয় কংগ্রেস দলপতি? হাঁ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বলা চলে Great mind। উনি একদিন বলেছিলেন, 'যাদের চারদিকে বিধি নিষেধের দেয়াল তুলে, আর্থিক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে, জ্যান্ত কবরস্থ করে রেখেচি,—তাদের প্রেতপিণ্ড ক'মুঠো চুরি করে ধনী সরিকরা বাদশাহী করেন, আর হিন্দু বিধবারা আর্থিক স্বাধীনতার অভাবে শিয়াল কুকুরের মত লাঞ্ছিত জীবন যাপন করেন—এটা শুধু অবিচার নয়,—অত্যাচার। এ অভিশাপের দেনা শুধতে হিন্দুকে একদিন চরম মার খেতে হবে।' চল আজ প্রমাণ দেখিয়ে দেওয়া যাক। দেখি Country people দের এসব Greatness ও'দের সয় কি না?"

সুকুমার উঠে বললেন, "এবং তার পরবর্তী স্তায়-সংহিতা রচনা করব আমরা,- স্বাধীন দেশের মানুষ। শুধু নাচন কোঁদন হৈ হল্লা নয়। কাযের দ্বারা প্রমাণ করব, আমরা বিধবা বঞ্চনাকারী ছোটলোক দস্যু নই। আমরা স্তায়ানুচারী, ভদ্র। উৎপীড়ন থেকে অসহায় দুর্ব্বলকে বাঁচাতে জানি।"

ফুট বল খেলোয়াড় সুকুমারের বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় ধরে ঝাঁকানি দিয়ে পরেশ বাবু বললেন, "তোদের শত ধন্যবাদ। তোদের মত সৎসাহসী সাধু প্রকৃতি, দেব-চরিত্র ছেলেরাই দেশের প্রধান সম্পদ। তোরা বেঁচে থাক,—এ দেশ আবার বাঁচবে, আবার বড় হবেই। আমি সামান্য কেরানী। হাতে নেই পয়সা, গায়ে নেই জোর, মগজে নেই বুদ্ধি। ওদের 'যত না মারেজা, তত মাঠ ময় তাড়েঙ্গা' গোছের আস্ফালনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। দাঁড়া তোরা মাথা তুলে। খুঁচিয়ে কর্ম্মতৎপর করে তোল, অলস মন্থর গবর্মেন্টকে। হাজার হাজার নির্য্যাতিত বিধবার, নাবালকের প্রাণ রক্ষা কর। ভগবান তোদের মঙ্গল করবেন।"

নমস্কার করে সুকুমার বললেন, "অমঙ্গল করলেও আপত্তি নাই। অন্যায়, অন্যায়-ই। তার বিরুদ্ধে আমাদের সমগ্র শক্তি রুখে দাঁড়াবে ই! সেখানে আমরা বাপের কুপুত্র। চলে আসুন ভদ্রেশ্বর দা।"

জামা জুতা পরতে পরতে স্মিত মুখে ভদ্রেশ্বর বাবু বললেন, "হিন্দু আইনানুমোদিত বিধবা নাবালক ঠকিয়ে খাওয়ার পথটা বড় সরল মসৃণ হে। তোমাদের মত দস্যিদের পাল্লায় না পড়লে আমিও লোভ সামলাতে পারতুম কি না বলা শক্ত। পরেশের দিদিকে যখন ওরা গোড়ার দিকে স্থল-কূল দেন নি, সাফ হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে ওর জ্ঞাতি গোষ্ঠির সর্ব্বগ্রাসী লোভকে একদা দমন করে এসেচি। আজ আবার। সমগ্র বিধবা সমাজের জন্য—যে সব মহাপ্রাণ ব্যক্তি এতদিন লড়েচেন, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁদের কায দেখেছি দূর থেকে। নিজে এগোবার সাহস পাই নি। সুকু-সুনীল দলকে ধন্যবাদ। মনে পড়ছে, "Energy of Character has always a power to evoke anergy in others. It acts through sympathy, one of the most Influential of human agencies."

সুকুমার বললেন, "বাক্য-বিস্তাসে নয়। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মানুষের সত্যকার চেহারা অভিব্যক্ত হয়। শত শত বৎসর ধরে মাতৃজাতিকে বঞ্চনার—বিশেষতঃ বিধবা বঞ্চনার ঘৃণ্য কৌশল,—আইনের নামে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এমন কদর্য্য নিষ্ঠুরতায় চালিয়েচি যে, বিদেশীরা ঘৃণাভরে শত ধিক্কার দিয়ে গেচে। Confession of a thing একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস। তার গ্রন্থকার Colonel Meadows Taylor ভারতে ঠগী বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এ দেশের রাজা মহারাজা নবাবদের কাণ্ড কারখানা, হিন্দুদের রীতি নীতি স্বচক্ষে দেখে হাতে কলমে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে গেচেন। তাতে পড়েচি,- কোথাকার এক রাজার এক ধনী হিন্দু কর্ম্মচারী মারা গেলেন। অমনি হিন্দু আইনের দোহাই দিয়ে মৃতের সমস্ত সম্পদ রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করে নিতে ধেয়ে এল রাজার হিন্দু কর্ম্মচারীর দল। অপরাধ?…মৃতের পুত্র নাই। আছে দু'তিনটি অবিবাহিতা কন্যা, আর বিধবা স্ত্রী! অতএব স্ত্রীলোক বলে মৃতের

একটি পয়সা স্পর্শ করার অধিকার না কি তাদের নাই।—"

উৎকণ্ঠা-ব্যগ্র স্বরে সুনীল বললেন, "কেন?"

সুকুমার উত্তর দিলেন, "তখনকার ওই ছিল 'হিন্দু আইন'। হাঁ হিন্দু আইন!"

প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে সেই হিন্দু রাজকর্ম্মচারী জাবানবন্দী দিলে—"By the laws of the Kingdom, accounts of the effects of···Wealthy persons ought to be furnished to the government when they died without male Children; that··· Jeysookhdas (মৃত ধনী) was wealthy,·· he had two or three daughters but no sons, and that they had no right to have touched a rupee of the property, until the Government ইত্যাদি। বিধবাকে এবং পিতৃহীনা অসহায় বালিকাদের সে বঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে পারে এমন হৃদয়বান সৎসাহসী হিন্দু ও সেদিনের হিন্দু সমাজে কেউ ছিল না।·· মৃতের অন্তিম অনুরোধে তাদের রক্ষা করতে দাঁড়াল কে জান? মৃতের প্রতিবেশী—ঠগী দস্যু ব্যবসায়ী এক মুসলমান! সে ঘৃণ্য দস্যু, তবু তার অন্তর বিদ্রোহী হোল এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে। রাজকর্ম্মচারীদের চোখে ধূলো দিয়ে, গোপনে মাতা কন্যাদের ধন রত্ন সহ সরিয়ে ফেললে। নিরাপদে পৌঁছে দিলে—মাড়োয়ারে তাঁদের আত্মীয়ের আশ্রয়ে। শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় হিন্দু কর্ম্মচারীদের হিন্দু ধর্ম্ম রসাতলে গেল!···গুপ্ত ঘাতক লাগিয়ে মুসলমানটির পিতাকে হত্যা করলে, তাকে আহত করলে। বহুদিন পরে সে সেই হিন্দু কর্ম্মচারীকে হাতে পেলে। ঠগী দস্যু গলায় ফাঁশ দিয়ে মেরে তার হিন্দুত্ব দর্পের পুরস্কার দিলে। Taylor সাহেব জলন্ত ভাষায় চাবুক মেরে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, হিন্দুর মাতৃজাতি বঞ্চনার কদর্য্য কৌশলের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণ্য ঠগী দস্যুও বিদ্রোহী বীর। কিন্তু সমাজ শুদ্ধ হিন্দু সেখানে নৃশংস, নিষ্ঠুর, পশুর অধম। ফাঁকির কারবার অনেকদিন চলেচে, আর চলবে না। নিজেদের মনুষ্যত্ব-সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু যদি আজও ন্যায্য মূল্য না দেয়, তার ধ্বংস অনিবার্য্য।"

গোপা

শ্রীহরিপদ গুহ

বিবাগী কুমারে বাঁধিয়া রাখিতে ঘরে,
তোমারে আনিয়া স'পিল তাঁহারে করে।
মন-প্রাণ দিয়া বাসিলে তাঁহারে ভালো,
রূপেতে তোমার প্রাসাদ হলো যে আলো!

সকলে বুঝিল এবার প্রণয় বানে—
ভাসিয়া কুমার ফিরিবে গৃহের পানে।
বিরস বদনে ফুটিবে মধুর হাসি,
প্রেমের সায়রে বিরাগ যাবে যে ভাসি!

নটীর মতন মিথ্যা ছলনা দিয়া,
জিনিয়া লইতে চাহনি তাঁহার হিয়া।
সবার বেদনা বুকেতে তোমার জাগে,
নিজের লাগিয়া বাঁধিতে বেদন লাগে।

কুমার যেদিন চলিল মুক্তি স্মরি,
পড়িয়া রহিলে নিদ্রার ভাণ করি!
কেহ জানিল না তব হৃদয়ের ভাষা,
বিশ্বের লাগি কত তব ভালবাসা!

ওগো মহীয়সী, তোমার না বলা বাণী
আকাশে বাতাসে আজো করে কানাকানি।
বাসনা তোমার সফল হয়েছে রাণী,
স্মরিয়া তোমারে আজিকে অর্ঘ্য দানি।

পর্দার আড়ালে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পুরাকালে গুরু শিষ্যে একটা ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। গুরু ভার্গব রাম ও শিষ্য কৌরব ভীষ্মের যুদ্ধ যখন কোন ক্রমেই অতিক্রম করা সম্ভব হইল না, তখন পরশুরামের শস্ত্রশিষ্য ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, "তোমারই প্রদত্ত বিদ্যা শিখাব তোমারে।" পরশুরাম যে-সে ও যেমন-তেমন বীর ছিলেন না, এই পৃথিবীকে তিনি এক-বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন এবং পরশুর একটি ঘায়ে জননী রেণুকা দেবীর শিরশ্ছেদন করিয়া ভূমণ্ডলে বিভীষিকা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ও পরাক্রমের তুলনায় ভীষ্ম 'শিশুমাত্র' হইয়াও গুরু পরশুরামকে ঘায়েল করিতে পরিয়াছিলেন। বোধ করি বিশ্বশুদ্ধ লোক সত্যব্রত ভীষ্মের জয় ও মাতৃঘাতী ভার্গবের পরাভব কামনা করিতেছিল; ভীষ্মের বিজয়ে সেই অব্যক্ত অথচ একাগ্র জনমতই জয়যুক্ত হইয়াছিল। ঘটনাটা যদ্যপি এ কালে ঘটিত, তাহা হইলে আমরা বলিতাম, যার শিল, তার নোড়া, ভাঙলো তারই দাঁতের গোড়া। আপাততঃ আমাদের দেশে, কংগ্রেসের শিল, কংগ্রেসের নোড়া দিয়া কংগ্রেসের দাঁতের পাটিকে পাটি উৎপাটনে চেষ্টা হইতেছে। মানভূম নূতন করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। কংগ্রেস সরিষা পোড়া দিয়া এ দেশ হইতে বৃটিশ ভূত ভাগাইয়াছিল— অন্ততঃ কংগ্রেস ঘোর রবে ও তারস্বরে এই সত্যই ঘোষণা করিয়া থাকে। সেই কংগ্রেসেই যে ভূত বাসা বাঁধিবে, ইহা বোধ করি কেহ কুস্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু সত্য সত্যই যদি ভূত বাসা বাঁধিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ আদি, অকৃত্রিম, অমোঘ ও অব্যর্থ সরিষা দগ্ধ না করিয়াই বা উপায় কি? মানভূমে আরম্ভ হইলেও, শেষও যে মানভূমেই হইবে এমত ভরসা আমাদের আর নাই। অগ্নির প্রকৃতিই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির সমর্থক।

কংগ্রেস বনাম কংগ্রেসের কলহের কারণটা কিন্তু নূতন নয়, অজানাও নহে। ৯৯টি কথাকথি, হাতাহাতি গুঁতাগুতি, লাঠালাঠি, ফাটাফাটি, রক্তারক্তি যে কারণে হয়, মানভূমেও ঠিক সেই কারণেই "অহিংস" যুদ্ধ বিঘোষিত হইয়াছিল। চার্চিলের সহিত ভারতবর্ষের মনোমালিন্যের হেতুটা কি ছিল? হেতু এই ছিল যে, উনস্টন্ চার্চিল (ও তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠি সুহৃৎ স্বগোত্র সকলেই) চাহিতেন যে, 'যাহার যাহা আছে তাহার তাহাই থাক্'— We hold what we have. শাখা প্রশাখা, ডাল পালা লতা পাতা বাদ দিলে, দেখা যাইবে মানভূমেও সেই ঠিক কথা। বিহারের কংগ্রেস (ও গভর্ণমেণ্ট) মনে করেন, মানভূম যখন বিহারের অন্তর্ভুক্ত, তখন মানভূমে বিহারী ভাষাই (হিন্দুস্থানী) একমেবাদ্বিতীয়ম্। মানভূমের কংগ্রেস (ও জনগণ) বলে, এককালে মানভূম বাঙ্গলাদেশের ভিতরে ছিল, ইংরাজ সীমারেখা অগ্র-পশ্চাৎ করিলেও মানভূমের ভাষ (বাঙ্গলা) নিষিদ্ধ করে নাই; আজ আড়াই যুগ পরে ভাষা বদল করিতে হইবে কেন? বিহারীদিগের ভয় মানভূমের বাঙ্গালীরা ভাষার লাঙ্গুল ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইয়া বাঙ্গালাদেশে পশ্চিম বঙ্গে পুনঃ প্রবেশ করিতে চাহিবে। ফলে, বিহারের অঙ্গহানি। সুতরাং সম্ভ নষ্টের মূল ঐ লাঙ্গুল ছেদন করা বিধেয়। বিহারীরা এই বিধিসঙ্গত ব্যবস্থাই করিতেছেন। পক্ষান্তরে মানভূমের বাঙ্গালীরা বলে, 'আ মরি, কি বাঙ্গলা ভাষা'। শুধু যে এত কাল তাহাদের মাতৃভাষাকে তাহাদের বুকের ভিতরে পুষিয়া রাখিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নহে, একবার যে ঐ ভাষাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার পক্ষে বাঙ্গলা ভাষাকে ত্যাগ করাও সুকঠিন। এককালে অনেক বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষার রত্নভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজীর মোহগর্ত্তে পতিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানে এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য করে। তবু তাহাদের পক্ষে একটি ক্ষুদ্র সান্ত্বনা ছিল, ক্ষীর ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু পচা নর্দ্দমার দূষিত পঙ্কিল নীর তাহারা পান করে নাই। বাঙ্গলা বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীকে হিন্দুস্থানী বরণ করিতে বলা আর পূতঃসলিলা ভাগীরথী হইতে উঠিয়া কলিকাতার প্রান্তবাহিনী ধাপায় স্নান করিতে অনুরোধ করা একই কথা। কি অশুভক্ষণেই গান্ধীজী ঘুঁটেকুড়োনীর ললাটে রাজটীকা দিয়াছিলেন। কি কুক্ষণেই (হিন্দী) হিন্দু-

স্থানীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ ছাই পাশ কদন্নভোজনের পাপ হইতে কে পরিত্রাণ পাইবে? গান্ধীজী শেষ বয়সে স্বরে অ, স্বরে আ এবং অবশেষে "মো-ক গান্ধী" ছকিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য না করিয়া যথাকালে বাঙ্গলা শিক্ষা করিলে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রমিত কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলে, অমৃতনিঃস্যন্দিনী অমৃত হ্রদে অবগাহন করিলে, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া (হিন্দী বা) হিন্দুস্থানীকে একেশ্বর (একেশ্বরী?) করিতে নিশ্চই তাঁহার বিবেক বিদ্রোহ করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সাহিত্যের অমৃত আস্বাদনের সুযোগ ত তাঁহার হয় নাই, বন্দে মাতরমের মাধুর্য্যমণ্ডিত বীর্য্যবত্তার প্রকৃত রসাস্বাদও তাঁহার হয় নাই, কৃষ্ণচরিত্রের মহামহিম ও তাঁহার অন্তরলোক প্রভাসিত করে নাই; করিলে, সিংহাসনে শিব বসিতেন, হনুর স্থান তথায় হইত না। তিনি ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ হামেসা যে গুরুদেবের দোহাই পাড়েন, সে গুরুদেবকে translated in English ইংরাজের কোটপ্যান্টালুনে স্কার্টগাউনে সাজাইয়া দেখিতে হইয়াছে বিদেশী অশনে ভূষণে গুরুদেব যত আদরণীয় হইয়া থাকুন না কেন, সেই গুরুদেবে ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথে অনেক প্রভেদ।

বারান্তরে আমি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইংরাজের পরিত্যক্ত ছিন্ন পাদুকা পায়ে গলাইয়া যাঁহারা মাতৃমন্ত্র "বন্দে-মাতরং" অপাংক্তেয় করিয়া, "জনগণমন অধিনায়ক, জয় হে" রবে নৃত্য রঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র-ভাষার দোহাই পাড়িয়া তাঁহাদের কাণ্ডা ভাণ্ডা ও চানা-ভহর দাণ্ডায় মন মজিলেও অন্যায় হইবেনা। জাতীয় সঙ্গীতে "বন্দে মাতরমের" দাবী যদ্যপি নস্যাৎ করিতে পারা যায়, অনেক জনগণমনকেই অনায়াসে কুপোকাৎ ও ধূলিসাৎ করা সহজ ও সম্ভব হইবে। তখন কল্পনা ভরেই কথাগুলা লিখিয়াছিলাম, মানভূমে দেখিতেছি কল্পনার অঙ্গে বাস্তবের পাকা রং লাগিয়াছে। গোটা বাঙ্গলা ভাষার মূলোৎপাটনই বিহারের অভিলাষ।

পশ্চিম বাঙ্গলা তাহার হারানিধি ফিরাইয়া দিতে না বলিলে হয়ত এত শীঘ্র "মানভূম" করিবার দরকার কোন পক্ষেরই হইত না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। পোড়া বাঙ্গলাদেশ স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া প্রায় হন্যা করিয়াছিল। এই বিদগ্ধ বঙ্গদেশেই "আনন্দমঠ" রচিত, প্রকাশিত, পঠিত ও মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। এই দুর্ভাগা বাঙ্গলাভাষাতেই "বন্দে মাতরম" রচিত হইয়া বীজমন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ—বুঝিবা ভবানন্দও এই বঙ্গদেশেই উদ্ভব হইয়াছিল। পোড়া মহেন্দ্র, কল্যাণী, শান্তি দেবী এই বাঙ্গলাতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বৃটিশ বিতাড়ন যজ্ঞানল এই অভাগা বঙ্গদেশেই প্রথম প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল। স্বাধীনতার সাধনায় ফাঁসীমঞ্চে এই জন্মহতভাগা বাঙ্গালীই সহাস্যাননে বাঙ্গলা গান গাহিতে গাহিতে আনন্দময় পাদবিক্ষেপে সর্ব্বাগ্রে আরোহণ করিয়াছিল। কালাপানি পারে আন্দামানে জীবনাবসান, দেহাবসান এই পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত একমাত্র বাঙ্গালীরই হইয়াছিল। এতগুলা পাপের শাস্তি বাঙ্গালী পাইবে না ত কে পাইবে? যত পাপ লেখা ছিল, আজ তাহার পুরাপুরি প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গলার একাংশ পাকিস্তানে পরিণত এবং অপরাংশের প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত। তেঁতুল পাতায় নয় জন শয়ন করিয়াও সে স্থান সঙ্কুলান করিতে অক্ষম হইয়া ত্রাহি মাম্ ত্রাহি মাম্ আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে। বসুধৈবকুটুম্ব করিতে তাহার কোন কালেই কুণ্ঠা ছিল না; আপনি খাইতে না পাইলেও শত্রুকে কুশাসন দিতে কোনদিনই সে দ্বিধা করে নাই। স্বখাত সলিলে সে ডুবিয়া মরিবে না ত কে মরিবে?

পশ্চিম বঙ্গের মহাপরাধ—সে তাহার হারাধন ফিরাইয়া দিতে বলে, বারম্বার একই অনুরোধ—অনুনয় বিনয়, আবেদন, নিবেদন, কাকুতি মিনতি জ্ঞাপন করে। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত, লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত হইয়াও দেহি দেহি সে করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু বিহারী কাণে তুলা দিয়াছে। তাহারা সে কথা কাণে তুলিবে না, এই ছিল প্রথম সঙ্কল্প। কারণ, কথা কাণে তুলিলেই বিপদ। বাঙ্গলার দাবী এমনই নির্ঘাৎ, যুক্তি এতই প্রবল ও প্রয়োজন এমনই জরুরী যে ফিরাইয়া না দেওয়া অসম্ভব;

অথচ বাঙ্গলায় হারামাণিক বাঙ্গলায় সংযুক্ত হইলে বিহারেরও করীভুক্ত কপিত্থের দশা ঘটে। কাঁঠালের কোয়া কয়টি পায়ে হাঁটিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া গেলে, বিহার কি ভুতুড়ি ভোজন করিতে থাকিবে? স্বার্থ বড় ঠেকা! স্বার্থের খাতিরেই বিহারকে ন্যায়, সত্য, যুক্তি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া মহামানী দুর্য্যোধনের মত বলিতে হইতেছে—"নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" "অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই মত বদলায়।" পাকিস্তান ভরসা করে পাকিস্তানের হিন্দুগুলা আতপ তণ্ডুলের পলান্ন ভক্ষণ ও 'কল্মী পাঠ' করিলে বহুবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইয়া যাইবে। বিহারীদেরও ভরসা আছে—যদ্যপি বিহারের বাঙ্গালীগুলা বাঙ্গলা ভাষার মমতা কাটাইতে পারে, তাহা হইলে পশ্চিম বাঙ্গলার দাবী ছিন্নমুণ্ড টিকটিকির লেজের দশাই প্রাপ্ত হইবে; বিহারের স্বার্থহানির আশঙ্কা চিরতরে বিদূরিত হইবে। "গুরু-শিষ্য রণের" ইহাই মূল কারণ।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইহার শেষ কোথায় এবং পরিণাম কি? সত্যাগ্রহ আমরা একাধিকবার দেখিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের ইহাই হইয়াছে যে, সত্যাগ্রহের ব্যর্থতায় তাহার গৌরব ম্লান হয় না, শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না এবং পরাজয়ে তেজোবৃদ্ধি, বিফলতায় গৌরব মণ্ডিত হইতেই দেখা গিয়াছে এবং 'শত্রু' যখন বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত, তখনও বিজয়ী পক্ষকে জয়দৃপ্ত না দেখিয়া পর্য্যুদস্ত অবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব আলোচনায় ব্যগ্র হইতেই দেখিয়াছি। লবণ সত্যাগ্রহ যখন চিতায় শয়ন করিয়াছে, তখনও সাপ্রুর জয়াকরের দৌত্য সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য বিশ্ববিজয়ী বৃটিশের আগ্রহ কি কিছু কম ছিল? সত্যাগ্রহের এই সূক্ষ্ম শিল্প তাৎপর্য্য গান্ধীজীর দ্বারা বারম্বার স্বীকৃত হইয়াছিল; পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার জীবনালেখ্যেও একাধিকবার ইহা সমর্থন করিয়াছেন। আজ 'মানভূমী'দের পরাজয় ঘটিলেও, বিহারের জয় সূচনা করে না। আমরা 'কংগ্রেস' করি নাই, অর্থাৎ জেল গমন করি নাই, আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহের ভাষ্য করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা বলিতে বাধ্য যে, সত্যাগ্রহের সংজ্ঞা ও রূপকে সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে হইলে, লর্ড রেডিং, লর্ড আরুইন ও লর্ড উইলিংডনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতে হয় যে, "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?" কিন্তু কথা তাহাতেই শেষ হইয়া যায় না। দিল্লীর 'ময়ূর সিংহাসনে' কংগ্রেস, বিহারের মসনদেও কংগ্রেস, আর মানভূমে যাঁহারা সত্যাগ্রহ করিতেছেন, ভাগ্যদোষে তাঁহারাও কংগ্রেস। সুতরাং গুরু ভার্গব ও শিষ্য ভীষ্মের যুদ্ধের উপমাটা অন্যায় দিই নাই। তবে সত্যাগ্রহ রোধ করা যে সম্ভব ছিল না, তাহাতেও আমরা সন্দেহ পোষণ করি না। গান্ধীজী স্বর্গে গিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন, অনেক দুঃখ দুর্ভোগের হাত এড়াইয়াছেন; নহিলে তাঁহাকেও হয় ত শেষ পর্য্যন্ত অতুল ঘোষের পার্শ্বে বসিয়া প্রায়োপবেশন করিতে হইত। এবং 'ভদ্রলোকটির' জীবন বিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বায়ু অচঞ্চল থাকিত। কেবল নাড়ী যখন ক্ষীণ, তখনই জোড়া তালি দেওয়া "সুনা চুক্তি" সাধিত হইতে পারিত। কথাগুলি ক্রোধে নহে, অত্যন্ত দুঃখ ভরেই বলিতে হইল। মুখে মহাত্মা নাম জপ, অঙ্গে মহাত্মা নামাবলী ধারণ করিয়াও যে কামান দাগিয়া সত্যাগ্রহ ঠাণ্ডা করা যায়, জীবিত থাকিলে গান্ধীকে ইহাও দেখিতে হইত। সাধে কি আর বলিয়াছি, মহাত্মা মরিয়া বাঁচিয়াছেন?

কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের—শুদ্ধ ভাষায় যাহাকে হাই কম্যাণ্ড বলা হইয়া থাকে—তাহার বিপদটাও কি আমরা অনুধাবন করিতে পারি না? অবশ্যই পারি তাহার এক পাশে ভাদ্রবধূ, অপর পার্শ্বে মামাশ্বশুর; বেচারারা ছোঁয়াচ বাচাইয়া চলে কি রূপে? বিহারের রাজপুরে মুখার আড়ালে মূল গায়েন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। খোদা তাল্লাহ যেমন অদৃষ্ট, অজ্ঞাত ও অশ্রুত স্থান হইতে বিশ্বের কলকাঠি নাড়িয়া থাকেন, এই নির্ব্বাক নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার মহাযোগীও কোন অন্তরীক্ষ হইতে বিহার কংগ্রেসের ইঞ্জিন চালাইতেছেন, কে জানে। চোর চোরের বিরুদ্ধতা করে না; গুরুভাই হইয়া গুরুভাইয়ের বিপক্ষাচরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সকলেই যে মহাত্মা-মার্কা কংগ্রেসী।

দিল্লীরও সেদিন আর নাই। সে একদিন ছিল যখন দিল্লীতে বৃটিশ-ভাইসরয় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লীর ড্রিল শিক্ষকের নির্দ্দেশে 'ওঠ্ বোস্' ডন বৈঠক কেলিত। দিল্লীর তার-বেতার টরে টক্কা শব্দ করিতে না করিতে প্রদেশ সমূহ 'ফল্ ইন্'—জী হুজুর শব্দে জুতার গোড়ালী হইতে ললাট পর্য্যন্ত এক তারায় বাউল সঙ্গীত ঝন্ ঝনাইত। আর আজ, দিল্লীর প্রান্তবাহিনী যমুনার পানে চাহিয়া গাহিতে হয়—"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী ?" আজ লোককে লাঠি পেটা করিতে ও তাহাদের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপাইতে দিল্লীর নির্দ্দেশ মান্ত করিতে আপত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু অন্যত্র সকলেরই এ বিশ্বাস অবিচলিত রহিয়াছে যে, "মোরা কিসে কম দাদা, কিসে কম ?" যে জেল সার্টিফিকেটের জোরে দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইয়াছে, প্রদেশগুলিতেও সেই প্রশংসা পত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অল্প নহে! দিল্লীর কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রদেশ সমূহের জমিদারী-প্রথা বিলোপ সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলেন, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার-গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশটি কিরূপ মান্ত করিয়াছেন, আশা করি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "লিখে দিলাম কলার পাতে, ঘুরে বেড়াক গে পথে পথে"—নির্দ্দেশটির ইহাই ভাগ্যলিপি। দিল্লীর কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট 'শাস্ত্র বাক্য' ভালই জানেন। নিজের মান নিজের কাছে। বাঙ্গলার হারানিধি প্রত্যর্পণের আদেশ দানে স্বতঃসিদ্ধরূপেই এই অনিচ্ছা ও গড়িমাসী।

একটা কাল ছিল যখন কংগ্রেসীদের নিয়ম-নিষ্ঠা শৃঙ্খলা বোধ, দুঃখ স্বীকার, কষ্ট বরণ, ত্যাগ-মাহাত্ম্য প্রভৃতির ঢক্কা নিনাদে কর্ণপটহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। "ওয়ান্-টু-থ্রি" শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র কংগ্রেসীগণ গোঁতা মারিয়া জেলে ঢুকিয়া পড়িত। আমরা ভ্যাবা গঙ্গারামের দল ভ্যাবাচাকা হইয়া ভাবিতাম, ওঃ কি শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা! এ দেশ স্বাধীনতা পাইবে না ত কোন্ দেশ পাইবে ? আবার যখন "ওয়ান্-টু-থ্রি" শব্দিত হইত, কংগ্রেসীরা পড়ি ত উঠি না, উঠি ত পড়ি না করিতে করিতে কারাগারের লৌহদ্বারে তিন লাথি মারিয়া বীরপদভরে বাহিরে আসিত, আমরা মাথা দুলাইয়া 'রঘুনন্দন' করিতাম। একাদিক্রমে দশ, পনেরো, কুড়ি বৎসর কাল ইহারই পুনঃ পুনঃ পুনরভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা কংগ্রেসীদিগকে একে একে দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণাদির পরিত্যক্ত বাঘছাল ও নামাবলী পরাইয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিলাম। এবং ভাবিতে লাগিলাম, বাহবা বাহা বাহা রে! হায়! তখন কি বারেকের তরে ঘুমের ঘোরেও চিন্তা করিয়াছিলাম যে "স্বর্গ হতে হলো পতন—রচেছিলাম যাহারে ?" ভুল আমাদেরই, দুর্ভোগ ও মনঃকষ্ট আমাদেরই। কংগ্রেসীরা জেলে গিয়া বৃটিশকে বিব্রত করিয়াছিল, সত্য কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে এক ঢিলে কত পাখী মারিয়াছিল, কত দুরূহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিয়া লইয়াছিল, তাহাও ত অসত্য নহে। অন্ন, বস্ত্র, চাকুরী, বাসস্থান, সংসারাদি জটিল সমস্যার সমাধান তখনও হইয়াছিল, আর এখন ত কথাই নাই! আজ যে কোনও প্রদেশে মন্ত্রিসভার ত্রিরাত্রি কাটে না, তাহার মূলে কি ঐ সকল নাজা বাবাদের ত্যাগ-মাহাত্ম্যই বিদ্যমান নহে ? পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে না হইতে মহাবীর দলপতি মাত্রেই যে মাদুর বালিশ বগলদাবায় পুরিয়া পদ্মা পার হইয়াছেন, তাহাও কি বীর্য্য ও শৌর্য্যের পরিচায়ক নহে ? হাই কম্যাণ্ড বাস্তুহারাদের কখনও অনুনয়, কখনও বিনয়, কখনও উষ্মা, কখনও ভৎর্সনা সহকারে "গো-ব্যাক্" করিতে বলিতেছেন, হামেসা, অহরহঃ তাহা শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু যাহারা ফিরিয়া গেলে, যাহারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে থাকিলে, বাস্তুহারাদের বুকে বল, হৃদে সাহস আসে, সেই পালপতিদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিবার দুঃসাহস হাই কম্যাণ্ডেরও হয় না কেন ? এ প্রশ্নের ঐ একই উত্তর—নিজের মান নিজের কাছে! দুই শত বৎসরের দাসত্ব ও দিল্লীর ঔজ্জ্বল্য দেখিতে দেখিতে আমাদেরও এমন স্থবিরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে যে, এখনও প্রতিকারের আশায় দিল্লীর পানে চাতকের তৃষ্ণা লইয়া চাহিয়া থাকি। এখনও সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করি,-পাটনা আর্জ্জি না শুনে, দিল্লীর দরবারে আপীলের পথ মুক্ত আছে! হায় রে হায়! দাদার আশা যে বামে ছুরী, সে জ্ঞান কবে জন্মিবে ? "নিপট কপট তুয়া শ্যাম, আরে!"

ভগবান আছেন

শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

লম্বা ছুটি পেলেই আমার বাইরে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। গেলবারের পূজার ছুটিতে বেড়াবার সুযোগও হয়েছিল বেশী—দুটো দিন অতিরিক্ত ছুটি ছিল, আর সঙ্গীও পেয়েছিলাম শঙ্কর আর বিজুদাকে। শঙ্কর আমার বাল্যবন্ধু, বিজু-দা সকলেরই সরকারী দাদা এবং, বয়সে বড় হ'লেও মনে ও মুখে পাইকারীভাবে আমাদের সমবয়সী।

পূর্ব্বে ছুটিতে পশ্চিমদেশেই বেড়াতে যাওয়া হয়েছে, এবারে মনে করলাম নূতন কোথাও যাওয়া যাক। সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল চন্দ্রনাথে যাওয়া যাবে। সেখানে গিয়ে রথ দেখা ও কলাবেচা একসঙ্গে দুইই হবে, অর্থাৎ তীর্থকে তীর্থও করা হবে আর নূতন পাকীস্থানের চেহারাটাও পরখ করা যাবে। শঙ্করের মামাতো ভাই তারকবাবু সীতাকুণ্ড ইস্কুলের মাষ্টার; তাঁর বাসায় ওঠার ব্যবস্থা হ'লো। তাঁকে নির্দ্দিষ্ট দিনে ইষ্টেশানে থাকার জন্ম সংবাদ দেওয়া গেল।

ছুটি হওয়া মাত্রই চন্দ্রনাথে 'পাড়ি' দেওয়ার জন্ম পৌঁটলা-পুঁটলী নিয়ে তিনবন্ধু শেয়ালদা ইষ্টেশানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। 'পাড়ি' দেওয়ার কথা বলছি, কেন না দুই দিকে দুই রেলের সেতুবন্ধ, মাঝে বিশাল পদ্মানদী। কলকাতার লোক আমরা, বরাবরই গঙ্গা দেখে এসেছি, পদ্মার বহর দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির। বিজু-দা তো ব'সে ব'সে দুর্গানামই জপ করতে লাগলেন। তা দেখে শঙ্কর হেসে বললো—'ও বিজু-দা, একি অদ্ভুত। পরমহংসদেব বলেছেন টিয়েপাখী খাঁচায় থেকে হরে কৃষ্ণ হরে রাম পড়ে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই টাঁ টাঁ ক'রে চেঁচায়; তোমার যে দেখছি উল্টো কাণ্ড। কলকাতায় ব'সে বলো ভগবান-টগবানকে হাতে পেলে জলে ডুবিয়ে মারি, এখন দেখছি পদ্মা দেখে দুর্গা দুর্গা করছো।' বিজু-দা তাকে ধমক দিয়ে বললো—'চুপ কর্, ফাজিল ছেলে, ইয়ার্কী মারতে হবে না। পদ্মায় ইষ্টীমার ডুবে গেলেই টেরটা পাবি কি মজা।'

বিজু-দার জপের ফলেই হোক্, কিম্বা সারেঙ্গের গুণেই হোক্, পদ্মানদী নির্বিঘ্নেই পাড়ি দিয়ে চন্দ্রনাথের দিকে রওনা হলাম।

ভোরবেলা সীতাকুণ্ড ইষ্টেশনে পৌঁছে দেখি তারকবাবু উপস্থিত। তিনি আদর ক'রে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন।...

দুই

তীর্থে গিয়ে তীর্থধর্ম্মই আগে পালন করা উচিত। কিন্তু পদ্মা উৎরে এসে বিজু-দার সুর বদলে গ্যাছে। তিনি বললেন—'সারারাত জেগে আসা গ্যাছে, আগে গায়ের মোড়টা না ভেঙ্গে পাদমেকং ন গচ্ছামি।' তাঁর এই সুপ্রস্তাব আমরাও সমর্থন করলাম। স্থির হ'লো পরদিন চন্দ্রনাথের সব কাজ সেরে তার পরের দিন বাড়বানল দেখতে যাওয়া যাবে।

চন্দ্রনাথ ইষ্টেশানের নাম সীতাকুণ্ড। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নীচে। বাড়বানল সীতাকুণ্ড ইষ্টেশান হইতে সাড়ে চার মাইল দূরে, হেঁটেও যাওয়া চলে কিম্বা চার মাইল দূরবর্ত্তী বাড়বাকুণ্ড ইষ্টেশানে নেমে ফিকি আধ-মাইল পা চালাতে হয়।

তার পরের দিন আমরা বাড়বানল দেখতে রওনা হলাম। তারকবাবুও ছড়িদার হ'য়ে সঙ্গে চল্লেন।

পাহাড়ের গায়ে রাস্তা, ভলোই পথ চতুর্দ্দিক একরূপ নির্জ্জন নিস্তব্ধ। গাছপালা যথেষ্টই আছে। গাছের উপর পাখীর ডাক আর পাহাড়ের পথে যাত্রীদের আলাপের গুঞ্জন, প্রাণীজগতের অস্তিত্বের তাই নিদর্শন। আমরা সেই পথ ধ'রে বাড়বানলে পৌঁছলাম।

বাড়বানলে আগুন জ্বলছে দেখে বিজু-দা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন—'পাণ্ডাদের রোজকারের ফন্দী দেখেছিস্?' নিশ্চয়ই কোথাও গন্ধকের বা সোরার খনি আছে, তার মধ্যে দিয়ে জলের ফোয়ারা চলে, তাতেই আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।'

শঙ্কর ব'লে উঠ্‌ল—'তোমার পণ্ডিতিপনা রাখো বিজু-দা। পাওয়া যাই করুক না কেন, বরুণদেব শীতের প্রাক্কালে আমাদের স্নানের জন্য যে গরম জলের বরাদ্দ করে রেখেছেন, এটাই সৌভাগ্য।'—এই বলে সে ঝুপ ক'রে বাড়বানল-কুণ্ডের জলে নেমে প'ড়্‌ল।

বাড়বানল-কুণ্ডে স্নান করে সকলে গিয়ে রাস্তার পাশে বস্‌লাম।

তারকদা বাড়ী হ'তে লুচি তরকারীর বড় একটা পুঁটলী নিয়ে এসেছিলেন। চারজনে মিলে টপাটপ্ তা দিয়ে উদর ভর্ত্তি কর্‌লাম।

তিন

এবারে ফেরার পালা। শঙ্কর লাফিয়ে লাফিয়ে সকলের আগে আগে চল্‌ছিল। আমরা তিনজনে একটু পেছনে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনি শঙ্করের গলা—'ওরে, শীগ্‌গির আয়, ভাখ্ এসে কি এখানে।

ব্যাপার কি? তার কাছে গিয়ে শুনি রাস্তার পাশে বুনো ফলের ঝোপ হ'তে ফল তুলতে গিয়ে সে একটা ঝুলিপথ আবিষ্কার করেছে। সেই পথটা ছুটো ঝোপের মাঝ দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। উপর হ'তে বিশেষ কিছু বোঝা যায়না, কিন্তু শঙ্কর একদিকের ঝোপটা পাশে ঠেলে ফল তুল্‌তে গিয়েই সেই পথ দেখতে পেয়েছে।

তারকবাবু বল্‌লেন—'শঙ্কর, তোর তো খুব নজর দেখ্‌ছি! আমি তো কতবারই এদিকে যাওয়া আসা করেছি, কই, ও পথটা তো আমার চোখে পড়েনি।'

আমি বল্‌লাম—'শঙ্কর গেলো জন্মে বেড়াল ছিল, তাই এজন্মে আঁধারেই ওর চোখ জলে ভালো।

শঙ্কর তো তক্ষুনি সেই পথ দিয়ে নীচে নামার জন্য উৎসুক। বিজুদা বাধা দিয়ে বল্‌লো—'আরে, না-না, ও যে বাঘ-ভাল্লুকের পথ নয়, কে জানে? আর নিচে নেমে কাজ নেই।' কিন্তু তার বাধা মানে কে? তাকে ভোটে হারিয়ে আমরা তিনজনে নীচের দিকে চল্‌লাম। বিজুদাকেও তখন বাধ্য হ'য়ে আমাদের সঙ্গী হ'তে হোল।

গোড়ার দিকে পথটা সরু, কিন্তু ক্রমেই তা একটু একটু বড় হ'য়ে এঁকে বেঁকে এ-গাছ ওগাছের পাশ দিয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। নীচের পথটা ছুই সারি গাছের আড়ালে পড়ায় একেবারেই ঢাকা পড়েছে। সেই গাছের সারি পেরিয়ে আমরা একটা ছোট উৎরাইয়ে গিয়ে পৌছলাম। সে জায়গাটা ছোট্ট একটুখানি ময়দানের মতো, আর সেখানে একটা কুটীর দেখে আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম; এবং পা চালিয়ে সেখানে এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কুটীরের দরজায় ঝাঁপ ভেজানো ছিল। কোনো লোক দেখা না গেলেও সেখানে যে কারু বসতি আছে, তা স্পষ্টই বোঝা গেলো, কেননা সেই দরজার সাম্‌নে একজোড়া খড়ম আর কুটীরের পাশে একগাছা দড়িতে টাঙানো একখানা গেরুয়া কাপড় ছিল। কুটীরখানির একপাশে কয়েকটা ফুলের গাছ; তাতে ফুলও ফুটে রয়েছে, আর একদিকে টুলের মতো সাজানো কয়েকখানা চওরা পাথর। আমরা চারজনে চারখানা পাথরের উপর ব'সে এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই কুটীর-খানি সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছি, এমন সময় জলের ঘড়া হাতে নিয়ে এক স্বামীজী সেই কুটীরের সামনে এসে উপস্থিত। আমরা স্বামীজীকে দেখে অভয় পেলাম। আমাদের দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য্য হলেন ব'লে মনে হোল। জলের ঘড়াটা নামিয়ে রেখে তিনি আমাদের কাছে এসে বল্‌লেন—'আপনারা? আর, এখানে?'

আমরা স্বামীজীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি হাতের ইসারা ক'রে আমাদের বস্‌তে ব'লে নিজেও পাশের একখানা পাথরে ব'সে প'ড়ে জবাবের জন্য আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

বিজু-দাই আমাদের হয়ে তাঁর কথার জবাব দিল—'আমরা তীর্থযাত্রী, আপনার এ আশ্রম আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি হঠাৎ, অর্থাৎ By accident, আর এখানে এসেও পড়েছি দৈবাৎ।'

সন্ন্যাসী একটু হেসে বল্‌লেন—'হ্যাঁ, তা সত্যি, হঠাৎ আর দৈবাৎই তো অনেক ঘটনা ঘটে।'

বিজুদা বললো—'আপনাকে তো সাধু-সন্ন্যাসীর মতই

বিলাতের সংগ্রামমুখর মাটিতেও এম্‌নি সুন্দর
পেঁপেগাছ জন্মায়

দেখছি, আর এ জায়গাটাও দেখছি নিরালায়। জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনি কি এখানেই থাকেন?'

স্বামীজী উত্তর করিলেন—'হ্যাঁ, থাকি এখানেই বটে।'

'একলা থাকেন?'

'একলা আর কি! বনে জঙ্গলেও ভগবান মানুষকে একলা রাখেন না। এই দেখুন না, আপনারা ক'জনই তো আমার সঙ্গী জুটেছেন।'

শঙ্কর বললো—'আমরা সঙ্গী জুটেছি বল্‌ছেন? তার জবাব তো আগেই পেয়েছেন, সেটা নেহাৎই দৈবাৎ, কিন্তু এখানে আপনার একলা থেকে চলে কি করে?'

'যিনি চালাবার মালিক তিনিই চালান।'

বিজু-দা একটু মুচকি হেসে বল্‌লো—'ওঃ! আপনি ভগবানের কথা বলছেন? ভগবান মানেন নাকি?'

কথাটা শুনে স্বামীজী যেন চম্‌কে গেলেন। বললেন, 'মানি না, বলেন কি? এই গাছপালা ফলফুল, পশু পক্ষী

জীব জন্তু, চন্দ্র সূর্য্য দেখেও ভগবানকে মানি-না বলি কি ক'রে?'

বিজু-দা বললো—'ওতো থিওরীর কথা। প্র্যাক্‌টিক্যালী বলুন, ভগবানকে দেখেছেন?' একথা জিজ্ঞেস করেই তার কি মনে হোল, সে হাত জোড় করে বললো—'স্বামীজী, আমার বেয়াদপী মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে এই দেখা, আর দেখামাত্রই তর্ক জুড়ে দিচ্ছি; কিন্তু ওটা আমার স্বভাব।'

স্বামীজী আশ্বাস দিয়ে বললেন—'না, না, এতে আপনি সঙ্কুচিত হচ্চেন কেন? ভগবানের কথা যত আলোচনা হয় ততই ভাল। হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেন? ভগবানকে দেখেছি কি না এই তো?' আপনার প্রশ্নের জবাব তো পরমহংসদেব দিয়ে গিয়েছেন?

আমি বল্‌লাম,—'হ্যাঁ, তিনি বলেছেন বটে—সত্যিই তাঁকে দেখা যায়—তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়।'

—'ঠিক কথা। দেখার ইচ্ছে থাক্‌লে দেখতে লাগে কতক্ষণ!'

বিজু-দার তর্কের গোঁ তখনও ছাড়ে নি। সে বললো—'ওতো পরের মুখে ঝাল খাওয়া। আপনার প্রত্যক্ষ-দর্শন হয়েছে কি?'

এই প্রশ্নে স্বামীজী একটু থতমত খেয়ে গেলেন। পরক্ষণেই বল্‌লেন—'আমার? আমি তো পাষণ্ড; আমার নিজের সৌভাগ্য না হোক্ যাঁর হয়েছিল তাঁর চরণ-সেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।'

তারকবাবু ইস্কুলের মাষ্টার। এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন, এখন একটু ফোঁড়ন না দিয়ে পারলেন না—'Things which are equal to the same thing are equal to one another.'

স্বামীজী তাঁর রসিকতা বুঝলেন। হেসে বল্‌লেন—'তাতেও Geometrical rule ঠিকই আছে।'

বিজু-দা জিজ্ঞেস করলো—'কিন্তু যাঁর কথা আপনি বল্‌ছিলেন, তিনি কে?'

—'আমার গুরুদেব; এই আশ্রম তাঁরই, আর তাঁরই চরণের সেবাইত আমি।'

স্বামীজীর কথায় আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সবিনয়ে তাঁকে বল্‌লাম—'স্বামীজী, অপরাধ না নেন তো, আমরা আপনার গুরুদেবের পরিচয় পেতে পারি কি?'

—'স্বচ্ছন্দে। সৎকথার আলোচনা যতই হয় ততই মঙ্গল। যিনি শোনেন তাঁরও আর যিনি বলেন তাঁরও!'

সকলেরই ঔৎসুক্য বেড়ে উঠেছিল। আমি আর শঙ্কর সমস্বরে ব'লে উঠলাম—'বলুন, স্বামীজী, আপনার গুরুজীর কাহিনী। শুনতে বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে।'

—'বেশ বল্‌ছি'—স্বামীজী তাঁর গুরুজীর কাহিনী আরম্ভ করার পূর্ব্বে প্রশ্ন করলেন—'আপনারা তো সকলে কলকাতা হ'তে এসেছেন?'

আমরা—'হ্যাঁ' ব'লে জবাব দিতেই তিনি বল্‌লেন—'তাহ'লে তো খড়দাও আপনাদের জানাশুনা জায়গা।' কুটীরের দিকে ফিরে প্রণাম ক'রে তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—'আচ্ছা, আপনারা যা শুন্‌তে চাচ্ছেন শুনুন।' এই ব'লে স্বামীজী তাঁর গুরুজীর কাহিনী আরম্ভ করলেন।

চার

'আমার গুরুদেব পূর্ব্বে ছিলেন গৃহস্থ, রেল-অফিসে কাজ করতেন, আর সেখানকার ছিলেন বড়বাবু। অফিস ছিল শিয়ালদায়। সেখানে আসতেন রোজ খড়দা হোতে ডেইলী প্যাসেঞ্জার হ'য়ে। খড়দা তো আপনারা জানেনই।'

বিজু-দা ব'লে উঠলেন—'হুঁ হুঁ, খুব জানি। তারপর কি, বলুন।'

স্বামীজী বল্‌তে লাগ্‌লেন—'অফিসের কাজকর্ম্মে তাঁর সুনাম ছিল, সাহেবও সেজন্য ভালবাসতেন। তাঁর একটা অভ্যেস ছিল প্রত্যহ নিজের ঠাকুর-পূজো করা চাই। ঠাকুরের নাম রেখেছিলেন গোপাল। পূজোর সময় তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তন্ময় হ'য়ে পড়তেন, আর তাঁরই ভোগের প্রসাদ গ্রহণ না ক'রে বাড়ী থেকে বেরুতেন না। পূজোয় একবার বসলে প্রায়ই তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। তাই গুরুমাকে ব'লে রেখেছিলেন বেশী দেরী দেখলে যেন পূজোর কাঁসরখানা একবার বাজান; তাহ'লেই তাঁর হুঁস হবে। গুরুমা কিন্তু পূজোর ব্যাঘাত

হ'বে ব'লে অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে কাঁসর বাজাতেন না, কাজেই সময়মতো তাঁর অফিসে যাওয়া প্রায়ই হ'য়ে উঠতো না। সেজন্য নিজেও লজ্জিত থাকতেন, আর সাহেবের ভৎর্সনা যে মাঝে মাঝে না শুনতেন তা নয়; তবে দেরী করার ঘাট রাতে খেটে শুধ্‌রে দিয়ে অফিস থেকে আসতেন।

'একবার উপরিয়ালা বড়সাহেবের অফিস-ইনস্পেকসনে আসার কথা। অফিসের সাহেব তাঁকে ডেকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন—বড় বাবু, কাল ঠিক দশটায় হাজির হওয়া চাই। আর অফিসের সকলেই যেন বকেয়া কাজকর্ম আজই সেরে যায়। কাল আমি এসেই সই করার খাতাপত্র চাই। সাহেবের হুকুম শুনে সকলে খেটেখুটে খাতাপত্র ঠিক ক'রে বড় বাবুকে দিল। তিনি তা নিজের টেবিলে গুছিয়ে রেখে দিয়ে গেলেন, পরদিন সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। রাত্রে বাড়ীতে গিয়েও তিনি গুরুমাকে ব'লে রাখলেন—কাল দশটার মধ্যে অফিসে যেতেই হবে। গুরুমা ভোরে উঠেই ভোগের যোগাড়ে গেলেন। গুরুদেব নেয়েধুয়ে এসে গোপালের পুজোয় ব'সে গেলেন। সেদিন পুজোয় বসে তাঁর কণ্ঠ ঠেলে যেন বারবার গোপাল গোপাল নাম বের হ'তে লাগলো। তাঁর চোখ দিয়ে আপনা-আপনি জল গড়াতে লাগলো। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তিনি গোপাল ঠাকুরের পুজো ক'রতে লাগলেন। পুজোয় ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে গেলো, তাঁর হুঁস নেই। গুরুমা ভোগ নিয়ে এসে তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে কাঁসর বাজিয়ে ডাকতে সাহস করলেন না। কিন্তু দশটা যখন বেজে গেলো তখন আর উপায়ান্তর না দেখে কাসর খানা বাজাতেই হ'লো। তার শব্দ শুনে গুরুদেব যেন কোন রাজ্য হ'তে ফিরে এসে প্রথমে বিহ্বলের ন্যায় চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর অফিসের কথা মনে পড়তেই হকচকিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন—সর্বনাশ! দশটা তো বেজে গ্যাছে! কি আর তখন করেন, গোপালের পায়ে লুটিয়ে একবার প্রণাম ক'রে ভোগের প্রসাদ দুটো মুখে ঠেসিয়ে পোষাক প'রে হন্তদন্ত হ'য়ে ইষ্টেশানের দিকে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন—মহাবিভ্রাট! দশটার গাড়ী সাড়ে দশটায়ও আসেনি। পৌনে এগারোটায় সেই গাড়ী আসতেই তিনি মনে মনে 'গোপাল' 'গোপাল' বলতে বলতে তাতে উঠে পড়লেন।

'অফিসে পৌছে প্রথমেই দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন—সা'ব আয়া? দরোয়ান বললো—হাঁ, হুজুর, সা'ব তো সাড়ে ন বাজে আ গিয়া।

'—সর্বনাশ! আজ আর চাকরী টিকবে না।—এই ভেবে তাঁর অফিসের দিকে যেতে পা সরছিল না, তবু তিনি গোপালের নাম জপতে জপতে চললেন। অফিস-ঘরের দরজায় পৌছেই—তাঁর মনে হ'ল—নাঃ, সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আগেই অপরাধের ক্ষমা চেয়ে যাই। এই-না ভেবে তিনি প্রথমেই সাহেবের ঘরে গিয়ে তাঁকে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালেন। সাহেব মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কি, বাবু?' তিনি অপরাধীর মতো হাতজোড় ক'রে সাহেবকে বললেন—'স্যার, আমি আপনার আদেশ রক্ষা করতে পারিনি, আপনার নিকট ক্ষমা চাইতে এসেছি।' সাহেব বললেন—'হ্যালো, কি ব্যাপার? তুমি কি বলছো?' গুরুদেব উত্তর করলেন—'আমায় দশটার সময়ে অফিসে আসার হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বড় দেরী ক'রে ফেলেছি, এই মাত্র এলাম। আমার অপরাধ গুরুতর নিজেই বুঝছি।' গুরুদেবের কথা শুনে সাহেব আশ্চর্য্য হ'য়ে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন—'তুমি কি বলছো? তুমি কি স্বপ্ন দেখছো? তুমি ঠিক সময়েই তো এসেছো। দশটার সময়ে তুমি নিজে খাতাপত্র এনে আমাকে দিয়ে গেলে, ঐ দ্যাখো, এখনও তা পড়ে রয়েছে। আর, তুমি বলছো এখন এসেছো। সে কি কথা?' গুরুদেব বললেন—'না, স্যার, আমি সত্যি কথাই বলছি. আমি দশটায় আসিনি, এই মাত্র এলাম।'—'নাঃ, তোমার দেখছি নিশ্চয়ই মাথাখারাপ হ'য়ে গিয়েছে'—এই ব'লে সাহেব ঘণ্টা টিপে বেয়ারাকে ডেকে ডাক্তার বাবুকে একবার খবর দিতে বললেন। গুরুদেব সাহেবের কথা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনে মনে একটা

সন্দেহ হ'লো। তিনি বললেন—'স্যার, আমি পাগল হইনি, আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, আমি দশটায় আসিনি। সাহেব টেবিল চাপড়ে ধমকের স্বরে বললেন, 'আমি বলছি এসেছো।' গুরুদেব সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে কখনও বড় কথা বলেন নি। আজ তাঁর কথা শুনে বিহ্বল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—'স্যার, যিশুখৃষ্টের দোহাই; বলুন, ঠিক আমাকে দশটার সময়ে দেখেছেন?' বড় বাবুর মুখে এইরকম কথা সাহেব কখনও শোনেননি। আজ শুনে অবাক হলেন। তিনি বিরক্তির স্বরে বললেন—'এ কথা কতবার আর বলবো?' সঙ্গে সঙ্গে একটা চুরুট ধরিয়ে মুখে পুরলেন।

'গুরুদেবের তখন আর কিছু বোঝার বাকী রইলো না। যে গোপালের পূজোয় তিনি এতদিন কাটিয়েছেন, আর যাঁর নাম আজ বারবার তাঁর কণ্ঠ ঠেলে বের হচ্ছিল এ সেই গোপালেরই কাজ। সেই বিপদভঞ্জন তাঁরই মূর্ত্তি ধরে এসে তাঁর কাজ করে দিয়ে তাঁকে বিপদ হ'তে রক্ষা করেছেন। ঝর ঝর ক'রে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। তিনি সাহেবকে গদগদ স্বরে বললেন—'স্যার, আপনি ধন্য, আপনি আমার গোপালের দেখা পেয়েছিলেন। আমাকে অনুমতি দিন, আপনাকে স্পর্শ ক'রে আমিও ধন্য হই।' ভক্তিভরে গুরুদেবের পা-টলমল করছিল, তিনি সেইখানেই হাঁটুগেড়ে ব'সে পড়লেন। সাহেব তাঁর অবস্থা দেখে হয়তো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলেন। গুরুদেবের সেদিকে খেয়াল ছিলনা। একঘণ্টা পূর্ব্বে যে চাকরী যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি ভীত হয়েছিলেন, সেই চাকরী তুচ্ছ মনে ক'রে উচ্চৈঃস্বরে 'গোপাল' 'গোপাল' বলতে বলতে অফিসঘরে ছুটে এলেন। তাঁর অবস্থা দেখে চারদিকে ভীড় জ'মে গেল; কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। খস্‌খস্ ক'রে একটা কাগজে চাকরীর ইস্তফাপত্র লিখে বেয়ারার হাতে দিয়ে বললেন—'সা'ব কো দে দেও।' তারপর পাগলের মতো ছুটে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়ীতে এসে তিনি সাতআটদিন ছিলেন। সে ক'টাদিন প্রায় সময়ই গোপালের সম্মুখে প'ড়ে থাকতেন। অফিসের সাহেব তাঁর খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার সঙ্গে দেখাও করেন নি।

'এরপরই তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর এখানে এসে নিরালায় আশ্রম ক'রেছিলেন। আমার সঙ্গে হঠাৎ তাঁর দেখা সীতাকুণ্ডে। সেই হ'তে তাঁর চরণে প'ড়ে আছি।'

পাঁচ

স্বামীজীর গুরুদেবের কাহিনী শুনে আমি ভাবলাম একি সত্যি? আমার মনের ভাব হয়তো তিনি বুঝতে পারলেন। তার মুখে আমারই কথার যেন জবাব হলো—'গুরুদেব নিজেই এ কাহিনী আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। তিনি মহাপুরুষ। তাঁর বাক্য আমার নিকট বেদবাক্য। গোপাল বাবার কথা এদেশের লোকও পরম সত্য ব'লে মনে করতো। যিনি তাঁর বেশ ধ'রে তাঁর বিপদভঞ্জন করেছিলেন, তাঁরই নামে তিনি এদেশে সকলের নিকট গোপাল-বাবা নামেই পরিচিত ছিলেন।'

বিজু-দা গোপালবাবার কাহিনী শুনে যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। সে বললো—'আপনার গুরুদেব এখন কোথায়?'

স্বামীজী উপরের দিকে আঙুল তুলে বললেন—'তিনি আজ দশবৎসর হোল তাঁর মহাপুণ্যের ফলে গোপালের চরণে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি প্রত্যক্ষই আছেন। তাঁকে দেখতে চান?'—এই-না বলে তিনি উঠে গিয়ে কুটীরের দরজার ঝাঁপ খুলে ফেললেন। আমরা সকলে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ঘরের মধ্যে একটা বেদী, তার উপর ফ্রেমে-বাঁধানো একখানি বড় ছবি। ছবিখানির একপাশে এক মহাপুরুষের মূর্ত্তি, তিনি হাত জোড় করে রয়েছেন, আর তার সম্মুখে গোপালের আলেখ্য। সেই ছবির তলায় রাশি রাশি ফুল।

ছবিখানা দেখেই বিজুদার কেমন চমক লাগলো। সে জিজ্ঞেস করলো—'আপনার গুরুদেব খড়দা হ'তে অফিস করতেন, বললেন তো? তাঁর আসল নামটা কি ছিল বলতে পারেন?'

স্বামীজী বল্লেন—'পূর্ব্বাশ্রমের নামতো নেওয়া নিষিদ্ধ।' তারপর কি ভেবে জবাব দিলেন—'তা বলারই বা ক্ষতি কি? শুনেছি তাঁর সংসারের নাম ছিল অনন্ত গাঙ্গুলী।' গুরুদেবের নাম নিয়ে তিনি হাতজোড় ক'রে নিজের কপালে ঠেকালেন।

আমার লক্ষ্য হোল নামটা শুনে বিজু-দার সর্ব্বশরীর যেন কেঁপে উঠলো। সে জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—'তাঁর এ ছবি আপনি পেলেন কোথায়?'

স্বামীজী বল্লেন—'তাঁরই সঙ্গে ছিল এরূপই একখানা ছোট্ট ছবি। গোপালের পূজো করার জন্য হয়তো বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে নিয়ে এসেছিলেন। সেই ছবিকেই বড় ক'রে নিয়ে এখানে রেখেছিল।'

বিজু-দার গলার স্বর হঠাৎ উচ্চতর হ'য়ে উঠলো। সে বল্লো—'স্বামীজী, এ ছবিতো আমার দাদামশাইএর। আমার মায়ের কাছেও এ রকম একখানা ছোট ছবি দেখেছি। আর, দাদামশাইএর নামও তো ছিল অনন্ত গাঙ্গুলী।'

বিজু-দার কথা শুনে মহাবিস্ময়ে আমাদের কারুর কথা সরছিলনা। বিজুদা আপন মনেই যেন আবার বলে উঠলো—'দাদামশাইএর এ কাহিনী মায়ের মুখেও আমি শুনেছি। তাঁর বাড়ী ছিল খড়দায়, আর কাজও করতেন তিনি শেয়ালদা রেল-অফিসে। দিদিমাকে একলা ফেলে সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মা তাঁকে আমাদের বাড়ীতে এনে রাখেন। কিন্তু তিনি আর বেশীদিন টিকলেন না, একমাস পরেই দেহ রাখলেন।'

আমি দেখলাম—একথা বলতে গিয়ে বিজু-দার চোখের কোণে জল আসছে।

স্বামীজী তার পীঠের উপর নিজের ডান হাতখানি রাখলেন। সেই স্পর্শে বিজু-দার শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরণ উঠলো। তার চোখ দিয়ে ঝর্ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগলো।

'ভগবান্ ভগবান্, সত্যিই তুমি আছ।'—এই ব'লে সে সেই কুটীরের সামনে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লো।

বিজু-দাকে ভক্তিভরে ভগবানের নাম নিতে এ-ই প্রথম দেখলাম।

অনাহুতের প্রতি

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

STUDENTS' P. G. A. COMMON-ROOM

গরীবের কুঁড়ে ঘরে
মিটি মিটি জলে ক্ষীণ প্রদীপের শিখা,
ময়লা চাটাই, ছেঁড়া কাঁথা তার 'পরে
কে ওই শয়ান কঙ্কাল বিভীষিকা?

বিভীষিকা নয়, ও যে ও মানবী, ওযে ও কিষাণী বধূ,
মন্বন্তরে হারায়ে ফেলেছে হয়তো বুকের মধু;
তবু বেঁচে আছে, আশা-নিরাশায় তবু কাঁপে তার প্রাণ,
আজ বুঝি তার ভাঙা বুক জুড়ে নমে শিশু ভগবান!

শিশু ভগবান নামে?
এই কুঁড়ে ঘরে, এই দুর্দ্দিনে, রিক্ত এ চাষীধামে।
এক কৌটা মধু, এক বিন্দুও জীবনের সুধা নাই।
তুমি তো শুনেছি স্বরগের শিশু; হেথা কেন এলে ভাই?

জানি জানি মোরা তুমি বিধাতার প্রাণের প্রতিজ্ঞা,আলো,
এ-আঁধার ঘরে জননীর মুখে তুমি এসে দীপ জ্বালো,
কী গভীর সুরে এনে দাও তুমি জীবনের স্পন্দন!
তবু তো সরে না বরণ করিতে আমাদের ভীরু মন?

তোমারে হেথায়, এ শ্মশান মাঝে আমাদের লাগে ভয়,
কি জানি তোমার মত এ সৃষ্টি যদি বা ব্যর্থ হয়?

জাতীয় সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

[আলোচনা]

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

গত মাঘের বঙ্গশ্রী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র বসু "বাংলা গানে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান" সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুচিন্তিত ও উপভোগ্য। এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কবিবর প্রাণহীন নির্বীর্য্য বাঙ্গালী জাতিকে এক দিক থেকে হাসির গানে, অপর দিক থেকে এরই বিপরীত বীর্য্যবান গৌরবময় জাতীয় সঙ্গীতে বাংলা তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে নব সৌন্দর্য্যের সূচনা করেন। এ পর্য্যন্ত কোন গীতিকারই এই দুইদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালকে এগিয়ে যেতে পারেন নি, এ দুটি বিষয়ে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।'

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁহার হাসি ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক গান ও কবিতা লইয়া বাংলার সাহিত্য-গগনে উদীয়মান হ'ন, তখন রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু বাঙ্গালী জাতিকে হাসাইতে আসেন নাই, একদিন যে জাগাইবেন ও মাতাইবেন, তাহারও আশ্বাস দিয়াছেন।" (দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে "আষাঢ়ের" সমালোচনা দ্রষ্টব্যঃ কবির আধুনিক সাহিত্য পুস্তকে)।

রবীন্দ্রনাথ যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন বাঙ্গালী জাতিকে 'জাগাইয়াছেন ও মাতাইয়াছেন।'

রবীন্দ্রনাথ যে খুব বড় সুরকার সে কথা লেখক ইতি-পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন কিছুকাল পূর্ব্বে আনন্দবাজার পত্রিকায়। লেখক নিজেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন ভক্ত। কিন্তু সঙ্গীতের যে বিভাগে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারেন না (যথা হাসির গান বা জাতীয় সঙ্গীতে), সে বিভাগেও তিনি শ্রেষ্ঠ এ কথা যদি বলা বা লিখিত হয় তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্ধ ভক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার আলোচনায় সেই অন্ধ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের প্রভাব যখন খুব বেশী, বাংলায়ও তাঁহার মৃত্যুর পর যখন বৎসরের পর বৎসর দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় ও দ্বিজেন্দ্র-লালের বড় ছোট জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখেন, "বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্"এ আমরা যে তেজ দেখিতে পাই, যে পৌরুষ দেখিতে পাই, সে তেজ সে সজীবতা, সে পৌরুষ সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। ইহাই তাঁহারপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, তিনি নিজেই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, লোকে তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্তাবক বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্তাবক ছিলেন না, তাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত লইয়া বহু আলোচনা হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্থায়ী আসন স্বাধীন ভারতে গৃহীত হয়, ইহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্"এর পর যদি কোন সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার প্রশ্ন আসে, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি ইকবালের জাতীয় সঙ্গীতের স্থান পাওয়া উচিত "বন্দে মাতরম্"এর সঙ্গে।

"জনগণমন অধিনায়ক" গীত কোন প্রকারেই জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত নয়। গানের সুরও ভাল, রচনাও সুন্দর, কিন্তু বীর্য্য শৌর্য্য অপেক্ষা কাব্যিক উপভোগই বেশী। এই কাব্যিক উপভোগের dose বা মাত্রা তাহা কি গানে বা নাটকে বা গল্পে বা উপন্যাসে কিছু অধিক হওয়াতে আজ বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বদিক হইতে নিম্নস্তরে উপনীত হইয়াছে, বিরাট ক্লৈব্য আসিয়া শুধু বাঙ্গালী জাতি নহে সমগ্র ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই ক্লৈব্য বা "Fumes of opium"কে দূর করিতে হইলে দেশবাসীর "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে পূত পবিত্র হইয়া "আমার দেশ" সঙ্গীত-এর সাহায্যে বীর্য্য-শৌর্য্যে অনুপ্রাণীত হইয়া মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিতে হইবে।

সার্ব্বজনীন আবেদনে দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতের অভ্রভেদী শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত যে "বন্দে মাতরম্"-এর পর জাতীয় সঙ্গীত রূপে

ব্যবহৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে আলোচনা না হওয়ার কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের অল্পায়ু জীবন ও রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকাল উপস্থিতি।

দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় সঙ্গীতের সুরকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা উর্দ্ধে। কেন এ কথা লেখক বলিতেছেন, তাহার কারণ দিতে হইবে। কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের যে কোন জাতীয় সঙ্গীত মূল সুর বজায় রাখিয়া তাহা কি বাংলা কি সংস্কৃত বা কি ইংরাজী বা কি জার্ম্মাণ ভাষায় গাহিলে রক্ত গরম হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কোন জাতীয় সঙ্গীতকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়া কোন সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথের সুর এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছে, আমরা জাতীয় সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্রভেদী শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য যে ভ্রমাত্মক, তাহা স্বীকার করিব।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের একটা সার্ব্বজনীন আবেদন আছে (জাতীয় সঙ্গীতে),তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারেন কবির খ্যাতনামা পুত্র দিলীপকুমার—যখন তিনি তাঁহার পিতৃদেবের গীত প্যারি, বার্লিন, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে গাহেন। আর বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের এই সার্ব্বজনীন আবেদনের দৃষ্টান্তের সাক্ষী স্বরূপ আমরা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়কে উপস্থিত করিতে পারি।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র যুদ্ধের সময় একটী কলেজ inspect করিতে যান, সেই কলেজে তখন জার্ম্মাণ ইতালীয় সব সাহেব informed হইয়াছিলেন। সেই কলেজে বিভিন্ন দেশের এইরূপ পঁচিশ জন সাহেব দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি" বাংলায় একসঙ্গে গাহিয়া তাঁহাদের শোনাইয়াছিলেন। খগেন্দ্রবাবু ও শ্যামাপ্রসাদবাবু উভয়েরই সেই গীত শুনিয়া রক্ত গরম হইয়া ওঠে। সাহেবেরা বলেন যে, তাঁহারা ভাবেন যে—কোন ইংরাজী বা ইউরোপীয় সুর গাহিতেছেন। অথচ "জন্মভূমি"র ভাষা বাংলা ও সুর আমাদের ভারতীয়—রাগিণী কেদারা ভাঙ্গিয়া, যেমন আবার "আমার দেশ"-এর সুর ঝিঁঝিট-এরূপ কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথ একটী সুরেও দেখাইতে পারেন নাই। বরং "জনগণমন অধিনায়ক" গীতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সুরে যে প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করা কঠিন নহে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া যান নাই—তাঁহার নামে কোন "গীত বিতান" বা "বাসর" স্থাপিত হয় নাই,এবং রেডিও রবীন্দ্রনাথের গীতের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের গীত লোককে শুনিতে বাধ্য করাইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গীতের প্রচণ্ড propaganda করেন না। থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অভিনীত হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাম নাটকের পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় না—সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কোন প্রকার Propagandar বালাই নাই। লেখক নিজে রেডিওর কর্ণধারগণকে বলেন যে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেন ও কবি তাঁহাকে এই সংগীত শিখাইয়াছিলেন এবং লেখক নিঃস্বার্থ ভাবে রেডিওর আর্টিষ্টদের তিন চারিটী জাতীয় সঙ্গীত মূল সুরে শিখাইয়া দিবেন ও তাঁহারা orchestraর সাহায্যে chorusএ সেই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের গীতের ন্যায় গাহিবেন, কিন্তু তাঁহারা লেখকের কথায় কর্ণপাত করেন নাই - অর্থাৎ তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রচার চাহেন না। দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতএর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহাদের Artist জোটেনা, ইহাও লক্ষ্য করা যায়; তথাপি Radio Artist-দের দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা করাইয়া গাহিবার তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন না, কারণ পরাধীন ভারতে দ্বিজেন্দ্রলালের গীত রেডিওতে বন্ধ ছিল বহু কাল। হায় স্বাধীন ভারতের Radio! আজও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে! এই 'বঙ্গ আমার' গীতটীর কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া যথা 'ভারত আমার' 'বঙ্গ আমার' এর স্থলে ও "প্রতাপাদিত্য"-এর স্থানে "প্রতাপ সিংহ" পরিবর্ত্তন করিলে সমগ্র হিন্দুস্থানেই এই সঙ্গীত গীত হইতে পারে। দিলীপকুমার বহু পূর্ব্বেই এই গীতের উপরোক্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

লোক শিক্ষা ও জাতীয় চরিত্র গঠনের দিক হইতে রেডিওতে যাহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত প্রায়ই সুভাবে গীত হয় তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। রেডিওর এই মহা দায়িত্ব স্বাধীন ভারতে যে কতখানি তাহা রেডিওর কর্ণধারগণ সম্যক উপলব্ধি করেন না।

দেশের কল্যাণে জাতির কল্যাণে যাহাতে ভারতের দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলালের ও কবি ইকবালের সঙ্গীত প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টায় দেশবাসী অগ্রসর হ'ন, ইহাই একান্ত নিবেদন।

STUDENTS
R. G. A.
COMMON-ROOM

ভারতবর্ষ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

মহাকাল সাগরের দগ্ধ ধু ধু বালুকার তীরে,
মৃত্তিকায় গড়া মোর ধ্যানের মূরতিখানি খুঁজি ফিরে ফিরে!

আজিও অন্তর মাঝে
দেখিতেছি যে প্রতিমা মধুময়ী সাজে,
বাহিরে কি কাল-গর্ভে গিয়াছে লুকায়ে?
সে কি আর উঠিবে না—জাগিবে না—
বিশ্বেরে জাগায়ে?

স্বপ্ন নয়—
দেখিতেছি মনশ্চক্ষে মূর্ত্তি এক অনুভূতিময়।
বাহিরে অনন্তরূপে সমৃদ্ধির অজস্র সম্ভার—
দিকে দিকে কোটী হস্তে হতেছে বিস্তার!
ললাটে কাঞ্চন-দীপ্তি সূর্য্য-করে হতেছে বিম্বিত,
কল্লোল-মুখর-সিন্ধু নত হ'য়ে চরণে চুম্বিত!
অঙ্গের শ্যামল-দ্যুতি—দীপ্তিময় রত্নের প্রভায়—
সপ্তদ্বীপ-মধ্যমণি শোভিতেছে অনন্ত শোভায়।
দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র—শ্যামায়িত বিস্তৃত আসন—
অসীম অম্বর-শীর্ষ মহান্ দেউলে
মৃত্তিকার এ প্রতিমা কবে কোন্ ভক্ত ঋষি
করেছে স্থাপন?
অন্তরে নেমেছে শান্ত সুগম্ভীর ধ্যান,
মহাবোধময় সত্তা আপনাতে আছে মজ্জমান্।
বাহিরের সমৃদ্ধির সাথে
সার্থকতা-রূপ তার মিশে গেছে স্বর্গীয় আভাতে।
গভীর শান্তির রাজ্য—পার হয়ে দিগন্তের শেষ—
সর্ব্ব ওতঃপ্রোত হয়ে ছাড়ায়েছে স্থান-কাল-দেশ!

মহাশূন্য—নাই রূপ—নাই সৃষ্টি—নাই ধ্বংস খেলা,
মহা অবকাশ শুধু সজাগ-চেতনা ল'য়ে
ছুঁয়ে আছে এই বিশ্ব-সাগরের বেলা!
কিছু নাই—আছে সব কিছু—
পরিপূর্ণ জীবনের মাঝে—

বাহির অন্তর-যোগে
অস্তি অস্তি এই গান বাজে!
এই ত' ভারতবর্ষ—এই মোর মহাবিশ্ব—
এই মোর অনন্ত নিখিল!
স্নেহগঙ্গা ব'য়ে যায়—বাহিরে অন্তরে তা'র
বহুত্বের সাথে হেথা এককের মিল!
সম্মুখে চাহিয়া দেখি—চেতনা প্রদীপ্তা সেই
জননীর মৃত্তিকার কায়া,
কোথায় হারায়ে গেছে! প'ড়ে আছে শুধু তার ছায়া!
বাহিরে সমৃদ্ধি নাই—অন্তরেতে নাই সার্থকতা,
মিল নাই—ছন্দ নাই—পূজা নাই, মন্ত্র নাই,
নাই ভক্তি, নাই ব্যাকুলতা!
কে আছ পূজারি আজো, আছ ভক্ত,
কে আছ সন্তান!
দেখিছ না শূন্য হেথা মাতৃ-পীঠস্থান?
গ'ড় পুনঃ মায়ের প্রতিমা—
প্রাণের ঐশ্বর্য্য দিয়ে পুনঃ তার কর পূজা—
আনো ফিরে ভারত-গরিমা!

ভদ্রেশ্বর রায়

রমেন মৈত্র

টাকার অভাব নেই ভদ্রেশ্বর রায়ের। চারতলা স্কুল বাড়ীতে পাঁচশো ছেলে। ঠাকুর্দ্দার নাম খোদাই করা স্কুল। বংশানুক্রমিক প্রথায় ভদ্রেশ্বরের হাতে এসেছে।

নীচে লোক-লস্কর, মালী, চাকর, দরোয়ানদের আড্ডা ও বাসস্থান। ভেতরে মস্ত উঠোনে টিফিনের সময় ছেলেরা বাস্কেট্ বল খেলে, বিকেলে দরোয়ান চাকরেরা সুর ক'রে রামায়ণ পড়ে সেখানে। আর চারতলার ঘরে ভদ্রেশ্বরের সহোদরা মালিনী রায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে আধুনিক বাংলা গান শেখে। ওপরের ক'টা ঘরে ভদ্রেশ্বরের সংসার। লোকে বলে ভদ্রেশ্বরের ভদ্রাসন। বউ, বোন আর গোটা পাঁচ ছয় ছেলে মেয়ে। বোনের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। পাত্র জুটে ছিল, কিন্তু বিয়ে হয়নি। সবই বরাত। ঠাকুর্দ্দার দেওয়া স্কুল, আর স্কুলের ছেলেদের দেওয়া টাকায় ওজন বেড়ে গেছে ভদ্রেশ্বরের। বছর খানেক আগে ওর ওজন ছিল এক মণ বারো সের; ইদানীং আড়াই-এ দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে ও। বলতে গেলে বাকী পনেরটা মাষ্টারের ওপর খবরদারী করে ভদ্রেশ্বর বেঁচে আছে। খোট্টা দরোয়ানদের ভেতর থেকে পালা করে একজন প্রত্যহ এসে ওর সংসারের কাজ, বাসন মাজা, বাজার করা ইত্যাদি সেরে যায়। তাতে পয়সা লাগে না। নইলে একটা চাকর রাখতে গেলে—আজকাল কমসে কম পনের টাকা। গানের মাষ্টারকে প্রথম মাসের মাইনে না দেওয়ার পর থেকে লেন-দেনের ব্যাপার চুকিয়ে গেছে। মাষ্টার নিয়মিত আসে যায়; শুধু কষ্ট করে মাইনের কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিতে পারে না। এক কথায় ভদ্রেশ্বর রায়ের সুবিধে অপর্য্যাপ্ত। আয়ের তুলনায় ব্যয় ঢের কম।

মহাত্মাজীর ভক্ত ও। দুবার তাঁর মেমোরিয়াল ফণ্ডে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে এসেছে। স্কুলের অন্য মাষ্টাররা মুখ বেঁকিয়ে হাসে—ভণ্ড কোথাকার! কিন্তু তবুও টাকার অভাব নেই ভদ্রেশ্বর রায়ের।

স্কুল-বাড়ীর লাগোয়া ছোট্ট একটা ঘর। ওর খাস কামরা। সারা স্কুলের গোলমালের ভগ্নাংশও ওর ঘ[রে] ঢোকে না। দরজায় পর্দা ফেলা। ভেতরে টেবিলে[র] ওপরে ইলেক্‌ট্রিক পাখা ঘোরে। সাদা কাগজের ওপ[র] হোঁচট খেতে খেতে ওর হাত থেমে যায়, কলম প[ড়ে] এলিয়ে; স্কুলের আগামী কালের অধিবেশনের ভাষ[ণ] লিখতে লিখতে ঘুম আসে ওর চোখে।

কী ভিড়! ছেলেদের কী ভিড়। রাশি রাশি ব[ই] খাতা, কাগজ, কলম, পেনসিল, কালি, ইংরেজী বিদ্[যা] শিক্ষার কী অপরিমিত আড়ম্বর। ভদ্রেশ্বর স্বপ্ন দেখে[:] এরা ওর দেশের ছেলে, নিজের ভাই, আগামীদিনে[র] ভবিষ্যৎ, জাতির মেরুদণ্ড। এদের তৈরী করে তুলত[ে] হবে। পৃথিবীর সামনে এদের কোরে তুলতে হবে উন্নত কষ্টসহিষ্ণু, স্বার্থত্যাগী। মহাত্মাজীর জীবনের আদর্শে[র] সঙ্গে সমতা রেখে এদের কোরে তুলতে হবে তাঁর যাত্রা পথের পথিক। এদের মধ্যে দিয়ে জাতিকে নূতন ক[রে] গড়ে তুলবে ও। এদের ভেতর দিয়ে জনগণের দৃষ্টিভ[ঙ্গী] ফেরাবে ও। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুকে তার অন্ধকার গভীর ভেত[র] থেকে ও টেনে নিয়ে আসবে আলোতে। এই ও[র] জীবনের আশা।

> "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
> এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

স্কুলবাড়ীর দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় কাটা[র] আগাছার অভাব হয়নি। নিম আর অশথ। পুরাতনী সাক্ষী। কল্পনাপ্রবণ ভদ্রেশ্বর। পরগাছা নির্মূল কর[ার] প্রবৃত্তি নেই, বলে—যারা আপনি গজায়, তারা আপ[নি] ঝরে পড়ে। তবে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনাকে ওর ব[ড়] ভয়। ভূমিকম্পের নামে ও বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে প[ড়ে] পুত্র পরিবার সব কিছু নিয়ে।

হচ্ছে নাকি ভূমিকম্প? থর থর করে কাঁপ[ছে] কাঁপতে ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি, বিম, জয়েন্ট সব খসে খ[সে] পড়ে যাচ্ছে নাকি? তবে? তবে? তন্দ্রা ছুটে যা[য়] ওর। উঠিয়ে নেয় চিৎ হয়ে পড়া কলম। সারা অ[ঙ্গ] ঘামে। অসমাপ্ত লেখাটার জন্যে মুখ ফেরাতেই চম[কে] ওঠে। সামনে বটু মুকুজ্জে। মালিনীর গানের মাষ্টার খানিকটা লেখা কাগজ বটু মুকুজ্জে তুলে দিলো খ[...]

হাতে। ভদ্রেশ্বর তাড়াতাড়ি চেয়ার দেখিয়ে দেয়: "বসুন বসুন।" বটু বসলো। খানিকটা চুপ করে থাকার পর বললো: "শুনলুম ডেকেছেন আমাকে। ব্যাপার কি বলুন তো?"

"ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয়।" হোঃ হোঃ করে হাসলো ভদ্রেশ্বর; সামনে পূজোর ছুটি। স্কুল বন্ধ হচ্ছে পরশু।

"ছেলেরা ধরে বসেছে কাল একটু উৎসব আহ্লাদ করবে। আবার খুললেই এগ্‌জামিন তো।"

'ও।' ভালো করে বসলো বটু: "তা বেশ, তা বেশ।"

"ছেলেদের আব্দার, আপনাকে ছাড়া কাউকে দিয়ে ওপেনিং সঙ্‌ গাওয়াবে না, আমাকেও রেহাই দেয়নি, বলেছে—একটা ভাষণ লিখে দিতে হবে আমাকে। আর সভাপতির চেয়ারে বসে তা আবার পড়তেও হবে। ছেলেদের কাণ্ড, না ভূতের কাণ্ড, দেখুন না—এর মধ্যে আমাকে আবার সভাপতি করাও ঠিক হয়ে গেছে। আরে বাবা—আমার কি মরবার ফুরসৎ আছে ছাই।"

'আপনি হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা।' হাসলো বটু, 'ছেলেদের আব্দার আপনাকে তো সইতেই হবে।'

'কিন্তু আমার অবস্থা যে একেবারে চরমে উঠেছে। কাল স্কুল, পরশু ইউনিভারসিটি, সামনের সপ্তাহে বাগবাজারে 'মহাত্মাজী-স্মরণে'। সেখানে নিশ্চয় কিছু পড়তে হবেই। তার জন্ত লিখতেও হবে। বয়স তো হোল, না কি বলেন? শরীরে আর সয় কত! তবুও কাউকে আমি নিরাশ করিনি। সময় পেলেই লিখছি, জিরোচ্ছি আবার লিখছি।'

'ধৈর্য্য আছে আপনার সত্যি।'

'ভুলচুক তো ছেলেদের সামনে পড়তে পারি না। একটু দেখে শুনে দিতেও হবে।' চোখে চশমা লাগালো ভদ্রেশ্বর···আর চোখের সামনে তুলে ধরলো খানিকটা লেখা কাগজ।

'অতদূর থেকে দেখতে পান?' জিজ্ঞেস করলো বটু। 'এ-তো কাছে, এর চেয়ে দূর থেকে আমি লেখা পড়তে পারি।'

'পড়ুন না শুনি কি লিখলেন—'

'এঁ্যা শুনবেন?' মুখগহ্বর বিস্তৃত হোল ভদ্রেশ্বরের: "পড়বো বলছেন? তা বেশ,—তাতে এমন কি আর হয়েছে! কাল তো সভায় পড়তেই হবে।"

একটু দম নিয়ে ভদ্রেশ্বর পড়ে চললো:

হে কিশোর জাগো। অহিংসমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া আগামীকালের জন্ত প্রস্তুত হও। দৃঢ় হস্তে স্তায় ও সত্যের বর্ত্তিকা তুলিয়া লও। অন্ধকার পথ আলোয় আলোকিত হইয়া উঠুক।

অন্ধকার হয়ে আসে। ঘরের ভেতরেও জমে ওঠে অন্ধকার। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি টাঙানো ছবি। যীশু, বিবেকানন্দ, পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী···আরও কত কে! জগতের কল্যাণকামীর প্রতিকৃতিতে দেওয়াল ভারাক্রান্ত।

বটু কান দিয়ে ভদ্রেশ্বরের ভাষণ পাঠ শোনে আর চোখ ঘুরিয়ে দেখে ছবিগুলো। তারপর এক সময়ে উঠে পড়ে: 'একটু তাড়াতাড়ি আছে।'

ভদ্রেশ্বর মুখ তোলে। বটু হাসে:

'এ লেখা আপনার হাত ছাড়া অন্ত কারও হাত দিয়ে কি বেরোয়?'

'তেমন শক্তি সামর্থ্য আর কই?' গদগদ কণ্ঠে বলে ভদ্রেশ্বর—'তাহলে ঐ কথাই রইলো—কাল পাঁচটার সময়ে একেবারে চলে আসবেন আমার বাড়ীতে। উদ্বোধন সংগীত আপনার তো ঠিক একটা করাই থাকে—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আসবো।'

'মণি গান টান শিখছে কেমন?' বটু এগিয়ে যায় দরজার দিকে। 'খাটলে হবে মনে হচ্ছে।' বেরিয়ে গেল ও।

বিলিতি লোকগুলো,—ঐ সব বিলিতি লোকগুলো দু'শো বছর ধরে এদেশের লোকগুলোকে শাসিয়ে ঠেঙিয়ে এদের মেরুদণ্ড তো ভেঙে দিয়েছেই, তা ছাড়া এমনি ধ্যাঁচড়া আর লোভী করে গেছে যে, ভাবলে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। নইলে ভদ্রেশ্বর রায় এত বক্তিমে দেয় কেন? পেশা তো মাষ্টারী করা, খুলে বসেছিস লেখাপড়া বিক্রির দোকান, তা তোর এত বক্তিমের ঘটা কিসের! এই সব বক্তার দলই আমাদের বরাবর উৎ-

সয়োয় দিয়ে এসেছে, আর যদ্দিন এরা বেঁচে থাকবে ততদিন জ্বালাবে সকলকে। ধাপ্পাবাজী আর ভণ্ডামিতে বক্তৃতার ঝুলি একেবারে বোঝাই। সব শালা পুরুত ঠাকুর। বাঁধা গৎ মুখস্থ করা বুলি। খুব জোড়ে বটু একটা নিশ্বেস ফেললো। ঐ সমস্ত পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভাবতেও ভয় করে। ফটক পেরিয়ে রাস্তায় আসবার আগে বটু প্রতিজ্ঞা করে এলো—আর কোনদিন ও বাড়ীতে পা দেবে না। তিন মাসের বাকী মাইনের শোকটা কোনমতে ভুলতে চেষ্টা করবে ও।

আর অন্ধকার ঘরের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ভদ্রেশ্বর। শিয়রে ভাজ করা কাগজটা—যাতে খণ্ড ভারতকে নুতন করে জোড়া লাগানোর কামনা ও পরিকল্পনা নিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা সাজিয়ে লিখে ফেলেছে ভদ্রেশ্বর; যাতে কবির কবিতার একছত্র তুলে দিতেও ভোলেনি :

"খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি—"

সেই দোমড়ানো কাগজখানা ওর শিয়রে, ওরই মত স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে আছে।

সত্যি—এত ছেলে ওর স্কুলে হবে কি নাকি, ও-ই কোনদিন স্বপ্নে দেখেছিল? র‍্যাডক্লিফকেও রোজ একবার করে স্মরণ করে এবং ধন্যবাদ দেয়। র‍্যাডক্লিফকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি না থাকলে, এত ভালো করে এমনি নির্মম ভাবে, ভারতবর্ষকে কে খণ্ড-ছিন্ন করতে পারতেন? ভাগ্যিস্ তিনি এই মহৎ কাজ করেছেন—একসংগে এতগুলো নতুন ছেলের মুখ তবেই তো ভদ্রেশ্বর দেখতে পাচ্ছে, তবেই তো নতুন নতুন জায়গা থেকে এত ছেলে এসে গেলো ওর স্কুলে।

জানালা দিয়ে হাওয়া আসে। নেশা লাগে ভদ্রেশ্বরের। ও ভাবে দু'তিনটে ছোট খাটো অঞ্চল নিয়ে আবার যদি একটা ভাগাভাগির পালা পড়ে—তাহ'লে? চারতলার ওপরে এস্‌বেস্‌টসের ছাদ করে একটা লম্বা হলঘর করা যায় না? খুব যায়। কত খরচ? দু'মাসে সে খরচ উঠে আসতে পারে। করা যায় না—একটা বড়ো হলঘর? তার পরেই রবিবারের কোন দৈনিকে বিজ্ঞাপন : 'এখনও ভর্তি চলিতেছে।' ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে ভদ্রেশ্বরের। যায় না করা? এ সমস্ত সামান্য দু' তিনটে কাজ ভদ্রেশ্বর করতে পারে না? অনায়াসে অক্লেশে। শুধু ক'টা অঞ্চল ভাগাভাগি হওয়ার যা দেরী। 'হে ঈশ্বর!' ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ভদ্রেশ্বরের ভক্তি উথলে ওঠে : 'ভাগাভাগিটা তাড়াতাড়ি করে দাও ঈশ্বর।'

আগামী আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' নববর্ষ সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সুচিন্তিত রচনায় এবং চিত্রে ও গঠনপারিপাট্যে সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ ও সুশোভিত হইবে।

পুস্তক ও আলোচনা

ইরাবতী—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক: দিগন্ত পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য—চার টাকা।

একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী অবাঙ্গালী বড় একটা দেখা যায় না—উপন্যাসের ঘটনাক্ষেত্রও ভারতবর্ষের বাহিরে যায় না। ইহার একটা কারণ, বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের কর্ম্মক্ষেত্র এমন কি কল্পনাক্ষেত্র তাঁহাদের সমাজ ও দেশের গণ্ডী পার হইবার সুযোগ পায় নাই। বাংলাদেশ, বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বাহিরে কল্পনার বিহার হইলে যে রোমান্সের সৃষ্টি হয়, ইরাবতীতে সেই রোমান্সের সৃষ্টি হইয়াছে। ইরাবতীর আখ্যান ভাগের ঘটনাক্ষেত্র ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর অববাহিকা। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মী, চীনা, বেববাদী, সঙ্করজাতীয় মুসলমান। এইগুলি ছাড়া বাঙ্গালী, পোর্তুগীজ, জার্ম্মাণ, গুজরাটী ইত্যাদি জাতীয় লোকেরও সমাবেশ আছে। নানাজাতীয় লোকের কালচারের মিশ্রণে একটা যে ঔপনিবেশিক জীবনধারা ইরাবতীর স্রোতোধারার সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়াছে—এই উপন্যাসে তাহাই হইয়াছে উপজীব্য। আর সকল জাতির নরনারীর মধ্যে যে মনোবৃত্তি সাধারণ—সে-মনোবৃত্তিতে বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ, কৃষ্টিভেদ নাই—সেই আদিম অকৃত্রিম মনোবৃত্তিই ইহার প্রাণবস্তু। উপন্যাসের ঘটনাধারাকে গত মহাযুদ্ধের শোণিতধারার সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে উপন্যাসখানি একটি উচ্চশ্রেণীর দেশাত্মবোধমূলক ভাবাদর্শ লাভ করিয়াছে। এই ভাবাদর্শেই সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক বীরব্রতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। অনুন্নত ব্রহ্মদেশের নরনারীর শোণিতধারার স্বাধীনতা-প্রীতি যে কতটা প্রবল ও প্রখর ছিল—তাহা এই উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের জাতীয় চরিত্র সমগ্র গ্রন্থখানিতে অনুস্যূত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে আমরা ব্রহ্মদেশকে পাই, কিন্তু ব্রহ্মের জাতীয় চরিত্র পাই না। ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী চরিত্রই পাই। ইরাবতীতে আমরা যেমন যথাযথ প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্রাহ্মী নারীশ্রেণী পাই, ব্রহ্মের জাতীয় জীবনকে তেমন যথাযথভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বঙ্গসাহিত্যে নিম্নপল্লীর সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রীয় জীবনে নরনারীর লীলাবৈচিত্র্যের অভাব নাই। সমাজ-সংসারের ভগ্ন অবস্থায় ও রাষ্ট্রিয় জীবনের বিপর্য্যয়ের মধ্যে অসহায় লক্ষ্যভ্রষ্ট নিয়তি-তাড়িত মানুষের চাঞ্চল্যকর জীবনচিত্র খুব কমই আছে। এই হিসাবে ইরাবতী একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা লাভ করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। জীবনমৃত্যুর আলোছায়ার সম্পাতে ইরাবতীতে যে গোধূলিচিত্রের প্রতিফলন হইয়াছে—তাহা অনন্যসাধারণ। ইরাবতীস্রোতে ভাসন্ত নৌকার উপর শত্রুর অস্ত্রে গতপ্রাণ মহাপ্রাণ দেশভক্ত বীর থাকিনের প্রশান্ত মুখচ্ছবিতে দিগন্তের রক্তালোকের আভা পড়িয়াছে—ঐ আভাই ইরাবতীর জলতরঙ্গ ও শোণিত-তরঙ্গে পরিণত হইয়াছে। ঐ রক্তালোক কিসের? বাঙ্গালী বোমার আঘাতে জলন্ত তেলের কলের আগুন?—না এশিয়ার চিরপ্রতীক্ষিত নবযুগের অরুণোদয়ের রক্তচ্ছটা! এই চিত্রটিই ইরাবতীর শেষ চিত্র। ইরাবতী পাঠ শেষের পর এই চিত্রটিই পাঠকের চিত্তে অমর হইয়া থাকিবে।

—কবিশেখর কালিদাস রায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ প্রণীত। মূল্য—১৷৹।

গ্রন্থকারের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফলে এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ লাভ সম্ভব হইয়াছে। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব। এই কারণেই তাদৃশ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবর্জ্জিত সাধারণ পাঠকের নিকট এই ব্যাখ্যা মনঃপূত না হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু ইহা সাধারণ পাঠকের তাদৃশ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মেষে হয় তো কিছু সাহায্য করিতে পারে। আদ্যোপান্ত মন দিয়া পাঠ করিলে গ্রন্থকারের বক্তব্যের সহিত পূর্ণ পরিচয় জন্মে। তখন, এই দুরূহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তিনি আগাগোড়া যেরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিনব তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষার দক্ষতার সহিত তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের সুখবোধ্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শক্তি, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রশংসা করিতে হয়। চণ্ডীগ্রন্থের অঙ্গীভূত কামনাকণ্টকিত প্রার্থনাবাক্যগুলি নিষ্কাম সাধকের সাধনোচিত দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তিনি একশ্রেণীর সমালোচকের বৈমনস্য পরিহারে সাহায্য করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম-এ মহাশয় ইহার ভূমিকায় সংক্ষেপে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন।

আমরা কামনা করি, এই গ্রন্থের পাঠক[illegible]

রূপলোক

যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির দরুণ অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগে কতিপয় লোক চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহার পিছনে দুইটি কারণ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। একটি হইল আত্মপ্রচার এবং অপর বড় দিকটি হইতেছে বৃহত্তর লাভজনক এই পথে টাকা খাটাইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা। কেহ কেহ যে এ-পথে কৃতকার্য্য না হইয়াছেন, তাহা নহে; অনেকে কার্য্যে সফল না হইয়া ইতিমধ্যে সরিয়াও পড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য তাহা লইয়া নয়। এই পথে অতিরিক্ত লোক ঝুঁকিয়া পড়ায় বিভিন্ন ষ্টুডিওতে বহু চিত্র নির্ম্মিত হইয়া প্রদর্শনীর অপেক্ষায় মজুৎ থাকে। তাহার কারণ হইতেছে এই যে, ষ্টুডিওগুলিতে যে-পরিমাণে ছবির কার্য্য সমাপ্ত হইতে লাগিল, তদনুসারে সহরে প্রেক্ষাগৃহের অভাব। প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠাও একটি মুনাফাজাত ব্যবসায়। অতএব এই সুযোগে প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণের দিকেও অনেকে ঝুঁকিয়া পড়িল। যখন র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ রোয়েদাদের ফলে বাংলাদেশ ভাগ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে আশ্রয়হীন লোক আসিয়া কলিকাতার পথে ফুটপাথে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল, বাসস্থান চাহিয়া হাহাকার উঠিল চতুর্দ্দিক হইতে, ঠিক এই সময়েই অনেকগুলি নতুন প্রেক্ষাগারের জন্ম। শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্য হইতে অনেকে বলিলেন, দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত মানুষ দিনান্তে অন্ততঃ একটি জায়গায়ও আসিয়া দুঃখ ভুলিবার অবকাশ পাইবে। এ-কথা বলিবার পিছনে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল; অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহ ছিল—তাহাতে সর্ব্বসাধারণের স্থান সঙ্কুলান ছিল অসম্ভব। নতুন প্রেক্ষাগৃহগুলি নির্ম্মাণের ফলে সেই অসুবিধার মেঘ অনেকখানিই কাটিল। আমরাও বলি—কাটিল। কাটিল সত্য, লোকসমাগমও প্রচুর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যে-কারণে প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণের এত কিছু তোড়জোড়, সেইখানেই ফাঁক থাকিয়া গেল। আজ আর কোনো একখানি চিত্রও একটি চিত্রঘরে সাধারণতঃ দুই এক সপ্তাহের বেশী প্রদর্শিত হইতে দেখা যায় না। দুই দিনেই 'হাউস্ ফুল' হইয়া আবার 'হাউস্ ভ্যাকান্ট' হইয়া যায়। ইহার দ্বারা দর্শকসাধারণের চিত্রবিমুখতা প্রতিপন্ন হয় না, প্রতিপন্ন হয় মনোরম কাহিনী ও সাবলীল সংস্কৃতিপূর্ণ চিত্রের অভাব। যুদ্ধকালীন অবস্থার মতো লোকের হাতে অবশ্য আজ আর উদ্‌বৃত্ত অর্থ (Money) নাই, কিন্তু যে চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইল—তাহার অর্থ আছে এবং অর্থ (Meaning) থাকা চাই। কিন্তু অধিক চিত্রই আজ অর্থহীনভাবে জোড়াতালি অবস্থায় চিত্রগৃহের পর্দায় রূপায়িত হয়। যে শ্রান্ত মন লইয়া দর্শক শ্রম-মুক্তি খুঁজিবার প্রত্যাশায় প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আরও অধিক বিক্ষোভে মন তাঁহাদের ভারী হইয়া ওঠে। আপামর সমস্ত বাংলা চিত্র সম্বন্ধে না হইলেও অধিক চিত্রক্ষেত্রেই এই অবস্থা। যে-যুগে বাংলা কথা-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানিত, সে-যুগে বাংলা চলচ্চিত্রের এই নিম্নগামী অবস্থা নিন্দার ও পরিতাপেরই বিষয় নয় কি?

'বিদুষী ভার্য্যা' চিত্রের একটি দৃশ্য

আমরা একটা জিনিষ স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—সাধক সাহিত্যিক-কাহিনীকারদের তুলনায় অর্থপিপাসী অসাহিত্যিক-কাহিনীকারদেরই চিত্রে প্রাধান্য অধিক। এই প্রাধান্যের ফলেই চিত্র যথার্থ বর্ণাঢ্য ও মনস্তাত্ত্বিক শিল্পের ক্ষেত্রে দিন দিন পিছাইয়া পড়িতেছে। সাহিত্যিকদের কাহিনীকেও প্রযোজক মহল হইতে ইচ্ছানুরূপ কাঁচি-ছাঁটা করিয়া তবে পরিচালনা তথা প্রদর্শনীর কাজে লাগানো হয়। এই ব্যাধি আজ বাংলা চিত্র-জগতে এমন সুন্দর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, মনে হয়—সহসা ইহা

নিরাময় করা একান্তই কঠিন। কিন্তু এই কাঠিন্যকে যতক্ষণ পর্যান্ত না—ভাঙা চলিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যিকারের সুষ্ঠু সমাজ-চিত্রের সার্থকতা সম্ভব নয়।

বাংলার স্থান আগাগোড়াই সীমাবদ্ধ। বঙ্গভঙ্গ হইবার পর তাহা আরও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্থানে একাধিক বাংলা চিত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এদিকেও পশ্চিম বঙ্গ-সরকার 'Amusement Tax' বর্দ্ধিত করিয়া জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের বহুলাংশে প্রশমণ করিয়াছেন। এ সময়ে বাংলা চিত্রের যে দায়িত্ব—তাহা প্রযোজকবৃন্দকে চিন্তার সঙ্গে অনুধাবন করিতে হইবে। বাংলার সমাজ-চিত্রের সার্থকরূপ যদি চিত্রে প্রতিফলিত না হইল, তবে মিথ্যা সেই চিত্র-প্রদর্শন। আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারেরও একটা বড় দায়িত্ব রহিয়াছে চলচ্চিত্র জগতের। অথচ সে দিকটা এখনও একেবারেই অন্ধকারে ঢাকা। সেই দিকটাকে উদ্ঘাটন করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে সেন্সার বোর্ডকে বাধ্য করিতে হইবে চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করিতে। এইভাবে ক্রমে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে চিত্র-জগৎকে। একই নায়ক-নায়িকা বা একই কাহিনীর ওলট-পালট বিষয়-বস্তুর ভিত্তিতেই আজ একাধিক চিত্র-নির্ম্মান লক্ষ্যে পড়ে। যে ছবিটি ভাগ্যক্রমে টিকিয়া গেল—অমনি সুরু হইয়া গেল তাহার ব্যর্থ অনুকরণ। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া অগ্রগতির পথে আজ আর কোনো চিত্রকেই বড় একটা অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে না। আজ সমাজের এতবড় একটা ঐতিহাসিক ভাঙনের মুহূর্ত্তে নানা ভাবে গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে চিত্রকে। কিন্তু সেইদিকে যথার্থই কি আমাদের চিত্র-নির্ম্মাতাদের দৃষ্টি আছে? সেই দৃষ্টি নাই বলিয়াই আজ প্রেক্ষাগৃহের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কোনো একখানি চিত্রই সপ্তাহকালের বেশী জীবনীশক্তি লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই দিকে আজ চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ ভাবে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

টুক্‌রো খবর

কলিকাতার মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে শ্রী এস্, এন্, কারনাণী প্রযোজিত ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিক্‌চার্সের নতুন চিত্র 'নিরুদ্দেশে'-এর প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে চিত্রখানির খ্যাতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলে জোর গুজব উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল—চিত্রখানি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। গীতিকার প্রণব রায় ইহাতে কাহিনীকারের ভূমিকা লইয়াছেন। অভিনয়ে দুইটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন অসিতবরণ ও রবীন মজুমদার। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার ও সুপ্রভা। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী।

*

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে সাহিত্যিক-পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় মহাভারতীর প্রথম চিত্র 'কুয়াসা'র কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যান্য চিত্রের ন্যায় এই ছবিখানিও দর্শকবৃন্দকে নিরাশ করিবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় দেখা দিবেন ছায়া দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শিপ্রা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত 'কালোছায়া'র অনুরূপ আর-একখানি ডিটেক্‌টিভ চিত্রের কাজ সুরু করিয়াছেন মহাভারতী। কাহিনী ও পরিচালনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের। চিত্রখানির নাম 'আবার কালোছায়া'।

*

'নন্দরাণীর সংসার'-এ যোগেশ বাবুকে হত্যা করিয়া যোগেশ নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নন্দরাণীর সংসারের সংসারত্ব কিছুই নাই, আছে কেবল মহিমের ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের কথা। ছবি বিশ্বাস প্রভৃতির অভিনয় তাঁহাদের চিরাচরিত নিজস্ব ধারা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে; কিন্তু যোগেশ বাবুর গল্পের ভাব একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি নতুন গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে মহিমের কথা ভিন্ন অধিকাংশ চরিত্রই চটুলতাপূর্ণ; মনে হয়—জোর করিয়া হাসাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করা হইয়াছে মাত্র।

*

শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় ভারতী চিত্রপীঠের 'দাসীপুত্র' চিত্রখানি আগামী ২০শে মে প্রাচী চিত্রমঞ্চে মুক্তিলাভ করিবার কথা চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে 'রামপ্রসাদ' চিত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত গুপ্ত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। দাসীপুত্রে তাঁহার সেই নাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়াই মনে করি। একটি মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা-সঙ্ঘাতে দাসীপুত্রের কাহিনী রচিত।—'জীবনের বহু ঘাত-সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া একটি পরিচারিকা দাসী তাহার পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিল, সমাজে প্রতিষ্ঠা করিল। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে দাসীপুত্র সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইল; কিন্তু যে মা দাসীবৃত্তি করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিল, তাহার কলঙ্ক কাঁটার মতো বিঁধিয়া রহিল। সমাজ পুত্রকে স্থান দিতে চায়, মাতাকে ঘৃণা করে।'...কাহিনী রচনাও দেবনারায়ণ বাবুর নিজের। চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযুবালা, রাণীবালা, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি।

*

কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে এম্, পি'র 'বিদুষী ভার্য্যা' চিত্রখানি পূরবী প্রভৃতি চিত্র গৃহে সাড়ম্বরে প্রদর্শিত হইতেছে। দুইটি তরুণী অভিনেত্রী মলয়া ও কবিতার অভিনয় তারুণ্যের দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদকীয়

কবিব্রত

"দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।"

ইহা শুধু কবি-উক্তি নহে। বাংলা বর্ষপঞ্জীর এই স্মরণীয় দিনটি সত্য-সত্যই সভ্য জগতের সকল বিদগ্ধজনকে আহ্বান করিয়া বলে :

"আজ হইতে বিশেষ ক'টি বছর পূর্ব্বে আমার এই পুণ্য-তিথিতে এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে তোমরা স্মরণ করো।"

বাঙ্গালীকে ডাক দিয়া এই তিথি আহ্বান জানায় :

"তোমাদের ভাষার প্রাদেশিকতাকে বিশ্বরূপে অলঙ্কৃত করিয়াছেন যে মহ...রূপকার, সেই রবীন্দ্রনাথ আমারই এই তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমার ঐতিহ্য, তোমার সংস্কৃতি, তোমার চিন্তার আদর্শকে তিনিই উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। তোমার উজ্জীবিত ঐতিহ্য তাই আজ পৃথিবীর সংস্কৃতি-সমাজে বরেণ্য। স্মরণ করো সেই অপরূপ রূপকারকে, উদ্‌যাপিত করো আমাকে।"

ভারতবাসীকে ডাকিয়া এই পুণ্য পঁচিশে বৈশাখ বলে :

"ভারতের সত্যকার পরিচয় তাহার চিন্ময় প্রকাশে, তাহার অবিভক্ত ভাবমানসে, তাহার আইডিয়া-রূপ রূপাতীত সত্তায়। ইতিহাসের স্থূল হস্তাবলেপে ভারতের ভৌগোলিক দেহ বহুবার ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, বহুবার রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার যূপকাষ্ঠে ভারতের মৃণ্ময় অভিন্নতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের অক্ষত ভাব-মানসকে কেহ কোনোদিন আঘাত করিতে পারে নাই। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিস্মৃত সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যিনি, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাই বরণ করো ভারতের এই সত্তাকে, স্মরণ করো সেই উজ্জীবককে, পালন করো আমাকে।"

পৃথিবীর মানুষকে এই পঁচিশে বৈশাখের পুণ্যতিথি আহ্বান জানাইয়া বলে :

"আঘাতের পর আঘাত পাইয়া তুমি নিজের ভবিতব্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছ, অকল্যাণ ও পশুধর্ম্মের অন্তহীন উন্মত্ততা তোমার সাধের সভ্যতা-বিগ্রহকে ভাঙ্গিয়া খান-খান করিতেছে। তাই শোচনীয় সংশয়ে আজ তোমার সকল শুভেচ্ছা পঙ্গু। কিন্তু হতাশ হইও না, তোমার বিশ্বাসকে অক্ষত রাখো। শোন, আমার এই তিথিতে জাত সত্যদ্রষ্টা ঋষি কী বলিয়াছেন :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি; পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম. ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট। সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শে... পর্য্যন্ত রক্ষা করবো। আশা করবো মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর, একদিন অপরাজিত মানু... নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্র... ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবা... পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভব... চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে ... করি।"

হে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মানুষ, হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-বিক্ষি... ভারতের অধিবাসী, হে অহল্যা পৃথিবী, জীবন-দ্রষ্টার এ... নিষ্কলুষ জীবনবাদে আস্থা রাখো। 'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব'—বিশ্বপাপের যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়াছে, সংশয়জিৎ আত্মবিশ্বাসে সেই বিশ্বপাপকে আঘা... করো। কল্যাণের সর্ব্বময় প্রতিরূপ ঈশ্বর তোমাদে... সহায়—তোমরা জয়ী হইবেই। আর স্মরণ করো এ... বিশ্বাসের বজ্রবাণী শুনাইয়াছেন যিনি, সেই মহামানবে... আর শুধু শুষ্ক অনুষ্ঠানে নয়, হৃদয়ের প্রেরণা নি... উদ্‌যাপিত করো এই পুণ্যতিথি পঁচিশে বৈশাখকে।

সোনার পাথর-বাটি

যাহা এতদিন ছিল শুধু জল্পনা-কল্পনা, সৌখীন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক মহলের অনুমান, গত মাসে লণ্ডনে তাহা সমর্থিত তথ্যের মর্য্যাদা পাইয়াছে। বৃটেনের ঝানু ও কূটনীতিজ্ঞ নায়করা খেলাইয়া খেলাইয়া ভারতকে তাহাদের কমনওয়েল্‌থের ডাঙ্গায় শেষপর্য্যন্ত ঠিক টানিয়া তুলিয়াছেন।

ব্যাপারটিতে আমাদের দেশের রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে হয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিশ্বশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ভারতের কংগ্রেস—ইহারা গত বছর-দুই ধরিয়া এক দুরতিক্রম্য উভয় সংকটের খপ্পরে পড়িয়া বড় বানচাল হইয়া যাইতেছিলেন। যে-বৃটেনের সদিচ্ছার(?) ফলে কংগ্রেস নিষ্কণ্টকিত হইয়া বিকলাঙ্গ ভারতের শাসনভার লাভ করিয়াছে, সেই বৃটেনের সুহৃদদের একেবারে তালাক দিয়া দিতে পণ্ডিতজীর কেমন যেন মন সরিতেছিল না। অথচ তিনি এবং কংগ্রেস আজ কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারত-বাসীর জাতীয়মানসের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার যে নির্মল আলেখ্যটি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে বৃটেনের স’হত সমুদয় সম্পর্ক সংস্রবই ত্যাগ করিতে হয়। পণ্ডিতজী এবং তাঁহার নেতৃত্বচালিত ভারত সরকারের ইহাই ছিল উভয় সংকট। তাঁহারা শ্যাম না কুল রাখিবেন, ইহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না; বৃটেনের ঝানু কূটনীতিজ্ঞরা পর্য্যন্ত সমস্যাটির একটি মীমাংসা করার জন্ত হিম্‌সিম্ খাইয়া যাইতেছিলেন।

এবারকার লণ্ডন কনফারেন্সে সেই সংকট মিটিয়াছে। পণ্ডিতজী তাঁহার সুহৃদদের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করিয়া, নিজের মস্তিষ্ককে তার চেয়েও অনেক বেশী আলোড়িত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি শ্যাম আর কুল কাহাকেও ফেলিবেন না, কেহই ফেলনা নয়। ইংলণ্ডেশ্বরকে প্রতীক-প্রভুরূপে মানিয়া নিয়া তিনি ভারতকে কমনওয়েলথেরও অন্তর্ভুক্ত করিবেন, আবার ভারতকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলিয়াও ঘোষণা করিবেন। ভারতের রাজনৈতিক মহলের একাংশ হাফ ছাড়িয়াছিলেন এই জন্তই। পণ্ডিতজী সংকটমুক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু আমরা যাহারা ভারতের ছাপোষা অ
যাহারা রাজনীতির মার-প্যাচের বিন্দু-বিসর্গও বু
সেই আমাদের মস্তিস্কে কিন্তু ব্যাপারটির অর্থ এ
প্রবেশ করে নাই। আমরা স্বাধীনও হইব, অথচ
বৃটেনের পার্শ্বচরও হইব—ইহা যে কেমন করিয়া
আমাদের কাছে এক মহা দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

ব্যাপারটিকে এমনি রহস্যময় বোধ হয় আ
দেশের কতিপয় সাংবাদিকেরও লাগিয়াছিল।
পণ্ডিতজী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্যক্তি হিসাবে বৃ
রাজটির সঙ্গে ভারতের আর কোনো সম্পর্ক নাই,
মান্য করিবে শুধু বৃটীশ রাজতন্ত্রের symbo
প্রতীকটিকে। এখন, পার্লামেণ্টের বিজ্ঞ সদস্যর
আমরাও পর্য্যন্ত জানিতাম যে ভারত যতদিন স
বাদের অধীন ছিল, ততদিন ব্যক্তি হিসাবে ইংল
সহিত আমাদের কোন বিবাদ ছিল না। তাঁহ
তাঁহার রাজদণ্ড যে পদ্ধতির প্রতীক, সেই বৃটীশ
গত দুই শত বৎসর ধরিয়া শোষণ করিয়াছে
পণ্ডিতজী symbol বা প্রতীক হিসাবে
বুঝিয়াছেন, ইহা আমরা ছাপোষা ভারতবাসী
নাই। আমাদের মত উক্ত অল্পবুদ্ধি সাংবা
সম্ভবতঃ সেই অর্থ-বিভ্রাটেই পড়িয়াছিলেন।
তাই পণ্ডিতজীর সহকারী ও সহচর এবং ভারতের
উপ-প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেলের কাছে এই অর্থ-
একটি পরিষ্কার উত্তর চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু মাননীয় উপ-প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এ
উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তাদের Webster-এর অভিধান
বলিয়াছেন।

এখন আর বাকি আছেন পণ্ডিতজী স্বয়ং।
অবস্থানকালে তিনি যখন বৃটেনের কাছ থে
সোনার পাথর-বাটিটি লাভ করেন তখন হইতেই
বামপন্থীরা বিপুল সোরগোল তুলিয়া বলিতে
করিয়াছেন যে, পণ্ডিতজী ভারতবাসীকে ঠকাই
পণ্ডিতজী কিন্তু এই অভিযোগ স্বীকার করেন
লণ্ডনে থাকিতেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভার
তনি ভারতবাসীকে বুঝাইয়া দিবেন তাহ

কথা, তখন ভারতবাসী বুঝিবে সত্যই তাহারা কিনা।

নজই আমাদের মনে হয়, এতদসম্পর্কে এখন -প্রতিবাদ চাপা থাকাই ভালো। পণ্ডিতজী ফিরিয়াছেন। খুব শীঘ্রই পার্লামেন্টে তাহার র সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হইবে।

কেবল এই ভাবি যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ন অখণ্ড ভারতকে এক বিশাল জাতি সংসদের খিতে এবং ভারতের বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, যুবক জওহর তখন লন, আর আজ ভারত বিখণ্ডিত করিয়া উভয় নজাগণকে লইয়া ইংরাজ কিরূপ মাঝে বসিয়া বিসম্বাদ জাগাইয়া রাখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ প্রবীণ জওহর আজ যে সেই সাম্রাজ্যবাদীর এ স্তায় তাহাদের কৌতূহলোদ্দীপক খেলার য়াছেন এবং ইহা যে তিনি বুঝিয়াও বুঝেন না, ।

গ্রেস কি ভারতবাসীর সমর্থন হারাইতেছে?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি, কংগ্রেসকে যাহারা জ্ঞানোদয়ের প্রথমক্ষণ হইতেই সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন, সেই ভারতবাসীদের গ্র করিয়া তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমরাও দের অন্যতম।

র শক্তি ক্ষুদ্র, ইহার কণ্ঠও খুব বেশী উচ্চস্বরে নগণ্য হইলেও 'বঙ্গশ্রী' আপামর সাধারণ ভারত- একজন প্রতিনিধি। সাধ্যমত দেশসেবায় তেছে না। এই বঙ্গশ্রী গত প্রায় দেড় বৎসর তাহার সাধ্যমত সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে চেষ্টা করিয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর আগে গ্রেস তাহার এতাবৎ আচরিত আদর্শ হইতে হইয়া যাইতেছে। কংগ্রেস আপামর বুঝাইয়া ছিলেন যে, অর্থনৈতিক মুক্তি, প্রজারাজই প্রকৃত স্বরাজ। কিন্তু কংগ্রেস প্রদর্শিত এই স্বরাজের ছবি স্বাধীনতা পাইবার পর আয়ত্তে আসা দূরে থাক, ভারতবাসীর সম্মুখ হইতে সে আলেখ্য দিন দিন দূরেই সরিয়া যাইতেছে। কংগ্রেস বলিয়াছিলেন নাগরিকদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, সভা শোভাযাত্রা করার স্বাধীনতা যে-সরকারের শাসনে থাকে না, সে সরকার জনসাধারণের বন্ধু নয়। অথচ প্রাদেশিক সরকারগুলি আজ নিরাপত্তার নামে ভারতীয় জন- সাধারণের এই অধিকার কাড়িয়া রাখিতেছেন। এই সব কারণেই বঙ্গশ্রী বলিতেছিল—জনসাধারণ ক্রমেই কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছে।

কংগ্রেসের পাণ্ডাস্থানীয়রা কিন্তু বঙ্গশ্রীর এবং বঙ্গশ্রীর মত আর যাহারা জনসাধারণের নাড়ি টিপিয়া কথা বলে, তাহাদের উক্ত উদ্বিগ্ন সাবধানবাণী কানেই তুলিতেছেন না। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এই সব কথা কালে ভদ্রে যদি গিয়া তাহাদের কানে পৌঁছায় তো তাহারা নাকি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাসেন আর বলেন—বটে! কই ইলেকসন তো খোলাই আছে। নিয়মতন্ত্রের পথে দেখাইয়া দাও তো তোমাদের ধারণার এই সত্যতা?

মনে মনে আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমাদের নেতাদের বিশ্বাসই যেন সত্য হয়—নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার কোন ক্ষেত্রেই যেন না ভারতবাসী কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়। কংগ্রেস তো একা নেতাদের নয়, কংগ্রেস আমাদেরই। কংগ্রেসের পরাজয় কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের পরাজয়।

কিন্তু যতদূর মনে হয়, আমাদের এই প্রার্থনা বুঝি ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। দিন কয়েক আগে ভারতের নানান স্থানে ও নানাবিভাগে ক'টি উপনির্ব্বাচন হইয়া গেল। সেই উপনির্ব্বাচনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস- প্রার্থী বিপক্ষ প্রার্থীদের কাছে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হইয়াছেন। বাঙ্গলায় অবশ্য এপর্য্যন্ত কংগ্রেসই জয়ী হইয়াছেন।

তবে সব চেয়ে শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে বোম্বাই হইতে। সেখানকার একটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের মনোনীত ও আপ্রাণ প্রচারিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন দুইজন প্রার্থী—ইহাদের মধ্যে একজন সোস্যালিষ্ট পার্টির

লোক। সোস্যালিষ্টরা নাকি এই নির্ব্বাচনের সময় তাহাদের ইলেক্‌সন ম্যানিফেষ্টো প্রচার করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের প্রতি অনাস্থাই তাহাদের পার্টির প্রথম নীতি। সোস্যালিষ্ট প্রার্থীকে যদি বোম্বাইয়ের লোক নির্ব্বাচিত করেন, তাহা হইলে এই কথাই প্রমাণিত হইবে যে, কংগ্রেসের প্রতি অন্ততঃ এই বিশেষ কেন্দ্রের অধিবাসীদের কোনো শ্রদ্ধা বা আস্থা নাই।

বোম্বাইয়ের উক্ত কেন্দ্রবাসীরা সোস্যালিষ্ট প্রার্থীকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে আসার আগে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের উপর নিজের ছায়া ফেলে। অধুনা সংঘটিত উপনির্ব্বাচনগুলিতে কংগ্রেসের পরাজয় কি তেমনি কোন অশুভ ভবিষ্যতের অগ্রগামী ছায়া?

গণতন্ত্র ও স্বাধীন সংবাদপত্র

দিন কয়েক আগে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার কোনো একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে নাকি বলিয়াছেন, স্বাধীন বিচার বিভাগের মতই স্বাধীন ও নির্ভীক সংবাদপত্র গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। প্রধানতঃ ভারতের সংবাদপত্রগুলি অকুতোভয়ে ভারতীয় গণসমাজের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ আজ সাম্রাজ্যবাদীর শাসন-মুক্ত।"

খবরটি কতদূর সত্য তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী যে কথা ক'টি উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, সমাজশাস্ত্রের তত্ত্ব হিসাবে কিন্তু ইহার সত্যতা আজ দেড়শত বৎসরেরও অধিককাল হইল পৃথিবীর ইতিহাসে অবিসম্বাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে।

জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা অভাব অভিযোগ পরস্পরের সহিত বাদ-প্রতিবাদ—সবেরই মুখপত্র সংবাদপত্র। যে-শাসনতন্ত্র জনগনের সেবক বলিয়া দাবী করিবে, তাহাকে সংবাদপত্রের নির্দ্দেশকে মান্য করিতে হইবে। জনগণ কী চায়, আর কী চায় না, জনগণের শাসনের দায়িত্ব যাহাদের স্কন্ধে আরোপিত, তাহাদের পক্ষে সব সময় সাধ্য নয় জনগণের চাওয়া-না-চাওয়া এই সব সংবাদ রাখা। সংবাদপত্র এবং সা[illegible] এই সব সংবাদ শাসনকর্ত্তৃপক্ষের শ্রুতিগো[illegible] আসেন। তার পর জনসাধারণের অভাব-[illegible] কথা শুনিয়া শাসনের দায়িত্ব প্রাপ্তরা সেই অ[illegible] প্রার্থনা মিটাইবার জন্য কী করিলেন অথবা ক[illegible] কী পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, সে কথা [illegible] জনগণের যে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ও অধিকা[illegible] উৎকণ্ঠা মিটাইবার জন্য গণতান্ত্রিক শাসনক[illegible] বাধ্যবাধকতা—এই পারস্পরিক আনাগোনাকে[illegible] করার দায়িত্বও সংবাদপত্রেরই। ইহাই গ[illegible] প্রক্রিয়া, ইহার বিচ্যুতি বা ত্রুটি গণতন্ত্রেরই [illegible] ডিক্টেটর শাসিত দেশগুলিতে কর্ত্তৃপক্ষ ও জনগ[illegible] পারস্পরিক সংবাদ আদান-প্রদানের এই [illegible] স্বাধীনতা নাই বলিয়াই বলা হয়—সে সব রা[illegible] অনুপস্থিত, গণস্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত।

কিন্তু অধুনা আমাদের ভারতীয় ইউনিয়[illegible] দায়িত্ব যাহাদের হাতে, তাহারা বছর দুই [illegible] আবেশ ও আন্তরিকতা নিয়া স্বাধীন [illegible] উপরোক্ত গণতন্ত্রের ভূমিকাটির কথা উচ্চার[illegible] ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে আজ তাঁহারা [illegible] পালন করিতে দিতে স্বীকৃত হইতেছেন কি [illegible] বলিয়া রাখিতে চাই, এ প্রশ্ন শুধু একা আম[illegible] অধুনা আমাদের মত ভারত-সরকারের অনুগত [illegible] অধিকাংশ ভারতীয় সংবাদপত্রেরই মুখে [illegible] সোচ্চার। এমন কি ষ্টেটস্‌ম্যানের মত স[illegible] বশম্বদ সংবাদ-পত্রটিও এ সম্বন্ধে কিছু প্রতি[illegible] না করিয়া পারেন নাই। স্বাধীনতা [illegible] ভারতের (পাকিস্তানেরও) রাষ্ট্রনায়করা আ[illegible] নীতির সমালোচকদের যে দৃষ্টিতে দে[illegible] করিয়াছেন, গণতন্ত্রীদের কাছে সত্যই [illegible] অপ্রীতিপদ বিষয়। দিন কয়েক আগে দুটি [illegible] বিরুদ্ধে কোনও এক প্রাদেশিক সরকার [illegible] দ্রোহের অভিযোগে সামান্য অর্থ দাবী করিয়[illegible] অভিযোগের বিচার করিতে গিয়া দুইজন [illegible] বিচার-পতিও পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য

এ-ধরণের কাজ জনসাধারণের স্বাভিমত ব্যক্ত ণ্ঠ রুদ্ধ করিবে।

রী ব্যক্তিরা হয়তো বলিবেন যে, শিশু রাষ্ট্রের ণ জন্য দেশের গভর্ণমেন্টের সব খবরই প্রকাশ ওয়াটা সব সময় বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহাদের এ অমান্য করিবে না। কিন্তু সব ব্যাপারেরই মাত্রা থাকা উচিত। তাছাড়া যে সকল খবরের াধারণের অভাব অভিযোগ, তাহাদের আশা- —সেই সব খবরকে ছাপার হরপে আত্মপ্রকাশ । দিলেই কি ছাপিয়া রাখা সম্ভব? বরঞ্চ ইহাতে ল হয়, গুজব সাংবাদিকদের অবৈতনিক চেষ্টায় খর অতি রঞ্জিত হইয়া তালের খবরে রূপান্তরিত

গুজবই যে হইতেছে নিরাপদ গভর্ণমেন্টের সব শত্রু।

আবার পুলিশ-'গুলি'

.২৭শে এপ্রিল কলিকাতার রাজপথে আবার াগরিক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া বে-আইনিভাবে ত্রা বাহির করিয়াছিল বলিয়া পুলিশ তাহাদের । চালাইয়াছিল। এবারকার ১৪৪ ধারা ভঙ্গ- মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া প্রকাশ। গুলির মত এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খবরটিও শান্তিকামী দের পক্ষে কম উদ্বেগজনক নয়। বে-আইনি ত্রীদের মধ্য হইতে পুলিসের উপরে কেহ কেহ মা নিক্ষেপ করিয়াছিল। শোভাযাত্রীদের মধ্যে ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নাকি ার আঘাতেই মারা গিয়াছেন।

ধারা অমান্য করিয়া কতিপয় বিশেষ রাজনৈতিক বে-আইনি শোভাযাত্রা করার চেষ্টা এবং তার লস কর্তৃক গুলিবর্ষণ—স্বাধীন ভারতে এ আজকাল তেমন আর কিছু রোমহর্ষক সংবাদ ম্বন্ধে 'বঙ্গশ্রী'ও একাধিকবার তাহার মন্তব্য- য়াছে। তাই এবারে এ নিয়া আমরা আর বিশেষ কিছু বলিতে রাজী নই। এ প্রসঙ্গে শুধু একটি মাত্র কথাই আমরা বলিতে চাই :

অনেকে বলেন, "নাগরিকদের কোনো অংশ যে-কারণেই হোক্ না কেন, রাষ্ট্রের আইন মানিতেছে না, ইহাও যেমন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে অবাঞ্ছনীয়, তেমনই রাষ্ট্রের কল্যাণের খাতিরে সেই আইন-না-মানার জন্য চরম শাস্তি দেওয়াটাও কিছু বাঞ্ছনীয় নয়, বিশেষতঃ শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে যদি সুকুমারমতী ছাত্ররা এবং মহিলারা থাকেন। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়াটা কাহারই বরদাস্ত হয় না, অধিকন্তু তাহাতে জন-সাধারণের সহানুভূতি শাস্তি-প্রাপ্তদেরই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিছু না বুঝিয়াই ঝুঁকিয়া পড়ে। মানুষের মনের নিয়মই এই। ১৪৪ ধারার মত নিষেধাজ্ঞা ইয়োরোপের নাগরিকরা হামেসাই অমান্য করিয়া থাকে, বিরুদ্ধপক্ষের রাজনৈতিকদলের অনুসারীরাও কখনও কখনও পুলিসকে ইটপাটকেল দিয়া আক্রমণ করিয়া বসে—কিন্তু ইয়ো-রোপের পুলিসরা অমন কথায় কথায় গুলি ছোড়ে না। শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য অনেক সভ্য অস্ত্র মানুষের অস্ত্রশালায় স্থান পাইয়াছে।"

এই মত অনুধাবন যোগ্য সন্দেহ নাই, তবে এ কথাও ঠিক যে আজকাল একশ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন ধ্বংসাত্মক কার্য্য করিবার স্পৃহা জাগরিত হইয়াছে বা mania হইয়াছে যে, তাহাদিগকে দমন করাও এক বিষম সমস্যার বিষয়। আজকাল ধ্বংসাত্মক কার্য্যে উৎসাহ দেওয়াই একশ্রেণীর লোকের আনন্দ এবং স্ত্রীলোকদিগের গায়ে কেহ হাত দিতে চাহিবেনা বলিয়া স্ত্রীলোকগণকে অগ্রভাগে দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই পূজ্যা, কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য হাওয়ার প্রভাবে যখন দেখিতে পাই যে—আফিসে, দপ্তরে, রাস্তায়, বালিকা বিদ্যালয়ে বাহিরের একশ্রেণীর মেয়েরা গিয়া এমন উৎপাত করে, যাকে তাকে গালাগালি দেয়, প্রহার করে, তখন মনে হয়, ইহাদের সঙ্গে আমাদের পূজ্যা মাতৃজাতির কি কোনরূপ সম্বন্ধ আছে? ইহাদের উৎপাত হইতেও দেশ-বাসীকে কি রক্ষা করা উচিত নয়?

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সাতজন নিহত ব্যক্তির মধ্যে শবদেহ

পরীক্ষকদের মতে পাঁচজনের দেহে বোমার ছিটকানি পাওয়া গিয়াছে এবং দুইজন গুলির আঘাতে মারা গিয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পুলিসও আছে। এখন এই যে বোমার ছিটকানিতে মারা গিয়াছে, সেই বোমা কোথা হইতে আসিল? পুলিসের হাতে ছিল এমন কথা কেহ বলেনা। স্ত্রীলোকদের হাতে ছিল বলিয়া সরকার বলেন। আবার অন্য স্থান হইতে পড়াও অসম্ভব নয়। সেই অন্যস্থানের সঙ্গে যদি পুলিসের সম্বন্ধ থাকে, তবে অবশ্য পুলিসের দোষ, আর যদি তৃতীয় পক্ষ হইয়া থাকে অথবা সেই পক্ষের সহিত মেয়েদের বা তাহাদের উৎসাহকারীদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, তবে পুলিসের কোন দোষ নাই। দ্বিতীয় বা দ্বিতীয় সংশ্লিষ্ট তৃতীয় অথবা নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষেরই দোষ। এই বিষয়ে স্থির একটা সিদ্ধান্ত পাইলে সাধারণ লোক খুসী হইবে।

যদি বোমার আঘাতের কথা সত্যই হয় এবং এপর্য্যন্ত বোমার কথা কেহই অস্বীকার করে না, আর পুলিস যদি বুঝিতে পারে যে, তাহাদের উপরেই বোমার আক্রমণ হইতেছে বা হইবে, তবে পুলিস যদি গুলি না করে, এবং যদি পুলিস আরও নিহত হয়, তবে ভবিষ্যতে বিপজ্জনক স্থানে পুলিসের সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়, আর পুলিস যদি শঙ্কিত হইয়া পড়ে, তবে শান্তিরক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সভা করিয়া যখন প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাই কি যথেষ্ট হয় নাই? আবার তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা করিয়া পরিচালিত করার আবশ্যকতা কি ছিল? শোভাযাত্রা হইলে বাহিরের লোকও তামাসা দেখিবার জন্য অনর্থ উৎপাদনে সহায়তা করিতে পারে, ইহাও তাহাদের বুঝা উচিত ছিল। বিশেষতঃ যাহারা পুরোভাগে ছিলেন এবং নিহত হইয়াছেন, তাহারা স্কুল কলেজের অপরিপক্কবুদ্ধি বা অল্প বয়স্কা বালিকা নহেন, সকলেই পরিণত বয়স্কা মহিলা। প্রকৃত কথা, মহিলারা নিহত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা আন্তরিক দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদিগকে পুরোভাগে রাখিয়া গোলমাল সৃষ্টি যাহাদের প্রয়াস ছিল, ঐসব বিয়োগান্ত দৃ তাহাদের দায়িত্বও কম নয়। দেশ হইতে এ ধ্বংসাত্মক অপকার্য্যের তাণ্ডবলীলা কি শীঘ্র হইবে না?

একটি হত্যাকাণ্ড

গত ৪ঠা মে মালয় ফেডারেশনের বৃটীশ ক আইনের(?) নাম করিয়া একজন কৃতী ভারতী হত্যা করিয়াছেন।

মালয়ের সাম্প্রতিক গোলযোগ দমন কর ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মাস কয়েক আগে এক করিয়াছিলেন যে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ অবস্থাতেই কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রাখিতে না। এই আদেশ অমান্য করার শাস্তি মৃত্যু। গণপতি নামে এক ভারতীয় যুবককে নাকি মা পক্ষের পুলিস এই আদেশ অমান্য করার গ্রেপ্তার করিয়াছিল।

মালয় ফেডারেশন বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের উপনিবেশ, অতএব ভারতের মত উহাও কমনও অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে মালয় কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্দ্যের থাকিবে, ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে। তবুও দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ মৃত্যুদণ্ডে রীতিমতই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। ভার কমনওয়েলথে যোগদানের ব্যাপারটাকে যাহারা চিত্তে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাদেরও অ দেখিলাম বেশ তিক্ত কণ্ঠেই মন্তব্য করিয়া ফে যে, ভারত বৃটীশ জাতটার কাছে কোন দিনই প্রাপ্য মর্য্যাদা পাইবে না।

আমাদের রাষ্ট্র নায়কদের এই ক্ষোভ আন্তরিক তাহা জানি না, তাহাদের এই কারণটি যেন আমাদের দেশবাসী কোন দিন না গণপতির অপরাধ বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ সন্তোষজনকভা করিতে পারেন নাই, অপরাধীকে তাহার দোষ বা আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোন সুযোগ তাহারা

...ধু এইটুকুই ভারতবাসীর স্মরণীয় বিষয় নয়। ... অপরাধ উপযুক্ত ভাবে উন্মুক্ত আইনসঙ্গত ...প্রমাণ করার জন্য ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকারে ...র্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৃটেনের ...দের জানাইয়াছিলেন পর্য্যন্ত। কিন্তু মালয়স্থ ...কার ভারতের সে অনুরোধে কর্ণপাতও করেন ...টেনের কর্ম্মচারীরাও না।

...কটি কথা—মালয়ের সাম্প্রতিক বিক্ষোভের ...নকার ভারতীয় বাসিন্দারা কিন্তু পরোক্ষভাবে ...পক্ষকেই সাহায্য করিয়াছিল।

নূতন আয়ার

...৯ সালের ইষ্টার সোমবারটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় তারিখ হইয়া থাকিবে। এ দিন ...গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে সমুদয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলিয়া নিজেকে ঘোষণা ...

...রিশদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সে এক ...্যের মত। নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ... ইংরেজ-শাসনের খবরদারি হইতে মুক্ত করার ...শত বৎসর ধরিয়া কতশত ভাবে প্রতিরোধ ... আসিয়াছে আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা। ইংরেজ ...ক্ষী এই শত শত বৎসর ধরিয়াই আইরিশদের ...মকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য কত যে নির্য্যাতন ... রক্তপাত করিয়াছে, তার আর ইয়ত্তা নাই। ...ল্যাণ্ড দমে নাই কোনোদিন। পুরুষানুক্রমে ...ণ্ডর সন্তানেরা ইংরেজ শাসকদের সেই ... সহ্য করিয়াছে, সম্ভব হইলে আঘাতের ...ত্যাঘাতও করিয়াছে। এতদিনে তাহাদের ... সংগ্রাম বুঝি শেষ হইল।

...শরা ভারতের আত্মীয়ের মত। ইংরেজ ...কবলমুক্ত হইবার চেষ্টায় ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ...হ আজ প্রায় শত-খানেক বৎসর। এই ...সরের সংগ্রামে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা ...তকে সমর্থন করিয়াছেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীরা আইরিশদের কাছে বহুক্ষেত্র হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে—কি নিরস্ত্র সাংস্কৃতিক সংগ্রামে, কি সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়। ভারতের আত্মার বাণী, ভারতীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যাহা আজ ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক মহলের সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধেয়—তাহাকে ইয়োরোপীয়দের উপলব্ধির কাছে পৌছাইয়া দিতে আয়ার্ল্যাণ্ডের দান কম নয়। রবীন্দ্রনাথকেও ইয়োরোপীয় রসজ্ঞদের কাছে প্রথম পরিচিত করিয়াছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের ইয়েটস্। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে গত ১৮ই এপ্রিল আয়ার নূতন পরিচয় লাভ করিল, তাহাতে ভারতবাসীর মত আনন্দিত বুঝি পৃথিবীর আর কোন জাতিই হইতে পারে নাই।

আইরিশদের কাছে সংগ্রামের শিক্ষা অনেক লাভ করিয়াছে ভারত। তাহাদের সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত দিয়াও তাহারা ভারতের সম্মুখে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আগাইয়া দিল। সে-শিক্ষাটি এই যে, যত ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই হোক্ না কেন, বা যত সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যই থাকুক,—সাম্রাজ্যবাদীর কণ্ঠলগ্ন থাকা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসী

উনোর তথাকথিত শান্তি-স্রষ্টারা পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের উৎপীড়িত অবস্থা নিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে রাজী হইয়াছেন। তদনুসারে উনোর পলিটিকাল কমিটিতে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক আইনের মার-প্যাঁচ নিয়া বাকযুদ্ধ হইতেছে।

উনোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে আজ প্রায় তিন বৎসরেরও উপরে। সকলেই জানেন, উদ্‌ঘোষিত আদর্শ অনুসারে সারা পৃথিবীতে সর্ব্বাঙ্গীন স্থায়ী শান্তি স্থাপন করাই উনোর জন্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দীর্ঘ তিন বৎসরাধিক কালের মধ্যে আমরা দেখিলাম যে, উনোর পাণ্ডাস্থানীয়রা শান্তির জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা শুধুই বক্তৃতা, বাচনিক প্রচেষ্টা। ইহা ব্যতীত তাহারা আর কিছুই করেন না, বা প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত উদ্দেশ্য সাধন তারা আর সবকিছুই করেন। এবারের আলোচনাতেও দক্ষিণ

আফ্রিকাবাসী আমাদের স্বজাতীয়দের সম্পর্কে উল্লসিত বা আশান্বিত হইবার কিছুই নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মুষ্টিমেয় শ্বেত ফ্যাসিষ্ট অধিবাসীদের দ্বারা একা ভারতীয়রা শুধু নয়, সেখানাকার সমস্ত অশ্বেত অধিবাসীরাই যে ভাবে নির্য্যাতিত ও উৎপীড়িত হইতেছে, সেই ফ্যাসিষ্ট নির্য্যাতন ও উৎপীড়নের প্রতিকারের একমাত্র উপায় উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ। ইহা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ভারতের ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ মহলের কেহ-কেহ অবশ্য এই ইচ্ছাবতী চিন্তায় মশগুল হইয়া আছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারত ও পাকিস্তান যখন একই সুখী কমনওয়েলথ্ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তখন ধীরে ধীরে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত অধিবাসীরা নিজেরাই ভারতীয় সহ-নাগরিকদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কোলে টানিয়া নিবে।

এপ্রসঙ্গের উত্তরে আমরা কেবল একটি চিঠির অনুবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। চিঠিখানি দক্ষিণ-আফ্রিকার একজন শ্বেত-অধিবাসীর লেখা। ডারবানের একটি দৈনিক সংবাদপত্র 'Mercury'-তে দিন কয়েক আগে চিঠিটা প্রকাশিত হইয়াছিল।—

'মহাশয়'

গত ২২শে এপ্রিল সংখ্যায় আপনাদের কাগজে একটি ছবি ছাপা হইয়াছে। উক্ত ছবিতে [illegible] আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মালান আর [illegible] ভারতীয় স্ত্রীলোক (বেগম লিয়াকৎ আলি [illegible] সঙ্গে মিঃ এটলির পার্শ্বে উপবিষ্টা)। এই [illegible] কখনই সত্য হইতে পারে না। [illegible] মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া [illegible] ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক সূত্রে মেলামেশা [illegible] এই জঘন্য মিথ্যা কোন্ জাতীয়তাবাদী ও দে[illegible] 'সাউথ্-আফ্রিকানরা' বিশ্বাস করিবে? আ[illegible] করিয়া বলিতে পারি, আপনারা যদি উপ[illegible] ব্যাপারটার তদন্ত করেন, তাহা হইলেই প্রমাণ [illegible] যে, সাউথ আফ্রিকার কোনো শত্রু আমাদের [illegible] প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার স্ত্রীকে আমাদের জাতি[illegible] হেয় করার হীন উদ্দেশ্যেই এইরূপ একটি ছবি আ[illegible] আপনাদের পাঠাইয়াছে।'

ইহার উপর আর কোন মন্তব্য করার [illegible] আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই [illegible] হইতেই ভারত ও পাকিস্থানের সাধারণ অধিবা[illegible] উপলব্ধি করিতে পারিবেন—দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীরা সেখানকার ভারতীয় অধিবাসীদের সম-মর্যাদা দিবার জন্য কতখানি উদ্গ্রীব।

বর্ষ শেষ

বর্ত্তমান সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর ষোড়শ বর্ষ সমাপ্ত হইল। আগামী সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রীর [illegible] বর্ষ আরম্ভ। এই সুদীর্ঘকাল বহু ঐতিহাসিক দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অগ্রগতির পথে অ[illegible] হইতে হইয়াছে। এতদিন আমাদের যে সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাত[illegible] শুভানুধ্যায়ীদের স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমাদের দুর্গম পথকে নিষ্কণ্টক করিয়াছে, ভরসা রাখি—অ[illegible] বর্ষেও তাঁহাদের সেই স্নেহ ও শুভেচ্ছা সমভাবেই আমাদের উপর বর্ষিত হইবে। এই অবকাশে [illegible] তাঁহাদিগকে এবং আপামর সর্ব্বসাধারণকে আমাদের সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাত[illegible]
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কে. ভি. আপ্পারাও